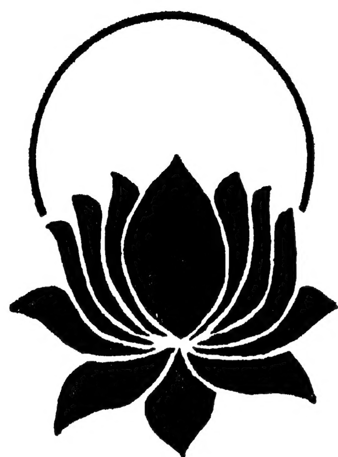


উদ্বোধন





উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ ১৩৭৮



৭৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়; কিন্তু শ্রাবণ মাস হইতে বার্ষিক গ্রাহক হওয়া যায় না, বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪'৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা। নমুনার জন্য ৭৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, সামাজিক উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় বামদিকে অন্ততঃ একইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। **পত্রোত্তর ও প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না, কপি রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। অফিসে টাকা জমা দিবার সময় : সকাল ৭½টা হইতে ১১টা; বিকাল ২½টা হইতে ৫টা। রবিবার কেবল বিকাল ৩টা হইতে ৫টা।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭৪তম বর্ষ

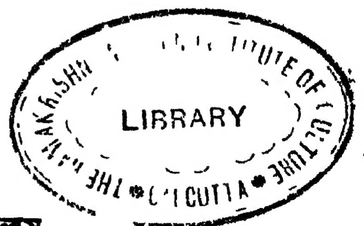
(মাঘ, ১৩৭৮ হইতে পৌষ, ১৩৭৯)



'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য ৮৲ প্রতি সংখ্যা ৭৫প.

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ, ১৩৭৮ হইতে পৌষ, ১৩৭৯)

চিত্রসূচী :



দিব্য বাণী

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥
কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাথস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

আপনার দেহাতীত অস্তিত্বের বোধ যার নাই,
দেহকেই আত্মা বলি ভাবি যারা চলে আজীবন—
নাস্তিক্য ইহারই নাম—মূঢ় তারা ; তারাই সদাই
'ক্ষীণ মোরা', 'দীন মোরা' বলি করে করুণ ক্রন্দন !
রামকৃষ্ণদাস মোরা -(দেহাতীত চিদানন্দময়
অবিনাশী সত্তাকেই আপন স্বরূপ বলি জানি')
অভয় পদেতে মোরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি যখন—
আস্তিক্য ইহারই নাম—হয়েছি যে বীর, গত-ভয় !
ত্রিভুবন উপাড়িব, গ্রহ-তারা করিব চর্বণ !
জানো নাকি কেবা মোরা ? —মোরা রামকৃষ্ণদাস,
(আত্মবলে মোরা বলীয়ান) !

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় উদ্বোধন পত্রিকা বর্তমান মাসে ৭৪তম বর্ষে পদার্পণ করিল। সুদীর্ঘ ৭৩ বৎসর ধরিয়া নবযুগ-প্রবর্তক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচারের মাধ্যমে সে জাতির সেবা করিয়া আসিতেছে। কোন ভাব সুদীর্ঘকাল স্থায়ী রাখিবার জন্য যেমন সেই ভাবানুরূপ জীবনের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহিত্যেরও। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। গুড্‌উইন যখন তাঁহার বক্তৃতাগুলি লিখিতে শুরু করেন, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন, "সাংকেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলি লিখে নেবার ফলে অনেকটা সাহিত্য গড়ে উঠছে দেখে আমি খুশী।" বলিয়াছিলেন, "এমন কতকগুলি পুস্তক রাখিয়া যাইতে চাই যেগুলি আমি চলিয়া গেলে আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ হইবে।" উদ্বোধন পত্রিকার পরম গৌরব, স্বামীজীর বাংলা রচনা, ইংরাজী বক্তৃতা ও রচনার অনুবাদগুলি সে বাংলা ভাষায় প্রথম পরিবেশন করিয়াছিল। জাতীয়তাবোধের জাগরণে তাহার অবদান তাই যথেষ্ট।

উদ্বোধন তাহার সাধ্যমতো এই কাজ করিয়া চলিয়াছে আজও। দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে চিন্তাধারায় ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। ব্যাপকভাবে কখনো স্বামীজীর চিন্তাধারাকে জীবনে গ্রহণ করা হইয়াছে, কখনো তাহার প্রতি উদাসীনতা দেখানো হইয়াছে, কখনো বা বিক্ষিপ্তভাবে তাহার বিরোধিতাও লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু একথা নিশ্চিত, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার ভাবধারা শুধু ভারতই নয়, সারা জগৎই আজ গ্রহণ করিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা ইহার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা তাঁহার ভাব-সম্প্রসারণের পথ প্রশস্তই করিয়া দিতেছে। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই—জাগতিক উন্নতির জন্য প্রচণ্ড কর্মোদ্যমের সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাস, সংযম, একাগ্রতা, ত্যাগ, ও ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের দেহাতীত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার উদ্যমই—মানবসভ্যতাকে উন্নততর করিবার, বিশ্বশান্তি ও যথার্থ সাম্যস্থাপন করিবার এক-মাত্র পথ, উদ্বোধন পত্রিকা ইহাতে স্থিরবিশ্বাসী থাকিয়াই পথ চলিয়া আসিতেছে।

যাঁহারা এই সেবাব্রতে 'উদ্বোধন'কে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন সেইসব লেখক, গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দের নিকট হইতে ভবিষ্যতেও এই সহায়তা আমরা প্রার্থনা করি। আজ 'উদ্বোধনে'র নববর্ষে তাঁহাদের সকলকেই আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীরাম-কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করি, উদ্বোধনের নববর্ষের যাত্রা যেন অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হয়—অধিকতর হৃদয়কে সে যেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় সিঞ্চিত করিতে পারে।

স্বামীজীর ভাবধারা

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্বোধনের দিন স্বামী বিবেকা-নন্দ সেখানে তাঁহার প্রথম ভাষণে বলিয়া-ছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বার

বার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে এই সব ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব-সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; আমি সর্বোতোভাবে আশা করি, এই ধর্মমহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।'

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও ধর্মোন্মত্ততার অবসানের ঘণ্টাধ্বনি নবযুগের শুভাশিস্ রূপে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল দক্ষিণেশ্বরে। সে ধ্বনিতরঙ্গকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিধ্বনিত করিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তখন হইতেই তাহা ব্যক্তিগতভাবে বহুজনের হৃদয় আলোড়িত করিয়া, বহুজনের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপক ক্ষেত্রে সর্বজনের জীবনচর্যার উপর তাহা প্রভাববিস্তার করে নাই। এই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও 'তরবারি ও লেখনীমুখে' ইহার কি পৈশাচিক নৃত্য আমাদের দেখিতে হইয়াছে! বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় উহা চরমে উঠিয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতেই আজ ইহার সমাধির বিপুলনিনাদ ঘণ্টাধ্বনি উঠিয়া দিগ্‌বিদিক পরিব্যাপ্ত করিতেছে। এখনো নিকটে এবং দূরে সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি-প্রসূত যে ভেদ ও ঘৃণার ধ্বনি শ্রুত হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এই নিনাদেই তাহা ডুবিয়া যাইবে।

ধর্মীয় মতবাদের ভেদ-রেখা টানিয়া মানুষে-মানুষে ঘৃণা ও বিদ্বেষ-সৃষ্টি যে কতখানি পৈশাচিক, কত ক্ষতিকর এবং আসলে এই ভেদ যে কাল্পনিক, একথা আজ সোচ্চার হইয়াছে শুধু চিন্তাতেই নয়, মানুষের হৃদয়েও। ধনী-নির্ধনে ভেদাপসারণের আন্তরিক কার্যকর প্রচেষ্টার ন্যায় স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত মানবজাতির যথার্থ অগ্রগমনের পথ প্রশস্ততর করিতে ইহাও পূর্ণোদ্যমে ব্যাপৃত হইল। শুধু বাংলাদেশে নয়, শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বেই ইহার প্রভাব ক্রমবর্ধমান গতিতে বিস্তৃত হইয়া চলিবেই। আমরা জানি, কথায় নয়, জীবন হইতেই আদর্শ জীবনান্তরে বাহিত হয়। বহুকালরক্ষিত সাম্প্রদায়িকতার ভেদান্ধকার পূর্বগগনে সে জীবনালোকের স্পর্শমাত্রে অন্তর্হিত হইয়াছে, আমরা প্রার্থনা করি সে আলোকে আলোকিত হইয়া উঠুক সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়। আজ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এই আলোকোদ্ভাসিত পথেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন পৃথিবী হইতে সর্ববিধ ভেদের অবসান ঘটাইবার জন্য। তাঁহার ভাবধারাই সর্ববিধ ভেদাপসারণে সক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভাবধারাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন আধুনিক মনের বোধগম্য ভাষায়, নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন কিভাবে সে ভাবকে আধুনিক জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে তাহার।

কথায় যাহাই হউক, কাজের বেলা স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত পথের বিপরীত দিকেই তো মানুষ আজ চলিতেছে, আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহার মধ্য দিয়াই মানুষ অগ্রসর হইতেছে তাঁহারই নির্দেশিত পথে; মানুষের সমাজের যাহা কিছু

মালিন্য, যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, তাহা সবই আজ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। মানুষ তাহা ত্যাগ করিয়া মালিন্যমুক্ত হইবেই। সারা পৃথিবীর মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ক্রমবর্ধমান। তমোগুণে আচ্ছন্ন জাতিগুলির মধ্যেও তামসিকতা কাটিয়া গিয়া রাজসিকতার বিকাশ ঘটিতেছে, ধনী-নির্ধনের ভেদাপসারণের বিপুল উদ্যমও শুরু হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি ব্যাপকভাবে ধর্মগত ভেদাপসারণও শুরু হইল। প্রথম প্রথম সর্বক্ষেত্রেই ভুলত্রুটি থাকিতেছে কিন্তু ক্রমে তাহা সংশোধিতও হইবে।

সংশোধিত হইবে ভারতকে দেখিয়াই। সংশোধনের জন্য একমাত্র প্রয়োজন দৃষ্টিকে জড়বাদ হইতে অধ্যাত্মবাদের দিকে—মানুষের কেবল দেহসীমিত অস্তিত্ব হইতে তাহার দেহাতীত সর্বগত সত্তার দিকে ফিরাইয়া আনা। একমাত্র ভারতই তাহা দেখাইতে পারে। [illegible] দৃষ্টিই কেবল মানবজাতিকে যথার্থ মানবপ্রেমের সর্বপ্রকার ভেদ- ও ঘৃণা-রহিত বিশ্বপ্রেমের পথ দেখাইতে সক্ষম।

ভারতবাসীর এজন্য প্রয়োজন, স্বামীজী বলিয়াছেন, দুটি জিনিস; দীর্ঘকালের সঞ্চিত তামসিকতা কাটাইয়া রাজসিকতার উদ্বোধন করিয়া জাগতিক উন্নতিসাধন, এবং সেই সঙ্গে ভারতের প্রাণকে, যাহা জীবন হইতে চলিয়া যাইতে বসিয়াছিল সেই আধ্যাত্মিকতাকে জীবনে পুনরায় মূর্ত করিয়া তোলা। ভারত এই উভয় দিকেই দৃষ্টি সজাগ রাখিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের শরণার্থীদের কোলে তুলিয়া আশ্রয় দিয়া, বাংলা দেশের মুক্তিসংগ্রামে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা করিয়া ভারত মানবিকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে, মুখে কেহ কেহ অন্য কথা বলিলেও সারা জগৎই আজ প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করিতেছে। আচরণই অপরের হৃদয় স্পর্শ করে, কেবল কথা নহে। আমরা বিপুল গর্ব অনুভব করিয়াছি আমাদের যোদ্ধৃগণের সংযত আচরণে, সেখানেও ভারতের নিজস্ব ভাবেরই, দেবভাবেরই বিকাশে।

তবে একটি কথা যেন আমরা স্মরণ রাখি, ভারত তাহার এই মানবিকতাকে, উচ্চ ভাবগুলিকে স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে ভারতবাসীর জীবনে ধর্মচর্যার প্রতি নিরপেক্ষ থাকিয়া নহে, তাহাদের উহাতে উদ্বুদ্ধ করিয়াই। কোন্ পথ ধরিয়া, কোন্ ধর্মমত অবলম্বনে নিজের দেহাতীত অমর সর্বগত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করার দিকে কে অগ্রসর হইবে, সে বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সব ধর্মই তো একই লক্ষ্যের পানে অগ্রসর-পথ যাহাই হউক; "একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান" ঘটানোই ধর্ম-নিরপেক্ষতা। উহা তো করিতেই হইবে; সেকাজের জন্য বিপুল নিনাদে ঘণ্টাও ধ্বনিত হইয়াছে; সেই সঙ্গে সকলকে নিজ রুচি ও সামর্থ্যমতো পথে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিতও করিতে হইবে। যে কোন ধর্মমতের যে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হউক, নিয়মিতভাবে সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস ছাড়া মানুষের মধ্যে দেহাত্মবুদ্ধি ও স্বার্থপরতাকে সরাইয়া দেবভাব স্থায়িভাবে আসিতে পারে না।

স্বামীজীর জন্মদিনে আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার ভারতের কল্যাণ-পথে চলার গতি যেন তিনি দ্রুততর করেন এবং সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সে পথের দিকে। অবশ্য, আমরা চাই বা না চাই, বুঝি বা না বুঝি অদৃশ্য হস্তে তিনি আমাদের চালাইতেছেন সেই পথেই—নবযুগের মানুষে-মানুষে সর্ববিধ ভেদবিহীন, কল্যাণময়, প্রেমময়, সত্যসন্ধী সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব লাভের পথেই

[শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়]

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে*

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন তথা বাণী ও রচনার সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখনই এর সূত্রপাত ঘটেছিল। আমার মা-বাবা দুজনেরই, বিশেষ করে আমার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল মিশনের সঙ্গে। আর আমি সত্যি করেই বলতে পারি যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র পরিবারকেই প্রেরণা দিয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক কাজে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও।

অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আমার অনুরাগের কারণ শুধু ব্যক্তিগত নিশ্চয়ই নয়। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারে এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের অবিরাম প্রয়াস আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশ চিন্তাধারায়, দর্শনে এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আমরা বিদেশে এমনকি দেশের জনগণের সব অংশের সামনে এই সমৃদ্ধিকে ঠিক-ঠিক ভাবে প্রক্ষেপ করতে পারিনি। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। মিশনের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি যে চমৎকার কাজ করেছেন ও করছেন তাতে আমাদের ওই অভাব কতকটা পূরণ হয়েছে।

॥ ২ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য মহান নেতারা আমাদের শিখিয়েছেন যে, সমস্ত বড় ও ভালো গুণ আমাদের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হওয়া চাই। অন্যরা আমাদের পথ দেখাতে পারেন কিন্তু তা অনুসরণ করবার বা না করবার দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রতিটি পৃষ্ঠা, তাঁর প্রতিটি উক্তি আমাদের প্রেরণা দান করে; স্বামীজী আমাদের দেন—সাহস, শক্তি, আত্মনির্ভরতা এবং বিশ্বাস। এই তো সেই জিনিস যার প্রয়োজন ভারতের ছিল এবং যার প্রয়োজন ভারতের আজও আছে। স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমরা সত্যই এক মহান সংস্কৃতি এবং এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সেই সঙ্গে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের জাতীয় ব্যাধি। নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের জাতিকে কীভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব শুধু তাঁর বিরাট বৌদ্ধিক শক্তি ও বিচারেই আবদ্ধ নয়, তাঁর হৃদয়ের অসীম প্রেমেও প্রবাহিত। মানুষের কল্যাণের জন্য কী তীব্র অনন্ত সংরাগই না প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবন ও বাণীতে। স্বামীজীর এই মঙ্গলকামনা সমগ্র ভারতের জন্য তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের জন্যও। আর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর বিশেষ ক্ষমতা এইখানে যে, আধুনিক বিশ্বে যে সমস্ত শক্তি সক্রিয় তিনি

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সৌজন্যে। [illegible] ইংরেজী ভাষণ হইতে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত।

সেগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে সজাগ ছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সেই সময়ে স্বামীজী কীভাবে আজকের সমস্যাগুলি তাঁর মানসনেত্রে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পেরেছিলেন, আজকের নানা ধারার ঘাত-প্রতিঘাত ধরতে পেরেছিলেন!

স্বামীজী প্রচার করেছিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্ব। আজ সব-জাতির মধ্যে এইটিই হল সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বনি ও ভাবধারা। কিন্তু এখানেও শক্তি আসা চাই মানুষের নিজের ভিতর থেকে।

স্বামীজী একটি শব্দ বার-বার ব্যবহার করেছেন তাঁর ভাষণগুলিতে। শব্দটি হল 'অভীঃ', নির্ভীকতা। স্বামীজীর জীবনের ছোট একটি ঘটনা, যা তিনি নিজেই বলেছিলেন—এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। তিনি তখন পরিব্রাজক হয়ে ভারত পর্যটন করছেন। এক সময় একদিন একপাল বানর তাঁর পিছু নিল। তিনি যত জোরে চলেন তারাও তত জোরে তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি দৌড়ান, তারাও দৌড়য়। এমন সময় এক বৃদ্ধ সাধু দূর থেকে চিৎকার করে বললেন তাঁকে, 'থামো। জানোয়ারগুলোর সামনের রুখে দাঁড়াও।' তিনি তাই করলে বানরগুলি পালিয়ে গেল। ঘটনাটির উল্লেখ করে স্বামীজী বলতেন যে, এইভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। পালালে চলবে না।—জগতের অধিকাংশ সমস্যা সম্পর্কেই তাঁর এই শিক্ষা প্রযোজ্য। যদি কেউ মনে করে যে, কোন সমস্যা তার পক্ষে বড্ড বেশি বড় এবং সে ওই সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচবে তাহলে সে ভুল করবে। সেই সমস্যা তাকে ক্রমশ আরও বেশি করে চেপে ধরবে এবং শেষে পিষে ফেলবে। বরং সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যার সামনে রুখে দাঁড়ালে তার সমাধানের একটা সুযোগ পাওয়া যায়। একজন যদি সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তাহলেই বা কী? পরে আর একজন তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও ভালোভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

॥ ৩ ॥

প্রগতি ও আধুনিকতার কথা আমরা প্রায়ই শুনি ও বলি। প্রগতি বলতে আমি বুঝি মানব-ব্যক্তিত্বের গভীরতা ও বিকাশসাধন—ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই। এর জন্য অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও সামাজিক বাধাগুলি নিশ্চয়ই অপসারিত হওয়া উচিত। এগুলি দূর করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দেখতে হবে যে, বস্তুগত জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করতে গিয়ে আমরা যেন কোনভাবে মানব-ব্যক্তিত্বকে আহত না করি বা মানুষ যেন তার সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষ যেন একই সঙ্গে তার সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় শরিক হয় এবং তার আত্মিক বিকাশসাধনেও তৎপর হয়। আধুনিকতা মানে নিশ্চয়ই শুধু হালের কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা জিনিসপত্র ব্যবহার, কিছু ফ্যাশানে গা-ঢেলে দেওয়া বা অধিক সচ্ছল দেশগুলির 'হনুকরণ' নয়। কাজেই শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দূর করলেই জাতি বড় হবে না। আত্মিক দারিদ্র্যও দূর করা দরকার। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছে আমরা মূল্যবান পথনির্দেশ পাব।

জানি উপরোক্ত দুটি কাজ (বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি) একত্রে করা সহজ নয়। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতা—তা সে পুঁজিবাদী ধরনেরই হোক বা কমিউনিস্ট ধরনেরই

হোক (যাকে পূর্বের বলা হলেও আসলে যা পশ্চিমেরই) তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ নিজের সঙ্গে নিজের শান্তি স্থাপন করতে না পারলে বিশ্বের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। তবু আমার মনে হয় দুইয়ের সমন্বয় সম্ভব। আমার আরও মনে হয় যে, ভারত সেই পথ খুঁজে পাবে। যদিও ভারত বা কারও পক্ষে তা খুঁজে পাওয়া সহজ বলে আমি মনে করি না।

সব যাত্রাপথেই পায়ের নীচে কাঁটা ও পাথর থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের সব মহান সংস্কারকের পায়ের নীচেও কাঁটা ও পাথর ছিল। কিন্তু তাঁরা সেদিক দৃকপাত করেননি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল উর্ধ্বে—আলোকের দিকে, স্বামীজীর এবং তাঁদের সেই দৃষ্টি থেকেই আমরা দিশা পাব। বুঝতে পারব অতীতকে এবং এগিয়ে যেতে পারব ভবিষ্যতের দিকে।

[৪র্থ　　র শেষাংশ]

জয়তু বাংলাদেশ! জয়তু ভারত!

একদা জগতের এক মহা অশুভকে, ধর্মের নামে জাতিতে-জাতিতে মানুষে-মানুষে ভেদ-ভিত্তিক ধর্মোন্মত্ততাকে অবলম্বন করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সেই দেশেরই 'মানুষ' আজ নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অসীম মনোবল সহায়ে ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব এক নারকীয় নরহত্যা-কারী নির্যাতনকারী পাশবিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া শুভ ও সত্যের আলোকস্নাত বেশে সগর্বে উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে—স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ জন্মলাভ করিয়াছে। আরো বড় কথা, ইহা সম্ভব হইয়াছে পরানু-করণ করিয়া নহে, মহাত্মাজীর জীবনে বিকশিত ভারতীয় ভাব এবং বাংলার সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই। জয়তু বাংলাদেশ! তোমার বিভা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া এক-পৃথিবী গঠনের কাজ দ্রুততর করুক।

জয়তু ভারত! তুমি চিরদিন সারা জগতে মানবজাতির কল্যাণকর ভাবগুলিই বিতরণ করিয়া আসিয়াছ, বিবেক, নির্লোভিতা, সহানুভূতি, সকলের সহিত সপ্রেম সহাবস্থান—মানুষের এসব মহৎ ভাবগুলির চিরবাহক তুমি, উদার তোমার দৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ভারত কখনো কোন দেশ জয় করে নাই,—ইহাতে সে গর্বিত। (বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সভায় কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক, শ্রীপ্রণব রঞ্জন ঘোষ বলিয়াছিলেন, ছেলেবেলা স্বামীজীর উক্তিটি পড়িয়া মনে হইয়াছিল, ভারত হয়তো পারে নাই বলিয়া তাহা করে নাই,—কিন্তু ভারত আজ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে তাহা করে না।) ভারত! কৃষ্ণার্জুনের ভারত, রামচন্দ্র-মহাবীরের ভারত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারত! বাংলা-দেশকে মানবতার শত্রুমুক্ত করিয়াও তুমি সেখানে ভারতের পতাকা উড্ডীন কর নাই, উড়াইয়াছ বাংলাদেশেরই পতাকা! মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানবিকতার, শক্তিমান দেবভাবের একটি অনবদ্য উদাহরণ তুমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিলে! নিজের দারুণ অসুবিধা সত্ত্বেও তুমি এক কোটি শরণার্থীকে কোল দিয়াছ, বিষম বিপদের ঝুঁকি লইয়াও তুমি বাংলা দেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করিয়াছ। ভারতের চিরসারথির নিকট প্রার্থনা, মানবিকতার পথে তোমার যাত্রা অরোধ্য হউক!

উদ্বোধন

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

একদা পথের প্রান্তে
মিলেছিল এসে
শেষ ভূমিস্পর্শটুকু
ভারতমাতার।
অনায়াস-সন্তরণে শত-উর্মিবাধা হ'লে পার,
শুভ্র শিলাখণ্ড 'পরে
ধ্যান-সমাসীন,
আসমুদ্র-হিমাচল হৃদয়ে বিলীন।

নিমীলিতনেত্রে দেখ
ইতিহাস যবনিকা তোলে।
কত শত শতাব্দীর
আলো-অন্ধকারে
শোভাযাত্রা চলে।
তারি মাঝে
সম্রাজ্ঞীর অটল গৌরবে
দিগন্তে নিবদ্ধ-দৃষ্টি
জননী ভারত,
বিশ্বের সন্তান-তরে চেয়ে আছে পথ।

সেদিনের
অতলান্ত সমুদ্রের
বক্ষ জুড়ে
তরঙ্গ-আহ্বান,
কলমন্দ্রে বেজে চলে
মানবহৃদয়তলে
চিরস্পন্দমান—

"অবিচারে অত্যাচারে মর্মযন্ত্রণায়,
মূঢ় অন্ধকারে যারা
আবৃত সত্তায়,
দিশাহীন পথচারী
জীবনের পথে হেঁটে যায়,
অন্নহীন, জ্ঞানহীন, পুণ্যহীন
যে আছে যেথায়—
সব নারায়ণ
পরিব্যাপ্ত চরাচরে আব্রহ্মভুবন।"

বিশ্বের আনন্দবাণী
ফিরে এলো
ভারতের তীরে,
বেঁধে দিল একসূত্রে প্রাচী প্রতীচীরে।

আবর্তিত মহাকাল।
তমিস্রাবিলয়শেষে
নব অভ্যুদয়,—
কেন্দ্র তুমি, হে ভারত,
অমৃত অভয়!
নূতন প্রাণের মন্ত্রে করো উদ্বোধন,
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত নিখিল জীবন!

এই পৃথিবী

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে 'মধুবিদ্যা' বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বস্তরে যে একটি নিবিড় ঐক্য, সামঞ্জস্য ও আনন্দ রহিয়াছে তাহারই নাম মধু। ধ্যানের দ্বারা সেই ঐক্য, সামঞ্জস্য ও আনন্দের উপলব্ধির চেষ্টার নাম মধুবিদ্যা। জগৎসংসারের নানা বিকাশকে অবলম্বন করিয়া এই ধ্যান অভ্যাস করা চলে। উপনিষদ্ ধাপে ধাপে কতকগুলি ধ্যান নির্দেশ করিতেছেন।

সহজতম ধ্যানের বস্তু হইল "ইয়ং পৃথিবী" —এই পৃথিবী—যেখানে তুমি আমি, তোমার আমার মতো আরও লক্ষ লক্ষ নর-নারী, মানবেতর লক্ষ লক্ষ প্রাণী, সংখ্যাতীত উদ্ভিদ তরুলতা শস্যরাজি দাঁড়াইয়া আছি, জীবনধারণ করিতেছি, সংসারের খেলা খেলিতেছি, হাসিতেছি কাঁদিতেছি, দৌড়াইতেছি। অনন্ত আকাশে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই, উহাদের রহস্য আবিষ্কার করিতে চাই কিন্তু ঘর আমাদের এই পৃথিবীতেই। পৃথিবীর প্রতি টান আমাদের দেহমনঃপ্রাণে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। পৃথিবীর বাতাসে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলে, পৃথিবী হইতে আমাদের দেহের খাদ্য পাই, পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই আমাদের মনের চিন্তা ও আবেগসমূহ ওঠা নামা করে। ধরিত্রী সত্যই আমাদের মাতা।

"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু"—এই পৃথিবী সকল জীবনিচয়ের ভোগ্য—আনন্দের বস্তু। কিন্তু ভোগের মর্মকথা জান কি? তাত্ত্বিক রহস্য? ভাবিও না ভোগ শুধু একমুখী, তুমিই তোমার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভোগ করিবে, আর যাহা ভোগ্য সে কেবল কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া তোমার লালসা ও দম্ভের ইন্ধন যোগাইবে। অধিকাংশ মানুষ এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই পৃথিবীকে ভোগ করিতে চায়। তাহারা ঠকিয়া যায়। ভোগের পারমার্থিক সার্থকতা তাহারা লাভ করিতে পারে না।

না, ভোগ একমুখী নয়। ভোগ্যও ভোক্তার ন্যায় সচেতন। সেও আনন্দের উপাসক। "অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু।" সকল ভূতবর্গ এই পৃথিবীর পক্ষে মধু—আনন্দের বস্তু। শিশু মাকে দেখিয়া মায়ের কোলে চড়িয়া, মায়ের দুগ্ধ পান করিয়া যেমন আনন্দ পায়, মাও তেমনি শিশুকে বুকে করিয়া, খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া; শিশুর খেলা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হন। পৃথিবীর উপর বসিয়া, পৃথিবীর অন্নজল শোষণ করিয়া, পৃথিবীর খনি হইতে সভ্যতার বিবিধ সম্ভার সংগ্রহ করিয়া আমরা যেমন উল্লসিত হই, পৃথিবীও তেমনি আমাদিগকে পোষণ করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করেন। তিনি যে বসুন্ধরা—প্রাণময়ী ধরিত্রীমাতা।

না, ভাবিও না অসংখ্য ভোগোপকরণ যিনি অনলসভাবে প্রাণিনিচয়কে জুগাইতেছেন, তিনি জড়বিজ্ঞানের নিয়মে চালিত একটি বৃহৎ জড়পিণ্ডমাত্র।

"যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা।" এই

পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি অমৃতময় চৈতন্য-সত্তা রহিয়াছেন। তোমার দেহমনঃপ্রাণের ভিতর ঐ একই চৈতন্যসত্তা। ঐ চৈতন্যসত্তার নামই আত্মা। তিনি জন্মহীন মৃত্যুহীন আনন্দ-স্বরূপ। তোমার ক্ষুদ্র দেহের তিনিই অধীশ্বর। আবার বিপুলা ধরিত্রীদেহেও তিনি ওতপ্রোত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি তোমার দেহে বসিয়া যেমন পৃথিবীকে মধুরূপে ভোগ করিতেছেন তেমনি তিনি পৃথিবীরও বিরাট দেহের অন্তরপুরুষরূপে তোমাকে এবং তোমার মতো অসংখ্য পৃথিবীবাসী প্রাণি-নিচয়কে মধুরূপে উপভোগ করিতেছেন। ধরিত্রী এবং ধরিত্রীজাতের মধ্যে একটি নিবিড় আনন্দ-সম্বন্ধ, একটি পরম আত্মিক একতা রহিয়াছে।

তোমার দেহ কি একটুকরা পৃথিবী নয়? পৃথিবীর অন্ন জল বায়ু দ্বারা কি উহা অনবরত পরিপুষ্ট নয়? ধ্যানে বসিয়া পৃথিবীর সহিত তোমার একতাকে ভাবনা কর। তোমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে দিগ্‌দিকপ্রসারিত ধরিত্রী-মাতার বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুপ্ত করিয়া দাও। মায়ের কোলে শিশু যেমন ঘুমাইয়া পড়ে, ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা তেমনি চৈতন্যময়ী বসুন্ধরার অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়। তোমার ক্ষুদ্র চৈতন্য এক মহাচৈতন্যে সমন্বিত হউক।

দৃষ্টি আমাদের যখন বহির্মুখী তখন আমরা পৃথিবীর বৈচিত্র্য দেখিয়া বিক্ষিপ্ত হই। বহু যে একে সংগ্রথিত উহার সন্ধান পাই না। পৃথিবীর তাত্ত্বিক ধ্যান অভ্যাস করিলে আমাদের বিক্ষেপ ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। তখন জল মাটি পাহাড় পর্বত তৃণলতা বনস্পতি ভূচর খেচর জলচর নরনারী পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য ও সামঞ্জস্য আমরা অনুভব করিতে থাকি। মধু মধু মধু। আমার শরীরমনে মধু, আবার আমার শরীরের বাহিরে সকল অভিব্যক্তির মধ্যে মধু।

সেই মধুই আমার অন্তরতম সত্য—পৃথিবীরও অন্তরতম সত্য। পৃথিবীতে জন্মিয়া, পৃথিবীর দেহ ধারণ করিয়া যদি পৃথিবীকে তত্ত্বত বুঝিতে না পারিলাম তাহা হইলে আমি একান্তই মূর্খ।

এই পৃথিবী—রূপময়ী শব্দস্পর্শরসগন্ধময়ী অসংখ্যবৈচিত্র্যময়ী পৃথিবী। জীবন-নাট্যের বিপুল মঞ্চ এই পৃথিবী। কিন্তু ইহা পৃথিবী-সত্যের মাত্র প্রাথমিক পরিচয়। স্থূলদৃষ্টিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম স্তরে লইয়া গিয়া পৃথিবীকে দেখিতে শিখিলে এই পৃথিবী চৈতন্যালোকে পরিদীপ্তা হন। শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধ উড়িয়া যায় না—যে চৈতন্যসত্তা হইতে উহাদের উদ্ভব উহারই আলোক ও আনন্দে ভাস্বর হইয়া উঠে। এই পৃথিবীতেই তখন স্বর্গ নামিয়া আসে। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা তখন মধুময় মনে হয়। ঘৃণা, বিদ্বেষ, কাম, দম্ভ, লোভ তখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে। অন্তর হইতে প্রেমের বন্যা বাহির হইয়া দশ দিককে আপ্লুত করে।

"ইদং অমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্"—এই একাত্মতাই অমৃতত্ব। ইহাই ব্রহ্ম—বৃহত্তম সত্য। সেই সত্যেই সব কিছু বিধৃত।

উনিশ শতকের মানস-মণ্ডল ও স্বামী বিবেকানন্দের গণমুক্তির পরিকল্পনা —সমীক্ষা

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

একদিন যখন আমাদের দেশে জনগণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সচেতনতা ছিল না, তখন একটি নিঃসঙ্গ একক কণ্ঠ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল "মনে রাখিও দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত।" সে কণ্ঠ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের। তখন কিন্তু আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না। বস্তুত তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচণ্ড অনুপ্রবেশ ঘটেছে আমাদের মানসমণ্ডলে এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজসংস্কারের প্রবল বন্যা সারা দেশের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল সমাজের উপরতলার মানুষ। কারণ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, পর্দাপ্রথা-বিসর্জন—যা ছিল এই সকল আন্দোলনের মূল বিষয়, তা সমাজের উপরতলার মানুষদের সমস্যা, এগুলি কোনদিনই নীচুতলার মানুষদের সমস্যা ছিল না। সমাজের অগণিত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের মূল সমস্যা দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, যার মূলে রয়েছে পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দীর্ঘকাল ধরে শোষণ, সেই সময় একমাত্র সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পেরেছিল। সেজন্য সমাজের মূল সমস্যা হতে চ্যুত উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনকে বিবেকানন্দ আদৌ গুরুত্ব-আরোপ করেননি। এ সম্পর্কে একটি সমীক্ষায় তিনি বলেন—"তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐরকম কিছু। তোমরা দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছো তো? দুই-চার জনের সংস্কার হল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হল, আর যারা মরে মরুক। ...আজ অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের নানাস্থানে ঘুরে দেখলাম, সমাজ-সংস্কার-সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাদের রক্তশোষণের দ্বারা ভদ্রলোকেরা ভদ্রলোক হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাদের জন্য একটি সভাও দেখলাম না।...জনগণকে অবহেলা করাই ভারতের জাতীয় পাপ এবং অবনতির প্রধানতম কারণ। নিম্নজাতিরা উচ্চবর্ণের শিক্ষার জন্য পয়সা দিয়েছে, ধর্মলাভের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা চিরদিন লাথিই খেয়েছে। ...সমাজ-সংস্কারকেরা খুঁজে পান না ক্ষতটি কোথায়? তাঁরা জানেন না জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপরে।" জনগণকে অবহেলা করাই যে আমাদের সমাজের মূল ত্রুটি, সেদিন তা একমাত্র বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিয়েছিল। সমস্যার মূল সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবার প্রয়াসে তিনি আরও বলেন—"সমস্ত ত্রুটির মূল এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রত্যেকের পদতলে পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে পিষ্ট হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব

ফিরাইয়া দিতে হইবে তাহাদের শিক্ষিত করিতে হইবে।"

যখন অন্যান্য সকল সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি সমাজের উপরতলায় আবদ্ধ, যখন তাদের একমাত্র প্রয়াস উপরতলার সমাজকে পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢেলে সাজানো, তখন বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত আসমুদ্রহিমাচল ভারতব্যাপী এক সবিপুল গণ-জাগরণের স্বপ্ন। তাঁর এই নূতন দৃষ্টি তাঁকে তখনকার মানস-মণ্ডলে অনন্য স্থান দিয়েছে। এটা সত্যই আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন জনগণ সম্বন্ধে সারাদেশে কোথাও বিশেষ কোন চেতনাই ছিল না, তখনই এই ক্রান্তদর্শী ঋষি মনশ্চক্ষে দেখছেন ভবিষ্যৎ ভারতে এক অভিনব গণ-অভ্যুদয়ের দৃশ্য, শোষকশ্রেণী উচ্চবর্ণদের সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার স্বপ্ন। ভবিষ্যতের সেই মহান অভ্যুদয়-দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাকে আবাহন করেছেন। বলেছেন—"তোমরা উচ্চবর্ণেরা···তোমরা হচ্ছ দশহাজার বছরের মমি !!···তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।···তোমার যাই শূন্যে বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি 'ওয়াহ গুরুকি ফতে।" এই আবাহনের' কথাগুলি পরবর্তী ভারতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ক্রমাগত মন্ত্রবাণীর মতো উদ্গীত হয়েছে। বারংবার উচ্চারিত হয়েছে, বহুমুখে উচ্চারিত হয়েছে। এভাবে উচ্চারিত হয়ে হয়ে সেই মন্ত্রার্থ আজ সবার অলক্ষ্যে সকলের হৃদয়ে অনুস্যূত হয়েছে, সকলের চোখে সেই মহান অভ্যুদয়ের স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে, সকলের হৃদয়ে এজন্য প্রতীক্ষা জাগ্রত করেছে। বহুদিন আগে অধ্যাপক বিনয় সরকার আমাদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়ে বলেছিলেন—"আজ যে তোমরা সমাজবাদকে গ্রহণ করতে পারছো, তা কার জন্য জানো? বিবেকানন্দের জন্য। তিনিই এদেশে সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি করে দেন।"

বস্তুত সেদিনের ভারতে বিবেকানন্দের মতো 'আমূল রূপান্তরের' সাধক, এমন বিপ্লবী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক আর কেউ ছিলেন না, যিনি আগামী গণ-অভ্যুদয়ের প্রস্তুতির কাজে সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সেজন্য একটি বাস্তব কার্যসূচীও প্রণয়ন করেছিলেন।

উনিশ শতকের মানস-মণ্ডলকে সমীক্ষা করে রুশ সমীক্ষক চেলিশেভ[১] বলেছেন, "The great merit of Vivekananda, in my opinion, is that he was one of the first in India to pay attention to the masses, to the suffering and misfortune of his compatriots". এখানে লক্ষণীয় চেলিশেভ বিবেকানন্দকে প্রথম ভারতীয় গণ-সচেতন ব্যক্তিদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। উনিশ শতকে মনীষি-মননে জনগণ অস্ফুট চেতনায় জাগ্রত হয়েছে রামমোহনের মধ্যে। তাঁর একটি দুটি বিচ্ছিন্ন উক্তিতে তা ধরা পড়ে। রামমোহনের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গ-দেশীয়

১ Swami Vivekananda Centenary Commemoration Volume

কৃষক" শীর্ষক একটি রচনা চোখে পড়ে। এ রচনাটি অবশ্য অনন্য, এতে কৃষক তথা জনগণের উপর যে শোষণব্যবস্থা জমিদারীপ্রথার মধ্যে কায়েম তারই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে জনগণ সম্পর্কে চেতনা পূর্ণ পরিণত। এজন্য বিবেকানন্দের চিন্তার যে বৈশিষ্ট্য তা অন্য কারও মধ্যে নেই।

বিবেকানন্দের মধ্যে শুধু যে জনগণ সম্বন্ধে চেতনা পূর্ণ পরিণত, তা শুধু নয়। এ বিষয়ে ইতিহাস পর্যালোচনা করে, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-সহায়ে গণমুক্তির একটি পূর্ণায়ত দর্শন তিনি গড়ে তুলেছেন। এজন্য আশ্চর্য ভবিষ্যৎ-বাণী তিনি উচ্চারিত করেছেন যা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণিত করেছে, যেমন তার এই ঘোষণাটি—আসন্ন শূদ্রবিপ্লব ঘটবে চীন কিংবা রুশ দেশে। এই দুই দেশেই জনগণ সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত। আমরা দেখেছি ভারতেও এই গণ-অভ্যুদয় যে অবশ্যম্ভাবী একথাও তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। ইতিহাস-বিশ্লেষণ করে সমাজ-বিকাশের স্তর ও পর্যায় নির্ণয় করে অকাট্য যুক্তিসহায়ে সেই সম্ভাবনা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে প্রত্যয় এনে দিতে চেয়েছেন। এবং সেজন্য পাশ্চাত্য ধাঁচে সমাজকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস না করে গণ-অভ্যুদয়ের কাজে হাত লাগাতে বলেছেন। তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে, তার সমাপ্তিসূচক স্বদেশমন্ত্রের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। উচ্চশ্রেণীকে এ বিষয়ে সাবধান করে তাদের ইতিকর্তব্যও বিবেকানন্দ নির্দেশ করেছেন। বলেছেন—"জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই-ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐকথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোট-জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতের কল্যাণ।...তা না হলে কিন্তু তোদের কল্যাণ নেই।...এই জনগণ যখন জেগে উঠবে, আর তাদের উপর তোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে তখন ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে, তারাই আবার তখন সব ভেঙ্গে দেবে।" এদের এই অভ্যুদয়ের পূর্বে যে বিপুল সংক্ষোভ দেখা দিতে পারে সে সম্ভাবনার কথাও তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "শূদ্রগণের সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু কি ভয়ানক সংক্ষোভের অন্তে!" উক্তিটি পড়লে মনে হয় তিনি তাঁর অনন্য প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা সমগ্র ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্ট দেখে কথা বলছেন। এবং কত সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখেছিলেন তা আজ আমরা এতদিন পরে বুঝতে পারছি।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি পাশ্চাত্য সমাজবাদী ভাবধারার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি একথাও বলেছিলেন, "আমি একজন সমাজ-বাদী।" কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন

এই সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখনই তার মূলত্রুটি সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন। বলেছিলেন, —"I am a socialist, not because it is a perfect system but because half-a-loaf is better than no bread." (একেবারে রুটি না থাকার চেয়ে আধাটুকরো থাকাও ভাল।) শূদ্রশাসনের কালে সাংস্কৃতিক অবনতি ঘটবে বলে তাঁর ধারণা—দৃঢ় ধারণা ছিল। আর তাছাড়া পাশ্চাত্য ধাঁচের সমাজতন্ত্রে যেভাবে সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান-ব্যবস্থা নিহিত তাকে তিনি কখনই কল্যাণকর বলে মনে করেননি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যতীত যে কোন উন্নতি, কোন কল্যাণ, সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব নয়, এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এ বিষয়ে দৃঢ়মত প্রকাশ করে তিনি বলেছেন—"যে সমাজ প্রাণহীন যন্ত্রের মতো, মৃত্তিকাপিণ্ডের মতো একদল লোকের সমষ্টি, একটি ঢেলা-স্তূপের সমষ্টি সেই সমাজ কি সমাজ? সে সমাজ কি কখনও কল্যাণকর হতে পারে?"

একটি কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, বিবেকানন্দ একদিন আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমি পদব্রজে ভ্রমণ করে দীর্ঘদিন ধরে জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে গণমানসের গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। সেজন্য ভারতের জনগণ সম্বন্ধে যা কিছু তিনি বলেছেন, তা অবাস্তব আদর্শবাদ নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত সত্য তত্ত্ব। বস্তুত গণ-জীবনের মর্মমূলটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। ভারতের গণ-জীবনের মধ্যেই তিনি ভারতের আবহমান কালের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই গণজীবনে যে ইতিহাস জীবন্ত তারই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর গণ-মুক্তির পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন।

আজ আমরা যারা সমাজের রূপান্তর আনতে চাইছি, আমাদের গণ-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কতটুকু? আমরা উচ্চশ্রেণীতে উদ্ভূত হয়ে, ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ভোগ করছি, আমরা আজ আমাদের পাশ্চাত্য দীক্ষানুসারে প্রাপ্ত মতবাদ, আদর্শ, রোমান্টিক স্বপ্ন সব জনগণের স্কন্ধে আরোপ করছি। ফলে নিদারুণ বিভ্রান্তি ঘটছে। বস্তুত আজ একথা বিশেষভাবে চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে যারা অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য ও শোষণের মধ্যেও শত শত শতাব্দী ধরে অবিচলিত ধৈর্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে এক উচ্চ শ্রেয়োবোধকে আঁকড়ে ধরে আছে, মনুষ্যত্বের মানদণ্ডকে যারা সর্বদা বিচারের মাপকাঠি বলে ধরে রেখেছে তাদের কি আমরা সত্যই চিনেছি? তাদের মুক্তি কোন্ পথে তা কি আমরা বুঝেছি?

বিবেকানন্দ তাঁর সুদীর্ঘ ভারতভ্রমণকালে গণ-জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁর জনগণের জন্য কার্যসূচী-প্রণয়নকালে জোর দিলেন ভারতের জনজীবনে যে শ্রেয়োবোধ, যে উচ্চ নৈতিকতা ও ধর্মচেতনা দেখা যায়, তা অক্ষুণ্ণ রাখবার উপর। তাঁর কার্যসূচীর প্রথম নির্দেশই হল—"আমাদের কার্যের মূল কথাটি মনে রাখিবে—ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান।" ধর্মকে আশ্রয় করে আমাদের জনজীবন অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে স্মরণাতীত কাল হতে, এবং সেজন্য অতি দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও আমাদের দেশে মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলি বিকশিত। পাশ্চাত্য দেশের জনজীবনকে দেখে তিনি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছিলেন—

"পাশ্চাত্যে গরীবগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর আমাদের দেশের গরীবেরা তুলনায় দেব-প্রকৃতির। সেজন্য আমাদের দেশের গরীবদের উন্নয়ন অনেক সহজ।"

ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর একটি অনন্য সমাজ-সমীক্ষায়[২] উদ্‌ঘাটিত করেছেন এই তত্ত্ব যে, ভারত জাতিসমূহের মধ্যে অনন্য জীবনশিল্পী। "মিশর যখন পিরামিড নির্মাণ করে অনন্য স্থাপত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছিল, ভারত রাখছিল অনন্ত জীবন-গঠন প্রতিভার।" তাঁর মতে ভারত যে অনন্য জীবনশিল্পী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখেছেন তিনি জনজীবনের সর্বস্তরে অনুস্যূত অনন্য শ্রেয়োবোধের মধ্যে। নিবেদিতা তাঁর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন—"যদি সভ্যতার মূল্যবিচারের কোন চূড়ান্ত মানদণ্ড থেকে থাকে, তা হল এই নৈতিকতা বা জাতীয় বিবেক; ধনসম্পদ, শিল্পায়ন, এমনকি সুখও এবিষয়ে আমাদের মানদণ্ড হতে পারে না।" পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্ হলডেনও (Haldane) এ বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে একমত। এ সম্পর্কে একটি সমীক্ষায়[৩] তিনি বলেছেন যে সমাজ-জীবনের ভিত্তিই হল এই নৈতিকতা যা ব্যক্তির আচরণে প্রতিফলিত না হলে সমাজ ভেঙে পড়ে। তাঁর মতে "ব্যক্তির জীবন ও আচরণে এইসকল শীল পালিত না হলে সমাজ-জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, এবং অব্যাহত-ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব হয় না। দৈনন্দিন জীবনে ও আচরণে উচিত ও অনুচিত বোধের সহজাত প্রকাশ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস। এই যে সহজাত ঔচিত্য-বোধ তাই সমাজ-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। এই সহজাত বোধ জীবন্ত হয়ে ওঠে আমাদের পারিবারিক জীবন এবং আমাদের পৌর ও সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান বিধি নিয়মের মধ্যে। এর এই সকল আধারকে যে সব সময় একই ধরণের হতে হবে তা নয়। নূতন ধরণের আধারও আসতে পারে, আবার পুরাতন আধারেরও নূতনতর বিকাশ ও রূপান্তর ঘটতে পারে।" সুতরাং সমাজ-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থাই আসুক তার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ধর্ম ও নৈতিকতার উপর। ভারতের জনজীবনে এই ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ পূর্ব হতেই দৃঢ়মূলবদ্ধ; তাকে সেজন্য সযত্নে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে ভারতের দৃষ্টান্ত জগতের সকল জাতির অনুসরণের যোগ্য। এজন্যই বিবেকানন্দ এর উপর এত জোর দিয়েছেন। এবং জোর দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার আর একটি প্রমাণ রেখেছেন।

বিবেকানন্দ জনসাধারণের জন্য মোক্ষ-বাদের বুলি কখনই আওড়াননি। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত—"ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও ভারতে এক-লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশকোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? ঐহিক সভ্যতা আবশ্যক; শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন

২ Civil and Political Ideals
৩ The Principle of Higher Nationality

নূতন কর্মের সৃষ্টি হয়।"

"যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখ দিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে; আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।" এই উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট তিনি জনসাধারণের জন্য চেয়েছেন ধনোৎপাদন, কর্মসৃষ্টি, স্বাচ্ছন্দ্য, খাদ্য, উন্নত জীবনধারণের মান। সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছেন তাদের শ্রেয়োবোধ অক্ষুণ্ণ থাকুক। ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন এই শ্রেয়োবোধ ও মনুষ্যত্বের উদ্ঘাটন। তাঁর মতে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবেই। তার বিনিময়ে কোন কিছুই তিনি চাননি।

বিবেকানন্দ তাঁর কর্মসূচী-রূপায়ণে আর একটি বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি জানতেন যে, অন্ধ অজ্ঞ জনসাধারণকে একটি কোন মহৎ লক্ষ্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেই মুক্তি আসবে না। ও ভাবে মুক্তি আসতে পারে না। মুক্তিকে সব সময় স্বোপার্জিত হতে হয়, তবে তা সত্যকারের মুক্তি হয়। পরের হাত দিয়ে পাওয়া যে মুক্তি তা একসময় দাসত্বের শৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তাঁর মত—"তাহাদের জনগণের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব-বোধ ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ নিজেকেই করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যগুলির একত্র সমাবেশ করিলে, যৌগিক ফল আপনিই প্রসূত হয়। আসুন আমরা তাহাদের মধ্যে ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই—বাকিটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে।"

এই উক্তি থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত পাই। প্রথমতঃ উচ্চশ্রেণীর হাত দিয়ে গণমুক্তি আসবে, তা বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না। তিনি চেয়েছেন নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্য হতে গড়ে উঠুক। সেজন্য একটি চিঠিতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখেছিলেন, "একটি চাষীর ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে গ্রামের ভার তার উপর ছেড়ে দিতে হবে, তারপর যা কর-বার তা তারা নিজেরাই করবে।" উচ্চশ্রেণীর উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না, কারণ তারা যে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইবে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যকে মূলধন করে, এও তিনি বোধহয় স্পষ্ট দেখেছিলেন। সেজন্য তিনি তাদের বলেছেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও।" শুধু তাদের হাতে যে অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার, সংস্কৃতিসম্পদ আছে তা দিয়ে যেতে বলেছেন জনগণের হাতে তুলে ধরে। বলেছেন—"অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের হাতে, যত শীঘ্র পারো ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও।" গণনেতৃত্ব-গঠনের উপর জোর দিয়ে বলেছেন—"ভারতের ভরসাস্থল জনসাধারণ। মধ্যবিত্ত ও অভিজাতরা শরীরে মনে একেবারে মরে গেছে। অনুশীলনের দ্বারা যে সহজ বুদ্ধি প্রতিভায় পরিণত হয়, তার উদ্ভব ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মতই ছোট দোকানদার বা লাঙলধারী কৃষকের মধ্যেও সম্ভব। সাহস যদি ক্ষত্রিয়ের একচেটে সম্পত্তি হত, তাহলে তাঁতিয়া ভীল কোথায় থাকত?" এইভাবে গণনেতৃত্বের উপর আস্থা আজও ক'জনের আছে? এখনও অনেক বিপ্লবপন্থী ব্যক্তিও বিশ্বাস করেন যে, নেতৃত্ব-প্রতিভা একমাত্র উচ্চশ্রেণী হতে আসতে পারে। এদিক দিয়ে

বিবেকানন্দের মতো খাঁটি সমাজবাদী সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে।

দ্বিতীয়ত বিবেকানন্দের পথ বিকাশের পথ, অভ্যুদয়ের পথ। জোর করে মুক্তি আনা যাবে না। মুক্তি-সচেতন জনগণের নেতৃত্ব গড়ে উঠলে গণ-নেতৃত্বে সমাজ নবকলেবর ধারণ করবে, এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এজন্য চাই গঠনমূলক কাজ। তাঁর পন্থা রাজনীতির পন্থা নয়। গঠনমূলক পন্থায় কিভাবে একাজ অগ্রসর হতে পারে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তাঁরই ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণ করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন রেখেছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে ছোটনাগপুর আদিবাসি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যে কর্মকাণ্ড 'দিব্যায়ন' নামক প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এঁরা পরিচালনা করছেন তা এদিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আদিবাসী কৃষকসমাজকে শিক্ষা দিয়ে, প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে, সমবায় যৌথ খামার ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতি সহায়ে এঁরা স্বাবলম্বনের যে পথ দেখাচ্ছেন গঠনমূলক কর্মধারায় তা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে আর একটি কথা স্মরণীয়। সমাজ-ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের পথেই একদিন সমাজবাদ আসবে—একথা পাশ্চাত্য সমাজ-বাদী তাত্ত্বিকদের। তা যদি হয়, তাহলে সমাজ-বাদী চিন্তার অভ্যুদয় স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় মানসিকতার বিকাশের পথেই হওয়া উচিত। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই অভ্যুদয় ঘটেছিল, যদিও দেশ আজ তা উপেক্ষা করছে পাশ্চাত্য ভাবধারার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ সুপ্রাচীন বেদান্তের নিহিতার্থ করে জীবব্রহ্মবাদের ভিত্তিতে]ত করলেন এই তত্ত্ব—"সকলেরই মধ্যে একই শক্তি নিহিত, সকলেরই এর বিকাশের সুযোগলাভের অধিকার আছে।" বিবেকানন্দ এই তত্ত্বকে সমাজবাদ বলেননি, বলেছেন 'ব্যবহারিক বেদান্ত'—তাই-ই এর যথাযোগ্য নাম। কারণ পাশ্চাত্য সমাজবাদের থেকে এ গোত্রে ভিন্নতর। এর মধ্যে সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান-ব্যবস্থা নেই, ধর্ম বা শ্রেয়োবোধের উপর এর প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য সমাজবাদী চিন্তা থেকে এজন্য এ চিন্তা আরও সম্পদশালী। কিন্তু আজকের ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবের দরুণ একে আমরা সমাজবাদ বলে অভিহিত করেছি। পাশ্চাত্য সমাজবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য এইখানেই যে, এ ধারণা আরও পূর্ণায়ত। কিন্তু এরও ফলশ্রুতিতে ঘটবে শোষণ হতে গণমুক্তি ও গণসমাজের প্রকৃত অভ্যুদয়। এবং এ মুক্তি হবে সত্যকারের মুক্তি, কারণ এ হবে স্বোপার্জিত।

সুতরাং পাশ্চাত্য অনুকরণে সমাজকে ঢেলে সাজানো নয়, ভারতে বহু প্রাচীনকাল হতে যে সাম্যতত্ত্ব বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদের মধ্যে নিহিত আছে তাকে বাস্তব করে তুললেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো। ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথেই তা আসবে। এই স্বাভাবিক বিকাশের পথটিই বিবেকানন্দ আমাদের দেখিয়েছেন।

উপরে উক্ত সুদীর্ঘ সমীক্ষান্তে তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তই রাখতে চাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর মানস-মণ্ডলে বিবেকানন্দের মধ্যে সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক পথে ভারতীয় চিন্তায় খাঁটি সমাজবাদ বা গণমুক্তি-সম্পর্কিত পূর্ণায়ত ভাবধারার অভ্যুদয় ঘটেছিল। তা নিয়ে আজ বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা-রূপায়ণ চলছে। এই ভাবধারা এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রূপায়ণপ্রয়াস আমাদের বিশেষ ও অনুসরণের বস্তু হওয়া উচিত।

প্রথম দেখা

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বেলুড় মঠের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রথম দেখার ও তাঁকে প্রণাম করার পরম আনন্দময় অনুভূতিটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তার মনে। তখন তার বয়স চৌদ্দ-পনের। সময় ১৯৪৭-এর শেষার্ধের একটি দিন। সকাল ন'টা।

তখন শরৎকাল। নির্মেঘ নীল আকাশে সোনালী রোদ। ধীরে বহমানা রূপালী ধারা। মঠের মাঠ ঝকঝকে সবুজ। শান্ত পরিবেশ। উদাস হাওয়া। নির্জন মন্দির।

মঠপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই এসব ভালো লেগেছিল তার কিন্তু মন্দিরের ভিতরে গিয়ে এসব ভুলে গিয়েছিল সে। তাকে আকর্ষণ করল ধূপের সুগন্ধে ভরা, ফুলে ফুলে সাজানো নয়নাভিরাম গর্ভ-মন্দির, মর্মরমণ্ডিত মন্দিরতল, মর্মরনির্মিত দীপাধার, সুচারু চন্দ্রাতপ ও পশ্চাৎপট, কারুকার্যমণ্ডিত শুভ্র বেদী।

সে প্রণত হল। তারপর নতজানু হয়ে, চোখ মেলে দেখল মন্দিরে বিরাজিত শ্রীরামকৃষ্ণকে। স্তব্ধ বিস্ময়ে, পরমানন্দে, অপলক নেত্রে দেখল। দেখতে থাকল। হৃদয়ে তার এক আশ্চর্য অনুভূতির অভিঘাত।

হায়রে, যা বোঝা যায় তা যদি বোঝানো যেত! একটি কিশোরের অননুভূতপূর্ব এক প্রথম, অব্যক্ত, বিমূর্ত ভাবতরঙ্গকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যে কী কঠিন, প্রায়-অসম্ভব এক প্রয়াস। সে প্রয়াস হয়ত ব্যর্থ হবে। তবু সেই কিশোরেরই জীবনের ঊষাকালের অন্য একটি ঘটনাকে উপমা হিসাবে প্রয়োগ ক'রে সেই দুঃসাধ্য কর্মে উদ্যোগী হওয়া যাক।

২

শৈশবে তার কাছে এক অফুরন্ত বিস্ময়ের বস্তু ছিল সমান্তরাল রেল-লাইন। যখনই সে তার মা-বাবার সঙ্গে ট্রেনে যাতায়াত করত তখনই সে ওভারব্রীজের ওপর থেকে প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা চলন্ত গাড়ির জানলার ধারে বসে একমনে দেখত রেললাইন। এদিক, ওদিক, যতদূর চোখ চলে। তার শিশুমনে উঠত একটা প্রশ্ন: কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই রেলপথ? এর শেষ কি আছে? থাকলে সেটা কেমন? কেউ কি তা দেখেছে? সে নিজে কি কোনদিন তা দেখবে?

যখনই কোন নতুন জায়গায় তারা যেত, সে ট্রেন থেকে নেমেই দেখত রেললাইন শেষ হয়ে গিয়েছে কিনা। কিন্তু হতাশ হত। যেমন রেললাইন তেমনই পড়ে রয়েছে। শেষ হওয়ার নামটি নেই।

একবার তখন শীতকাল। তার বাবা ঠিক করলেন যে, সামনের বছর তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। তাকে একটি হোস্টেলে গিয়ে থাকতে হবে। আর তার আগে তাঁরা সবাই পুরী গিয়ে একমাস কাটিয়ে আসবেন। তার মায়ের কাছে সে পুরীর মন্দিরের আর সমুদ্রের অনেক গল্প শুনেছিল। সেই মন্দির আর সমুদ্র দেখা হবে—এই আনন্দে সে বিভোর হয়ে রইল।

ওরা থাকত পশ্চিমে। সেখান থেকে একদিন একটা ট্রেনে চাপল। তারা আগে যাবে হাওড়া। সেখানে ওয়েটিংরুমে থাকবে কয়েক ঘণ্টা। পুরী যাবার ট্রেন ছাড়বে রাত্রের দিকে। জ্ঞান হওয়ার পর এই সে প্রথম হাওড়া স্টেশন দেখবে।

হাওড়ায় তারা নামল। কী বিরাট ইসটিশন! কত লোক! এমন সে কোথাও দেখেনি। তার বাবা তার হাত ধরলেন। তারা চলতে শুরু করল ওয়েটিংরুমের দিকে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। অভিভূত হল বিস্ময়ে। চোখ বড় বড় ক'রে দেখতে লাগল। এত বিস্মিত সে এর আগে কখনও হয়নি। কেউ যেন তার পা-দুটিকে বেঁধে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। নড়বার ক্ষমতা নেই। গলাটা যেন কেমন কেমন হয়ে গিয়েছে, কথা বলবার শক্তি নেই। সাধ্য নেই চোখ ফেরানোর।

তার মা-বাবা প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তার মা তার মুখ মুছিয়ে দিলেন রুমাল দিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবলুসোনা, কী হয়েছে?' তার বাবা বললেন, 'এত ভীড় দেখে বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছে।' এই বলে তাকে কোলে তুলে নিলেন। বাবার কোলে চড়ে যেতে যেতেও সে তাকিয়ে থাকল সেই দিকে। তার জীবনের মস্ত এক আবিষ্কারের দিকে।

তারপর দোতলার ওয়েটিংরুমের বারান্দা থেকে গঙ্গার ওপরের স্টিমার দেখতে দেখতে এবং তারও পরে পুরী এক্সপ্রেসের কামরায় শুয়ে শুয়ে যেতে যেতে সে ভাবল তার সেই আবিষ্কারের কথা: হ্যাঁ, আমি রেলপথের শেষ দেখেছি। হাওড়া ইস্টিশনের প্লাটফরমের শেষে সেই একজোড়া বাম্পার। কত, কত, কত দূর থেকে এসে রেললাইনটা ওইখানে শেষ হয়েছে। এর পরেও আমি অনেক ঘুরব, দেখব অনেক রেললাইন, কিন্তু আজ আমি যে পথের শেষ দেখলাম তা ভুলব না।

৩

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে সেই শৈশব-অনুভূতির অনুরূপ ভাবনার ঢেউ কিশোরটির হৃদয়ের তটে আছড়ে পড়েছিল।

তার জীবনের সেই পরম লগ্নের ভাবনাটি তার আজকের ভাষায় অনুবাদ করতে বলা হলে সেই লোকটি বলবে: সেদিন হাজার জন্মের অন্ধকার এক হৃদয়পুরে অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছিল কৃপার আলো। সেই আলোয় আবিষ্কার করলাম আমার জন্মজন্মান্তরের পথ-চলার চরম গন্তব্য। সেই গন্তব্য, হে রামকৃষ্ণ, তুমি। তুমি আমার সব চাওয়ার চরম প্রাপ্তি! তুমি আমার সব প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা। সব সমস্যার সুনিশ্চিত সমাধান।

জানি প্রভু, আমার সংস্কারে হয়ত আরও কিছু ঘোরাঘুরি আছে। তাই তো আমি তোমার রূপসাগরে চিরদিনের জন্য তলিয়ে যেতে পারিনি। তাতে কী? এই ঘোরা-ঘুরির শেষে কী আছে তা তো আমার জানা হয়ে গিয়েছে। সেই শেষ তোমার দুটি চরণ। তোমার পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণই আমার পরম গতি। তুমি আমার জীবন-মরণের নিয়ন্তা ও পরিপূর্ণতা। আমার সব কথার শেষ কথা: শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসি।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

সন্ধ্যাবেলা স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ রকে ক্যাম্পখাটে বসিয়া আছেন। মালদহের একটি ভক্ত খুব ভাবের সহিত গাহিতেছে:

সহজ মানুষ হয় যে জনা,
ও মনের মানুষ হয় যে জনা,
তায় চোখে দেখলেই যায় গো চেনা।
সে উজান পথে করে আনাগোনা।
তার কামনদীতে চর পড়েছে
আর প্রেমনদীতে জল ধরে না।

গানের শেষে বাবা বলিতেছেন, "বেশ গান। গান গাইতে না পারলে স্বামীজী তাকে ঠিক পুরোপুরি মানুষ বলতে দ্বিধা করতেন। মানুষের একটা লক্ষণ গান—গান হৃদয় থেকে আসে কিনা।"

সন্ধ্যার পর আবছা অন্ধকারে বাবা হল-এ বসিয়া আছেন। ভিতরে ঘরের মধ্যে একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। চেয়ারের কাছে মাটিতে বসিয়া দু-একটি ভক্ত। বাবা বলিতেছেন, "মালা আর কত ঘুরাবে? ডাকো ব্যাকুল হয়ে। ডাকতে ডাকতে সব স্থির হয়ে যাবে, হাতের মালা হাতেই থেকে যাবে, আর ঘুরবে না, কাপড়েরই খেয়াল থাকবে না—খসে পড়বে। নাম করতেই ইষ্ট-রূপ দর্শন হবে—তখন কত হাসি, কত কান্না, কত কথা, 'কেন দেখা দাওনি এত দিন!'—এই সব। ব্যাকুল হও। এত জপ করতে হবে, এত তপ করতে হবে এসব কিছু না। ব্যাকুল হয়ে, কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকবে, বলবে—'দেখা দাও, দেখা দাও; কত জনকে দেখা দিয়েছ, আমায় কেন দেবে না? তুমি তো বলেছ—যে তোমার জন্য কাঁদবে তাকেই দেখা দেবে। তবে কেন দেখা দিচ্ছ না?' 'দেখা দাও, দেখা দাও' ব'লে ব্যাকুলভাবে কাঁদবে। ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞেস করতেন—'কিরে, কেঁদে কেঁদে ডেকেছিলি?' যদি বলতুম, 'হ্যাঁ', তো খুব খুশী হতেন। আবার জিজ্ঞেস করতেন, 'চোখের কোন্ কোণ দিয়ে জল পড়েছিল?' নাকের ডগার কাছ দিয়ে অনুতাপাশ্রু, আর কানের দিকের কাছে হলে বলতেন প্রেমাশ্রু।

"ঠাকুরের কাছে যারা এসেছিল, তাদের সবারই এসব কিছু না কিছু দেখা যেত—অষ্টসাত্ত্বিক বিকার—স্বেদ কম্প পুলক অশ্রু হাসি কান্না নৃত্য গীত, ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। স্বামীজীরও হ'ত, তবে খুব চাপা। আর ঠাকুরের তো লেগেই আছে। লেগে যাও। কেঁদে কেঁদে জানাও—কেন আমার কিছু হচ্ছে না? কেন তোমার দেখা পাচ্ছি না? কেন তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল ইচ্ছা হচ্ছে না?"

* * *

আর একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা ঘরে খাটে শুইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া 'স্মৃতিকথা' লিখিবার সেবকটি আসিয়া চলিয়া গেল; একটু পরে আবার আসিতেই বাবা বলিলেন, "ডাকোনি কেন? ভেবেছিলে ঘুমুচ্ছিলাম। আমি ঘুমুচ্ছিলাম? এরা (বালকেরা) শিবের নাম করছিল—শিব, শিব! অনন্ত, অনন্তের অংশও অনন্ত। এই আকাশ নক্ষত্র বিশ্বজগৎ—সমাধিতে সব শূন্য। ক্ষুদ্র লীনমিদং

বিশ্বম্, ক্ব গতং কেন বা নীতম্? গুরুর উপদেশ শ্রবণ ক'রে গভীর ধ্যান ও উপলব্ধি। তারপর শিষ্য বলছে—'কোথায় গেল বিশ্বজগৎ —এই তো ছিল—কে নিয়ে গেল?'"

রাত্রি প্রায় ৮টা, বাবা ঘরে শুইয়া। সেবক ভক্ত ব্রহ্মচারীরা বাবাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে, বাবা উঠিয়া বসিলেন এবং বেশ উদ্দীপিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "Hand head and heart (হাত, মাথা ও হৃদয়) তিনটিরই culture (অনুশীলন) করতে হবে; হাতের কাজ শারীরিক কাজকর্ম, মাথার কাজ বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলন আর হৃদয়ের কাজ সেবা ভালবাসা। স্বামীজী আমায় লিখেছিলেন, 'It is the heart that conquers, not the brain' (হৃদয়ই জয়ী হয়, মস্তিষ্ক নয়)। প্রত্যেক প্রাণীই হৃদয়ের ভাষা বুঝতে পারে। স্বামীজীর ভেতর তিনটিই ফুটেছিল। আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রথমটি থেকে। স্বামীজীর মতো spiritual (আধ্যাত্মিক) আমরা না হতে পারি, তাঁর মতো heart (হৃদয়) বা intellect (বুদ্ধি) আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু হাতের কাজের দিক দিয়ে তো আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি। মঠে তিনি বড় বড় হাণ্ডা মেজেছিলেন—এক ইঞ্চি পুরু ময়লা। আমরা কি একটা বাটিও পরিষ্কার করতে পারি না? তিনি মঠের পায়খানা পরিষ্কার করেছেন—তা জানো? একদিন গিয়ে দেখেন —খুব দুর্গন্ধ। বুঝতে আর বাকী কিছু রইল না, স্বামীজী গামছাটা একটু মুখে বেঁধে দুহাতে দুটো বালতি নিয়ে যাচ্ছেন! তখন সব দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে, বলছে 'স্বামীজী, আপনি!' স্বামীজীর হাসি হাসি মুখ, বলছেন, 'এতক্ষণে স্বামীজী, আপনি!'"

সকালে পত্র লিখিবার সেবক একটি চিঠির উত্তর-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে লিখিয়াছে— 'আমি বুড়ো হয়েছি, সময়মত চিঠিপত্র দিতে পারি না ইত্যাদি।' শুনিয়াই বাবা পিঠ টান করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, "আমি বুড়ো হয়েছি—হতেই পারে না; কেটে দাও, কেটে দাও। আমি still young—young in spirit (এখনও যুবা, ভাবে যুবা)।" হাত মুঠা করিয়া আবার বলিতেছেন, "I am younger than all of you combined (তোমাদের সকলের চেয়ে আমি যুবা)। আমার শরীরটাই আর সেরকম নড়তে চড়তে পারে না। কিন্তু প্রাণটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়—সর্বদা কিছু করতে চায়। এই দেখনা—ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলাম। তবু কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কি আর কাজ ক'রব! ভাবলুম চিঠি লেখাই, আর তুমি কিনা লিখে দিয়েছ—আমি বুড়ো হয়ে গেছি

মনি-অর্ডার আসিয়াছিল—সেবক কুপনটি বাবাকে দিয়াছে; দেখিয়াই বাবা বলিতেছেন, "এর ঠিকানা কই? জানা নেই? সেটা কোন excuse (ওজর) নয়। জানা নেই কেন? জানবার ইচ্ছা নেই বা চেষ্টা করনি। দেখে লিখে রাখলেই পারতে ফর্ম থেকে বা জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতে। এই সামান্য ব্যাপারেই সব এই রকম! আর ব্রহ্মজ্ঞান?— সে কি সোজা কথা? কত তীব্র জানবার ইচ্ছা চাই, কত দিনের কত সাধনা চেষ্টা চাই, তবে তো। বুঝলে—আগে ইচ্ছে, তারপর চেষ্টা চাই।"

একদিন বিকালে কাছে অন্য কোন সেবক ছিল না। বাবা হাতে জল দিবার জন্য ডাকিতেছেন। অগত্যা একঘটি জল লইয়া

ভক্ত জল দিতে গেল। জল দেওয়া হইয়া গেলে বাবা বলিতে লাগিলেন, "(ঘটি ধরিয়া দেখাইয়া) এমনি ক'রে ঘটি ধরে জল দিতে হয়, বাইরে ধরবে, ভেতরে হাত ডোবাতে নেই। খুঁটিনাটি সব কাজ নিখুঁতভাবে করতে হবে—বাইরের কাজ যা তা ক'রে করলুম তা নয়। সব কাজ যত্ন নিয়ে করতে হয়। যখন যেটা করবে তখন সব মনটা তাতে থাকবে, আর মনে করতে হয় সেটাই সাধন—তাঁকে পাবার উপায়—সহায়ক। ঢাকার ডাঃ গাঙ্গুলী বাগান কোপায়, ফুলগাছে জল দেয়, আর ভাবে : এই ঠাকুরের বাগান, জল দিচ্ছি, গাছ হবে, ফুল হবে, সেই ফুলে ঠাকুরের পূজো হবে। সর্বদা এই চিন্তা—এই তো জপধ্যান, এই তো সাধন-ভজন।"

একদিন বাবা একা একা গাহিতেছেন :

হাস-মুখ তেরা করল কি গুণ।
অংগর আগ রহ ইস্‌ক্ আগুন।

ভক্ত ও সেবকরা কাছে আসিয়া গেলে বলিতেছেন, "ইস্‌ক্ মানে love (প্রেম)। এ গানটা গাইছিল অবশ্য একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে লক্ষ্য ক'রে, পশ্চিমে এক শহরে। আমার কানে যখন এল, তখন আমার মনে অন্যভাবই উঠল। ভাবলাম—সত্যি তো হাসিমুখ আর কার আছে? এক তাঁরই (ঠাকুরের) হাসিমুখ দেখেছি।"

সন্ধ্যার বারান্দায় একটু আসর জমিয়াছে। কেহ প্রশ্ন করিয়াছে—তিব্বতে কেন গিয়াছিলেন, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি। বাবা বলিতেছেন, "তিব্বতে যাওয়া কেন? তাঁর অদর্শনের পর কোথাও কিছু ভাল লাগত না। সর্বদা ভাবতাম—কোথায় গেলে আবার তাঁকে পাবো? মনে হ'ত—হিমালয়ে গেলে নিশ্চয় পাবো, হিমালয় দেবস্থান। কৈলাস, মানস সরোবর, কেদারবদরী—ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে মনে হ'ত—বড় হ'লে ঐখানেই চলে যাবো। আরও শুনেছিলাম তিব্বতে এখনও সব বড় বড় বৌদ্ধ মঠ আছে। দেখবার খুব ইচ্ছে হ'ত। হিমালয়— পাহাড়ের পর পাহাড়, চিরতুষারাবৃত। সারা বছরে কখনো সেখানকার বরফ গলে না—সাদা ধব্ ধব্ করছে, নির্মল নিস্তব্ধ। কতদিন বরফের ওপরেই কেটে গেছে। বেশ লাগত, চারদিক দেখতুম আর মনে হ'ত যেন কত দিনের পরিচিত পরিত্যক্ত স্থান।"

"তিব্বতে বৌদ্ধ মঠে আমাকে নিয়ে যায় বরফ থেকে তুলে প্রায় নগ্ন অবস্থায়। হিমে জমে যাচ্ছিলাম। তোমরা শিশু সন্তান, তোমাদের বলতে আর কি! শরীরের লক্ষণ দেখে তারা বলে ওঠে—'গে-লাম্' অর্থাৎ আকুমার ব্রহ্মচারী। ওদের দেশে গে-লামের ভারি সম্মান। আমাকে বলে—'এইখানেই থাকো।' ঠাকুরের ছবি আমার কাছ থেকে নিয়ে বেদীতে বুদ্ধের কাছে রেখে আরতি করে, বলে 'এ কে? এ চোখ তো মানুষের নয়। এ ভগবান, এ বুদ্ধ।' শেষে ছবি দেয়। এক এক মঠে ৪,০০০, ৭,০০০ সাধু। চায়ের জল চড়ানোই আছে। এ পাতা-চা নয়—ট্যাবলেট-চা। গরম জল নিয়ে যখন ইচ্ছে, যত ইচ্ছে খাও। চা না খেলে জমে যেতে হয়। মাঝখানে আগুন জ্বলছে—চায়ের জল ফুটছে আর চারদিকে সব দেয়ালে গাঁথা চেয়ারের মতো ধ্যানের আসন। চা খেয়ে নিচ্ছে, একটু মাংসটাংস খেয়ে নিচ্ছে। আবার ধ্যানে বসে যাচ্ছে।

"তিব্বতী ভাষা শিখে ফেলেছিলাম। সেখানে মেয়েরা বলে, 'তোমার কি মা বোন কিছু নেই? দেখতো, এখানে বিয়ে কর না।'

আমি বলি, 'তোমরা সবাই তো আমার মা। কাকে বিয়ে ক'রব বলনা? আমি সন্ন্যাসী যে।' তাশি লামা political head (রাষ্ট্রপ্রধান), দলাই লামা spiritual head (ধর্মগুরু)। ও-জাতিটাই spiritual (আধ্যাত্মিক)। কোন লামা যখন মরে ওরা খবর রাখে— তিনি কোথায় জন্মাচ্ছেন, খোঁজ ক'রে তাঁকে নিয়ে আসে এবং লামাপদে বরণ করে—সে যত ছোটই হোক। একজন 'অছি' থাকে—সেই সব করে, তাকে সব বলে। একবার ব্রিটিশ রিজেন্ট-এর সঙ্গে কথা হচ্ছে, অছি সব বুঝিয়ে দিচ্ছে। আঠার মাস বয়সের লামা ঘাড় নেড়ে approval (সম্মতি) বা disapproval জানাচ্ছে। ওরা জাতিস্মর হয়—পূর্বজন্মের সব কথা মনে থাকে।

"তিব্বতী পোশাক প'রে ফিরছি। কাশ্মীরে আটকালে, নজরবন্দী ক'রে রাখলে, গবর্ণমেণ্টের ধারণা—আমার বুঝি কোন political (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য। তিব্বতী ভাষা শুনে আরো সন্দেহ, বলে—কেন ওরা তোমায় অত ভক্তি করে? আমি বলি—সে কথা ওদের জিজ্ঞেস কর না। আমি বাঙালী সন্ন্যাসী, বরানগরে আমাদের মঠ। আমায় ছেড়ে দাও। নতুবা আমি অনশন আরম্ভ ক'রব। জেলে কিছু খেতুম না। হাবিলদার চেষ্টা খুব করছিল—যাতে ছেড়ে দেয়। হাবিলদারের স্ত্রী কত বলে—'মহারাজ, খান; নইলে আমাদের অকল্যাণ হবে। এই তো ছেলে মানুষ! আমাকে মা মনে ক'রে আমার কথা শুনুন।' কান্নাকাটি করে। আমি বলি, 'গর্ভধারিণী মাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তোমার চোখের জল টলাতে পারবে না মা, তেমন সাধু নই।'

"শেষে তাদের ছোট্ট ছেলেটি যখন বিকেলবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে জানলা দিয়ে তার আধলা দিয়ে কেনা চা ও আপেল নিয়ে এল, তখন আর পারলুম না। সে বলতে লাগলো—সাধুজী, দাদাজী, খাও। চোখে জল এল, তার দেওয়া জিনিসগুলো খেলুম। খোঁজ-খবর নিয়ে ওরা জানলো—রাজনীতিক কোন কিছুর সঙ্গে আমার যোগ নেই। তখন মুক্তি—তবে পুলিশ সঙ্গ ছাড়েনি। বাদিতে সীমন্তেই ধরে, বরানগর মঠে পৌঁছে দিলে।"

* * *

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ, ৩ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। সারগাছিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহোৎসবের দিন দুপুরে জনৈক ভক্ত একখানি সংবাদপত্র আনিয়াছে। তাহাতে এক বৈষ্ণব প্রচারকের বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে—রামকৃষ্ণ হিস্টেরিয়া রোগী, হিপ্‌নটিজম্ জানিতেন আর বিবেকানন্দ তাঁর গুণ্ডা। ভক্তটি দুই-তিন বার ঐটির প্রতি বাবার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন এবং কাগজে প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। শেষে বাবা বলিলেন, "আরে পাগল, ও সব আবার কেউ দেখে, না পড়ে। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে॥' যদি কেউ এসে বলে 'কৃষ্ণ লম্পট'—তার কথা শুনতে হবে, না প্রতিবাদ করতে হবে? যে বুঝেছে, সে বুঝেছে। অপরকেও বুঝতে দাও। এ নিয়ে আর কিছু ক'রো না, কাগজটা ছিঁড়ে ফেলো। তুমিই তো ওদের ভাব প্রচার ক'রছ।" ভক্তটি কাগজখানি ফেলিয়া দিল। কিছু পরে বাবা বলিতেছেন, "আলোয়ারে একজনের বাড়িতে উঠেছি রাত্রে থাকব ব'লে। খাওয়া-দাওয়ার পর কথায় কথায় স্বামীজীকে খাটো করা হচ্ছে; একবার প্রতিবাদ করলুম, তারপর

তখনি সেই বাড়ি ত্যাগ তখন রাত ১০টা কি ১১টা হবে।"

* * *

একটি ব্রহ্মচারীকে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণভঙ্গীতে বাবা বলিতেছেন, "'গহনা কর্মণো গতিঃ'—বুঝলে কর্মযোগ বড় শক্ত পথ, ধ্যান জপ তো তার তুলনায় ঢের সহজ। কি ধ্যান-জপ কর—সবই বুঝি, ও কেবল ফাঁকির পন্থা। যা ধ্যান জপ হয়, তা আমার জানতে বাকী নেই। কাজ কর, কাজ কর। Positive something—যার ফল হাতেনাতে দেখা যায়। তোমারও ভাল, অপরেরও ভাল—সা চাতুরী চাতুরী। Work, work (কাজ কর, কাজ কর), তবে as worship (উপাসনার ভাবে)—এইটুকুই যোগ। যার ধ্যান-জপ ভাল হবে, তার কর্মের শক্তি ও কর্মের কৌশল বেড়ে যাবে, সে কখনও tired (শ্রান্ত) হয় না, কারণ তার শক্তির বাজে খরচ হয় না ; সে কখনও বিরক্ত হয় না, কারণ তার কিছুতে আসক্তি নেই, সর্বদা শান্ত, অক্লান্ত-ভাবে কাজ করে। এই তো test (পরীক্ষা)—মন ঠিক চলছে কিনা, তা এই থেকেই বেশ বোঝা যায়।"

বাবা কথায় কথায় একদিন তাঁর সাধন ভজন ও জীবনের অনেক কথা বলিলেন, "ছেলেবেলায় শিবপূজো করতুম, রোজ শিব গড়তুম, ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পূজো করতুম, সাজাতুম, স্তবপাঠ করতুম—এই সব। গঙ্গাস্নান করবার সময় প্রাণায়ামের কুম্ভক করতুম, জলের ভেতর একটা ঢিল কি পাথর ধরে ডুবে থাকতুম।…তারপর ঠাকুরের দেখা—তিনি ব'লে দিলেন 'অত সব করতে হবে না, ও-সব একালের নয়। ভক্তি বিশ্বাস হলেই হয়ে গেল।' ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরানগর মঠে সবারই তীব্র বৈরাগ্য, ঠাকুরের দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা। সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে, তারপর শ্মশানে সারারাত জপ ধ্যান। চিচিকুচী—ভোরের পাখি ডেকে উঠল। গঙ্গায় ডুব দিয়ে মঠে ফিরে আসা। কোনদিন বা মঠেই সব—চেয়ারে মাদুরে ব'সে ঠাকুরের প্রসঙ্গ হতে হতে ধ্যান। যে যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়—সব ধ্যানে লেগে গেল।

"হৃষীকেশে ছত্রের ঘণ্টি বাজত, উঠতে ইচ্ছা হ'ত না। অনেক পরে মাঈর কাছে গিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়াতাম। 'বাচ্চা, এতনা দেরী কাহে—ঘন্টি নেহি শুনা?' 'মাঈ, ধেয়ান লগয়া। নেহি উঠা।' 'অব্ ত কুছ নেহি। জারা সবুর কর্ বেটা, পাকায় কে ভেজ দেউঙ্গী।' এই রকম দিয়ে যেত, শেষে আমার জন্যে দুখানা রুটি রেখে দিত।

"ছেলেবেলা শিবলিঙ্গ গড়ে পূজো করেছি, পরে হিমালয়ে জীবন্ত শিব দর্শন করেছি—ঠাকুরই সবার ভেতর চলছেন ফিরছেন—নারায়ণ। ঠাকুরের ভেতরই এই সেবাধর্মের বীজ—তাই এখন চারদিকে পল্লবিত। দেওঘরে মথুর বাবুকে বললেন, 'এদের খেতে দাও, পরতে দাও, এক মাথা তেল দাও—নইলে রইল তোমার কাশী যাওয়া। এখান থেকে আমি উঠব না।' তাই তো এই সেবাধর্মের যুগচক্র ঘুরল। তাই তো সব সময় বলি—কাজ কর, কাজ কর। Something positive, যার ফল হাতেনাতে দেখা যায়। কি জপধ্যান করবে? কত ধ্যান জপ করবে? সে তো আমরা জানি।

"স্বামীজী ও আমি—দুজনে চলেছি পাহাড়ে। এক জায়গায় দেখি একজন সাধু ধ্যান করতে বসেছে—বেশ কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা

পর্যন্ত, আর বেশ সজোরে নাক ডাকছে। স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠেছেন—'ওরে বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে কম নয়তো, দে বেটার কাঁধে লাঙল জুড়ে—তবে যদি এর কোন কালে কিছু হয়।'

"আর একবার রাজপুতানায় একটি অকর্মণ্য idiot (বুদ্ধিশুদ্ধিহীন) মতো ছেলেকে তার বাড়ির লোকেরা স্বামীজীর কাছে নিয়ে এল। তারা ভাবত—এ বুঝি খুব ধর্মভাবাপন্ন, তাই ওই রকম। যাই হোক, স্বামীজী একজন জ্ঞানী লোক, তিনি কি বলেন শোনা যাক্—ছেলেটি কতদূর উন্নত, কি বৃত্তান্ত! স্বামীজী সটান ব'লে দিলেন, 'ওকে নিয়ে যাও শৌণ্ডিকালয়ে এবং তারই সংলগ্ন জায়গায়, তবে যদি ওর চৈতন্য জাগ্রত হয়। সেখানে একটা action (ক্রিয়া) হবে, তার re-action-এ (প্রতিক্রিয়ায়) যদি ও জাগে।' এই রকম তাঁর ব্যবস্থা।

"এসব দেখে-শুনেই তিনি বলতেন, 'সত্ত্বের ধুয়া ধরে দেশ তমঃসমুদ্রে ডুবতে বসেছে।' আর বলতেন, 'এর থেকে একে বাঁচাতে হ'লে চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-সঞ্চারী তীব্র রজোগুণ।' তাই তো কর্মের উপর এত জোর। যা হবার হোক, কর্ম ক'রে যাও, তবু কিছু হবে—নিশ্চয় হবে। সাহস নেই, শক্তি নেই, বিশ্বাস নেই—সর্বদা ভয়, যদি না পারি। এজন্যই তো পিছিয়ে যাও আসুক না বিফলতা, বলুক না লোকে মন্দ, তুমি প্রভুর নামে কাজ ক'রে যাও সাহস বিশ্বাস নির্ভরতা নিয়ে।

"হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফিয়ে চলেছি। একটা চূড়া পেরিয়ে এসে দেখি—আর এক চূড়া দৃষ্টিপথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু বিশ্রাম করেই মনে হ'ত কতক্ষণে ওর পারে যাব। আবার চেষ্টা—আবার চলা। সত্যি বলছি, তোমাদের অধিকাংশই কর্মের অধিকারী—কর্ম কর, কর্ম কর যতক্ষণ না ক্লান্ত হও। তবে ঐ—ভগবানের কাজ করছি, ঠাকুরের কাজ করছি—এ ভাবটি সদাসর্বদা রাখা চাই। নইলে মুশকিল।

"উদ্বোধনের সত্যেন (স্বামী আত্ম-বোধানন্দ) তখন অদ্বৈত আশ্রমের বই বিক্রী ক'রত কলেজ স্ট্রীটে। বেলা দশটায় খেয়ে যেত দুটি ভাতে-ভাত—আর সারাদিন দোকানে থাকত। মনে ভারী কষ্ট—'এ কি করছি!' একদিন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এইসা লেকচার দিলুম যে, এখনও বলে—'মহারাজ, সেই যা inspiration (উৎসাহ) পেয়েছি, তার জোরে এখনও চলেছি।' বলেছিলাম—'একি তুমি সোজা কাজ করছ? এর ভেতর কত ত্যাগ, কত তপস্যা, কত সেবা রয়েছে! এই তো ঠিক ঠিক সাধন। সকালে যা হোক দুটি খেয়ে আসো, আর সবাই কত কি খায়!—এই তো ত্যাগ। তারপর এই ছোট্ট একটি ঘরে—সারাটা দিন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা বা থাকতে পারা—এই তো তপস্যা। তারপর এইসব বই থেকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচার হচ্ছে কত লোকের ভেতর—তোমার হাত দিয়েই তো তা যাচ্ছে। এ কি কম ঠাকুরের সেবা? ঠাকুরঘরের কাজই কি ঠাকুরের সেবা?'

"তোমাদেরও বলছি, এ ভাবটি নিয়ে এস—'যা করি তাই সাধন। যা সাধন ব'লে মনে করতে পারব না, তা করব না। খাচ্ছি—তাঁকে আহুতি দিচ্ছি; বেড়াচ্ছি কি নগর পরিভ্রমণ করছি—তাঁকে প্রদক্ষিণ করছি; এমনকি শুয়েছি ঘুমোচ্ছি তাও যেন তাঁকে প্রণাম করছি—তাঁর ধ্যান করছি।' সর্বদা তাঁর ভাবে ভরা—একটি গানে এই ভাবটি আছে:

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর
আহুতি দিই শ্যামা মারে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

প্রত্যেক জাতির জীবনেই মধ্যে মধ্যে সঙ্কট দেখা দেয়। সেই সময় প্রয়োজন হয় বলিষ্ঠ ও আদর্শ নেতৃত্বের—যাঁরা দেশ ও জাতির জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করেন ও সেই লক্ষ্যপথে পরিচালিত করেন। ইংরেজ শাসনের যুগে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। কেবল পরাধীনতা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহময় আকর্ষণে সেদিন এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল আত্মবিস্মৃতি। ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদের স্থান অধিকার করতে বসেছিল পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ। সেই চরম সঙ্কটের দিনে দেশে বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল। সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, জীবনের সর্ব স্তরে তাঁরা প্রচার করেছিলেন জাতীয়তার আদর্শ, ঘোষণা করেছিলেন ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য। দেশ ও জাতিকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার, দৈন্য ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে নূতন আদর্শ গড়ে তুলবার জন্য মনীষিগণের যে প্রচেষ্টা ও আন্দোলন তার মধ্যেই নবযুগের সূচনা। সমগ্র দেশ ও জাতির উপর স্বামী বিবেকানন্দের অসীম প্রভাবের কথা স্মরণ করে তাঁকে এই নবযুগের আচার্য বলে উল্লেখ করা হয়।

পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ যা হিন্দুজীবনের মূল ভিত্তি অধ্যাত্মবাদকে অস্বীকারপূর্বক ব্যক্তি বা সমাজের সুখই পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করে তার প্রতিবাদ-রূপেই যেন আবির্ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের। অতীতে একদা ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, জ্ঞানিগণ তাঁকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন করে উপনিষদের সেই তত্ত্ব ঘোষণা করলেন—'সকল ধর্মই সত্য', 'বিভিন্ন ধর্ম সেই চরম সত্যে উপনীত হবার বিভিন্ন পথ মাত্র।' এই সর্বধর্মসমন্বয় তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তি বা মতবাদের উপর নয়। ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদ এই পরম তত্ত্বকেই প্রচার করে। তার প্রকাশ জীবনের সকল কর্মে, চিন্তায় ও আচরণে। স্বামী বিবেকানন্দ এই অধ্যাত্মবাদ প্রচার করেছেন স্বদেশে ও বিদেশে। Religion is being and becoming. Religion is realization. আত্মসাক্ষাৎকারই প্রকৃত ধর্ম, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অবিচ্ছিন্ন। হিন্দুধর্ম বা বেদান্ত বলতে স্বামী বিবেকানন্দ কোন গণ্ডিবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ব্যাখ্যা করেননি। সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বিশাল, উদার বিশ্বজনীন হিন্দুধর্মের রূপটিই তাঁর সকল বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে।

বস্তুত: জগতের, বিশেষত: ভারতের সাধারণ নরনারীর দুঃখ, দারিদ্র্য, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা উপেক্ষা করে স্বামী বিবেকানন্দ কোন অধ্যাত্মবাদ প্রচার করেননি। সমগ্র মানবজাতির জন্য যেমন তাঁর হৃদয় ছিল প্রেম ও করুণায় পূর্ণ, মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মর্মান্তিক সমস্যার প্রতি তিনি তেমন ছিলেন গভীরভাবে সচেতন। জাতীয় জীবন যাতে সুস্থ, সবল, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেজন্য

তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। দেশ স্বাধীনতা লাভ করুক, আধুনিক বিজ্ঞান যন্ত্র-ব্যবহার ও সংগঠনপ্রণালী সহায়ে উন্নততর হোক—এ সবই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সকলের মূলে প্রাধান্য দিয়েছিলেন অধ্যাত্মবাদকে। ভারতের সব সমস্যা তিনি সমাধান করতে চেয়েছিলেন কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ দ্বারা, ধর্মকে অবলম্বন করেই জীবনের সকল দিক পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করবে—এই ছিল তাঁর দৃঢ় সাধনা।

পাশ্চাত্য দেশের উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশ, প্রাণের প্রাচুর্য ও শক্তির আবেদন স্বামীজীকে মুগ্ধ ও অভিভূত করলেও, একথা তাঁর হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব হয়নি যে, আত্মার স্বরূপ-অভিব্যক্তিই মানবের ভৌতিক, মানসিক বা সর্বপ্রকার উন্নতির ও মহিমার মূল কারণ, সেখানে সেই আত্মার স্বীকৃতির অভাব—ফলে ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য। বিজ্ঞানের আরাধনা তথা প্রকৃতির অনুশীলনের মধ্যে মানুষের প্রেয়-সাধনের সঙ্গে তার বিনাশের সম্ভাবনাই কী আজ সর্বত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করছে না? স্বামী বিবেকানন্দ যেন বর্তমান ভারতকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান বা ব্যবহারিক জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের নিকট বিজ্ঞানশিক্ষা ভারতের পক্ষে অপরিহার্য, বারবার তিনি বলেছেন। বর্তমান ভারত বিজ্ঞান-আরাধনায় মগ্ন। কী তার লক্ষ্য—এ প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্ট। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ দূরত্বের ব্যবধান দূর করেছে। পৃথিবী জুড়ে চলেছে আদর্শের প্রবল সংঘাত। কোন দেশের পক্ষেই আর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির প্রভাব উপেক্ষা করা কঠিন। যে বিজ্ঞান মানবজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি, শক্তি প্রদান করছে, প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করে কেবল জলে বা স্থলে নয়, অন্তরিক্ষেও আধিপত্য-বিস্তারের নেশায় বিভোর করছে, তাকে উপেক্ষা করা কি যুক্তিসঙ্গত অথবা বাঞ্ছনীয়? সে শক্তিই বা কোথায়? তবে কি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বিজ্ঞানের হস্তে আত্মসমর্পণই মানব-জীবনের শেষ পরিণতি? ভারত কি শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির নিছক অনুকরণে পর্যবসিত হবে? তার বহু যুগের বৈশিষ্ট্য সনাতন অধ্যাত্মসাধনা পরিহার করে রাজনীতি ও অর্থনীতিকেই জীবনের নিয়ামক বলে গ্রহণ করবে? চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করছেন। আজ এই মুহূর্তে বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অনুধ্যান বর্তমান সমস্যায় আলোকপাত করতে পারে।

স্বামীজী জানতেন, সমাজের কুসংস্কাররূপ ব্যাধি দূর করবার উপায় আন্দোলন নয়, সমাজ-শরীরকে অন্ন ও বিদ্যা দ্বারা পুষ্ট করা। যদিও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই সন্তোষজনক নয়, তথাপি একথা অস্বীকার করা চলে না, এই শিক্ষা মানুষকে কিছুটা সচেতন করেছে। সমাজের নিম্নস্তরেও আজ প্রবল আত্মচেতনা দেখা যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনসংগ্রামে জয়লাভের বিপুল প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। আশঙ্কার কথা, সেই সঙ্গে কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সাধারণ নরনারীর নিছক ভোগবাদের দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখবার প্রচেষ্টা সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান। কেবল সীমান্তে বিরোধ বা খাদ্য-সমস্যাই ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান কথা

নয়। স্বাধীন ভারতে দৈনন্দিন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তার নরনারীকে ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃতির পথে টেনে নিয়ে চলেছে। হয়তো ভবিষ্যতে এই বিজ্ঞানের সাফল্য বা ঐহিক ভোগবাদ জাতীয় জীবনকে গ্রাস করতে পারে, এই চিন্তা করেই স্বামীজী বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আজ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশেষ করে উপলব্ধি করছি, কেন তিনি অধ্যাত্মবাদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন জাতীয় জীবনেও তেমন চলার পথে প্রয়োজন উচ্চ আদর্শের। আর সেই আদর্শকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন সমগ্র জীবনকে অখণ্ড সাধনায় পরিণত করা। স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে ভারতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার জীবনের লক্ষ্য কি, কোন্ পথে চলবার সাধনা তাকে করতে হবে। 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ—বেদান্তের এই ঘোষণা সকল মানবের মধ্যে ঐক্যসাধন করবে ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব-বিকাশে সাহায্য করবে। স্বামীজী তাই বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে চেয়েছিলেন, তাঁর মতে 'বেদান্তের এইসকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, ধীবরের গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত হবে, কার্যে পরিণত হবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা—যে যে কাজ করুক, যে যে অবস্থায় থাকুক—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।' দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছেন, 'সবল-দুর্বল-উচ্চ নীচ-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সেই অনন্ত আত্মা রয়েছেন, সুতরাং সকলেই মহৎ হতে পারে, সকলেই সৎ হতে পারে। ওঠ, জাগো, নিজের স্বরূপ প্রকাশ কর। তোমার ভেতর যে ভগবান রয়েছেন, তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁকে অস্বীকার করো না।'

আজ নবভারত-সংগঠনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত বেদান্তের-আদর্শ অনুসরণই জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন। এই বেদান্তের আদর্শে আমাদের দৈনন্দিন জীবন, নাগরিক জীবন, পারিবারিক জীবন ও জাতীয় জীবন প্রভাবিত ও পরিচালিত হলেই যথার্থ কল্যাণ। প্রতিদিন সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে যেন আমরা দিনের কাজ আরম্ভ করি, যাতে আমাদের বুদ্ধি ও কর্ম শুভপথে পরিচালিত হয়। (আকাশবাণীর সৌজন্যে)

বিবেক-বন্দনা

শ্রীবিধুভূষণ নন্দ

জগতের ব্যথা বেজেছিল বুকে
কেঁদেছিল তব প্রাণ
তাই নেমে এলে ধরার ধূলিতে
সপ্তঋষি-প্রধান!
স্বার্থ আঁধার নিবারি করিলে
প্রেমের আলোক দান ॥

জীব-মাঝে শিব সতত বিরাজে
বুঝাইলে সযতনে,
আপনা বিলাতে জগতের হিতে
শিখালে সর্বজনে।
জড়তা-দানবে বিনাশি মানবে
দানিলে আত্মজ্ঞান ॥

শৈশবে আচার্য শঙ্করের প্রতি শ্রীদুর্গার কৃপা

পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ

দুর্গদৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা

দুর্গনামক অসুর মহাবাধা সংসারবন্ধন ও অসদ্ভাব—এই সকলের যিনি নাশকারিণী তিনিই দুর্গা বলিয়া পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক পরিকীর্তিত বা উক্ত হন।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি
নমোঽস্তুতে॥

হে মাতঃ দুর্গে! তুমিই জাগতিক বা অজাগতিক প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত যাবতীয় দেব তির্যক ও মনুষ্যাদির স্বরূপ তুমিই সর্বনিয়ন্ত্রী সর্বশক্তিসমন্বিতা দেবী দুর্গা, তুমিই আমাদের সকলের যাবতীয় ভয় নিবারণ কর

এই আদ্যাশক্তি দুর্গাই কালী তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা এবং চতুঃষষ্টি বা কাটিযোগিনী-রূপে আবির্ভূতা হন—(এই মর্ত্যধামে) বহুপূর্বে ত্রিলোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই অজনাভবর্ষের অর্থাৎ ভারতবর্ষের দ্রাবিড়দেশনিবাসী ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী শঙ্করাচার্যের পিতা শিবগুরু অপুত্রক ও শিবভক্ত ছিলেন। পরে অধিক বয়সে শিব-শক্তির কঠোর উপাসনায় ভগবান শঙ্করের কৃপায় শিবগুরুর পত্নী কাত্যায়নীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। শঙ্করের কৃপায় জন্ম বলিয়া শিবগুরু ঐ পুত্রের শঙ্কর বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। শঙ্করের ছয়মাস বয়ঃক্রমসময়ে শিবগুরু ভিক্ষার্থ দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। এস্থলে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শিবগুরু ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, অযোধ্যার রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত দানীয় দ্রব্য-গ্রহণার্থে যাইলে এখানে একদিন শঙ্করের জননী কাত্যায়নী দেবীও কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণার্থে ঐ ষাণ্মাসিক বালক শঙ্করকে ঘরের বাহিরের দালানে বা দাওয়ায় শয়ন করাইয়া শাক আহরণ নিমিত্ত বাহিরে গিয়াছিলেন। এমন সময়ে বালক ক্ষুধার্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে জগদম্বা স্বয়ং শঙ্করী ঐ বালকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শিশু শঙ্করকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া নিজ স্তন্য পান করাইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। বালক শঙ্করও তৎক্ষণাৎ মহাকবি হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে একটি ক্ষপণক বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থী হইয়া সেই কুটীরে উপস্থিত হইলে গৃহে কেহই না থাকায় ষাণ্মাসিক বালক শঙ্কর সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শুনিয়া বক্ষ্যমাণ শ্লোক দ্বারা উত্তর করিলেন। শ্লোক যথা—

একা মাতা শাকহর্তা অত্র ক্ষপণক
দশশাকার্তাঃ।
যত্র ক্ষপণক দশশাকাশা তত্র ক্ষপণক
শাকাশা কা॥

ইহার অর্থ এই যে, হে ক্ষপণক, এখানে আমার জননী একাকিনী। তিনি সম্প্রতি শাক আহরণের জন্য বাহিরে গিয়াছেন, আমাদের এই সংসারে দশজন শাকভোজনার্থ কাতর হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই দশজনের মধ্যে প্রত্যেকের যখন দশজন ক্ষপণক অর্থাৎ দশবিধ ইন্দ্রিয় প্রত্যেকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য নিজ নিজ বিষয়ের জন্য লালায়িত হইতেছে, অতএব

এবাটীতে তোমার একগাছি শাকেরও আশা করা উচিত নহে।

উত্থানশক্তিরহিত অতি শিশু পুত্রের এইরূপ উক্তি শুনিয়া অত্যাশ্চর্যান্বিত সন্ন্যাসী গৃহ হইতে বহির্গত হইলে ঠিক সেই সময় শিবগুরু অযোধ্যা হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সব দেখিলেন, শঙ্কর গৃহের দাওয়ায় শুইয়া যাহা বলিতেছে তাহা সব শুনিলেন। শঙ্কর বলিতেছে তব স্তন্যং মন্যে ধরণীধরকন্যে হৃদয়তঃ পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব। দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়কবয়িতাম্॥ অর্থাৎ হে মাতঃ গিরিসুতে, তোমার হৃদয় হইতে সারস্বত পয়ঃপ্রবাহের ন্যায় অর্থাৎ কৈলাসশিখরস্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিন্ধুর ন্যায় স্তন্য প্রবাহিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ দ্রবিড়দেশীয় শিশু শঙ্করকে হে দয়াবতি, তুমি দয়া করিয়া স্তন্যপান করাইয়াছ। যে স্তন্যপানের প্রভাবে শঙ্কর শিবশঙ্করাদির মত শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত হইল।

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি
ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্॥

হে মাতঃ ভবানি, আমি তোমার দাস। তুমি আমার প্রতি দয়ার সহিত দৃষ্টিপাত কর, এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি কোনও ব্যক্তি "ভবানি তুমি" মাত্র এইটি বলে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ এই দুইটি পদের অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র চন্দ্রাদির মুকুটরত্ন দ্বারা নিরাজিত চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক।

পুনঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নোচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

হে মাতঃ, স্বয়ং শঙ্কর যদি শক্তিযুক্ত হন তাহা হইলেই তিনি সৃষ্ট্যাদি সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হন না। এই জন্যই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতা প্রভৃতি সকলেই তোমার অর্থাৎ আদ্যাশক্তি ভবানীর আরাধনা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ অবস্থায় মাদৃশ অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে। 82,014

ছয়মাসের বালকের মুখ হইতে এইরূপ অপূর্ব শ্লোক বা দেবীর স্তুতিপ্রকাশক বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকসকল শুনিয়া কিছুক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর শঙ্কর বলিয়া সম্বোধনকরতঃ শিবগুরু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন—শঙ্কর, তুমি কে? কিরূপে এই অপূর্ব বিজ্ঞানতত্ত্ব কোথা হইতে লাভ করিয়াছ তাহা আমাকে বল। আমি তোমার পিতা শিবগুরু, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি ছয়মাসের শিশু, তোমার মুখ হইতে এ কি শুনিতেছি ইহা কি দৈবী বাক্, ভৌতিকী অথবা আসুরী বাক্— আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বল বল তোমার স্বরূপটি কি, তাহা আমাকে বল।

পিত্রৈবং গদিতে তত্র পুনঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ॥ পিতা এইরূপ বলিলে শঙ্কর পিতাকে উদ্দেশ করিয়া পুনর্বার বলিয়াছিলেন—

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ ন ব্রাহ্মণ-

ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ। ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী ন বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ॥—আমি মনুষ্য দেবতা যক্ষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থাবলম্বী বা সন্ন্যাসী কিছুই নয়, আমি কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ।

ভগবত্যাঃ প্রসাদাম্মে ভবতাং ভক্তিযোগতঃ।
জ্ঞানিনাং দুর্লভং জ্ঞানং লব্ধমদ্য বিশেষতঃ॥

আপনাদের অর্থাৎ আমার পিতামাতার ভক্তিযোগের প্রভাবে জগজ্জননী ভগবতী দুর্গার দয়ায় জ্ঞানিগণেরও দুর্লভ জ্ঞান অদ্য আমি বিশেষভাবে লাভ করিয়া মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি।

এবং শ্রীশঙ্করেণৈব মহাভাষ্যবলেন হি।
বৌদ্ধধর্মনিরাসেন সদ্ধর্মঃ প্রকটীকৃতঃ॥
পৃথিব্যাং যে সুবিদ্বাংসো ব্রহ্মসূত্রবিচারকাঃ।
সন্তি শাঙ্করভাষ্যন্তু সর্বোপরি বিরাজতে॥

তৎপরে শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের মহাভাষ্য রচনা করিয়া সেই ভাষ্যশক্তির প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম নিরস্ত করিয়া ভগবদ্ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। পৃথিবীর সুপণ্ডিতবর্গ কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যটিই সর্বপ্রধান বলিয়া সর্বজনপ্রশংসিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্রোঽহং কিং বদিষ্যামি তন্মহত্ত্বং সুদুর্লভম্।
শঙ্কর শঙ্কর সাক্ষাৎ হ্যত্র লোকেষু গীয়তে॥

অতি ক্ষুদ্র আমি ভগবান শঙ্করের অতি দুর্গম মাহাত্ম্য কি বর্ণন করিব? যেহেতু শঙ্কর ইহজীবনে স্বয়ং পার্বতীপতি শঙ্করসদৃশ জ্ঞানী বলিয়া জনগণের নিকটে সুকীর্তিত হইয়া থাকেন।

শিব-স্তুতি

শ্রীপ্রসিত রায়চৌধুরী

রুদ্র তোমার নয়নবহ্নি উঠুক জ্বলি,
দিকে দিকে আজি দানবের হিংসায়
সত্য ও ন্যায় নীরবে সদাই হতেছে বলি,
ভরিছে ধরণী আর্তের কান্নায়।

প্রলয়পিনাক নাও হাতে তুলে মহেশ্বর,
ঝঞ্ঝামত্ত নৃত্যে কাঁপুক ধরা,
হানো হানো তব দীপ্ত ত্রিশূল ভয়ঙ্কর
হে নীলকণ্ঠ, বাঁচাও বসুন্ধরা।

মহাকাল তুমি দেখেছ অনেক কালান্তর,
প্রলয় আলোয় ভাঙাগড়া পলকের—
আজ ইতিহাসে লিখেছে ভারত স্বর্ণ-আখর
ভাগ্যের তারা শতাব্দী পারে উঠেছে ফের।

কুটিল হিংসা ক্ষিপ্ত নখরে মূর্তিমান,
ওগো ও দেবতা, দাও দাও বরাভয়,
তোমার নামের পুণ্যমন্ত্রে লভুক প্রাণ
বাঁচুক জগৎ তব নাম স্মরি,
ওগো মৃত্যুঞ্জয়।

সকল ভাবেরে অদ্বয় ভাবে করিয়া সমন্বয়,
শক্তি ও ত্যাগে, হয়েছে ও হবে এ ভারত
শিবময়॥

গান

শিবদাস

১

গানের একটা বিশেষ শক্তি আছে—ঠিক মতো গাওয়া হলে গান মনকে খুব একাগ্র করতে পারে। একটা জগৎ থেকে যেন টেনে নিয়ে যায় আর একটা জগতে। যে ভাবের গান, সেই ভাবে ভরিয়ে তোলে সারা মনটাই—সাময়িকভাবে অন্য কোন ভাব আর ঠাঁই পায় না সেখানে। আর খুব ভাল গান হলে, খুব ভাল লাগলে সে ভাবটা মনে থেকেও যেতে পারে বহুকাল। অবশ্য এ গুণটা গানের ঠিক নয়, গুণটা একাগ্রতার, যা আনার বহুবিধ উপায়ের একটা হল সঙ্গীত। আমাদের মন যেখানে খুব একাগ্র হয়, তার একটা ছাপ আজীবন মনে থাকেই। আজীবন কেন, একটা জীবন যখন শেষ হয়ে যায়—স্থূল দেহটা নষ্ট হয়ে যায়—তখন মন এসব ছাপ নিয়েই আর একটা শরীরে ঢোকে। সেগুলোকেই সংস্কার বলে।

গানের এই বিশেষ শক্তির জন্য সে যেমন আমাদের ভালও করতে পারে, তেমনি খারাপও করতে পারে অনেকখানি। যে ভাবের গান, মনে ছাপ দেয় সেই ভাবেরই, সেই ভাবেই মনকে একাগ্র করে। সেজন্য উচ্চ ভাবের গান হলে মনকে যেমন উঠিয়ে দেয় অনেকখানি, ভাব নীচু হলে তেমনি তাকে নামিয়েও দেয় ততখানি।

মনকে একাগ্র করানোর এই বিশেষ শক্তির জন্য ভগবানলাভের একটা উপায় হিসাবে সঙ্গীতকে বরণ করা হয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। গাওয়া এবং শোনা দুইকেই। সে সঙ্গীতে ভাবের সঙ্গে তালমানও ঠিক রাখা চাই, কেবল ভাবের ঘোরে গেয়ে চললেই হবে না। স্বামীজীর সেই ছোট্ট লেখাটি নিশ্চয়ই জানি আমরা। একটি ঠাকুর-দালানের এককোণে থামে হেলান দিয়ে চোবেজী ঝিমুচ্ছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী। আবার সেতার বাজাতে জানেন—সঙ্গীতজ্ঞ একজন। তিনি আবার 'দুই লোটা ভাঙ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও সদ্‌গুণশালী।' সহসা একটা বিকট নিনাদে চোবেজীর তন্দ্রা টুটে গেল। চোবেজী চোখ খুললেন এবং কোথা থেকে এ মর্মভেদী নিনাদ আসছে তা খোঁজার জন্য চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন 'এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপন-ভাবে বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে।' চোবেজী বিরক্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলি বাপু হে, ও বেসুর বেতাল কি চাৎকার ক'রছ!' উত্তর এল, 'সুর-তানের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।' চোবেজী বললেন, 'হুঁ, ঠাকুরজী এমনি আহাম্মক কি না। পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?'

এ রকম তালজ্ঞানহীন সুকণ্ঠহীন ভাবুক গায়ক আর এ রকম চোবেজী শুধু গল্পে নয় বাস্তবেও তো অনেক দেখা যায়। আমার

নিজেরই করুণ অভিজ্ঞতা আছে। আমিও সঙ্গীতচর্চা করেছিলাম একবার, আমার অবস্থাও গায়কটির মতো বা ততোধিক শোচনীয় হয়েছিল। সঙ্গীতের শখ জেগেছিল ছেলেবেলাতেই আর তা পূরণ করার প্রচেষ্টায় একবার হারমোনিয়ামে গান সাধতে গিয়ে প্রথম প্রচেষ্টাতেই কানমলা খেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসি। অপরাধের মধ্যে হয়েছিল, গলা সাধার সময় সা-রে-গা ইত্যাদির মধ্যে শব্দেই শুধু পার্থক্য হচ্ছিল, সুরে নয়—আমার যতখানি চীৎকার করার ক্ষমতা, একই ভাবে সবগুলির বেলাই তাই করছিলাম, বেলো-ও টানছিলাম প্রাণপণ শক্তিতে। তার পরের বার তবলা বাজানো শিখতে গিয়ে প্রথম প্রচেষ্টাতেই বাঁয়ার মধ্যে হাত ঢুকে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি সেটা উল্টে রেখে সেই যে দৌড়ে পালাই, আর ওমুখো হইনি। তারপর আর একবার চেষ্টা করতে হয়েছিল প্রাণের দায়ে, প্রয়োজনের খাতিরে—ভজন গাইতে হয়েছিল কিছুদিন একজায়গায়। বলা বাহুল্য, আমার অনুচর তিনজন ছিল সঙ্গীতে আমার চেয়েও বিশেষজ্ঞ। সেবারে, আমার মতে, আমি সাফল্য অর্জন করেছিলাম। ফলে দুঃসাহস বেড়ে গেল, প্রয়োজনের সীমারেখা ছেড়ে ভালভাল ভজন গান নিজে নিজেই গাইতে লাগলাম স্বরলিপি দেখে। আমার গলা থেকে যে সুরলহরী ছড়িয়ে পড়ত, তা যে চোবেজীর মতো বহু শ্রোতার পিত্ত দাহ করছে, তা তখন বুঝেও বুঝতাম না। একজন বন্ধু বললে, 'ধাষ্টামো করা ছেড়ে দাও হে!' আর একজন বললে, 'কেন শক্তির অপচয় করছ?' এসব কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না। শেষে গ্রাহ্য করতেই হল, যেদিন আমার ভজন শুনে একজন মন্তব্য করলেন, 'ঠাকুর আজ প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়েছিলেন।' শুনে প্রশ্ন করলেন আর একজন, 'কেন, কি ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'ঠাকুর স্বামীজীকে বললেন, চল, একটু বেড়িয়ে আসি; এরা ভজন গাইবে ঘরে তো টেকা যাবে না!'

৩

যথাযথ সুর-লয়-তালে গীত ভগবদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত ভগবানলাভের যে একটি উপায় এবং ভগবানলাভ করতে হলে সত্যকে যে আঁকড়ে থাকতে হয়—এই দুটি সত্য বিবৃত করা হয়েছে বরাহপুরাণের একটি আখ্যায়িকায়।

পুরাণগুলি সব বেদান্তদর্শনের রচয়িতা ব্যাসদেবই লিখেছিলেন; মহাভারতও। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে নিজের উপলব্ধ সত্য ঋষিরা বলে গেছেন। বেদান্তে তাঁদের কথাই লিপিবদ্ধ। বিভিন্ন ঋষির কথা বিভিন্ন উপনিষদে ছড়ানো। ব্যাসদেব সেগুলিকে একত্র করে, গুছিয়ে, সূত্রাকারে (খুব সংক্ষিপ্তাকারে) লিখে গেছেন। তারই নাম ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। যেন প্রাচীন ভারতের তপোবনে বিভিন্ন ঋষির জীবন-তরুশাখা হতে বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি-কুসুম চয়ন করে ব্যাসদেব সেগুলি নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি মালা গেঁথেছেন। উপনিষদ্ বা বেদান্তের চিন্তাই ভারতের উচ্চতম চিন্তা; ভারতের কেন, মানবজাতিরই। চিন্তার, উপলব্ধির সেই সর্বোচ্চ লোকে যিনি বিচরণ করেছেন, সেগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন, তিনি আবার মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি লিখতে, গল্প লিখতে গেলেন কেন? লিখতে গেলেন, যেজন্য যীশু গল্প বলতেন, বুদ্ধদেব গল্প বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প বলতেন, সেইজন্য—সর্বসাধারণ যাতে বুঝতে পারে, এমনভাবে তত্ত্বগুলিকে পরিবেশন করার জন্য; কেবল

তত্ত্বকথা শুনতে গেলে মাথা টনটন করে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প শুনতে পারে সবাই। ব্যাসদেব মহাভারতে সেকথা উল্লেখও করেছেন —'বেদকে ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি দিয়ে বর্ধিত করবে, তা নইলে সাধারণ মানুষ বেদকে প্রহার করবে'—অর্থাৎ বুঝতে না পেরে 'যত সব গাঁজাখুরি' ব'লে বেদের নিন্দা করে বেড়াবে। ভারতে আপামর জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তেরই সত্য যুগযুগ ধরে প্রচারিত হয়েছে বেদান্তের মাধ্যমে নয় (সে আর কয়-জন পড়ে বা শোনে বা বোঝে ?)—রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলিরই মাধ্যমে —গল্পেরই মাধ্যমে।

৪

বরাহপুরাণের গল্পটি হল এই :

বর্ষা ঋতু ধরণীকে 'ধৌত শ্যামল' করে দিয়ে আকাশকেও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তার নীল রঙকে গাঢ়তর করে রেখে যাবার পর শরৎ এসেছে। শরতের এই মনোরম পরিবেশে চাঁদিনী রাতের তুলনা নাই। প্রাকৃতিক পরিবর্তন আমাদের মনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে, যার যেমন ভাব তার ভেতর সে-ভাবকে নিবিড়তর করে তোলে।

এমনি এক শারদ চাঁদিনী নিশীথে, কার্ত্তিক শুক্লাদ্বাদশীর রাতে একাকী একজন ভক্ত চলেছেন। চলেছেন বীণা বাজিয়ে। জাতিতে তিনি চণ্ডাল, কিন্তু পরম ভক্ত। সবাই ঘুমিয়ে যাবার পর গভীর রাতে প্রতিদিনই তিনি এমনি বীণা নিয়ে ঘর ছেড়ে আসেন, একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে সারারাত ধরে বীণা বাজিয়ে শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তন করেন। বছরের পর বছর গত হয়েছে, তাঁর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি একদিনও।

সেদিন কিন্তু পথে বিপদ ঘটল। একটি রাক্ষস এসে তাঁকে আক্রমণ করল। রাক্ষস বলবান, কাজেই তার হাত থেকে মুক্তিলাভের প্রশ্নই ওঠে না। অবস্থা বুঝে চণ্ডাল দুঃখে শোকে কাতর হয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে এভাবে জোর করে ধরলে কেন ?' তাঁর দুঃখের কারণ জীবন যাবে ব'লে নয়, ভগবানের আরাধনা করতে যাচ্ছিলেন সেটা হল না ব'লে। রাক্ষস বলল, 'ধরেছি কেন তা আবার বলতে হবে নাকি ? আমি রাক্ষস, মানুষের মাংস খাই। বিধি তো সকল প্রাণীরই খাবার জুটিয়ে দেন, আজ আমার খাদ্যরূপে তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন। আজ তোমার রক্ত-মাংস-চর্বি সবই খাব—খুব তৃপ্তি নিয়েই খাব—দশদিন অনাহারে আছি—খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

চণ্ডাল বললেন, 'তা বিধি যখন এ সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন, আমাকে খাবে বৈ কি। অবশ্যই খাবে। তবে এখন আমাকে একটু ছেড়ে দাও—রাত জেগে হরিনাম-সংকীর্তন করা আমার ব্রত—আজও তাতে ব্রতী হয়েছি—সংকীর্তন শেষ করে ফিরে আসবো তোমার কাছে, তখন খেয়ো।'

রাক্ষস বললে, 'বাঃ! বাঃ! বেশ মিছে কথা বলে ধাপ্পা দিতে শিখেছ দেখছি—রাক্ষসের মুখ থেকে ছাড়া পেয়ে আবার সেখানে ফিরে আসবে বলছ! ওসব ধাপ্পা চলবে না—আমার হাতে পড়ে আবার ফিরে যাবে ?—যমের বাড়ী এসেছ, বুঝলে ?—যমের বাড়ী গিয়ে মানুষ আর ফিরে যায় না।'

চণ্ডাল বললেন, 'দেখ রাক্ষস, আমি চণ্ডাল হয়ে জন্মেছি বটে, তবে আমি নীচমনা নই—আমি সত্যনিষ্ঠ যা বলছি তাই-ই করব। সত্যি বলছি, রাতজেগে হরিনাম-সংকীর্তন করে আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।

আমি ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করছি, সত্যকে আঁকড়ে না থাকলে তাঁকে পাবো কি ক'রে?—

সত্যমূলং জগৎ সর্বং
লোকাঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সত্যেন সিদ্ধিং প্রাপ্তা হি ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥
সত্যেন গম্যতে স্বর্গো মোক্ষঃ সত্যেন চাপ্যতে।
সত্যেন তপ্যতে সূর্যঃ সোমঃ সত্যেন রজ্যতে॥

—সত্যই জগতের মূল—বিশ্বভুবন সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সত্যকে অবলম্বন করেই ব্রহ্মবাদী ঋষিরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সত্যের দ্বারা; সত্য বলেই মানুষ স্বর্গে যায়, সত্য বলেই মোক্ষলাভ করে, সত্যকে অবলম্বন করেই সূর্য-চন্দ্র তাপ ও কিরণ দিচ্ছে। আমি সত্য হতে ভ্রষ্ট হব না, যা বলেছি তা-ই করব, ফিরে আসবই।'

রাক্ষস চণ্ডালের কথায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে দিল। চণ্ডাল যথাস্থানে গিয়ে সারারাত সংকীর্তন করে কাটালেন। নিশান্তে সংকীর্তন-শেষে দ্রুতপদে ফিরে চললেন রাক্ষসের কাছে। পথে পরিচিত একজন জিজ্ঞেস করল, 'এত দ্রুতবেগে কোথায় যাচ্ছেন?' চণ্ডাল সব কথা বললেন। শুনে লোকটি বলল, 'সর্বনাশ! আপনি আর সেখানে যাবেন না। যাবো বলছেন তা কি হয়েছে, জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যাকথা বললে দোষ হয় না।' চণ্ডাল বললেন, 'সত্য হতে জীবনে কখনো ভ্রষ্ট হব না, এই আমার ব্রত। আপনার কথামতো চলতে আমি পারব না। নমস্কার!'—এই বলে চণ্ডাল রাক্ষসের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'আমি এসেছি। তুমি ক্ষুধার্ত, দেরী করে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি আমার দেহ খেয়ে ফেল। আমিও দেহ ছেড়ে বিষ্ণুলোকে চলে যাই।'

চণ্ডাল সত্যসত্যই ফিরে এসেছেন দেখে রাক্ষস তো অভিভূত হয়ে গেল। সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়, এমন মানুষও আছে তা হলে! সে বলল, 'তুমি জাতিতে চণ্ডাল, শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছুই জান না, অথচ এত উঁচু মন তোমার!'

চণ্ডাল বললেন, 'আমি শাস্ত্র জানি না, ধর্মকর্মও জানি না, তবে সত্যকে আঁকড়ে রয়েছি আজীবন।' সেই সঙ্গে রাত জেগে হরিসংকীর্তনের ব্রতের কথা তো রাক্ষস আগেই শুনেছিল।

রাক্ষস বলল, 'একটা কাজ কর, তোমার হরিসংকীর্তনের ফল আমায় দাও। তাহলে তোমায় আর খাব না, ছেড়ে দেবো।'

চণ্ডাল বললেন, 'ভালরে ভাল, সে কথা তো ছিল না। আমার দেহ তুমি খাবে এই কথা ছিল। সংকীর্তনের ফল দেবার কথা তো ছিল না।'

রাক্ষস বলল, 'তা ছিল না ঠিক, তবু দাও। তোমায় পুণ্য দিয়ে এই নীচ অধমকে উদ্ধার কর। আমি এজন্মে রাক্ষস হলেও পূর্বজন্মে মানুষ ছিলাম, ব্রাহ্মণ ছিলাম। মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানতাম না, ভুল উচ্চারণ করতাম, তবু লোভের বশে যাজন করতাম, দুষ্ট লোকেরও গৃহে যাজন করতে ছাড়তাম না। আরো নানা কর্মদোষে রাক্ষস হয়েছি। তোমার গীতফল পেলে, সব না পাই একরাত্রির গীতফল পেলেও আমি আমার শুভসংস্কার ফিরে পাব। তুমি দিতে অস্বীকার কোরো না।'

চণ্ডাল একথা শুনে সানন্দে সম্মত হলেন। চণ্ডালের পুণ্যে রাক্ষস অধম জীবন থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

উপাখ্যান-শেষে বরাহদেব বলছেন, "যদি

কেউ রাত জেগে আমার নামগান করে, তার ফলেই আসক্তিমুক্ত হয়ে সে আমার লোকে চলে যায়।"

সংসারাসক্তিই বারংবার জন্মমৃত্যুর কারণ। ভগবানের নামকীর্তনে লেগে থাকলে মন ক্রমশঃ শ্রীভগবানে একাগ্র হয়ে ভগবদানন্দের অমৃতাস্বাদ লাভ করতে থাকে। আর যতই তা পায়, বিষয়ানন্দ ততই তুচ্ছ বোধ হতে থাকে তার কাছে, কাজেই বিষয়াসক্তিও কমতে থাকে, শেষে লোপ পায়। যতক্ষণ কোন বিষয়ে রসবোধ, ততক্ষণই তাতে আসক্তি। রসবোধ চলে গেলে আর আসক্তি থাকবে কি অবলম্বন ক'রে?

মিছরীর সরবতের আস্বাদ একবার পেলে চিটেগুড়ের পানা কে আর খেতে চাইবে? যতক্ষণ না মিছরীর সরবতের আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণই চিটেগুড়ের পানাকে পরম উপাদেয় বলে মনে হয়।

বিষয়ানন্দের চেয়ে ভজনানন্দ বড়। তার চেয়েও বড় ভগবানলাভের আনন্দ। ভগবদ্-ভাবের গান, সংকীর্তন, সেই চরম পরম আনন্দের দিকেই মনকে টেনে নিয়ে যায়।

একা হও!

শ্রীমতী বিভা সরকার

এ সংসার রঙ্গশালে একা হও নিত্য মনে মনে
আমিত্ব যা আছে তব অর্ঘ্য দাও সেই নিরঞ্জনে!
একা হও তারপর প্রাণপদ্ম সঁপি সে বল্লভে
নিঃশেষে হারায়ে যাও জীবনের এই মহোৎসবে।
বেদনা হইবে সোনা দুঃখ হবে নির্মাল্য পরম
মানস কমলে নিত্য কি আশ্বাসে জাগে অনুপম!

তামসী রাত্রির শেষে যে আশ্বাসে জাগে শুকতারা
যে আশায় মোহানায় নদী হয় নিত্য আত্মহারা!
শুনিতে কি নাহি পাও বেজে চলে অনন্ত বাঁশরী
নিত্যদিন শ্রান্তিহীন তোমারেই মনে মনে স্মরি!
মহাপ্রাণ জেগে আছে এ বিশ্বের সকলি ব্যাপিয়া
কণামাত্র তুমি তার ধন্য হও তাঁহারে যাচিয়া
মৃত্যু সে অমৃত হবে সোনা হবে সকল বঞ্চনা
সব ফেলে একা হও জাগাও চেতনা!

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

"Indian civilisation evolved an admirable political system, built solidly and with an enduring soundness, combined with a remarkable skill the…, principles and tendencies to which the mind of man has leaned in its efforts of civic construction and escaped at the same time the excesses of the mechanising turn which is the defect of modern European state".

—Sri Aurobinda

উপক্রমণিকা :

রাষ্ট্রদর্শনের পরিস্ফুটন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক হারনশ (F.J.C. Hearnshaw) বলেছেন, আমরা যতদূর জানি এবং আমাদের পক্ষে যতদূর জানা সম্ভব তা থেকে বলতে পারি বিশুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত রাষ্ট্রদর্শনের (political philosophy) উদ্ভব ঘটেছিল প্রচীন গ্রীসে। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন কালে চীনদেশ ও ভারত রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিল, কিন্তু এই আলোচনা ছড়িয়ে আছে ঐ দুই প্রাচ্য দেশের অসংখ্য পবিত্র গ্রন্থে। যেহেতু অসংখ্য সূত্র থেকে প্রাচীন ভারত ও চীন দেশের রাষ্ট্রচিন্তা খুঁজে বের করতে হয় সেইহেতু বলা যায় যে, প্রাচীন কালে ঐ দুই দেশের রাষ্ট্রচিন্তা বিশুদ্ধ বা সুশৃঙ্খল কোনটাই ছিল না—অর্থাৎ এই দুই প্রাচীন সভ্যতায় ঠিক রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভব ঘটেনি।[১]

অধ্যাপক হারনশ-র এই স্বীকৃতি প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা সম্বন্ধে বিদেশীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফল। তবুও কিন্তু স্বীকৃতিটি অর্ধ-স্বীকৃতির বেশী নয়—এতে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালে ভারতে যে রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভব ঘটেনি তার উল্লেখও সুস্পষ্টভাবে করা হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে বক্তব্য হলো যে, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল যে রাষ্ট্রদর্শনের কাঠামো রচনা করেছেন, তাই কি রাষ্ট্রদর্শনের একমাত্র রূপ? আমাদের শুক্রাচার্যের নির্দেশ যে, নৃপতি প্রথমে নিজেকে নিয়মানুবর্তী ক'রে পরে অপরকে নিয়মের অধীনে আনয়নের প্রচেষ্টা করবেন—তা কি রাষ্ট্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না? বস্তুত দেখা যায়, প্রাচীন গ্রীসের মতো প্রাচীন ভারতেও রাজনৈতিক বিষয়সমূহ ব্যাপক অর্থে দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল। তাই 'ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন' কথাটি ব্যবহার করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে সুসম্বদ্ধতা বা ক্রমানুবর্তিতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মাত্র এই কারণেই ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনকে অস্বীকার করা বা হেয় মনে করা চলে না।

সেদিন পর্যন্ত অবশ্য তাই করা হত—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলতেন যে, প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং যেটুকু রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাকে 'বর্বরসুলভ' বলেই

১ Development of Political Ideas, 1-2

অভিহিত করতে হয়।

এর চেয়ে বেশী ভ্রান্ত বা হাস্যকর অভিমত আর কিছু হতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যদি বর্বরসুলভ না হয় তবে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাও বর্বরসুলভ নয়। ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অধ্যাপক ব্যাশাম (Prof A. L. Basham) বলেন, মানুষে মানুষে ন্যায়- ও মানবতা-প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ভারত সকল দেশকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এমন কোন প্রাচীন সভ্যতার কথা আমরা জানি না যেখানে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল এত অল্প এবং তাদের অধিকার ছিল বিধিশাস্ত্র দ্বারা এরূপ সংরক্ষিত।[২] পরাজিত শত্রুর প্রতি এত উদার ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আমাদের জানা নেই।[৩]

অধ্যাপক ব্যাশামের এই অভিমত যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি—যাকে সভ্যতার সত্তা বা প্রাণ বলে অভিহিত করা হয়, উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবেই প্রযোজ্য, তা বহির্বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এর মধ্যেই নিহিত আছে ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি। সহজ কথায় বলতে গেলে, আজ উন্নাসিক পাশ্চাত্য জগৎ একথা মেনে নিয়েছে যে, প্রাচীন ভারতেও রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভব ঘটেছিল, এবং এই রাষ্ট্রদর্শন মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

পুনরুদ্ধার, মৌলিক অবদান এবং গবেষণা :

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে বিদেশীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সূচনা হয় নবযুগের প্রারম্ভ থেকেই। বলা যায়, স্যার উইলিয়ম জোনসের মনুসংহিতার অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মোড় ঘুরতে সুরু করে। তবে ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে ঠিক প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক দিন সময় লেগেছিল, এবং এই প্রতিষ্ঠাকার্যে সহায়তা করেছিল ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের মৌলিক অবদান এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ।

মৌলিক অবদানের পথিকৃৎ হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে সংক্ষেপে 'উপনিষদের বিশ্বজনীনতার পরিপূর্ণতা ও উপলব্ধি' বলে বর্ণনা করা যায়।[৪] তা ছাড়া তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী। এই স্বাধীনতাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা যায়—এর লক্ষ্য ছিল জীর্ণ পুরাতন বিকৃত প্রতিবন্ধক থেকে ব্যক্তির মুক্তি।[৫]

রাজা রামমোহনের পরই কিন্তু আমরা চলে আসতে পারি লোকমান্য তিলকে (১৮৫৬-১৯২০), কারণ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) এবং বিচারপতি রাণাডে (১৮৪২-১৯০২) যথাক্রমে ছিলেন মূলত ধর্ম-সংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারক—রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এঁদের বিশেষ কিছু অবদান ছিল না।

তিলকের অবদান সংখ্যায় মোটামুটি দুটি : প্রাচীন ধর্মনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং

২ এই কারণেই বোধহয় মেগাস্থিনিস লিখেছিলেন যে, ভারতে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত নেই।

৩ Wonder That Was India

৪ D. S. Sarma : Renaissance of Hinduism in the Nineteenth and Twentieth Centuries

৫ D. M. Brown : White Umbrella

বিশ্বজনীন আদর্শের উপলব্ধির প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্য ও হিন্দু আদর্শের মিলনের ফলেই তিলকের রাষ্ট্রচিন্তা এইভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

তিলকের পরই কিন্তু যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন যে, স্বামীজীকে কেউ সাহিত্যিক বলবেন না, তবে তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব লেখার মধ্যে ঢুকে একরকম অপূর্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে।[৬] তেমনি স্বামীজীর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ঢুকে অনেকাংশে মৌলিক রাষ্ট্রদর্শনেরও সৃষ্টি করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের পর আছেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজী।

এই কজন ছাড়া যাঁদের নাম উল্লেখ না করলে মৌলিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাঁরা হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আধুনিক যুগের এই রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের সম্বন্ধে আলোচনা পরে করব।

গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে আছে জয়াসয়ালের (K. P. Jayaswal) 'হিন্দু রাষ্ট্র-ব্যবস্থা' (Hindu Polity), অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'হিন্দু রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস' (A History of Political Theories), ভাণ্ডারকারের 'প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্রব্যবস্থা' (Ancient Hindu Polity), বেণীপ্রসাদের 'প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র' (State in Ancient India), অঙ্গারিয়ার 'হিন্দু রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রকৃতি ও ভিত্তি' (The Nature and Grounds of Political Obligation in the Hindu State), পণ্ডিত-প্রবর কাণের (Pandurang Vaman Kane) 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' (History of Dharmasastra), রামস্বামী আয়ারের 'ভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব' (Indian Political Theories), আনন্দকুমার স্বামীর 'ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার তত্ত্বে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও ইহলৌকিক ক্ষমতা' (Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government), অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'প্রাচীন ভারতে সঙ্ঘজীবন' Corporate Life in Ancient India), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'প্রাচীন ভারতীয় আইনের ক্রমবিকাশ' (Evolution of Ancient Indian Law), অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের 'ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সাধারণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান' (Democratic Ideals And Republican Institutions in India), 'সৃজনশীল ভারত' (Creative India) ও 'শুক্রনীতি' (Sukranity), স্বামী অভেদানন্দের 'ভারতীয় সংস্কৃতি' (India and Her People)[৭] আয়েঙ্গারের 'রাজধর্মকাণ্ড' (Rajdharmakanda) এবং রাধাকৃষ্ণনের 'হিন্দু জীবনদর্শন' (Hindu View of Life)। এছাড়াও আছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি মূলগ্রন্থের বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা।

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের প্রকৃতি :

বলা হয়েছে, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা সনাতন ও ঐতিহ্যময় হলেও এতে সুসংবদ্ধতা ও ক্রমানুবর্তিতার অভাব দেখা যায়। এর মূলে আছে

---

৬ সাহিত্য-সঙ্কট : ভূমিকা

৭ স্বামী অভেদানন্দ বঙ্গানুবাদের ঐরকম নামকরণ করেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উত্থানপতন। যুদ্ধবিগ্রহ পরাধীনতা বা অন্য কোন কারণে যখনই বৃহত্তর সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সুরু হয়েছিল, তখনই যেন রাষ্ট্রচিন্তাতেও ছেদ পড়েছিল। শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হয়েছিল রাষ্ট্রচিন্তা। এই কারণে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের শান্তিপর্বেই আমরা পাই প্রকৃত রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় এবং ব্রিটিশ যুগে রাষ্ট্রচিন্তার সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। মেকিয়াভেলির (Mechiavelli) মত বিশৃঙ্খলার যুগে ব্যাধিগ্রস্ত ইতালীর নিরাময়ের জন্য 'প্রিন্স' (Prince) রচনার প্রচেষ্টা ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ কখনও করেননি। প্রিন্সের সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও শৃঙ্খলার যুগে রচিত বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

বৃহত্তর সমাজজীবনের উত্থানপতনের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার যে একরকম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়,তার কারণানুসন্ধান করতে হবে ভারতীয় জীবনদর্শনেরই মধ্যে। এই জীবনদর্শনের রূপ অখণ্ড এবং একে হিন্দুর জীবনদর্শন বলে অভিহিত করা যায়। গান্ধীজীর ভাষায়, হিন্দুর জীবনদর্শনকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কোনরকম কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করা হয়নি। স্যর রামস্বামী এবং অন্যান্য পণ্ডিত দেখেছিলেন সনাতন ভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ভারতীয় দর্শনেরই অঙ্গীভূত এবং পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদের (doctrines of rebirth and Karma) পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া ভারতীয়দের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না। জীবনের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ব্যাপার যখনই ইহলৌকিক অবস্থার উন্নয়ন সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিককে হতাশ করে তুলেছে তখনই তিনি একে কর্মফল মনে করে পুনর্জন্মের মাধ্যমে নবজীবনের পথের সন্ধান করেছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেউ কেউ পলায়নী মনোবৃত্তি (escapism) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ চিন্তাবিদের মতে, এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হিন্দুর জীবনদর্শনের মধ্যে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'হিন্দুরা রাজনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে পার্থক্য করেনি। তাদের বিশ্বাস, ভাল কাজ করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহজীবনে দুঃখভোগ করিতে হইলে হিন্দুরা তাকে পূর্বজন্মের কর্মফল বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, সুতরাং কোনরকম অসন্তোষ প্রকাশ করে না ; বরং ধৈর্য, ক্ষমা, নিরহঙ্কার প্রভৃতির অনুশীলনের মাধ্যমে ইহজীবনে সুকৃতি করিতেই চেষ্টিত থাকে। ইহাতে সমাজে বিদ্বেষাদি ভাব বিনষ্ট হইয়া সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করে।'[৮]

সুতরাং প্রাচীন যুগের হিন্দুরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চাননি, তাঁরা নৈতিক জীবনদর্শনের প্রতিবিম্বে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতেই চেয়েছিলেন। ছয় শতকের বিখ্যাত গল্পকার দণ্ডী তাঁর 'দশকুমারচরিতে' সরল অনাড়ম্বর কিন্তু সুখময় জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করা যায়। এই আদর্শ দ্বারা অনুরঞ্জিত সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনও ছিল সুনীতি সুরুচি শান্তি শৃঙ্খলা ও সুন্দরের অভিমুখে প্রসারিত। (ক্রমশঃ)

---

৮ সামাজিক প্রবন্ধ

উদ্বোধন

বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র। ১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ১লা মাঘ। ১৩০৫ সাল।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক। স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "উদ্বোধনের" প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।** এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা কার্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করা হয়। **।

* *
*

সূচী

—0—

৬

বিশেষ বিজ্ঞাপন

মহোদয়-গণ,

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও "উদ্বোধনের" গ্রাহক-শ্রেণী-ভুক্ত হন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিজেদের নাম ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে গ্রাহক-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া লইব ও ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া দিব।

স্বামী শুদ্ধানন্দ

সহকারী সম্পাদক, "উদ্বোধন"।

নং ১৪, রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কম্বুলেটোলা,

শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রণীত

রাজ-যোগ

মূল ইংরাজী ভাষা হইতে শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক অনুবাদিত। এই গ্রন্থ ডিমাই ৮ পেজী ৩০ ফর্মায় শেষ হইবে; আইভরী ফিনিশ কাগজে ও একের নম্বর কালীতে ছাপা হইতেছে। সডাক মূল্য ১৷৶০ মাত্র। এই গ্রন্থ এখনও উদ্বোধন-প্রেসে যন্ত্রস্থ; মাঘ মাসের মধ্যে যাঁহারা ইহার দরুন অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদিগের এক টাকা দুই আনা মাত্র পাঠাইলেই হইবে; ফাল্গুন মাসে গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবে; প্রস্তুত হইলেই গ্রাহকগণের নিকট পুস্তক পৌঁছিবে; ডাক মাশুল পৃথক লাগিবে না। মূল্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা—স্বামী শুদ্ধানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়; নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলেটোলা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কভার, ৪র্থ পৃষ্ঠা। ১ম সংখ্যার কভার আমাদের নিকট নাই, সেজন্য ২য় সংখ্যার কভার হইতে লওয়া হইল।—সম্পাদক

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা মাঘ। [১ম সংখ্যা।]

উদ্বোধনের

প্রস্তাবনা।

—০—

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত)

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্ব্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস বলিলে সচরাচর রাজা রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম ক্রোধ ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায়; তাহা হয়ত প্রাচীন ভারতের একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্য্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্ অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাব পরিচালিত একটী অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার প্রতিপদ-বিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা, লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ-কর্তৃক প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচারক 'উদ্বোধন' পত্রিকা এবং তাহার প্রকাশের জন্য স্থাপিত 'উদ্বোধন কার্যালয়'-এর সহিত আমাদের দেশে জাতীয়তার জাগরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেজন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম চারি বৎসরের—স্বামী বিবেকানন্দের স্থূলদেহে ইহার সহিত জড়িত থাকা কালের, অন্ততঃ প্রথম বর্ষের (মাঘ ১৩০৫—পৌষ, ১৩০৬) সব সংখ্যাগুলিরই পুনর্মুদ্রণ করিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বহুদিন হইতেই অনুভব করিতেছিলাম। ৭৪ বৎসরের পুরাতন কাগজ স্বাভাবিক নিয়মেই জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, উহার সংরক্ষণও এভাবে সহজ হইবে; এজন্য অবশ্য মাইক্রোফিল্ম্ প্রভৃতি সংরক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থার কথাও ভাবা হইতেছে।

আমরা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এই সংখ্যা হইতেই উহার প্রথম বর্ষের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ করিলাম। যতদিন এবং যতখানি সম্ভব উহা করিয়া যাইবার ইচ্ছা রহিল। প্রথম কয়েকটি সংখ্যা সামগ্রিকভাবে পুনর্মুদ্রণের পর যেসব প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও বহুল-প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির শিরোনামাদির উল্লেখ মাত্র করিয়া পুনর্মুদ্রণ সংক্ষিপ্তাকারেও করা হইতে পারে।

'উদ্বোধন' প্রথম নয় বৎসর পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হইয়া দশমবর্ষ হইতে মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথমে ইহার আকার ছিল ডিমাই ৳, আমরা স্থানসংক্ষেপের জন্য উদ্বোধনের বর্তমান আকারেই ইহার পুনর্মুদ্রণ করিতেছি। এজন্য প্রচ্ছদপটের সূচীর সহিত ইহার পত্রাঙ্ক মিলিবে না। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটটি আমাদের নিকট নাই (কাহারো নিকট যদি থাকে, দয়া করিয়া জানাইয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন); সেজন্য প্রথমবর্ষের পরবর্তী সংখ্যাগুলির প্রচ্ছদের অনুরূপ করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদপটের ফটো যথাস্থানে দেওয়া হইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে আর প্রচ্ছদ দেওয়া হইবে না।

—সম্পাদক

এই জাতি, মধ্য-আসিয়া, উত্তর ইয়োরোপ বা সুমেরুসন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে, শনৈঃপদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থ-ভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূত-দেশবিশেষনিবাসী একটী বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এইসকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এসকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে, যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে—সেইস্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির—চিন্তারাশির—উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় সূত্রে, ভারতীয় চিন্তা-রুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে। হয়ত আমাদের ভাগ্যে সার্ব্বভৌমিক পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বিভূষিত একটী ক্ষুদ্রদেশে, অল্পসংখ্যক অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশী-সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব্বক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।

অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত ; ইঁহাদের নিজনাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্য্যশালী জাতি এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্য্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেইস্থানেই প্রাচীন গ্রীশের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক ; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন-গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীশের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী ; এমন কি একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের সৃষ্টি।"

সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্ব্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয় ; যখনই ঐপ্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্তোলিত

সভ্যতারেখা সুদূরসম্প্রসারিত, এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরাণী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্দ্ধভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে; এবং বোধ হয় আধুনিক সময়ে পুনরায় ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্যকার্য্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্ব্বচেষ্টা অন্তর্ম্মুখী, অপরের বহির্ম্মুখী; একের প্রায় সর্ব্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোককল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্ত্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান।

ইউরোপ আমেরিকা, যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্য্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্ব্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে পুনর্ব্বার রন্তিদেবের কীর্ত্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত একটী বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টবিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে? অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌনসম্বন্ধ মনুক্ত ধর্ম্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণ মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমন কি, একই দেশে, জাতি এবং বংশ ভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা-দৃষ্টে মীমাংসা আরও

দূরাহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটী কোটী নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্ম্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্য-হীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিতচর্ব্বণে, এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম; সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না; সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেইপ্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের

ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনের" জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যাতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই—

এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে—আসাধারণ সকলে তাঁহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

কত পর্ব্বতশিখর হইতে কত চিরহিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুরতরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ, দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বিমস্তিষ্ক হইতে প্রসৃত হইয়া—নর-রঙ্গক্ষেত্র কর্ম্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোত-বাহন ও তড়িৎসহায় ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে—ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে, এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃতজল হইতে মৃতজীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই, বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে, ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য "উদ্বোধন" সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে অহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধি-বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।

স্বামী বিবেকানন্দ-
প্রণীত

রাজ-যোগ।

(আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ রাজযোগ সম্বন্ধে কতিপয় ইংরাজী বক্তৃতা দেন এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রের ইংরাজী ভাষ্য করেন। সেই বক্তৃতাগুলি ও ইংরাজী ভাষ্য, একত্রে সংকলন করিয়া পুস্তকাকারে, ইংলণ্ডস্থ লংম্যান কোম্পানীরা বাহির করেন। পুস্তকের নাম দেওয়া হয়—রাজযোগ। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রাজযোগের অনেক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইয়ুরোপের যাবতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বামী বিবেকানন্দকৃত রাজযোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিকাতাতে নিউম্যান ও থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীরা যতবারই বিলাত হইতে উক্ত রাজ-যোগ আনয়ন করিয়াছেন, ততবারই দিনকতকের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ, অতি সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় রাজযোগ অনুবাদ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণের তৃপ্তিসাধনের জন্য, সেই অনুবাদিত রাজযোগের ১ম অধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে উদ্বোধনের প্রবন্ধস্বরূপে দিলাম। রাজযোগের বিজ্ঞাপন উদ্বোধনে কভারে (মলাটের উপর) দেওয়া গেল। তাহা পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইবেন।)

মনকে বহির্বিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতই বহির্ম্মুখী; কিন্তু ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান, কিম্বা দর্শন বিষয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে প্রমেয় একটী আভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে প্রমেয়। মনস্তত্ত্ব অন্বেষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনস্তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিবার কর্ত্তা। আমরা জানি যে, মনের এমন একটী ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা উহা নিজের ভিতরে যাহা হইতেছে, তাহা দেখিতে পারে। আমি তোমাদের সহিত কথা কহিতেছি; আবার ঐ সময়েই জানিতেছি যে আমি যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—যেন আমি আর একজন, আর আমি যে কথা কহিতেছি, তাহা আমি জানিতেছি ও শুনিতেছি। তুমি এক সময়ে কার্য্য ও চিন্তা উভয়ই করিতেছ কিন্তু তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া, তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা দেখিতেছে। মনের সমুদায় শক্তি একত্রিত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অন্ধকারময় স্থানসকলও তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই একাগ্রমন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যসকল প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভূমিতে উপনীত হইব। তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হইবে। তখনই আত্মা আছেন কিনা, জীবন কেবল এই সামান্য জীবিত কালেই পর্য্যাপ্ত বা অনন্তব্যাপী, ও ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না, আমরা স্বয়ং দেখিতে পাইব। সমুদায়ই আমাদের জ্ঞান-চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে। রাজযোগ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর। ইহাতে যত উপদেশ আছে তৎসমুদায়ের উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ, মনের একাগ্রতা-সাধন, তৎপরে উহার ভিতর কতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইতেছে, তাহার জ্ঞান-লাভ, তৎপরে [ক্রমশঃ]

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

Ramkrishna Mission Ashram
Sargachi, P. O. Mahula (Murshidabad)
January 10th, 1936

শ্রীমান্ সুবোধ,

তোমার ২২শে পৌষের পত্রখানা পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। তুমি মনে বেদনা পাইয়াছ জানিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি তোমার প্রতি মোটেই অসন্তুষ্ট হই নাই। তবে কাহাকেও দীক্ষা দিতে হইলে আমার মনের একটা preparedness চাই—এইজন্য পূর্ব হইতেই জানা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সেদিন তোমার দীক্ষা হয় নাই বলিয়া নানারূপ অমূলক কল্পনা করিয়া বৃথা মানসিক অশান্তি ভোগ করিও না। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাগত হইয়া তাঁহার স্মরণ, মনন করাই প্রকৃত দীক্ষা—আর সবই বাহ্যিক। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সরল ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে চেষ্টা কর—যখন যাহা দরকার তিনিই যথাসময়ে সব যোগাইয়া দিবেন—ঐ জন্য তোমাকে অস্থির হইতে হইবে না। জীবন-গঠনই মুখ্য উদ্দেশ্য। মন মুখ এক করিয়া প্রাণপণে জীবনগঠনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর। তবেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। জীবনগঠনের দিকে নজর নাই—কেবল দীক্ষাগ্রহণ—ইহাতে তেমন কিছুই হয় না—ইহা নিশ্চয় জানিবে। শ্রীভগবান তোমার জীবন সুখময় ও শান্তিময় করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা। আমার শুভাশিস্ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
অখণ্ডানন্দ

(২)

শ্রীদুর্গাসহায়

সারগাছী আশ্রম, ৩।৬।৩৬

পরমকল্যাণবরেষু,—

তোমার ৩০।৫ তারিখের পত্র পাইলাম। আশ্রমের পুকুরের কাজ শেষ হইয়াছে এবং মন্দিরের কাজ অগ্রসর হইতেছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আমার শরীর বিশেষ ভাল নয়। ইন্‌সুলিন্ ইনজেকসন রোজই নিতে হয়। পথ্যেরও খুব বাঁধাবাঁধি চলিয়াছে। আশ্রমের অন্যান্য সবাই ভাল আছে। মহোৎসব এবার এখানে সমারোহে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সর্বদা তোমার অন্তরে ঠাকুর বর্তমান আছেন, এইরূপ অনুভব করিতে চেষ্টা কর, এবং পবিত্র ভাবে ন্যায়ের পথে কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হও। ঠাকুর বাকী সবই পূরণ করিয়া দিবেন। ইহাতে কখনও ভুল হইবে না। ভয় করিও না। দ্বিধা করিও না। আমার অন্তরের আশীর্বাদ এবং স্নেহ জানিবে। তোমার যখন সুযোগ হইবে তখনই আসিয়া আবার দেখা করিতে পারিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
অখণ্ডানন্দ

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর স্মরণিকা—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা। ১৪বি, গড়িয়াহাট রোড সাউথ, কলিকাতা-৩১। পৃষ্ঠা-৩২। মূল্য এক টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুদুর্লভ সান্নিধ্য-লাভের যাঁহারা অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় পরমদ্যুতিমান ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের চরিত্র গ্রন্থখানিতে সুললিত ছন্দে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই ভক্তিরসাপ্লুত গীতি-পুষ্পার্ঘ্য ভক্তগণের নিকট সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিকরগণ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়, তাঁহাদের পুণ্য চরিত্র অনুধ্যান করিলেই সর্বভাবময় করুণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে মন প্রাণ ভরিয়া উঠে। পুস্তকখানিতে মহাপুরুষগণের চরিত্রানুধ্যানের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত—শ্রীল বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর-বিরচিত (আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড)। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক: শ্রীনন্দকৃষ্ণ মল্লিক, ৪১।১বি, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা-২৭। পৃষ্ঠা ১১৫+৬; সেবানুকূল্য চার টাকা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে:

'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে॥'

বস্তুত: নিত্যানন্দ-প্রভুর চরিত্র সমুদ্রের মতই দুরবগাহ, যতই অনুধ্যান করা যায় ততই যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে হৃদয় মন ভক্তিরাজ্যের কোন্ এক রহস্যপূর্ণ স্তরে উঠিতে চায়!

মহাকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার অপূর্ব কবিত্বশক্তি ভাব ও ভাষার সম্মিলনে অনবদ্য চরিত্রাঙ্কন করিয়া ভাবী কালের ভক্তগণের জন্য এই অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত: আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড।

আদি খণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব হইতে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত মিলন পর্যন্ত, মধ্য খণ্ডে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত মিলন হইতে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের যুক্তিপ্রদর্শন পর্যন্ত এবং অন্ত্য খণ্ডে তিরোভাব পর্যন্ত ঘটনা-নিচয় বিবৃত হইয়াছে।

মধ্য খণ্ডই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ। কবির নিজের কথায়—

'মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥'

এই খণ্ডেই প্রসিদ্ধ ঘটনা 'জগাই-মাধাই'-উদ্ধার স্থান পাইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ হাওড়া-রামকৃষ্ণপুরের ভক্ত স্বর্গত হরিচরণ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণটিতে সুলিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত ভক্তকণ্ঠে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

গত ৭ই জানুআরি, ১৯৭২ বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১১০ তম জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। সারাদিনে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক স্বামীজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য মঠে সমাগত হন। স্বামীজীর মন্দিরে ভোরে মঙ্গলারতি ও বেদপাঠ, পরে ভজন, বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে (নাটমন্দিরে) পূর্বাহ্নে স্বামী বোধাত্মানন্দ কঠোপনিষদ্ পাঠ করেন, পরে কালীকীর্তন হয়। মঠবাড়ীর দোতলায় স্বামীজীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় ভজনের ব্যবস্থা ছিল। দুপুরে প্রায় পনের হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে স্বামীজীর একখানি সুসজ্জিত সুন্দর প্রতিকৃতির সম্মুখে আয়োজিত জনসভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর ভজন ও রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়।

জনসভায় অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ (বাংলায়) বলেন, 'স্বামীজী নিজেকে "একটি অশরীরী বাণী" বলেছেন ; এ বাণী ভারতের যুগযুগ-সঞ্চিত বাণী, ভারতের চিরন্তন ভাবই বিবেকানন্দরূপে মূর্ত। এ বাণী মানবাত্মার বাণী, মানুষের সচ্চিদানন্দস্বরূপতার বাণী। প্রয়োজনের মুহূর্তে বারবার এ বাণী ভারতে মূর্ত হয়েছে, ধর্মবিপ্লবের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজকে লক্ষ্যাভিমুখী করেছে ;— পশুমানবকে দেবমানবে উন্নীত করাই সে লক্ষ্য, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে মানবের অন্তর্নিহিত নামরূপাতীত সত্তার উপলব্ধিই সে লক্ষ্য। বর্তমান যুগে শুধু ভারতেরই নয়, সারা পৃথিবীরই প্রয়োজন ছিল এ বাণীর। বিবেকানন্দ জগতে সেই বাণীই প্রচার করে গেছেন।'

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (ইংরেজীতে) বলেন, 'স্বামীজীর জীবন ছিল তাঁর বাণীর চেয়েও অনেক বড়। স্বামীজী শুধু স্বদেশ-প্রেমিক, সমাজসেবীই ছিলেন না, তিনি ভগবদ্-ভাবে সদাবিভোর একজন সন্ন্যাসীও। নির্বিকল্প সমাধিলাভকেই, নিজের সহিত ভগবানের অভেদত্ব-উপলব্ধিকেই তিনি জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি আত্মার কথাই শোনাতে এসেছি।" এটি তাঁর জীবনের সার কথা। তাঁর মানবিকতাবাদ ও পাশ্চাত্যের মানবিকতাবাদে পার্থক্য এখানেই—মানুষকে তিনি ঈশ্বররূপে দেখেছেন, দেখতে শিখিয়েছেন, ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা করতে বলেছেন। ভারতকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন—তবে সে ভারত শুধু ভৌগোলিক ভারত নয়—মানবাত্মার পরম মাহাত্ম্যের চির-উদ্গাতা সনাতন-ভাবময় ভারতকে। পাশ্চাত্যের অনেক মনীষী, আর্নল্ড টয়েনবী ভারতের সনাতন ধর্মকে জগতের অন্যান্য বড় ধর্মগুলির মতোই ব'লে মন্তব্য করেছেন, "তবে হিন্দুধর্ম বড্ড বেশী বৌদ্ধিক, হৃদয়ের স্থান সেখানে কম।" স্বামীজীর জীবনই একথার প্রতিবাদ—হিন্দুধর্মের যথার্থ ভাবই, হৃদয় মনীষা ও মননের সমন্বিত ভাবই মূর্ত সেখানে।'

সভাপতির মন্তব্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (বাংলায়) বলেন, 'স্বামীজীর চরিত্রে বহু আপাতবিরুদ্ধ শক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায়। তিনি যে বিশাল সহজাত আধ্যাত্মিকতা নিয়ে পৃথিবীতে এসে-

ছিলেন তাতেই ঐ সকল বিরুদ্ধতা সমন্বিত হয়েছিল। তাঁর চরিত্রের এই সমন্বয়কে বুঝতে পারা অনেকের পক্ষেই কঠিন। তাই কেউ তাঁকে বলেন দেশপ্রেমিক, কেউ সমাজনেতা, কেউ শিক্ষাসংস্কারক, কেউ বিদ্রোহী জাতি-সংগঠক, কেউ যোগী, কেউ ভক্ত, কেউ জ্ঞানী, কেউ বাগ্মী, কেউ পণ্ডিত ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দ এই সবগুলিই ছিলেন এবং আরও অনেক শক্তি তাঁতে বিকশিত হয়েছিল। তরুণ নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা এবং তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের রূপায়ণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক কথা বলতেন। শ্রোতৃবৃন্দের এবং নরেন্দ্রনাথেরও তা বোঝা কঠিন হত। অনেকে ঠাকুরের এই সকল উক্তিকে ভাবালুতাও ভাবতেন। কিন্তু ঠাকুর জানতেন নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর দর্শনে একটুও ভুল নেই। বাস্তবিকপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে মানুষের আধ্যাত্মিক সঙ্কটে মহা-শক্তিধর পথনির্দেশকরূপে আবির্ভূত।

'স্বামীজীর বিশ্লেষণে কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে মানুষের সঙ্কটের কারণ হল তার নিজের কেন্দ্রচ্যুতি। মানুষ যখন তার নিজের যথার্থ কেন্দ্র সম্বন্ধে অচেতন থাকে তখনই সে হিংসা, বিদ্বেষ, দম্ভ, ঘৃণা, কাম ও লোভে মত্ত হয়ে সমাজে বিক্ষোভ ও অশান্তির সৃষ্টি করে। মানুষের কেন্দ্র হল তার আত্মিক সত্তা। সেই সত্তাই সকল সাম্য, মৈত্রী, শান্তি ও সামঞ্জস্যের উৎস। মানুষকে তার কেন্দ্র সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, তবেই তার চরিত্রে উদ্বুদ্ধ হবে প্রেম, মৈত্রী, নিঃস্বার্থ সেবা ও শান্তি। ব্যক্তিই সমাজকে, দেশকে চালায়। বিবেকানন্দ তাই বারবার আমাদের মানুষ হতে বলেছেন।

'মানুষের দৈবী সম্ভাবনার মহিমা বর্ণনা করতে স্বামীজীর ভাষা ফুরিয়ে যেত। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—এমন একটি সময় আসবে যখন সকল দেবদেবী তাঁদের আসন থেকে চ্যুত হবেন, এবং সেইসব আসনে বিরাজ করবেন একটি মাত্র দেবতা—মানুষ—সকল শক্তি, সকল সৌন্দর্য, সকল শান্তির কেন্দ্র মানুষের অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তায় সচেতন মানুষ।'

উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন ভবনের হলে গত ৯ই জানুআরি একটি জনসভার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। সভায় স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী জীবানন্দ।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১৪ই পৌষ (৩০.১২.৭১) বৃহস্পতি-বার সকাল ১০টায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নব-নির্মিত 'সাধুভবনের' দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা হোমাদি ও শ্রীশ্রী-চণ্ডীপাঠ ও প্রসাদবিতরণ করা হয়।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা ও ২রা জানুআরি, ১৯৭২ কল্পতরু-উৎসব গাম্ভীর্য-পূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

১লা জানুআরি মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তনের মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনার পর বিশিষ্ট গায়কগণ কর্তৃক ধর্মসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তারপর শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীধনঞ্জয়

ভট্টাচার্য কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, রসরঙ্গের সভ্যগণ কর্তৃক সঙ্গীতে ও সংলাপে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালেখ্য এবং সালিখা কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকর্তন হয়।

অপরাহ্নে বিরাট জনসমাবেশে শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারীর রামায়ণগান ('ভক্ত-তরণীসেন' পালা) বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী জীবানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ বক্তৃতা দেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু' হওয়ার তাৎপর্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন আলোচনার পর ভক্তদের অবশ্য-কর্তব্য বিষয়ের প্রতি আলোকসম্পাত করেন।

২রা জানুআরি রবিবার শ্রীভুপেন চক্রবর্তী কর্তৃক 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' অনুষ্ঠানের পর শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকেদার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মনোজ্ঞ সঙ্গীতাঞ্জলি নিবেদিত হয়। জনসভায় বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সময়োপযোগী ভাষণ দেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ। তারপর শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণকীর্তন করেন।

কল্পতরু-উৎসব উপলক্ষে উদ্যানবাটীতে প্রতিদিন পনর সহস্রাধিক ভক্তসমাগম হইয়াছিল; প্রসাদ হাতে হাতে দেওয়া হয়।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১লা জানুআরি, ১৬ই পৌষ, শনিবার 'কল্পতরুদিবস' সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল—বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদি। ভক্তবৃন্দ হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তসমাগমে ও ভজন-কীর্তনে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান সারাদিন আনন্দমুখর ছিল।

সেবাকার্য

উদ্বাস্তুসেবা: পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্যে ১৯৭১-র অক্টোবর-নভেম্বরে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যাদি: চাল ৪,২২১'৭৫ কুইন্ট্যাল, ডাল ৫৪১'৬৪ কুই, আটা ১৫০'২০ কুই, গুঁড়া দুধ ৩০'২১ কুই, বার্লি ২'১৩ কুই, গ্লুকোজ ০'০৫ কুই, চিনি ৪'১ কুই, শিশুখাদ্য ৩'১০ কুই. ও ১৩০টিন সবজি ৩৪'৪৮ কুই, জামা-কাপড় প্রভৃতি ৪৩,৬৪৭, কম্বল ১১,০১৬, বাসনপত্র ১,২৮৬, লণ্ঠন ২টি, বই ১৪০ খানি, চিড়া ১'১৫ কুই, গুড় ৮ কুই, বস্তা ২,১২৮, ছবি ২,৬৩২, রোগীদের খাদ্য ৩০ টিন ও মুড়ি ১০ কুইন্ট্যাল। মোট ১,৭৮,০০০ শরণার্থীকে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরণ করা হয়। চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া হয় ৩২,২৫৫ জনকে।

বন্যার্তসেবা: পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে বন্যাক্লিষ্টদের সেবাকার্যে গত অক্টোবর ও নভেম্বরে মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়: বার্লি ০'১০ কুইন্ট্যাল ও ৩৫ টিন, সাগু ০'৫ কুই, চিনি ০'৪ কুই, গ্লুকোজ ১৫ প্যাকেট, চাল ৫৮'৮৯ কুই, ডাল ৬'১৫ কুই, চিড়া ০'০৫ কুই, বস্ত্রাদি ৭০৮ এবং কম্বল ৫৫০ খানি। ৯,২৫৮ ব্যক্তি চিকিৎসা-সাহায্য লাভ করেন।

ঘূর্ণিবাত্যা-সেবা: ওড়িশার কটক জেলায় পট্টমুণ্ডাই অঞ্চলে ঘূর্ণিবাত্যাক্লিষ্টদের সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১,৪০৪ বস্ত্রাদি এবং ১,০০০ কম্বল দেওয়া হয়।

কার্যবিবরণী

কালাডি—(এর্ণাকুলাম, কেরল) রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম আচার্য শঙ্করের জন্মস্থানের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত। এই আশ্রমের এপ্রিল ১৯৬৬—মার্চ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী

প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দৈনন্দিন পূজা-ভজনাদি, সাময়িক উৎসবাদি এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কালাডি আশ্রম কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র বেসিক), সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৩৯ (ছাত্র ২৯৮)। ছাত্রাবাসে ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১২২ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ৬০ জন ছাত্র উপজাতি-সম্প্রদায়ের। ৬৪ জন ছাত্র বিনা-ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। ফ্রি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষত্রয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা—৪,৪৭৫, ৩,৮৯৬ এবং ৩,০৪৯। স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ২,০০০ সুনির্বাচিত পুস্তক আছে। পাঠাগারে ৪টি দৈনিক এবং ১৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। প্রকাশন বিভাগ হইতে তিনখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে: বিবেকচূড়ামণি, প্রবোধ-সুধাকর, পরমার্থপ্রসঙ্গ।

বেলঘরিয়া: রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের সুপ্রাচীন গুরুকুলপ্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয়ে এই বিদ্যার্থী আশ্রম পরিচালিত হয়। এখানে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং অল্প কয়েকজন আংশিক বা পূর্ণ ব্যয়ে থাকিয়া কলিকাতার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করে এখানকার শুচিসুন্দর পরিবেশে তাহারা শরীর মন ও বুদ্ধির সুষম বিকাশসাধনের সুযোগ পায়। দৈনন্দিন পড়াশুনার সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা, প্রার্থনা, ভজনাদি, বাগান ও ক্ষেতের কাজ, রোগীর সেবা এবং নৈশবিদ্যালয়-পরিচালনা প্রভৃতি সমাজসেবার মাধ্যমে স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত পথেই তাহাদের জীবন গড়িয়া উঠে।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৯২ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৬৫ জন সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল, ৯ জন আংশিক ব্যয় এবং ১৮ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছিল। বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত পুস্তকসংখ্যা ৩,৪৫০; ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। লাইব্রেরীর টেক্সটবুক সেকশন-এ ২,৫৫০খানি পুস্তক আছে, এই বইগুলি আশ্রমের বিদ্যার্থীরা পড়াশুনার জন্য নিয়মিত ব্যবহার করে।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা প্রভৃতি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও অন্যান্য পুণ্যদিন ও তিথিকৃত্য বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্রদিবস প্রভৃতিও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ', সরকার-অনুমোদিত। এই ত্রৈবার্ষিক পলিটেকনিকে ছাত্রেরা ইঞ্জীনিয়ারিং শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে শিল্পপীঠের মোট ছাত্রসংখ্যা ২২৫ তন্মধ্যে ২৫ জন সিভিল ইঞ্জীনিয়ারিং এবং ১৩৭ জন মেকানিক্যাল ও ৬৩ জন ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জীনিয়ারিং শিক্ষা করে।

শিল্পপীঠ গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৫,০০০। ৫টি দৈনিক, ৬টি সাময়িক পত্রিকা এখানে লওয়া হয়।

শরণার্থী শিবিরে পুরস্কারবিতরণ-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন কেন্দ্রে বাংলাদেশ হইতে আগত প্রায় দু'লক্ষ শরণার্থীর সেবা করিতেছে, যাহার ভিতর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা, কলাসীমা, বকচরা ও লক্ষ্মীপুর এই চারটি শিবিরের চৌত্রিশ হাজার শরণার্থীর সেবার দায়িত্ব মিশনের অন্যতম কেন্দ্র নরেন্দ্রপুর আশ্রমের উপর ন্যস্ত। এই সকল শিবিরের শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও শরণার্থীদের জন্য লেখাপড়া, খেলাধুলা, সমাজসেবা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থাও মিশন করিতেছে। গত জুলাই মাস থেকেই এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি খোলা হইয়াছিল, প্রায় সাড়ে তিন হাজার শরণার্থী ছাত্রছাত্রীদের লইয়া। শিবিরবাসী নবীন ও প্রবীণ বাহাত্তর জন শিক্ষক শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং প্রগতিপত্র প্রদান করা হইয়াছে। গত ২৭শে ও ২৯শে ডিসেম্বর চারটি কেন্দ্রের পুরস্কারবিতরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এইসব অনুষ্ঠানে শরণার্থী ছাত্রছাত্রীরা ব্রতচারী নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বক্তৃতা করে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দ ও সহ-কর্মসচিব স্বামী ভূতেশানন্দ দুইটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। অন্য দুটি কেন্দ্রে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, ও স্বামী অক্ষরানন্দ। চারিটি কেন্দ্রে মোট তিনশত ছাত্রছাত্রী পুরস্কার গ্রহণ করে। বনগাঁ মহকুমাশাসক শ্রীএম. কে. ভট্টাচার্য, শ্রীগিরিজাশঙ্কর গুপ্তা, স্বামী অক্ষরানন্দ এবং শরণার্থীদের পক্ষ হইতে অনেকেই এই অনুষ্ঠানগুলিতে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। বক্তৃতাগুলি সবই খুব মর্মস্পর্শী হইয়াছিল।

দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে সঙ্ঘের দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি।

স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ

গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটে স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ (সতীশ মহারাজ) ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি মৈমনসিংহ, কালিম্পং, বাগেরহাট, কলিকাতা গদাধর আশ্রম ও জামতাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। কঠোরতাপরায়ণ এবং ধীর-স্থির শান্তস্বভাব ছিলেন তিনি।

স্বামী কৈবল্যানন্দ

গত ১৪. ১২. ৭১ রাত্রি ৩টার সময় স্বামী কৈবল্যানন্দ (যোগী মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে তিনি ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে অতিবাহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার পূজাদি কার্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

তাঁহাদের আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে স্বামী শিবানন্দের জন্মোৎসব গত ১৩ই ডিসেম্বর হইতে সাতদিন বিবিধ কার্যসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে বিশেষপূজা-পাঠ হোমাদি, বারাসত সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাপুরুষজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয় এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত স্বামী শিবানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। বৈকালে রামনামসংকীর্তন এবং স্বামী কৈলাসানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি মহারাজ এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী শিবানন্দের জীবন আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন লোকগীতি পরিবেশিত হয়। তৃতীয় দিন ধর্মসভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী জীবানন্দ মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই দিন পরে সেতারবাদন হয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন চণ্ডীগীতি-আলেখ্য, বিভিন্ন শিল্পীদের ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদের ধ্রুপদ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতাদের উপভোগ্য হইয়াছিল। শেষ দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ ভজন গাহিয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। কয়েক হাজার নরনারীর মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরিত হয়। শ্রীকিরণ ঘোষাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ব্রহ্মচারী দেবদাস গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণগীতি-আলেখ্য এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ কথকতা পরিবেশন করেন শ্রীঅনন্ত চ্যাটার্জি ও শ্রীঅতুল চ্যাটার্জি।

কল্যাণীতে স্থানীয় 'সারদা সমিতি'র উদ্যোগে গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭১ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ভজনাদির পর আলোচনা-সভায় প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। সভান্তে আগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদবিতরণ করা হয়। সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত শ্রীসারদা মঠ পরিচালিত দরিদ্র শিশুবিদ্যালয়ে সেবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

পরলোকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, আকুমার ব্রহ্মচারী অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত গত ২৫শে ডিসেম্বর, '৭১ রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটে ৬৫ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে কলিকাতায় স্বগৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায়। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের (১৯১৬ খৃঃ) লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সভাপতি স্বনামধন্য অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের দৌহিত্র এবং শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী জিতেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের পুত্র ছিলেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম. এ. পাস করিবার পর তিনি প্রথমে রিপন কলেজে, পরে দৌলতপুর কলেজে ও দেশবিভাগের পরে জয়পুরিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের মাধ্যমে নিয়মিত ক্লাস আলোচনা প্রভৃতি কার্যে জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত ব্রতী ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।



দিব্য বাণী

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কো স্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংশ্রিতঃ॥
তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতৈর্গুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌

দ্রষ্টা, বোধরূপ তুমি, নির্গুণ-স্বরূপ, তুমি সৃষ্টির আদিতে,
তাই সৃষ্ট গুণান্বিত ইন্দ্রিয়াদি পারে নাকো তোমারে ধরিতে,
সে গুণের আবরণে আবৃত কোনও জনে
পারে নাকো তাই তোমা স্বরূপে জানিতে।
তুমি ব্রহ্ম ; স্বতঃস্ফূর্ত নিজ গুণ দিয়া নিজে আবরিয়া নিজ মহিমায়
সাজিয়াছ বাসুদেব। নমি ব্রহ্ম! ভগবান বাসুদেব! নমি তব পায়!

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষ

১

কোন মানুষের সম্বন্ধে ধারণা করিতে গেলে আমাদের মনে সর্বপ্রথম ভাসিয়া উঠে তাহার আকৃতি—দেহ। কারণ তাহার দেহটিই আমরা দেখিতে পাই। তারপর ভাসিয়া উঠে তাহার মনবুদ্ধির গড়ন; মনবুদ্ধি আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু মানুষের চিন্তা, আচরণ প্রভৃতির ভিতর দিয়া সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লই। কিন্তু আমরা জানি, অধিকাংশ মানুষের দুটি ব্যক্তিত্ব থাকে —সে অর্থাৎ তাহার মনবুদ্ধির আসল রূপ একটি, আর অপরের কাছে সে নিজেকে যেভাবে দেখাইতে চায়—সেই প্রকাশ আর একটি। সেজন্য কেবল বাহির দেখিয়া কোন মানুষ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তা সব সময় ঠিক হয় না। বিশেষ করিয়া যাহার সহিত প্রথম পরিচয়।

মানুষ সম্বন্ধে আমাদের এ বাহ্য ধারণা অনেক ক্ষেত্রে আরও বাহিরে চলিয়া যায়—মানুষের বেশভূষা ধনদৌলত পদমর্যাদা প্রভৃতিও, তাহার জাতি-ধর্মও মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় ছাপ ফেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু কোন মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করিবার সময় এসব কোন বাহ্য আবরণ ও পরিবেশের দিকে তাকাইতেনই না। তাকাইবার প্রয়োজনও তাঁহার ছিল না—তিনি সোজাসুজি আসল মানুষটিকে, মানুষের আসল চেহারাটিকে, দেহযন্ত্রের চালক দেহীকে দেখিতে পাইতেন; মানুষের মনবুদ্ধি প্রভৃতি দেখিতে পাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'কাঁচের আলমারির ভেতর জিনিস রাখলে যেমন সবকিছু দেখা যায়, আমিও সকলের মনের ভেতরটা ঠিক তেমনি দেখতে পাই।' কাউকে দেখামাত্রই তাহার সম্বন্ধে তাই তিনি সঠিক ধারণাই করিয়া লইতেন। কাহারো মনবুদ্ধির গঠন যদি ভাল হইত, তাহার বাহ্য রূপ ও পরিবেশ যাহাই হউক, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিয়া লইতেন; তাহার দেহ সুরূপ না কুরূপ, সে যুবা না বৃদ্ধ, ধনী না দরিদ্র, পণ্ডিত না মূর্খ—এসব কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। আবার কাহারো মনবুদ্ধি মলিনতালিপ্ত হইলে তাহার সম্পদ, পাণ্ডিত্য, পদমর্যাদা প্রভৃতি থাকিলেও তাহাকে উচ্চ-দৃষ্টিতে দেখিতেন না; যাহার যাহা প্রাপ্য সম্মান তাহা অবশ্য তাহাকে দিতে কখনো দ্বিধা করিতেন না। নরেন্দ্রনাথ যখন অখ্যাত যুবকমাত্র, যখন তাঁহার মা ও ভাইরা পেট ভরিয়া দুবেলা খাইতেও পাইতেছেন না, এমন কি যখন তাঁহার পরিচিতেরা তাঁহার নামে অপবাদে মুখর, তখনও তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ ধারণা অটুট। ব্রাহ্ম-সমাজের জগদ্‌বিখ্যাত পণ্ডিত বাগ্মী নেতা কেশবচন্দ্রের চেয়েও, মহামনা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর চেয়েও তখনই অনেক অধিক শক্তি-ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তাঁহাকে। নরেন্দ্রনাথ এজন্য তাঁহাকে বকিতেছেন, বলিতেছেন, 'এরূপ বলিবেন না, বলিলে লোকে আপনাকে পাগল বলিবে', তথাপি তিনি নিজ ধারণায় অবিচল—তিনি

যে আসল মানুষটিকে 'দেখিতে' পাইতেছেন, নরেন্দ্রনাথের মতো (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) কেবল বাহির মাত্র দেখিয়া তো ধারণা করিতেছেন না! আর একই কারণে প্রখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে তিনি বিশেষ আলাপ করিতে পারেন নাই, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকেও কড়া কথা বলিতে দ্বিধা করেন নাই। আবার একই কারণে একজন মালা-তিলক-গেরুয়াদি-ভূষিত, বাহ্য-দৃষ্টিতে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তির ছোঁয়া জলও খাইতে পারেন নাই। (এই দিন নরেন্দ্রনাথ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব চলিয়া যাইবার পর গোপনে খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন যে লোকটির মন মলিনতালিপ্ত —চরিত্র নিষ্কলুষ নয়।) এদিকে একজন অতি দরিদ্র বৃদ্ধার (গোপালের মা) নিকট হইতে প্রথম সাক্ষাতের দিনই খাবার চাহিয়া লইতেছেন—'আমার জন্য কি এনেছ, দাও', আর দিনের পর দিন কিছু না কিছু রান্না করিয়া আনিবার জন্য ফরমাশ করিতেছেন। (এই চাহিয়া খাওয়ার আধিক্য এত অধিক হইয়াছিল যে, গোপালের মা একদিন স্বগতোক্তিই করিয়াছিলেন, 'গোপাল, তোমায় আজীবন ডেকে এই ফল হল, এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে, যে দিনরাত "খাই খাই" করছে!')

২

আমরা জানি, কোন মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি তাহার জাতি-ধর্ম-বর্ণের উপরও পড়িত না। তিনি জানিতেন, তিনি 'দেখিয়াছিলেন' মনবুদ্ধি-চেতনা-সমন্বিত মানুষটিই আসল মানুষ, যে একটি দেহের বিনাশে বিনষ্ট হয় না, যে একটি দেহের বিনাশের পর বাসনাপূর্তির জন্য কর্মানুসারে, এবং নির্বাসনা মুক্তাত্মাদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ঈশ্বরেচ্ছায় লোককল্যাণ-সাধনের জন্য দেহান্তর ধারণ করে। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'মানুষ কেমন করে মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।...দেখলাম খাপটার ভেতর থেকে যেন তলোয়ারটা বের করে নিলে. খাপটা পড়ে রইল...তলোয়ারের কিছু হল না।' মথুরবাবুর দেহত্যাগের পর তিনি কোথায় গিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'হয়তো কোথাও একটা রাজা-টাজা হয়ে জন্মেছে—ভোগবাসনা ছিল।' লোককল্যাণসাধনে তাঁহার সহায়করূপে আগত লীলাসহচরগণ সম্বন্ধে কাহাকেও বলিয়াছেন, 'নরঋষি' আবার দেহধারণ করিয়া আসিয়াছেন, কাহাকেও 'ব্রজের রাখাল', কাহাকেও 'শ্রীমতীর অংশ', কাহাকেও 'খ্রিখৃষ্টের (যীশুখৃষ্টের) দলের লোক' ইত্যাদি। একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোশাক পরিলে, একই তলোয়ারকে বিভিন্ন খাপে রাখিলে মানুষটির বা তলোয়ারটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না; যাহারা আসল মানুষটিকে বা তলোয়ারটিকে আলাদা কখনো দেখে নাই তাহাদেরই নিকট ভিন্ন পোশাকপরা একই মানুষকে ভিন্ন মানুষ বা ভিন্ন খাপে রাখা একই তলোয়ারকে ভিন্ন তলোয়ার বলিয়া মনে হইতে পারে মাত্র; পোশাক বা খাপই সে-ক্ষেত্রে মানুষ বা তলোয়ার বলিয়া প্রতীত হয়। ঠিক তেমনি একটি জন্মের জাতি-ধর্মাদি এবং দৈহিক আকৃতি, সম্পদ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি পোষাক বা বাহ্য আবরণের অভ্যন্তরস্থ আসল মানুষটিকে দেখিতে না পাইয়া আমরা এই পরিচ্ছদগুলিকেই মানুষ বলিয়া মনে করি; জন্মে জন্মে সে যে এই পোশাক

পালটাইয়া আসে, তাহাও জানিতে পারি না। এজন্মে যে মানবদেহের পোষাক পরিয়া আসিয়া কোন বিশেষ জাতি ও ধর্মের পরিবেশের মধ্যে বড় হইয়া সেই বিশেষ জাতি ও ধর্মে 'আমি'- বা 'আমার'- বোধের পোশাক গায়ে জড়াইয়াছে, ভিন্ন জাতি ও ধর্মের পরিবেশে দেহধারণ করিলে সে-ই ভিন্নরূপ বোধের পোশাক পরিত; পূর্বজন্মে সে-ই হয়তো অন্য কোন জীবদেহের পরিবেশের আমিত্বের পোশাক পরিয়াছিল। তাই সমভাবে উন্নতমনা হইলেও বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে, বিভিন্ন পরিবেশের মানুষকে আমরা সব সময় ধারণার একই আসনে বসাইতে পারি না। আরো সাংঘাতিক কথা, বিভিন্ন ধর্মানুমোদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে—বাহ্যদৃষ্টিতে সেগুলির ভিতর যত প্রভেদই লক্ষিত হউক না কেন—এই আসল মানুষটি যে একই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ইহাও, আমাদের বুদ্ধি কখনো কখনো বুঝিলেও, মন সাধারণতঃ বুঝিতে চায় না। আমি হিন্দুমতে বিভিন্ন সাকারোপাসনার কোন পদ্ধতি অবলম্বনে বা নিরাকার সাধনার পথে চলিতেছি, আপনি হয়তো অন্য পথে চলিতেছেন, অথবা খৃষ্টমতে বা মুসলমানমতে সাধনা করিতেছেন। সাধনা যে পথেই হউক, ঠিকমতো হইলে বাহ্যানুষ্ঠানের বিভিন্নতা এমনকি বৈপরীত্য সত্ত্বেও আমাদের মন, দেহের অভ্যন্তরস্থ আসল মানুষটি যে সমপ্রকারেই উন্নত হইতেছে,—একই লক্ষ্যাভিমুখে আমরা সবাই যে অগ্রসর হইতেছি, ইহা আমরা সকলে মনেপ্রাণে ভাবিতে পারি না। বরং আধুনিক যুগের উদার দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও এখনো ইহার বিপরীত ভাবই আমাদের মনে কোথাও কোথাও দৃঢ়বদ্ধ—'আমি যে পথে চলিতেছি, এই পথে না চলিলে লক্ষ্যলাভ হইবেই না'; এমনকি, 'আমার পথে' যে না চলিবে তাহাকে শত্রুহিসাবে জ্ঞান করিবার লোকেরও অভাব নাই। পথ যাহাই হউক না কেন, লক্ষ্য যে আমাদের সকলেরই এক, ইহা ধারণায় আসে না বলিয়াই গোঁড়ামি ও ধর্মোন্মত্ততার, ভিন্ন পথের মানুষের প্রতি ভেদ-দৃষ্টির উদ্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের দেহরথে আসীন আসল মানুষটিকে দেখিতে পাইতেন বলিয়া মানুষ সম্বন্ধে ধারণার সময় তাহার রথের বৈচিত্র্যকে বা রথের বিচরণক্ষেত্রকে কখনো প্রাধান্য দেন নাই, প্রাধান্য দিয়াছেন রথী লক্ষ্যের দিকে কতখানি অগ্রসর, মাত্র তাহারই উপর। আর সেইজন্যই তিনি জোরগলায় বলিয়া গিয়াছেন যে, যত মত তত পথ, মত বা পথ ধর্ম নয়, ঈশ্বরানুভূতিই ধর্ম। বলিয়াছেন যে, এই অনুভূতিলাভই লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য সব মানুষেরই এক—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেরই। আর বলিয়াছেন, যাহাকে লক্ষ্য ভাবিয়া বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন ধর্মমতে মানুষ অগ্রসর হয়, লক্ষ্যে পৌঁছাইলে দেখা যায় তাহা মানুষের নিজেরই স্বরূপ।

৩

মানুষ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাই চরম কথা। মানুষের এই স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন 'মানুষ' বলিয়া ধারণা করিবার মতো স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন আবরণই আর থাকে না, বিভিন্ন দেহাদির ও যাহাকে এতক্ষণ 'আসল মানুষ' বলিয়া আসিয়াছি তাহারও ভিতর একই সত্তাকে দেখা যায়। এখানে পৌঁছিয়া মানুষ দেখে এই সত্তাকেই সে কালী, কৃষ্ণ, আল্লা, গড্ প্রভৃতি ভাবিয়া উপাসনা করিয়া আসিয়াছে।

এ দৃষ্টিতে মানুষকে আর বিভিন্ন দেহরথে আসীন মনবুদ্ধিবিশিষ্ট রথী বলিয়াও দেখা যায় না; দেখা যায় দেহরথের ভিতর মনবুদ্ধিও যেন আর একটি সূক্ষ্ম রথ, আর তাহারও ভিতর আছে আসল মানুষটি। সে মানুষ ও ঈশ্বর অভেদ। এতদূর পর্যন্ত, লক্ষ্য পর্যন্ত, মানুষের স্বরূপ পর্যন্ত যাঁহাদের দৃষ্টি প্রসারিত, তাঁহাদের নিকটই 'সবার উপরে মানুষ সত্য' একথা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। এই দৃষ্টিতেই দেখা যায় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহরূপ রথগুলি বিভিন্ন প্রকার হইলেও সেগুলির ভিতরে আসীন সব মানুষই এক এবং সেই-ই বিশ্বের চরম সত্য, 'যাহার উপরে নাই।' সব মানুষই সেখানে শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ—দেহমনবুদ্ধিরূপ বহিরাবরণে 'আমি'-বোধশূন্য চৈতন্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ চির-অবিনাশী সত্তা। এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের সঙ্গে আচরণ করিতেন, মানুষকে দেহমনাদি আবরণের ভিতর নিজ স্বরূপ উপলব্ধির পথে আগাইয়া যাইতে সহায়তা করিতেন। এই দৃষ্টিলাভের পথে, ধর্মপথে অগ্রসর মানুষের 'থাক' তিনি নির্ণয় করিতেন লক্ষ্যপথে কতদূরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেদিকে কতদূর সে অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখিয়া। এই দৃষ্টিতে তিনি মানুষকে দেখিতে শিখাইয়াছেন—'জীব'কে 'শিব' জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন। শিবজ্ঞানে মানুষের সেবা করিতে বলিয়াছেন। তত্ত্ব হিসাবে ইহা ভারতে অতি প্রাচীন। কিন্তু আচরণে এই ভারতেই মানুষে-মানুষে ভেদদৃষ্টিও অতি উৎকট! শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্ব ও আচরণকে এক করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। ইহাই যুগধর্ম!

৪

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরোপলব্ধি বাদ দিয়া তাই মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাকে বোঝা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কালী, কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, আল্লা, গড্ প্রভৃতি নামে বিভিন্ন ধর্মপথে যাঁহাকে, যে একই সত্তাকে লক্ষ্য করা হয়, মানুষ স্বরূপতঃ তাহাই, এবং বিভিন্ন ধর্মমত মানুষের এই স্বরূপোপলব্ধির বিভিন্ন পথ মাত্র—এসব তিনি বলিয়াছেন সব পথে গিয়া সব কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াই। যাঁহাকে কোন বিশেষ রূপগুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতেছি, অন্য কোন রূপগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি এক হন কিরূপে, তিনি আবার নির্গুণ নিরাকার সত্তার সঙ্গে এক হইবেন কিরূপে? যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আল্লা প্রভৃতি হন কিরূপে? ইহাই আমাদের অনেকের অন্তরের প্রশ্ন, মুখে যাহাই বলি না কেন। এই প্রশ্নের বহিঃপ্রকাশরূপে 'ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত, কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক'—আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে এরূপ যুক্তিও আমরা শুনি; ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের উপাসকদের পরস্পরের মধ্যে ইহা লইয়া ভেদ তো শুধু প্রশ্নের আকারেই থাকে নাই, মর্মান্তিক ঘটনারূপে বহুবার জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আজিও করিতেছে; অপর-ধর্মাবলম্বী লোকের প্রতি বিদ্বেষ না থাকিলেও 'আমি যেভাবে এবং যে রূপে ভগবানকে উপাসনা করিতেছি তাহাই ঠিক, আর সব ভুল'—এরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'মতুয়ার বুদ্ধি'-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা কম নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন যুক্তির মাধ্যমে এ ভেদ-বুদ্ধি অপসারণের চেষ্টা করেন নাই—নিজে সাধনা করিয়া যাহা সত্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বিবৃতিই দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষেই 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ', যুক্তিতে নয়।

কারণ, যুক্তির আশ্রয় মনবুদ্ধির আবরণটিকেই খুলিয়া না ফেলিলে এ সত্য মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। এই সত্যই মানুষের স্বরূপ। তাই 'সব দেশের সব ধর্মের সব মানুষ' স্বরূপতঃ এক—ইহা জানিতে হইলে মানুষের দেহরথের ভিতর তো বটেই, সে-রথে অধিষ্ঠিত রথীরও—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহাকে 'আসল মানুষ' বলিয়া আসিয়াছি, যে ছিন্ন বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বাস গ্রহণের মতো একটি দেহরথ-বিনাশের পর অপর একটি দেহরথে উঠে বলিয়া গীতায় বলা হইয়াছে, তাহারও ভিতরে আমাদের দৃষ্টিকে লইয়া যাইতে হইবে। আর ঈশ্বরীয় রূপ বিষয়ে যতটুকু বুদ্ধির সীমায় আমরা ধরিতে পারি, ততটুকু ধারণার আভাস আনার জন্য এখানে এ কথাও বোধ হয় বলা যায় যে. আমাদের মনবুদ্ধিই কেবল দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম রথ নয়, মনবুদ্ধির অতীত যে সত্যকে আমরা উপলব্ধি করি, যেমন কোন ঈশ্বরীয় রূপ, তাহাও যেন সে সত্যের রথ—একই সত্য যেন দুটি ভিন্ন রথে, 'আমি' ও 'ঈশ্বর'-এর মধ্যে প্রকাশিত ; একই ঈশ্বরকে তাই বিভিন্ন ভাবানুরঞ্জিত মনবুদ্ধিতে বিভিন্নরূপ দেখায়। যতক্ষণ না আমরা এই সূক্ষ্ম রথ হইতেও নামিয়া আসিতেছি, মনবুদ্ধিতে 'আমি'-বোধকে বিনষ্ট না করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যকে এভাবে দেখা ছাড়া আমাদের আর অন্য উপায়ও নাই ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, ততক্ষণ 'আমি-জলে' সত্যের 'প্রতিবিম্বই' আমাদের দেখিতে হইবে।

৫

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মমতে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই সব পথে যে ভাবে এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা সবই করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানকে কালীরূপে, কৃষ্ণরূপে, সীতারূপে, হিন্দুশাস্ত্রবর্ণিত সর্ববিধ দেবদেবীরূপে, এবং নিরাকার ব্রহ্মরূপে, আবার মুসলমান ও খৃষ্টধর্মবর্ণিত রূপেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইসব ঈশ্বরীয় রূপ নিশ্চয়ই ভিন্ন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের এইসব রূপকে এবং তাঁহার নিরাকার নির্গুণ স্বরূপকে এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপ একই সত্তার বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যক্ষের যতটুকু বর্ণনা তিনি স্বমুখে দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, রামচন্দ্র, সীতাদেবী, শ্রীরাধা, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতিকে দর্শনের পর দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত নামরূপাতীত সত্তায় মিশিয়া এক হইয়াছেন। সর্বক্ষেত্রেই দেখিয়াছেন একই অদ্বয় সত্তায় এইসব ঈশ্বরীয় রূপ ও তিনি মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষের সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াই তিনি জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছেন, একই ঈশ্বরকে বিভিন্নরূপে দেখা যায় মাত্র, ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন নহেন। আর, 'তিনিই আমাদের স্বরূপ'—ইহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন, সবমানুষের ভিতর তাঁহাকেই 'দেখিয়াছেন'—বিচার বা অনুমান করিয়া কিছু বলেন নাই, অপরের প্রত্যক্ষের বিবৃতিরূপেও বা শাস্ত্রের উদ্ধৃতিরূপেও বলেন নাই। মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্বভূতে, সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপে একই সত্তাকে দেখার ভিত্তি ঈশ্বর নিজেই গড়িয়া দিয়াছিলেন তাঁহার প্রথম ঈশ্বর-দর্শনের কালেই। মা-কালীকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন মা-কালীকে তিনি প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহার নির্গুণ নিরাকার স্বরূপেই, কালীরূপে নয়। আর সেই নির্গুণসত্তাকেই সেদিনই কালীরূপেও দর্শন

করিয়াছিলেন বলিয়া স্বামী সারদানন্দ আভাস দিয়াছেন: "প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি? ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তিনি কাতর কণ্ঠে 'মা' 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।" এই প্রথম দর্শনকালেই মা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন কালী ও ব্রহ্ম একই সত্তা। কারণ তাঁহার প্রথম দর্শনের বর্ণনায় চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রে নিজের মিশিয়া যাওয়ারই বর্ণনা দিলেও তিনি উহাকে 'মাকালীর দর্শনলাভ' বলিয়াছেন—"...মার দেখা বোধ হয় কোনকালই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।"

তন্ত্র বৈষ্ণব ও অদ্বৈতাদি হিন্দু মতে, এবং মুসলমান ও খৃষ্টমতে সাধন করিয়া তাঁহার যে সব উপলব্ধি হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন যে, মা সে সবই তাঁহাকে আগে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই 'তুরীয়া নির্গুণা মা'-কেই যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয় তাঁহাকেই যে সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপে, মানুষরূপে এবং জগতের সব কিছু রূপে দেখা যায়, এ সত্য তাঁহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াই তিনি মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে দেখিতে শিখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি যে কোন ধর্মবর্ণিত পথে চলিয়া, যে কোন ধর্মবর্ণিত যে কোন রূপ বা সত্তা বলিয়া ঈশ্বরকে ভাবিয়া মানুষ তাঁহার দিকে অগ্রসর হউক না কেন, পরিণামে সকলেই একই সত্যে উপনীত হয়। 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা।'

৬

নিজের ও অপর মানুষের দেহ-মনাদি আবরণের ভিতর তাকাইতে পারিলে, দেহজ্ঞান অতিক্রম করিতে পারিলে সকলেরই এই 'এক রা' হয়; শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদের ভাষ্যকার স্বামীজীর ভাষায়, "দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমনকি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।"

সর্বধর্মমতকে একই সত্যলাভের বিভিন্ন পথ বলিয়া নিঃসংশয়ে জানিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকে মানুষের এই দেহমনাতীত সত্যের দিকে ফিরাইয়া তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের এই দৃষ্টিই নবযুগের কল্যাণকারী দৃষ্টি,—যুগধর্ম। যে কোন জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষের সঙ্গে আমাদের আচরণকে এই সত্যানুগ করিতে হইবে। যুগ-যুগসঞ্চিত বহুবিধ ভেদের সংস্কার আসিয়া এ আচরণের পথে বাধা দিবে সত্য, কিন্তু কঠোর হস্তে সেগুলি অপসারণও করিতে হইবে। মানুষের কোনওরূপ বাহ্য ভেদের জন্য তাহাকে ঘৃণা করা নয়, ছোট ভাবা নয়, পর ভাবা নয় এমন কি তাহার প্রতি নিরপেক্ষ ভাব পোষণ করাও নয়—'সব ধর্মের, সব দেশের সব মানুষকে ভালবাসিতে' হইবে। সব মানুষকেই কেবল দেহাদি

আবরণ ও বাহ্য পরিবেশ-জড়িত তো নয়ই, তাহারও অভ্যন্তরস্থ সত্তা, 'শিব' বলিয়া ভাবিতে হইবে। সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বহুদূরের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দিরে মসজিদে অথবা গির্জায় যাইয়া ঈশ্বরের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া আমাদের মনে যে সশ্রদ্ধ ভাব জাগে, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা মতো সেরূপ সশ্রদ্ধ ভাব লইয়া প্রতিটি মানুষের সহিত আচরণ করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা তো আমরা সকলেই করিতে পারি। যদি তাহা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ যে দৃষ্টিতে মানুষকে দেখিতেন সে দৃষ্টিতেই তাহাকে দেখিতে পারি, তবেই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী বলিয়া আমাদের পরিচয় দেওয়া সার্থক হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

স্বামী হর্ষানন্দ

ঈশাবাস্যমিদং যদস্তি সকলং
হ্যেবেতি বেদৈস্তুতং
যস্যেশস্য নরঃ স্বকর্ম সফলং
কুর্বীত পাদেঽর্পণম্।
যং দৃষ্ট্বাঽত্মনি ভূতজাতহৃদয়ে
মোহ ন শোকোঽস্তি বা
যশ্চৈনস্ সততং গদাধরমহং
যোযোতি মত্তং ভজে ॥*

যাহা কিছু সমস্তই পরমেশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়—এইরূপে বেদে যিনি স্তুত, যাঁহার শ্রীপদে ফল সহিত মানবের সমস্ত কর্ম অর্পণীয়, যাঁহাকে নিখিল প্রাণিজাতের হৃদয়ে এবং স্বহৃদয়ে দর্শন করিয়া মোহ বা শোকাতীত হওয়া যায়, যিনি সততই আমার সমস্ত পাপ বিদূরিত করিতেছেন, সেই গদাধররূপী পরমেশ্বরকে আমি ভজনা করি।

* গদাধর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষণগুলি সবই শাপনিষদের কয়েকটি শ্লোকের সংক্ষিপ্তসার।

সমন্বয়ী ঠাকুর

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে

"যে সমন্বয় করেছে সেই লোক।"
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর সর্বধর্মসমন্বয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই একটি মাত্র সমন্বয়বার্তা অবলম্বনে তাঁহার সমন্বয়ের মহিমা-কীর্তন আংশিক মাত্র হয়। কেননা আমাদের এরূপ উক্তি, কোন অমূল্য মুক্তাহার হইতে তাহার একটিমাত্র দানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার প্রশংসা করার অনুরূপ। বাস্তবিক পক্ষে একটি সোনার কণ্ঠহারের সবটাই যেমন সোনা ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে, তেমনি ঠাকুরের সমগ্র জীবনটাই সর্ববিধ বিপরীতমুখী গুণ ও ধর্মের সমন্বয় ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। একথা তাঁহার ব্যবহারিক জীবন, তথা আধ্যাত্মিক জীবন উভয়ত্রই তুল্যরূপে সত্য।

ব্যবহারিক জীবনে সমন্বয়

(১) ঠাকুর পুরুষ-শরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার দেহ ছিল পুরুষভাব, স্ত্রীভাব এবং বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপভাব প্রকাশের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্রবিশেষ; ঠিক যেন —"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষতে॥"— এই শ্রুতিমন্ত্রটির একটি নিখুঁত ছবি। পুরুষভাব, স্ত্রীভাব কিংবা স্ত্রী-পুরুষবোধরহিত আত্মস্বরূপভাব, তিনি যখন যেভাবে ভাবিত হইতেন, তাঁহার শরীরও তখন সম্পূর্ণরূপে সেই ভাবটি প্রকাশ করিত। এইজন্য তাঁহার প্রতিবেশী দুর্গাদাস পাইন রমণীবেশধারী বালক গদাধরকে রমণী বলিয়াই ভুল করিয়াছিলেন, তাঁহার নিত্যপরিদৃষ্ট গদাধর বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। মথুরবাবুর অন্তঃপুরস্থ রমণীমণ্ডলবেষ্টিত স্ত্রীবেশধারী ঠাকুরকে, তাঁহার অহোরাত্রের সেবক ও ভাগিনেয় হৃদয়রাম মাতুল বলিয়া চিনিয়া লইতে পারেন নাই; শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় জানবাজারে আরতির সময়ে দুর্গাদেবীকে চামরবীজনরত স্ত্রীবেশে বিভূষিত ঠাকুরকে মথুরবাবু তাঁহার পত্নীর কোন প্রতিবেশিনী বন্ধু বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। আবার ঠাকুর যখন তাঁহার পুরুষ কিংবা স্ত্রীভক্তদের সাক্ষাতে স্ত্রীজাতিসুলভ হাবভাবাদির নকল করিতেন, তখন তাহাও হুবহু স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় হইত। গিরীশবাবু ঠাকুরের উভয়ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ উপলব্ধি করিয়া একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে তো জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিয়াছিলেন, "মশাই, আপনি পুরুষ, না প্রকৃতি?" তাঁহার স্ত্রীভক্তেরা তাঁহাতে স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া তিনি তাঁহাদেরই একজন এইভাবে ভাবিত হইয়া যাইতেন এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সঙ্গে উঠা বসা এবং চেষ্টা ব্যবহারাদি করিতেন অধিক কি, মধুরভাবে সাধনকালে তাঁহার স্থূল শরীরটি পর্যন্ত স্ত্রীধর্মের আবেশে আবিষ্ট হইত। তাঁহার দেহভাবাতীত অবস্থার সহিত দেহের পরিবর্তনের বর্ণনাও রহিয়াছে (লীলাপ্রঃ, সাঃ, ৮ম)।

লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়

(২) পূর্ণমাত্রায় ভাবুকতার সহিত নিত্য-ব্যবহার্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সুশৃঙ্খলবিধান-পটুতার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল হইলেও, ইহা ঠাকুরের জীবনে নিত্যপ্রত্যক্ষ ব্যাপার ছিল। "নিরন্তর ভাবমুখে থাকিয়াও ঠাকুরের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের হুঁশ থাকিত; যে জিনিসটি যেখানে রাখিতেন তাহা সর্বদা সেইখানেই রাখিতেন,—নিজের কাপড়-চোপড় বেটুয়া প্রভৃতি সকল নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের খোঁজ রাখিতেন, কোথাও যাইবার আসিবার সময় আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে কিনা সন্ধান লইতেন এবং ভক্তদিগের মানসিক ভাবসমূহের যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন, তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিয়া কিসে তাহাদের বাহ্যিক সকল বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন[২]।"

(৩) অল্পজ্ঞ বালকভাব, রসজ্ঞপ্রিয় যুবক-ভাব এবং সর্বজ্ঞ গুরুভাব—এই ভাবত্রয় তাঁহাতে অবিমিশ্রভাবে সমন্বিত ছিল। "যখন তিনি বালকভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক বলিয়াই বোধ হইত"; "বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরের ঘনমূর্তি ঠাকুরকেই সময়ে সময়ে মথুরকে নানা কথায় ভুলাইতে ও বুঝাইতে হইত।" "ইতিপূর্বেই যে 'বাবা' হয়ত গূঢ় আধ্যাত্মিকতত্ত্বসকল অপূর্ব সরলভাবে বুঝাইয়া মোহিত ও মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই 'বাবা'ই পরমুহূর্তে একটা সামান্য কারণে বালকের ন্যায় নিষ্কারণে ভাবিয়া অস্থির হইয়া মথুরের আশ্বাসবাক্যের উপরে নির্ভর করিতেছেন।" মথুরবাবুর পরলোকগমনের পরে, পরবর্তীকালেও অনেক সময়ে ঐরূপ বালকভাবে ভাবিত ঠাকুরকে তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদিগের আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর করিতে দেখা গিয়াছে। আবার যুবক ভক্তদিগের সহিত এইক্ষণে রহস্যপ্রিয় যুবকের ন্যায় ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন, হাসির লহর উঠিতেছে, পরক্ষণেই হয়ত একটা গান শুনিতে শুনিতে বা নিজেই গাহিতে গাহিতে গভীরসমাধিস্থ হইলেন, এরূপ দৃশ্যও তাঁহার জীবনে বিরল ছিল না।

(৪) দীনভাব এবং দিব্য ঐশ্বরিক ভাবের সমন্বয়: "ঠাকুর যখন সাধারণভাবে থাকিতেন, তখন আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণবুদ্ধি স্থির রাখিয়া, মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই 'দাস আমি' এই ভাব লইয়া থাকিতেন; তখন গুরু, কর্তা বা পিতা বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না। তখন তিনি বলিয়া উঠিতেন, 'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা,—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোদের গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান,—একগাছি বড়র সমানও নই।" "আবার তিনি যখন দিব্য ঐশ্বরিক ভাবে আবিষ্ট হইতেন তখন স্পর্শমাত্রেই কাহারও কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, কাহারও আধ্যাত্মিক চৈতন্য প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন, বিরল কাহাকেও সমাধিমগ্ন করিয়া দিয়াছেন।"[৪]

(৫) নিরক্ষরতা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের সমন্বয়: যাঁহার বিদ্যাশিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালার

২ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ: ৯১)

৩ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ: ২৩১)

৪ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়

ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই তাঁহাকে কার্যতঃ প্রায় নিরক্ষর বলা চলে। সেদিক দিয়া ঠাকুরকে নিরক্ষর বলা চলে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তাঁহার মধ্যে নিরক্ষরতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্য তুল্যরূপে সমন্বিত ছিল; তাই দেখিতে পাই যে, লাহাবাবুদের বাড়ীর শ্রাদ্ধবাসরে যখন পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃত ভাষাতে গভীর শাস্ত্রবিচার করিতেছিলেন, তখন তাহার মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে এবং যে বিষয়ের মীমাংসায় তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন নাই, তাহার যুক্তিপূর্ণ সরল মীমাংসা করিয়া দিতে ঠাকুরকে বিন্দুমাত্রও বেগ পাইতে হয় নাই। পরবর্তীকালেও, তাঁহার বেদান্ত-সাধনান্তে যখন দলে দলে সন্ন্যাসী পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া বেদান্ত-চর্চা করিতেন, তখনও তাঁহাদের অনেকে যে বিষয়ের কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাহার একটা সহজ কথায় মীমাংসা করিয়া দিতেন।[৫] ঠাকুর নিজেও বলিতেন যে সংস্কৃতে আলাপ করিলে তিনি তাহা সব বুঝিতে পারিতেন, তবে সংস্কৃতে তিনি কথা বলিতে পারিতেন না। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও তিনি সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদি শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিতেন এবং তাহার অন্তর্নিহিত ভাবও পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। বিশেষ বিশেষ স্তোত্রাদি কিভাবে মাত্রাদি ঠিক রাখিয়া নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিতে হয়, ঐ সকলের অর্থ কি, তাহা বলরামবাবুর পুরোহিতপুত্র ফকিরকে, এবং কখন কখন তাঁহার কোন কোন বালক ভক্তকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও তাঁহাকে দেখা গিয়াছে।

বাস্তবিক, কতপ্রকার বিপরীতমুখী গুণ ও ভাবসমূহই যে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সমন্বয়প্রাপ্ত দেখা যায়, তাহার পরিসংখ্যা করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অতএব তাঁহার সর্বাশ্চর্য সমন্বয়, গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীর ভাবের সমন্বয়ের কথা বলিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের আলোচনা সমাপ্ত করিব।

(৬) একাধারে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসজীবনের অভূতপূর্ব সমন্বয়: ঠাকুরের ব্যবহারিক জীবনের এই পর্বটি ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব, অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়! গার্হস্থ্যাশ্রমের এবং সন্ন্যাসাশ্রমের এহেন অভিনব চিত্র বিশ্ব-সংসারে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ চিত্র একাধারে "সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমস্থিতিঃ"[৬]—সম্পন্ন সিদ্ধ পরমহংসের এবং কর্তব্যপরায়ণ গৃহস্থের উজ্জ্বল ও পবিত্র চিত্র। যথাশাস্ত্র দীক্ষিত সিদ্ধ পরমহংস সন্ন্যাসী হইয়াও মাতা-পত্নী-পরিজন-বেষ্টিত পরিবেশের মধ্যে নির্লিপ্তভাবে জীবন-যাপন, দিবারাত্র ঈশ্বরপ্রেমে আত্মহারা থাকিয়াও ত্রুটিবিচ্যুতিবিহীন মাতৃসেবা, পত্নীকে কামগন্ধহীন স্বর্গীয় প্রেমে কৃতার্থ করিয়া সাংসারিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম স্তরে তুলিয়া দেওয়া, মায়াবন্ধনবিমুক্ত হইয়াও আত্মীয় পরিজনের প্রতি স্নেহশীল থাকিয়া তাহাদিগকে কল্যাণমার্গে পরিচালিত করা—এরূপ একটি সর্বসমন্বিত জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া তো দূরের কথা, কল্পনাও কি কেহ করিতে পারিয়াছে? পতি পত্নীকে জগজ্জননী-দৃষ্টিতে পূজা করিতেছেন, আর পত্নী পতিকে সেবাপূজা করিতেছেন,

৫ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

৬ পরমহংসোপনিষদ্, ৩

এবং আজীবনকাল পরস্পর পরস্পরের সহিত অবিচ্যুতভাবে ব্যবহারও করিতেছেন তদ্রূপ[৭]। পতি সারারাত্র ঈশ্বরাবেশে জগৎসংসার ভুলিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতেছেন, কখনও বা গভীরসমাধিস্থ হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন, আর পত্নী সারারাত্র জাগিয়া সশঙ্কচিত্তে তাঁহাকে সামলাইতেছেন। অথবা সমাধিমগ্ন স্বামীর কর্ণে যথাপ্রয়োজনীয় বীজমন্ত্র—প্রণবাদি শুনাইয়া তাঁহাকে ব্যুত্থিত করিতেছেন, কাহারও মনে একক্ষণের জন্যও দেহবুদ্ধির উদয় হইতেছে না,—এই তো সেই দেবদম্পতির একত্র রাত্রিবাসের অদ্ভুত, চিত্র[৮]। এ অবতারবরিষ্ঠের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসমূহ যেমন বেদবেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে, ব্যবহারিক জীবনাদর্শও তদ্রূপ জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কাহিনী ও ঘটনা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। একাধারে এইপ্রকার উভয়াশ্রম-সমন্বিত নিষ্কলঙ্ক জীবনাদর্শ জগতে রাখিয়া যাওয়া একমাত্র সেই ত্যাগীশ্বর দেবমানবের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল।

আধ্যাত্মিক জীবনে সমন্বয়

(১) ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সর্বপ্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার চিরপবিত্র নিষ্কলুষ শ্রীঅঙ্গ ও মানসই সর্বদেবদেবীর এবং পৃথিবীর যাবতীয় অবতারপুরুষদিগের মিলন বা সমন্বয়ভূমি ছিল। বালক-বয়সে যে দেহ-মনে দেবাদিদেব মহাদেবের এবং বিশালাক্ষীদেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছিল, পরবর্তীকালে সীতা হইতে আরম্ভ করিয়া বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, কাশীর বিশ্বনাথ, গৌরনিতাই প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় অবতার ও দেবদেবী এবং যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি অবতারপুরুষগণ একে একে সকলেই তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন।

(২) সর্বধর্মসমন্বয়: আবহমান কাল হইতে পরস্পরবিবদমান গোঁড়া একদেশদর্শী ধর্মান্ধ লোকদিগের অত্যাচার-পীড়িত শতসহস্র নরনারীর রক্তস্নাত ধরণী হইতে ধর্মান্ধতা দূর করিবার জন্য, মা ভবতারিণীর অনুপ্রেরণায় তাঁহার 'যন্ত্র' "ঠাকুর স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন যে, ভারত এবং ভারতেতর দেশে প্রাচীনযুগে যত ঋষি, আচার্য, অবতার, মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া যত ভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়াছেন এবং ধর্মজগতে ঈশ্বরলাভের যত প্রকার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাদের কোনটিই মিথ্যা নহে, প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ সত্য; বিশ্বাসী সাধক ঐ ঐ পথাবলম্বনে অগ্রসর হইয়া এখনও তাঁহাদের ন্যায় ঈশ্বরদর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারেন[১০]।" জগৎকে তিনি শিক্ষা দিলেন "যত মত, তত পথ।" "তিনিও অনন্ত, পথও অনন্ত[১১]।" "ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়[১২]।" তাঁহার এই সমন্বয়বাণীর বিভায় ধর্মজগৎ অভিনব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং ইহার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(৩) চৌষট্টিখানা তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তথা বাৎসল্যভাবে রামলালার, মহাবীরের ন্যায় দাস্যভাবে

৭ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, চতুর্থ অধ্যায়
৮ ঐ
৯ ঐ

১০ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়
১১ কথামৃত, ৪।১৬।৩
১২ কথামৃত, ৩।৫।৪ ও ৫।১০।২

শ্রীরামচন্দ্রের, মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণের, সন্তানভাবে মা ভবতারিণীর সাধনা-উপাসনায় কৃতকৃত্য হইয়া ঠাকুর শাস্ত্রোক্ত সর্ববিধ শাক্তবৈষ্ণবাদি সাধনায় সমন্বয় সম্পাদন করিয়া হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষবহ্নি প্রশমিত করিয়াছেন। শিক্ষা দিয়াছেন শিব, কালী, হরি সবই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।[১৩] "শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে[১৪]।"

(৪) জ্ঞানমার্গের সাধকগণ, ভক্তিমার্গী সাধকদিগকে প্রায়ই কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; আর শক্তিসাধকগণকে? "সদসদ্‌-বিলক্ষণা অনির্বাচ্যা" মায়াকেই যাঁহারা নস্যাৎ করিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দেন, তাঁহারা সেই মহামায়ার উপাসককে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখেন তাহা অনুমান করিয়া লওয়াই ভাল। অদ্বৈত-বিজ্ঞানী ঠাকুর কিন্তু জগজ্জননী মহামায়ার বিরহ মুহূর্ত-কালের জন্যও সহ্য করিতে পারিতেন না। জ্ঞানমার্গের সাধনার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনা তাঁহাতে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; তিনি ছিলেন অদ্বৈত জ্ঞান ও প্রেমভক্তির মিলনের পুণ্যতীর্থ-প্রয়াগ। সে প্রয়াগে অবগাহন করিয়া জ্ঞানী তোতাপুরীও মাতৃপ্রেমে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন[১৫]।

(৫) সাকার সত্য, না নিরাকার সত্য? ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার?—এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা," "নিম্নাধিকারী সাধকদের আলম্বনের জন্য সাকার মূর্তি আবশ্যক," প্রভৃতি কথার ধার দিয়াও গেলেন না, কেননা তাহাতে জিজ্ঞাসুর মনের সন্দেহের আমূল নিরসন হয় না। সাধকের হিতের জন্য ভগবান যদি রূপকল্পনাই করেন, তাহা হইলে সাধকের মনে এ সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, সে কল্পিত রূপ ভগবানের যথার্থ রূপ নাও হইতে পারে; আবার সাকার রূপকে নিম্নাধিকারীর জন্য আলম্বন বলিলেও সেই একই সন্দেহ সাধকের মনে জাগিয়া উঠে। ঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তরে দিলেন জল ও বরফের উপমা[১৬]; বুঝাইলেন, সাধকের ভক্তিহিমে সচ্চিদানন্দ-সাগরের খানিকটা জমিয়া যাওয়াতেই ভগবানের সাকার মূর্তি সাধকের দর্শনপথে আবির্ভূত হয়। সরল, সাধারণ উপমা অথচ কি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং দৃঢ়প্রত্যয়জনক! উপমাটি জিজ্ঞাসুর নিত্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার হওয়াতে তাহার প্রাণে যে শুধু প্রগাঢ় বিশ্বাসের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয় তাহা নহে; এরূপ ভাবা তাহার পক্ষে সহজ হয় যে, বরফের প্রতিটি পরমাণু যেমন জল ছাড়া অন্য আর কিছুই নহে, তেমনি ভগবানের সাকার মূর্তিও ভগবৎসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। এ সত্যও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ভগবানলাভ সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজের প্রচেষ্টা এবং ভক্তির প্রগাঢ়তার উপরে নির্ভর করে। একটিমাত্র উপমার দ্বারা ঠাকুর সাকার মূর্তির সত্যতা, ভগবানের ভূমাত্ব এবং আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা র হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। এত বড় ব্যাপারটিকে যদি শুধুমাত্র 'সাকার-নিরাকারের সমন্বয়ে'র পর্যায়-ভুক্ত মাত্র করা হয়, তাহা হইলে ইহার মহত্ত্বকে

১৩ কথামৃত, ৪।২।১

১৪ কথামৃত, ৩।১৫।১

১৫ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ ২৭৯, ২৮০

১৬ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৯১

যে কতদূর খর্ব করা হয়, সুধী পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

(৬) দৈব ও স্বাধীনেচ্ছার সমন্বয় : সবই যদি ঈশ্বরেচ্ছাধীন, তাহা হইলে স্বাধীনেচ্ছার স্থান কোথায়?—এই প্রশ্নের উত্তরে, ঠাকুর মাঠে বাঁধা গরুর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, দৈব ও স্বাধীনেচ্ছা পরস্পরবিরোধী নহে; জীবনের অগ্রগতির জন্য দৈবের মধ্যেও স্বাধীনেচ্ছার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে।

(ক্রমশঃ)

নমঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত

নমো লীলাবতারায় যুগাবতাররূপিণে
মাতৃ-ভাবে নিমগ্নায় সাধকপ্রবরায় চ।
সংসারতাপদগ্ধেভ্যঃ শান্তি-সুধা-প্রদায়িনে
বিবেকানন্দ-পূজ্যায় ভাব-মুখে স্থিতায় চ।
দক্ষিণেশ্বরতীর্থেষু সারদেশ্বর-বিগ্রহঃ
রামকৃষ্ণপদে নিত্যং তিষ্ঠতু মে মনঃ সদা।

সারদা জননী মাতা

শ্রীসলিলকুমার ঘোষ

সা-রদা জননী মাতা রামকৃষ্ণ জায়া
র-বিরশ্মি অন্তরালে শান্তিকরী ছায়া;
দা-ক্ষায়ণী সতী শিব-ভাবনা ভাবিতা,
জ-গন্ময় পতি ধ্যানে সর্বাত্ম-সংস্থিতা,
ন-য়নে নবীন স্বপ্ন পতির প্রভাবে,
নী-রবে কর্মের ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্বভাবে
মা-তৃভাবে সর্বজীবে বাৎসল্যের রূপ,
তা-ই দেখা পেল মর্ত্য ঈশ্বর-স্বরূপ॥

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

সন্ধ্যায় রকে ক্যাম্পখাটে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ উপবিষ্ট। উপস্থিত দু-এক জন। বাবা বলিতেছেন :

"বেশী ঘুমোবে না। যোগীর ঘুম ৪ ঘণ্টা, ভোগীর ঘুম ৬ ঘণ্টা। সেদিন 'উদ্বোধনে' মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কথা পড়ে ভারী আনন্দ হ'ল—তিনি বলছেন, '৪ ঘণ্টার বেশী ঘুম রোগবিশেষ—যার চিকিৎসা দরকার। তোমরা বলো, না ঘুমোলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক উল্টোটি—ঘুমোলেই দুর্বল হয়ে পড়ে, বিশেষতঃ দিনের বেলা। দুপুরে একটু বিশ্রাম—তার সঙ্গে পড়াশুনা।' ঠাকুরকে তো জানাও—'আমার সকল ভোগ-বাসনা দূর ক'রে দাও।' ঘুম তো একটা ভোগ, সে ভোগও ছাড়তে হবে, যদি ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে চাও। যে ঠিক ঠিক ভগবান লাভ করতে চায়, সে ঘুমোবে কি ক'রে? তার যে অহরহ এক চিন্তা বুকের মাঝে ধিকি ধিকি ক'রে জলছে—'কই ঈশ্বরলাভ তো হ'ল না, কই তাঁর দেখা তো পেলাম না আজও, কই এখনও তো তাঁর জন্যে কাঁদতে পারলাম না।'

"ঠাকুর আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাতেন—তাঁর সেই খাটের ওপর ছোটছেলেটির মতো পা ছড়িয়ে বসে বলতেন, 'মা, দেখা দে, দেখা দে, মা। তোকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। ছোট ছেলেকে ফেলে কি ক'রে তুই ভুলে আছিস, মা। মা, আয় মা, কোলে তুলে নে, মা।' এই রকম ব্যাকুল হয়ে বলছেন আর কাঁদছেন, সত্যি কাঁদছেন। সেই ভাবটা আমাদের দেখাতে দেখাতে সেই ভাবে তিনি ভরে গেছেন—ছোটছেলের মতো মাকে দেখবার জন্য কাঁদছেন হাত পা ছুঁড়ে। পরে স্থির, আবার সজলনয়নে কম্পিতকণ্ঠে বলছেন, 'মা, আমি সাধনহীন, আমি ভজন-হীন। মা, আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। মা, আমায় তোর পায়ে অচলা মতি দে।'

"আবার একদিন ধ্যান করতে শেখাচ্ছেন—সেদিন আমাকে একান্তে নিয়ে, যদিও আমি ছেলেমানুষ। আমার মন তো তখন মোটেই বিক্ষিপ্ত হ'ত না। বড় হয়েও কোমরের ওপরে কাপড় তুলেই বাইরে গেছি, শৌচ করেছি সবার সামনে, লজ্জা ক'রত না। আমার বয়িসি ছেলেদের লজ্জা হয়েছে, আমার হয়নি। তখন বুঝতাম না—এই লজ্জা না থাকাটা কি!

"মন বিক্ষিপ্ত হ'ত না, তবু ঠাকুর শেখাচ্ছেন—'দেখ, ধ্যান করতে করতে মন এদিক এদিক গেলে তখন মনোযোগে জপ করবি খুব ভাল ক'রে। তাতেও না হ'লে জপের ওপর ঝোঁক ছেড়ে দিয়ে মন যেভাবে চায়, সেইভাবে ধ্যান করবি। এইভাবে জপও থাকবে আর ভেতর ভেতর ধ্যানও থাকবে। ভাববি—যেন হৃদয়-মন্দিরে ইষ্টদেবতা রয়েছেন—সুন্দর শান্ত হাসি হাসি মুখ; এই তাঁর আরতি হচ্ছে প্রদীপ দিয়ে, কর্পূর দিয়ে, ফুল দিয়ে, চামর দিয়ে, আরতি যেন আর ফুরোয় না। অনেক পরে যদি আরতি হয়ে গেল তো অমনি ফুলের মালা গাঁথতে বসে গেলি—এই সুন্দর সুন্দর ফুল—যেমন দেখতে তেমনি সুগন্ধ, বড় বড় যুঁই-এর গোড়ে, আরও সব ফুল এল। এই তাঁর পাদপদ্মে মুঠো মুঠো-পদ্মফুল অঞ্জলি দিচ্ছিস—

রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম। পদ্মফুল নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল তো জবা আরম্ভ হ'ল, জবার স্তূপ হয়ে গেল। তারপর আরও সব ফুল—সাদা ফুল, নানাবিধ ফুল। একটার পর একটা—শেষ হ'তে দিবিনি! ফুলের পর এল ফল মূল মিষ্টি নানাবিধ—বেশ ক'রে সাজিয়ে নিবেদন করছিস। এই রকম ক'রে মনটা লাগিয়ে রাখতে হয়। মনের গতিই বিষয়ভোগের দিকে (রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ)—সেই ভোগটা ভগবানের সঙ্গে, ইষ্টের সঙ্গে করলে তার দোষ কেটে যায়।'

"সর্বদা ভগবানের স্মরণ মনন, তাঁর উপর একান্ত নির্ভর—এই তো সাধন, এই তো শেষ কথা। আমরা ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর কাছ থেকে শিখে নিজেদের জীবন যতটুকু পেরেছি গড়েছি। ঠাকুরের জীবন দেখে, তাঁর ছেলেদের জীবন দেখে তোমরা যদি না নিজেদের জীবন গড়তে চেষ্টা কর, তবে আর এ সবের—এত কাণ্ডের কি দরকার ছিল? প্রার্থনা কর অহরহ ঠাকুরের কাছে—'ঠাকুর, দেখা দাও, দেখা দাও। কত দূর দূর দেশের লোক—ইওরোপ, আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার লোক তোমার দেখা পাচ্ছে, তোমার ভাব পাচ্ছে, তুমি তাদের কতজনকে স্বপ্নে দেখা দিচ্ছ। আমায় কেন দেখা দেবে না? কেন দেখা দিচ্ছ না? আমরা তোমার এত কাছে রয়েছি, আমাদের বিশ্বাস দাও, ব্যাকুলতা দাও—তীব্র অভাব-বোধ দাও। দিনের পর দিন যেন খোঁচার মতো বিঁধতে থাকে—আজও তোমার দেখা পাইনি।'

* * *

"কাল রাত দুটোর সময় উঠেছি—ভারী আনন্দ, কি জানি কেন জানালা খুলে গান ধরে দিলাম:

(১) পরবত পাথার...

(২) এক সনাতন পুরুষ নিরঞ্জন
আদি অনাদি গুরু!

কথামৃতে আছে; খুব উঁচু গলায় গাইছি। গোপাল মঃ (গুণাতীতানন্দ) শুনতে পেয়েছিল। শরীরটা যেদিন একটু ভাল রাখেন, সেদিন আর কোন বাঁধ থাকে না। দেখনা ছেলেদের সঙ্গেই ঝগড়া করি।

"বেলুড়ে একদিন, তখনও রাত আছে—উঠে পড়েছি। উঠেই স্বামীজীকে দেখতে ইচ্ছে হ'ল। দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছি। ভেবেছি স্বামীজী ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু স্বামীজী জেগে আছেন। ঐটুকু টোকাতেই উত্তর আসছে গানের সুরে—

Knocking Knocking—who is there?
Waiting, waiting—O how fair!
Waiting, waiting—brother dear.

"তখনও মঠ নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে। একদিন রাত দুটো পর্যন্ত বেদান্ত আলোচনা চলছে—মানবাত্মার অধোগতি হয় কিনা? পুনর্জন্ম আছে কিনা? স্বামীজী তর্ক লাগিয়ে দিয়ে মধ্যস্থ হয়ে চুপ ক'রে হাসছেন, আর যখন যে পক্ষ পারছে না, তাদের নতুন যুক্তি দিয়ে উসকে দিচ্ছেন। রাত দুটোর পর আলোচনা ভেঙে দিলেন। তারপর সব ঘুম। ৪টে বাজতে না বাজতেই স্বামীজী আমাকে তুলে দিলেন। দেখলুম তিনি এর মধ্যেই সব সেরেসুরে পায়চারি করছেন আর গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইছেন। আমাকে বললেন, 'লাগা ঘণ্টা। সব উঠুক। শুয়ে থাকা আর দেখতে পারছি না।' আমি তাও একবার বললুম, 'এই দুটোর সময় শুয়েছে, ঘুমোক না একটু।'

"স্বামীজী কঠোর স্বরে বলছেন, 'কি! দুটোর সময় শুয়েছে ব'লে ছটায় সময় উঠতে

হবে নাকি? দাও আমাকে, আমিই ঘণ্টা দিচ্ছি। আমি থাকতেই এই, ঘুমোবার জন্য মঠ হ'ল না কি?' তখন আমি খুব জোরে জোরে ঘণ্টা দিলাম। সব ধড়মড় ক'রে উঠেই চীৎকার—'কে রে, কে রে?' আমায় বোধ হয় ছিঁড়েই ফেলত, কিন্তু দেখে আমার পেছনে স্বামীজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তখন সব চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওদিককার ঘরে চলে গেল।

"এটা বোধ হয় বেলুড়ে—হরি মহারাজ একদিন ধ্যানে যাননি, কি যেতে একটু দেরী হয়েছে। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'একটু সর্দিজ্বরের মতো হয়েছে।' প্রথম তো স্বামীজী খুব একচোট বকলেন—'এখনও এই দেহ দেহ! ছি:!' হরি মহারাজ আমাদের মধ্যে সব চেয়ে কঠোরী, তপস্বী, সহিষ্ণু। সব শুনে তিনি ম্লান হয়ে চুপ হয়ে গেছেন। পরে স্বামীজী আদর ক'রে বোঝাচ্ছেন, 'তোদের কেন বকি জানিস? তোরা ঠাকুরের ছেলে। তোদের দেখে জগৎ শিখবে। তোদের এতটুকু খুঁত দেখলে আমার বড় লাগে। তোদের এতটুকু আলগা দেখলে ওরা আরও আলগা দেবে। ঠাকুর যেমন বলতেন—আমি ষোল টাং করলে তোরা যদি এক টাং করিস। তেমনি আবার তোরা যদি এক টাং করিস, ওরা তার ষোল ভাগের এক ভাগ করবে। সেটুকুও যদি না করিস তা হলে ওরা দাঁড়ায় কোথা!'"

রাত্রি ৮।৮৷৷টায় ঘরে একটি ব্রহ্মচারীকে বাবা বলিতেছেন, "খাওয়া-দাওয়ার পর ৯টার সময় আসবে, (স্মৃতিকথা) লেখাব। তখন বেশ অনেকক্ষণ লেখাতে পারব।" ব্রহ্মচারীটি বুঝি বলিয়াছে—খাওয়া-দাওয়ার পর লিখিতে তাহার কষ্ট হইবে। তাই বাবা একটু উচ্চ-কণ্ঠে ব'লতেছেন, "কি? পারবে না? খাওয়ার পরই ঘুম, ৯টার সময়? একটু পড়া নয়, শোনা নয়, জপধ্যান ছেড়েই দাও; আমি বলছি—তাও ব'লছ, 'পারব না'। আমি বুড়ো মানুষ, আমি জেগে জেগে ভেবে ভেবে লেখাব—আর তুমি জোয়ান ছোকরা, তুমি পারবে না?" বলিতে বলিতে বাবা উঠিয়া বসিলেন—চোখ মুখ উত্তেজিত। আবার বলিতেছেন,

"স্বামীজী আগেই জানতেন, তাই সাবধান ক'রে দিতেন এবং বলতেন—'monastic indolence (সন্ন্যাসীদের অলসতা) বড় ভয়ঙ্কর জিনিস, ওইটিকে বড় ভয়। আর ঐটিই আমাদের কাল হবে।' শুধু খাওয়া আর ঘুম। উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাব ধারণার শক্তিও চলে যাবে। কত বড় আদর্শ নিয়ে এসেছ, একবার ভাবো দিকি! আর এই নিয়ে ভেবেছ স্বামীজীর সংঘের সেবা করবে? ধ্যান-ধারণা না পারো, কোদাল কুপুতেও না পারো তো language (ভাষা) শেখো—দেশ-বিদেশের ভাষা English, French, German (ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান)। অতদূর কেন—সংস্কৃত, হিন্দী এগুলোও তো ভাল ক'রে শিখতে পারো, তাতেও অনেক কাজ হয়। – কে হিন্দী শিখতে বলেছিলাম। সে এখন কেমন শিখেছে—অনর্গল বলে! একটা কিছু কর। নইলে অকর্মণ্য জড় হয়ে যাবে, তখন কিছুই হবে না, এও না, অও না। তোমরা youngmen (যুবকদল), করে না বলতে—৯টার পর আর কিছু করতে পারব না। দেখছ না চোখের সামনে বুড়ো মানুষটা খেটে খেটে মরে যাচ্ছে? দেখেও একটু শেখ। আচ্ছা, ৯টার সময় শোবে—বলতে পারো ৩টার সময় উঠে একটু বসবে। তাও পারবে না। সেই ৬টার সময়

উঠবে। আবার দুপুরে বিশ্রাম, অর্থাৎ তিন ঘণ্টা ঘুম। এরা সব বিকেল ৩টার সময় ঘুম থেকে উঠে এসে বলে—বিশ্রাম করছিলাম। আমরা তো বাপু বিশ্রাম বলতে বুঝি—কার্যান্তর, এই একটু শুয়ে বসে পড়াশুনা।"

সেই ব্রহ্মচারীটি একদিন সন্ধ্যাবেলা মাথায় একটি পাগড়ির মতো বাঁধিয়া, এক হাতে দণ্ড, আর একহাতে কমণ্ডলু লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবার কাছ দিয়া দুইবার যাতায়াত করিল। বাবা রকে ক্যাম্প খাটে বসিয়া আছেন। ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "কি? মনের ভাবটা কি? দণ্ড কমণ্ডলু? বুঝেছি, বুঝেছি—তা মুখ ফুটে বললেই তো পারো। তবে কি জানো?—আমি পছন্দ করি না এই রকম। কর্মীর গেরুয়া কি দরকার? সাদা কাপড় পরেই কোন আশ্রমে থেকে কাজকর্ম কর, ত্যাগ তপস্যা কর। শেষে সন্ন্যাসী—তখন আর এক রকম। সন্ন্যাসী গেরুয়া পরবে—ভিক্ষাব্রত নিয়ে সাধন করবে, প্রব্রজ্যায় চলে যাবে। পারবে?"

ঈশ্বরের নাম প্রেম

শ্রীউমাপদ নাথ

ঈশ্বরকে দেখনি তো? পেয়েছ তো তাঁর ভালবাসা!
যেখানে যখন তুমি কিছু মাত্র প্রীতিকণা পেয়ে
তৃপ্ত হলে পুষ্ট হলে, সে তো তাঁরই অস্তিত্বের ভাষা:
মানুষ যে ভালবাসে—সে তো তাঁরই গান গেয়ে গেয়ে।

ঈশ্বরের নাম প্রেম। প্রেমের পূজায় যদি প্রাণ
নিবেদিত হয় তবে তারই নাম ঈশ্বর-ভজন।
প্রেমের শ্রীমতী পদ্ম ফোটে যদি তবে তাঁরই গান
সার্থক জীবন জুড়ে: এই অর্ঘ্য বিরচে ক'জন?

হৃদয় ছড়িয়ে দাও। মাঠে ঘাটে পুষ্পে তৃণে বনে
তোমারই হৃদয় নিত্য মুক্তিকামী বৈরাগীর মতো
একতারা নিয়ে ঘোরে। অর্গল বিমুক্ত করো, মনে
আসুক প্রেমের ঝড়: শেষ হোক বন্ধনের ব্রত।

ভালবাসা এলো তাই পেয়েছি জীবন, তাই ফুল
ফুটেছে আগুন জুড়ে: অঞ্জলি ভরিয়া তাই নিয়ে
এ বিশ্ব প্রপূর্ণ করি। ঈশ্বরের শ্রীচরণমূল
সে অর্ঘ্য গ্রহণ করে। বিশ্ব বাঁচে ভালবাসা দিয়ে।
ঈশ্বর প্রেমের গুরু। প্রেম করে মৃত্যুর বিনাশ।
প্রেমের তপস্যা-মাঝে লভো তাঁর করুণা-নির্যাস॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ঃ মাণিকরাজা*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বাভাষ ও পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণ - লীলাঙ্গনে মাণিকরাজার ভূমিকা স্মরণযোগ্য। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'পুঁথি'তে এঁর বৃত্তান্ত ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। পরিমাণে ঐগুলি সামান্য হ'লেও যুগাবতারের লীলাকাণ্ডে অশেষ মাধুর্যমণ্ডিত

মাণিকরাজার পুরা নাম ছিল শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংক্ষেপে মাণিক বাঁড়ুয্যে নামেও ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। কামারপুকুর হ'তে প্রায় এক মাইল উত্তরে 'ভুরসুবো' নামক গ্রামে তাঁর বাসভবন ছিল। তাঁর বসতভিটাবাটী ও অধস্তন বংশধরগণ এখনও তথায় বর্তমান। তিনি ঐ অঞ্চলের একজন অতি বিশিষ্ট ও ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন। তাঁর ন্যায় দানশীল, পরহিতব্রতী, সদাশয় জমিদার কমই দেখা যায়। তিনি যেমন ধর্মপ্রাণ, তেমনি প্রজানুরঞ্জক ছিলেন। তাঁর নানাবিধ সৎকর্ম ও গুণাবলীর জন্য জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'রাজা' আখ্যা প্রদান ক'রেছিল। এইজন্যই তিনি 'মাণিকরাজা' নামে সুবিখ্যাত হন। জনগণের প্রদত্ত ঐ 'রাজা' উপাধি তাঁর জীবনে যথার্থই সার্থকতা লাভ ক'রেছিল।

মাণিকরাজার কীর্তি-প্রতিষ্ঠা

মাণিকরাজার কীর্তি-প্রতিষ্ঠার যৎসামান্যই জানা যায়। ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত 'সুখসায়ের', 'হাতিসায়ের' প্রভৃতি সুবিশাল দীঘি তাঁরই মহৎ কীর্তি-কলাপের অন্যতম নিদর্শন। কামারপুকুরের পশ্চিম প্রান্তের ভূতির খালের ধারে অবস্থিত, সর্বসাধারণের উপভোগ্য বৃহৎ আম্রকাননটিও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ আম্রকানন-সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ একটি ভূমিখণ্ডও তিনি পল্লীবাসীদের গবাদিপশু-চারণের উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রেছিলেন। উক্ত আম্রকাননটির শেষ নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি প্রাচীন আম্রবৃক্ষ কিছুকাল পূর্বেও তথায় অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ঐ কাননটি নেই, তবে ঐ স্থানটি এখনও 'মাণিকরাজার আমবাগান' নামেই পরিচিত। 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ বিখ্যাত কাননটির একটি মনোরম চিত্রও সন্নিবেশিত দেখা যায়।

মাণিকরাজার ধর্মপ্রাণতা

মাণিক বাঁড়ুয্যে মহাশয় অতিশয় ভক্তিমান দেবদ্বিজপরায়ণ ছিলেন। 'অতিথিসেবায় তাঁর বড়ই পীরিতি'। বাড়ীতে সদাব্রত ছিল। পরহিতসাধনে তিনি সর্বদা রত থাকতেন। তাঁর ভবনে বহুবার লক্ষ ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হ'য়ে ভোজন করেছেন। তাঁর বিষয় হতে যা আয় হত, তা সবই তিনি দেব-দ্বিজ-সেবায় ও অতিথি-বৈষ্ণবাদির সৎকারে মুক্তহস্তে ব্যয় ক'রতেন।

রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা

'পরিবার যত তাঁর গড়া এক ছাঁচে।
সবে ভক্ত, তত্ত্ব তম সাধ্য কার বাছে॥'

মাণিকরাজার গৃহিণী এবং পরিবারস্থ

* এই প্রবন্ধের সব তথ্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি থেকে সংগৃহীত।

অন্যান্য সকলেও তাঁরই ন্যায় মহৎপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। ধর্ম-কর্ম, দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদেরও সমান অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল তাঁর এক সহোদর ভ্রাতার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মাণিকচন্দ্রের অনুজ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্রজের পরলোক-গমনের পর তিনিই তার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবৃত্তান্তে এঁর নামও স্মরণীয়।

ক্ষুদিরামের সঙ্গে মাণিকের সৌহার্দ্য

শ্রীরামকৃষ্ণের জনক মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাণিকরাজার নিবিড় সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি সম্ভবতঃ ক্ষুদিরামের সমবয়সী ছিলেন। যা হোক, চাটুয্যে মহাশয়ের অবিচল সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরপ্রাণতা, নির্লোভতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর জন্য তিনি তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। পক্ষান্তরে চাটুয্যে মহাশয়ও তাঁকে তাঁর অদ্ভুত মহানুভবতার জন্য অত্যন্ত ভালবাসতেন। শ্রীযুক্ত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ক্ষুদিরামের গভীর হৃদ্যতা লক্ষিত হয়। চাটুয্যে মহাশয়ের শুদ্ধসত্ত্ব স্বভাবের জন্য তিনিও তাঁকে অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। অপর পক্ষে, মহাত্মা ক্ষুদিরামও তাঁকে বরাবর বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন।

পরম নিষ্ঠাবান গম্ভীরাত্মা ক্ষুদিরাম স্বভাবতঃ যার তার গৃহে গমন করতেন না। কিন্তু ধর্মপ্রাণ সুহৃদ্বরের প্রেমাকর্ষণে তিনি প্রায়ই তাঁর ভবনে পদার্পণ ক'রতেন। তাঁর আগমনে বাঁড়ুযো মহাশয় ও তাঁর পরিবারবর্গ সকলেই বিশেষ আহ্লাদিত হ'তেন এবং অশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরপূর্বক তাঁকে আপ্যায়িত ক'রতেন।

মাণিকভবনে গদাধর

'মাণিকের বংশে যত মাণিক সবাই।
বারে বারে যার ঘরে গেলেন গদাই॥'

শ্রীমান্ গদাধরের প্রতি মাণিকরাজা ও তাঁর ভক্তিমতী সহধর্মিণীর গভীর অপত্যস্নেহ ও বাৎসল্য-প্রীতি দেখা যায়। শ্রীযুক্ত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাঁড়ুয্যে পরিবারের অপরাপর সকলেও তাঁকে বিশেষ স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার চক্ষে দেখতেন।

মাণিকভবনে শৈশবকাল হ'তেই গদাধরের গতায়াত লক্ষিত হয়। ক্ষুদিরাম মধ্যে মধ্যে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। তার বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, সে-সময় একদা সে তাঁর সঙ্গে তথায় যাইতে চাইলে চন্দ্রাদেবী তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দেন :

'পরম সুন্দর শিশু লম্বমান বেণী।
ঝাঁপা দিয়া সাজাতেন আইঠাকুরাণী॥
কোমরেতে আঁটা গোট বালা দুই হাতে।
রঙ্গিন বসন পরা সুন্দর দেখিতে॥
অপরূপ যেন রূপ শ্রীবদন মাঝে।
চলিতে বেণীতে বদ্ধ ঝুরি-ঝাঁপা বাজে॥'

অপরূপ সুঠাম নয়নাভিরাম সদানন্দময় শিশুকে দর্শন ক'রে মাণিকরাজা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকলে পরম আহ্লাদিত হন মাণিক-গৃহিণীপ্রমুখ অন্তঃপুরবাসিনীরা অপার স্নেহভরে তাকে কোলে নিয়ে বহু আদর-যত্ন করেন এবং নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন-ভোজ্য উপহার দেন। সেও তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে চিরপরিচিতের ন্যায় একান্তই নিঃসঙ্কোচ ও সপ্রেম ব্যবহার করে এবং তাঁদের প্রদত্ত মিষ্টান্নগুলি মহাহ্লাদিত চিত্তে ভোজন করে। তার মধুর স্বভাব-প্রকৃতি ও

ভোজনরঙ্গ দেখে তাঁরা যার পর নাই উল্লসিত হন। যা হোক, সেই প্রথম দিবস হতেই সে বাঁড়ুয্যে পরিবারের সকলের অগাধ স্নেহ-মমতা আকর্ষণ করে এবং প্রত্যেকের একান্ত প্রিয় হ'য়ে ওঠে। সেদিন তার বিদায়ের পর তাঁরা সকলেই তার বিরহে অন্তরে বিষম বেদনা বোধ করেন।

তাঁদের প্রবল স্নেহ-ভালবাসার টানে সে তদবধি প্রায়ই পিতার সঙ্গে মাণিকভবনে গমন ক'রত। তাকে পেয়ে ঐ পরিবারের সকলেই পরম আহ্লাদে আত্মহারা হ'তেন। পুরবাসিনীরা তাকে কোলে পিঠে নিয়ে কত স্নেহ-আদর ক'রতেন এবং দুগ্ধজাত সুস্বাদু নাড়ু, পিঠা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাকে স্বহস্তে ভোজন করাতেন। বস্তুতঃ তাকে বারংবার অশেষ স্নেহ-যত্ন করেও তাঁদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কখনই চরিতার্থ হত না।

মাণিকরাজা এবং তাঁর পরিবারের অপরাপর সকলে গদাধরকে কিছুদিন না দেখলে ব্যাকুল হ'য়ে পড়তেন। ক্ষুদিরামকে বলা ছিল, 'আপনি যখনই এদিকে আসবেন, গদাইকে সঙ্গে ক'রে আনবেন। তাকে দেখলে আমাদের পরম আনন্দ হয়।'

'গদাধরে মুগ্ধ মন এত সবাকার।
না দেখিলে কিছুদিন দেখিত আঁধার॥
লোক পাঠাইয়া দিত কামারপুকুরে।
আদরের গদাধরে আনিবারে ঘরে॥'—

একবার ঘটনাচক্রে ক্ষুদিরাম কিছুদিন ভুরসুবোয় যেতে পারেননি। সেই হেতু ঐ অবসরে সেখানে গদাধরেরও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তার ফলে, বাঁড়ুয্যে-পরিবারস্থ সকলে তার জন্য সবিশেষ উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন। অবশেষে, তার কুশল-সংবাদ-গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিজ পরিবারের জনৈকা রমণীকে কামারপুকুরে প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে, তিনি তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে সুস্থ থাকলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও যেন তাকে তাঁর ভবনে আনয়ন করা হয়। যা হোক, ঐ রমণী যথাসময়ে চাটুয্যে-কুটীরে উপনীতা হ'য়ে নিজ আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং গদাধরকে ভুরসুবোয় নিয়ে যাওয়ার জন্য চাটুয্যেদম্পতির সম্মতি প্রার্থনা করেন। ক্ষুদিরাম সুহৃদের অভিলাষ অনুসারে গদাধরকে সেদিন তাঁর সঙ্গে তথায় প্রেরণ করেন।

তাকে নিয়ে ঐ রমণী ভুরসুবোয় উপস্থিত হ'লে মাণিক বাঁড়ুয্যে, তাঁর গৃহিণী এবং পরিবারস্থ আর আর সকলে তাকে পেয়ে যার-পরনাই উল্লসিত হন। সে তাঁদের সঙ্গে ঐদিন তথায় সমস্ত দিবস মনোহর রঙ্গ-ক্রীড়া ও আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত করে। তার আগমন প্রত্যাশা করে মাণিকগৃহিণী পূর্ব হ'তেই তার জন্য মনোহর বেশ-বাস ও কতকগুলি সুবর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়ে রেখেছিলেন। ঐদিন তিনি নানাবিধ সুস্বাদু মিষ্টান্নসহ ঐগুলিও তাকে সাদরে উপহার দান করেন। ঐ সকল মনোরম বেশ-ভূষায় ভূষিত হ'য়ে সন্ধ্যাসমাগমে গদাধর রমণীর সঙ্গে কামারপুকুরে ফিরে আসেন।

মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে তাকে আনা হ'ত। তার প্রতি মাণিকরাজা ও তাঁর পরিবারবর্গের মধুর অপত্যস্নেহ ও বাৎসল্যপ্রেম নিরন্তর বর্ষিত হলেও, তার সহজাত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব দেব-প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ঐ সম্পর্কে তাঁরা নিজেদের অন্তরের সেই প্রত্যয়ের কথা কখন কখন ক্ষুদিরামের নিকট সহর্ষে ব্যক্তও ক'রতেন। এ-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি ক্ষুদিরামকে প্রায়ই বলতেন—সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নয়, এতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান ব'লে জ্ঞান হয়। পরিবারের রমণীরাও ঐ কথা ভক্তিভরে প্রায়ই ব্যক্ত ক'রতেন।

'প্রভুর জনকে কহে যত নারীগণ।
তোমার তনয়ে নাই মানব-লক্ষণ॥'

গোচারণে আম্রকাননে গদাধর

মাণিকরাজার ভুরসুবোর ভবন যেমন গদাধরের অমিয় লীলা-স্মৃতি-বিজড়িত, তাঁর পূর্বোক্ত আম্রকানন এবং গোচারণভূমিও তেমনি তার বাল্য লীলাক্ষেত্ররূপে সুচিহ্নিত। এই স্থান দুটিতেও গদাধর পল্লীর বালকদের সঙ্গে বহু লীলা-খেলা ও রঙ্গ-অভিনয়াদি করে। এই স্থানদ্বয় চাটুয্যে-কুটীরের অনতিদূরে অবস্থিত থাকায়, অতি বাল্যকাল হ'তেই তথায় তার ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। গ্রামের রাখাল বালকদের সঙ্গে সে প্রায়ই ঐ গোচারণক্ষেত্র ও আম্রকাননে উপস্থিত হ'ত। গোচারণে আসার সময় সেও তাদের মত আঁচলে ক'রে মুড়ি, গুড় প্রভৃতি জলপান নিয়ে আসত এবং গোচারণকালে নেচে নেচে ঐগুলি খেয়ে বেড়াত। সেখানে তাদের সঙ্গে সে আরও কত মধুর খেলা-ধূলা ও রঙ্গ-তামাসা করত, কখন কখন মনোহর নৃত্য-গীত ও অভিনয়াদিতেও মত্ত হ'ত।

ঐ মাঠে একদিন কোন এক বৃক্ষতলে রাখালদের পরস্পরকে জলপান কাড়াকাড়ি ক'রে খেতে দেখে তার অপূর্ব ভাবাবেশ হয়। সুমধুর ব্রজভাবের প্রবল আবেশে সে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঐ অবস্থায় তার নয়নযুগল হ'তে অবিরল অশ্রুধারা প্লাবিত হ'তে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তার হস্তদ্বয়ে কম্পন লক্ষিত হয়। সেই সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিতও হয়ে ওঠে। যা হোক, তার ঐরূপ অদ্ভুত অবস্থা দেখে উপস্থিত রাখালেরা নিদারুণ আশঙ্কায় দিশেহারা হ'য়ে পড়ে। তাঁকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য তারা কেহ কেহ তাড়াতাড়ি নিজেদের কাপড়ের আঁচল ভিজিয়ে এনে তার চোখে-মুখে জল দিতে থাকে। কিন্তু তাতে কোনও সুফল হয় না। তখন তারা আরও অধিক শঙ্কাকুল হ'য়ে ওঠে। অবশেষে গ্রাম্য-সংস্কারবশে তাদের মনে উদিত হয় যে, গদাইকে হয়তো'বা ভূতে ধরেছে। কারণ তারা জানত যে, মাঝে মাঝে তাকে ভূতে ধরে। যা হোক, ঐ কথা ভেবে তারা সম্মিলিত কণ্ঠে রামনাম, হরিনাম ক'রতে থাকে। নামগানের উচ্চ রোলে তারা সমস্ত প্রান্তর মুখরিত ক'রে তোলে। অতঃপর ঐ নাম শ্রবণে সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে এবং ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। তখন তারা শঙ্কামুক্ত হয় এবং সবাই যেন দেহে জীবন ফিরে পায়। অবশেষে তারা তাকে বলে, 'তোকে আর কোনদিনই মাঠে গরু চরাতে আনব না। নিজ ঘরে থেকে তুই একা একাই খেলা করিস।'

গোচারণে কখন কখন সে কচি ঘাস-পাতা ছিঁড়ে, আদর ক'রে, স্বহস্তে গরুদের খাওয়াত। ঐ সময় গরুগুলি তাকে ঘিরে দাঁড়াত। তখন তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে সে কতভাবে তাদের স্নেহ-আদর ক'রত। তার ঐ বুক-ভরা আদর-স্নেহ গরুগুলিও অন্তরে অন্তরে অনুভব ক'রত। সে আদর করে কখন কখন তাদের এক একটিকে নাম ধরে ডাকত। অমনি তারা একে একে তার নিকট এসে উপস্থিত হ'ত। কখন কখন সে ডাঙ্গায় কাপড় ফেলে, রাখালদের সঙ্গে ভুতির খালে নেমে খেলা ক'রত। আবার কখন কখন

তাদের সঙ্গে ছোট ছোট গাছে উঠে রঙ্গ-ক্রীড়া ক'রত, কখন কখন বা গাছের ডালে দোল খেত।

রাখালেরা মাঠে গরুর পাল রেখে ঐ মাঠসংলগ্ন আমবাগানে বিশ্রাম ও খেলাধূলা ক'রত। গদাধর সেখানেও নানা রঙ্গ-ক্রীড়ায় তাদের মাতিয়ে রাখত। সে-সময় ঐ আম-বাগানের গাছগুলিও ছিল ছোট এবং তাদের ডাল-পালাও বেশ নীচুতে ছড়ান ছিল তার ফলে, বালক গদাধর ও তার সঙ্গীরা অনায়াসে সেগুলিতে উঠতে পারত। যা হোক, ঐ বাগানের আমগাছগুলিতে উঠেও সে তাদের সঙ্গে নানা রকমের খেলাধূলা ক'রত।

গোপাল শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর লীলা-খেলায় গদাধরের স্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রীতি ছিল। এই জন্য সে গোচারণে রাখালদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি বিচিত্র খেলা ক'রত। ঐ সকল খেলায় সে নিজে হ'ত কানাই এবং রাখালদের কাউকে সুদাম, কাউকে শ্রীদাম, কাউকে বা অন্য কোন সখা ক'রত। ঐ সকল খেলার সময় সেখানে প্রায়ই তার ভাবাবেশ হ'ত। সেখানে রাখাল-সখাদের নিয়ে সে কোনদিন হরিনাম, কোনদিন লীলাকীর্তন, কোনদিন বা যাত্রাভিনয় প্রভৃতিও ক'রত। এই সকল অনুষ্ঠানকালেও সে প্রায়ই আবিষ্ট হয়ে পড়ত। ভাবের প্রবল উদ্দীপনায় কখন কখন সে একেবারে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলত।

ঐ আমবাগানে সে একদিন রাখালবন্ধুদের নিয়ে 'মাথুর' পালা-অভিনয়-কীর্তন আরম্ভ করে। ঐ অভিনয়ে সে তাদের কাউকে বৃন্দা, কাউকে ললিতা, কাউকে বা বিশাখা প্রভৃতি সখী করে এবং সে নিজে হয় রাইকমলিনী। যা হোক, অভিনয় করতে গিয়ে সে কৃষ্ণ-পাগলিনী শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবাবেশে হয়ে পড়ে। শ্রীরাধার বিরহের ভাবে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুরু করে। ঐ অবস্থায় সে 'কোথা কৃষ্ণ, কই কৃষ্ণ, কৃষ্ণে দাও এনে'...ইত্যাদি গাইতে গাইতে অশ্রু-সাগরে ভাসতে ভাসতে একেবারে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তার ঐরূপ অদ্ভুত অবস্থা দেখে উপস্থিত সঙ্গীরা নিদারুণ ভীত ও চঞ্চল হয়ে পড়ে এবং দিশে-হারা হয়ে 'কি হল! কি হল!' বলে রোদন ক'রতে থাকে।

'কেহ বা আনিয়া জল দেয় চোখে মুখে।
কেঁদে কেঁদে কেহ বা গদাই বলি ডাকে॥
ভূতে যেন ধরে তাই মনে বিচারিয়া।
রামনাম হরিনাম ডাকে উচ্চারিয়া॥
তার মধ্যে একজন কয় উচ্চরোলে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥'

কৃষ্ণনাম শুনে গদাই ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পায়, "কোথা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলি চাহিলা অমনি।" তাকে প্রকৃতিস্থ দেখে সকলে "ফিরাইল ধেনুপাল ফিরিবারে ঘরে।"

ঐ আমবাগানে গদাধরকে কেবল রাখাল-বালকদের সঙ্গেই নয়—প্রতিবেশী গয়াবিষ্ণু, গঙ্গাবিষ্ণু, রাম মল্লিক প্রমুখ সহচরদের সঙ্গেও বিচিত্র খেলা-ধূলায় ও রঙ্গ-কৌতুকে মত্ত দেখা যায়। যৌবনের প্রারম্ভে সে উক্ত সহচরদের নিয়ে যাত্রার দল বেঁধে ঐ বাগানেই পালাগুলির অভ্যাস-চর্চাদিও ক'রত। গদাধরগতপ্রাণ চিনু শাঁখারী মহাশয়ও তার ঐ যাত্রাদলে ছিলেন। সুতরাং গদাধরের মধুর রঙ্গ-অভিনয়ে ঐ বাগানে চিনুকেও দেখা যায়। যা হোক, গদাধরের যাত্রাভিনয়ের মধুর-সঙ্গীতমালার মধুর মূর্ছনায় প্রায়ই ঐ আম্রকানন মুখরিত হ'ত। প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, ভাগ্যবান মাণিকরাজা গদাধরের বাল্যলীলা-খেলার জন্যই যেন কামারপুকুরে ঐ গোচারণ-ক্ষেত্র ও আম্রকানন প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন।

ভাইরাসকে জানা দরকার

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি এই প্রাণিজগৎ। অনুসন্ধিৎসা মানুষকে যতই আগাইয়া লইয়া যাইতেছে, ততই ইহার বিশালতা তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া দিতেছে।

জীবজন্তু ছাড়া উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, ইহা লইয়া কেহ আর তর্ক করে না। কারণ চোখের সামনে তাহারা বড় হয়, তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। আমি এখন এমন এক প্রাণিজগতের কথা বলিব, যাহাদের খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ তারা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) বা জীবাণুর কথা বলিতেছি। অবশ্য ইহাদের কথা বলিতে গেলে মনে পড়িয়া যায় অসুখের কথা, কারণ টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ফোড়া, টনসিলের অসুখ, কলেরা, মেনিনজাইটিস, ডিপ্‌থিরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি অনেক অসুখের মূলে আছে এই জীবাণুগুলি। ইহারা নিশ্বাস, খাবার বা পানীয়ের মধ্য দিয়া অথবা অন্যভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। তারপর শরীরের কোন স্থানে বাসা বাঁধিয়া আমাদের দেহ হইতে প্রয়োজনীয় সব কিছু লইয়া নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে, এবং তাহা করিতে যাইয়া আমাদের দেহে নানারকম অসুখের সৃষ্টি করে। সুস্থ শরীরের নানা জায়গায় কোন কোন জীবাণু থাকে, যেমন গলায়, অন্ত্রে প্রভৃতি। সেখানে তাহারা যে আমাদের কোন উপকার করে না তাহা নয়, তবে পরিমাণে সেটা বেশী নয়। এই সব ব্যাকটিরিয়া কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, কারণ তাহা এত ছোট যে সিকি ইঞ্চি জায়গায় প্রায় ছয় লক্ষ ব্যাকটিরিয়া সারিবদ্ধভাবে থাকিতে পারে। ইহারা সকলে সমান আকারের নয়, কেহ গোল, কেহ লম্বা প্রভৃতি। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহ ছাড়া, আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে জানা গেল যে, ব্যাকটিরিয়াই ক্ষুদ্রতম প্রাণী নয়। তাহা অপেক্ষা আরও ছোট প্রাণী আছে, যাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না। ইহারা 'ভাইরাস' (Virus)—সৃষ্টির এক বিচিত্র রহস্য। ইহারা শুধু মানুষের শত্রু নয়, অন্যান্য জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, এমন কি ব্যাকটিরিয়ার দেহেও অসুখ সৃষ্টি করে, এবং তাহাদের ধ্বংসের কারণ হয়। আয়তনে ইহারা কেহ কেহ ব্যাকটিরিয়ার এক তৃতীয়াংশ, কেহ কেহ শতাংশের একভাগ। আজকাল যে বিশেষধরণের অনুবীক্ষণ যন্ত্র—ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ (Electron microscope) বাহির হইয়াছে, তাহার দ্বারা সব ভাইরাসকে দেখা যায়। বাংলা ভাষায় ভাইরাসের ঠিক প্রতিশব্দ নাই—'জীবপরমাণু' বলা যাইতে পারে। মানুষের দেহে যে যে অসুখ ইহারা সৃষ্টি করে, তাহাদের কতকগুলি হইল—ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি, হাম, বসন্ত, মাম্‌প্‌স (Mumps) বা গলপ্রদাহ, এন্‌কেফালাইটিস (Encephalitis) বা মস্তিষ্কের প্রদাহ, পলিওমায়েলাইটিস (Poliomyelitis) বা

পক্ষাঘাত, জলাতঙ্ক, ডেঙ্গুজ্বর, কনজানক্‌টি-ভাইটিস (Conjunctivitis) বা চক্ষুপ্রদাহ প্রভৃতি। অনেক অসুখ, যাহাদের কোন কারণ জানা ছিল না, এখন ভাইরাসজনিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ক্যানসারের মূলেও আছে এক বা একাধিক রকমের ভাইরাস। শুধু তাই নয়। অনেক ভাইরাসজনিত অসুখ মানুষ হইতে অন্য জন্তুতে সংক্রামিত হয় অথবা জন্তু হইতে মানুষে আসে। কথাটি ভাবিবার বিষয়। কারণ মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার পৃথিবীর আদিযুগ হইতে পাশাপাশি বাস করিতেছে, এবং তাহাদের উভয়কেই এভাবে বাস করিতে হইবে। মশকের দ্বারা যে ডেঙ্গুজ্বরের ভাইরাস মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, তাহা অনেকেই জানেন।

ভাইরাস সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া আজকাল উন্নত প্রথায় চাষবাস বা গোপালন সম্ভব নয়, কারণ আগেই বলিয়াছি, গবাদিপশুর এবং কৃষিফসলের বহু অসুখের কারণ নানাবিধ ভাইরাস। সেইজন্য ফসলকে বাঁচাইবার জন্য, মড়ক হইতে গৃহপালিত পশুকে রক্ষা করিবার জন্য ভাইরাস-বিশেষজ্ঞকে ডাকিবার প্রয়োজন হয়।

যেমন ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছি, সুস্থ শরীরের অনেক স্থানে ভাইরাসও সেইরূপ বাসা বাঁধিয়া থাকে। ইহাদের সহিত শরীরের, অথবা সহবাসী ব্যাকটিরিয়ার সম্বন্ধ লইয়া অনেক গবেষণা হইতেছে

প্রাণী হিসাবে ভাইরাস বিজ্ঞানজগতের এক মহাবিস্ময়। অত্যন্ত সামান্য উপাদানে ইহাদের শরীর তৈয়ারী। আপনারা জানেন যে, মানুষের দেহ কোটি কোটি জীবকোষের দ্বারা গঠিত, যেমন বৃহৎ অট্টালিকা এক একটি ইষ্টকের সমষ্টি। ব্যাকটিরিয়ার দেহে মাত্র একটি কোষ আছে। কিন্তু ভাইরাসের দেহকে একটি পুরা কোষ বলা যায় না। এক একটি জীবকোষ অসংখ্য মলিকিউল (molecule) দ্বারা সৃষ্ট। কোন কোন ভাইরাস মাত্র একটি নিউক্লিও প্রোটিন মলিকিউল (Nucleo-protein molecule) দিয়া তৈয়ারী। এই সামান্য উপাদানে কোন প্রাণীর সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা আগে কেহ ধারণা করিতে পারিত না। শুধু তাই নয়—ভাইরাসের দেহকে ভাঙিয়া দেখা গেল যে, মলিকিউলের মাত্র একটি অংশ—নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid) এর মধ্যেই প্রাণের সৃজন-ক্ষমতা রহিয়াছে এবং বংশধারা সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা নিহিত রহিয়াছে। আজ সারাজগতের বৈজ্ঞানিক মহল মাতিয়া উঠিয়াছে নূতন প্রাণসৃষ্টির নেশায়; তাই ভাইরাসকে, বিশেষতঃ তাহার নিউক্লিক এসিডকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছে যে, প্রাণের রহস্য ইহার কোন্ অংশটির মধ্যে নিহিত আছে। ভাইরাসকে গবেষণার বস্তু হিসাবে লইয়াছে এইজন্য যে, ভাইরাসই বাস্তবজগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণী এবং নূতন ভাইরাস সৃষ্টি করিয়া বৈজ্ঞানিক তাহার প্রাণসৃষ্টির বিজয়-অভিযান সুরু করিতে চায়।

ভাইরাস কি করিয়া জীবনধারণ করে ও বংশবৃদ্ধি করে তাহার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে এমন সব হজমী-রস বা enzyme-এর সমষ্টি আছে, যাহাদের সাহায্যে নানরূপ মূল খাদ্যাংশ হইতে সে তাহার প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে। সেই জন্য ব্যাকটিরিয়াকে ল্যাবরেটরিতে মাংসের রস এবং অন্যান্য কয়েকটি সামগ্রী দিয়া সহজেই চাষ করিয়া এক হইতে কোটি কোটিতে পরিণত

করিতে পারা যায়। ভাইরাসকে চাষ করিতে হইলে এইরূপ সহজে হইবে না। কোন কোন ভাইরাস-এর মধ্যে একটি বা দুইটি এনজাইম থাকিলেও খাদ্য তৈয়ারী করিতে পর পর যে সব হজমীরস লাগে, তাহা নাই। সেইজন্য সে মূল খাদ্যাংশ হইতে নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না। খাদ্যের জন্য (এবং সেইজন্য তাহার বংশবৃদ্ধির জন্যও) তাহাকে জীবন্ত জীবকোষের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার নিকট হইতে তৈয়ারী খাদ্য লইতে হয়। তাই ভাইরাসকে ল্যাবরেটরিতে চাষ করিতে হইলে তাহাকে জীবকোষ দিতে হইবেই। এই জীবকোষ দুইভাবে দিতে পারা যায়। প্রথমতঃ ইঁদুর খরগোস প্রভৃতি কোন প্রাণীর শরীরে ভাইরাস ঢুকাইয়া দিলে, সেই প্রাণীর জীবকোষে সে তাহার বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। তারপর সেই প্রাণীকে মারিয়া তাহার দেহ হইতে কোটি কোটি ভাইরাস পাইতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ কোন প্রাণীর দেহ হইতে অংশবিশেষ লইয়া, সেই দেহাংশের জীবকোষগুলিকে কাঁচের শিশিতে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রাখিয়া চাষ করিয়া (ইংরাজীতে. যাহাকে tissue culture বলে) পরে সেইসকল কোষগুলিতে ভাইরাস ঢুকাইয়া ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করিতে পারা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে ভাইরাস সম্পূর্ণরূপে parasite বা পরভোজী, সে একা স্বতন্ত্র বাঁচিতে পারে না। ভাইরাসের বিরুদ্ধে ঔষধ আবিষ্কার করিবার পক্ষে ইহাই এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে পেনিসিলিন (Penicillin) স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) প্রভৃতি অনেক এ্যানটিবায়োটিক (antibiotic) ঔষধ বাহির হইয়াছে অথচ ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রায় কিছু নাই বলিলেই চলে। উপরোক্ত ব্যাপার হইতে তাহার খানিকটা কারণ বুঝা যাইবে। আগেই বলিয়াছি যে, ব্যাকটিরিয়ার নিজস্ব খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী আছে। সেই খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী জানিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ঔষধের সাহায্যে সেই প্রণালীর কোন অংশে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন, যাহাতে খাদ্যের অভাবে ব্যাকটিরিয়া মরিয়া যায়। এইভাবেই এন্টিবায়োটিক কাজ করে। ভাইরাসের নিজস্ব কোন খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী নাই, জীবকোষের খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালীকে তাহার নিজের কাজে লাগায়। যদি ঔষধের সাহায্যে সেই প্রণালীতে বাধা সৃষ্টি করা যায়—তবে শুধু ভাইরাস মরিবে না, জীবকোষও মরিবে। অর্থাৎ যে প্রাণীর চিকিৎসার জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন, তাহারও শারীরিক ক্ষতি হইবে। সেইজন্য ভাইরাসের বিরুদ্ধে ঔষধ বাহির হইতে এত দেরী হইতেছে।

ভাইরাস কি করিয়া জীবকোষের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে, তাহা আরও বিচিত্র। ভাইরাসের দেহের নিউক্লিক এসিড অংশের মধ্যে তাহার বংশানুক্রমিক গুণাবলী (genetic properties) নিহিত আছে। জীবকোষের মধ্যে ভাইরাস তাহার কেবল এই অংশটিকে ঢুকাইয়া দেয়। নিউক্লিক এসিড ভিতরে যাইয়া জীবকোষের যে অংশ তাহার জীবনধারণ-প্রণালী পরিচালিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে জীবকোষকে তাহার নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈয়ারী করিতে দেয় না, কেবল যে খাদ্য ভাইরাস-এর কাজে লাগিবে সেই খাদ্য তৈয়ারী করিতে বাধ্য করে। এইরূপ করিতে করিতে জীবকোষ মরিয়া যায়, কিন্তু সেই মুমূর্ষু জীবকোষের মধ্যে তৈয়ারী হয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভাইরাস। ক্ষুদ্রতম প্রাণী ভাইরাসের

এই প্রচণ্ড ক্ষমতা বিচিত্র নয় কি ? মনে করুন ভাইরাস ঢুকিয়াছিল যকৃৎ (liver)-এর কোষের মধ্যে, ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির ফলে যকৃতের অনেক কোষ নষ্ট হইয়া যায় এবং অসুখের সূত্রপাত হয়। এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, জীবাণুরা শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র অসুখ হয় না, হয় অনেক পরে যখন শরীরের অনেক কোষ নষ্ট মৃত বা মৃতপ্রায় হয়।

ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস কেহই চায় না অসুখের সৃষ্টি করিতে। তাহারা চায় বাঁচিতে এবং তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিতে। মনে হয় সৃষ্টির ইহাই নিয়ম ; সকল প্রাণীর মধ্যেই, এমন কি মানুষের মধ্যেও এই ইচ্ছা অন্তর্নিহিত আছে। ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে অসুখের সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। অনেক ভাইরাস আছে, তাহারা সাধারণতঃ জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে—মশা বা অন্যান্য কীটের দ্বারা জন্তু হইতে জন্তুতে সংক্রামিত হয়। মানুষ অনেক সময়—ঘটনাচক্রে সেই আবর্তনলীলার মধ্যে পড়িয়া যাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। পীতজ্বরের ভাইরাস মশা বা বাঁদরের মধ্যে সাধারণতঃ সীমিত থাকে ; মহীশূর অঞ্চলে একরকম ভাইরাস (K. F .D. Virus) জঙ্গলের ছোট ছোট জন্তু ও জন্তুকীট (tick)-এর মধ্যে বিবর্তিত থাকে। মানুষ জঙ্গলে বা জঙ্গলের কাছে যাইয়া ঐ সকল মশা বা কীটের কামড়ের দ্বারা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এইসব ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে আসিয়া অনেক সময় ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির ত সুবিধা হয়ই না, বরং সেই দিক হইতে তাহার অনেক ক্ষতি হয়। সে যাহাই হউক, মানুষকে তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য এখন শুধু মানুষের অসুখের ভাইরাসকে জানিলেই চলিবে না, জীবজন্তু পশুপক্ষীর ভাইরাসকেও জানিতে হইবে। কাগজে দেখিয়াছেন আমেরিকার টেক্সাস (Texas) অঞ্চলে বর্তমানে একরকমের ভাইরাস (V. E. E. Virus) হাজার হাজার অশ্বের প্রাণনাশ করিতেছে, এবং কিছু কিছু মানুষেরও অসুখের সৃষ্টি করিতেছে। আমেরিকার ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কি করিয়া এই ভাইরাসের বিস্তার রোধ করা যায়। মানুষের অসুখ যদি নাও হয়, হাজার হাজার অশ্ব গবাদির অসুখ হইলে বা প্রাণনাশ হইলে মানুষ কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে ? আগেই বলিয়াছি, নানারূপ ফসলের অসুখের কারণও ভাইরাস। সুস্থ ও উন্নত জাতির জন্য সুস্থ ও সবল গবাদি পশু ও পুষ্টিকর নীরোগ ফসল-- দুই-ই দরকার। তাই এখন মানুষের নিজের স্বার্থেই ভাইরাসকে জানা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

"সজ্জনগণ সকল অসত্যের হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে সুখী হোন, রাষ্ট্রপাল ধর্মের অনুবর্তী হ'য়ে দেশরক্ষা করুন, মেঘসকল প্রজার সুকৃতির ফলে সর্বঋতুতে বারিবর্ষণ করুক এবং প্রজাবৃন্দ বন্ধু-স্বজন-সহবাসে আনন্দ উপভোগ করুক।"—ভবভূতি

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন ও গণতন্ত্র

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও রাজনৈতিক চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই চিন্তাপ্রবাহ ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের অঙ্গীভূত হয়নি। ব্রিজির সাধারণতন্ত্রের (republic) উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধের যে উপদেশবাণী তা গণতান্ত্রিক ধারণায় ভরপুর—সন্দেহ নেই।[১] কিন্তু তা ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ দ্যোতক নয়। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে গবেষণার প্রথম যুগে জয়াসয়াল প্রভৃতি গবেষক ভিন্ন মত পোষণ করলেও পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে দেখিয়েছেন, প্রাচীন ভারতে যে 'সভা' 'সমিতি' প্রভৃতি সংস্থা ছিল তা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কোন পরিচয় প্রদান করে না, কারণ তারা ছিল ধর্মব্যবস্থারই বিভিন্ন সংস্থা।

আদর্শবাদভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শন

এইভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন গণতান্ত্রিক ধারণা থেকে বিচ্যুত হলেও এই রাষ্ট্রদর্শন যে আদর্শবাদভিত্তিক তাতে কোন সন্দেহই নেই। (এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, আঠার শতকের প্রথম ভাগেও ইয়োরোপে 'গণতন্ত্র'কে আদর্শ বলে মনে করা হ'ত না।) এখানেই হ'ল পাশ্চাত্য ও ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন অনেকাংশে ভূয়োদর্শনমূলক (empirical) এবং মেকিয়াভেলিবাদভিত্তিক।[২] ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন কিন্তু কোনকালেই ভূয়োদর্শন বা মেকিয়াভেলিবাদকে সমাদর করেনি। এমনকি কৌটিল্য, যাঁকে অনেক সময় মেকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করা হয়, নৃপতিকে নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, অন্যথায় সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরও বিনষ্ট হবেন।[৩] শুক্রাচার্য বলেছেন, নৃপতি প্রথমে নিজেকে নিয়মানুবর্তী করবেন, তারপর তাঁর পুত্রগণকে, তারপর তাঁর মন্ত্রীদের, তারপর রাজভৃত্যদের এবং সর্বশেষে প্রচেষ্টা করবেন প্রজাবৃন্দকে নিয়মের অধীনে আনবার।[৪] রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, রাজধর্ম ও লোকধর্ম এক নয়—ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ তা কোন-

---

১ বুদ্ধদেবের এই বাণী হ'ল : "যতদিন পর্যন্ত ব্রিজিবাসীরা তাদের পূর্ণ গণ-সম্মেলনকে নিয়মিত আহ্বান করে যাবে ততদিন তাদের কোনপ্রকার অবনতি না হ'য়ে সমৃদ্ধি ঘটতে থাকবে।" মহাপরিনির্বাণ সুত্ত, ১-৪ (Rhys Davids, Budhist Suttas, 3)

২ এপিকিউরিয়ানদের বোধহয় মেকিয়াভেলিবাদের পথিকৃৎ বলে বর্ণনা করা যায়।

৩ অর্থশাস্ত্র ১ : ৬ (শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ)

৪ Binoy K. Sarkar : Sukraniti

কালেই স্বীকার করেননি, বরং গান্ধারীর উক্তি যে—

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।[৫]—তাকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের ধ্যানধারণাকে রূপায়িত করেছেন। এবং এইভাবে 'অর্থশাস্ত্র' বা বাস্তব শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত বিদ্যা অনুপ্রবেশ করেছে 'ধর্মশাস্ত্র' বা চরম বিধি (Supreme Law)-সম্পর্কিত বিদ্যার ক্ষেত্রে।

ধর্মশাস্ত্র :

এই চরম বিধি বা ধর্মের কাছে দায়িত্বশীলতাই ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল সুর—মনু থেকে শুক্রাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ থেকে মহাত্মা গান্ধী সকল চিন্তাবিদ্‌দের রচনাতেই সুরটি সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনিত। স্মরণ রাখতে হবে, এই প্রসঙ্গে ধর্ম বলতে ভারতীয়রা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা উপাসনাপদ্ধতি বোঝেননি, বুঝেছিলেন চরম লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত কল্যাণধর্মী সামাজিক রাজনীতির সমষ্টিকে[৬]। লক্ষ্য যখন চরম—সত্য শিব সুন্দরের সাধনা-সম্পর্কিত বিধিও তখন চূড়ান্ত এবং সকলকেই এই বিধির অনুবর্তী হয়ে চলতে হবে। শান্তি পর্বে ব্যাসদেব এ-সম্পর্কে দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় বলেছেন: ন্যায়ই ধর্ম, জীবের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ঈশ্বর ধর্মের সৃষ্টি করেছেন…শেষপর্যন্ত সকল নৃপতিকেই ধর্মের কছে দায়ী হতে হবে।[৭]

ভারতীয় জীবনদর্শনের কয়েকটি গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়: উদারতা, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমতাশীলতা। এর ওপর আছে সকলকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন দেখবার ইচ্ছা। তাই প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর 'সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'—সকলেই সুখী হোক, সকলেই নীরোগ হোক—এই প্রার্থনাকেই ভারতীয় দার্শনিকরা পর্যাপ্ত বলে মনে করেননি। অনুরূপভাবে তর্পণের মন্ত্রে 'দেবতা যক্ষ হইতে শুরু করিয়া ক্রুর সর্প পর্যন্ত' সকলকেই পরিতৃপ্ত করবার প্রচেষ্টাকেও যথেষ্ট বলে মনে করেননি। ফলে তাঁরা আরও প্রার্থনা করেছেন:

সর্ব স্তরতু দুর্গাণি
সর্বো ভদ্রানি পশ্যতু
সর্বঃ শান্তিমবাপ্নুয়াৎ
সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু—

সকলেরই দুর্গতি দূর কর, সকলেরই মঙ্গল কর, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক, সর্বত্রই যেন সকলে আনন্দ করে। আত্মার একত্বে পূর্ণ বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসাবে এই সব প্রার্থনার সুর ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত। 'ধর্মের নভোমণ্ডলে'[৮] অবস্থান করে সকলেই সম্প্রসারিত হোক—সকলেই চরম লক্ষ্যের পথে চলুক—এই হলো ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: এখন আমরা জাগ্রত করবার চেষ্টা করব পাশ্চাত্য ভাবধারায় মগ্ন প্রতীচ্যবাসীদের নয়— পাশ্চাত্য গুরুকুলের সুবোধ শিষ্যদের নয়, যারা পাশ্চাত্যের সফলতা-

---

৫ গান্ধারীর আবেদন

৬ 'ধর্ম' বলে অভিহিত ভারতীয়দের এই ধারণাকে বোধহয় সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের (St. Thomes Acquinas) শাশ্বত বিধির ('eternal law') সঙ্গে তুলনীয়। সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের এই শাশ্বত বিধি অন্য সব বিধি-ব্যবস্থার উৎস।

৭ Pratap Chandra Roy: The Mahabharata of Krishna Dwaipayana Vyasa, VII, 290, 304

বিফলতার চক্রের মাত্র পুনরাবৃত্তিই করতে সমর্থ; জাগ্রত করবার প্রচেষ্টা করব সেই শাশ্বত শক্তিকে যার মাধ্যমে ধর্মের পূর্ণ অর্থ ও ব্যাপকতর রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।[৯]

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

ধর্ম বা চরম বিধির কাছে অনুবর্তিতার মতবাদ থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মের উদ্দেশ্য মহৎ বলে ধর্ম মানুষের কাছ থেকে মহৎ প্রকৃতিই দাবি করে, এবং মানুষ মহৎ হলে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও উন্নত হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ঐকান্তিকতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন: "সমাজ ব্যবস্থাই হোক, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই হোক সকলেরই ভিত্তি মানুষের মহত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনসভা এই আইন বা ঐ আইন প্রণয়ন করলেই কেবল জাতি মহৎ বা বড় হয়ে ওঠে না, ওঠে যদি মানুষ মহৎ এবং বড় হয়।" "The basis of all systems, social or political rests upon the goodness of men. No nation is good or great because Parliament enacts this or that, but because its men are good and great." [১০]

সত্যযুগে মানুষ ছিল পবিত্র। সুতরাং তখন ধর্মরক্ষার জন্য নৃপতি বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কোন প্রয়োজন হয়নি। ক্রমে ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি যুগে মানুষের প্রকৃতি যত বিকৃত হতে লাগল, ধর্মের ক্ষেত্রে ততই দেখা দিল সঙ্কট। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ হল নৃপতির অধীনে বা রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে সংঘবদ্ধ হওয়া।

এই মতবাদ সতের শতকের ইংরেজ দার্শনিক লক্ এবং আঠার শতকের ফরাসী দার্শনিক রুশোর 'পতনবাদ' (doctrine of fall) অনুরূপ। লক্ ও রুশোর মতে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্ভবের আগে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থার (state of nature) মধ্যে বাস করত।[১১] প্রথমে এই প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল বিশুদ্ধ, কিন্তু ক্রমে তা বিকৃত হয়েছিল বলেই 'সামাজিক চুক্তির' (social contract) মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন অনুসারে সত্যযুগের পর পথভ্রষ্ট মানুষকে আবার ধর্মপথে পরিচালিত করবার জন্যেই নৃপতি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়েছিল। ধর্মপথে পরিচালিত করবার প্রথম স্তর হলো মানুষকে অরাজকতা-ও মৎস্যন্যায়মুক্ত করা।

ধর্মশাসিত সমাজ ও রাষ্ট্র

নৃপতি অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে অপরিহার্য বিবেচিত হলেও 'সামাজিক চুক্তিমতবাদ' (social contract theory) ভারতীয় রাষ্ট্র-দর্শন দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হয়নি, এমনকি বলা যায় যে, এরকম চুক্তির কল্পনাও বিশেষ করা হয়নি।[১২] এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি এবং জনসাধারণ—উভয়ই ছিল ধর্মশাসিত। সুতরাং লকের মতবাদের মত সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাজ-ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রাখা অথবা হবসের মত-

৮। 'Firmament of Law'—R. M. Mac Iver : Web of Government

৯। The Spirit and Form of Indian Polity

১০। Interview in London, C. W., V.

১১। সতের শতকের ইংরেজ দার্শনিক হবসের অনুরূপ ধারণা ছিল।

১২। মহাভারতের শান্তি পর্বে এবং অনুশাসন পর্বে 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়।

বাদের মত ঐ রকম কোন চুক্তির দ্বারা নৃপতিকে চূড়ান্ত অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা—কোনটিরই প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য দু'এক ক্ষেত্রে চুক্তির কল্পনার মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রজা-বিদ্রোহের অধিকারকে সমর্থন করা হয়েছে। যেমন মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৩শ পরিচ্ছেদে ভীষ্ম বলেছেন, "যিনি (যে রাজা) প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না, সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।"[১৩] বলা যায়, এই প্রজারক্ষার দায়িত্ব ধর্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মনুসংহিতাতে আছে, "ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলে বন্ধুবর্গ সহ রাজাও দণ্ড দ্বারা হত হয়েন।"[১৪]

বস্তুতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অধিকার নয়—কর্তব্য। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নিয়ে ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গণ মাথা ঘামাননি, এবং ফলে সিংহাসন যে রাজার নিজের সুখের জন্য নয়, রাজা যে প্রজার শক্তিতেই শক্তিমান,[১৫] তাঁর অধিকারের ওপর যে আছে তাঁর কর্তব্য—এই ধারণাই প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রদর্শনে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছে। শুধু প্রাচীন কালের কথা নয়, আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনেও এইটিই হল মূল সুর। বলা যায়, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' গল্প এবং 'বিসর্জন' নাটকের সুরে ভরপুর। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু এই কথাই বিশ্বকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[১৬]

(ক্রমশঃ)

১৩। রাজশেখর বসু: মহাভারত

১৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায়: সামাজিক প্রবন্ধ

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র: ভক্তির পাত্র

১৬। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত', মহাত্মা গান্ধীর Young India II দ্রষ্টব্য

দয়া ও মায়া

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়

সর্বভূতে যেই প্রেম তার নাম দয়া,
আত্মজনে ভালবাসা তার নাম মায়া।
দয়ার নিলয় দেহ-মনাতীত দেশে,
মায়া থাকে দেহ-মনে আসক্তির বেশে।

করিতে বন্ধনমুক্ত দয়ার প্রকাশ,
মায়া আরো শক্ত ক'রে দেয় অষ্টপাশ।
মায়া সে হৃদয়ে করে গোষ্পদ সমান,
প্রেম-পারাবার হয় যেই দয়াবান।

দাক্ষিণাত্যভ্রমণ

স্বামী ঋদ্ধ্যানন্দ

গত ৩১শে মে মাসে স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বোম্বে আশ্রমে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর সমাগম হয়েছিল। দক্ষিণভারত থেকেও অনেকে এসেছিলেন। তাঁদের কাছেও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু খবরাখবর পেলাম। বাসে ভ্রমণ করবো ঠিক করলাম। দক্ষিণ ভারতের বাস-সার্ভিস নাকি খুব ভাল।

১৫ই জুন মঙ্গলবার। বোম্বে-মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেস-এ রওনা হলাম। মাদ্রাজ পৌঁছে প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে। সকাল ৭-৫০ মিঃ ট্রেন ছাড়ল। কল্যাণ, কার্জাত্ স্টেশন পার হবার পর থেকেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা—ধাপে ধাপে সমুদ্রের দিকে নেমে এসেছে। এই পর্বতমালা সমুদ্রের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে দক্ষিণ দিকে ত্রিবান্দ্রম্ পার হয়ে চলে গেছে। কার্জাত্ থেকে লোনাভলা পর্যন্ত দুটি ইঞ্জিন গাড়ী টানে। লোনাভলার পরে মালভূমি। পুণা পর্যন্ত রেল-লাইনের দুধারে অনেক কলকারখানা গড়ে উঠেছে। এই সব জায়গা কার্পাস চাষের উপযোগী। কালো মাটি। গাড়ী চলতে লাগলো। রেলের দুধারে বৈচিত্র্য কিছুই নেই। রাত্রি ৯টায় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি রেললাইনের দুধারেই অসংখ্য তালগাছ। সেইজন্যই স্টেশনটির নামও তালপত্রী। এই তালপাতা গরীবদের ঘর ছাউনীর কাজে লাগে। অদূরেই দ্রোণাচলম্ পর্বত। তার নামকরণের ইতিহাস জানা নেই। দূর থেকে পর্বতের উপরিভাগ খুব সমান দেখায়, যেন 'রোলার' চালিয়ে উপরটুকু 'লেভেল' করে দেওয়া হয়েছে। ট্রেন সকাল থেকেই জোরে চলছে। পর্বত সামনে। সমতলভূমির সমান লেভেলেই রেল লাইনটি আঁকা বাঁকা হয়ে পর্বত পার হয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে গেল। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আশে-পাশের চাষকরা জমিগুলির দিকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে দেখলাম। জমির উপরের মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এসে জমা হয়েছে। চাষীরা এই মাটি আবার উঠিয়ে গরুর গাড়ী করে সেই সব জমিতেই সার হিসাবে ব্যবহার করছে। মাঝে মরুভূমির মত মনে হয়, চাষ-বাস নেই! আবার কেউ কেউ বৈদ্যুতিক পাম্প চালিয়ে এই শুষ্কহৃদয় মরুভূমিতে সরস মরূদ্যানের সৃষ্টি করছে। রেণীগুণ্টা জংশনে পৌঁছলাম। এখান থেকে তিরুপতি হয়ে কাটপাড়ি, আবার অন্যদিকে কালহস্তী হয়ে গুডুর যাওয়া যায়। অল্প পরেই, ১টা ৫৫ মিনিটে আমরা মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। ২-৩০ মিঃ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে পৌঁছলাম। সন্ধ্যার দিকে আমাদের অনেক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মায়লাপুরের শিবমন্দির-দর্শনে গেলাম। তামিল ভাষায় ময়ূরকে 'ময়লা' বা 'মায়লা' বলা হয়। পার্বতী ময়ূরের রূপ ধরে মহাদেবের তপস্যা করে এইখানেই তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। এখনও এই মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে দু-একটি ময়ূরকে রাখা হয়—যা স্মরণ করিয়ে দেয় তপস্বিনী পার্বতীর কথা।

পরদিন, ১৭ই জুন আমরা সকালে মোটরে মহাবল্লীপুরমের দিকে চললাম। একটি প্রস্তর-

গাত্রে খোদিত চিত্রাদি। পহ্লব-বংশীয় রাজা নরসিংহ বর্মনের সময়েই এই খোদাই-এর কাজ হয়। চিত্রগুলি যথাক্রমে: অর্জুনের তপস্যা, পঞ্চপাণ্ডব-মণ্ডপম্। একটু দূরে শ্রীস্থলশয়ান বিষ্ণুমন্দির, পঞ্চরথ ইত্যাদি। সমুদ্রতীরের মন্দিরটিতেও স্থলশয়ান ও শিবলিঙ্গ বর্তমান। মহাবল্লীপুরম্-দর্শনের পর দশ মাইল চ'লে পক্ষিতীর্থ মন্দিরটি দূর থেকেই দেখতে পেলাম। খুব খাড়া পাহাড়, তার ওপর মন্দির। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়। শিবলিঙ্গ দক্ষিণমুখী। দর্শনার্থীরা মন্দিরদর্শনের পর নীচে অপেক্ষা করেন শিব-রূপী পক্ষিদর্শনের জন্য। বিকাল ২টা-৩টার মধ্যে পূজারী ভোগনিবেদন করার কিছু পরেই কোথা থেকে দুটি পাখী এসে সেই ভোগ গ্রহণ করে। মন্দিরের হর-পার্বতীর নাম—বেদগিরীশ্বর ও ত্রিপুরাসুন্দরী। সেখান থেকে আমরা চললাম কাঞ্চীপুরমের দিকে। আগে বিষ্ণুকাঞ্চি দেখে নিলাম—ভরদ্বাজ মন্দির। তারপরে কাঞ্চীপুরম্ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে কিছুক্ষণ বিশ্রামাদি করে বিকালে শিবকাঞ্চি বা আম্রেশ্বর দর্শন এবং কামাক্ষী মন্দির দর্শন করে শ্রীরামানুজাচার্যের জন্মস্থান 'শ্রীপেরমবুদুর' যাই। সেখানে একটি মন্দির আছে, আর তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থানটিতে লেখা আছে 'রামানুজ-অবতারস্থলম্'। শিব কাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি ও শ্রীপেরমবুদুর—এই তিন মন্দিরেই এক একটি করে তিনটি হাতি আছে এবং সবসময়েই হাতির কপালে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া থাকে, যাতে বোঝা যায় হাতিটি কোন্ মন্দিরের।

১৮ই জুন, শুক্রবার। স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে যে পার্থসারথির মন্দিরের কথা আছে, সেই পার্থসারথির মন্দির দর্শন করে এলুম। পার্থসারথির মূর্তিতে লম্বা গোঁফ, সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে যা দেখা যায় না।

১৯শে জুন, শনিবার। আমরা সকালে ৬-৩০টায় বের হয়ে এক্সপ্রেস বাস ধরে তিরুপতি পৌঁছলাম বেলা ১২টায়। সেখান থেকে অন্য বাস—তিরুপতি হতে তিরুমালাই পাহাড়ের উপর পর্যন্ত যাতায়াত করে। এই বাস-সার্ভিস্ সম্পূর্ণভাবে দেবস্থান কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন। লাইনে দাঁড়ালাম, চার-পাঁচশো লোকের পিছনে আমরা তিনজন। কিছুক্ষণ পর পর ৮।১০ হাত এগিয়ে যাই। এক একবার একটি দুটি বাস ফেরত আসে তিরুমালাই থেকে, আর অপেক্ষমান যাত্রীরা হুড়মুড় করে উঠেন বাসে। বাস ছাড়ে, আবার আসে। এইভাবে সারাদিন চলে। রাত্রে ক'টা পর্যন্ত চলে জানা নেই। তবে পাহাড়ের ওপরের রাস্তা খুব আঁকাবাঁকা বলে বেশী রাত্রি পর্যন্ত বাস চলে না। আমরা প্রায় ৫ টার সময়ে তিরুপতি দেবস্থানম্ বাস স্টেশনে পৌঁছলাম তিরুপতি মন্দিরের কাছে, তিরুমালাই পাহাড়ের ওপর। এখানে থাকার জন্য অনেকগুলি একতলা বাড়ী তৈরী হয়েছে। কতকগুলি বাড়ী দাতাদের নামে তৈরী; আবার কতকগুলি মন্দির কর্তৃপক্ষ তৈরী করে রেখেছেন—অল্প ভাড়াতে থাকতে দেন। আলো, জল, বাথরুম, রান্নাঘর, শোবার ঘর সবই আছে। অনেকগুলি বাড়ী নিয়ে একটি ইউনিট করা হয়েছে। তার সঙ্গে অফিস আছে। দিবারাত্র খোলা থাকে। এক একটি ইউনিটে এক একটি ক্যান্টিন। ক্যান্টিনেও খাওয়া যায়, ইচ্ছা হলে জিনিসপত্র কিনে রান্না করেও খাওয়া যায়। শীঘ্র দর্শনের সুবিধাও হয়ে গেল। তিরুপতিদর্শনে অনেক সময় লাইনে দাঁড়িয়ে প্রায় ৬।৭ ঘন্টা পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে হয়। স্থানীয় ভাষায় 'তিরু' মানে 'শ্রী'; কাজেই তিরুপতি অর্থ শ্রীপতি বিষ্ণু। এদিকের অধিবাসীর কাছে তিনি 'বেঙ্কটেশ্বর স্বামী' নামে পরিচিত। স্বয়ং লক্ষ্মীকে তাঁরা বলেন 'শ্রী আলামেলু মাঙ্গাম্মাল'। এই মন্দিরের চূড়া ও মঙ্গলঘটাদি স্বর্ণনির্মিত বলেই মনে হল। সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় দেবদর্শন হয়ে গেল। তারপর খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ভোর ৩টায় আমরা বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হলাম। ভোর ৩টা থেকেই মন্দিরে মধুর স্বরে 'সুপ্রভাতম্' গীত হয়। দেবস্থানম্ স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে আমরা 'কালহস্তী' যাওয়ার একখানা বাস ধরলাম। একঘণ্টা পরেই 'কালহস্তী' পৌঁছলাম। এখানে শিবমন্দির। দর্শনাদির পর 'রেণিগুণ্টা' হ'য়ে মাদ্রাজে ফিরে আসি। 'রেণিগুণ্টা' ফিরে এলাম তখনই যাত্রা করে।

২১শে জুন সোমবার। সকালে বাসে ক'রে তম্বারম্, চিঙ্গেলপেট, পণ্ডিচেরী, কুড্ডালোর (সাউথ আর্কট) হয়ে প্রায় বিকাল ২টায় পৌঁছি চিদাম্বরমে। সেখানে আহার বিশ্রামাদির পর চিদাম্বরমের বিখ্যাত নটরাজ (শিবের) মন্দির দেখতে যাই। ইনি আকাশলিঙ্গম্। নটরাজ মন্দিরের পাশেই গোবিন্দরাজ (অনন্তশয়ান বিষ্ণু) মন্দির। সুবিধামত জায়গায় দাঁড়ালে এই দুই মন্দিরের পূজাদি একই সঙ্গে দেখা যায়। নটরাজ মন্দিরের সন্ধ্যারাত্রিক খুব উপভোগ্য—বিভিন্ন আকারের প্রদীপাদির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, পতঞ্জলি মুনি এইস্থানে বসেই যোগসূত্র রচনা করেন। তিনি মহাদেবকে তাঁর নাচ দেখাবার জন্য অনুরোধ করেন। নর্তনের পর নটরাজ 'অরূপ' অর্থাৎ নিরাকার বা রহস্য হয়ে গেলেন। (বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর চিদাম্বরমে কয়েকদিন থেকে নটরাজের নৃত্যের ভঙ্গিমাগুলি তন্ন তন্ন করে লিখে এবং এঁকে নিয়ে গিয়ে ছিলেন।)

রাত্রি ৭-৫৭ মিনিটে মাদুরাই জনতা এক্সপ্রেসে উঠে মধ্যরাত্রিতে ত্রিচিনাপল্লী পৌঁছি। জনবিরল রাজপথ ধরে একটি হোটেলের দরজায় উপস্থিত হ'লাম। জায়গা নেই বলাতে আমরা 'অজন্তা' হোটেলে উঠি। সেখানেই রাত ১৷৷টার সময়ে একটি ঘর ভাড়া করে শুয়ে পড়ি। সকালে একটি অটো রিক্সা ভাড়া করে রক্ টেম্পল (গণেশ, শিবলিঙ্গম্ ও দুর্গা), জম্বুকেশ্বর শিবমন্দির দেখতে যাই। এই মন্দিরে ৭টি গোপুরম্; প্রত্যেকটিই অতি সুন্দর—কথিত আছে, জম্বু মুনি শিবদর্শনের জন্য এখানে তপস্যারত ছিলেন। তখন তাঁর মস্তক ভেদ করে জম্বুবৃক্ষ নির্গত হয়। সেই থেকেই জম্বুমুনি কর্তৃক তপস্যালব্ধ শিবের নাম জম্বুকেশ্বর। এটি শিবলিঙ্গম্। তারপর আমরা আবার শ্রীরঙ্গম্ রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে শ্রীরঙ্গম্ মন্দির দেখতে যাই। এটি বিষ্ণুমন্দির—অনন্তশয়ান বিষ্ণু, স্থানীয় নাম 'শ্রীরঙ্গনাথার'। শ্রীরঙ্গম্ কাভেরী নদীর তীরেই। শ্রীরঙ্গম্ও শ্রীরঙ্গপত্তনম্—দুইটি পৃথক স্থান। দুইটিই কাভেরীর কূলে—প্রথমটি মাদ্রাজদেশে, অর্থাৎ শ্রীরঙ্গম্; আর দ্বিতীয়টি মহীশূর-দেশে—টিপু সুলতানের রাজধানী। দ্বিতীয়টি বোধ হয় পরবর্তীকালে প্রথমটির অনুকরণে তৈরী। দুইটিতেই শ্রীরঙ্গনাথ বিরাজিত। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই বিশালাকৃতি গরুড় মন্দির দেখা যায়। এত বড় গরুড় মূর্তি আরও কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলেই অনন্তশয়ান

শ্রীরঙ্গনাথার। দক্ষিণ ভারতে প্রত্যেক মূর্তির সামনেই একটি উৎসবমূর্তি থাকে, অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। এই মূর্তিই উৎসবাদির সময় শোভাযাত্রায় নেওয়া হয়। এইটি চিদাম্বরমের গোবিন্দরাজের মূর্তির মতই।

২২শে জুন মধ্যরাত্রে রামেশ্বরম্ এক্সপ্রেস্ ধরলাম। সকালে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। রামনাদ পৌঁছলাম। এরোপ্লেন্ নামবার ছোট একটি জায়গা আছে। তার নাম এখনও রামনাদ; কিন্তু রেল-স্টেশনের আধুনিক নাম রামনাথপুরম্। লাইনের দুই দিকেই অসংখ্য তালগাছ। আমরা ক্রমশঃ মানচিত্রের সূক্ষ্মাংশের মধ্য দিয়েই চলেছি দুই দিকেই সমুদ্র, কোন দিকে কম, কোন দিকে বেশী মনে হয়। ভারতভূখণ্ডের সর্বশেষ রেলস্টেশন মণ্ডপম্। এই পর্যন্ত মোটরগাড়ীও চলে। যাঁরা মোটরে দক্ষিণভারতের রামেশ্বরমে যান, তাঁরা এখানেই গাড়ী রেখে ট্রেনে পুল পার হয়ে রামেশ্বরম্ দ্বীপে যান। গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ালো। ব্রিজের সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ট্রেনকে যেতে অনুমতি দেওয়া হলো। ওপারেই পাম্বান জংশন—একটি লাইন ধনুষ্কোটি, অন্যটি রামেশ্বরম্ চলে গেছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সেই ধেনুষ্কোটি নাকি এখন সমুদ্রের তলে, রেল লাইন ভেঙ্গে চুরমার। সপ্তাহে দুইদিন যে জাহাজটি সিংহলের তালাইমান্নার যায়, সেটি এখন রামেশ্বরম্ থেকে ছাড়ে। আজ ২৩শে জুন, বুধবার। সকাল ৯-৪৫ মিনিটে রামেশ্বরম্ পৌঁছি।

রামেশ্বরম্ দেবস্থানমের অফিসে দেখা করে প্রথমে 'বাসা পাকড়ে' নিলাম। তারপর স্নানাদি সেরে একবার সংক্ষেপে অল্প সময়ের জন্য রাম-সীতা-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করে নিলাম। একটি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ২।৩ ঘন্টা বেশ বিশ্রাম। বিকাল ৩-৩½টায় সমুদ্রস্নান সেরে নিয়ে আবার বিস্তারিতভাবে দর্শনের জন্য মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। কথিত আছে, রাবণ-বধ ও সীতা-উদ্ধার করে ফিরবার সময় শ্রীরামচন্দ্রকে ঋষি মুনিরা শিবপূজার উপদেশ দেন। কৈলাস থেকে শিব-লিঙ্গ আনবার জন্য মহাবীরকে বললেন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু মহাবীরের আসতে দেরী হওয়ায় রাম-সীতা বালুকা দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে শুভ মুহূর্তে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন। এদিকে কিছু পরে শিবলিঙ্গ নিয়ে হনুমানও উপস্থিত। ভক্তের পরিশ্রম নিষ্ফল না করার জন্য অদূরেই মহাবীর আনীত লিঙ্গটিও প্রতিষ্ঠিত হল এবং রামের আদেশে এই লিঙ্গপূজাই এখনও প্রথমে হয়, পরে রাম-সীতা-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পূজা হয়। মহাবীর-

ষ্ঠিত লিঙ্গকে বলা হয় বিশ্বনাথার, কাশী-লিঙ্গম্ বা হনুমানলিঙ্গম্। ভক্তগণ প্রথমে পূজা করেন 'বিশ্বনাথার' ও 'বিশালাক্ষী'র, পরে 'রামনাথার' (রামলিঙ্গ বা রামেশ্বর) ও 'পর্বতবর্তিনী'র) মন্দিরপ্রাঙ্গণে ছোট-বড় দেবদেবী প্রায় ১৫।২০ জন হবেন, ২৪টি তীর্থ বা কুণ্ড, মন্দিরের বাইরে আরও ৭।৮টি কুণ্ড রয়েছে। প্রায় ঘন্টাখানেক দর্শনের পর আমরা টাঙ্গা করে গন্ধমাদন পর্বতে গেলাম। মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন রয়েছে—তাকে বলা হয় 'রামঝুক্কে'। সন্ধ্যা ৬টায় ফিরে এসে আরাত্রিকে যোগ দিলাম। মন্দিরের আরাত্রিক শেষ হওয়ার পর পুরোহিত এক-একটি মন্দিরে যাচ্ছেন, আর প্রদীপের আরতি করছেন। প্রায় ঘন্টাখানেক আরাত্রিক

হলো। বেশ ভাল লাগলো। সব ক্লান্তি যেন মুছে গেল।

পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফেরার পথে সিংহল হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এই রামেশ্বরম্ দ্বীপেরই পাম্বানে প্রথম পদার্পণ করেন। তাঁরই শিষ্য রামনাদের মহারাজের সুব্যবস্থায় রামেশ্বর মন্দিরাদিও দর্শন করেন। কন্যাকুমারীতে আমেরিকা যাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগেও তিনি রামেশ্বর দর্শন করে গিয়েছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী রামেশ্বরম্ দর্শনে এসেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় শ্রীশ্রীমা ১০৮টি সোনার বেলপাতা দিয়ে রামেশ্বরের পূজা করেছিলেন। পরে ফিরে এসে ভক্তদের কাছে এই রামেশ্বর শিব-দর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, 'যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন।'

২৪শে জুন ট্রেনে মাদুরাই রওনা হলাম। মাদুরাই বেশী দূর নয়। দূর থেকেই মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম্ দেখা যাচ্ছে। ১-৩৫ মিনিটে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামল। জনৈক ভদ্রলোক তার বাড়ীতে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। বিকালে 'তিরুমালাই নায়ক'-এর রাজপ্রাসাদ, পরে মাদুরার বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির গেলাম। মন্দিরে প্রবেশ করার কিছু পরেই ডানদিকে একটি মিউজিয়াম দেখা যায়—দক্ষিণভারতের বিভিন্ন মন্দির ও ভাস্কর্যের ফটো ও সংগৃহীত অনেক কিছুর সমাবেশ। মীনাক্ষী দেবীর সান্নিধ্যে যাওয়ার আগেই বাঁ দিকে পদ্মপুকুর; খুব বড় নয়, তবে বোধ হয় এই জল তুলেই দেবীকে স্নান করানো হয়। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেই মীনাক্ষীদেবী। রামে-শ্বরমের 'পর্বতবর্তিনী' ও কন্যাকুমারী মন্দিরের দেবী 'কুমারী'—এই দুই মূর্তির গঠন প্রায় এক রকম। এই মন্দিরটি নাকি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল। (ক্রমশঃ)

অমৃতসম্ভব

শ্রীমতী বিভা সরকার

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রশেষে
মহা প্রশান্তির দেশে
প্রস্ফুটিত প্রাণপদ্মে
দাঁড়ায়েছ জীবন-বল্লভ।
উত্তাল তরঙ্গগুলি
বিদ্রোহের সুর ভুলি
অতলান্ত স্তব্ধতায়
হল আজ অমৃতসম্ভব।
মন্থনের বিষ যত
পান করি অবিরত
আত্মভোলা ভোলানাথ
শঙ্করের কণ্ঠ হল নীল।
জীবের কল্যাণ স্মরি
দুষ্টের দমন করি
ব্রজের কিশোর হরি
অরিশূন্য করিল নিখিল!

হিংসা-নাগিনীর ফণা
উদ্গারিছে অগ্নিকণা
বিদ্বেষের মহাবহ্নি
বার বার পোড়ায় বসুধা,
অন্যায়-অসত্যে হানি
বাড়ায়ে দক্ষিণ পাণি
দেবলোক হতে আনি
হে সুন্দর, বিতরিছ সুধা।
উদ্ভাসিয়া মনোলোক
জ্যোতির প্রকাশ হ'ক,
ফোটালে সহস্রদলে
কুণ্ঠিত এ প্রাণপদ্ম মোর।
অতল প্রশান্তি মাঝে
মনহংস ডুবিতেছে
মধুর গুঞ্জন-মত্ত
আজি তাই মানস-ভ্রমর।

স্বামীজীর কালজয়ী যুগপ্লাবী চিন্তাধারা-প্রসঙ্গে

স্বামী জীবানন্দ

✓ স্বামীজীর ভাবধারার গভীরে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই মনে হয় এ যেন সত্য-সত্যই সমুদ্রদর্শন! ভাবী কালের মানুষের জন্য কত অমূল্য বস্তু রেখে গেছেন স্বামীজী! ধর্মে, দর্শনে, দেশপ্রেমে, সমাজসংস্কারে, সেবায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে—যেদিকে দৃষ্টি পড়ছে সর্বত্রই তাঁর চিন্তার মৌলিকতা, অপূর্ব বিপ্লবাত্মক দিগ্‌দর্শন রয়েছে, দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। স্বামীজীর বাণীতে আছে বৈদ্যুতিক শক্তি। সে বাণী ঘুমন্ত মানুষের কানে প্রবেশ করলে জাগিয়ে দেবে তাকে! ঘুমন্ত যে সে জেগে উঠবে, জাগরিত যে সে কর্মে ব্রতী হবে অতন্দ্রিতভাবে। স্বামীজী হচ্ছেন অশরীরী বাণী। তাঁর নিজেরই উক্তি: ' I am a voice without a form.'

এখানে উপস্থাপিত হ'ল স্বামীজীর কালজয়ী কয়েকটি চিন্তাসূত্র সেই তরুণদের জন্য যাদের অন্তরে নিরন্তর বেজে চলেছে আগে চলার সুর, যাঁদের কণ্ঠে শোনা যায় অন্যায়ের প্রতিকার-ধ্বনি, যারা ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল, যাদের উপর নির্ভর করছে দেশের সর্ববিধ উন্নতি।

অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে উৎসাদিত না ক'রে কেবল অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরিবর্জন ক'রে নূতন সৃষ্টির আগ্রহে ভরপুর স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণী বিশেষভাবে প্লাবিত ক'রে নিয়ে যায় মানুষকে নব নব সৃজনের মূল উৎসের সন্ধানে। অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা সতর্ক থেকে লোকে ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়।

স্বামীজীর বাণী চিরায়ত ও কালজয়ী, তার আবেদন শাশ্বত। চিরন্তন হলেও পরিপূর্ণ ভাবে আধুনিক। আধুনিকতার মধ্যে লক্ষণীয় জিনিস: (১) যুক্তিনিষ্ঠ ভাব, (২) মানবিকতা-বোধ, (৩) সমাজসচেতনতা, (৪) বিজ্ঞান-দৃষ্টি। এ সবই তাঁর বাণীতে পুরামাত্রায়ই বিদ্যমান। অতএব তাঁর বাণী অতীতের বস্তু ব'লে দূরে রাখা যায় না। অনন্য-প্রজ্ঞাপ্রসূত তাঁর প্রত্যেকটি কথা পরম মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, অন্যায়ের প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে তাই বলেন স্বামীজীর বাণী বিপ্লবাত্মক।

স্বামীজী বলেছেন, মানুষ স্বভাবতই পূর্ণ-স্বরূপ; স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। তার মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি, কিন্তু সে শক্তি রয়েছে ঘুমিয়ে। সেই সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করা, অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করাই স্বামীজীর মতে ধর্ম। 'ধর্ম হচ্ছে—মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।' ধর্ম উপলব্ধির বস্তু। এই উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন মানবতাবোধ, মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন, অনলস প্রচেষ্টা, স্বার্থপরতা-ত্যাগ, কাপুরুষতা-বিসর্জন, ভালবাসার বিস্তৃতি, নিঃস্বার্থ সেবা প্রভৃতি। স্বামীজী যে ধর্মের কথা বলেছেন, সে ধর্ম পোশাকী ধর্ম নয়, তা অন্তরের সম্পদ, দুর্বার তার গতি। সে ধর্ম সমগ্র জীবনকে ধরে থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও জীবন থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে না। সে ধর্ম মানুষের প্রগতিতে কখনও বাধাস্বরূপ হয় না। তা জড়তা আলস্য তমোভাব নিঃশেষে বিদূরিত করে, শুভকর্মে উদ্দীপনা দেয়, দেহমনের সুষম বিকাশ ঘটায়, প্রকৃত স্বাধীনতার আনন্দ ও নির্ভীকতার পরিতৃপ্তিতে চিত্ত ভরপুর ক'রে

রাখে। স্বামীজী যে ধর্মের কথা বলেছেন তা না থাকলে মানুষের মতো আকৃতিবিশিষ্ট হয়েও মানুষ-নামের যোগ্য হওয়া যায় না। অতএব 'মানুষ' হতে গেলে স্বামীজীর নির্দেশিত ধর্ম প্রত্যেকেরই জীবনে অপরিহার্য।

মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসবান স্বামীজী কাউকে পাপী বলতেন না, বলতেন—মানুষকে পাপী বলাই পাপ। পাপ ব'লে যদি কিছু থাকে তবে সে পাপ দুর্বলতা, পরপীড়ন ইত্যাদি। ধর্ম ও পাপের পার্থক্যনির্দেশক তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি :

'পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে এবং নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ। বিভিন্ন শাস্ত্র শুধু ধর্মলাভের উপায় নির্দেশ করে।'

যত উচ্চ মতবাদই হোক, যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক চিন্তা তাতে থাক, যতক্ষণ তা পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ স্বামীজী তাকে ধর্ম আখ্যা দেন না।

দর্শন সম্বন্ধে স্বামীজীর যে চিন্তাধারা তাঁর বাণী ও রচনায় প্রকীর্ণ রয়েছে, তাতে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, তাঁর দর্শন মূলতঃ অদ্বৈত বেদান্ত—আরও প্রাঞ্জল ক'রে বলতে পারা যায়, অদ্বৈত বেদান্তের কর্ম-পরিণত রূপ। অদ্বয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যিনি সর্বভূতে ওতপ্রোত, তাঁকে সম্যক্ উপলব্ধি করাই হচ্ছে তাঁর 'দর্শন'। ব্রহ্মকে তত্ত্বগত না রেখে ব্রহ্মভাব জীবনে ফুটিয়ে তোলা, কথায় কাজে আচরণে থাকবে তার প্রকাশ; স্বামীজীর দর্শন প্রকৃতপক্ষে সর্বভূতে আত্মদর্শন—ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে ভূমার উপলব্ধি। এ দর্শন সীমিত নয়, সার্বভৌম। তাত্ত্বিক দিক থেকে এ দর্শনের মর্যাদা যতখানি, ব্যাবহারিক দিক দিয়ে তার মূল্য অণুমাত্রও কম নয়। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত আদর্শ ও ভাবের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হলেও স্বামীজীর দৃষ্টিতে তা আপাতপ্রতীয়মান, তাঁর মতে দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্ব একটি অপরটির পরিপূরক এবং চরম উপলব্ধির সহায়ক, এক একটি স্তর।

যেখানেই স্বামীজীর দেশপ্রেমের কথা, সেখানেই দেশের সামগ্রিক রূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; সেখানে কোন গোষ্ঠী নেই, নেই কোন দল, কোন সম্প্রদায়। তাঁর কাছে দেশবাসী মানে সর্বস্তরের জনসাধারণ, দেশের শ্রীবৃদ্ধি মানে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, সর্ববিধ উন্নতি। স্বামীজী অনুভব করতেন—সকলের সুখেই তাঁর সুখ, সকলের দুঃখে তাঁর দুঃখ। স্বামীজীর মতে দেশপ্রেমিকের থাকবে না কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ। তিনি বলছেন—'তোমরা কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ ক'রে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পার? তোমাদের হৃদয়ে প্রেম আছে তো?' অনন্ত দেশপ্রেমে থাকবে আত্মত্যাগ, দেশের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা। স্বামীজীর দেশপ্রেম সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে, তাই স্থানের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে বিদ্যমান, স্থানের সীমাবদ্ধতা নেই ব'লে বিশ্বপ্রেমে উন্নীত; কালের প্রভাবও ছাড়িয়ে গেছে ব'লে শাশ্বত প্রভায় দীপ্যমান স্বামীজীর প্রেমে আছে বিশ্বজনীন ভাব, বিশ্ব-মানবিকতা।

সমাজের পূর্ণ সংস্কারেই স্বামীজী বিশ্বাসী। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি: সমাজের যে সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক—এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তা করবার উপায় কি?. সংস্কারকগণ

সমাজকে ভেঙে-চুরে যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী দেখালেন, তাতে তাঁরা কৃতকার্য হ'তে পারলেন না। আমার প্রণালী এই: আমি এখনও এটা মনে করি না যে, আমার জাতি এতদিন ধরে কেবল অন্যায় ক'রে আসছে; কখনই নয়। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তা নয়—আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই—আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা থেকে সত্যে বা মন্দ থেকে ভালয় যেতে হবে, তা নয়; সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে, ভাল হ'তে আরও ভালয়—যেতে হবে। আমি আমার স্বদেশবাসীকে বলি—এতদিন তোমরা যা করেছ, তা বেশ হয়েছে; এখন আরও ভাল করবার সময় এসেছে।

স্বামীজীর সমাজসম্বন্ধীয় চিন্তাধারা নিম্নোক্ত বিষয়ে চিন্তাশীল মনকে প্রভাবিত করে:

(১) উপেক্ষিত জনগণের দিক থেকে সমাজবিবর্তন, (২) সমাজবিবর্তনের দিক থেকেই সমাজের ইতিহাস-বিশ্লেষণ, (৩) বৈশ্য-যুগের নিষ্ঠুর শোষণ, (৪) শোষণমূলক বৈশ্য-শাসনের বিপ্লবাত্মক পরিণতি।

ভারতের চিরপতিত অগণিত নরনারীর জন্য কারও হৃদয় কাঁদে না, তাই স্বামীজী বলছেন: 'তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদা সর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।'

স্বামীজীর অভিনব ও অনন্য সেবাদর্শের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যিনি সেবা গ্রহণ করেন, তাঁর চেয়ে যিনি সেবা করেন তাঁর লাভ বা উপকার অণুমাত্রও কম নয়, বরঞ্চ বেশি। এ সেবায় আসে হৃদয়ের অসামান্য প্রসারতা, চিরতরে ঘুচে যায় ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় সর্বপ্রকার মালিন্য। এ সেবায় বন্ধনবিমুক্তি ও লোককল্যাণ একই সঙ্গে ঘটতে থাকে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—স্বামীজী দিয়েছেন জগদ্বাসীকে বর্তমান যুগে এই মহত্তম সেবাদর্শ। শিবজ্ঞানে জীবসেবায় তাঁর প্রাণস্পর্শী আহ্বান:

> 'ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু,
> সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
> মন প্রাণ শরীর অর্পণ
> কর সখে, এ সবার পায়।'

সাহিত্যসৃষ্টিতে—গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায় স্বামীজীর যেমন অনন্যকরণীয় বৈশিষ্ট্য, যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টির দিগ্‌দর্শনের ক্ষেত্রেও তাঁর তেমনি অপূর্বত্ব বিদ্যমান। স্বামীজীর অভিমত: 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।...ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।' ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুআরি প্রদত্ত এই দিগ্‌দর্শন বর্তমানেও সাহিত্যের প্রগতির যুগে সুসাহিত্যিকদেরও

বিস্ময় জাগায়।

সঙ্গীতের মধ্যে স্বামীজী চেয়েছেন তেজ-বীর্যের ভাব। কণ্ঠে তাঁর অভীঃ-মন্ত্র, জাতিকে সর্বক্ষেত্রে নির্ভীক শক্তিমান দেখতে চান তিনি, তাই বলছেন: 'যে-সব music-এ মানুষের soft feelings উদ্দীপিত করে সে-সকল কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখতে হবে।...সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে।'

ভোজনবিষয়ে স্বামীজীর নির্দেশ অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন, তাঁদের পক্ষে নিরামিষ-ভোজনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু দেশবাসীকে তমোভাব কাটিয়ে রজোগুণের কর্মশক্তিতে উদ্দীপিত হ'তে হ'লে আমিষ-ভোজনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। যাঁরা শ্রমিক, যাঁদের কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, যাঁরা দেশরক্ষী সৈনিক, তাঁদের আমিষ-ভোজন দরকার। যে খাদ্যে শরীর-মন সুস্থ-সবল থাকে তাই-ই প্রকৃত খাদ্য। শুধু আহারের দ্বারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করা যায় না, তা লাভ করতে হ'লে তদনুরূপ কর্ম সাধন-ভজন-তপস্যারও প্রয়োজন। যাঁকে শারীরিক শ্রম করতে হয় না, সংসারের চিন্তায় যাঁর শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, যাঁর ভোগবিমুখ মন ঈশ্বরচিন্তায় সতত নিরত, তাঁর পক্ষে নিরামিষ ভিক্ষান্ন একাহার অপর্যাপ্ত নয়। প্রাতঃকাল থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত যাঁকে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হবে, তাঁর পক্ষে নিরামিষ-ভোজন অপেক্ষা আমিষ-আহার অধিকতর ফলপ্রদ নিঃসন্দেহ—এই স্বামীজীর ভোজন-বিষয়ে সুনিশ্চিত অভিমত।

স্বামীজী দেখেছেন সব কিছুর মূলে শিক্ষা; রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি বা যে-কোন নীতির উন্নতির সোপান—শিক্ষা। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখা দিতে বাধ্য। তিনি শিক্ষার মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। যে শিক্ষার দ্বারা অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ হয় তা-ই শিক্ষা। 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।' প্রকৃত মানুষ হ'তে গেলে যে শিক্ষা চাই, তারই উপর তিনি জোর দিয়েছেন। সে শিক্ষায় মানুষ শরীর-মনের সমভাবে উন্নতি করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ পরনির্ভর না হয়ে স্বাবলম্বী হবে। ব্যাবহারিক শিক্ষার দিকে স্বামীজী বিশেষভাবে সচেতন। স্ত্রীশিক্ষা, জনশিক্ষা প্রভৃতি বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি যে-সব কথা বলেছেন, সেগুলি ঠিকমত অনুসৃত হ'লে শিক্ষাজগতে অভাবনীয় উন্নতি দেখা যাবে, শিক্ষার সামগ্রিক রূপটি মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সর্বোপরি স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহা-মূল্য উপদেশ ও পরমপবিত্র জীবন অনুসরণ করতে বলেছেন। ভারতের সমগ্র অতীত চিন্তার মূর্তবিগ্রহ তিনি। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য, কি উদ্দেশ্যে সেগুলি রচিত, তাঁর জীবনে তা সুপরিস্ফুট। বর্তমান প্রগতিকে যথার্থ পথনির্দেশ দিতে হ'লে, ভবিষ্যৎকে শ্রীমণ্ডিত করতে হ'লে অতীত ভারতকে জানতে হবে, আর তা ঠিকভাবে জানা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনবদ্য চরিত্রানুধ্যানে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুআরি স্বামীজী কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, "আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। ...তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করবে।...অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'"

তরুণসম্প্রদায়ের নিকট আবেদন—তাঁরা স্বামীজীর প্রাণপ্রদ কালজয়ী বাণী মনে প্রাণে অনুশীলন ক'রে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের আকাঙ্ক্ষিত দেশের যোগ্য সন্তান হয়ে উঠুন।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলাদেশে সেবাকার্য

বাংলাদেশ হইতে আগত শরণার্থীদের যে ব্যাপক সেবা রামকৃষ্ণ মিশন গত কয়েকমাস যাবৎ ভারতের সীমানার ভিতর থাকিয়া করিয়াছে, জনসাধারণ তাহা অবগত আছেন ; যুদ্ধের পর শরণার্থিগণ দেশে ফিরিতে আরম্ভ করিলে ফেরার পথে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন যশোহর ও খুলনায় সেবাকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিয়াছে। বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের যে দশটি কেন্দ্রের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে পুনরায় সচল করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন সেই স্থায়ী কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে মিশনের সব স্থায়ী কেন্দ্রই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সেগুলিকে কাজ-চলার মতো অবস্থায় আনিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অধিকাংশ লোকই সহায়সম্পদ-হীনতার কবলগ্রস্ত বলিয়া এই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজও প্রচুর ব্যয়সাধ্য। কেবল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহায়তাই নয়, ইঁহাদের অন্তরে আত্ম-বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্যও সহায়তা প্রয়োজন ; এই উভয়বিধ প্রয়োজন মিটাইতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রচেষ্টা করিবে।

জনগণের সেবার জন্য বা রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি পুনঃস্থাপনের জন্য, অথবা এই উভয় কার্যের জন্য প্রদত্ত যে-কোন সাহায্য সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক ও ড্রাফট্ "RAMAKRISHNA MISSION"—এই নামে লিখিবেন, এবং ক্রস্ (CROSSED) করিয়া দিবেন ; সর্ববিধ সাহায্য "স্বামী গম্ভীরানন্দ, সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া"—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড় মঠ
২৭. ১. ৭২

সমালোচনা

আমাদের শিক্ষা ও সমাজ—রাজনারায়ণ বসু। সঙ্কলন ও সম্পাদনা : শ্রীহরিপদ মণ্ডল। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা : ৫৫+২৫। মূল্য আড়াই টাকা।

জাতীয় শিক্ষা, মাতৃভাষাশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতিতে উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারার কিরূপ স্বকীয়ত্ব ছিল, তাঁহার শিক্ষাচিন্তা কত গভীর, মৌলিক ও ব্যাপক ছিল, তাহা বর্তমানে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। যাঁহারা শিক্ষা-বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা পুস্তকখানিতে অনেক সাহায্য পাইবেন। শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে এই বলিষ্ঠ চিন্তাধারা যথার্থ পথের দিশারী হিসাবেও গ্রহণীয় হইতে পারে।

বাঙালীর অনুকরণের মোহ বলিতে গিয়া রাজনারায়ণ বসু উল্লেখ করিয়াছেন : চতুর্দিকে হীন অনুকরণের প্রবলতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রতিপদেই অনুকরণ; ইহাতে আন্তরিক সারবত্তার হানি হইতেছে ···আমরা সকল বিষয়েই অনুকরণ করিতে ভালবাসি। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, সে অনুকরণ আমাদের উপযোগী কিনা, আর তদ্দ্বারা আমাদের দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে কি না।

মাতৃভাষা-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের সুচিন্তিত অভিমত সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিবে : জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির উপর জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে।···জননীর স্তনদুগ্ধ যেরূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বলবৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য প্রকাশ করে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি ছিল রাজনারায়ণের অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বলিয়াছেন—জগতের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ভাষা।

আমাদের শিক্ষাজগৎ নানা সমস্যার সম্মুখীন, সেইজন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে, সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এখনও পাওয়া যায় নাই। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত সময়ে শিক্ষাবিদ্ রাজনারায়ণ বসুর শিক্ষা-ও সমাজবিষয়ক চিন্তাধারা সঙ্কলন করিয়া জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন বলিয়া সুধী সঙ্কলককে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

প্রারম্ভে প্রদত্ত ভূমিকাটি তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত। এই পুস্তকখানি মনীষী রাজ-নারায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর অপেক্ষা রাখে, পরবর্তী সংস্করণে এবিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে ইহা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইবে।

পত্রে উপদেশ- সঙ্কলক : শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র গুহরায়, অভেদানন্দ স্মৃতি কুটিয়া, পো: সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ৮৬+৩২; মূল্য দুই টাকা।

সাহিত্য-জগতে পত্রাবলী বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। পত্রসাহিত্যে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবতা অধিক, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান, স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী বিষয়বস্তুর মনোজ্ঞতা অবশ্য স্বীকার্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বামী অভেদা-নন্দ মহারাজ কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পরিবেশে ও সময়ে লিখিত পত্রমালা হইতে উপদেশাত্মক অংশ সঙ্কলন করিয়া 'পত্রে উপদেশ' গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। উপদেশগুলি স্বীয় শিষ্যগণকে প্রদত্ত হইলেও ইহাদের সার্বভৌমত্ব রহিয়াছে, সেইজন্য প্রত্যেক

অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসু পাঠকেরই নিকট পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে। সঙ্কলন-কার্যে সঙ্কলক যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত ভূমিকাটি সুন্দর। প্রারম্ভে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত, শেষাংশে কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী সচ্চিদানন্দ। প্রাপ্তিস্থান: শ্রীনেপাল দাশগুপ্ত, ৫৭ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ৩১১+২৪। মূল্য ৫৲

পুণ্যজীবনচরিত-রচনার সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস হইল চরিত্রানুধ্যান। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের নির্দশন লেখকের রচনায় বিদ্যমান। ইতিপূর্বে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আকরগ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আলোচ্য পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত। আঠারোটি অধ্যায়ের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব, পিতৃগৃহে ও দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান, সাধন-ভজন, তপস্যা, তীর্থদর্শন, মহিমা প্রভৃতি বর্ণিত। সনাতনী চিরসীমন্তিনী, সর্বভাবময়ী বিশ্বজননী, জ্ঞানদায়িনী মোক্ষদায়িনী শীর্ষক অধ্যায়গুলি সুলিখিত। পুস্তকখানি পাঠে ভক্তবৃন্দ আনন্দ পাইবেন।

দীপ-শিখা—আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা। পৃষ্ঠা ৭০।

শিক্ষাজগতে অশান্ত ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও 'দীপশিখা' জ্ঞানানুশীলনের শিখা উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, এই প্রকাশনে তাহার স্বাক্ষর বিদ্যমান। শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রদের সমবেত প্রচেষ্টায় পত্রিকাখানি আরও শ্রীবৃদ্ধি করুক, ইহাই প্রার্থনা। বর্তমান সংখ্যার বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধের কয়েকটিতে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় রহিয়াছে। 'বিদ্যাসাগর-স্মরণে' ও 'তুলসী' (হিন্দী) কবিতা দুইটি সুন্দর। 'আমাদের সায়েন্স ক্লাব', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', ও 'আমাদের বিদ্যালয়' এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যালয়-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞাপিত।

Narendrapur Samachar (1971) Published by Swami Lokeswarananda, Secretary Ramakrishna Mission Ashram, P. O. Narendrapur, 24 Parganas, Pp. 163, price Rs. 3/-.

নরেন্দ্রপুর আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানকার বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, ছাত্রনিবাস, শিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষাপ্রচেষ্টা, সমাজকল্যাণ, যুবনেতৃত্ব, গ্রামোন্নয়ন, শিশুকল্যাণ, আর্তসেবা প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ ও জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে

'নরেন্দ্রপুর সমাচার' ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত স্মরণিকা। এই স্মরণিকায় একদিকে যেমন নরেন্দ্রপুর সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিজ্ঞাপিত, অপরদিকে তেমনি কতকগুলি উচ্চস্তরের সুচিন্তিত নিবন্ধের মাধ্যমে ভারতীয় শাশ্বত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাশীল লেখকগণ তাঁহাদের রচনাবলীতে স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। স্বামীজীর 'My Master' এবং 'The Alpha and Omega of Vedanta Philosophy' প্রবন্ধ দুইটি প্রদত্ত হওয়ায় সঙ্কলনের বিচক্ষণতা প্রমাণিত হইয়াছে। ক্রিস্টফার ঈশারউড লিখিত 'Swami Vivekananda' প্রবন্ধটি পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। যাঁহারা

বাংলাভাষাভাষী নন, তাঁহাদের নিকটও পত্রিকা সমাদৃত হইবে। কাগজ ও মুদ্রণ উৎকৃষ্ট।

নির্মাল্য (বার্ষিক সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, ১৯৭১): শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রহড়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৭২ + ১২।

'নির্মাল্য' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্যের অভিমুখে তাহার অগ্রগতি লক্ষণীয়। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত যে সব গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছে, পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার অধিকাংশই সেইগুলি। শিক্ষকগণের লেখাগুলি সুচিন্তিত ও পত্রিকার উপযোগী এবং বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। বাংলা বিভাগে ৩৩টি এবং ইংরেজী বিভাগে ৫টি রচনা স্থান পাইয়াছে। 'বিদ্যালয় প্রসঙ্গে' এবং সম্পাদকের বিবৃতিতে বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মধারা ও 'নির্মাল্য' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় উপস্থাপিত

ব্রতী বাৎসরিক সংখ্যা, ১৩৭৮), ৩২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা ২৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪১; মূল্য ১।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ যে ভগিনী নিবেদিতার মহাদর্শ রূপায়ণে বদ্ধপরিকর তাহা বার্ষিক পত্রিকাখানির মাধ্যমে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইংরেজী ও বাংলা প্রত্যেকটি রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে অনুধ্যান, মননশীলতা ও আদর্শের কালোপযোগী অভিব্যক্তি। 'চতুরক্ষরা শ্রুতি' কবিতাটিতে ফুল, পাখি, নদী ও তারার উপমায় নিবেদিতা-জীবনের দিব্য মাধুর্য অভিব্যঞ্জিত। পত্রিকায় পরিবেশিত কয়েকটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে: আয়ুষ্কামনা ও কল্যাণচিন্তায় ভগিনীদের মধ্যে বোন-ফোঁটার অনুষ্ঠান, বীর জোয়ানদের বীরত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ উপহার-প্রেরণ, বন্যার্ত-ত্রাণে ও শরণার্থীদের সেবার্থে সাহায্য

Vivek Jivan (Annual Number, 1971)—Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mahamandal, published from Registered Office, Bhubın-Bhawan, P.O Balaram Dharma Sopan, Khardah, 24 Parganas. Pp 54, Price : Re, 1-.

সুচিন্তিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এই 'বিবেক-জীবন' বার্ষিক সংখ্যাখানি। 'বিবেকজীবন' পত্রিকাটি যে উন্নতির পথে অগ্রসর, লেখাগুলি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকগণ কি নিষ্ঠার সহিত নানাভাবে জনগণের সেবা করিয়া চলিয়াছে 'মহামণ্ডলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে' প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শেষে আছে স্বরলিপি সহ 'এগিয়ে চলা'র সুন্দর গানটি।

ছন্দক—(ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, দেওয়ালী সংখ্যা, ১৩৭৮) সম্পাদক: রবিরতন ভৌমিক। আভা প্রেস, ৬ বি গুড়িপাড়া রোড, কলিকাতা ১৫ হইতে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক (বিবেকানন্দনগর,) পুরুলিয়া প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৫, মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

প্রাচীন ভাবাদর্শ ও ঐতিহ্য সম্মুখে রাখিয়া এবং আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া 'ছন্দক' পাঠক-সমাজে আবির্ভূত হইয়াছে। সাহিত্য ও জীবন অবলম্বনে চিন্তার জগতে দৃঢ় পদক্ষেপ করিবার প্রচেষ্টা ছন্দকের বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলিতে দেখা যায়। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প—সমস্ত রচনাতেই চিন্তার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

উদ্বাস্তুসেবা :—বাংলাদেশ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্যে গত ডিসেম্বর (১৯৭১) ও জানুআরি (১৯৭২) মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যাদি : চিনি ১১ কেজি, মিল্ক পাউডার ১৪,৬৩ কুইন্ট্যাল, শিশুখাদ্য ২৭,৪৬ কুই, বার্লি ৪'১৯ কুই, কাপড় ৪৩৮ খানি, জামা ইত্যাদি ৪,৯৮১, পশমী পোশাক ১,১৬৩, কম্বল ২,৯৬৫ এবং গানি ব্যাগ ২,৬৫০।

২,৯২৬ ব্যক্তিকে চিকিৎসা-সাহায্য দেওয়া হয়।

ভারতের সমস্ত শরণার্থী-শিবির বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্বাস্তুগণ যাহাতে স্ব স্ব গৃহে সুষ্ঠুভাবে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যশোহর ও খুলনায় সেবাকেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে মঠ-মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি পুনর্গঠিত হইলেই সেবাকার্য সেই সব আশ্রমের মাধ্যমেই চালাইয়া যাওয়া হইবে; ঢাকা কেন্দ্রে প্রথমে কার্য আরম্ভ করা হইবে, পরে শ্রীহট্ট কেন্দ্রে।

সাইক্লোন রিলিফ : ওড়িশায় ঘূর্ণিবাত্যাক্লিষ্টদের সেবায় মিশন কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যাদি : চাল ১৫ কুইন্ট্যাল, আটা ৫৪ কুই, ধুতি ৬০২ খানি, শাড়ী ৮০২ খানি, কম্বল ১,২৫০।

বিবিধ

গত ৭ই জানুআরি, ১৯৭২ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ এলাহাবাদ কেন্দ্রে নবনির্মিত দ্বিতল চিকিৎসা-ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিরও তিনি উদ্বোধন করেন।

গত ৯ ১,৭২ রায়পুর আশ্রমে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবের উদ্বোধন করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীজি, এস, পাঠক।

বাংলাদেশের কেন্দ্রসমূহ

বাংলাদেশে অবস্থিত মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলির মধ্যে ঢাকা, বালিয়াটি ও শ্রীহট্ট আশ্রমের ঘরবাড়ী প্রায় অটুট অবস্থাতেই আছে; আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিস অবশ্য পাওয়া যাইতেছে না। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। ঢাকা কেন্দ্রের কার্য পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। বাংলদেশের অপর কেন্দ্রগুলির পুনর্গঠনের জন্যও কর্মী পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

উৎসব-সংবাদ

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে গত ১৬ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব একটি জনসভার মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। সভায় স্বামী সন্তোষানন্দ (সভাপতি), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (প্রধান অতিথি) ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সঙ্গীত ও 'বিবেকানন্দ লীলাগীতি' পরিবেশন

করেন আশ্রমের বর্তমান বিদ্যার্থিগণ।

এই সভায় ভারতে আগত আমেরিকার সাক্রামেন্টো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন কর্মী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আশ্রমের বর্তমান ও প্রাক্তন বিদ্যার্থিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে একখানি অভিনন্দনপত্রও প্রদান করেন।

কার্যবিবরণী

সিংহল রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮—মার্চ, ১৯৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। সিংহলে কলম্বো কেন্দ্রটিই প্রধান, ইহা ওয়েল্লাওয়াট্টে রামকৃষ্ণ রোডে (কলম্বো-৬) অবস্থিত। আলোচ্য বর্ষগুলিতে এখানে মিশনের কাজে সন্তোষজনক পরিবিস্তার ঘটিয়াছে।

নিয়মিত পূজা-প্রার্থনা-ভজনাদি, সাময়িক তিথিকৃত্য ও জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব বিবিধ মনোজ্ঞ কার্যসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভাষণ উৎসবগুলিকে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে। তামিল ও ইংরেজীতে ধর্মালোচনা-সভায় প্রতি সপ্তাহে বহু শ্রোতার সমাগম হয়।

অবৈতনিক গ্রন্থাকারে ২,৫১০ খানি পুস্তক আছে, পাঠাগারে ১০টি দৈনিক, ২৭ খানি সাময়িক পত্রিকা আসে। শিশুদের জন্য আশ্রমে 'পোয়া-ডে' ধর্মক্লাস করা হয়, এই ক্লাসে ৪০০টি শিশু যোগদান করে, ২০ জন শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী আছেন, তাঁহারা কোন বেতন লন না।

কলম্বো হইতে ৩০ মাইল দূরে ওয়াটুপিটি-ওয়েলা ট্রেনিং স্কুল অবস্থিত, এখানে তরুণ অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাহাদের জন্য মিশনের পক্ষ হইতে ধর্মালোচনা করা হয়।

ইন্‌টারন্যাশনাল কালচারাল সেণ্টার করা হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্রে ছাত্রাবাস, অতিথি-ভবন, গ্রন্থাগার প্রভৃতির কাজ উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মারক ভবন-নির্মাণের কাজ ১৯৬৯-মার্চে সমাপ্ত হইয়াছে, কলম্বোয় ইহাই বৃহত্তম সভাগৃহ। বাট্টিকালোয়া শাখায় তিনটি অনাথ আশ্রম পরিচালিত হয়, এই সব আশ্রমে শতাধিক অসহায় বালক ও প্রায় অর্ধশত বালিকা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে।

মনটিভু কুষ্ঠাশ্রমে ৭৮ জন চিকিসার্থে অবস্থান করে, তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চারের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ও পূজা-ভজনাদির ব্যবস্থা করা হয়।

কলম্বো হইতে ১৮০ মাইল দূরবর্তী কাতারাগামা নামক স্থানে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রশস্ত 'মদম' অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ। বর্তমানে দৈনিক গড়ে পাঁচশতাধিক তীর্থযাত্রী এখানে আগমন করেন। 'ঈশালা' উৎসবের সময় ১৭ দিন-ব্যাপী ১২,০০০ যাত্রীকে আহার, ১৫,০০০ ব্যক্তিকে সুশীতল শরবৎ প্রদান করা হয়।

চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী (১৯৬৪—৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। মেঘালয়ের খাসি জয়ন্তীয়া পার্বত্য অঞ্চলে চেরাপুঞ্জীকে কেন্দ্র করিয়া স্বামীজীর আদর্শে মানুষ তৈরীর উদ্দেশ্যে বেশ কয়েক মাইল

জুড়িয়া শিক্ষা-প্রদানের বিরাট কাজ চলিতেছে।

চেরাপুঞ্জীতে উচ্চ বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল সেকশন, কম্যুনিটি হল, স্টুডেন্টস্ হোম্ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৯ জন উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদানকার্যে নিরত আছেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে তাঁতশিল্প, দরজীর কাজ, টাইপরাইটিং, কাঠের কাজ ও হিসাবরক্ষণ-প্রণালী শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ভবনে মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক চিত্র দেখানো হয় এবং বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রাবাসটিতে ১০০ জন ছাত্র থাকে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনার সঙ্গে বিদ্যার্থীরা যাহাতে শরীর-মনের সুষম বিকাশসাধন এবং সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। অনগ্রসর উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ খাওয়া-খরচে ভালরকমই কনসেশন-লাভের সুযোগ পায়।

চেরাপুঞ্জীর ১৩ মাইল দক্ষিণে পাহাড়িয়া গ্রাম শেলায় মধ্য ইংরেজী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফ্রি লাইব্রেরী, সভাগৃহ প্রভৃতি তৈরী করা হইয়াছে। শেলা কেন্দ্রে আনন্দময় পরিবেশে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।

চেরাপুঞ্জী হইতে ৮ মাইল দূরে শোভার গ্রামে মধ্য ইংরেজী, জুনিয়র বেসিক, টেকনিক্যাল বিদ্যালয় প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি ছাত্রাবাস এবং একটি ছাত্রীনিবাসও এখানে হইয়াছে।

শেলা ও শোভার-স্থিত স্কুলগুলি ছাড়াও চেরাপুঞ্জী কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে দক্ষিণ খাসি পাহাড়ের দূর দূর গ্রামাঞ্চলে ৯টি মধ্য ইংরেজী ও ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এক হাজারের বেশী বালক এবং তাহা অপেক্ষা অধিক বালিকা ৩৫টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইতেছে। সমস্ত স্কুলেরই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। চেরাপুঞ্জী আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এ পর্যন্ত ৩৫১ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিয়াছে, অনেকেই কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আশ্রমের প্রার্থনাগৃহে নিয়মিত পূজা, ভজনাদি এবং সাময়িক জন্মতিথিগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আঁটপুর রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রমে গত ২৪শে হইতে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত তিনদিন স্বামী প্রেমানন্দজীর জন্মোৎসব এবং ২৪শে ডিসেম্বরের স্মরণোৎসব পূজা, পাঠ, কীর্তন, জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে ; ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ প্রেমানন্দজীর আটজন গুরুভ্রাতা ধুনি জ্বালিয়া যীশুর ত্যাগের ভাবের আলোচনায় সারারাত্রি কাটাইয়াছিলেন। তাহার স্মরণেই এই উৎসব। জনসভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (প্রধান অতিথি) ভাষণ দেন। স্বামী প্রেমানন্দের জীবনালোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী অক্ষয়-চৈতন্য।

ভুপাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা এবং ৯ই জানুআরি সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন প্রায় একহাজার নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ভজন, কীর্তন, চলচ্চিত্রে মহাভারত-কাহিনী প্রদর্শন প্রভৃতিও উৎসবের অঙ্গ ছিল।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ৭ই হইতে ১০ই জানুআরি পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পূজা, কীর্তন, জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। এই সঙ্গে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবসও পালিত হয়। ৭ই বিশেষ পূজা, স্বামীজীর জীবনালোচনা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত শ্রীপুলিন-বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভদ্রকালী সেবা সমিতির পালাগান পরিবেশিত হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদে গত ১৬ই জানুআরি পাঠ, গীতি-আলেখ্য, জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি-উৎসব পালিত হইয়াছে। জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিত্যানন্দ ও ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

জি-প্লট উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ (সুন্দরবন) বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে গত মাঘী পূর্ণিমার দিন পূজা, হোম, প্রসাদবিতরণ, সভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া- ও সন্তরণ-প্রতিযোগিতা, আলোচনা এবং পুরস্কার-বিতরণী সভাও অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভা ও পুরস্কার-বিতরণী সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী অমলানন্দ (সভাপতি), স্বামী সিদ্ধিদানন্দ (প্রধান অতিথি) এবং ছয় জন ছাত্রবক্তা।

এই উপলক্ষে একটি নাতিবৃহৎ সুদৃশ্য মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

[পূর্বানুবৃত্তি : রাজযোগ]

উহা হইতে সাধারণ সত্যসকল আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই জন্যই রাজযোগ শিক্ষা করিতে হইলে, তোমার ধর্ম্ম যাহাই হউক—তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, ইহুদি হও, বৌদ্ধ হও অথবা খৃষ্টানই হও—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তুমি মানুষ—তাহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মনুষ্যেরই ঈশ্বরতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে-কোন বিষয়ে হউক না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, সে নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে। তবে অবশ্য, ইহার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক।

এতক্ষণ দেখিলাম, এই রাজযোগ সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের আবশ্যক করে না। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পার, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না; রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কোন সহায়তার আবশ্যক করে না। তোমরা কি বলিতে চাও যে, জাগ্রৎ অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার অবস্থার সহায়তার আবশ্যক হয়? কখনই নহে। এই রাজযোগ অভ্যাস করিতে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। ইহার কিয়দংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক। কিন্তু, ইহার অধিকাংশই মনঃ-সংযমাত্মক। আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র, আর মন শরীরের উপর কার্য্য করে—এ সত্যের উপর যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরও মনের উপর কার্য্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়, তখন তাহার মন অস্থির হয়, মনের অস্থিরতার জন্য শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন এবং বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাদের মনঃশক্তি অতি অল্প পরিমাণেই প্রস্ফুটিত। অধিকাংশ মনুষ্যই পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। একথা বলিলাম বলিয়া আপনারা কিছু মনে করিবেন না। শুধু তাহাই নহে, অনেক স্থলে সামান্য পশুপক্ষী অপেক্ষা তাহাদের সংযমের ক্ষমতা বড় অধিক নহে; আমাদের মনকে নিগ্রহ করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে। মনের উপর এই ক্ষমতা লাভের জন্য—শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে সংযত হইবে, তখন মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এইরূপে মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিলে আমরা উহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ও ইচ্ছামত উহাকে একাগ্র করিতে পারিব।

রাজ-যোগীর মতে এই সমুদায় বহির্জগৎ সূক্ষ্ম জগতের স্থূল বিকাশ মাত্র। সর্ব্বস্থলেই সূক্ষ্মকে কারণ ও স্থূলকে কার্য্য বুঝিতে হইবে। এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য্য ও অন্তর্জগৎ

কারণ। এই হিসাবেই স্থূল জগতে পরিদৃশ্যমান শক্তিগুলি আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূল ভাগ মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরিক শক্তিগুলিকে চালাইতে শিখিয়াছেন, তিনিই সমুদায় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন। যোগী সমুদায় জগৎকে বশীভূত করা ও সমুদায় প্রকৃতির উপর ক্ষমতা বিস্তার করাকেই আপন কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে চাহেন, যথায় প্রকৃতির নিয়মাবলী তাঁহার উপর কোন ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না, এবং যে অবস্থায় যাইলে তিনি ঐ সমুদায়ই অতিক্রম করিয়া যাইবেন। তখন তিনি আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সমুদায় প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতা, এই প্রকৃতিকে বশীভূত করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন দুইটী ব্যক্তির ভিতরে দেখা যায় যে, কেহ বা বাহ্যপ্রকৃতি, কেহ বা অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ্য ও কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভুত করিবার চেষ্টা করে। কাহার মতে অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদায় বশীভূত হইতে পারে। কাহারও মতে বা, বাহ্যপ্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদায় বশীভূত হইতে পারে। এই দুইটী সিদ্ধান্তের চরম ভাব লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য ; কারণ বাস্তবিক 'বাহ্য' ও 'অভ্যন্তর' বলিয়া কোন ভেদ নাই। ইহা একটী কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। এরূপ বিভাগের অস্তিত্বই নাই, কখনও ছিল না। বহির্বাদী বা অন্তর্বাদী উভয়ে যখন স্ব স্ব জ্ঞানের চরম সীমা লাভ করিবেন, তখন এক স্থানে উপনীত হইবেনই হইবেন। যেমন বহির্বিজ্ঞানবাদী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া যাইলে শেষকালে তাঁহাকে দার্শনিক হইতে হয়, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, তিনি মন ও ভুত বলিয়া যে দুইটী ভেদ করেন, তাহা বাস্তবিক কাল্পনিক মাত্র, তাহা একদিন একেবারেই চলিয়া যাইবে।

যাহা হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদায় বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রাজযোগীরা বলেন, আমরা প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞানলাভ করিব, পরে উহা দ্বারাই বাহ্য ও অন্তর উভয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিব। প্রাচীনকাল হইতেই লোকে এই বিষয় চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয় কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রদেশের লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্ত বিদ্যা ভাবিত, যাহারা ইহা অভ্যাস করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ডাইন, ঐন্দ্রজালিক ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথবা মারিয়া ফেলা হইত। ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন লোক-সমূহের হস্তে পড়ে, যাহারা এই বিদ্যার শতকরা ৯০ অংশ নষ্ট করিয়া অবশিষ্টটুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট গুরুনামধারী কতকগুলি ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, ইহারা কিছুই জানেন না।

এই সমস্ত যোগ-প্রণালীতে গুহ্য বা অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, সমুদায় ত্যাগ করিতে

হইবে। যাহা কিছু বল প্রদান করে, তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, ধর্ম্মেও তদ্রূপ; যাহা তোমাকে দুর্ব্বল করে তাহা একেবারেই ত্যাজ্য। রহস্য-স্পৃহাই মানব-মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এই সমস্ত গুহ্য রাখাতেই যোগশাস্ত্র প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বলিলেই হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী মহা বিজ্ঞান। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালীবদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে। একটী আশ্চর্য্য এই যে, ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাঁহার ভ্রমও সেই পরিমাণে অধিক। লেখক যতই প্রাচীন, তিনি ততই অধিক ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। আধুনিক লেখকের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার আজগুবী কথা কহিয়া থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহা পড়িল, তাহারা সমস্ত ক্ষমতা নিজ করতলস্থ রাখিবার প্রয়াসে ইহাকে মহা গোপনীয় বা আজগুবী করিয়া তুলিল, এবং যুক্তিরূপ প্রভাকরের পূর্ণালোক আর উহাতে পড়িতে দিল না।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি, আমি যাহা প্রচার করিতেছি, তাহার ভিতর গুহ্য কিছুই নাই। যাহা যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। ইহা যতদূর যুক্তি দ্বারা বুঝান যাইতে পারে, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি যাহা বুঝিতে পারি না, তৎসম্বন্ধে বলিব "শাস্ত্র এই কথা বলেন"। অন্ধ বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; কার্য্যে করিয়া দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কিনা। জড়-বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতেই এই ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই। ইহার মধ্যে যতদূর সত্য আছে, তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করা উচিত। কোনরূপে এসকল গোপন করিবার চেষ্টা করিলে অনেক বিপদের উৎপত্তি হয়।

আর অধিক বলিবার পূর্ব্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই সাংখ্যদর্শনের উপর রাজযোগ-বিদ্যা স্থাপিত। সাংখ্যদর্শনের মতে, বিষয়-জ্ঞানের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ, বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি, ইন্দ্রিয়গণের নিকট উহা প্রেরণ করে; ইন্দ্রিয়গণ মনের ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন; পুরুষ আবার, যে সকল সোপান-পরম্পরায় উহা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া উহাদিগকে যেন ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। এইরূপে, বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে। পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি জড়। তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্ম্মিত। মন যে উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা ক্রমশঃ স্থূলতর হইলে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। উহা আরও স্থূল হইলে পরিদৃশ্যমান ভূতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান এই। সুতরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার হাতে যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্মা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সদা পরিবর্তনশীল, একদিক হইতে অন্য দিকে যাইতেছে, কখন সমুদায় ইন্দ্রিয়গুলিতে সংলগ্ন, কখন বা একটীতে সংলগ্ন থাকে; আবার কখনও বা কোন

ইন্দ্রিয়ে সংলগ্ন থাকে না। মনে কর আমি একটী ঘড়ির শব্দ মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না; ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মন যদিও শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। এইরূপ, মন সমুদায় ইন্দ্রিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্তর্দ্দৃষ্টির শক্তি আছে, এই ক্ষমতাবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। এই অন্তর্দ্দৃষ্টিশক্তি লাভ করা যোগীর উদ্দেশ্য; মনের সমুদায় শক্তিকে একত্র করিয়া, ও ভিতরের দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে তাহাই তিনি জানিতে চাহেন ইহাতে বিশ্বাসের কোন কথা নাই। ইহা জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার কথা। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, চক্ষু প্রকৃত দর্শনের সাধন নহে, কিন্তু বাস্তবিক সমুদায় ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার করণগুলি মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদায় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্ম্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্ম্মিত। সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন; তবে একটী ভৌতিক বিষয় ও অপরটী আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত। তাহা হইলেও, উভয়ই এক কথা। আমাদিগকে ইহার অতীত রাজ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে।

যোগী নিজ শরীরাভ্যন্তরে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা জানিবার উপযোগী অবস্থা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন। মানসিক প্রক্রিয়া সমুদায়ের মানস-প্রত্যক্ষ আবশ্যক। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয় ইন্দ্রিয়-গোচর হইবা মাত্র যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা কিরূপে স্নায়ুমার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়। শিক্ষার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে উহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, পরে এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়; তাহা না করিলে উহা শিক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই; রাজযোগ শিক্ষাতেও তদ্রূপ।

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক; যাহাতে মন অতিশয় পবিত্র থাকে, সেই খাদ্যই ভোজন করিতে হইবে। যদি কোন পশুশালায় গমন করা যায়, তাহা হইলে আহারের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। হস্তী অতি বৃহৎকায় জন্তু, কিন্তু শান্তপ্রকৃতি; কিন্তু যদি যদি তুমি সিংহ বা ব্যাঘ্রের পিঁজারার দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে, তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সমুদায় গুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, আমরা ইহা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি তুমি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, তোমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলির হ্রাস হইবে, কয়েক দিন পরে মানসিক শক্তিগুলিরও হ্রাস হইবে। প্রথমতঃ স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না—বিচার করা ত দূরের কথা। সেইজন্য সাধনের প্রথমাবস্থায় ভোজনের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইলে ঐ বিষয়ে ততদূর সাবধান না হইলেও চলে।

যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে, ততক্ষণ উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, তাহা না হইলে পশুরা উহা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, তখন উহা সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিতে সক্ষম হয়।

যোগী ব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরতা উভয়ই পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অন্যরূপে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতাকার বলেন, যিনি আপনাকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না।

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ। ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥"

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬।১৭

উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্ম্মী, অথবা নিষ্কর্ম্মা, ইহাদের মধ্যে কেহই হইতে যোগী পারে না।

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) মানুষ আপনাকে চিন্তে পারলে, ভগবানকে চিন্তে পারে। "আমি কে" ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিষ নাই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোন্‌টা আমি? যেমন প্যাজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার কল্লে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে, সেই আত্মা—চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে, ভগবান দেখা দেন।

(২) রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে, তুমি এক ডুবে পেলে না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে কোরো না। সেইরূপ একটু সাধন ভজন কোরে ঈশ্বরদর্শন হলো না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য্য ধরে সাধন কত্তে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর হইবে।

(৩) তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই? যেমন সতীর পতিতে—কৃপণের ধনেতে—বিষয়ীর বিষয়েতে—এইরূপ টান যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন ভগবান লাভ হয়।

(৪) মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুন্ গুন্ করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে আর সে গুন্ গুন্ করে না, চুপ ক'রে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম্ম লয়ে গোল করে, ততক্ষণ সে ধর্ম্মের আস্বাদ পায় নাই, পেলে চুপ করে যায়।

(৫) সমুদ্রে একরকম ঝিনুক আছে, তারা সদাসর্ব্বদা হাঁ করে জলের উপরে ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্ব-পিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরু-মন্ত্ররূপ একফোঁটা জল পেয়ে, সাধনায় অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্যদিকে চেয়ে দেখে না।

শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্)

পূর্ব্বকালে শ্রীশ্রীকুলশেখর নামা রাজর্ষি কেরল দেশকে (Travancore) স্বকীয় শাসনে পবিত্র ও সৌভাগ্যশালী করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। সেই ভাবময় পবিত্র হৃদয়সরোবর হইতে শ্রীশ্রীমুকুন্দমালারূপ সর্ব্বমনোহারিণী সহস্রদলকমলপ্রসবিনী অপূর্ব্ব কমলিনীর উদয় হইয়াছে। আমাদের দেশে সেই ভাবোচ্ছ্বাস-গুলির অধিকাংশই অদ্যাবধি উপনীত হয় নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমরা আজ সাদরে পাঠকবর্গকে উক্ত মনোহর, সদ্ভাবোদ্দীপক, প্রেমিক কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলি উপহার প্রদান করিতেছি। ইহা যে প্রত্যেকেরই অতি আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। আসুন পাঠকবর্গ, আমরা ভক্তকবির নির্ম্মল কবিতা-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিবার পূর্ব্বে, তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণত হই।

ঘুষ্যতে যস্য নগরে রঙ্গযাত্রা দিনে দিনে। তমহং শিরসা বন্দে রাজানং কুলশেখরম্ ॥

যাঁহার নগরে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের উৎসবকাহিনী গীত হয়, আমি সেই রাজা কুলশেখরকে মস্তক অবনত করিয়া বন্দনা করি।

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসেত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ১ ॥

হে স্বর্গ এবং পৃথিবীর পতি মুকুন্দদেব! আমি যাহাতে প্রতিদিনই তোমায় "হে শ্রীবল্লভ, হে বরদ, হে দয়াপর, হে ভক্তপ্রিয়, হে ভবব্যাধির সুচিকিৎসক, হে নাথ, হে নাগশয়ন, হে জগন্নিবাস" বলিয়া ডাকিয়া তোমার পবিত্র নামগুলি কীর্ত্তন করিতে পারি, তাহাই কর।

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ম্ জয়তু জয়তু দেবো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥

যিনি দেবকীর আনন্দবর্দ্ধন, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে জয় হউক; যিনি বৃষ্ণিবংশের উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ, সেই দেববরের সর্ব্বাঙ্গীণ জয় হউক; যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যাম-কান্তিবিশিষ্ট এবং যাঁহার সুকুমার অঙ্গ কোমলতার আদর্শস্থল, তাঁহার জয় হউক, জয় হউক; যিনি পৃথিবীর দুঃখভার মোচন করেন ও যিনি স্বেচ্ছায় স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্য দান করিতে পারেন, তাঁহার নিরন্তর জয় হউক।

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥ ৩ ॥

হে মুকুন্দ! ভবদীয় চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে তোমার কৃপাবলে ত্বদীয় শ্রীচরণপদ্ম কখনও বিস্মৃত না হই।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাপি রন্তুম্ ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৪ ॥

হে সর্ব্বসন্তাপহারিন্! শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি

পাইবার জন্য, ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরক নিবারণের জন্য, অথবা চিত্তরঞ্জিনী রমণীগণের সুকোমল শরীরলতা আলিঙ্গন করিয়া স্বর্গস্থ নন্দনকাননে ক্রীড়া করিবার জন্য তোমার চরণপ্রান্তে প্রণত হইতেছি না ; কিন্তু যাহাতে জন্মে জন্মে হৃদয়মন্দিরে তোমার নিরন্তর ধ্যান করিতে পারি, তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্ যদ্ ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়, ধনোপার্জ্জন বা কামোপভোগে আমার অভিলাষ নাই ; পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি তদনুযায়ী যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটুক। যাহাতে জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদপদ্মযুগলে অচলা ভক্তি থাকে, তাহাই আমার অন্তরের একমাত্র প্রার্থনা।

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥ ৬ ॥

হে নরকান্তকারিন্! স্বর্গে, ধরাতলে, এমন কি নরকেও যদি আমার দীর্ঘকাল বাস হয়, ইহাই বিধান কর, যেন মৃত্যুযন্ত্রণাতেও তোমার যে চরণযুগল শরৎকালের সুবিকশিত ও প্রফুল্ল কমলকেও সৌন্দর্য্যে পরাজিত করে, সে দুটীকে বিস্মৃত না হই।

কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঙ্কজপঞ্জরান্তম্ অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! অদ্যই আমার চিত্তরূপ রাজহংস তোমার শ্রীচরণরূপ পদ্মের কেশরে যাইয়া প্রবেশ করুক, কারণ প্রাণপরিত্যাগের সময় যখন কফ, বায়ু ও পিত্তে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন তোমার কিরূপে স্মরণ করিতে পারিব ?

চিন্তয়ামি হরিমেব সন্ততম্ মন্দমন্দহসিতাননাম্বুজম্।
নন্দগোপতনয়ং পরাৎপরম্ নারদাদিমুনিবৃন্দবন্দিতম্ ॥ ৮ ॥

আমি সর্ব্বদাই সর্ব্বসন্তাপহারী হরির ধ্যান করি। তাঁহার মুখপদ্ম মধুর মন্দ হাস্যে অতি রমণীয়, তিনি গোপরাজ নন্দের পুত্র, তিনি সকলের অগ্রগণ্য, এবং নারদ প্রভৃতি মুনিগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বন্দনা করেন।

করচরণসরোজে কান্তিমন্নেত্রমীনে শ্রমমুষি ভুজবীচিব্যাকুলেঽগাধমার্গে।
হরিসরসি বিগাহ্যাপীয় তেজোজলৌঘম্ ভবমরুপরিখিন্নঃ খেদমদ্য ত্যজামি ॥ ৯ ॥

সর্ব্বসন্তাপহারী হরি একটী প্রকাণ্ড সরোবর। তাঁহার অঙ্গকান্তি সেই সরোবরের জল, তাঁহার করতলদ্বয় ও চরণযুগল তাহার পদ্ম, মনোহর চক্ষু দুটী তাহাতে মৎস্য হইয়া আছে, ক্লেশনাশক ভুজদ্বয়রূপ তরঙ্গে তাহা নিয়ত তরঙ্গিত। সেই সরোবরে যাইবার পথ অতি দুর্গম। (কারণ তাহা সংসার-মরুভূমি মধ্যে অবস্থিত)। এই মরুতে পরিভ্রমণ করিয়া আমি সাতিশয় পরিশ্রান্ত। সুতরাং অদ্য সেই হরিসরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক (প্রাণ ভরিয়া) তাঁহার কান্তিরূপ নির্ম্মল সুশীতল সলিল পান করত সমুদয় খেদ দূর করিব।

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি মা বিরমস্ব চিত্ত রন্তুম্।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥ ১০ ॥

হে চিত্ত! পদ্মনয়ন, শঙ্খচক্রধারী, মুরহরের সহিত সম্মিলিত হইতে বিরত হইও না। কারণ হরির শ্রীচরণধ্যানরূপ অমৃতপানের তুল্য আর অধিক আনন্দদায়ক কিছুই নাই।

মাভীর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনাঃ
নামী নঃ প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণম্
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ॥ ১১ ॥

হে নির্ব্বোধ মন! বহুকালব্যাপী নানাবিধ যমযন্ত্রণা কল্পনা করিয়া ভীত হইও না। যদি হরি আমাদের প্রভু হন, তাহা হইলে উক্ত বিষম শত্রুগণ আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে ভক্তি দ্বারা অতি সহজে লাভ করা যায়, সেই নারায়ণকে ধ্যান কর। যিনি লোকত্রয়ের সমুদয় বিঘ্ন নাশ করিতে পারেন, তিনি কি নিজ দাসের দুঃখ মোচন করিতে পারিবেন না?

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাম্ সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাম্ ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্॥ ১২॥

মনুষ্যগণ সংসারসাগরে পতিত হইয়া শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বঝটিকায় নিয়ত তাড়িত হইতেছে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সেই সাগরের জল; উড়ুপ (ভেলা) না থাকায় তাহাতে তাহারা নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর পুত্র কন্যা ভার্য্যা প্রভৃতির পরিত্রাণচিন্তায় চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। এরূপ নিঃসহায় মানবগণের বিষ্ণুরূপ নৌকাই একমাত্র অবলম্বন।

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ম্ কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্॥ ১৩॥

হে চিত্ত! এই অতলস্পর্শ অপার সংসারসমুদ্র কিরূপে পার হইব, ইহা ভাবিয়া কাতর হইও না। কারণ কমলনেত্র, নরকনিহন্তা দেববরের প্রতি তোমার নিশ্চলা ও ঐকান্তিকী ভক্তি স্থাপিত হইলে তাহা তোমায় অবশ্যই পরপারে লইয়া যাইবে।

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্ম্মিমালে দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্ পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিভাবে প্রসীদ॥১৪॥

হে ত্রিলোকপতে! হে বরদ! আমরা সংসাররূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ভোগবাসনা এই সাগরের জল, স্ত্রীসম্ভোগলিপ্সারূপা ঝটিকা ইহাতে অজ্ঞানতরঙ্গ উত্থিত করিয়াছে। ভার্য্যা তাহার আবর্ত্ত (জলভ্রমি), এবং সন্তান ও ভ্রাতা কুম্ভীরস্বরূপ হইয়া তাহাকে অতিশয় ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব সর্ব্বদাই জাজ্বল্যমান থাকে, তাহা কর।

মা দ্রাক্ষম্ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতোভক্তিহীনান্ পদাব্জে
মা শ্রৌষম্ শ্রাব্যবন্ধং তবচরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্।
মা স্মার্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাপহ্নুবানান্
মা ভুবং ত্বৎসপর্য্যাব্যতিকররহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি॥ ১৫ ॥

তোমার শ্রীপাদপদ্মে যাহাদের ভক্তি নাই, সেই সকল পুণ্যহীন লোকের সহিত আমার যেন ক্ষণকালের জন্যও সাক্ষাৎ না হয়। যে সকল আখ্যায়িকায় তোমার চরিত্র বর্ণিত হয় নাই, সুশ্রাব্যপদবাক্য সমন্বিত হইলেও সে সমুদয় যেন আমি কখন শ্রবণ না করি। (ক্রমশঃ)



দিব্য বাণী

দৃষ্ট্বা মহাদ্ভুতং রাজন্ রাজসূয়ে মহাক্রতৌ।
বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ ॥ ১
তত্রাসীনং সুরঋষিং রাজা পাণ্ডুসুতঃ ক্রতৌ।
পপ্রচ্ছ বিস্মিতমনা মুনীনাং শৃণ্বতামিদম্ ॥ ১৪
অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ ॥ ১৫
দমঘোষসুতঃ পাপ আরভ্য কলভাষণাৎ।
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ১৭

রাজসূয়যজ্ঞকালে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালে দেহান্তে সাযুজ্যমুক্তি লভিতে দেখিয়া
হতবাক্ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদে কন বিস্মিত হইয়া,
'কথা বলা শেখা থেকে দন্তবক্র আর এই দমঘোষ-সুত শিশুপাল
কৃষ্ণনিন্দা কৃষ্ণদ্বেষ ছাড়া কিছু করে নাই এ যাবৎ কাল!
সেই পাপমতি আজ মরণের পরে পেল পরম সম্পদ—
লীন হ'য়ে পরতত্ত্ব বাসুদেবে পেল সেই পদ
ঐকান্তিক ভক্তিতেও যে দুর্লভ পদ পাওয়া দায়!
কি অদ্ভুত কাণ্ড এ যে, কিছু এর বোঝা নাহি যায়!'

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥ ২৩
...তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ।
পরস্য দমকর্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ॥ ২৪
তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ২৫
কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ২৯
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩০

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৭।১

নারদ কহেন, 'দেহে অভিমান হেতু যার আমি- ও আমার-বোধ আছে,
আমারে করেছে নিন্দা—তাড়না করিব একে—
এ ভাব সম্ভব তারই কাছে।
অদ্বিতীয় অখিলাত্মা যিনি তাঁর (স্থূল-সূক্ষ্ম-
কারণাদি) কোন দেহে আমি-বোধ নাই,
হিংসা করিয়াছে মোরে—দণ্ড দিতে হবে এরে—
হেন বোধ তাঁর মাঝে সম্ভবে না ভাই।
(কেবল দেখেন তিনি—কে তাঁর করিছে ধ্যান,
কে তাঁরে চিন্তিছে অনুক্ষণ,
করিছে তা বৈরভাবে, কিম্বা ভক্তিভাব নিয়ে,
সে বিষয়ে দৃক্‌পাত না করি কখন।
যে কোন ভাবেতে হোক, ঈশ্বর-স্মরণ করি তন্ময় হইয়া যেই যায়
ভাব-গত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তিপদ সেই জনই পায়।)
অতএব বৈরভাব, ভক্তি- ভয়- কাম- কিম্বা স্নেহ-ভাব নিয়ে
অনুক্ষণ স্মরি তাঁরে যুক্ত রও তাঁর সনে,
সব ভাবই অপৃথক্ একথা জানিয়ে—
(তন্ময়তা আনে যদি সব ভাবই নিয়ে যায়
পরমেশ-পাশে, এতে নাই কোন ভুল,
ভগবানলাভ তরে পথ বা উপায়রূপে সব ভাবই তাই সমতুল !)
ভক্তিভাবে ঈশ্বরেতে আবিষ্ট করিয়া মন যেমন অসংখ্য ভক্তগণ
করেছে ঈশ্বরলাভ, কাম দ্বেষ ভয় স্নেহে ঈশ্বরে আবিষ্ট করি মন
সেইভাবে বহুজন পরমেশে পাইয়াছে, পরাভক্তি করিয়াছে লাভ
(পরতত্ত্বতন্ময়তা-গঙ্গাস্নানে) ধুয়ে মুছে ভাব-গত সর্ববিধ পাপ।
কামভাবে গোপীগণ, কংস ভয়ে, শিশুপাল আদি দ্বেষভাবে,
সখ্যভাবে যাদবেরা, তোমরা পাণ্ডবগণ পাইয়াছ কৃষ্ণে স্নেহভাবে,
আমরা নারদ আদি পাইয়াছি তাঁরে ভক্তিভাবে।
(কি ভাব লইয়া মন একাগ্র হইল তাঁয়, তাহে কিছু নাহি আসে যায়,
অনুক্ষণ তাঁর ধ্যানে তন্ময়তা আসিলেই তাঁরে পাওয়া যায়।)

কথাপ্রসঙ্গে

'চেতোদর্পণমার্জনম্'

১

বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বোধের অধিকাংশই জুড়িয়া রহিয়াছে রূপ, দেখা।

আমরা যখন কিছু দেখি, সেই দৃষ্ট বস্তু হইতে আলো আসিয়া আমাদের চোখে পড়িয়া চোখের ভিতরে রেটিনায় তাহার একটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। সেখান হইতে তাহা স্নায়বিক স্পন্দনরূপে মস্তিকের দেখার কেন্দ্রে যাইয়া সেখানে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সূক্ষ্ম দর্শনেন্দ্রিয় সেই প্রতিক্রিয়াকে মনে পৌঁছাইয়া দিলে মনে তাহার অনুরূপ একটি স্পন্দন উঠে। চেতনা-উদ্ভাসিত মনের এই বিশেষ স্পন্দিত বা তরঙ্গায়িত অবস্থাই আমাদের 'দেখা'। এই দেখার কাজে একেবারে বাহিরের দিকে একান্ত প্রয়োজন আলোকের, আর ভিতরের দিকে চৈতন্যের। আলো ছাড়া বাহিরের কিছুই দেখা যায় না, চেতনা ছাড়াও নয়। গভীর অন্ধকার আমাদের বহির্জগৎকে যেন মুছিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তির অথবা জীবিত অচেতন ব্যক্তির চোখ খোলা থাকিলেও সে কিছু দেখে না।

প্রকাশাত্মক চৈতন্যকে তাই সত্যদ্রষ্টাগণ বহু স্থানে তুলনা করিয়াছেন আলোকের বা জ্যোতির সঙ্গে, এবং চৈতন্যের একমাত্র উৎস ভগবানকে, জ্ঞানস্বরূপকে আমাদের আলোকের প্রধান উৎস সূর্যের সঙ্গে।

আমরা যখন দিনের বেলা সূর্যকে, বা দর্পণে সূর্যের বা নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখি, বা অন্য কোন বস্তু দেখি, তখন সব ক্ষেত্রেই আসলে দেখি সূর্যের আলোককেই। সে আলোক হয় সোজাসুজি আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, অথবা অন্য কোন বস্তুতে প্রতিহত হইয়া আসে। সূর্যালোক যখন সোজাসুজি দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসে, তখন দর্পণের মধ্যে সূর্যের একটি প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই; দর্পণটি যদি পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে সূর্যের প্রতিবিম্ব উহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। মনে হয় যেন দর্পণটির ভিতরেই আলোকের উৎস রহিয়াছে, দর্পণটিই যেন আলোক বিকিরণ করিতেছে। সূর্যকে যখন দেখিতেই পাই না, কেবল যেখান হইতে উহার আলোক প্রতিহত হইয়া আসিতেছে সেটিকেই দেখি, তখন ইহা আরো বেশী করিয়া মনে হয়। যেমন রাত্রিতে চাঁদ বা শুকতারাকেই আলোকের উৎস বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যকে যেমন আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, হৃদয় বা মন-বুদ্ধি বা চিত্তকে তেমনি তুলনা করা হইয়াছে দর্পণের সঙ্গে। দর্পণের যেমন নিজের আলোক দিবার ক্ষমতা নাই, সে আলোর উৎস নয়, কিন্তু আলোককে সে প্রতিফলিত করিতে পারে, আলোকের উৎসকে প্রতিবিম্বিতও করিতে পারে, তেমনি আমাদের মনবুদ্ধি প্রভৃতিরও, চিত্তেরও ইট পাথর জল বায়ু প্রভৃতির মতোই নিজস্ব চেতনা নাই, কিন্তু চৈতন্য তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে, চৈতন্যের মূল উৎস ভগবানকে সে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিতও করিতে পারে। এই জন্যই চৈতন্যের মূল

উৎস ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত চিত্তকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এই জন্য চিত্তে হৃদয়ে ভগবানকে দর্শনও করা যায়। অসংখ্য ব্যক্তি হৃদয়মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

তবে দর্পণে যেমন ময়লা জমিয়া থাকিলে উহাতে সূর্যালোক কিছুটা প্রতিহত হইয়া বিচ্ছুরিত হইলেও সূর্যের প্রতিবিম্ব তাহাতে দেখা যায় না, চিত্তও সেরূপ মলিন থাকিলে উহার ভিতর দিয়া চেতনার প্রকাশ হইলেও চৈতন্যের উৎস ভগবানকে সে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে না—মনবুদ্ধিকে চেতন বলিয়া মনে হইলেও হৃদয়মধ্যে ভগবানের দর্শনলাভ আমাদের হয় না।

হৃদয়মধ্যে শ্রীভগবানকে দেখিতে হইলে তাই আমাদের একমাত্র কাজ মনবুদ্ধিরূপ বা হৃদয়রূপ বা চিত্তরূপ দর্পণটিকে পরিষ্কার করা, মালিন্যমুক্ত করা, শুদ্ধ করা। ভোগেচ্ছা বা বাসনাই এই মালিন্য। চিত্ত-দর্পণের উপর উহা জমিয়া রহিয়াছে বলিয়া ভগবানকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না; যদিও আমাদের জীবনের সর্ববিধ চিন্তা, অনুভূতি, সর্ববিধ বোধ মলিন চিত্তের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত সেই চৈতন্যস্বরূপের চেতনাতেই উদ্ভাসিত হইতেছে। যেমন গোধূলি-বেলায় সূর্যকে দেখা না যাইলেও আকাশে বিচ্ছুরিত তাহারই কিরণে আমরা জাগতিক বস্তুনিচয়কে দেখি। এই জন্য সেই চৈতন্যস্বরূপ ভগবানকে বলা হইয়াছে 'প্রতিবোধবিদিতম্'—প্রতিটি বোধের পিছনে তাঁহারই চৈতন্য, যে চৈতন্য ছাড়া বোধ সম্ভবই নয়। আমরা তাঁহাকে চিত্তে দেখিতে পাই না বলিয়া ভুল করিয়া ভাবি উহা মনবুদ্ধিরই চেতনা; এমনকি যাঁহারা চিত্ত দর্শন করেন নাই বা উহার অস্তিত্বেই সন্দিহান, তাঁহারা আরো বহিদেশে চলিয়া যান, ভাবেন উহা মনবুদ্ধির প্রকাশের স্থূলতর যন্ত্র মস্তিষ্কেরই ক্রিয়ামাত্র। মস্তিষ্ককে তো বটেই, মনবুদ্ধিকেও চেতনার উৎস বলিয়া ভাবটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, যেমন কাল্পনিক দর্পণকে আলোর উৎস বলিয়া ভাবা। প্রতিবিম্বের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাই হইল আলোর কল্পিত উৎস।

২

চিত্তকে মালিন্যমুক্ত করার বহু উপায় আছে, যাহার মধ্যে ভক্তিপথে একটি হইল ক্রমাগত শ্রীভগবানের নাম করা। চৈতন্যদেব তাই শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তনকে বলিয়াছেন 'চেতোদর্পণমার্জনম্'—শ্রীভগবানের নামকীর্তন চিত্তরূপ দর্পণের উপর সঞ্চিত মালিন্যকে মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, ভস্মদ্বারা মাজিলে যেমন দর্পণ মালিন্যমুক্ত হয়, ক্ষার দিয়া কাচিলে ময়লা কাপড় যেমন পরিষ্কার হয়, শ্রীভগবানের নাম করিলে তেমনি চিত্ত নির্মল হইয়া উঠে।

কত বড় আশার কথা, কত সহজ সর্বজন-সাধ্য উপায়। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চিত্তের উপর বহু মলিনতা আমরা লেপিয়া আসিতেছি। কি আর হইয়াছে তাহাতে? আমরা যদি চাই, ইচ্ছা করিলে আমরাই আবার উহা সব পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারি, যেমন করিয়া ময়লা আয়না পরিষ্কার করিয়া লই, যেমন করিয়া মলিন বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া লই। উহা করিবার উপায় ময়লা জমিয়াছে ভবিয়া মন খারাপ করা নয়, নেতিবাচক কিছু নয়, ইতিবাচক পথে চলা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা: পূর্ব দিকে আগাইয়া গেলে পশ্চিম আপনি পিছাইয়া পড়ে। ময়লা কত পুরু হইয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া চিন্তা করিবারই প্রয়োজন নাই, শ্রীভগবানের নাম করিলেই আপনি সব

যাইবে। তাঁহার নামের এমনই প্রভাব। রিপুগুলি চিত্তকে মলিন করিয়া দেয়। স্বামী যোগানন্দ (তখন যোগেন্দ্রনাথ) একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'রিপু দমন করিবার উপায় কি?' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে ভগবানের নাম করিবার কথাই বলিয়াছিলেন —'সকাল-সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে হরিনাম করবি'। কথাটি স্বামী যোগানন্দের মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথামত কিছুদিন চলিয়াই তিনি ফল পাইয়াছিলেন। চিত্ত শুদ্ধ করিতে শ্রীভগবানের নামের এই প্রচণ্ড প্রভাবের জন্যই পূজার প্রারম্ভে নিজেকে শুচি, শুদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্র—'অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ'— পবিত্র বা অপবিত্র, যে কোন অবস্থাতেই মানুষ থাকুক না কেন শ্রীভগবানের নাম স্মরণমাত্রই দেহ-মন পবিত্র হয়। স্নান, শুচিবস্ত্রপরিধান প্রভৃতি করুক বা না করুক, মন যদি ভগবচ্চিন্তানিরত থাকে, তাহা হইলেই সে শুচি, পবিত্র। আর বাহিরের শুচিতা সত্ত্বেও মন যদি বিষয়-ভোগচিন্তায় নিরত থাকে, সে অশুচি।

৩

একটি প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে, যে প্রশ্ন স্বাভাবিক। মানুষ আদৌ ভগবানের নাম করিতে চাহিবে কেন, চিত্তের মলিনতাকেই, ভোগেচ্ছাকেই বা সরাইতে চাহিবে কেন? ভোগের মাধ্যমেই তো আমরা জীবনে আনন্দ পাইতেছি। ইহা তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ। উহা ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ ভগবানকে কেন আমরা দেখিতে চাহিব? অনিশ্চিতের জন্য নিশ্চিত আনন্দকে ছাড়িব কেন?

অনিশ্চিতের জন্য নিশ্চিতকে কেহই ছাড়িতে বলেন নাই, বলিবেনও না। বলিলেও কেহ তাহা শুনিবে না। কিন্তু এপথে চলার সঙ্গে সঙ্গেই যে নিশ্চিত আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। উপনিষদ্ তো স্পষ্টই বলিতেছেন, হৃদয়ে এই আনন্দের উৎস না থাকিলে মানুষ কি কিছু করিবার প্রেরণা পাইত নাকি?—'যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কো হ্যেবান্যাৎ কো প্রাণ্যাৎ॥' চিত্ত মালিন্যমুক্ত হইতে আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয় হইতে এই আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হইতে থাকে। কারণ যিনি চৈতন্যস্বরূপ তিনিই আনন্দস্বরূপও। চিত্ত যত নির্মল হয়, এই আনন্দও তত অধিক পরিমাণে স্ফুরিত হইতে থাকে। এই আনন্দ বাহিরের কোন কিছুর অপেক্ষাই রাখে না। এই আনন্দকে তাই বলে বিষয়নিরপেক্ষ-আনন্দ। কবির ভাষায় 'অকারণ পুলক'। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে আনন্দ বলি, তাহার জন্য স্থূল ভোগ্যবস্তু হোক, নাম-যশ টাকা-কড়ি প্রতিষ্ঠাদি হোক—বাহিরের কোন বিষয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ হওয়া চাই-ই; এ আনন্দ উহা ছাড়াই জাগে, নিজেরই ভিতর হইতে উৎসারিত হইতে থাকে।

চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তন-প্রসঙ্গে সেই কথাও বলিয়াছেন—বলিয়াছেন, ইহা 'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্'—শ্রীভগবানের নামকীর্তন আনন্দসাগরকে বাড়াইয়া দেয়, প্রতি পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ আনিয়া দেয়।

৪

বিষয়চিন্তায় অস্থির হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধিকতর মালিন্যলিপ্ত হইতে না দিয়া মনকে শ্রীভগবানে বা বিশ্ব ও জীবনের মূল সত্যে স্থির করিয়া মালিন্যমুক্ত করিবার সহজতম উপায়—তাঁহার নাম করা। বাসনাই মনকে তাঁহাতে

স্থির হইতে দেয় না, তাঁহাতে স্থির করিবার চেষ্টা করিলেও বার বার সেখান হইতে বাসনা তাহাকে বিষয়চিন্তায় টানিয়া লইয়া যায়। ফলে অশান্তি বাড়ে। সাধারণতঃ আমরা যাহা কিছু ভোগ করিতে চাই, তাহা পাই না, পাইলেও,—যতই পাই না কেন—মন কখনও তাহাতে তৃপ্ত হয় না, আরো চায়। কাজেই অশান্তি আর যায় না; বরং অশান্তিকে উহা আরও বাড়াইয়া দেয়। শান্তিলাভের একমাত্র উপায় মনকে মালিন্য-মুক্ত করার বা ভগবচ্চিন্তায় স্থির করার চেষ্টা করা এবং তাহার সহজতম উপায় ভগবানের নাম করা। শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করা ছাড়া শান্তিলাভের দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই। ইহা ধ্রুব সত্য। সত্য কিনা, তাহার প্রমাণ যুক্তি দিয়া, বুদ্ধির বেড়াজাল হাতে লইয়া শব্দের মহারণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরিতে যাইবার প্রয়োজন কি? তাহার প্রমাণ আমরা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া সহজে পাইতে পারি। কয়েকদিনমাত্র আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলেই তাহা পাওয়া যাইবে। জননী সারদাদেবী যেমন বলিয়াছেন: লোকে অশান্তির কথা বলে—ভোর তিনটায় উঠিয়া তিনদিন বিশ-পঁচিশ হাজার নামজপ করুক, কেমন শান্তি না পায় দেখি। জীবনকে যাঁহারা সত্যই শান্তিময় করিতে চান—আর কেই বা তা না চান?—ভগবানের নাম করার মাধ্যমে হৃদয়কে বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দে নিষিক্ত করাই তাঁহাদের একমাত্র পথ; ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ আর নাই। পথ নাই বলা যায় না, কিন্তু ইহা অপেক্ষা সহজ, সর্বজনসাধ্য পথ আর নাই। যোগের পথ আছে, ধ্যানের পথ আছে, বিচারের পথ আছে,—কিন্তু শ্রীভগবানের নাম করাই সর্বসাধারণের উপযোগী পথ। মন আনন্দ চায়। তাহারই অন্বেষণে বাহিরের বিষয়ে ছুটিয়া বেড়ায় ভিতরেই আনন্দের একটি নিশ্চিত অবলম্বন না পাইলে সে ভিতরে থাকিতে চাহিবে কেন? শ্রীভগবানের নাম-কীর্তন এই আনন্দের আস্বাদই তাহাকে দেয়।

এই নামের মাধ্যমে মানুষ শুধু যে হৃদয়-মধ্যে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া—সত্যকে হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ধন্য হয়, কৃত-কৃতার্থ হয়, তাহাই নহে; এই নামের মাধ্যমে চরমে সত্যকে শুদ্ধ চিত্তদর্পণের সহায়তা ছাড়াই সরাসরি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব তাই শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনকে বলিয়াছেন, 'বিদ্যাবধূজীবনম্,'—পরাবিদ্যার, জ্ঞানের, শ্রীভগবানের সহিত নিজের অদ্বৈতানুভূতির জীবনস্বরূপ। ভগবানের নামকীর্তন করিতে করিতে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া—মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশে যাইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপে মিশিয়া যাওয়া চৈতন্য-দেবের জীবনে এবং আধুনিককালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। রূপ হইতে অরূপে এবং অরূপ হইতে রূপে, লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য হইতে লীলায় যথেচ্ছ যাওয়া-আসা করিতেন তাঁরা। ভক্তিপথ ধরিয়াও জ্ঞানে পৌঁছানো যায়, এই সত্যই প্রকাশিত এখানে।

৫

আজ জড়বাদ বিশ্ব জুড়িয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে—দেহ ছাড়া মানুষের যে অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বর বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাতে মানুষকে অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়া তাহাকে সর্বদা বহির্মুখী করিয়া রাখিয়াছে; নিজের ভিতরের দিকে একবার তাকাইয়া সেখানে শান্তিপারাবার, আনন্দাম্বুধি সত্যই আছে কিনা

তাহা দেখিবার চেষ্টাও করিতে দিতেছে না। ফলে অশান্তিতে আজ জগৎ আচ্ছন্ন—যেখানে ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য সেখানেও, যেখানে উহার অভাব, সেখানেও। প্রতিটি মানুষের ভাণ্ডার কুবেরের ঐশ্বর্যে ভরিয়া দিলেও এ অশান্তি যাইবে না, যদি না মানুষ বাহির হইতে চোখ ফিরাইয়া নিজের ভিতরের দিকে তাকাইতে শিখিয়া সেখানে অবস্থিত শান্তিপারাবারের সন্ধান পায়। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে আজ তাই প্রার্থনা, যাহা ক্রমে মানুষকে অন্তর্মুখী করিতে পারে সেই 'নামে রুচি' তিনি যেন সবারই অন্তরে আনিয়া দেন।

বিশ্ব হ'তে যাবার বেলায়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সুরার নেশায় ঘোরে
ঘুরবি কত অর্বাচীন?
রামকৃষ্ণনাম-সাগরে
মীন হ'য়ে খেল্ রাত্রি-দিন!—
ভুলিসনে আর ফুলের মালায়,
মন ভরেছে শাল-দোশালায়?
বিশ্ব হ'তে যাবার বেলায়
নি স্ব যে তুই ভাগ্যহীন!

করলি মনের বাজে খরচ
তুচ্ছ কাচের অন্বেষণে!
থাকতে নামের দিব্য-কবচ
মন দিলিনে নিত্য ধনে!
মহানামের বহ্নিশিখায়
সব জড়তা ছাই হয়ে যায়!
পলকে পাপ নামের কৃপায়
কোন্ দিগন্তে হয় বিলীন!

‘গোপালের মা’র গোপাল-লাভ

এই সময় (১৮৮৪ খৃঃ, বসন্তকাল) ‘কামারহাটির ব্রাহ্মণী’ [অঘোরমণি, ‘গোপালের মা’] একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন।···এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বামদিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুঠো করার মতো দেখা যাইতেছে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন, “একি? এমন সময় ইনি কোথা থেকে কেমন ক’রে হেথায় এলেন?” গোপালের মা বলেন, “আমি অবাক্ হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি ‘গোপাল’ বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর ক’রে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীরামকৃষ্ণের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় মিলিয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ-মাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখপানে চেয়ে (সে কি রূপ, আর কি চাউনি!) বললে, ‘মা, ননী দাও।’ আমি তো দেখেশুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা! চীৎকার ক’রে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হ’ত। কেঁদে বল্লুম, ‘বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব বাবা?’ কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল ‘খেতে দাও’ বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারকেল-লাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বল্লুম, ‘বাবা, গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।’

“তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমন সকাল হোলো অমনি পাগলিনীর মতো ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চল্লো—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চল্লুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলচে!”···

···পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন, সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। এই রূপে মায়ে পোয়ে কাঠকুড়ান হইল, তাহার পর রান্না। রান্নার সময়ও দুরন্ত গোপাল কখন কাছে বসিয়া, কখন পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল, কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আব্দার করিতে লাগিল!

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—(গোপালের মার পূর্বকথা)

সমন্বয়ী ঠাকুর

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে

(৭) যুগ-যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী (দ্বৈতাদ্বৈতবাদী), শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বৈদান্তিকদিগের মধ্যে কর্ণপটহবিদারী বাদ-বিসংবাদ চলিয়া আসিতেছিল, যাহার ফলে বাগ্দেবীর দার্শনিক পাদপীঠ খণ্ডনমণ্ডন-তর্ক-সাহিত্যে পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয় উপলব্ধিলব্ধ জ্ঞানের আলোকে তাহার নিঃসংশয় সমাধান সম্পাদন করিয়া বিবদমান গোষ্ঠিবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বাদসকল পরস্পরবিরোধী নহে; উহা উপলব্ধির ক্রমপরম্পরা, সোপানাবলী।[১৭] প্রত্যেক সাধককে উহার সকল সোপানই অতিক্রম করিয়া তবে চরম তত্ত্বে পৌঁছিতে হয়; সাধক উপলব্ধির ঐ সকল স্তরের মধ্যে যখন যেটিতে উপস্থিত হন, তখন সেইটিই তাঁহার কাছে একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, এবং অপরগুলি মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। "অদ্বৈতবাদ শেষের কথা," "সেখানে সব শিয়ালের এক রা।"

(৮) অদ্বৈত বেদান্তের অভ্রভেদী সৌধের অভ্যন্তরও সর্বত্র সমুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিল না। মায়ার স্বরূপ এবং ব্রহ্ম ও শক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বনে অদ্বৈতবেদান্তী ও বিপক্ষদলের বৈদান্তিকগণের মধ্যে কয়েকশতাব্দব্যাপী বাদানুবাদের অন্ত ছিল না, তৎসত্ত্বেও অদ্বৈতবেদান্তীদের সব সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র বলিয়া সকলের নিকট গৃহীত হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর, যিনি নিরন্তর ছয়মাসকাল অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিয়াছিলেন, যিনি দিনের মধ্যে 'দণ্ডে শতবার' সবিকল্প-নির্বিকল্প ভূমিতে যাতায়াত করিতেন, যাঁহার শ্রীমুখ দিয়া শুধু জগজ্জননীর 'রাশঠেলা' জ্ঞানরাশিই বাহির হইত, যাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসমূহ বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্র-পুরাণাদিরও উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিল,— তাঁহার অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা অদ্বৈত বেদান্ত-সিদ্ধান্তকে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, অতঃপর তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

শাঙ্করাদ্বৈতবাদমতে: (১) ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মে শক্তি বা কোন প্রকার অবস্থা কল্পনীয় নহে, "অবস্থাশক্তীভাবয়োপপদ্যতে" (বৃহঃ উপঃ ৩।৮।১২ ভাষ্য)।

(২) ব্রহ্মের নির্গুণভাবই সত্য, সগুণভাব মায়িক ও মিথ্যা।

(৩) মায়া[১৮] বা অবিদ্যা (শঙ্করমতে অভিন্ন) ব্রহ্মাণ্ডজননী; এই মায়াশক্তি-উপহিত ব্রহ্মই পরমেশ্বর বলিয়া কথিত হন, "নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধিরাত্মান্তর্যামীশ্বর উচ্যতে" (বৃহঃ উপঃ ৩।৮।১২ ভাষ্য)। এই পরমেশ্বরই মায়াশক্তিকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডলীলা সম্পাদন করেন।

১৭ ঐ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১১৩

১৮ শ্রুতিতে নানাস্থানে এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে তমঃ, অবিদ্যা, প্রকৃতি, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, প্রাণ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

(৪) এই অবিদ্যা (মায়া) অনাদি, অনিত্য, সদসদ্‌বিলক্ষণা, ভাবাভাববিলক্ষণা, জ্ঞানবিনাশ্য[১৯] ও অনির্বাচ্য।

(৫) মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়াই ব্রহ্মকে আবরণ করে, "আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনীনির্বিভাগচিতিরেব কেবলা" (সংক্ষেপশারীরক ১।৩১৯)।

(৬) প্রলয়কালে জগৎপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মশক্তিরূপে মায়ার গর্ভে বিলীন থাকে, এবং মায়া অব্যক্ত-রূপে ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে।

এ বিষয়ে এসব সন্দেহ মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়:—(১) ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্গুণ, বা কেবলমাত্র সগুণ, একথা বলিলে অনন্ত ব্রহ্মের সীমা বাঁধিয়া দিয়া তাঁহার অনন্তত্বের লোপ সাধন করা হয়।

(২) ব্রহ্ম ও শক্তি বিভিন্নতত্ত্বরূপে প্রতিপাদিত। শক্তিকে ব্রহ্মাশ্রিতা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মাত্মিকা নহে। এইখানে অদ্বৈতবাদের ভিতরে দ্বৈতবাদের স্পর্শ আসে। ইহা একটি ছিদ্র। মায়াশক্তিকে "ভাবাভাববিলক্ষণা বা সদসদ্‌বিলক্ষণা ও অনির্বাচ্য" বলিয়া নস্যাৎ করিয়া দিলেও তাহা অপনীত হয় না। পণ্ডিত Max Muller এইটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন।

(৩) অনাদি পদার্থের বিনাশ হয় না, প্রতিপক্ষদার্শনিকদিগের এই আপত্তিখণ্ডনার্থে যে সমস্ত তর্কযুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা কত দূর দৃঢ়প্রত্যয়জনক তাহা বলা কঠিন। শক্তির বিনাশ হয়—একথা ভৌতিক বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। শক্তি এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য; শক্তির রূপান্তর আছে, উপচয় অপচয় বা বিনাশ নাই,—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত।

এই সকল অসঙ্গতির জন্যই বোধ হয় মহামান্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে বুঝাতে পারে নাই।"[২০]

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে কিন্তু এসব সন্দেহের নিরসন:

(১) ব্রহ্মের 'ইতি' করা যায় না; তিনি সগুণ, নির্গুণ এবং আরও যে কত কি তাহা বলা যায় না।[২১] যিনিই (নিত্যে) নির্গুণ, তিনিই (লীলায়) সগুণ।[২২] তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর কোরে বোলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না।...মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে?[২৩]

(২) ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।...যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি।...সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মিভাবা যায় না।...নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলা ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।...একই বস্তু; যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নামরূপভেদ।[২৪] বাবু যখন চুপ করে আছে, তখনও যে ব্যক্তি, যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি।[২৫]

১৯ শক্তি এক অবিভাজ্য; শক্তির উপচয়, অপচয় বা বিনাশ নাই, ইহা ভৌতিক বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত এখানে যে শক্তি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে তাহাকে বিনাশশীলা বলা হইয়াছে।

২০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১।৩ ২১ লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ১।১ ২২ কথামৃত, ৩।১।৬

২৩ কথামৃত, ১।১২।৩ ২৪ কথামৃত ১।২।৪ ২৫ ঐ ৪।৭।২

ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় না, বাদ্যকে ছেড়ে বাজনা হয় না।[২৬] স্থির জল ব্রহ্মের উপমা, জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা।[২৭] যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি।[২৮]

(৩) ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না। অভেদ। এক। যে একের আর দুই নাই। অদ্বৈতম্।[২৯] এ অভেদজ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়। ...সমাধিতে যে কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না।...ব্রহ্ম বেদাবিধির পার।[৩০]

(৪) চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম অভেদ।[৩১] সেই চিচ্ছক্তি মহামায়ারূপে সব অজ্ঞান করে রেখেছে। এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই 'যা ছিলুম তাই হলুম'।[৩২] সেই চিচ্ছক্তি,—সেই মহামায়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। নামরূপ যা আছে, সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য।[৩৩]

(৫) মায়ার ভিতর তিন গুণ আছে,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।...আগুনে যদি নীল বাড় ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়; রাঙা বাড় ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায়, কিন্তু আগুনের নিজের কোন রং নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা (ব্রহ্ম), তিনি নির্লিপ্ত। তাঁতে এই তিন গুণ আছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত।...এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত।[৩৪] ব্রহ্ম মায়াতীত। (এইজন্য তাঁতে মায়া, অবিদ্যা থাকিলেও তাঁর কোন ক্ষতি হয় না)। ...যেমন সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিন্তু কিছু হয় না।[৩৫]

(৬) যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।...বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়;...কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না; শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে।[৩৬] জীবজগৎকে বাদ দেবে কি করে? তাহলে যে ওজনে কম পড়ে।...ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আর সেই আদ্যাশক্তিতেই জীবজগৎ হয়েছে।[৩৭]

এই নিত্য ও লীলা যে একই ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা তাহা বুঝাইবার জন্য ঠাকুর বলিয়াছেন,[৩৮] "অকার, উকার, মকার—কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। আমি উপমা দিই ঘণ্টার টংশব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়;—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পোড়লো, আর ঢেউ আরম্ভ হোলো, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পোড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হোলো। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য। আমি ঠিক এইসব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে—চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই

২৬	কথামৃত	৫।১৩।১	২৭	কথামৃত,	১।১২।৯	২৮	কথামৃত	৫।৭।৫
২৯	ঐ	৫।৩।৩	৩০	ঐ	১।১২।৯	৩১	ঐ	২।১৯।৩
৩২	ঐ	৫।৮।২	৩৩	ঐ	২।১৯।৩	৩৪	ঐ	৪।২১।৩
৩৫	ঐ	৬।১।১	৩৬	ঐ	১।১৩.৬	৩৭	ঐ	৪।৭.২

লয় হোয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়। তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।"

সারসংক্ষেপ: (১) অনন্ত ব্রহ্মের ইতি করা যায় না। তিনি সগুণ, নির্গুণ, তাছাড়া আরও যে কত কি হইতে পারেন, তাহা ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগম্য।

(২) ব্রহ্ম শক্তিহীন নহেন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, শান্ত অবস্থা,—নিত্য বা তুরীয় অবস্থা; আর শক্তি তাঁহারই সক্রিয় বা লীলাবস্থা। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া শক্তি হয় না। শক্তি ব্রহ্মাশ্রিতা মাত্র নহে, ব্রহ্মাত্মিকা।

(৩) অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও শক্তি দুটি। পূর্ণজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অভেদত্ব উপলব্ধি হয়। তখন দুই ই এক, অদ্বৈত বোধ হয়।

(৪) যেমন বেলের সারটুকুই সমগ্র বেল নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবটি চরমতত্ত্ব (Ultimate Reality) হইলেও, তাহা ব্রহ্মের সমগ্রটুকু নহে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্গুণ। কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ, উভয়ই।[৩৯]

(৫) ব্রহ্মশক্তি এক, অখণ্ড এবং অবিভাজ্য হইলেও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয়। (i) তুরীয়স্তরে শক্তি স্ব-স্বরূপে,—প্রশান্ত 'অমলাকারানির্বিকল্পা' 'জ্যোতির্ময়ীচিদ্রূপে' ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকে; সেই চিৎপ্রভায় সমস্ত অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্ব প্রকাশিত থাকে। ("ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং" ইত্যাদি মন্ত্রে এই চিৎ-প্রভা বর্ণিত)। (ii) ঈশ্বরীয় স্তরে শক্তি 'মহামায়া'রূপে অভিব্যক্ত, এবং (iii) জৈব স্তরে ইহার অভিব্যক্তি 'অবিদ্যা' রূপে। নিত্যস্তরে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, ঈশ্বরীয় স্তরে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা, জৈবস্তরে মলিনসত্ত্বপ্রধানা,—তিন স্তরে শক্তির এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। [উপরি লিখিত (৪) ও (৫) প্যারাতে উদ্ধৃতোক্তির পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এইরূপ অর্থই পাওয়া যায়।] এবং তাঁহার সমাধিচিত্র হইতেও আমরা ইহার বাস্তব নিদর্শন (practical demonstration) পাইয়া থাকি। যথা—যখন তিনি নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ন হইতেন তখন তাঁহার অবিদ্যাকার্য,—জগদ্দর্শন, প্রাণস্পন্দনাদির নিবৃত্তি হইত এবং তাঁহার বদনমণ্ডল চিৎ-প্রভায় জ্যোতির্ময়[৪০] হইত; সে সময়ে তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর বিষয়বাসনাদুষ্ট মনও সেই প্রভার প্রভাবে বাসনাবিমুক্ত হইয়া দৈবীভাবে অভিভূত হইত। আবার তাঁহার ব্যুত্থিতাবস্থাতে প্রাণস্পন্দনাদি আরম্ভ হইত। এই প্রকার তিনি যখন ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত হইতেন তখন তাঁহাতে "নিত্যনিরতিশয় জ্ঞানশক্তি"র আবির্ভাব হইত এবং সেই শক্তি তিনি তাঁহার কোন কোন ভাগ্যবান্ ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াও দিতেন। ঠাকুর যে সদাসর্বদাই এইরূপ শক্তি সঞ্চার করিতেন না, কেবলমাত্র ঈশ্বরীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিবার সময়েই উহা করিতেন, ইহা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-পাঠকের অবিদিত নহে।[৪১] এইরূপে আমরা ঠাকুরের আপ্তবাক্য হইতে ও সমাধি-

---

৩৮ ঐ ১।১।৬

৩৯ কথামৃত ৩।১।৩।২ কঠঃ উপঃ ২।২।১৫, মুণ্ডক উপঃ ২।২।১১, এবং শ্বেতাশ্ব উপঃ ৬।১৪

৪০ কথামৃত ১।১১।৩

৪১ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠসংস্করণ পৃঃ ৩২৩

দৃষ্টান্ত সহায়ে বুঝিতে পারি যে, জীবের বোধ যখন যে স্তরে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মশক্তির (আত্মশক্তির) সেই স্তরের অভিব্যক্তিই হয়, অন্য স্তরের অভিব্যক্তি নিবৃত্ত থাকে; আত্মজ্ঞানোদয়ে অবিদ্যাভিব্যক্তির নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার বিনাশ হয় না।

ঠাকুর বলিয়াছেন যে, শক্তি ব্রহ্মাত্মিকা—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। আবার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম মায়াতীত। এই মায়াতীত অর্থে মায়া-সম্বন্ধবিহীন বুঝলে আমাদিগকে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। মায়াতীত অর্থ মায়ার আয়ত্তের বাহিরে; শক্তি-শক্তিমানের এ সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আপনি যত বড় বিশ্ব-বিখ্যাত কুস্তিগীরই হউন না কেন, আপনার শক্তি কখনও কুস্তির প্যাঁচ খেলিয়া আপনাকে ভূমিশায়ী করিতে পারিবে না। আর সাপের দৃষ্টান্ত দিয়া ঠাকুর এই বুঝাইয়াছেন যে, শক্তি সর্বভাবেই শক্তিমানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, এই জন্য শক্তিমানের কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে না,—ব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তি অভিন্ন থাকিলেও, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম কলুষিত হন না।

(৯) ঠাকুর পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মুসলমান গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মুসলমানধর্মের প্রণালীতে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; এই প্রকারে তাঁহার মধ্যে ভারতবর্ষনিবাসী দুইটি প্রধান জাতির ভাব সমন্বয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার এই জীবনাদর্শের অন্তর্নিহিত ভাবানুশীলন করিয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান একদিন যে উভয়ে উভয়কে সপ্রেম আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবে এবং বহু কালের বিবাদ ভুলিয়া শান্তিলাভ করিবে,[৪২] স্বামী সারদানন্দ ইহা আশা করিয়া গিয়াছেন। আজ পূর্বগগন তাঁহার সে আশাপূরণের আলোকে সমুজ্জ্বল। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর আমাদিগকে তাঁহার এই প্রদর্শিত মার্গে চলিবার শক্তি ও প্রেরণা প্রদান করুন, বিশ্ব-মনকে এই আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলুন, তাঁহার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

৪২ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ১০৮

অপরূপ

শ্রীমতী শেফালি ভট্টাচার্য

ফুল হয়ে তুমি ফোট ফুল-মাঝে,
সুর হয়ে বাজ বাঁশীতে,
মানুষের মনে মূর্ত যে হও
শত কান্না ও হাসিতে—
ভিখারীর বুকে ক্ষুধা হয়ে ফের,
আর্তের বুকে বেদনা,
সুখ হয়ে ভাস সুখীর চিত্তে,
বুঝি না, তোমারে বুঝি না।
বুঝাইতে চাও তুমিই আলোক
তুমিই আঁধাররূপে !

নানা রূপে আস হৃদয়ের দ্বারে
চিরকাল চুপে চুপে।
প্রেমময় তুমি প্রেমিকের কাছে,
ভক্তের ঈশ্বর,
সেবকের কাছে সেব্য, জ্ঞানীর
ব্রহ্ম পরাৎপর।
রূপে ও অরূপে অপরূপ তুমি
আপনারে চাও লুকাতে,
তোমারে খুঁজিতে তোমারে হারাই
পারি না তোমারে চিনিতে।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

সন্ধ্যারতির পূর্বে বাবা ঘরের বাইরে হল-এ চেয়ারে একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; নিকটে কেহ কোথাও নাই, ভক্ত একটু যাইতেই বলিলেন, "পাখাটা নিয়ে আয় তো।"

ভক্ত আস্তে আস্তে সর্বাঙ্গে বাতাস করিতেছে। তিনি বলিলেন, "না, গরমের জন্য নয়; পায়ে বড় মশা বসছে, তাই।" ভক্ত সেই পুণ্য সন্ধ্যায় চুপ করিয়া আস্তে আস্তে পায়ের দিকে বাতাস করিতে লাগিল।

সেদিন বৈকালে বোধ হয় কোন আশ্রম-বালকের আচরণে ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাই খানিকক্ষণ পরে নিজেই বলিতেছেন, "ভাবছিলাম অনাথ ছেলেদের মধ্যে থেকে কই তেমন ত্যাগ-বৈরাগ্যবান্ ছেলে তো বেরুল না, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব নিতে পারল না। তবে কি হ'ল? বড় দুঃখ হচ্ছিল। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন ও বুঝিয়ে দিলেন—ওরা একমুঠো ভাতের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত, একটু ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে পরত। ওরা কি এসব ভাব ধরতে পারবে, না দেখাদেখি নিলেও ধরে রাখতে পারবে? এদের চাই খাওয়া-পরা, একটু লেখাপড়া—যাতে জীবনে দাঁড়াতে পারে। এজীবন এভাবেই কেটে যাবে, তবে এতদিনের আশ্রম-বাসের ছাপ একটু না একটু থেকে যাবে।

"ভারী কষ্ট হয়—যখন দেখি, সামান্য জিনিসের জন্য কেউ স্বার্থপরতা দেখাচ্ছে। কখনও একটি লবঙ্গ পর্যন্ত নিজে আগে খাইনি। খাওয়া-দাওয়ার পর লবঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, আঁচিয়ে এসে সবাই মুখে দেবে, সবার হয়ে গেলে শেষে একটি মুখে দিয়েছি, বরাবর সবাইকে খাইয়ে নিজে খেয়েছি, কত দিন না খেয়ে না পরে ওদের খাইয়েছি, পরিয়েছি। এসব থেকে ওরা কি কিছুই শিখবে না? তবে দু-একজন বেরিয়েছে—যেমন ত্যাগের ভাব, তেমন কর্মের শক্তি।

"বাহাদুর—সে-তো মানুষ নয়, দেবশিশু—যেন স্বর্গ থেকে, হিমালয় থেকে নেমে এসেছিল! মাটির ধূলিতে রইল না; তার কি যাবার বয়স হয়েছিল—দুধের বাছার? কি শক্তি গায়ে! কি মনের জোর! কি অনুসন্ধিৎসা—সরল বিশ্বাস, পরোপকার-স্পৃহা! শুয়ে শুয়ে আমায় কত কি জিজ্ঞেস ক'রত—মানুষ মরে কোথায় যায়? মানুষ কেন জন্মায়? কতক উত্তর দিতাম—আর কতক বলতাম—বড় হ'লে শিখবে। কিছুদিন পরেই বলত—'বাবা, এখন বড় হয়েছি। এখন কি বলবেন সেই কথাগুলি?' কখন বা গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে দিতুম। খুব দুর্দান্ত ছিল—তেমনি সাহসী। বেলুড়ে নিয়ে গেছলাম। সব তছনছ ক'রে দেয়—সার্সি কাঁচ সব ভেঙে ফেলে। শেষে স্বামীজী বললেন, 'ভাই, তোমার ও পাহাড়ী বাচ্চা তোমাতেই শোভা পায়।'

"এইখানে—চাষীদের একটি ছেলে বর্ষার স্রোতের জলে ডুবে গিয়ে খাবি খাচ্ছে, দেখতে পেয়েই বাহাদুর এক লাফে তাকে তুলে এনে বাঁচালে। নিজের প্রাণের মায়া নেই। গাছে টিক্ ক'রে ঢিল ছুঁড়ত। অনেক সময় মাঠে চাষীদের গায়ে গিয়ে লাগত। চাষীরা

বলে—দণ্ডী ঠাকুর, বারণ কর। একবার বুঝিয়ে বললুম—তখনি শুনলে। বড় দুঃসাহসী ছিল—একটা খুব ভারী জিনিস তুলে বুকে আঘাত লাগে, বোধ হয় শিরা-টিরা ছিঁড়ে যায় তাতেই দিন দিন ক্ষয়ে যেতে লাগল, শুকিয়ে যেতে লাগল। কত চেষ্টা, কত চিকিৎসা! কিছুতেই কিছু হ'লনা। অত ভারী রোগ, তবু নিজে হাতে খাবে। একদিন—শেষদিনের আগের দিন—সেইদিন শুধু তাকে হাতে ক'রে দুধ খাইয়েছি। শেষদিন—সকালবেলা বলে 'বাবা, ঠাকুরঘরে যাব।' আমি বলি—সে কি বাবা, তোমার যে অসুখ! ভাল হও, ভাল হয়ে ঠাকুরঘরে যাবে। সে বললে, 'না, বাবা! আমায় ঠাকুরঘরে নিয়ে চলুন। ঠাকুরঘরে গেলেই আমি ভাল হয়ে যাব।' নিয়ে গেলুম—ঠাকুরের ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে 'পরমেশ্বর, পরমেশ্বর,' বলতে লাগল। তারপর ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ রাখল।

"আর একদিন ভাবছি—আচ্ছা, এদের আমি এত ভালবাসি, তবু কেন এরা ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়? এতটুকু টান বোধ করে না, একবার ফিরেও তাকায় না। এতটুকু মায়া নেই? ঠাকুর বলছেন: 'আর কোন মায়া তোকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুই যে আমার প্রেমজ্যোতিতে ঘেরা, আমার ভালবাসায় ভরা। সংসারের মায়িক ভালবাসা কি তোদের স্পর্শ করতে পারে রে?' তখন বুঝলাম—মনটা শান্ত হ'ল। ওরা থাকলেই বা আমার কি, আর ওরা গেলেই বা আমার কি? তবে যার সঙ্গে যে ক'দিনের যোগাযোগ। একটা ভারী মজা দেখেছি—বরাবর একজন না একজন গোপাল নামের কেউ না কেউ আমার কাছে আছে। সেই যে ঠাকুর দেখিয়েছিলেন—যশোদা ও গোপাল, আর বলেছিলেন, 'দেখ্ দেখি কি ভাব!'"

এই প্রসঙ্গে আর একদিন বলিতেছেন, "এর ভেতর মা যশোদা আছেন জানো? মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন—দেখনি সেদিন?"

একদিন সন্ধ্যার পর বাবা ঘরে খাটে শুইয়া আছেন। বলিতেছেন, "খেতড়িতে থাকতে স্বামীজীকে এক চিঠি লিখলাম আমেরিকায়। রাত ন-টায় লিখতে বসি—লেখা যখন শেষ হ'ল তখন ফর্সা হয়ে গেছে। পরিষ্কার করে লিখলুম—দেশের অবস্থা যা বুঝেছি ও আমি যা করতে পারি; আর জানতে চেয়েছিলাম—আমায় কি করতে হবে। উত্তরের আশায় দিন গুনতে লাগলাম; আর ভাবতে লাগলাম নানা কথা—স্বামীজী কী লিখবেন। যদি লেখেন, 'তুই সন্ন্যাসী, তোর অত মাথাব্যথা কেন? সাধন ভজন শাস্ত্রালোচনা প্রব্রজ্যা নিয়ে থাক। ওসবে হাত দিয়ে 'অব্যাপারেষু ব্যাপার' করতে যেও না।' যদি এরকম লিখতেন, তা হ'লে ঠিক ছিল—কাকেও কিছু না ব'লে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব, তা হ'লে আর এইসব দুঃখ-দুর্দশা দেখতে হবে না। কারাকোরাম দিয়ে একেবারে Central Asia (মধ্য এশিয়ায়) চলে যাব, যেখানে যাবার জন্য আগেই বেরিয়েছিলাম। স্বামীজীই তো ডেকে নামিয়ে আনেন—তাঁর সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণ করতে হবে বলে। পাহাড়ের পথঘাট সব আমার জানা ছিল কিনা।

"স্বামীজীর চিঠির জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। উত্তর এল। এ চিঠি partly published (আংশিক প্রকাশিত) পত্রাবলীতে। চিঠি পড়ে বুঝলাম—ওখানে তুফান উঠেছে। তাঁর বিরাট হৃদয়ে সেবাধর্মের যে বান ডেকেছিল, তাই এসে এখানে (বুকে হাত দিয়া) ধাক্কা

দিল। আমার জীবন ও কর্মের ধারা সেই-দিনই ঠিক হয়ে হয়ে গেল।

"প্রথমে খেতড়িতে কাজ—তারপর এখানে। স্বামীজী যখন যে ভাবের ওপর জোর দিতেন, তখন মনে হ'ত সেইটিই সত্য—একমাত্র সত্য। মঠে প্রায়ই হত, সেইজন্য হঠাৎ কেউ এসে তাঁর ভাব ধরতে পারত না। যেদিন সেবাধর্মের কথা উঠল, সেদিন এমন বললেন যে, মনে হ'ল—এছাড়া আর সব মিথ্যা ভুল। যেদিন শাস্ত্রজ্ঞান কি ধ্যানের কথা উঠল, সেদিন মনে হ'ত—এ-ই সত্য আর সব বাজে কাজ।

"স্বামীজীকে মনে হ'ত বুঝি বা সাক্ষাৎ শঙ্কর অথবা বুদ্ধ—সারা মঠ শান্ত স্থির, যেন ধ্যানমগ্ন। আর যেদিন তিনি রাধা ও গোপীভাব বা ভক্তির কথা বলতেন, সেদিন তিনি সম্পূর্ণ আর একটি, বলতেন—

Radha was not of flesh and blood,
Radha was a froth in the ocean
of love.

—শ্রীমতী রাধা রক্ত-মাংসের নয়, তিনি প্রেমসমুদ্রের একটি বুদ্বুদ। একথা তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছি। হয়তো আপন মনে বলছেন, আর জোরে জোরে পায়চারি করছেন, অথচ সাধারণত: কেউ রাধাকৃষ্ণ বা গোপীভাব আলোচনা করলে থামিয়ে দিতেন, বলতেন, 'শঙ্কর পড়্, শিবের ভাবে ভরে যা।' ত্যাগ, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম—এগুলির ওপর জোর দিতেন।"

শান্ত উদ্দীপিত ভাবে এইসব কথা বলিতে বলিতে বাবা শোয়া অবস্থা হইতে উঠিয়া বিছানায় বসিয়া বলিতেছেন, "শিব! শিব! শিব শৌর্য-বীর্যের দেবতা,—রুদ্র, মৃত্যুঞ্জয়, মদনজয়ী বীর, শ্রেষ্ঠ বীর। ওঁর সঙ্গে কেউ পারে না। সব ওঁর শরণাগত। উনি সবের কর্তা কিনা, শেষ গতি। আগে আগে শিবের ছবি আঁকত—কি বিশ্রী! শিবের কোন idea (ভাব)-ই নেই—এতখানি ভুঁড়ো পেট, চোখগুলো অসম্ভব রকমের ঢুলো ঢুলো—গাঁজাখোর ভাঙখোর শিব। যেমন দেশ, তার তেমনি ঠাকুর। এখন art (চিত্রশিল্প) অনেক improve (উন্নতি) করেছে আমাদের সময়ের চেয়ে। কি সুন্দর সুন্দর শিবের ছবি দেখেছি। একদিকে যেমন শক্তিমূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত মূর্তি! ভারী চমৎকার! দু-রকম দু-খানা ছবি এই ঘরে রয়েছে। হিমালয় না দেখলে শিবকে কিছুই বোঝা যায় না। হিমালয় যেন শিবের মূর্তি। শিব শিব শঙ্কর, শিব শিব শঙ্কর—আহা! শিব কি সুন্দর! ঠাকুর আমায় দেখিয়েছিলেন চৈতন্যময় শিব! দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরে নিয়ে একদিন দেখালেন—'এই দেখ্ চৈতন্যময় শিব!' সত্যিই সেদিন কী যে দেখলাম! কি আনন্দই যে ঠাকুর প্রাণে ঢেলে দিলেন! তারপর স্বামীজী দেখালেন—জীবে জীবে শিব জীবন্ত শিব! অসহায়, দরিদ্র, রুগ্‌ণ, অভুক্ত, অন্নহীন বস্ত্রহীন—সব নারায়ণ! স্বামীজীর চোখই আলাদা। সত্যিই বলছি—সবাইকে খাওয়ালে ঠাকুর খান, এ বিশ্বাস আমার আছে,—এ আমি দেখেছি! হয়তো ঠাকুরের জন্যে কিছু এনেছে—ভোগ দেওয়া হবে, দেরী আছে; আমি সবাইকে খাইয়ে দিয়েছি—এতটুকু মনে কিছু হয়নি। আমাদের ঠাকুর লক্ষ মুখে খান। ঠাকুরকে ঐভাবে খাইয়েই আমার অধিক আনন্দ। ঠাকুরঘরে ভোগ দেওয়ার চেয়ে এই ভাবেই আমার ভাল লাগে। ঠাকুরঘর তো প্রথম করতেই চাইনি—সে সব তো শুনেছ। সন্ন্যাসীদের আবার ঠাকুরঘর কি? সব ব্রহ্মময়। ঠাকুরঘরে ভোগ না দিলে

যে তাঁর খাওয়া হবে না, তা কেন? ঠাকুর সবার মুখে খাবেন—ব্রহ্মার্পণম্‌।

"আলমবাজার মঠে খুব গরম—কারও ঘুম হচ্ছে না। আমি উঠে পাখার হাওয়া করি ও realise (উপলব্ধি) করি--দশের সুখে আমার সুখ, দশেতে আমি, দশের সেবায় ঠাকুরের সেবা—সবাইকে বাতাস করলুম, তারা সুখে ঘুমুতে লাগল, আর আমার ক্লান্তি দূর হ'ল।"

কে তুমি

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

কে তুমি গো হৃদে মোর?
খুলেছ জ্যোতির দ্বার—
আলোর প্লাবনে ঘুচি
গেল চির অন্ধকার।

মরম-দেউলে বসি
কে তুমি গো নিশিদিন,
ডাকিছ সবারে কাছে
বাজায়ে প্রাণের বীণ।

কে তুমি গো বিশ্বময়
হয়ে আছ একাকার,
লুকাইয়ে আপনারে,
করো লীলা-অভিসার!

কে তুমি গো, দেহ ধরি
দুখ সহি বার বার
তাপিত ধরায় আস
ঢালিতে করুণাধার!

কে তুমি গো কর্ণধার
ভবনদী পারাপারে,
বাহিছ সবার তরী
অমৃতের পারাবারে!

কে তুমি? তোমারে ওগো
যে আলোতে যায় চেনা,
কৃপা করে সেই আলো
দাও মোরে এককণা!

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রুতি বলিয়াছেন—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।'—তৈ. উ. ২।৪ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া তত্ত্ববিদের কখনও ভয় হয় না এবং ভয়ের কারণ হইতেও তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন।

তত্ত্ববিদ্ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি সর্ব দুঃখ ও ভয়ের অতীত অবস্থা লাভ করেন। ব্রহ্মানন্দ-সাগরে তিনি সদা ভাসমান। সর্ববাহ্যভোগ-নিরপেক্ষ তিনি কখনও বা 'আত্মক্রীড়' এবং কখনও বা 'আত্মরতি'। আত্মক্রীড় অবস্থায় তিনি বাহ্যসাধন সৎশাস্ত্র বেদান্ত, সৎসঙ্গ প্রভৃতি সহায়ে আত্মানুভব অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করেন। পুনঃ যখন তিনি আত্মরতি তখন পূর্বোক্ত সৎশাস্ত্র বেদান্ত ও সৎসঙ্গাদি সাধনেরও কোন প্রয়োজন হয় না। যখন তিনি একান্তে থাকেন তখন তাঁহার যেমন আত্মানুভব হয়, পুনঃ যখন ব্যবহার করেন তখনও তাঁহার তদ্রূপ আত্মানুভব অব্যাহতই থাকে। একখানা পুস্তকের সাহায্যও লইবার তাঁহার প্রয়োজন হয় না। আত্মাতে তাঁহার এতই নিবিষ্টতা যে সর্বাবস্থাতেই তাঁহার চিত্তে আত্মাকার বৃত্তি জাগ্রত থাকে। আত্মানুভব অতি গভীর হইলে এই অবস্থা হয়।

সত্যবাদিনী শ্রুতির শ্রীমুখবর্ণিত এই অবস্থা লাভের ইচ্ছা কাহার না হয়? মাতৃবৎ পরম-হিতৈষিণী শ্রুতি সেইজন্য এই তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়ও স্বমুখে ঘোষণা করিয়াছেন:

(জ্ঞানসাধন শ্রবণাদিত্রয়): 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' বৃঃ উ. ৪।৫।৬—এই আত্মাকে দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য—এই পর্যন্ত বলিয়াই যেন শ্রুতির মনে হইল যে, তাই তো আত্মাকে দর্শন করিবার কথা তো বলিলাম, কিন্তু কি উপায়ে সে দর্শন হইবে তাহা তো বলা হইল না! স্বভাবতই ভোগপ্রবণ বহির্মুখ মোহান্ধ মানবচিত্তে এই পরমতত্ত্বের আলোক প্রবেশ করিবে কি করিয়া? তাই পরমুহূর্তেই শ্রুতি ঐ আত্মদর্শনের সাধন বলিলেন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ গুরুর মুখে পুনঃ পুনঃ ভেদবাধক ও অভেদসাধক বেদান্তবাক্যসমূহ-শ্রবণ, তৎপর শ্রুতসিদ্ধান্ত-অনুকূল যুক্তিসহায়ে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন এবং পরিশেষে ঐ নিশ্চিতরূপে নির্ণীত তত্ত্বে চিত্ত-সমাধান।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহুকাল পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি সাধনাভ্যাস করা সত্ত্বেও ব্রহ্মানন্দানুভব হয় না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ঠিক ঠিক সাধনানুষ্ঠানপূর্বক জ্ঞানোদয়ের অভাববশতই ব্রহ্মানন্দানুভব হয় না। বেদান্ত-শ্রোতা অনেকেই কিছুকাল শ্রবণ মনন করিয়া নিজেদের জ্ঞানী মনে করিয়া বসেন এবং চিত্ত-গত দুর্বাসনার প্রেরণায় সংসারবন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। কেবল ব্রহ্মবার্তা-কুশলতাই জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। এই কথাই অন্যত্র শ্রুতিও বলিয়াছেন—

'কুশলাঃ ব্রহ্মবার্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥'—

তেজবিন্দু উপঃ ১।৪৬

—ঘোরবিষয়াসক্ত, ব্রহ্মাকারাবৃত্তিবিহীন কিন্তু ব্রহ্মবিচারকথাবিন্যাসে সুচতুর অনেক ব্যক্তিই সংসারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা

অজ্ঞানহত হইয়া এবং জ্ঞানফল লাভ করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারেই যাতায়াত করিয়া থাকে।

(জ্ঞানের লক্ষণ): তাহা হইলে, জ্ঞান হইয়াছে—তাহা জানা যাইবে কি করিয়া? উত্তরে বেদান্ত বলেন যে, জ্ঞানেরও লক্ষণ আছে। প্রধান লক্ষণ হইল বিষয়াসক্তির অভাব। আচার্য সুরেশ্বর বলিয়াছেন—

'রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু।
কুতঃ শাড্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ॥'
নৈঃ সিঃ

—বিষয়ে আসক্তি অজ্ঞানীর লক্ষণ। জ্ঞান হইলে আর বিষয়াসক্তি থাকিতে পারে না। কারণ যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি প্রজ্বলিত, তাহার কি হরিদ্বর্ণ থাকিতে পারে? তদ্রূপ হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে চিত্তগত বিষয়-ভোগাসক্তি বাসনাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়।

তাহা হইলে জ্ঞানীর শারীর ব্যবহার হয় কি করিয়া? ব্যবহারকালে তো দেখা যায় জ্ঞানীও বিষয়-সম্পাদনাদি করিতেছেন এবং তাহা ভোগও করিতেছেন, আসক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভব হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য ভগবান্ শ্রীশংকর বলিয়াছেন:—'ন হি অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বং শক্যং দর্শয়িতুম্…' (ব্র. সূ. ভাষ্য ১।৪)—যিনি 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের পূর্বের ন্যায় সংসারিত্ব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।—জাগতিক ব্যবহার তিনি পূর্বের ন্যায় করিলেও অন্তরে তাঁহার আসক্তির লেশমাত্রও থাকে না, কারণ সুনিশ্চিতরূপে তিনি ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, দৃশ্য বিষয়সমূহ স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় কেবল প্রতিভাসমাত্র, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অজ্ঞানী বিষয়কে সত্য জ্ঞান করিয়াই তাহাতে আসক্ত ও বদ্ধ হয়। বৈরাগ্যবান্ জিজ্ঞাসুরই যখন বিষয়ে রুচি হয় না, তখন জ্ঞানীর তো কথাই নাই। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রবণ-মননানুষ্ঠান সত্ত্বেও জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সম্যক্ দূরীভূত নয় নাই বলিয়াই ব্রহ্মানন্দানুভব হইতেছে না। সর্ব উপকরণ বিদ্যমান সত্ত্বেও অগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে যেমন বুঝিতে হয় যে, মণি মন্ত্রাদি কোন প্রতিবন্ধকই উহার কারণ, তদ্রূপ।

(নিদিধ্যাসন): সাধারণতঃ অনেকে শ্রবণ মনন করে বটে, কিন্তু নিদিধ্যাসন করে না। উহাই ব্রহ্মানন্দ-অনুভব না হইবার কারণ। তাহারা মনে করে যে, নিদিধ্যাসন নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত। নিজেকে সকলেই অতি উত্তম অধিকারী বলিয়াই মনে করিয়া বসে। তাই ভাবে যে, কেবল শ্রবণ ও মননের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া যাইবে। শ্রবণ মননের দ্বারা প্রমাণ (বেদান্তবাক্য) ও প্রমেয় (ব্রহ্মাত্মৈক্য)- বিষয়ক সংশয়মাত্র নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রবণ সর্ববেদান্তের অভেদসিদ্ধান্তবোধক ও মনন ঐ অভেদবিষয়ক সংশয়নিবারক মাত্র। এই পর্যন্ত করিয়াই বহু সাধক বিরত হন এবং ঐখানেই যেন আটকাইয়া যান। নিদিধ্যাসন তাঁহারা করেন না উত্তম অধিকারীর কেবল ব্রহ্মবিচার দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা জগতে অতি মুষ্টিমেয়। উত্তম অধিকারী অতি বিরল। তাঁহারাও পূর্বজন্মে নিদিধ্যাসন করিয়া আসিয়াছেন। কেবল আবরণমাত্র তাঁহাদের প্রতিবন্ধক ছিল। তাহা এই জন্মে বেদান্ত-শ্রবণ ও মনন দ্বারা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারজনিত তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে, দূর হইয়া যায়। অতএব সাধারণ অধিকারীর জন্য নিদিধ্যাসন অতীব প্রয়োজন। ইহা দ্বারাই

বিপরীত ভাবনা (দেহাত্মবুদ্ধি) দূর হয়। বিপরীত ভাবনা, বিপরীতনিশ্চয় অর্থাৎ দেহাত্ম-বোধ দেহবিস্মৃতি না হওয়া পর্যন্ত দূর হয় না। কেবল বিচার দ্বারাই সাধারণ অধিকারীর জ্ঞান হইয়া থাকিলে মান-অপমানে তাহাদের চিত্ত চঞ্চল হয় কেন? ভাষ্যকার শ্রীশংকরাচার্যও বলিয়াছেন —

'যাবন্ন তর্কেণ নিরাসিতোপি
দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্ত্বপরোক্ষবোধাৎ
বিলীয়তে তাবদমুষ্য ভিক্ষো-
র্ধ্যানাদি সম্যক্ করণীয়মেব॥'

—সঃ বেঃ সিঃ সাঃ সংগ্রহ—

—বিচার (মনন) সহায়ে দৃশ্যপ্রপঞ্চের সত্যত্ব নিরাকৃত হইলেও অর্থাৎ দৃশ্য মিথ্যা, এইরূপ ধারণা হইলেও যে পর্যন্ত দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান (ব্রহ্মাত্মৈক্য-বোধ) দ্বারা দৃশ্য বিলীন না হইয়া যায় তাবৎ কাল পর্যন্ত মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর সম্যক্‌রূপে ধ্যান অর্থাৎ নিদিধ্যাসন অবশ্যই অভ্যাস করা কর্তব্য।

(ব্রহ্মানন্দ): ব্রহ্মানন্দ কি প্রকার তদ্বিষয়ে গীতামুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে উহা 'বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্'। 'অতীন্দ্রিয়' বলাতে উহা যে বিষয়সুখ নহে তাহা বলা হইল। কারণ বিষয়সুখ অতীন্দ্রিয় নহে, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। শঙ্কা হইতে পারে যে, বৈষয়িক সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও সুষুপ্তিকালে যে সুখ অনুভূত হয় উহা তো অতীন্দ্রিয়, কারণ সুষুপ্তি-কালে কোন ইন্দ্রিয়ই থাকে না, অতএব সুষুপ্তির আনন্দই অতীন্দ্রিয় পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ। এই শংকা দূর করিবার জন্যই বলা হইয়াছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্', সুষুপ্তিতে অজ্ঞানাবৃত আনন্দানু-ভব হয় মাত্র, সুতরাং উহা পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ নহে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে যে আনন্দানুভব হয় উহা বিষয়াবৃত আনন্দ, উহাও পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ নহে, উহার আভাস, অংশ বা কণা বলা যাইতে পারে মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এতস্যৈবা-নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।' (বৃহঃ উপঃ ৪।৩।৩২)—এই ব্রহ্মানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম অংশ, আভাসমাত্র সর্ব জীব অবস্থাত্রয়ে অনুভব করিয়া থাকে। সুষুপ্তির আনন্দ 'বুদ্ধিগ্রাহ্য' নহে, কারণ তখন বুদ্ধিই নাই। সুষুপ্তির আনন্দকে 'সাক্ষিগ্রাহ্য' বলা হয়। অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত নিদ্রাসুখ ও ঐ অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত স্বরূপসুখ সাক্ষিবেদ্য।

ব্রহ্মসুখানুভূতি যে অবস্থায় হয় সেখানে ইন্দ্রিয় কোন ব্যাপার করে না, বুদ্ধির কোন ক্রিয়াই সেখানে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বুদ্ধি সুষুপ্তি-অবস্থার ন্যায় তখন অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায় না। বুদ্ধি সে অবস্থায় ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়—ইহাই 'তুরীয়' অবস্থা। এই অবস্থার বর্ণনা-প্রসঙ্গেই শ্রুতি বলিয়াছেন—

'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥'

(কঠ উপঃ ২।৩।১০)

—যে অবস্থায় মন সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার-রহিত হয় এবং বুদ্ধিও কোন ক্রিয়া করে না, জ্ঞানিগণ তাহাকেই উত্তম অবস্থা বলিয়া থাকেন।—এরূপ অবস্থায়ই ব্রহ্মানুভূতি হইয়া থাকে।

প্রদীপে আলোক ও তাপ উভয়ই আছে। আলোক দূর হইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাপ অনুভব করিতে হইলে প্রদীপের নিকটে যাইতে হয়। তদ্রূপ আত্মার সৎ ও চিৎ-অংশ (অংশত্বভাব কল্পিত) সর্ববৃত্তিতে এবং দূর হইতেই সর্ব পদার্থে অনুভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু আনন্দাংশ অনুভব করিতে হইলে আত্মার নিকটে যাইতে হইবে। একমাত্র চিত্তের শান্ত

সাত্ত্বিক বৃত্তিতেই আনন্দানুভব হইয়া থাকে। চিত্তের অফুরন্ত ও অগণিত বিষয়াকার বৃত্তি-সমূহই আমাদিগকে স্বরূপানন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে হইলে ঐ সকল বৃত্তিধারা শান্ত করিতে হইবে। চিত্তকে বৃত্তিরহিত বা নির্বিকল্প করিতে হইবে। নির্বিকল্প অবস্থা চিত্তের না হইলে স্বরূপানন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয় না।

(নির্বিকল্প অবস্থার ভান): ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্য চিত্তকে নির্বিকল্প করিবার প্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার মুক্তা-মালার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :

'মুক্তাভিরাবৃতং সূত্রং মুক্তয়োর্মধ্য ঈক্ষ্যতে।
তথাবৃতা বিকল্পৈশ্চিৎ স্পষ্টা মধ্যে বিকল্পয়োঃ॥
(লঘুবাক্যবৃত্তিঃ ১০)

—সূত্রে মুক্তাসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। কিন্তু মুক্তাদানার মধ্যগত সূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। দুইটি দানার মধ্যবর্তী ব্যবধানে সূত্র দেখা যায় বটে। তদ্রূপ চিত্তে বৃত্তির উদয়ে ঐ বৃত্তির মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভব হয় না। একটি বৃত্তির বিলয় ও অপর একটি বৃত্তির উদয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানস্থলে শুদ্ধ চৈতন্যের অনুভব হয়। বৃত্তি সহ চেতনের অনুভব করা বড় কঠিন। যে কোন বৃত্তিতেও চৈতন্য রহিয়াছে। কিন্তু বৃত্তি জড়। উহাতে চৈতন্য আছে বলিয়াই উহা অনুভূত হয়, অনুভবের বিষয় হয়। চৈতন্য বৃত্তিসহ যেন মিশ্রিত হইয়া থাকে বলিয়াই কেবল চৈতন্যের ভান হয় না। যোগদর্শন বলিয়াছেন—'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' অর্থাৎ সমাধি ভিন্ন অন্য কালে স্বরূপচৈতন্য বৃত্তিসহ মিলিত হইয়া যেন তাহার সমানরূপতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং লোকে বৃত্তিটাকে অনুভব করে, চৈতন্যের সন্ধান আর পায় না। যেমন আমরা পুষ্পই দেখি; আলোকাকার পুষ্প দেখি, এই বোধ আমাদের আছে কি?

অতএব বৃত্তিনিরোধ করিলে তখনই শুদ্ধ-চৈতন্যের ভান হয়। দুই বৃত্তির মধ্যস্থল অর্থাৎ সন্ধিস্থল—উহাই নিরোধকাল।

সংবিৎ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি এক বিষয় ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে যাইবার অর্থাৎ অন্য বিষয়াকার হইবার পূর্বে ঐ দুই বৃত্তির মধ্যস্থলে নির্বিকল্প চৈতন্য বিরাজমান এবং উহাই ভগবান্ ভাষ্যকার প্রথম অনুভব করিতে বলিয়াছেন। ঐ নির্বিকল্প চৈতন্যানুভবই ব্রহ্মানুভব।

'ক্ষণে ক্ষণে অন্যথাভূতা ধীবিকল্পা চিতির্ন তু
মুক্তাসু সূত্রবদ্ বুদ্ধিবিকল্পেষু চিতিঃ স্থিতা॥
নষ্টে পূর্ববিকল্পে তু যাবদন্যস্য নোদয়ঃ।
নির্বিকল্পক-চৈতন্যং স্পষ্টং তাবদ্ বিভাসতে॥'—

লঘুবাক্যবৃত্তিঃ ৯, ১১—প্রতিক্ষণে বৃত্তিসমূহ বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, চৈতন্যের কিন্তু সেরূপ হয় না, উহা সদা একরূপেই বিদ্যমান থাকে। মুক্তাসমূহের মধ্যে অনুস্যূত সূত্রের ন্যায় বুদ্ধি-বৃত্তিসমূহের মধ্যেও এক নির্বিকার একরস চৈতন্য বিরাজমান। কিন্তু বৃত্তিসমূহ দ্বারা যেন আবৃত থাকে বলিয়া উহার স্পষ্ট প্রতীতি কষ্টসাধ্য। একটি বৃত্তির বিলয় ও অপরটির উদয়কালের মধ্যবর্তী ব্যবধানকালেই নির্বিকল্প ব্রহ্মচৈতন্যের স্পষ্ট প্রতীতি হইয়া থাকে। এই বৃত্তিমধ্যকালই নির্বিকল্পাবস্থা।

'একদ্বিত্রিক্ষণেনৈবং বিকল্পস্য নিরোধনম্।
ক্রমেণাভ্যস্যতাং যত্নাদ্ ব্রহ্মানুভবকাংক্ষিভিঃ॥'
—ল. বা. বৃত্তিঃ ১২

—ব্রহ্মানুভবপ্রয়াসী সাধক এক, দুই, তিন ক্ষণ এইরূপে বর্ধিত ক্রমে চিত্তকে নির্বৃত্তিক করিয়া শুদ্ধচৈতন্যের অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন।

তুষ্ণীস্থিতিকালে, উদাসীনকালে বা সময়

সময় অন্যকালেও সকলেরই অল্প সময়ের জন্য এই নির্বিকল্প অবস্থার আভাস অনুভূত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে তাহা খেয়াল করে না, সে বিষয়ে তাহারা অবহিত থাকে না বলিয়া ঐ অনুভব কোন কার্যকরী হয় না। এই জন্যই অবহিতচিত্তে অভ্যাসের প্রয়োজন। বৃত্তিমধ্যকালকেই আচার্যগণ সন্ধিকাল বলিয়াছেন। এই সন্ধিকালেই শুদ্ধ স্বরূপ-চৈতন্য ও আনন্দের প্রকাশ। প্রথম ক্ষণে উহার অনুভূতি হইলে, চেষ্টা দ্বারা ঐ সন্ধি-কালের স্থিতি বর্ধিত করিলে পূর্বোক্ত অনুভবও দৃঢ় হইতে থাকে। ঐ অবস্থালাভানন্তর মহাবাক্যশ্রবণ ও বিচার পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী হয়। তখন এই বোধ হয় যে, বৃত্তি-সন্ধিকালে যে আমি নিজেকে শুদ্ধচৈতন্য ও আনন্দরূপে অনুভব করিতেছি, সেই আমিই ব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য ও ব্রহ্মানন্দ।

একবার এই দৃঢ় অর্থাৎ সংশয়-বিপর্যয়-রহিত অনুভব হইলে তখন সমাধিকালে যে নির্বিকল্প চৈতন্য ও আনন্দ অনুভূত হয় ব্যবহারকালেও, বিবিধ বৃত্তির উদয়কালেও সেই চৈতন্য ও আনন্দেরই স্ফুরণ হইতে থাকে। ইহাই 'ব্রাহ্মী স্থিতি'—'জ্ঞানসমাধি'—বা 'সহজসমাধি'। অন্য প্রযত্নসাধ্য সমাধি হইতে ব্যুত্থান হয়, কিন্তু এই 'জ্ঞানসমাধি' হইতে জ্ঞানীর আর ব্যুত্থান নাই। সবৃত্তিক বা নির্বৃত্তিক সর্বাবস্থাতেই তিনি তখন সমাধিস্থ। বেদান্তিগণ এইরূপ সমাধিরই পক্ষপাতী।

'যোগবাশিষ্ঠ' বলিয়াছেন—

'তত্ত্বাত্মবোধ এবৈকঃ সর্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তুষ্ণীমবস্থিতিঃ॥"

—সর্ববাসনাতৃণদাহকারী অগ্নিসদৃশ এক ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই সমাধি শব্দ দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে সমাধি কেবল নিশ্চেষ্ট অবস্থান মাত্র নহে।

নিদিধ্যাসনের অভাববশতই বহু সাধক ব্রহ্মানন্দানুভবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কেবল শব্দজালরূপ মহারণ্যে অর্থাৎ মত-মতান্তরের খণ্ডন-মণ্ডনেই তাঁহারা যেন দিশাহারা হইয়া কালাতিপাত করেন। নিদিধ্যাসন বিনা কেবল শ্রবণ ও মনন অর্থাৎ ব্রহ্মবিচার দ্বারাই যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হন, তাঁহারা অতি উত্তম অধিকারী, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও জন্মান্তরে যথেষ্ট ধ্যানাদিসহায়ে চিত্তৈকাগ্রতার অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন, নতুবা এই জন্মে তাঁহাদের অন্তর্মুখ, বিষয়বিমুখ চিত্তের স্বাভাবিক প্রত্যক্‌প্রবণতা দৃষ্ট হইত না।

অতুলনীয় রাজ্যভোগৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যখিন্ন চিত্তে মহারাজ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

'গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য।
ব্রহ্মধ্যানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য॥
কিং তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈর্যত্র তে
নির্বিশংকাঃ।
কণ্ডূয়ন্তে জরঠহরিণাঃ স্বাঙ্গমঙ্গে মদীয়ে॥'

—বৈরাগ্যশতক, ৭৮

—অহো! এমন শুভ দিন কি আমার জীবনে আসিবে, যখন হিমালয়ে গঙ্গাতীরে শিলার উপর পদ্মাসনে বসিয়া আমি ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইব এবং পাষাণবৎ স্থির আমার অঙ্গে বৃদ্ধ মৃগকুল নির্ভয়ে আমাদের অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিয়া ঘর্ষণসুখ অনুভব করিবে? অর্থাৎ মৃগকৃত কণ্ডূয়নও আমি জানিতে পারিব না, এমন গভীর সমাধি আমার কবে হইবে?

শ্লোকোক্ত 'যোগনিদ্রা' বা সমাধি না হইলে ব্রহ্মানন্দানুভব হইবে কি করিয়া? এই

'যোগনিদ্রা' সাধনজন্য। সাধারণ নিদ্রা প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। তৎকালে দেহ, মন ইন্দ্রিয়াদি সব কিছুই অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু 'যোগনিদ্রা' তদ্রূপ নহে। উহা পূর্ণ-সচেতন অবস্থা। তখন বাহিরের আর কোন জ্ঞান থাকে না। ঐরূপ হইলে তবেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দানুভব হয়। ব্রহ্মানন্দের নিকট বিষয়ানন্দও অতি তুচ্ছ। এই আনন্দ-লাভে পরিতৃপ্ত পুরুষ আর তখন কিছুতেই বিচলিত হন না, তাই শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন--

'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।'

—তৈ. উ. ২।৯

হে মহাজীবন

শ্রীবিভুভূষণ চৌধুরী

মাতৃরূপা মহাশক্তি যিনি বিশ্বরানী
তাঁর লীলাদূত তুমি, অবতরি লোকে,
সুবর্ণ চেতনা দীপ্ত, দিব্য সুধাবাণী
বিতরিলে নরদেব! কথামৃত-মুখে।
জ্ঞান-সুদর্শনে চূর্ণি ধ্বান্ত কারাগার,
পূত স্পর্শে সঞ্জীবিয়া অহল্যা-জীবন,
সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন পরম সত্তার
সার্থক সন্ধান তারে দিলে তপোধন!
বরে তব জীবে শিব হেরে মুগ্ধ আঁখি,
'যত মত তত পথ' এই ধ্রুব জ্ঞান
লভি ধরা বাঁধে রাখি সবে ডাকি ডাকি
বীণে বীণে অনুখন বাজে ঐকতান।
সত্য শিব সুন্দরের অমৃত মুরতি
হে মহাজীবন! লহ ধরণীর নতি *

* শিলং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সভায় ২০।২।৭২ তারিখে পঠিত।

স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবাধর্মের আদর্শ

স্বামী সমুদ্ধানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যদিও তাঁর মধ্যে লক্ষণীয় ছিল বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের প্রজ্ঞা, শ্রীচৈতন্যের ভক্তি, গুরু নানকের অনির্বাণ আধ্যাত্মিকতা, সন্ত পলের সোচ্চার ভাগবতী প্রীতি ও খ্রীষ্টের সারল্যের সমন্বিত নিদর্শন, তবু তাঁর জীবনের সর্ব স্তরে ত্যাগ ও সেবা-ধর্মের মহান আদর্শের ব্যাপ্তি কচিৎ কারো এড়ায়। এ দু'টিই তাঁর জীবনে আদ্যন্ত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক।

মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসে এমন আর কোন দ্বিতীয় পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ পাই না, যিনি অধিকতর আগ্রহ ও তৎপরতার সহিত বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন আদর্শ উপ-স্থাপিত করেছেন, যাঁর ত্যাগ ও সেবাধর্মের আদর্শ মানব মন ও অনুভূতিকে গভীরতরভাবে দোলা দিয়েছে।

সুতরাং নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার আদর্শে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অনন্য। যীশুখ্রীষ্টের পর এই আদর্শে একমাত্র তিনিই ছিলেন অন-বদ্য ও অতুলনীয়। বীর ব্যতীত বীরের বীরত্ব অনুধাবন করবার শক্তি অপর কারো নাই। স্বামী বিবেকানন্দকে সম্যক্ বুঝতে হ'লে প্রয়োজন দ্বিতীয় একজন সু-উচ্চ মানসিকতা-সম্পন্ন পুরুষের। দ্বিতীয় আর এক বিবেকা-নন্দ ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দের উপলব্ধি দুঃসাধ্য।...স্বামী বিবেকানন্দকে কল্পনাই করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রায়শঃ তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষী বুদ্ধির অগম্য, চিন্তাজগতে বিচরণশীল দুর্বোধ্য পুরুষ। আবার, অনেকের নিকট তিনি ছিলেন প্রহেলিকাবিশেষ, জটিল। এই জটিলতা এতই তীব্র ছিল যে, যাঁরা তাঁর দৈনন্দিন জীবন ও কর্মের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টিত হতেন, তাঁরা আরো বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতেন। তাঁর জীবনী- ও চরিত্র-বিশ্লেষণে আগ্রহী লোকের দারুণ সংশয় সত্ত্বেও যাঁরা ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর জীবনী ও কার্যাবলী আলোচনায় প্রয়াসী হতেন, তাঁদের নিকট তিনি প্রতিভাত হতেন ঋজু ও তীক্ষ্ণধী মানুষরূপে। অন্যদের নিকট বস্তুতই তিনি ছিলেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসা—বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক, সর্বদিকেই।

ত্যাগ ও সেবা কি?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে প্রিয় শিষ্য অর্জুনের সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন, জ্ঞানিগণ সমস্ত কর্মের ফলবর্জনকে ত্যাগ বলেন।"

ত্যাগ আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি, যা লোকের স্বার্থপরতার সর্বশেষ চিহ্নকে বিলুপ্ত করে। প্রতি বস্তুতে অনুপ্রবেশাকাঙ্ক্ষা যেমন মানবের স্বভাব, তেমন প্রতিটি কর্মের ফলকামনাও তার স্বভাব। কিন্তু ত্যাগের প্রবৃত্তি অহং-ভাব-বহিষ্করণের দ্বারা আত্মানুপ্রবেশ প্রতিস্থাপন করে। ইহাই প্রতি বস্তুতে আত্মত্যাগের স্বরূপ। ইহার উদয় হয় তখনই যখন অহং-বোধ প্রশমিত হয়ে পরার্থবোধ জাগ্রত হয়। ইহা

সামগ্রিক পার্থিব কল্যাণের বেদীমূলে অহংকারকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার অবস্থা। ইহা পরমাত্মার নিকট মানবাত্মার পূর্ণ আত্ম-নিবেদন, যখন মানবাত্মা ও পরমাত্মা একাত্ম হয়, যখন অহং-বোধের 'আমি'-র আসনে 'তুমি' বসে এবং পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ সঞ্জাত হয়। এস্থলে ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমময় বাণীর প্রতিধ্বনিই যেন শ্রুতিগোচর হচ্ছে—"যা লাভ করলে আর কিছু অধিক লভ্য ব'লে মনে হয় না, যাতে স্থিত হ'লে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হওয়া যায় না।" উপনিষদেও এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন মেলে—'একমাত্র ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয়, সন্তান-সন্ততি, ধন, যজ্ঞাদি দ্বারা নয়।" প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে উক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটিতেও অনুরূপ ভাব লক্ষ্য করা যায়—অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেয়, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগই শ্রেয়; এই ত্যাগ এলেই শান্তি।

সেবার মাধ্যমেই ত্যাগ প্রকট হয়। বস্তুতঃ ত্যাগ যেন আত্মা, সেবা তার দেহ। নিঃস্বার্থ সেবা ব্যতীত ত্যাগের মর্ম কেহই উপলব্ধি করতে পারে না। ত্যাগ ব্যতীত সেবা নির্জীব, সেবা ব্যতীত ত্যাগও নিরর্থক। সেবা-শূন্য ত্যাগ দেহশূন্য আত্মার মতো, ত্যাগশূন্য সেবা আত্মাশূন্য দেহসদৃশ। সুতরাং ত্যাগশূন্য সেবা সেবাই নয়। সেবা ও ত্যাগ মূলতঃ একই বস্তু। সেবা দানকর্ম নয়, ইহা প্রকৃতপক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য অমলিন প্রেম। নিঃস্বার্থ কর্মী মাত্রেরই জানা আছে যে, বাস্তবতঃ সুষ্ঠুরূপে কৃত সেবার সঙ্গে যথার্থ আদর্শ সেবার পার্থক্য কোথায়; যোগ্য পাত্রে নিঃস্বার্থ প্রেমের সঙ্গে সেবা না করলে তো প্রকৃত আদর্শ সেবা হয় না।

ক্ষেত্রভেদে, স্থান- ও কাল-ভেদে সেবার প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়—কায়িক বা আধিভৌতিক, বৌদ্ধিক বা শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক বা জাতীয় এবং নৈতিক বা ধর্মীয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে ভারতে এটি জীবনের প্রতি স্তরে, বিশেষতঃ ধর্মাচরণে, বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। ঔপনিষদিক যুগে, যার অনুবর্তন ঘটেছিল বৌদ্ধ যুগে, আমরা সেবা-ধর্মের বহু দীপ্ত উল্লেখ পাই: 'ধর্মের তিনটি শাখা—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান; তন্মধ্যে দানই প্রথম স্থানাধিকারী।' 'এই তিনটি শিক্ষণীয়—দম, দান ও দয়া।' দান কী ভাবে অভ্যাস করতে হয়, এই মর্মে চতুর্থ একটি অনুশাসন আছে—'শ্রদ্ধাপূর্বক দেওয়া উচিত, অশ্রদ্ধায় দেবে না; শ্রী-হ্রী-ও ভীযুক্ত হয়ে দেবে;' 'সংবিৎ দ্বারা দেবে।' ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'যজ্ঞ, দান ও তপঃকর্ম মনীষীদেরও পালনীয়।' অবশ্য দান-কর্মের সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু ভগবান যতিদের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাঁদের প্রেম ও-সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভগবান বলেন—'পাপাদিদোষ-হীন, সংশয়শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, সর্বজীবকল্যাণে নিযুক্ত ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন। যাঁরা সর্বদা সমবুদ্ধি, সকল প্রাণীর কল্যাণে রত ও সংযতেন্দ্রিয়, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।'

ভগবদ্গীতায় সেবাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কর্মও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—কর্ম (অবশ্য করণীয় কর্ম) বা কর্তব্য, অকর্ম (কর্মাভাব) ও বিকর্ম (বিরুদ্ধ কর্ম)। তন্মধ্যে কামনাশূন্য কর্ম সকল সময়ে ও সর্বত্র করণীয়। শারীরিক বিপদ ও দুঃখের ভয়ে কর্মবর্জন রাজসিক কর্মের লক্ষণ। এতে কর্মত্যাগের ফললাভ হয় না।

মোহবশতঃ কর্মপরিত্যাগ তামসিক কর্মের লক্ষণ। এটি সর্বথা পরিত্যাজ্য। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অদোষদর্শিতা, জীবে দয়া, অলোভ, সমত্ব, বিনয়, অচঞ্চলতা—এই সমস্ত দৈবী প্রকৃতি নিয়ে যাঁরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাই নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পার্থক্যবর্জিত অহিংসা ও সর্বজীবে দয়া সৎজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান।

প্রাচ্যের পারংগম ঋষিগণ ও পাশ্চাত্যের বিদ্বৎসমাজ একবাক্যে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভগবদ্গীতা বেদবেদান্তের কেবল নিষ্কর্ষ নয়, এসবের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যও বটে। স্বীয় অননুকরণীয় ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন: গীতা কী প্রচার করছে জানো কি? কয়েকবার 'গীতা' 'গীতা' উচ্চারণ করলে যা হয়, তা-ই গীতার শিক্ষা—অর্থাৎ 'ত্যাগী',—ত্যাগই গীতার শিক্ষা। গীতার বাণী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।—যেমন, (১) তাহাই লক্ষ্য, (২) তাহা লক্ষ্যলাভের উপায়। অবশ্য, প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে গীতার বাণী হচ্ছে 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই'। ইহাই প্রকটিত হয় যখন গ্রন্থটির মোট অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রতি ছয়টিকে নিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মই কেবল ব্যাখ্যাত হয়নি, 'ত্বম্'-এর স্বরূপও বিশ্লেষিত হয়েছে। পরবর্তী ছয় অধ্যায়ে 'নিঃস্বার্থ প্রেম' অথবা শুদ্ধাভক্তি আলোচিত হয়েছে ও 'তৎ'-এর প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে। অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ে রয়েছে 'পরম জ্ঞান'-এর সমীক্ষা। উক্ত মহাবাক্যের 'অসি' 'হেতু' পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এতে নির্ণীত করা হয়েছে 'ত্বম্' ও 'তৎ'-এর পূর্ণ সাযুজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের বোধগম্য হয় যে, যখন মুক্তিকামী ব্যক্তি উদ্দেশ্যলাভে—উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়লাভে অতিমাত্রায় আগ্রহী হন, তখন তাঁকে কর্মের সকল ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে হয়। অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যতের কর্মফলপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ ক'রে তখন 'কাজের জন্য কাজ'—এই নীতিই তিনি আশ্রয় করেন। সংক্ষেপে তাঁকে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে খাঁটি নিষ্কাম ত্যাগী হতে হয়। ইহাই গীতার মর্ম।

কর্ম—সৎ বা অসৎ কর্ম—সর্বদা নিরূপিত হয় তার উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবলম্বিত পদ্ধতি দিয়ে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম সেবার আওতায় আসে না। কারণ সেবা সর্বদাই মহৎ ও নিঃস্বার্থ। সেবকের প্রকৃতি হওয়া উচিত দীন ভৃত্যের মতো; যিনি মনে করেন সেবাতেই তাঁর অধিকার, তার ফলপ্রাপ্তিতে নয়। এ হ'ল 'কর্মের জন্য কর্মসাধন, কর্তব্যের জন্য কর্তব্যপালন।' তাই ই সেবা, বিনম্র চিত্তে ভক্তিমান হয়ে যা করণীয়। সেবকের এই জ্ঞান থাকা উচিত যে, সেবা দয়া বা অনুকম্পা-প্রদর্শন নয়। দয়া- বা অনুকম্পাপ্রদর্শনে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার বিধৃত থাকে, যা হ'তে সেবা সম্পূর্ণ বিমুক্ত। সেবক সেব্যের নিকট কৃতজ্ঞ এই ভেবে যে, সেব্য তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করবার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু দয়ার ভাব নিয়ে যিনি অপরের উপকার করেন, তাঁর মনে এই ভাব সর্বদা জাগ্রত থাকে যে, তিনি দাতা ও অপরে গ্রহীতা। এতে 'উত্তমর্ণ-অধমর্ণ' ভাব নিহিত আছে। ইহা আত্মাবলুপ্তির সহায়ক তো নয়ই, বরং মানবজীবনের মহা অমঙ্গলস্বরূপ অহং-জ্ঞানের দ্যোতক।

একদিন পরম শুভক্ষণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আগ্রহী শিষ্যবৃন্দের সম্মুখে সমাধিস্থ

হলেন। যখন তাঁর ব্যুত্থান হলো তখন তাঁর শ্রীমুখ হ'তে যে কয়টি অস্ফুট বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল তাতে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাবের ব্যঞ্জনা ছিল। শিষ্যগণ তাঁকে মাত্র দু'টি কথা উচ্চারণ করতে শুনলেন - দয়া ও সেবা, এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। একটিতে অহঙ্কার বেড়ে যায়, অপরটিতে বিলুপ্তির পথ ধরে। শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এ দু'য়ের পার্থক্যের কথাটি গভীরভাবে তাঁকে প্রভাবিত করে। কিছু পরে তিনি অন্যান্য গুরুভ্রাতা সহ নীচে নেমে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের মননশীল উক্তির উল্লেখ ক'রে বললেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি কার্যে পরিণত করতে তিনি সর্বপ্রাথমিক সুযোগ গ্রহণ করবেন।

অচিরেই ত্যাগ ও সেবা-ধর্মের প্রচার-মানসে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামে যুগল সংস্থা। রামকৃষ্ণ মঠ সন্ন্যাসীদের আবাস। এখানে তাঁরা কঠোর তপশ্চর্যায় নিমগ্ন থাকেন পূর্ণ অহংবিলুপ্তির উদ্দেশ্যে। রামকৃষ্ণ মঠ ত্যাগের প্রতীক। রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী জনহিতকর কার্যাবলী গ্রহণ করেছে। এটি সেবাধর্মের প্রতীক। বহুবিধ তপশ্চরণের মাধ্যমে যে ত্যাগের মন্ত্রে সন্ন্যাসিগণ উদ্বুদ্ধ, নিঃস্বার্থ জনহিতকর কার্যাবলীতে যা রূপায়িত, তা-ই প্রকৃত সেবা-ধর্মের দ্যোতক। স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই আপ্ত-বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'ত্যাগ ও সেবাই হচ্ছে ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই দুই ধারায় দেশকে জাগিয়ে তোল। আর সব আপনিই এসে যাবে।' ভারতের পূর্বতম সীমান্ত আসাম হতে পশ্চিমতম সীমান্ত বোম্বাই এবং হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারতভূমিকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ভারত ও ভারতবাসীকে সম্যক জানবার যে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা তাঁর জন্মেছিল তা-ই তাঁকে দিয়েছিল সমস্ত সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গ্লানির প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের সুযোগ। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার দুর্বার অনুপ্রবেশের প্রতিরোধ করতেই তাঁকে স্থাপন করতে হয়েছিল ঐ দু'টি সংস্থা।)

মহাভারতীয় যুগ হ'তে বুদ্ধের যুগ পর্যন্ত একই আদর্শ সাধারণ্যে উপস্থাপিত হয়েছে নূতন নূতন আকারে। এই কালেই আমরা দেখি সম্রাট হ'তে ভিক্ষুক পর্যন্ত উচ্চ নীচ সকল ভারতবাসী সেই একই সু-উচ্চ নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যুগের চাহিদায় বুদ্ধ আমাদের দর্শনশাস্ত্রের আস্তিক্যবাদের প্রচার না করে নৈতিক উপযুক্তির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর আবেগপূর্ণ ও প্রগাঢ় উপদেশ তৎকালীন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজন্যবর্গেরও হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করেছিল, যার ফলে তাঁরা দেশ ও দশের মঙ্গলের বেদী-মূলে তাঁদের জীবন ও ধনসম্পদ উৎসর্গ করতে ইতস্তত: করেননি। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এরই ফলশ্রুতি। এই যুগেই ভারত পুনর্বার উত্তুঙ্গ গৌরবশীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতেতিহাসের সে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

পরবর্তী কালেও নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ ও অনুসরণ বিস্মৃত হয়নি ভারত। বিশ্বের বুধমণ্ডলী যাঁর লোকাতীত ধীশক্তির প্রশংসায় মুখর, অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা সেই আচার্য শঙ্করও

নিঃস্বার্থ সেবার মহিমা-কীর্তনে পরাঙ্মুখ হননি। তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—'যাঁরা বসন্ত ঋতুর মতো অপরের মঙ্গলবিধান করেন, জন্মমৃত্যুর দুস্তর বারিধি স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়ে কোন কিছুর প্রত্যাশা না রেখে অপরকেও ঐ কর্মে সাহায্য করেন, সেই সব মহাত্মাই মহানুভব।' আরো পরবর্তী কালের বিরাট পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকেও আমরা ভুলিনি, তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরসাধকরূপে দেশিকোত্তম সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন ভারতে ও বহির্ভারতে- এ দু'টির অসংখ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুসৃত আধুনিক সমাজসেবা-আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নবযুগের সূচক। তড়িদ্‌গতিতে এর প্রবর্ধন অনেকের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে। তার কারণ এই যে, কাল ও স্থানের সঙ্গে এর সমতা রক্ষিত হয়েছে বলে এই সমন্বিত প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য

উপনিষদে ঘোষিত হয়েছে—'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব'—তোমার মাতা তোমার কাছে দেবতুল্য হউন; পিতা পূজাস্পদ হউন; আচার্য সম্মান-ভাজন হউন। স্বামী বিবেকানন্দ এর সঙ্গে সংযোজন করেছেন—'দরিদ্রদেবো ভব। মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র জনগণ তোমার পূজা লাভ করুক; অশিক্ষিত জনসাধারণ তোমার সশ্রদ্ধ সেবার পাত্র হোক। এ নিশ্চয়ই শাস্ত্রবহির্ভূত অনুশাসন নয়, শাশ্বত সেবা-ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধানেরই পরিণত রূপ। পূর্বে উল্লিখিত শাস্ত্রীয় অনুশাসন হ'তে যা শিক্ষণীয় তা হচ্ছে এই যে, নিঃস্বার্থবোধ সার্বিক সেবা-ধর্মের মূল প্রাণস্বরূপ, আর স্বার্থবোধ হচ্ছে আধ্যাত্মিক মৃত্যু। এইজন্যই আমরা দেখি যে, ভক্তগণ কেবল আত্মাভিমান প্রশমিত করতেই নয়, সর্বজীবে নিঃস্বার্থ প্রীতির মাধ্যমে আত্মসম্প্রসারণের জন্য ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন। একটি সমবেত প্রার্থনায় উদাত্ত কণ্ঠে তাঁদের নিবেদন—'হে বিশ্বপতি বিষ্ণো, আমার অহংবোধ বিদূরিত করো, মনকে সংযত করো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমরীচিকায় আমার আসক্তি দূর করো, সর্বজীবে আমার প্রীতি প্রসারিত করো, জীবন সমুদ্র হ'তে আমায় রক্ষা করো।'

নিঃস্বার্থ সেবার প্রাচীন আদর্শ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রতিহত গতিতে পুরুষপরম্পরায় চলে আসছে এবং এইগুলিতে সর্বত্র প্রধান অংশ গ্রহণ করে থাকে দান। শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে লোকান্তরিত আত্মীয়ের আত্মার উদ্দেশ্যে ও সর্বজীব-নির্বিশেষে পিণ্ড-জল নিবেদিত হয়, প্রার্থনা করতে হয়—'দেব, ঋষি, প্রেতাত্মা এবং আমার পিতৃ- ও মাতৃকুলের সকল আত্মীয় আব্রহ্মস্তম্ব সকলের তৃপ্তি হোক।' ভারত ও ভারতীয় ধর্মের মাহাত্ম্যে যাঁরা সচেতন, তাঁদের প্রহ্লাদের ভাষায় পরমব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করতে হয়—"ভগবন্, আমি রাজ্য, পার্থিব সুখ, পুনর্জন্ম হ'তে ত্রাণ কিছুই কামনা করি না; দুর্গত প্রাণীর আর্তিনাশই আমার একমাত্র কাম্য।"

সেবাধর্মের চরম বিকাশ হয় তখনই যখন সেবক সর্বত্র একই পরমাত্মার সন্ধান পান—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; উপনিষদের সঙ্গে সমতালে সোচ্চারে তিনি বলেন—'তুমি স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, তুমি জীর্ণদণ্ডাশ্রয়ী বৃদ্ধ, তুমি সর্বব্যাপী।'

স্বামী বিবেকানন্দের ঘটনাবহুল জীবন ও কার্যাবলীর গভীর নিরীক্ষা তাঁর অত্যাশ্চর্য সহৃদয়তা ও সকলের প্রতি সমপ্রাণতা পরিস্ফুট করে। তাঁর কতকগুলি উল্লেখ্য উক্তিতে তাঁর আন্তরিক অনুভূতির আভাস মেলে। হৃদয়াবেগে তিনি বলেছেন,—'নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারংবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি ; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ—এরাই বিশেষভাবে আমার বরেণ্য।' আবার, জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অশুভ প্রবেশ ক'রে তাকে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তুলেছে সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হয়ে কম্বুকণ্ঠে জাতীয় জনগণের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সার্থক পরিচয় বহন করে—'হে অমৃতের সন্তান আমার স্বদেশবাসিগণ, আমাদের জাতীয় অর্ণবপোত যুগ যুগ ধরে সভ্যতার অমূল্য পণ্য নিয়ে পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে দেশবিদেশকে সম্পদশালী ক'রে তুলেছে। শত শত দ্যুতিময় যুগ ধরে পোতটি জীবনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোটি কোটি মানবকে অমৃতলোকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে।…কিন্তু আজ হয়তো এতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে ; তাই হয়তো এটি জীর্ণ হয়ে গেছে—তোমাদের ত্রুটির জন্যই হোক, অথবা যে-কোন কারণেই হোক, তাতে যায় আসে না। এখন তোমাদের—ভারতীয়দের—কর্তব্য কি ? তোমরা কি পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ে একে অন্যকে শাপান্ত করবে ? অথবা সেই ছিদ্র বুজিয়ে ফেলতে সমবেত চেষ্টায় ব্রতী হবে ? আমাদের হৃদয়শোণিতেই তা করতে হবে। যদি আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, আমাদের রসনায় আশীর্বাদ নিয়ে—অভিশাপ নিয়ে নয়—আমরা সকলে একসঙ্গে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করব।' এ তো কেবল প্রচারধর্মী আদর্শ নয়, ভারতে ও বহির্ভারতে বিস্তৃত সংস্থা কর্তৃক আচরিত কার্যও বটে।

বিভিন্ন যুগে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদিতে যে-সব উচ্চ আদর্শ বিধৃত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ও কার্যাবলীতে তারই সোচ্চার প্রতিফলন লক্ষিত হয়। তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশের অগাধ অনুভূতিই প্রকট হয় তাঁর কম্বুকণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত বাণীতে—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে,
এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছিল ত্যাগ ও সেবাধর্মের সমুচ্চ আদর্শের। বস্তুতঃ তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল দীর্ঘকালের ব্যবধানে যুগের চাহিদা মিটাবার জন্যেই, যা এ প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিরা বারবার বলে এসেছেন তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিরক্ষকই কেবল নয়, ভারতেতিহাসে নবযুগের বার্তাবহও বটে।*

* 'Vivekananda Centenary Volume'-এ প্রকাশিত মূল ইংরেজী হইতে শ্রীশৈলেশকুমার সেন কর্তৃক অনূদিত।

বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ইহলীলাসংবরণের পর তাঁহার যুবক সন্ন্যাসী ভক্তগণ বরাহনগরে এক মঠ স্থাপন করিয়া সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হন। সকলেরই জানা আছে, অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচার ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহার আদরের বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকায় যাইয়া কিরূপ সাফল্যলাভ করেন এবং ভারতে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় মঠ নামে অভিহিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগকে মঠের ট্রাস্টী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে মঠ-মিশনের যাবতীয় কার্য চালাইবার ভার অর্পণ করেন। যে অল্প কয়দিন পূজ্যপাদ স্বামীজী নশ্বর দেহে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার ভাবধারা কিরূপে কার্যকরী করা যাইতে পারে তাহার উপদেশ দেন। ঐকালে তিনি তাঁহার অন্যতম ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের এক বিরাট মন্দির স্থাপিত হয় এবং সেখানে অগণিত ভক্তমণ্ডলীর কল্যাণে তাঁহার নিত্য পূজাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সেইজন্য তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে ডাকাইয়া নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া একটি নকসা করিতে নির্দেশ দেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ পূর্বাশ্রমে পুণা সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়া ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে উচ্চপদে কাজ করিতেন। স্বামীজীর আদেশ পাইয়া তিনি তখনকার এক ইউরোপীয়ান সরকারী স্থপতি (Government architect) এর সাহায্যে একটি বড় মন্দিরের নকসা তৈরি করান ও পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজকে দেখাইয়া তাঁহার আশীর্বাদ ও সাধরণভাবে সম্মতি লাভ করেন।

ইহার প্রায় তিন দশক পরে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ১৩ই মার্চ ১৯২৯ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিনে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর তখনকার বাগানের ভিতরে স্থাপিত করেন। পরে বর্তমান মন্দিরের স্থান নির্বাচিত হইলে উক্ত প্রস্তর ঐস্থান হইতে প্রায় ১০০ ফুট দক্ষিণে সরাইয়া বর্তমান মন্দিরের বনিয়াদে প্রোথিত করেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, ১৬ই জুলাই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের গুরু পূর্ণিমাতে। মন্দিরের কাজ সর্বাঙ্গীণভাবে আরম্ভ না হইলেও ঐ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ হইতে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়।

লেখক ঐ সময় বেলুড় মঠের নানা বিল্ডিং-এর কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তখন তিনি Martin Company-র office-এ Engineer Officer-পদে কাজ করিতেন। সেই সময় তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে বলা হইলে তিনি Martin Company-র Senior Engineer-কে জানান এবং মঠকর্তৃপক্ষও কোম্পানীর নিকট এই বিষয় উত্থাপন করা স্থির করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ স্বয়ং Martin Company-র Senior Partner স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর-সহিত দেখা করেন ও কথাবার্তার পর এই স্থির করেন যে, cost basis-এ সামান্য মুনাফা লইয়া মার্টিন কোম্পানী

এই মন্দিরের নকসা তৈরি ও নির্মাণের কাজ দুই-ই করিবে। তখন মার্টিন কোম্পানীর architect (স্থপতি) ছিলেন মেজর হেরল্ড ব্রাউন। তাঁহার সহিত স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর নকসা লইয়া আলোচনা হয়। তিনি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের approved নকসা হইতে তিনটি জিনিস প্রতীয়মান হইতেছে—সেই তিনটি জিনিস অক্ষুন্ন রাখিয়া মন্দিরের নকসা করিতে হইবে যাহাতে ইহা architecturally (নির্মাণ-কৌশলের বা স্থাপত্য-শিল্পের দিক দিয়া) দেখিতে সুষ্ঠু এবং বিরাট আকারের হয়। প্রথমটি হইল যে, স্বামীজী domical (গম্বুজাকৃতি) ছাদওয়ালা গর্ভমন্দির চান, দ্বিতীয়তঃ European Church-এর মত নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির একসঙ্গে যুক্ত থাকিবে, তৃতীয়তঃ মন্দিরটির আভরণ (architectural mouldings) ভারতীয় রীতিতে হইবে। মঠকর্তৃপক্ষ এই তিনটি জিনিস বজায় রাখিয়া plan-এ রদবদল করিবার অনুমতি দেওয়ায় নকসা তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়। এদিকে মার্টিন কোম্পানীর architectural office-এ সাড়া পড়িয়া গেল, দুইটি ভিন্ন নকসা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করিবার সিদ্ধান্ত হইল। একটি করেন স্বয়ং ব্রাউন সাহেব ও তাঁহার ইউরোপীয়ান সহকারী draftsman, আর অপরটি লেখক ও architectural draftsman শ্রীসুশীলবাবু তৈরি করান। নকসা দুইটি কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। তাঁহারা দ্বিতীয় নকসাটি অধিক পরিমাণে ভারতীয় বলিয়া পছন্দ করেন এবং ঐ নকসা অনুসারে কার্যে অগ্রসর হইবার আদেশ দেন। কর্তৃপক্ষ খরচে কুলাইলে মন্দিরটি সোনার পাথরে তৈরি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই কারণে একটা মোটামুটি খরচের আভাস দিবার নির্দেশ দেন। বলাবাহুল্য, পাথরের মন্দিরের বিশদ নকসা না করিয়া খরচের (estimate of cost) আন্দাজ করাও এক দুরূহ ব্যাপার। মোটামুটি ছয়লক্ষ টাকার মত খরচ পড়িবে বলিয়া আন্দাজ করা হয়। তাহাতে ঠিক হয় গর্ভমন্দির পাথরের হইবে এবং নাটমন্দিরের অংশ ইট ও বালির কাজ হইবে। কিছুদিন এই বিষয় আলোচনার পর পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের শরীর খারাপ হওয়ায় ইহার কার্য শীঘ্র আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হয় এবং লেখক ও রায় বাহাদুর অনুকূলচন্দ্র মিত্র মহাশয় কাজ শুরু করিবার নির্দেশ পান। মার্টিন কোম্পানীর মত সুপ্রসিদ্ধ Builders and Architect Firm-এর সাহায্য ব্যতিরেকে শ্রীমন্দিরের কাজ এত শীঘ্র ও সুচারুরূপে এবং এত কম খরচে সম্পন্ন হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের Stone workshop, Wood workshop, Structural workshop, Mechanical deptt. এবং Precastural deptt-এর একান্ত সহযোগিতায় ইহা সম্ভব হয়।

মন্দিরের স্থাপত্য

শ্রীমন্দিরের design-এর drawing করিতে গিয়া প্রথমতঃ গর্ভগৃহের আকার নির্ধারণ করা দরকার হয়। যতটা জমি পাওয়া যাইতেছে তাহা এবং ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়াই বেশ বড় করিয়াই মন্দিরের আকার ধার্য করিবার নির্দেশ হয়। যাহাতে উৎসবাদিতে পূজার সরঞ্জাম ও সাধু-মহারাজদের ভিতরে বসিবার স্থান থাকে—এইসব চিন্তা করিয়া গর্ভগৃহ ২৬´ ফুট লম্বা ও ২৬´ ফুট চওড়া এবং ইহার চারি পাশে প্রায় ১০´ ফুট করিয়া পরিক্রমার জায়গা বা বারান্দা রাখা হয়। গঙ্গার পশ্চিমকূলে মঠটি

অবস্থিত—নদীকূলের অনিশ্চয়তার জন্য মন্দিরের স্থানটি প্রায় ৩০০´ দূরে নির্ধারণ করা হয় ও গঙ্গাকূলে একটি sea-wall (পোস্তা) নির্মাণ করা সাব্যস্ত হয়।

Royal Institute of British Architect-এর প্রেসিডেণ্ট স্যর উইলিয়াম ইমারসন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্ল্যান করেন এবং তাহা Indo-European স্থাপত্যের একটি দর্শনীয় নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে মন্দিরের plan design-এর ছাপ পড়ায় খানিকটা মন্দিরের ভাব আসে। যাহাই হউক, পরিক্রমার সামনে বাঁকানো অংশ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাঁকানো colonnede-এর ভাব আনে, কিন্তু পরিক্রমার পথের অঙ্গ হিসাবে এইখানে তাহা শ্রীমন্দিরের শোভা বাড়াইয়াছে। ইহা ভারতীয় স্থাপত্যের একটি মধুর নিদর্শন বলা যাইতে পারে। ইহার ভিতরে জালির কাজ শিল্পকলার সার্থক নিদর্শন হইয়া আছে। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের সাহায্যে নবগ্রহের মূর্তি অঙ্কিত করাইয়া পরে উহাকে পাথরে কাটাইয়া বসানো হইয়াছে, মূর্তিগুলির স্পর্শে সমগ্র জালি ও পরিবেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। গর্ভগৃহের ভিতরাংশের দেওয়ালে কয়টি niche (কুলুঙ্গী) রাখা হইয়াছে যাহাতে পূজার সরঞ্জাম রাখা যায়। একটিতে শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি রাখা আছে ও অপর একটিতে বাণলিঙ্গ রাখা আছে। ভিতরে হাওয়া খেলার জন্য (ventilation) উপরের দিকে চারটি বড় জাফি সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং ইহাকে মনোরম করার জন্য পেখমবিস্তৃত ময়ূরের প্রতিকৃতি দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে। 'গর্ভগৃহের অভ্যন্তরিক' এইসব নকসার কাজের জন্য ঢাকা হইতে আনীত গড়নের কারিগরদের নিয়োগ করা হয়।

গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরে মর্মরপাথরের বেদীর উপরে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের ধ্যানস্থ মূর্তি স্বর্গত ভাস্কর গোপেশ্বর পাল দ্বারা নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বেদী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল—ইহা যেন একটি ডম্বুরু আকৃতির হয়। স্বর্গত নন্দলাল বসু মহাশয় এই বেদীটি নিজে design (নকসা) করিয়া কাগজে আঁকিয়া পাঠান এবং সেইমত ইহা নির্মিত হয়। তাঁহার নির্দেশমত বেদীর সম্মুখে ব্রাহ্মীহংস উৎকীর্ণ করা হইয়াছে এবং ইহার অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'আত্মারাম' কৌটা প্রোথিত করা আছে। উপরের চাঁদোয়া বর্মা হইতে আনীত সেগুনকাষ্ঠে নির্মিত এবং সালকিয়ার বিশেষ নকসা-জানা সূত্রধর মিস্ত্রী দ্বারা মকরের মুখ দিয়া সজ্জিত করা আছে. গর্ভমন্দিরের এবং নাটমন্দিরের সমস্ত জানালা দরজা বাছাই মৌলমেন সেগুনকাষ্ঠে চীনা মিস্ত্রী দ্বারা তৈরী। অর্থাভাবে সমস্ত জানালা-দরজার panel-এর নকসা কাজ করানো সম্ভব হয় নাই। জানালা-দরজার সমস্ত fittings বম্বের বিশেষজ্ঞ Acme Company দ্বারা তৈরী এবং সুবিধাজনক দরে কেনা হয়। গর্ভগৃহের মেঝে শ্বেত-পাথরে এবং নাটমন্দিরের মেঝে কালো ভারতীয় পাথরে আবৃত। এই পাথর Victoria Memorial-এর দরজার Hall-এ ব্যবহৃত হইয়াছে। গর্ভগৃহের পিছনে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন- ও ভাণ্ডার-গৃহ, যদিও অন্নভোগ রান্নার ঘর দূরে আছে। শয়ন কামরাখানি ভাণ্ডারঘরের উপরে দ্বিতলে করা হয়।

শ্রীমূর্তি যাহাতে দূর হইতে দেখা যায় সেজন্য মন্দির ৬´ উচ্চ এক বেদীর উপর বসানো হইয়াছে। জমি হইতে উপরে উঠিবার সোপানাবলীর সম্মুখে দুই পার্শ্বে বিন্যস্ত

থাকিয়া মন্দিরগাত্রের শোভাবর্ধন করিতেছে। মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, ইহা ভারতীয় এমনকি সমগ্র বিশ্বের কোনও একটি বিশেষ স্থাপত্যের বিশুদ্ধ অনুকরণ নয়। লেখক স্বর্গত পূজনীয় সনৎ মহারাজজীর সঙ্গে রাজপুতানা ও উত্তর ভারতে বেশ কিছুদিন সফর করিয়া নানাপ্রকার মন্দিরাদি পরিদর্শন করিয়া আসেন, এবং বৃন্দাবনের অদূরস্থিত ডিগ নগরে মন্দিরের চূড়ার কারুকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। পরে সুশীল বাবুকে (যিনি এই সকল নক্সা- (design) কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন) জালি ও এইসব গড়নকার্যের নক্সা করিয়া আনিবার জন্য পাঠানো হয় এবং মন্দিরের বহিরাংশে এইগুলি স্থাপন করা হয়। গম্বুজ বা ডোম-এর আধুনিক নির্মাণরীতি প্রথমে সেরাসেমিক স্থাপত্যে দেখা যায়। তখন ডোম একটি গোলক বা স্ফীয়ারের অংশ ছিল। ক্রমশঃ ইহার সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য নানাদেশে এবং নানাভাবে ইহা পরিমার্জিত হইতে থাকে। ইতালীর নব-জাগরণের সময়ে ইহার আকৃতি রমণীয় হয়। আমাদের দেশে যেটি রাজপুতানার স্থাপত্য-রীতি সেটি কতকটা ইহার এক শাখা বলা যাইতে পারে। রাজপুতানার রীতিতে গম্বুজ বেশ সুন্দর। গোলাকৃতি গম্বুজের গুরুভার তাহাতে নাই। কমনীয়তায় (grace & delicacy) এর তুলনা বোধহয় কম আছে, অন্ততঃ আমাদের ভারতীয়দের চক্ষে। এই স্থাপত্যরীতিতে শ্রীমন্দিরের গম্বুজের আকৃতি দিবার চেষ্টা হইয়াছে। গম্বুজগাত্রটি সাদাসিদা না করিয়া bead (গুটিকা) এবং বোল দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণদেশের মন্দিরগাত্রে এইরকমের শিল্প দেখা যায়। প্রাচীন মন্দিররীতি অনুযায়ী আমলকী ইত্যাদি দিয়া চূড়া তৈরি করা হইয়াছে। পুরীতে ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে এক বিশাল আমলকীর নিদর্শন রহিয়াছে। যাহাতে দূর হইতে আলো দেখা যায় সেইজন্য বন্দুকের ধাতু (gun metal)-এর চূড়া তৈরি করিয়া তাহার ভিতর dome-এর আকারে কাঁচের panel দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত আধারটি তৈরি করাইতে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। কোনও স্থানে ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া অবশেষে হাওড়ার এক বিশিষ্ট ঢালাই-এর কারখানায় আমাদের নির্দেশমত বানাইতে সম্মত হওয়ায় তখনকার দিনে ইহা আমাদের দেশে করা সম্ভব হইয়াছে। কাশী হইতে আনীত সোনার পাত দিয়া তাম্রকলস মোড়ার অভিজ্ঞ মিস্ত্রী আনাইয়া বড় dome-এর সর্বোচ্চ কলসটি তৈরি করা হইয়াছে ও অন্যান্য কলসও তৈরি করা হয়।

বাহিরে মন্দিরের চারিধারে আলোকস্তম্ভের উপর যে তাম্রনির্মিত বাতিদান আছে, তাহাও এইখানে তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় অনেক খরচ ও সময় বাঁচিয়াছে। বড় গম্বুজের নীচে shallow dome আছে। তাহার মধ্যে জালির কাজ আছে। জালি reinforced concrete-এ তৈরি। Shallow dome-এর কার্নিশের নীচে ব্রাকেট বা modellian দেওয়ায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। Shallow dome-এর উচ্চতা ৬০´ ফুট এবং ভূমি হইতে মন্দিরশীর্ষ ১০৮´ ফুট উচ্চ। Dome-এর নির্মাণকার্যে চুনার-পাথর, ইট এবং কংক্রীট একসাথে ব্যবহার করা হইয়াছে। Hoop tension-এর জন্য galvanised লোহা ব্যবহার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পাথরের ডোম নির্মাণ করিতে অনেক নক্সা ও পাথরের কাজে পারদর্শী নিপুণ মিস্ত্রীর দরকার। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সবই

সময়মত জোগাড় হইয়া গিয়াছিল এবং পাথরের কারখানায় যথাসম্ভব মেশিনের ব্যবহার করা হইয়াছিল। বড় ডোমের নীচে চারিধারে খালি জায়গা ছত্রী দিয়া পূরণ করা হইয়াছে। এই ছত্রীগুলির একটু বিশেষত্ব যে, ইহা বাংলার গ্রামের ভাবসম্পন্ন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্বাশ্রমের বাসগৃহের খড়ের চালের ভাব আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বড় ডোমের চতুষ্পার্শ্বে যেসব ছোট ডোম রহিয়াছে সেগুলির নীচে কার্নিশ ও তাহার নীচে ব্র্যাকেট বসানো হইয়াছে। ঐগুলি রাজপুতানা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের স্থাপত্যে দেখা যায়। যথাযোগ্য স্থানে ভারতীয় শিল্পরীতিতে জালির কাজ হইয়াছে। গর্ভমন্দিরের বাহিরের দেওয়াল চুনার-পাথরে আবৃত। এই কাজটি আজকালকার veneering নয়। মোটা পাথর, ইট বা কংক্রীট একসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মন্দিরের স্থায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থান কাল পাত্র অনুসারে যতটা সম্ভব এবং অর্থে যতটা সঙ্কুলান হইয়াছিল, সেইমত উত্তম দ্রব্যাদি ব্যবহার করার চেষ্টা হইয়াছিল। চুনার-পাথর যাহাতে নোনা না খায় এইজন্য উপযুক্ত খাদান বা quarry খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে, যদিও তাহাতে খরচ বাড়িয়াছে। খরচের জন্য তখন পাকুরের পাথর ব্যবহার না করিয়া বিশেষভাবে বাছাই করা ঝামা ইট হইতে aggregate তৈরি করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। বালু মগরা হইতে আনা হইয়াছে। সুরকী নিজ কলে ভাঙানো হইয়াছে, চুণ দূরের কারখানা হইতে আনাইয়া এখানে ফুটাইয়া ছাঁকুনিতে চালিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। মশলা ও কংক্রীট মেসিনে মেশানো হইয়াছে। কোনদিক হইতে পরিশ্রমের ভয়ে বা আলস্যের জন্য কিছুই অবহেলা করা হয় নাই।

নাটমন্দির

গর্ভগৃহ এবং নাটমন্দির সংশ্লিষ্ট—খৃষ্টীয় গীর্জাসমূহে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যায়; বিশুদ্ধ ভারতীয় মন্দিরে গর্ভমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যে কিছুটা খোলা জায়গা থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদর্শিত পথে সর্বধর্মের সমন্বয় হইয়াছে, স্বামীজী-পরিকল্পিত মন্দিরেও সেই ভাবটি স্পষ্ট দেখা যায়। মন্দিরটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় রীতির সহিত পাশ্চাত্য ও সেরেসিনিক রীতির সার্থক সমন্বয় এবং অন্তরে ভারতীয় মনের গভীরতা ও কমনীয়তা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টীয় চার্চে যেমন বেদী, sanctuary, nave এবং aisle আছে, এখানেও বেদী, গর্ভগৃহ-পরিক্রমা ও নাটমন্দির বিরাজ করিতেছে। পাশ্চাত্য nave-এর উপরটা প্রায়ই ভিতরে curved; এখানে আমাদের বিখ্যাত কারলী গুহা জগতে স্থাপত্যের এক অভিনব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। সেই গুহার ভাবটি নাটমন্দিরে খানিকটা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে, যদিও archটি gothic style-এ করা হইয়াছে। নাটমন্দিরের স্তম্ভগুলি reinforced concrete-এ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ইহার base-গুলি tracery plaster-এ সজ্জিত করা হইয়াছে। উপরে যে balcony আছে তাহার bracket-গুলি উত্তরভারতীয় style-এ cement concrete ও plaster-এ নির্মিত করা হইয়াছে। নির্মাণকার্যে অবশ্য আধুনিক লোহা ও reinforced concrete দ্বারা হাল্কা অথচ সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা হইয়াছে। সমগ্র মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৩৫´ ফুট, প্রস্থে ১৪০´ ফুট, প্রায় ৩২,৯০০ বর্গফুট। নাটমন্দিরটির ভিতরের মাপ ১৫২´ ফুট লম্বা, ৭২´ ফুট চওড়া ও ৪৮´ ফুট উচ্চ। নাটমন্দিরে পশ্চিম ও

পূর্বদিকে দুটি প্রবেশপথ রাখিবার নির্দেশ পরে পাওয়ায় ইহা পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুই প্রবেশপথের দুইদিকে উপরাংশে মহাবীর এবং গণেশের মূর্তি দেওয়া হইয়াছে। নির্মাণকার্যে অবশ্য আধুনিক উপাদান ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন লোহা ও reinforced concrete দ্বারা হাল্কা অথচ সুদৃঢ় ভাবে তৈরি করা হইয়াছে। গর্ভমন্দির প্রায় ১০´×১০´×৩½´ মোটা reinforced concrete-এর উপর আছে। নাটমন্দির এবং গর্ভমন্দির বনিয়াদ হইতে উপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নির্মাণ করা হইয়াছে এবং একটা expansion joint রাখা হইয়াছে, যদিও বাহির হইতে বোঝা যায় না।

গর্ভমন্দিরের বাহিরের দেওয়াল চুনার-পাথর দিয়া মোড়া আছে; অর্থের অভাববশতঃ নাটমন্দিরের দেওয়ালে তাহা করা সম্ভবপর হয় নাই। পাথর ও imitation plaster এবং চুনার রং ঢালা concrete-এ দেওয়াল আবৃত হইয়াছে। ঢালাই-এর ফর্মা তৈরির নিপুণ মিস্ত্রী দ্বারা টিনপ্লেট-এর ফর্মা করাইয়া চুনার-পাথর পাউডার করিয়া প্রিকাস্ট গড়নের জিনিস অবিকল পাথরের মত ছাঁচ তুলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথমে চুনার-পাথর ও নকলে পার্থক্য ধরা যাইত না; অবশ্য কালে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাইতেছে ভিতরের দেওয়ালে কয়েকটি niche (বেদী রাখা হইয়াছে যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের প্রতিকৃতি রাখা যাইতে পারে এবং উপরের দেওয়ালে ফ্রেস্কো পেন্টিং-এর জায়গা রাখা আছে। গর্ভমন্দিরের চারিপার্শ্বের কর্নার-টাওয়ারের নীচে খালি জায়গা আছে যাহাতে ছয় ঋতুর মূর্তি বসানো যাইবে। কালে আশা করা যায় শাস্ত্রীয় রূপ-মত এই ছয় ঋতুর মূর্তি বসানো হইবে।

নাটমন্দিরের সামনে প্রবেশদ্বার। ইহা খুব উচ্চ। দক্ষিণদেশের মন্দির-স্থাপত্যে গোপুরম খুব উচ্চ হয়, যদিও তাহা মূল মন্দির হইতে দূরে থাকে। এখানে উহা মন্দিরের সংলগ্ন রাখিয়া উচ্চ ভাব আনার চেষ্টা করা হইয়াছে, যদিও গোপুরমের আঙ্গিকে রাখা হয় নাই। উচ্চ অংশে বাংলার খড়ের চালের অনুকরণে কুটিরের ভাব আনা হইয়াছে। প্রবেশপথ যাহাতে দর্শকদের ভিতরে যাইতে আহ্বান করে, সেইমত বড় ও উচ্চ করা হইয়াছে। গোপুরমের উচ্চতা ৭৮´ ফুট। মঠ ও মিশনের প্রতীক এক বিশেষ জালির ভিতর সংবেষ্টিত করা হইয়াছে, তাহাতে মন্দিরের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বাড়িয়াছে। ইহাতে অজন্তার প্রবেশ-পথের কিছুটা ছাপ পড়িয়াছে। ১৪ই জানুয়ারি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বিধিপূর্বক পূজা যাগযজ্ঞ করিয়া মন্দির উৎসর্গ করা হয়। পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিপাত্র—'আত্মারামের কৌটা' বহস্তে শ্রীমন্দিরে লইয়া যান এবং গভীর অনুরাগের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিতে প্রার্থনা জানান। যদিও প্রতিষ্ঠার কাজটি ঐকালে সম্পন্ন হইয়া যায়, তথাপি নাটমন্দিরের কাজ এর পরও কিছুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রায় চার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মোট প্রায় আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটি তৈরী হয়

অর্থাভাব, সময়ের স্বল্পতা এবং নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতাবশতঃ অনেক কিছু যাহা করা যাইত তাহা করা সম্ভবপর হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব জগতের কল্যাণের জন্য এবং শ্রীমন্দিরের নির্মাণকার্যে সর্বদেশের লোকের কোনও না কোন প্রকারে সহায়তা আছে। কথিত আছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-ধারা হাজার বৎসরের উপর থাকিবে। আশা করা যায় যে, শ্রীমন্দির যেভাবে নির্মিত, যদি মেরামত ঠিকভাবে হয় এবং প্রাকৃতিক কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহা হইলে শ্রীমন্দিরও হাজার বৎসরের উপর থাকিয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন আবার বাংলাদেশে গেল

পথিক (স্বামী লোকেশ্বরানন্দ)

১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষ ভেঙে দু'টুকরো হলো। আরো অনেক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মত রামকৃষ্ণ মিশনকেও অবাঞ্ছিত এই অঙ্গচ্ছেদের শিকার হতে হলো। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে, অধুনা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ মিশন তার বহুমুখী কাজ চালিয়ে যেতে পারবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, নামে একটা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও কোন বিশেষ ধর্মমত প্রচার এর উদ্দেশ্য নয়; সেরকম কোন সংকীর্ণ মতবাদে মিশন বিন্দুমাত্র বিশ্বাসীও নয়। জাতি ও ধর্মের ঊর্ধ্বে বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে মিশনের উদার সেবামূলক কর্ম ও পরিকল্পনার বিস্তার। সেই সংকল্পের অনুপ্রেরণাতেই সব বাধা-বিপত্তি ও নিরাপত্তার সংশয়কে অগ্রাহ্য ক'রে পাকিস্তানে মিশন তার কর্মধারা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসী ছিল। চিন্তাশীল অনেক মুসলমান হয়ত পাকিস্তানে মিশনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন; কিন্তু (বিশেষ ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানে) বেশ কিছু সংখ্যক জনসাধারণের অসহযোগিতা মিশনের সাধু সংকল্পের প্রবল অন্তরায়রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এবং পরবর্তী কয়েকটি ঘটনায় এই সংকট তীব্রতর রূপ নিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিশন কর্তৃপক্ষ করাচীতে তাঁদের কেন্দ্র বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সন্ন্যাসীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো।

পশ্চিম পাকিস্তানে মিশনের শাখাকেন্দ্র বন্ধ হলেও পূর্ব পাকিস্তানে তখনও অনেক সঙ্কটের মধ্যেও মিশন তার সেবামূলক বিভিন্ন কর্মধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা ক'রে আসছিল। এখানে ধর্ম-নির্বিশেষে বহুজন মিশনের সমর্থক ছিলেন। এখানে মিশনের কেন্দ্রগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল বেশ পুরাতন, সেগুলি কাজ-কর্মের জন্যে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। আশা করা হচ্ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনার প্রতিফলন এখানে হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশার মূল অল্পদিনের মধ্যেই ছিন্ন হলো। পাকিস্তান সরকার ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পূর্ব পাকিস্তানে যাবার পথ বন্ধ করলেন তাঁদের 'ভিসা' দিতে অস্বীকার ক'রে। পাকিস্তানের এই অংশে মিশনের এগারটি কেন্দ্র ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি ছিল বেশ বড় এবং কাজকর্মের দিক দিয়েও যথেষ্ট প্রসারিত। 'ভিসা'র বিধিনিষেধের ফলে সন্ন্যাসী কর্মীর সংখ্যা সেখানে অত্যন্ত কমে এল। মিশনকে কোনরকমে অল্প কয়েকজন মাত্র সন্ন্যাসী (যাঁরা ছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক) দিয়ে ঐ অঞ্চলে কাজ-কর্ম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। তাই কর্মধারা ও পরিকল্পনায় বাধ্য হয়ে মিশনকে ন্যূনতম সঙ্কোচনের নীতি নিতে হলো। এই সঙ্কট তীব্রতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছুলো যখন কর্মিসমস্যার সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত হলো আর্থিক অনটন— দেশান্তরের ফলে সহৃদয় ও সম্পদশালী হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মিশন বঞ্চিত। এখানে মিশনের কেন্দ্রগুলির প্রাণশক্তি তখন স্তিমিত।

শেষ আঘাত এলো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। বর্বর পশুশক্তি তখন দুর্বারভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পূর্ববঙ্গে। সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত, দেশের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সীমিত কর্মিসমস্যা ও আর্থিক অসঙ্গতি সত্ত্বেও মিশন পূর্ব-পাকিস্তানে তার কেন্দ্রগুলিকে এতদিন কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল। অবশ্য তাদের শক্তি তখন অবক্ষয়ের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। অবশেষে এই প্রচণ্ড আঘাতে তা নিঃশেষে অবলুপ্ত হলো। পাকহানাদাররা মিশনের যাবতীয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করলো, ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিল মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রের বাইরের অস্তিত্বকে। পূর্ব-পাকিস্তানের আশ্রমের সন্ন্যাসীরা আশ্চর্যজনক-ভাবে প্রাণ নিয়ে এদেশে চলে আসতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ মিশনের বিস্তারের অধ্যায়ের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো।

তারপর বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। গঙ্গা-গোদাবরী—নর্মদা—কাবেরী—পদ্মা—কপোতাক্ষ-মেঘনায় অনেক জল বয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। বহু উল্লেখ্য ঘটনার সাক্ষ্য এ কয়টা মাস। পাকিস্তানের ভারত-আক্রমণ; যুদ্ধে তার শোচনীয় পরাজয়; নতুন রাষ্ট্র বাঙলাদেশের জন্ম; রাশিয়া, বৃটেন, ভারত ও আরো অনেক রাষ্ট্রের এই নবজাত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদান এবং দেশের অবিসংবাদিত নায়ক মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ বাঙলাদেশ সরকারের দৃপ্ত আত্মপ্রকাশ

ইতিমধ্যে বাঙালাদেশের একজন প্রখ্যাত মুসলমান নেতা মিশনের সভাপতির কাছে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি বাঙলাদেশে মিশনের কাজকর্ম শুরু করার জন্যে অনুরোধ করেন এবং নূতনভাবে 'সোনার বাঙলা'কে গড়ার কাজে মিশনের সক্রিয় সহযোগিতার জন্যে আবেদন জানান। চিঠিতে তিনি মিশনকে বাঙলাদেশে ত্রাণকার্য-পরিচালনার জন্যেও অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মিশন কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে খুলনা ও যশোরে ত্রাণকার্য শুরু করেন। এ দুটি জায়গায় ইতিমধ্যেই ভারত থেকে শরণার্থীদের ঘরে ফেরা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

গত ২৯শে জানুয়ারি বাঙলাদেশে মিশনের পূর্বের কেন্দ্রগুলির প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি-নির্ধারণের জন্যে মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ ও আরো দুজন সন্ন্যাসী সরেজমিনে তদন্তে ঢাকায় যান। সেখানে বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামারুজ্জমানের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন। উভয়েই তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং যাতে বাঙলাদেশে তাঁরা কাজকর্ম শুরু করেন সেজন্যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কথাপ্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের বহু-বিস্তৃত সেবামূলক কার্যাবলী সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল আছেন এবং মিশন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রধানমন্ত্রীকে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র বাঙলা রচনাবলী ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' উপহার দেন। শেখ সাহেব এতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে একজন 'প্রকৃত মহামানব' ব'লে বর্ণনা করেন।

বাঙলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গের আস্থা ও আন্তরিকতা এবং স্থানীয় জনসাধারণের

উৎসাহে মিশন কর্তৃপক্ষ বাঙলাদেশে পুরানো কেন্দ্রগুলির পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে বেশ কয়েক জায়গায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করার কথা চিন্তা করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করার আগে প্রথমে বাঙলাদেশের জনসাধারণ ও শিক্ষিতসমাজকে মিশনের আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ জনসভার আয়োজন প্রয়োজনীয় ও সমীচীন ভেবে গত ১০ই ফেব্রুআরি ঢাকার আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এক বিরাট জনসমাবেশে মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভায় ছাত্র ও সাধারণ শ্রোতা ছাড়া বাঙলাদেশ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ সরকারী ও সামরিক কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভারতে শরণার্থীদের ত্রাণকার্যপরিচালনার ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশনের মহান অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বাঙলাদেশ বিধানসভার সদস্যা শ্রীমতী বদরুন্নেসাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিশনের কাজকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ঢাকায় ভারতীয় মিশনের প্রধান শ্রী জে. এন. দীক্ষিত রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের কথা উল্লেখ ক'রে বর্তমান পৃথিবীতে তার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করেন

প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামারুজ্জমান বলেন, দুর্গত ও দেশবাসীর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যে বাঙলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য; কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—দেশের যুবচেতনাকে সঠিক পথে পরিচালনা ও যুবচরিত্র-গঠনের সুকঠিন কাজে মিশনের সহযোগিতা তাঁদের আজ অপরিহার্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাই ব'লে তিনি মনে করেন না যে, ধর্ম জীবনে অপ্রয়োজনীয়। বরং তিনি বিশ্বাস করেন, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের স্থান অপরিহার্য। এবং তাঁর মতে, একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন ধর্মকে যে উদারভাবে প্রচার করে তাহাই ধর্মের শ্রেষ্ঠ রূপ এবং প্রত্যেক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেরই উচিত ধর্মগত সেই উদার ভাব অনুসরণ ক'রে চলা।

স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সবিস্তারে আলোচনা করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে একদিন রামকৃষ্ণ মিশনকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। আজ আবার সে সেখানে ফিরে গেছে, পূর্ণ মর্যাদায়। কিন্তু পাকিস্তানে নয়, স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ বাঙলাদেশে—দেশের ন্যায়সঙ্গত সরকার, জনপ্রিয় নেতা ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আমন্ত্রণে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটী

আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রস্মৃতিবিজড়িত কাশীপুর উদ্যানবাটী নামে বিখ্যাত ভবনেই উক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত। এই স্থানেই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া নিজেদের অধ্যাত্ম-জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যলীলাক্ষেত্র-রূপে প্রসিদ্ধ।

এই ঐতিহাসিক স্থানেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরুলীলা, স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর স্বকীয় অধ্যাত্মশক্তিসঞ্চার, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সূত্রপাত, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের নরনারায়ণরূপে জীবসেবার ব্রতগ্রহণ।

এইসব কারণে এবং বিশেষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃপক্ষ এই উদ্যানবাটীর একাংশ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ক্রয় করিয়া এখানে একটি মঠকেন্দ্র স্থাপন করেন। কিছুদিন পরেই বাকী অংশটিও ক্রয় করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আন্তর্জাতিক স্মৃতিভবনরূপে সমগ্র উদ্যানবাটীটি সংরক্ষণের জন্য ইহার সংস্কার ও পুণর্গঠনের পরিকল্পনাও এই সময় গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য—সমগ্র উদ্যানবাটীটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকালে যেমনটি ছিল, অর্থাৎ বাড়ী, বাগান, রাস্তা, পুকুর, প্রাচীর প্রভৃতি যেখানে যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে পুনর্নির্মাণপূর্বক সুরক্ষিত করা।

এইভাবেই উদ্যানবাটীর সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ কিছু কিছু আরব্ধ ও সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর্তমানে সাধুদের স্থায়ী বাসভবনটির নির্মাণের কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাকী কাজটুকু সম্পন্ন করিতে এবং সমগ্র পরিকল্পনাটিকে রূপদান করিতে সর্বসমেত ৬,০০,০০০ (ছয়লক্ষ) টাকার প্রয়োজন হইবে।

সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদের আন্তরিক অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই মহৎ উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের সহায়তা করেন।

সর্বপ্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকে অথবা আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মারফত অনুগ্রহপূর্বক পাঠাইবেন। চেক পাঠাইলে RAMAKRISHNA MATH, COSSIPORE, এই নামে লিখিয়া Account Payee করিয়া দিবেন।

স্বামী সাধনানন্দ

অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর, ৯০ কাশীপুর রোড, কলিকাতা ২

[বিঃ দ্রঃ—ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০ জি (১৯৬১) ধারানুযায়ী উক্ত দান আয়করমুক্ত।]

সমালোচনা

The Mind and its Control: Swami Budhananda : Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta 14. Pages 112 : Price Rs, 1·50

Priya : 'Sir, our legs are in chains. We cannot go forward'.

Sri Ramakrishna : 'What if the legs are chained ? The important thing is the mind. Bondage is of the mind, and freedom is also of the mind.' (P.3)

গ্রন্থখানি ইংরেজীতে, তাই 'কথামৃতের' অনুবাদ থেকেই উদ্ধৃতি করা হয়েছে, এবং উক্ত উদ্ধৃতিতেই গ্রন্থখানির বা পুস্তিকাখানির আলোচ্য বিষয়ের পূর্বাভাষ পাওয়া যাবে।

এককথায় পুস্তিকাখানিকে 'ধর্মের ব্যবহারিক দিকের ওপর কয়েকটি রচনার' (a few essays on applied religion) সংকলন বলে বর্ণনা করা যায়। ধর্মের এই ব্যবহারিক দিকের—চিত্তনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সকল যুগেই অনুভূত হয়েছে, এবং সাধারণ মানুষের কাছে জপতপ সন্ধ্যা আহ্নিকের সার্থকতাই এইখানে। ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা হল : সহস্র যুদ্ধজয় অপেক্ষা নিজচিত্তজয়ই কঠিনতর কার্য। (ধম্মপদ, ১০৩)। শিক্ষাটি উদ্ধৃত করে স্বামী বুধানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন যে, নিজচিত্তজয় হল প্রকৃত বীরের কার্য (৮ পৃষ্ঠা)। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তি, মহাপুরুষ, যোগী, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী সকলেরই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করবার। বৃত্তিনিচয়ের যে সামঞ্জস্যের ওপর প্লেটোর সময় থেকেই গুরুত্ব আরোপ করে আসা হচ্ছে, বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তা চিত্ত-নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে আত্মোন্নয়ন বা সামাজিক প্রসার—কোনটাই সম্ভব নয়।

লেখক প্রথমে চিত্ত-নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে কিভাবে যোগ ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিত্তকে স্ববশে আনতে হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি হিন্দু শাস্ত্র বচন ও হিন্দু চিন্তাবিদ্‌দের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ যুক্তিবাদসম্মত ও ক্রমপর্যায়ী। ফলে 'দীক্ষিত' ও 'অদীক্ষিত' উভয়েরই পক্ষে সমান উপযোগী। পরিশেষে একটি সংক্ষিপ্তসার যোগ করে বোধগম্যতা যাচাই করতে সহায়তা করেছেন।

অদীক্ষিত এবং বিদেশী পাঠকদের জন্যে একটি সুন্দর শব্দার্থ-তালিকাও (glossary) আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা, মুদ্রণ ইত্যাদির দিক দিয়ে দামও অতি সামান্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্যে কোন অতিরিক্ত গ্রন্থতালিকা (a course of further reading) দেওয়া হয়নি। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি (!) দূর করা হবে। পুস্তিকাখানি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হলে দেশের আরও উপকার হবে। কারণ, ইংরেজীজানা লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং ভবিষ্যতে বোধ হয় আরও হ্রাস পাবে। —**ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়**

যেমন শুনিয়াছি : শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর উপদেশ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রেল স্টেশন ও গ্রাম—বেলানগর, পোঃ অভয়নগর, জেলা—হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৯৩; মূল্য সাত টাকা।

শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ অপেক্ষা শাস্ত্রবিৎ উপলব্ধিমান মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত উপদেশ-শ্রবণ শ্রেয়স্কর নিঃসন্দেহ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের সন্নিধানে সেবকরূপে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া লেখক যে-সকল উপদেশ পাইয়াছিলেন, সেইগুলি 'যেমন শুনিয়াছি' গ্রন্থাকারে রূপায়িত। কথোপকথনচ্ছলে প্রদত্ত মানবজীবনের নানা জটিল সমস্যার সহজ সরল সমাধান বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও অনুধাবনযোগ্য। প্রারম্ভে স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনী, শেষাংশে তাঁহার প্রিয় স্তোত্রাবলী, অনেকগুলি ছবি পুস্তকখানির অন্যতম আকর্ষণ। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল

সত্যবাণী (কাব্যগ্রন্থ): শ্রীবগলাপ্রসন্ন চৌধুরী। প্রকাশক ও পরিবেশক—'আত্মালয়', পি-৫৫৩ সি. আই. টি স্কীম-৪৭, কলিকাতা-২৯। পৃষ্ঠা ১৬; মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছেন: সত্য জানিতে সাহসী হওয়া চিত্তের দৃঢ়তা দরকার। সত্য কথা বলা আরও কষ্টকর।··· যে সমাজের বেশীর ভাগ লোক সত্য কথা বলে সে সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ।

শুধু ভূমিকায় নয়, গ্রন্থকারের কবিতাগুলিতেও সত্যবাণী প্রকাশ করিবার প্রাণের আকূতি আছে।

'আজকের বাণী' কবিতায় কবির মর্মবাণী:

কেহ নহে নীচ, কেহ নহে অস্পৃশ্য,
কেহ নহে হীন,
সকলে ব্রহ্মসাগরে হবে লীন।
যাহারা করিলে কর্মত্যাগ পড়ে যায় হাহাকার,
সুবিচার করিতে হবে তাহাদের সকলের উপর,
দিতে হবে সামাজিক অধিকার।

গ্রন্থখানি কাব্য হিসাবে পাঠকবৃন্দের কেমন লাগিবে জানি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৮ (১৬. ২. ৭২) বুধবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৭তম পুণ্য জন্ম-তিথি-উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও উষাকীর্তন, পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা হোম প্রভৃতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-পাঠ, কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ২০ হাজার ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার বাংলায় এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে লোকে তিন প্রকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে—তত্ত্ব-দর্শী মহাপুরুষজ্ঞানে, অবতারজ্ঞানে, এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ ক'রে; শেষোক্ত ভাবেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। ঈশ্বর সত্য, আন্তরিকভাবে চাইলে তাঁকে দেখা যায়, জগতের মূলে চৈতন্যসত্তারূপে তিনি বিদ্যমান, এই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই ধর্ম, কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠানপালন মাত্র নয়—শ্রীরামকৃষ্ণের এই আধ্যাত্মিক ভাব আজ বহু জনের হৃদয় স্পর্শ করছে। শিল্প-বিজ্ঞানাদি জাগতিক উন্নতির চরমে উঠেও মানুষ আজ শান্তি খুঁজে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে তার সন্ধান করছে; এরূপ সময়েই মানুষ নিজের ভেতরের দিকে তাকায়, মানুষের মন সংস্কার-মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করে।

আজ সে সময় এসেছে, বিশ্ববাসার অন্তরের ব্যাকুলতা শ্রীরামকৃষ্ণের "তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে"-ডাকে সারা দেবার জন্য যেন উন্মুখ হয়েছে। সারা জগৎ তাঁর এ আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করবেই, এবং তাতেই জগতের সব সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও যথার্থ বিশ্বপ্রেম।'

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন, 'মানুষের উন্নতির জন্য আজ আমরা দু-ধরণের কথা শুনতে পাচ্ছি—রাধাকৃষ্ণন, টয়েনবী প্রভৃতি মনীষীরা বলছেন, এর জন্য ধর্মকে আঁকড়ে ধরে চলতে হবে অশোক, গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি কর্তৃক প্রদর্শিত পথে। আর একদল বলছেন, এর জন্য ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই, ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষের কেবল জাগতিক উন্নতির দিকে, খাদ্য বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে চললেই হবে—যাকে সেকুলারিজম্ বলে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এ দুয়ের সংযোগসেতু—তিনি জাগতিক উন্নতির পথে চলতে বলেছেন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে। তাঁর এই ভাব গ্রহণ না করলে মানব-জাতিই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। টয়েনবী সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, মানুষ আজ শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতিতে বিপুল শক্তির অধিকারী, "ভারতীয় পন্থায়" না চললে

মানুষ এ শক্তিকে কেবল কল্যাণকর্মে নিয়োজিত রাখবে কেমন করে, ধর্ম ছাড়া তাকে সংযত রাখবে কে?'

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন, 'আজ যে সারা পৃথিবীর মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তার কারণ আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত তাঁর জীবন। মানুষ কেবল তত্ত্বকথা শুনতে চায় না, যে জীবনে সে তত্ত্ব মূর্ত, সেরকম জীবন দেখতে চায়। এরূপ উপলব্ধি-সমুজ্জ্বল জীবন স্বতই অধ্যাত্ম-লিপ্সুকে আকৃষ্ট করে, কাউকে ডেকে আনতে হয় না; শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।" জগৎ আজ চায় কর্মপরিণত তত্ত্ব, চায় সর্বজনীন ভাব; শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাই তারা পাচ্ছে। তাঁর ভাবে জাগতিক আনন্দের চেয়েও উচ্চতর আনন্দের সন্ধান, জগতে শান্তিরাজ্য-স্থাপনের পথের সন্ধান পাচ্ছে বলেই সব মানুষকে তা আকৃষ্ট করছে।'

স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বিশ্বচেতনাকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন—তাই তাঁর উদার ভাব আজ আপনা আপনি জগতের লোক গ্রহণ করছে।' তিনি বলেন, 'ফ্রয়েড ও কার্ল মার্কস কাম এবং কাঞ্চনকে মানুষের জীবন ও সমাজের নিয়ামক বলে ঘোষণা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এ দুয়ের প্রতিবাদস্বরূপ। শৈশব থেকেই তাঁর জীবনের নিয়ামক মানুষের অন্তরস্থ দেবভাব। কাম-কাঞ্চন-ত্যাগকেই তিনি মানুষের চরম উন্নতির সহায়ক বলে গেছেন। মানুষের জাগতিক উন্নতির বিরোধী নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন না, বরং তাঁকে সেকুলারিজম্-এর প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়—স্বামীজীকে নির্বিকল্পসমাধি থেকে জাগিয়ে এনে তিনি মানবসেবায় নিযুক্ত করেছিলেন—তাঁর সর্বক্ষণ সমাধিতে ডুবে থাকার ইচ্ছাকে "স্বার্থপরতা" বলেছিলেন। ত্যাগই মানুষের স্বার্থপরতা কমায়, আর যথার্থ ধর্মই মানুষকে ত্যাগী করে। ধর্ম তো আর সমাজে শোষণ, উৎপীড়নাদির কারণ নয়, মানুষের স্বার্থপরতাই তার কারণ। যান্ত্রিক সভ্যতায় সাহায্য নিয়ে নয়, কোন আইনের সাহায্য নিয়ে নয়, মানুষের অন্তরস্থ ঈশ্বরকে ধরে এগিয়ে যাওয়াতেই সভ্যতার যথার্থ বিকাশ। মানুষকে ত্যাগী করতে হবে, নিঃস্বার্থপর করতে হবে; তারই পথ দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে কার্য-পরিণত করে, সব কাজে ভগবানকে অবলম্বন করে চলতে শিখিয়ে। ধর্মকে বাদ দিয়ে সৃষ্ট সমাজ টিকবে না, স্বার্থে-স্বার্থে সংঘর্ষই আজ বা কাল তার বিনাশের কারণ হবে।'

রাত্রে শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা, দশমহাবিদ্যার পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ ১৯ জনকে সন্ন্যাসব্রতে ও ২৭ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

গত ৭ই ফাল্গুন (২০. ২. ৭২) রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব মনোজ্ঞ কর্মসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা হয়। ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতি দ্বারা সাধারণ উৎসবের শুভ সূচনা হয়।

সকাল ৬টা হইতে বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রদর্শনী-মণ্ডপে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি পরপর হইয়াছিল: বেদপাঠ, স্তবপাঠ, গীতা-আবৃত্তি,

বিশিষ্ট গায়কগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীত।

দুপুর ১২টা হইতে বেলা ৪টা পর্যন্ত মঠ-প্রাঙ্গণে আন্দুল কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন এবং প্রদর্শনী-মণ্ডপে সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত মনোজ্ঞভাবে পরিবেষিত হয়। সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত পাঠ, আবৃত্তি ভজন ইত্যাদি চলিয়াছিল।

হাতে হাতে প্রসাদবিতরণ আরম্ভ হয় বেলা ১২ টায়। প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় আরাত্রিকের পর আতসবাজী পোড়ানো হয়।

সাধারণ উৎসবে সারা দিনে বেলুড় মঠে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। বহু দোকানপাট বসিয়াছিল। নানাবিধ অনুষ্ঠানে সমগ্র মঠ বিশেষ আনন্দমুখর ছিল।

বাংলাদেশের কেন্দ্রসমূহ

বাংলাদেশে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, বাগেরহাট ও ফরিদপুর কেন্দ্র পুনরায় খোলা হইয়াছে। দিনাজপুর কেন্দ্র খোলার জন্য শীঘ্রই লোক যাইতেছেন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র হইতে রিলিফের কাজ আরম্ভ হইয়াছে; বাকী কেন্দ্রগুলিতেও রিলিফ আরম্ভ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

বাংলাদেশে উদ্বাস্তুসেবা ও পুনর্বাসনকার্য

গত ১০ই ফেব্রুআরি, ১৯৭২ ঢাকা আশ্রমে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে প্রায় সহস্র লোকের সমাবেশে বাংলাদেশ সরকারের সেবা ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ. এইচ. এম কামারুজ্জমান মিশনের রিলিফ-কার্যের উদ্বোধন করেন। ভারত হইতে যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী নিত্য-স্বরূপানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী যুক্তানন্দ।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের দুঃস্থ জনগণকে মিল্ক-পাউডার, কম্বল, বস্ত্রাদি ও পোশাক বিতরণ করা শুরু হইয়াছে।

বিবিধ

গত ২১. ২. ৭২ ভারত সরকারের সহকারী শিক্ষা- ও সমাজকল্যাণ-মন্ত্রী শ্রীকে. এস. রাম-স্বামী চেরাপুঞ্জী আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং ২২. ২. ৭২ শোভারপুঞ্জীতে নবনির্মিত ছাত্রী-নিবাসের উদ্বোধন করেন।

গত ২৯. ২. ৭২ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মাদ্রাজ ত্যাগরায়নগরে বিদ্যার্থী ভবনের সম্প্রসারিত অংশের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

রাজামুন্দ্রী আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকে. এল. রাও সভাপতিত্ব করেন।

গত ২৮. ২. ৭২ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বিমান-যোগে স্যাক্রামেণ্টো রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্যাক্রামেণ্টো পৌঁছিবার তারিখ ৬ই মার্চ। পথিমধ্যে তিনি রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, টোকিও ও হনলুলু পরিদর্শন করিবেন।

গত ৮ মাস যাবৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, ইউ. এস. এ, মেক্সিকো, কানাডা এবং ইউরোপের ৬টি দেশে বক্তৃতা-সফর করিয়া ১২ই ফেব্রুআরি বেলুড় মঠে ফিরিয়াছেন।

কার্যবিবরণী

শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আসামে উপজাতি-অধ্যুষিত কাছাড় জেলায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমটি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠা-সময় হইতেই দীর্ঘকাল এই আশ্রম জনকল্যাণকর শিক্ষা-সংস্কৃতি-সেবামূলক কার্যধারা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিও আশ্রমের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। প্রতি রবিবারে গীতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রভৃতি অবলম্বনে ধর্মালোচনা হইয়া থাকে।

সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সেবাশ্রম-গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২,৫০০। পাঠাগারে দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র এবং কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে পঠিত পুস্তকসংখ্যা ২,২৪৬।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৬০ জন ছাত্র থাকিবার সুযোগ লাভ করে; তন্মধ্যে ৪০ জন ছাত্রই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের, ইহারা মিজো, নাগা, কুকি প্রভৃতি উপজাতি-সম্প্রদায়ভুক্ত। ৯ জন দরিদ্র ও তীক্ষ্ণধী বালক সম্পূর্ণ বিনাখরচে থাকে। বিদ্যার্থীদের বিদ্যাশিক্ষার সহিত চরিত্রগঠনের প্রতি এবং সেবাবৃত্তি-পরিস্ফুটনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ছাত্রাবাসের ছাত্রসংখ্যা বাড়াইবার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা অর্থাভাবে মিটাইতে পারা যাইতেছে না।

অনাবৃষ্টির ফলে যখন ব্যাপক শস্যহানি ঘটে, তখন খরা-পীড়িত ৫টি গ্রামে ১০৮ পরিবারের ৬৪৬ জনকে খাদ্যবিতরণ করা হয় এবং ৪২৪ খানি কাপড় ও কম্বল দেওয়া হইয়াছিল।

কাছাড় জেলায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনুন্নত উপজাতি-সম্প্রদায়সমূহ দরিদ্র এবং শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত। ইহাদের সেবাকল্পে শিলচর সেবাশ্রমের মাধ্যমে যে কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা স্থানীয় জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

পুরী (ওড়িশা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৭ই জানুআরি থেকে ১০ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী পূজা, পাঠ, ধর্মসভাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

৭ই জানুআরি পূজাদির পর দুপুরে সমাগত দুইশতাধিক ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ উড়িয়াভাষায় ধর্মালোচনা করেন।

৮ই সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীকৈলাসচন্দ্র পাণ্ডা (সভাপতি) শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী ও স্বামী ভক্ত্যানন্দ স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীপাণ্ডা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারও এই সভায় বিতরণ করেন।

৯ই জানুআরি অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত সভায় পদ্মভূষণ শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী (সভাপতি), শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী ও স্বামী ভক্ত্যানন্দ ভাষণ দেন। আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী-পাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতিও সভার অঙ্গ ছিল। সভান্তে শ্রীনিমাইচরণ হরিচন্দন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১০ই জানুআরি সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাত্রগণ একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করে। ছাত্রগণ উৎসবের কয়দিনই পূর্বাহ্ণে ভজনসঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিল।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৭.২.৭২ হইতে ১১.২.৭২ তারিখ বেলুড় মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ অবস্থানপূর্বক বহু ভক্তকে ধর্মভাবগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন।

১৬.২.৭২ হইতে ২০.২.৭২ ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবতিথি স্মরণে বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভক্তসেবা ও ধর্মসভার আয়োজন হয়। স্বামী প্রভানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। প্রায় চারি হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদধারণে পরিতৃপ্ত হন।

এই আশ্রম উদ্যোগী হইয়া গত ২৩.১.৭২ হইতে ২৮.১.৭২ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আমেরিকা স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সফরের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারে ব্রতী হন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ২৩.১.৭২ তারিখে ঝাড়গ্রাম শহরে আসিয়া ঝাড়গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা কন্যাপীঠ ও খড়্গপুর দুর্গা মন্দির হলে দুইটি সভায় ভাষণ দেন। পরে ২৪.১.৭২ হইতে ২৮.১.৭২ পর্যন্ত মেদিনীপুর আশ্রম, তমলুক আশ্রম, হলদিয়া পোর্ট, চণ্ডীপুর মঠ, কাঁথি আশ্রম ও কাঁথি বীরেন্দ্র হলে বেদান্তের আদর্শ বিদেশ কিভাবে গ্রহণে অগ্রণী হইতেছে তৎসম্বন্ধে চিন্তাপূর্ণ ভাষণ দেন।

দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে চারজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

স্বামী বাগীশ্বরানন্দ

স্বামী বাগীশ্বরানন্দ (মহেন্দ্র মহারাজ) গত ১৭.২.৭২ রাত্রি ২টা ২০ মিনিটের সময় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আন্ত্রিক গোলযোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হইয়াছিল।

বেলুড় মঠ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কাঁথি, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান, দেওঘর, রাঁচি, লখ্‌নৌ ও জয়রামবাটী কেন্দ্রে তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত ছিলেন। অক্লান্ত কর্মী ও মধুরস্বভাব ছিলেন তিনি। কৃষি সম্বন্ধে ও উদ্যান-পরিচর্যায় তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল।

[illegible]ানন্দ

স্বামী সুদীপ্তানন্দ (রবি মহারাজ) উদ্বোধনে গত ২১. ২. ৭২ সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে সহসা করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বেশ কয়েক বৎসর তিনি বরাহনগর আশ্রমের কর্মী ছিলেন, বেলুড় মঠে প্রায় চার বৎসর এবং গত এক বৎসর কাল তমলুক আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে নিরত থাকেন। তাঁহার স্বভাব ছিল মাধুর্যপূর্ণ; কর্মে পারদর্শিতা এবং পরিবেশকে মানাইয়া লইবার ক্ষমতাও ছিল। এই তরুণ

সন্ন্যাসী সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল প্রয়াণে সঙ্ঘ একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ সন্ন্যাসী হারাইল।

স্বামী সম্ভবানন্দ

গত ২৬. ২. ৭২ রাত্রি ১১টা ৫ মিনিটে স্বামী সম্ভবানন্দ ৭৬ বৎসর বয়সে মহীশূর আশ্রমে করোনারী থ্রম্বোসিসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে গত কয়েক বৎসর তিনি অসুস্থ ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালোর আশ্রমের কর্মী ছিলেন এবং আশ্রমের সর্ববিধ উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৭-১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পোনাম্পেট আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় আশ্রমটির প্রভূত উন্নতি হয় এবং ইহা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি কুর্গ অঞ্চলের সর্বত্র মৌমাছিপালন-প্রণালী প্রবর্তন ও সংগঠন করেন—এই কার্যে স্থানীয় জনসাধারণের খুবই উপকার হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি মহীশূর আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুযোগ্যতার সহিত ইহার পরিচালনা করিয়াছেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ও গভর্নিং বডির সদস্য নিযুক্ত হন। বর্তমান মহীশূর আশ্রমের প্রগতির অনেকাংশই তাঁহার পরিচালনা-কৃতিত্বের নিদর্শন বহন করিতেছে।

স্বামী জপানন্দ

গত ২৬. ২. ৭২ বেলা ৫টায় স্বামী জপানন্দ পরিণত বয়সে আমেদাবাদের সন্নিকটস্থ দিশা নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষ হইয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠে কয়েক বৎসর থাকা এবং ঢাকা মঠে অধ্যক্ষরূপে এক বৎসর অবস্থান করা ব্যতীত তাঁহার সুদীর্ঘ সাধু-জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি গুজরাট ও রাজস্থান অঞ্চলে তপস্যায় ও শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাব-প্রচারে অতিবাহিত করেন, মাঝে মাঝে অল্পকালের জন্য বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলি দর্শন করিতে আসিতেন। হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় তিনি কয়েকখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কঠোরতপস্যাপূত জীবন এবং মধুর প্রকৃতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটির (কলিকাতা) উদ্যোগে ১৫১ বিবেকানন্দ রোড-স্থিত স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে গত ৪ঠা মার্চ স্বামীজীর ১১০তম জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ (সভাপতি), অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী (প্রধান অতিথি), ও অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

সভাপতি মহারাজ কর্তৃক স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং কুমারী শিবানী দাস কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশিত হইবার পর সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। পরে সোসাইটির সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটির বহুমুখী কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য। সর্বশেষে নির্ঝরিণী শিক্ষালয়ের পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

বালিগঞ্জ মহিলা সঙ্ঘ (কলিকাতা) গত ৭ই ফেব্রুআরি ইনস্টিটিউট অব কালচারে আয়োজিত একটি সভায় সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। শ্রীমতী শোভা রায়ের বেদগান ও সঙ্গীতের পর সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রীতিময়ী কর কার্যবিবরণী পাঠ করেন। পরে স্বামী নিরাময়ানন্দ ও ডক্টর রমা চৌধুরী ভাষণ দেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ও শ্রীমতী বাণী রায়। সঙ্ঘের পঁচিশ বৎসর পূর্তির স্মারক হিসাবে পাঁচজন দুঃস্থ মহিলাকে পঞ্চ-উপকরণসহ বাসন-পত্রাদি দান করা হয়। মাতৃসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গের ভজন, নৃত্য প্রভৃতিও অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ২৩শে হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত রামায়ণগান, অষ্টমপ্রহর নাম-সংকীর্তন, নারায়ণসেবা ও ধর্ম-সভাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী স্বানুভবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ আলোচনা করেন।

আশ্রম কর্তৃক একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি ছাত্রাবাস ও একটি পুস্তকালয় পরিচালিত হয়।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (নব বনগাইগাঁও, আসাম) গত ১৬ই ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ঐ দিন বিকালে চার হাজার ব্যক্তিকে খিচুড়িপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ভজন ও কীর্তন হয়। ১৭ই বিকালে ধর্মসভা হয়, সন্ধ্যায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে ভাষণ দেন। ১৮ই বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভাতেও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আলোচনা করেন।

তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃতি সঙ্ঘে গত ৯.১২.৭১ তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের, ৭.১.৭২ তারিখে স্বামীজীর এবং ১৬.২.৭২ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পূজা পাঠ, প্রসাদ বিতরণ ও আলোচনাদির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (হুগলী) কর্তৃক গত ১৬.`.৭২ তারিখ স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। পূজাদির পর দুপুরে প্রায় ৭০০ ব্যক্তি অন্নপ্রসাদ পান এবং পরে স্বামী বিশ্বদেবানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুরবিতানে (কলিকাতা) গত ১৬.২.৭২ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্]

হে ত্রিলোকনাথ, হে লক্ষ্মীপতে! যাহারা তোমারও অপলাপ করিতে চায়, সেই সকল নাস্তিকদিগকে যেন আমি কখন মনেও স্থান দান না করি, এবং কোন জন্মেও যেন তোমার কায়িক বাচিক ও মানসিক সেবাবিরহিত না হই।

জিহ্বে কীর্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরম্
পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চয়াচ্যুতকথাঃ শ্রোত্রদ্বয় ত্বং শৃণু।
কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের্গচ্ছাঙ্ঘ্রিযুগ্মালয়ম্
জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীং মূর্দ্ধন্নমাধোক্ষজম্ ॥ ১৬ ॥

হে জিহ্বে! তুমি সর্ব্বদা কেশবের নামই কীর্তন কর; হে চিত্ত! তুমি সর্ব্বদা মুরহরের ভজনা কর; হে হস্তদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্মীপতির পূজা কর; হে কর্ণদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদাই সনাতন হরির কথাই শ্রবণ কর, হে নেত্রদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন কর; হে পদদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্দিরেই গমন কর; হে নাসিকে! তুমি সর্ব্বদা মুকুন্দের শ্রীচরণতুলসীর আঘ্রাণ লও; হে মস্তক! তুমি সর্ব্বদাই সেই অব্যয় পুরুষের সম্মুখে অবনত হও।

হে লোকাঃ শৃণুত প্রসূতিমরণব্যাধেশ্চিকিৎসামিমাম্
যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ।
অন্তর্জ্যোতিরমেয়মেকমমৃতং কৃষ্ণাখ্যমাপীয়তাম্
তৎপীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্ব্বাণমাত্যন্তিকম্ ॥ ১৭ ॥

হে মানবগণ! যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগজ্ঞ মুনিগণ জন্মমরণরূপ ব্যাধির যেরূপ চিকিৎসা বিধান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। স্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময় ও অপরিমেয় শ্রীকৃষ্ণনামক অমৃত পান কর; উক্ত পরমৌষধ পান করিলে চিরকালের জন্য সমুদয় বাসনাজাল নির্বাণ হইয়া যাইবে।

হে মর্ত্ত্যাঃ পরমং হিতং শৃণুত ভো বক্ষ্যামি সংক্ষেপতঃ
সংসারার্ণবমাপদূর্ম্মিবহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ।
নানাজ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়েত্যমুম্
মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রাবর্ত্তয়ধ্বং মুহুঃ ॥ ১৮ ॥

হে মানবগণ! সংসার-মহাসমুদ্র বহুবিধ বিপত্তিরূপ তরঙ্গে সর্ব্বদাই অতি ভয়ঙ্কর। সেই সাগরে তোমরা সম্যক্‌রূপে নিমগ্ন হইয়াছে; অতএব যাহাতে তোমাদের পরম মঙ্গল হয়, আমি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্য সমুদয় জ্ঞানলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া সভক্তি প্রমাণসহকারে প্রণব (ওঁ মন্ত্র) উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বদাই 'নমো নারায়ণায়' এই মহামন্ত্র মনোমধ্যে ধ্যান কর।

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুস্ফুলিঙ্গো লঘুঃ
তেজো নিঃশ্বসনং মরুৎ তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টে যত্র স তাবকো বিজয়তে ভূমা বিধূতাবধিঃ॥ ১৯॥

তোমার অসীম সর্ব্বব্যাপী ভূমামূর্ত্তি সকলকেই পরাজিত করিয়াছে। সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিলে পৃথিবীকে পরমাণু বলিয়া বোধ হয়, সাগরসকল জলবিন্দুবৎ, প্রত্যেক জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্ষুদ্র অগ্নিকণার ন্যায়, সমগ্র বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাসক্রিয়ার ন্যায়, বিশ্বব্যাপী আকাশ একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ন্যায়, জগদুৎপত্তিপ্রলয়কারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে সামান্য জীবের ন্যায় এবং অন্যান্য দেবতাগণকে কীটের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

বদ্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদ্গমৈঃ
কণ্ঠেন স্বরগদ্গদেন নয়নেনোদ্গীর্ণবাষ্পাম্বুনা।
নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলধ্যানামৃতাস্বাদিনাম্
অস্মাকম্ সরসীরুহাক্ষ সততং সম্পদ্যতাং জীবিতম্॥ ২০॥

হে কমলনেত্র! করতলদ্বয় যুক্ত করিয়া, অবনতমস্তকে, রোমাঞ্চিতকলেবরে, গদ্গদস্বরে, প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিয়ত তোমার শ্রীপাদপদ্ম দুটির ধ্যান দ্বারা অমৃত আস্বাদপূর্ব্বক যাহাতে আমাদের জীবন সতত অতিবাহিত হয়, সেইরূপ বিধান কর।

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাম্
হে গোপীজননাথ পালয় পরম্ জানামি ন ত্বাং বিনা॥ ২১॥

হে গোপাল! হে করুণাসাগর! হে লক্ষ্মীপতে! হে কংসমর্দ্দন! হে গজেন্দ্রমোক্ষদাতঃ! হে মাধব! হে রামানুজ লক্ষ্মণ! হে ত্রিলোকগুরো! হে কমলাক্ষ! হে গোপীজনবল্লভ! আমায় পালন কর। আমি ত্বদ্ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা। [ক্রমশঃ]

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, রবিবার ২৮ শে আগষ্ট)

সৃষ্টির অনাদিত্ব।

আজ ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে একটী গল্প পাঠ করিব;—শ্বেতকেতু নামে একটী ব্রাহ্মণপুত্র ছিলেন; তাঁহার পিতার নাম আরুণি বলিয়া তাঁহাকে আরুণি শ্বেতকেতু বলিত। একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্মচর্য্য আচরণপূর্ব্বক গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন কর। শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য চিন্তা করতঃ কিছু অহঙ্কারী

হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "শ্বেতকেতো, তুমি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ সত্য, কিন্তু এরূপ কিছু জানিয়াছ, যাহা জানিলে জগতের সমস্ত পদার্থই জানা যায়? মাটিকে জানিলে যেরূপ মাটির বিকার সরা খুরি প্রভৃতি সমস্তই জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন এক বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে জগতে জানিবার আর কিছু বাকি থাকে না। এরূপ কোন বস্তু কি জানিতে পারিয়াছ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, না আমি এরূপ বস্তু জানি না, আমার গুরুও ইহা জানেন না, জানিলে অবশ্যই সে বস্তুর কথা আমাকে বলিতেন। অতএব আপনি যদি তাহা জানেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, "শ্বেতকেতো, অগ্রে কেবল এক সৎ বস্তুই বিদ্যমান ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি ঈক্ষণ করিলেন—ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব এবং তিনি বহু হইলেন। এইরূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত পুত্রকে শিক্ষা দিলেন। এক্ষণে আমাদের বুঝা আবশ্যক, এই যে সৃষ্টতত্ত্ব বর্ণনায় বলা হইয়াছে, অগ্রে কিছুই ছিলনা, কেবল এক সৎ ছিলেন, ইহার অর্থ কি? সৃষ্টি আদৌ ছিলনা, বা হয় নাই ইহাই কি অর্থ? না, আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই। ইহার অর্থ—সৃষ্টি বীজরূপে সেই সৎবস্তুতে বর্ত্তমান ছিল, সৃষ্টি সেই সৎবস্তু হইতে পৃথক নয়, তিনিই বহু হইয়াছেন। যখন এই সৃষ্টি তাঁহার অংশ হইল, তখন ইহা ছিলনা, এরূপ কিরূপে হইবে? প্রকাশভাবে সৃষ্টি না থাকুক, বীজভাবে ছিল। বৃক্ষ যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে শাখাপত্রাদি আকারে প্রকাশিত হয় ও পরে আবার বীজে পরিণত হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ সৃষ্টি বারংবার প্রকাশিত ও লয় হইয়া থাকে; ব্যক্তাবস্থা হইতে আবার অব্যক্ত অবস্থায় লুক্কায়িত হয়। এইরূপে প্রকাশ ও প্রলয় এই দুই অবস্থায় প্রবাহরূপে সৃষ্টি অনাদি-কাল বর্ত্তমান আছে। সৎবস্তু যেরূপ অনাদি, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি। সৃষ্টির আদি আছে বলিলে দুইটি দোষ উপস্থিত হয়, ইহা আমরা গতবারে দেখিয়াছি—১ম বৈষম্যদোষ—আমরা জগতে বৈষম্য দেখিতে পাই—কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থকায়; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ পণ্ডিত, কেহ মুর্খ ইত্যাদি; এইরূপ বৈষম্য কেন ও কোথা হইতেই বা হয়? সৃষ্টিকর্ত্তা-কৃত বলিলে তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ পড়ে এবং ২য়, তাঁহাতে নৈঘৃণ্য দোষ হয়, তাঁহার নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ হয়, কারণ অকারণে তিনি কাহাকেও সুখী ও কাহাকেও মহাদুঃখী করিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলিয়া বর্ণিত। উহা প্রবাহরূপে অনাদি, উহা তাঁহারই রূপ, তাঁহারই অংশ, তিনিই। সৃষ্টির আদি আছে বলিলে আর এক দোষ আছে—যখন সৃষ্টি ছিলনা, তখন ভগবানের সৃষ্টিকর্তৃত্ব না থাকার জন্য হয় তাঁহার পূর্ণত্ব ছিলনা—তিনি অপূর্ণ ছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া তাঁহার অধিক গুণ-প্রাপ্তি হইয়াছে অথবা গুণের হ্রাস হইয়াছে, বলিতে হয়। কি বেদ, কি পুরাণ, কি মহা-ভারত, কি স্মৃতি—সকল শাস্ত্রেই সৃষ্টি অনাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—প্রাণ ও আকাশ।

মহাভারতাদিতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করিয়া সাধারণতঃ আমরা অনেক ভুল বুঝিয়া থাকি। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ, প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হইল, এখন

প্রাণ মানে আমরা নানারূপ বুঝিয়া থাকি। কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝিয়া লন, কেহ জীবাত্মা বুঝেন ইত্যাদি, কিন্তু এরূপ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। সেইরূপ আকাশ অর্থে আমরা অবকাশ বুঝি, এই আকাশের তিন রূপ অর্থ আছে। ১ম মহাকাশ—বাহ্য জগতের সকল বস্তু এই মহাকাশে বর্ত্তমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বৃক্ষাদি সমস্তই এই অবকাশে রহিয়াছে; ২য়,—চিত্তাকাশ, আমরা সে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইজন্য মনকে আকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; ৩য়,—চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ; আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সামান্য জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নাই—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ; এই আকাশে বাহ্যিক মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্তাকাশ উভয়ই রহিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় আকাশ আর এক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরাজীতে যাহাকে matter বলে; ইহা জড়ের সূক্ষ্ম অংশ, এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, যেমন গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্নপরিপাকশক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার; সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসশক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং এই নিঃশ্বাসশক্তি বর্ত্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলিয়া ইহাকে প্রাণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণ বলিতে এক মূল শক্তিকে বুঝিতে হইবে, আর সকল শক্তিই ইহার বিকার। সেইরূপ আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, মূল জড় বস্তু—আর সমস্ত জড় বস্তুই যাহার বিকারমাত্র।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—শাস্ত্র ও বিজ্ঞান।

আমরা শাস্ত্রের এই মত না বুঝিয়াই ইহা ভ্রান্তমত বলিয়া অগ্রাহ্য করি, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন। আকাশের পরমাণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বায়ু—বা ধাতু—কম্পন অর্থ। আকাশ হইতে এই বায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হইতে তেজঃ জন্মায়, বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করিতেছে। কোন বস্তুর গতিরোধ করিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বহিলে উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ছিল। ক্রমে শীতল হইয়া বাসোপযোগী হইয়াছে। এখনো সূর্য্যলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাষ্পরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তেজঃ শীতল হইয়া অপ্‌ বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হইয়া পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদি রূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চমহাভূত প্রথমে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থূল জগৎ নির্ম্মিত হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বে—সাংখ্য ও বেদান্ত।

বেদান্তমতে এই স্থূল জগৎ এক সতেরই রূপান্তর মাত্র। এক সৎবস্তুকেই অবলম্বন

করিয়া এই জগৎ রহিয়াছে; তিনিই এই জগৎ হইয়াছেন। সাধারণতঃ বেদান্তের অর্থ লোকে এইরূপ করে যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎ নাই; কিন্তু বেদান্তের এরূপ অর্থ নয়। যখন সৎবস্তু হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইহা মিথ্যা কি করিয়া বলিব? যখন তিনিই সকল জীব জন্তুর প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তখন ইহা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? আমাদের এইস্থলে "মিথ্যা" এই কথা "কম সত্য, সেই পূর্ণ সত্য অপেক্ষা কম সত্য" এইরূপ বুঝিলে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ—পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অনাদি বস্তু। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হন, যেরূপ চুম্বকলৌহের সান্নিধ্যবশতঃ লৌহ আকৃষ্ট হয়। এই প্রকৃতি হইতে মহান্ অর্থাৎ বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংজ্ঞান, অহঙ্কার হইতে পঞ্চসূক্ষ্মভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়।

সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভেদ—ঈশ্বর-তত্ত্বে।

এখন সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে প্রভেদ এই, সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না; বেদান্ত করেন। বেদান্ত বলেন, যেমন মানুষের এই দেহ, সেইরূপ সমগ্র সৃষ্ট জগৎ একটি মহান্ বিরাট দেহ। আমাদের দেহসকল সেই সমষ্টি-দেহের অংশ মাত্র। প্রত্যেকের যেরূপ মন আছে, সেইরূপ এই স্থূল জগতের ভিতর এক অনন্ত মন আছে, আমাদের প্রত্যেকের মন সেই মহান্ মনের অংশমাত্র। সমস্ত দেহ পরস্পর-সম্বদ্ধ; কারণ তাহারা এক বিরাট দেহের অংশ। সমস্ত মন পরস্পর সম্বদ্ধ; কারণ তাহারা এক বিরাট মনের অংশ।

বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের কার্য্যকারিতা—নিঃস্বার্থপরতা।

যখন একটী দেহ ক্লেশ পায় বা একটী মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন আর আর দেহ ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হইবে। কারণ, তাহারা পরস্পর সংলগ্ন ও সেই একেরই অংশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল, ও তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল। তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবসিত হইতেছে না, তাহার প্রতিঘাত আমাতে ও সর্ব্বজগতে গিয়া লাগিতেছে। সেইরূপ এক জাতির উন্নতি অবনতি অপর জাতি-সমূহকে স্পর্শ করে। আমরা বেদান্তের এই মহান্ সত্য যে দিন হইতে ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমাদের অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বার্থের বশীভূত হইয়া আমরা যে স্ত্রী ও শূদ্রজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি। সমাজ-শরীরের এক অংশ রোগগ্রস্ত হইলে অপর অংশও রুগ্ন হয়—পাশ্চাত্যগণ বেদান্ত না পড়িয়াও বহুদর্শিতায় ইহা বুঝিয়াছে ও এখন সেই সত্যটি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। একদেশে মহামারী হইলে অপর দেশে হইবার সম্ভাবনা, অতএব পরের দেশের মহামারী নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। স্ত্রীজাতির অবনতিতে, সমাজের অপর অঙ্গ পুরুষজাতিরও অবনতি হইয়া থাকে এবং অপর দেশের অমঙ্গলে নিজেদেরও অমঙ্গল, ইহা বুঝিতেছে। সকলেই সেই বিরাট মূর্ত্তির অঙ্গ, এই মহান্ ভাব বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জুন, যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, তাহা আমি;

নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ ইত্যাদি বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন, আর আমি কত বলিব, আমি একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া রহিয়াছি। এই বিরাটের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। সাধন ভজন সব এক কথায় বলিলে ইহাই বলা যায় যে—স্বার্থত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া—যে আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাধন ভজন সব হইয়াছে। ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যে, যে তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিল, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর যে করিল না, তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন? না, তিনি এরূপ নন। একজন ভগবান মানে না, কিন্তু সে স্বার্থশূন্য, পরের সেবা তাহার ব্রত, ইহাই তাহার প্রধান সাধন। জানিও, তাহার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যস্ত কিন্তু মহাস্বার্থপর, তাহার সাধন ভজন পণ্ডশ্রমমাত্র। সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলেই তাঁহার মূর্ত্তি জানিয়া সেবা করিতে হইবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, সকলেই বিরাটের অংশ। সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমরা অধিকার করিয়া বলিতেছি, আমার মন। তুমি একটু লইয়া বলিতেছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার কোন অংশে বেড়া দিয়া আমি একটা নাম দিলাম, ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি। সকলেই জানেন কিন্তু বাস্তবিক গঙ্গা এক। সেই এক জল, এক তরঙ্গ কেবল নামরূপে প্রভেদ। সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিতেছি। যখন দুইজনের মন পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্য ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, একভাবে ভাবিত হয়, তখন তাহাদের শরীর পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকিলেও মনের কথা জানিতে পারে; আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেইজন্য আমাদের মন ও শরীর পরস্পর সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহা এক মহাসত্য। যখন মনে পাপচিন্তা উদয় হয়, অন্যান্য মনের পাপচিন্তা সেই মনে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে আরো পাপে নিমগ্ন করে, আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তা উদয় হইলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা তাহার মনের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে আরও উন্নত করিতে থাকে। আমাদের সমস্ত সাধন ভজন আমাদিগকে স্বার্থশূন্য করিয়া এই বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে।

ঈশ্বরের প্রকাশ—ব্যক্তি-ভেদে।

যাহার যেরূপ মন, সে বিরাটকে সেইরূপে ভাবিয়া থাকে; যে নিষ্ঠুরস্বভাব তাহার ভগবানকে সে নিষ্ঠুরস্বভাব দেখে, যে পুণ্যবান সে ভগবানকে অনন্ত পুণ্যময় দেখিতে পায়। আমাদের নিজের স্বভাব অনুযায়ী আমরা ভগবান কল্পনা করি। ইহা স্বাভাবিক এবং ইহা সত্য, কারণ মনের উন্নতি অনুযায়ী আমরা ভগবানকে ধারণা করিতে সক্ষম হই, তাহাই সেই সময়ে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। যেমন, সূর্য্যকে আমরা একরূপে দেখিতেছি, ইহা সূর্য্যের প্রকৃত রূপ নহে, কিন্তু আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাও মিথ্যা নহে। যতই সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হই, সূর্য্যকে ততই ভিন্নরূপে অবলোকন করিতে থাকি।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ;—দূর হইতে পর্ব্বত দেখিলে বোধ হয়, একখানি কাল মেঘ উঠিয়াছে; যতই অগ্রসর হওয়া যায়, বৃক্ষমন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে আরো অগ্রসর হইলে জীব জন্তু প্রভৃতি দেখা যায়, এইরূপ যতই সেই বিরাট পুরুষের নিকট যাওয়া যায়, ততই আমরা তাঁহার নূতন নূতন ভাবসকল দেখিতে পাইয়া ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যাই। পরমহংসদেব দৃষ্টান্ত দিতেন, যেমন ঘরের ভিতর একটু আলো ছাতের ফাঁক দিয়া আসছে। যে ভিতরে আছে তার আলোজ্ঞান সেইটুকু, যার ঘরে অনেক ছ্যাদা, সে অধিক আলো দেখিতে পায় আবার দরজা জানলা খুললে আরো আলো হয়, কিন্তু যে মাঠে আছে তার কাছে আলোয় আলো। ভগবান এইরূপে লোকের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।

বেদান্ত কি নাস্তিক?

লোকে বেদান্তশাস্ত্রকে নাস্তিক শাস্ত্র বলে। বেদান্ত নাস্তিক শাস্ত্র? যে বেদান্ত সকলেরই ভিতর অনন্তকে দেখাইয়া দেয়, সকলকেই ব্রহ্মের অংশ বলিয়া পূজা করিতে বলে, তাহা কখন কি নাস্তিক শাস্ত্র হইতে পারে? আমরা অতি হীন হইয়াছি, নিজের শাস্ত্র পড়ি না, বুঝি না, তাই এই দুর্দ্দশা। আবার শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। সকলের ভিতর আনন্দময় ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, সমস্ত জগতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই উন্নতির সময় আসিবে।

বিবিধ।

পাশ্চাত্য দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (Schopenhaur) বলিয়াছেন—জগতে উপনিষদের তুল্য উপকারী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। জীবনে ইহা আমায় সান্ত্বনা দিতেছে, মৃত্যুকালেও ইহা আমায় শান্তি দিবে।

ইউক্লিডের (Euclid) জ্যামিতি আবিষ্কার করিবার বহুপূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞার্থ বেদী নির্ম্মাণ করিতে গিয়া জ্যামিতির অনেক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত এই যে, জগতের মধ্যে হিন্দুরাই সর্ব্বাপেক্ষা কম রোগগ্রস্ত হয়।

ডাক্তার কারির (Dr. Currie) মত—"আমরা রোগের গুহ্য কারণ সম্বন্ধে এতদূর অনভিজ্ঞ যে, অনেক সময়ে যে ঔষধ প্রদত্ত হয়, তাহা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায়; তাহাতে, অনেক সময়ে যে রোগ নিবারণের উদ্দেশে তাহা প্রদত্ত হয়, তাহাই আনিয়া দেয়।"

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "উদ্বোধনের" প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। **। এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা কার্য্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সু-সম্পন্ন করা হয়। **।

"উত্তিষ্ঠত, শ্বেতকেতো!"

বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র।

১ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ১৫ই মাঘ। ১৩০৫ সাল।

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

"উত্তিষ্ঠত, শ্বেতকেতো!"

সূচী।

—০—

উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যার কভারের ফটো; মূল প্রচ্ছদ গেরুয়া রং-এর কাগজে, কাল কালিতে ছাপা।—সম্পাদক



দিব্য বাণী

রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্।
দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে ॥ ১ —বাক্যসুধা
সদা সাক্ষিস্বরূপত্বাৎ শিব এবাস্মি কেবলঃ।
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৪
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাস্ম্যহমদ্বয়ম্।
সর্বজ্ঞোঽহমনন্তোঽহং সর্বেশঃ সর্বশক্তিমান্ ॥ ২৫ —ব্রহ্মানুচিন্তনম্

—শঙ্করাচার্য

(কেবল চৈতন্য দ্রষ্টা, আর সবই দৃশ্য তার কাছে—
মন ও ইন্দ্রিয় দৃশ্য, দৃশ্য সবই বহির্বিশ্বে যাহা কিছু আছে—
যদিও চেতনা-স্পর্শে মন ও ইন্দ্রিয়াদিরে দ্রষ্টা বোধ হয়।)
রূপ দৃশ্য, চক্ষু দ্রষ্টা ; চক্ষু দৃশ্য, মন দ্রষ্টা তার ;
মনোবৃত্তিগুলি দৃশ্য সাক্ষী চেতনার ;
চৈতন্য কেবল দ্রষ্টা, দৃশ্য কারো নয় ॥

চৈতন্যস্বরূপ আমি, সাক্ষিরূপ আমি সর্বদাই—
পরতত্ত্ব শিব আমি তাই।
সব কিছু সৃষ্ট আমা হতে,
সব কিছু স্থিত আছে, সব কিছু লীনও হয় প্রলয়ে আমাতে—
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমি তাই,
আমি ছাড়া বিশ্বমাঝে দ্বিতীয় সত্তাই কিছু নাই।
সর্বজ্ঞ, অনন্ত আমি, আমি সর্বেশ্বর,
সর্বশক্তিমান আমি (সচ্চিদ্-আনন্দ-রূপ, অজর, অমর) ॥

কথাপ্রসঙ্গে

সত্য ও তাহার আবরণ 'তত্ত্ব'

আমাদের দুঃখকষ্ট বা মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, আমরা স্বরূপতঃ এসবেরই অতীত—একথা সকল সত্যদ্রষ্টাগণই বলিয়াছেন। নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন। অথচ আমরা তো প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদের অস্তিত্ব জন্ম-মৃত্যুর সীমায় ঘেরা, দুঃখ-কষ্ট-ভয় তো আমাদের ঘিরিয়াই রহিয়াছে। দুইটি তো আর এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে না! তবে দুঃখাদির অতীত হইয়াও আমরা নিজেদের দুঃখী মনে করি কেন, ভয় পাই কেন?

কেন তাহা ঠিকমতো বলা সম্ভব নয়। তবে এরূপ হয়, এরূপ ঘটিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই এই 'ঘটনাকেই' মায়া বলিয়াছেন। ভক্ত বলেন, ভগবানের 'ইচ্ছায়' এরূপ ঘটিতেছে। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'মায়া' বা অজ্ঞান প্রভাবে এরূপ ঘটে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, 'অবিদ্যা' প্রভাবে এরূপ ঘটে। জৈন মতে 'প্রকৃতি-বন্ধে'র ফলে এরূপ ঘটে; এই প্রকৃতি-বন্ধগুলি অনেকটা তন্ত্রের জগন্মাতার 'পাশের' অনুরূপ। মোট কথা, ইহা সকলেই বলিতেছেন যে একটা কিছু আমাদের অবাধ স্বরূপকে ভুলাইয়া দিয়াছে, তাই আমরা জন্ম-মৃত্যু-সীমিত বলিয়া নিজেদের ভাবিতেছি, সুখ-দুঃখ-ভয়াদিতে আচ্ছন্ন বলিয়া নিজেদের মনে করিতেছি; অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি না।

কেন এমন ঘটিল তাহা লইয়া ভাবিয়া লাভ নাই—উহা লইয়া বহু আলোচনা হইলেও পরিণামে উহা বুদ্ধির অগম্যই থাকিয়া যায়। তবে ঘটনা যে এরূপ—ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। কেহ কেহ হয়ত বলেন সত্যই এরূপ কিছু ঘটে নাই, ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে মাত্র; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদের নিকট উহা ঘটনাই, বাহিরে কিছু ঘটার জন্যই হউক, অথবা মনের ভিতরে কোন প্রক্রিয়ার জন্যই হউক, যে কোন কারণে আমাদের মনে-হওয়াটাই আমাদের কাছে বাস্তব। বস্তু যাহাই হউক, আমাদের মন উহাকে কিরূপ অনুভব করিতেছে, তাহাই আমাদের নিকট 'বাস্তব'।

যখন আমরা নিজেদের এই মায়া বা অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা প্রকৃতিবন্ধ বা পাশ হইতে মুক্ত অনুভব করি, যখন আমরা স্বরূপতঃ যাহা নিজেকে সেরূপই প্রত্যক্ষ করি, তখন কি উপলব্ধি করি? তাহাও কেবল উপলব্ধির বিষয়, বাক্য-মন-বুদ্ধির অগম্য, আমাদের ধারণার অতীত, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

তবে বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা যে এ-বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলিয়া গিয়াছেন? বলিয়াছেন ঠিকই, না বলিলে যে আমরা বন্ধনমুক্তির পথে, অজ্ঞাননাশের পথে অগ্রসর হইবার অবলম্বনই পাইব না। যাহা 'কখনো উচ্ছিষ্ট হয় নাই', অর্থাৎ যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ভাষার মাধ্যমে তাহারই আভাস দিতে হইবে; যাহা মনবুদ্ধির অতীত, মনবুদ্ধিগ্রাহ্য কিছুর মাধ্যমে তাহারই আভাস দিতে হইবে। না দিলে তাহার দিকে মানুষ অগ্রসর হইবে কেমন করিয়া? মনবুদ্ধির পারে যাইবে কি অবলম্বন করিয়া? যাহা মনবুদ্ধি-বাক্যের অতীত, তাহাকে তো আর চিন্তা

করা যায় না, তাহার সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। সোজাসুজি মনবুদ্ধির অতীত সত্যকে, নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কয়জন করিতে পারেন? কয়জন শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার পরও জ্ঞানখড়্গ দিয়া তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সোজাসুজি সে সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন? কিন্তু যে কোন একটিমাত্র চিন্তার বিষয়ে, একটিমাত্র বৃত্তি অবলম্বনে মনকে একাগ্র করিবার চেষ্টা আমরা সকলেই করিতে পারি—করিতেও হয় তাই। নিজেরই স্বরূপকে আমি ও ঈশ্বর—এই দুই ভাবে ভাবিয়া কোন নাম-রূপের মাধ্যমে তাঁহাকে চিন্তা-গ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পূজা, জপ, নামকীর্তন, ধ্যানাদির মাধ্যমে তাঁহাতে মন স্থির করিবার বহুবিধ পথ সত্যদ্রষ্টাগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার আমি বা জীব, এবং ঈশ্বর—এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং এ দুয়ের স্বরূপ সম্বন্ধেও বহু বিভিন্ন কথা বলা হইয়াছে। তবে, এ সব 'কথা'ই হইল মন-বুদ্ধির সীমানার ভিতরের আভাস। যতক্ষণ আমরা মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশে না যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ মনবুদ্ধির অতীত সত্যের অভিমুখী হইবার জন্য বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রুচির মানুষের মনবুদ্ধি-গ্রাহ্য করিয়া সত্যদ্রষ্টাগণ-কর্তৃক প্রদত্ত সেই অদ্বিতীয় চরম সত্যের আভাসমাত্রকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, বিভিন্ন রুচির মানুষকে ভগবন্মুখী করিবার জন্য ঈশ্বরেচ্ছাতেই বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন যে, জড়াবরণে, অন্ততঃ শব্দের আবরণে আবৃত না হইলে চরমসত্য 'তত্ত্ব'-রূপে, আমাদের মনবুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়া থাকিতে পারে না; আর 'এই আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আমরা আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্যই একথা বোঝেন, আর সেজন্যই অবতারেরা পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মূল তত্ত্বটী বুঝিয়ে দিয়ে যান, আর সেইকালের উপযোগী তার একটী নূতন আকার দিয়ে যান। আমার গুরুদেব বলতেন: ধর্ম এক; সকল অবতারকল্প পুরুষ একপ্রকার শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়। সেই জন্য তাঁরা তাঁকে পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে একটী নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন।'

এই কারণেই আমাদের মনে হয় যে, বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টাগণ বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন।

যখন কেহ সত্যদ্রষ্টাগণ কর্তৃক উক্ত বিভিন্ন 'তত্ত্বে'র যে কোন একটি অবলম্বনে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া মনবুদ্ধির পারে চলিয়া যায়, তখনই সে প্রত্যক্ষ করে যে, মনবুদ্ধির রাজ্যে তাহার প্রকাশ বিভিন্ন তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত হইলেও সব মতেরই, সব তত্ত্বেরই মূলে সত্য একটিই,—'দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমনকি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।'

এই অনুভূতিলাভই 'ভগবানলাভ', 'জ্ঞান-লাভ', 'নির্বাণলাভ', 'কৈবল্যলাভ' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উক্ত হয়। এই সত্যই আমাদের সকলেরই স্বরূপ—মনবুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া ইহাকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, কালী, শিব, কৃষ্ণ, আল্লা, গড্ প্রভৃতি বলা হয়। শব্দের আবরণজড়িত সত্য—তত্ত্ব—আমাদের মনবুদ্ধিগ্রাহ্য; শব্দের প্রতিপাদ্য সত্য নয়।

২

আমরা দেখিলাম স্বরূপতঃ আমরা দুঃখ-ভয়

প্রভৃতির অতীত হইলেও যে কোন কারণেই হউক দুঃখ-ভয় প্রভৃতি জড়িত রূপে নিজেদের দেখিতেছি। সত্যকে অন্যরূপে দেখিতেছি ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমাদের নিজেদের এরূপ দুঃখাদিমণ্ডিত দেখা যে ভুল দেখা, তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি; কেন ভুল দেখিতেছি, তাহা নাই বা বুঝিলাম। আর ইহাও তো ঠিক যে, দুঃখ-ভয়াদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আমাদের মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশে যাইতেই হইবে, কেবল শব্দ লইয়া, তত্ত্ব লইয়া বুদ্ধির সীমার মধ্যে ঝটাপটী করিলেই চলিবে না, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ যে কথা নারদের মুখ দিয়া বলিয়াছেন, 'আমি চতুর্বেদ, ইতিহাস-পুরাণ, বেদাঙ্গ, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি সবই তো পড়িয়াছি; কিন্তু কই, ইহাতে তো ভয়ের হাত হইতে এখনো রেহাই পাইলাম না! এসব পড়িয়া আমি মন্ত্রবিদ্ মাত্র হইয়াছি, আত্মবিদ্ হই নাই। আমাকে আত্মবিদ্ হইবার, অভয় হইবার পথ দেখান সত্যদ্রষ্টাগণ সেই পথই দেখাইয়া যান।

ভগবান বুদ্ধ এইরূপ সত্যদ্রষ্টাগণের অন্যতম, অবতার। তিনি কিন্তু সত্যকে মনবুদ্ধিগ্রাহ্য কোন রূপ দিতে প্রয়াসী হন নাই। আবার দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা ইহা বলিলেও সেই অবিদ্যায় কেন আমরা জড়িত হইলাম সে সম্বন্ধেও নীরব ছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, এ দুই-ই মনবুদ্ধির ধারণার অতীত। তিনি শুধু পথের নির্দেশ দিয়াছেন—কিভাবে দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে আমরা নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি, তাহা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। সকল মানুষের উপযোগী, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়েরই উপযোগী পথের সন্ধান তিনি দিয়াছেন। পথে চলাটাই তো আসল কাজ, লক্ষ্যে পৌঁছিলে তো প্রত্যক্ষই করিব—সত্যের, আমার নিজের স্বরূপ কি; তাহা লইয়া আলোচনায় লাভ কি? যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাহাকে ভাষায় সীমিত করিবার চেষ্টায় কি ফল? তিনি বলিয়াছেন, দুঃখ আছে, ইহা তো দেখিতেছি। ইহার কারণও আছে—কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না জগতে। দুঃখের এই কারণ দূরও করা যায়। উহা দূর করার পথের নির্দেশ তিনি দিয়াছেন—সে পথে চলিয়া উহা দূর কর। সে পথ মূলতঃ বেদান্তের জ্ঞানমার্গেরই পথ, কেবল চরম সত্য সম্বন্ধে, আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে তত্ত্বরূপ আবরণ কিছু নাই তাহাতে। দেহ-মন-বুদ্ধির সব চাহিদাকে অস্বীকার করিয়া চলিতে হইবে, এমন কি 'অহং'-বোধকেও। আমাদের পরিচিত বা কল্পিত সব কিছু অনুভূতির শিখাকে নিভাইয়া দিতে হইবে, কিন্তু কি অবলম্বন করিয়া সে সর্বনাশা অন্ধকারের রাজ্যে যাইব, সে সম্বন্ধে তিনি নীরব। মনবুদ্ধি-অহংকারের সীমাটুকু পার হইবার জন্য যে-কোন নামরূপের আবরণ-জড়ানো একটি অবলম্বন সাধারণ মানুষের চাই-ই—ভগবানের যে কোন নাম, বা নাম ও রূপ। আর, যাঁহারা প্রথম হইতেই অহংকারকেও অস্বীকার করিয়া চলিতে চান, তাঁহাদেরও অধিকাংশেরই প্রয়োজন 'আমিই সেই সত্য'—এরূপ চিত্তবৃত্তির আবরণমণ্ডিত তত্ত্বরূপ অবলম্বন। এসব ছাড়াই পথ চলার অধিকারী অতি বিরল। পরবর্তী কালে এই কারণেই বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে হয়, এবং অন্যত্রও অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধদেবকেই ভগবানের আসনে বসান।

৩

সনাতন ধর্মে সবরকম মানুষের রুচি ও

সামর্থ্যমতো পথে চলার অবলম্বন দেওয়া আছে, দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত সবই আছে। একসময় আমরা অবলম্বনের, 'আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে' আসলকেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তখন বুদ্ধদেব আসিয়া সত্যকে সর্ববিধ আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। কালক্রমে মানুষ নিজের পছন্দমতো আবরণে সত্যকে জড়াইয়া আবার আসলকে ভুলিয়াছিল। সেসময় আচার্য শঙ্কর আসিয়া সনাতন ধর্মোক্ত সর্বোচ্চ তত্ত্বের আবরণে, অদ্বৈততত্ত্বে সত্যকে পুনরায় উপস্থাপিত করেন। অবশ্য সর্বসাধারণের অবলম্বনরূপে সাকারোপাসনাকেও তিনি স্বীকৃতি দিয়াছিলেন।

৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, মত ধর্ম নয়, সত্যোপলব্ধিই ধর্ম। মতগুলি সত্যকে উপলব্ধি করিবার এক একটি পথ মাত্র। যুগপ্রয়োজনে ঈশ্বরেচ্ছাতেই এসব পথের উদ্ভব। এবারে তিনি আসিয়াছিলেন সমগ্র জগতের লোককে পথ দেখাইবার জন্য। জগৎ জুড়িয়া মানুষ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে যতপ্রকার অবলম্বনের, তত্ত্বের, মতের মাধ্যমে সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছে, তাহার সবগুলিকেই সমর্থিত এবং নিজ সাধনায় সেগুলির যাথার্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। নিজ সাধনাতেই হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্মোক্ত সব তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া তিনি একই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি জোর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা'—যাহার ভাষ্য, 'দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, এমনকি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।' সেখানে আমরা সবাই এক।

৫

সেখানে পৌঁছানোই সব ধর্মের সব সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য, মতগুলি সত্যের আবরণমাত্র, সত্য নয়,—একথাটি যত শীঘ্র আমরা বুঝিতে শিখিব, ধর্মগত, আচারগত, জাতিগত, মানুষে-মানুষে সর্ববিধ ভেদ ততই অপসৃত হইবে। যত আমরা বুঝিতে শিখিব যে বিভিন্ন ধর্ম- বা সম্প্রদায়োক্ত তত্ত্বগুলি একই সত্যের আবরণ মাত্র, বিভিন্ন তত্ত্ব অবলম্বনে আমরা সকলেই একই সত্যলাভে প্রয়াসী, ততই সেই শুভদিনের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হইবে, যেদিন 'একই পরিবারে কেহ খৃষ্টান, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান হইলেও সকলে একত্রে সদ্ভাবে বাস করিবে, যেমন এক ভাই উকীল, এক ভাই ডাক্তার, এক ভাই অধ্যাপক হইলেও একই পরিবারে বাস করিতে তাহাদের আটকায় না।'

শ্রীসারদাষ্টকম্

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীমতঃ রামকৃষ্ণস্য শক্তিরূপা মহেশ্বরী
সারদা জননী পূজ্যা নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
দক্ষিণেশ্বরতীর্থেষু আবির্ভূতা সনাতনী
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
পুত্রাণাং স্নেহদাত্রী যা ব্যামোহানাং বিনাশি
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
প্রণতানাঞ্চ সর্বেষাং সদা কল্যাণকারিণী
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
স্বরূপে পরমা যা হি ব্রহ্মময়ী প্রিয়ঙ্করী
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
ব্রহ্মাত্মিকা পরা বিদ্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
আনন্দদায়িনী যা তু আদিভূতা জগন্ময়ী
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
ভক্তানাঞ্চ সদা সৌম্যা হ্যসৌম্যাশুভকারিণাম্
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

পঠেন্নিত্যং জপেন্নিত্যং স্মরেন্নিত্যমিদং শুভম্
সর্বদুঃখহরং পূতং ভবব্যাধিবিনাশকম্।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
সারগাছী, পোঃ মহুলা, (মুর্শিদাবাদ)
৬. ৪. ৩৬

পরমকল্যাণীয়াসু,—

মা, তোমার পত্রখানি পাইয়াছি। শ্রীহট্ট হইতে পরশু একখানি তুলার আসন আসিয়াছে। উহাই তোমার নির্দেশানুসারে প্রেরিত হইয়া থাকিবে। আমি উহা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।

মা, এই সংসারে সকলকেই ভুলত্রুটির ভিতর দিয়া জীবনের উদ্দেশ্যলাভের জন্য অগ্রসর হইতে হয়। এক-আধবার কোনপ্রকার ভুল করিয়া ফেলিলে তজ্জন্য অনুশোচনা হওয়া ভাল কিন্তু কেবল উহা ভাবিয়া ভাবিয়া কোন ফল হয় না। মনে দৃঢ় সংকল্প করিবে আর যেন কখনো ভুল না কর। মনের দৃঢ়তা না থাকিলে জীবনে উন্নতিলাভ অসম্ভব। ভগবানের নিকট ব্যাকুলভাবে নিয়মিত প্রার্থনা করিবে এবং নিজের কথা অকপটভাবে তাঁহার নিকট নিবেদন করিবে। আন্তরিকভাবে তাঁহাকে জানাইলে তিনি তোমার সব ঠিক করিয়া দিবেন। সরল ও পবিত্র থাকিতে প্রাণপণে যত্ন করিবে। নিষ্ঠার সহিত ভগবানের স্মরণ মনন ও জপ অভ্যাস করিলে ধীরে ধীরে মনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। ভগবান তোমার হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস দিন, ইহা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে।

আমার শরীর একপ্রকার। আশা করি তোমার কুশল। ইতি শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

পুঃ—শ্রীহট্ট হইতে বি. বি. সেন ঐ আসনখানি পাঠাইয়াছে।

আমি চাই সেই বীর্য

'অবধুত চট্টোপাধ্যায়'

দুর্বল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুয়ারে তোমার
আসিনি চাইতে ভিক্ষা হে প্রভু এবার।
জানি যদি এই চিত্তে সে শক্তি না থাকে
নিজের সামর্থ্যে ধ'রে রেখে দিতে তাকে,
তবে সে দানের ভারে বিকলাঙ্গ হ'য়ে
জীবন কাটাতে হবে মৃত্যু ব'য়ে ব'য়ে!
আমি চাই সেই শক্তি, যে শক্তির বলে
স্বর্গকে আনতে পারি ধরণীর তলে
অনায়াসে; সুকঠোর তীব্র তপস্যায়
বজ্রাগ্নির মতো ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ হতে চাই।
গ্রহতারা উপগ্রহ যেন আকর্ষণে
নীরবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে!

আমি চাই সেই বীর্য, হে বীর্যসম্রাট।
যে বীর্যে অসীম তুমি, সমগ্র—বিরাট॥

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ভুবনেশ্বর পোঃ
পুরী জিলা। ২২শে আষাঢ়
(১৯২৬ খৃঃ)

কল্যাণীয়া মায়ী—

তোমার পত্র পাইয়াছি। সমস্ত অবগত হইয়া খুব সন্তুষ্ট ও সুখী হইলাম। ৺পুরী হইতে এখানে আসার পর কয়েকদিন পরে আমার শরীর আবার খারাপ হইয়াছিল গরমের জন্য। আজ ২।৩ দিন বৃষ্টি হইতেছে, এখন বেশ ঠাণ্ডা। অসুখও কম জানিবে। আহারাদি সম্বন্ধে আমিও খুব সাবধানে থাকি। পুরীতে কিছু দিন থাকতে পারলে খুবই ভাল হইত। অন্য লোকের বাড়ীতে অসময়ে আহারাদি করা এখন আর সহ্য হয় না। যখন শরীর ভাল ছিল, তখন সব সহ্য হইত। এখন পুরীতে যদি খুব জানাশুনা লোক পাই সময়ে রান্না করিয়া দেবে, তাহা হইলে থাকা চলে। আমার জন্য এখন কে কষ্ট করে রোজ রোজ পাক করিবে বল। সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। এখন তিনি যেমন রাখিবেন সেই রকম থাকিতে হবে। আমার ইচ্ছাতে সব হয় না। আজকাল রথযাত্রা উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন ২।৩ খানা পুরীতে যায়। অনেক লোক ভুবনেশ্বরে নামে। এক এক বারে হাজার, দেড় হাজার করিয়া নামে। এখন এখানেও অনেক লোক (যাত্রী) আসিয়াছে। মঠে কেহ কেহ আলাপ করিতে, ঠাকুর দর্শনে আসে। বাকি সব লোক ভুবনেশ্বর মন্দিরের দিকে যায়। এখানে এতো যাত্রী আসিয়াছে, বৃষ্টি-ঠাণ্ডায় সকলের থাকার স্থানাভাব, কষ্ট করে যেখানে সেখানে থাকে।

তোমরা সকলে আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে, খুকীমায়ী ও তোমার দিদি তাদের সকলকে জানাইবে। আশা করি সমস্ত কুশল সংবাদ। মুকুলের ইস্কুল খুলেছে ?

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

বহু শত বর্ষ এপার থেকে শ্রীরামচন্দ্রকে যখন দেখি, তখন মনে হয় যেন এক সত্য ও ত্যাগঘন বিগ্রহ দেখছি—বালি, পৌলস্ত্যবধ ইত্যাদি হারিয়ে যায়। লোককল্যাণে অদেয় তাঁর ছিল না কিছুই। সত্যপালনেও তাই-ই। সত্যের জন্য রাজ্যত্যাগ, লক্ষ্মণত্যাগ; লোক-কল্যাণে সীতাত্যাগ, সর্বস্বত্যাগ—শ্রীরাম-চন্দ্রকে সত্য ও ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহ করেছে। 'অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন' —বলেছিলেন রাম—'আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা বলিনি, বলবও না কখনো।' সীতা বলে-ছিলেন রামকে 'মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব'—'মিথ্যাকথা তুমি পূর্বে কখনো বলোনি, রাঘব, ভবিষ্যতেও বলবে না।' এই রাম নরচন্দ্রমা!

শ্রীকৃষ্ণকেও এরূপ সহস্রাধিক বৎসরের এপার থেকে এক মহাসমন্বয়ের প্রতিমূর্তি বলে দেখায়। যুগ যুগ আহিত ভারতীয় ধর্মাদর্শের সমন্বয়াচার্য শ্রীকৃষ্ণ। অনাসক্তিতে পুণ্যে অনলসকর্মে জ্ঞানে এমন এক পুরুষমূর্তি সমগ্র পৃথিবী আর দেখেনি।

এই দুই পুরুষ-প্রবরের ভাবমূর্তিকে ভারত এক আধারে নূতনরূপে দেখতে পেল অতীত-যুগসঞ্চিত মহতী তপস্যার পুণ্যফলে অথবা বিধাতার এমনি সৃষ্টিপরিকল্পনা যে, তিনি পরমকরুণায় উত্তরোত্তর অধিকতর পূর্ণরূপে মানুষকে ধন্য করতে আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। ধন্য এই ভারততীর্থভূমি!

বেদমার্গনিষ্ঠ তপোময় জীবনযাত্রা-পথে চলতে চলতে ঈশ্বরপ্রাপ্তির, নিখিল মোহ-নাশের কত বিভিন্ন মত পথ গড়ে ওঠে! আবার কালক্রমে যখন সকল ভাবের মধ্যে একক অখণ্ড-স্বরূপকে মানুষ ভুলে যেতে বসে — অমনি শ্রীভগবান্ ভাবসাগর মথিত ক'রে অমিয় মধুর মূর্তি ধারণ ক'রে মানুষকে সমন্বয়-বার্তা শোনান।

শ্রীরাম সনাতন ধর্মাদর্শ ত্যাগ ও সত্যকে গৃহস্থজীবনে আচরণ ক'রে দেখালেন। গৃহের অঙ্গিনায়ও এ সত্য পালন সম্ভব। গৃহস্থ জীবন যে এক অখণ্ড সত্যধৃত ত্যাগ সাধনা তা সুচারুরূপে দেখিয়েছেন রামচন্দ্র। পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু পুত্র প্রজা রাজা সকলের প্রতি যে শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত কৃত্য আছে তা যে কতখানি ত্যাগ-নির্ভর, কতখানি সত্যাশ্রিত হ'লে গৃহী মানুষ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে তার বাস্তব আলেখ্য সীতারাম-চরিত্র।

শ্রীরাম থেকে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে কেটে গেছে কত কাল! কত মত, কত দর্শনচিন্তা, ঈশ্বর-সাধনার কত বিচিত্র পদ্ধতি এরই মাঝে উঠেছে পড়েছে—কে তার খবর রাখে? ভক্তি-সাধনার যে বিচিত্র বিকাশ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মাধ্যমে আমরা পাই, তা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনচরিতকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। যদিও রামায়ণ-ব্যাখ্যায় কৌশল্যার আদর্শ বাৎসল্যরতির, লক্ষ্মণে কৈঙ্কর্য, ভরতে ভগবৎপরতন্ত্রতা, হনুমানে দাস্য, বিভীষণে শরণাগতি, সুগ্রীবে সখ্য ও বশিষ্ঠে শান্ত ভাবধারা মূর্ত বলা হ'য়ে থাকে, তথাপি ঐ সকল ব্যাখ্যান শ্রীকৃষ্ণ-পরবর্তী বলেই বিশ্বাস। যদিও

এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, ঐ-সকল ভাবরাশি রামচন্দ্রের কালে একেবারেই ছিল না—অন্ততঃ, আমরা ও-সকলের বহুল আলোচনা ও সাধনার কথা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে ও তৎপরবর্তী কালেই পেয়েছি। বৈষ্ণব ভাব-সাধনা শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক একথা বলা চলে। পরে তা রামচরিতে সংক্রামিত। এ কারণেই বোধকরি, শ্রীকৃষ্ণজীবনকে ঘিরে যে সাধনলীলা ঋষিগণ, বালকসঙ্গীরা, মায়েরা, নন্দ উপানন্দ প্রমুখ পিতৃগণ, গোপিকারা করলেন ভক্তির পঞ্চ অর্ঘ্য সাজিয়ে, তার ইতিবৃত্ত রচিত হ'ল শ্রীমদ্ভাগবতে। শ্রীরাম-জীবনে অমন করে এর প্রকাশ ঘটে না। ভাগবতের অনুকরণে অবশ্য শ্রীরামচরিত-মানসে তুলসীদাস ভক্তিরস-মাধুর্যে শ্রীরামচন্দ্রজীবনেও ঐ সকল ভাব-সাধনাকে স্পষ্টীকৃত করেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণেও প্রথমাবধি রাম যে পূর্ণব্রহ্ম আর সীতা তাঁর মায়াশক্তি, এই তত্ত্বই তুলে ধরা হ'য়েছে—ভাগবতের সে রসমাধুর্য সেখানে নেই। যোগবাশিষ্ঠও মোক্ষশাস্ত্র, অদ্বৈতপর তত্ত্বকথা।

সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মহাবির্ভাবের মধ্যবর্তী কালে সাংখ্য, যোগ, জ্ঞান ও কর্ম ব্যতীত এক নবীন ভক্তিসাধনবাদ গড়ে উঠেছিল, যার বীজমাত্র পাওয়া যায় বেদে। অধিকন্তু 'কর্ম' সম্পর্কে বেদবাহিত যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তাও নানা সংশয়ের সম্মুখীন হ'য়েছিল। 'কর্ম' বলতে তখন সকাম যজ্ঞকে বোঝাত। আর উপনিষদ্ বারে বারে সকাম কর্মীকে 'মূঢ়', 'বালকবুদ্ধি' 'জঘন্যমনাঃ' ব'লে, তা যে নিশ্চিতই পুনরাগমনের পথ সে-কথা বলে সাবধান ক'রে দিয়েছেন। এতৎ সত্ত্বেও অন্ত্যাশ্রমী ভিন্ন কর্ম ত্যাগ করতে বলেন-নি। এই বিরোধের প্রথম সামঞ্জস্যের প্রয়াস ঈশোপনিষদে দেখা যায়। কর্ম সাধনায় উন্নীত হচ্ছে ঐ-কালে। ভাবজগতের এই সংঘাতময়ী যুগসন্ধ্যায় প্রমাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন পাঞ্চজন্য শঙ্খ হাতে। সাংখ্য যোগ ও জ্ঞানের পাশে যুগ-আহিত ভক্তি ও কর্মের স্থান রচনা করে দিলেন। নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ সমশ্রদ্ধায় বৃত হ'ল। এই মহা-সমন্বয়ের পাঞ্চজন্যই বাজালেন শ্রীকৃষ্ণ—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥'

তাই মনে হয়, যাত্রাপথে পায়ে পায়ে যত পথ ওঠে গড়ে, সবার শেষে যে অশেষ এ-কথা বলার জন্যও তিনি আসেন বারে বারে—যে-সে বললে তা প্রমাণ হয় না; তাঁকেই এসে স্বীয় জীবনে তাদের সাধনরূপ দেখিয়ে মানুষকে চিনিয়ে দিতে হয়।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একই আত্মার দুইটি প্রকাশ দুই ভিন্ন কালে। এঁদের পরও কত আবির্ভাব, কত মত গড়ে উঠল—বৌদ্ধ সাধন, তন্ত্র, খৃষ্ট, ইসলাম, আরো কত সাধন। বিভক্ত মানবসভ্যতা নিজ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সীমাতে গড়ে উঠে, অপর ভাবকে বুঝতে না পেরে গোঁড়ামিকে আশ্রয় ক'রে পথ হারাল—যা ছিল মুক্ত উদার পরম-প্রসৃত, তা হ'য়ে পড়ল বদ্ধ, সঙ্কুচিত গোষ্ঠিসম্পদ, জাতীয় চেতনার আকর। মনে হয় যেন ধর্মগুলি একান্তই ভিন্ন, পরস্পরবিরোধী তাদের বক্তব্য। সুযোগ বুঝে বিজ্ঞান-সহায় জড়বাদ নব নব রূপ নিয়ে উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। তাই একালে যেমনি বহির্বিশ্ব পরস্পরসান্নিধ্যে এল দূরত্ব ঘুচিয়ে বিজ্ঞান-বলে, অমনি জাতিগত সভ্যতা আর গোষ্ঠিবদ্ধ কোনও জাতি বিশেষের না থেকে হ'য়ে পড়ল সকলের সাধারণ সম্পত্তি। এ কারণে এ-বারের আবির্ভাবে কেবল

ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে ঐক্যই নয়, বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলিরও সমন্বয়সাধন করবার দরকার হ'ল। বর্তমান কালের আবির্ভাব তাই এত বিশ্বব্যাপক ও বহুমুখী ভাবধারার গোমুখস্বরূপ! এ-কারণে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ এক আধারে শ্রীরামকৃষ্ণ হ'য়ে এলেন।

ধর্মমূলে হ'ল ত্যাগ ও সত্য—তাতে যুগ-প্রভাবিত চেতনার সংযোগ দুইটি প্রতীকে স্থান পেল শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণে। আবির্ভাব তাঁদেরই একটি সজ্ঞান দেহসীমানায়—শ্রীরামকৃষ্ণে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তাই সর্বাঙ্গসুন্দর ও অনন্ত ভাবসাগর-সদৃশ। তাঁর ত্যাগ ও সত্যপ্রাণতার কি তুলনা মেলে? কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের অমন স্বাভাবিক সমুজ্জলতা ইতিহাসে আর মেলে না। কাম-কাঞ্চনই সংসার। সে সংসারের নামগন্ধও রইল না তাঁর জীবনে। সত্যবচনে, সত্যপালনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। মার কাছে প্রার্থনা ক'রে পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম লোকমান্য দেহসুখ সব সমর্পণ করলেন, পারলেন না দিতে সত্য। বললেন, সত্য দিলে সব দেওয়ার সত্য টেকে কই?

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'লেন। ১৬।১৭ বৎসর পর্যন্ত গ্রামে ছিলেন। পাঠশালায় পড়াশুনা খানিক হ'য়েছিল। অঙ্ক পারতেন না, যোগ হ'ত—বিয়োগ হ'ত না। শুভঙ্করী ধাঁধা লাগত। হাতের লেখা সুন্দর ছিল—তাঁর নকল করা পুঁথি এর সাক্ষ্য। সংস্কৃত বললে বুঝতে পারতেন, বলতে পারতেন না। শ্রুতিধর—একবার শুনলে সব মনে থাকত চিরকাল। হোক লৌকিক অপরা বিদ্যায় ইতি—পরা বিদ্যায় তাঁকে আটকায় কে? যাহা হইতে বেদাদি স্বতই উদ্ভূত প্রমাণ তো তিনি; বেদ বেদান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব যখন নিরক্ষরপ্রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ থেকে বেরুত তখন মহামহাপণ্ডিত অবাক হ'য়ে যেতেন ও-সকল গূঢ় তত্ত্বে তাঁর সহজ স্বচ্ছ অধিকার দেখে। শুধু বলা কওয়া নয়—ধর্ম-সত্যগুলি স্বয়ং আচরণ ক'রে দেখালেন, সব সত্য।

দক্ষিণেশ্বরে বারটি বছর কঠোর সাধনা ক'রেছেন। একে একে চৌষট্টিখানি তন্ত্র, বৈষ্ণব ভাবসাধন, যোগ, বেদান্তাদি সাধন সব করেছেন। দর্শন-উপলব্ধির বিরাম ছিল না। অদ্বৈততত্ত্বে লীন হ'য়ে সমাধিস্থ অবস্থায় ছয়মাস কাল ছিলেন—পরে করেছেন ইসলাম ও খৃষ্টীয় তত্ত্বসাধনা। জেনেছেন 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' সরল ভাষায় সে-তত্ত্ব বলেছেন—যত মত তত পথ। নামভেদ, বস্তু এক। শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল মতকে সমন্বিত ক'রে গিয়েছিলেন—তার সাথে যুক্ত হ'ল তন্ত্র, খৃষ্ট, ইসলাম। তন্ত্র ও বেদমতের অমন প্রাঞ্জল মিল ইতিপূর্বে আর কেউই দেখাননি। সকল ধর্মমত এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি লাভ করল—তাঁরই সাধনসঞ্জাত আবিষ্কারে।

নূতন ক'রে ঘোষণা করলেন পরম সত্যকে 'মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরম ব্রহ্ম', 'জীব-শিব', 'নর-নারায়ণ'। 'ঈশ্বরলাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য'।

সকল অবতারকেই সমকালীন জড়সর্বস্ব চেতনার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়; এ-কালে এই বিরুদ্ধ জড়বাদ নানাভাবে মানুষকে ইহসর্বস্ব, ঈশ্বরবিমুখ করেছে। বিজ্ঞান আঠারো শতকে যতদূর অগ্রসর হয়েছিল তাতে জড়বাদ দৃঢ়মূল হ'য়েছিল। এবং সে প্রভাব আজও অব্যাহত। তবু, শ্রীরামকৃষ্ণসাধনা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক জড়বাদের বিরোধী সিদ্ধান্তগুলি

জীবন্ত, জোরালো ও প্রভূত শক্তিশালী করেছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সে-কালের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়গুলি মোটামুটি ভাবে ছিল: (১) জীব ও জগৎ জড়-অণুর পরস্পর মিলনের ফলে আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয়েছে; (২) মানবসভ্যতার মর্মমূলে মানুষের কামপ্রবৃত্তিই কাজ করে; কেউ বা বলেন, অর্থই সভ্যতার নিয়ামক শক্তি; (৩) উপযোগবাদ ও মানবতাবাদ এবং (৪) ধর্ম কুসংস্কার। পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যয়গুলি: (১) জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন; (২) অর্থ ও কাম লোকস্থিতির জন্য প্রয়োজন বটে, তবে তাদের সংযমের দ্বারা সীমিত প্রয়োগেই মানুষের যথার্থ কল্যাণ; অধিকন্তু জীবনের উদ্দেশ্য অর্থ- ও কাম-সেবা নয়—ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য; (৩) লোককল্যাণও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না—বরং সে সেবা মানববুদ্ধিতে না ক'রে নিষ্কামভাবে নারায়ণসেবাবুদ্ধিতে করা—যাতে সেবক মুক্ত হ'তে পারে সংসার-বন্ধন থেকে। কাম ও কাঞ্চনকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'সংসার' বলেছেন এবং তাই-ই মানুষকে বাঁধে। কাম ও কাঞ্চন একেবারে ত্যাগ করা যে সম্ভব এবং সে-ত্যাগে মানুষ যে কত মহান্, কত সুন্দর ও পূর্ণকাম হ'তে পারে তার নজির তিনি স্বয়ং। (৪) ধর্ম সত্য জ্ঞান—ধর্ম সভ্যতার নিয়ামক শক্তি। আঠারো শতকে একই সময়ে পরস্পরবিরোধী সত্যসমূহ পরীক্ষিত হচ্ছিল। জড়বাদের জয়ডঙ্কা যখন পৃথিবীতে নিনাদিত—শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অশ্রুত, অজ্ঞাত। আজ মনে হয়, সভ্যতার যে সঙ্কট-মুহূর্তে যে সত্য নীরবে তিনি মানুষের জন্য মর্ত্যে বহন ক'রে এনেছেন তা মানুষকে অমৃতলোকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

বিজ্ঞান-মূল অর্থ-কামভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ফল আমরা ভোগ করছি। কল্যাণরাষ্ট্র—সভ্যতার ক্রান্তিপথে এক অত্যুজ্জ্বল আবিষ্কার মানুষকে দিয়েছে নানা যান্ত্রিক ভোগ্য উপকরণ, কেড়ে নিয়েছে তার আত্মাকে। ধর্মহীন যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, তা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-বেদকে অবলম্বন ক'রে এবার ঘোষণা করার কাল এসেছে—সভ্যতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষা, দীক্ষা সবই ব্যর্থ হবে, যদি না তা ঈশ্বরকেন্দ্রিক হয়। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে' জগৎ-রঙ্গমঞ্চে নামতে হবে—তবেই পূর্ণ হয়ে উঠবে সব। 'জীব-শিব', 'নর-নারায়ণ', 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' তবেই পরোপকার সার্থক। 'ঈশ্বর-লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য'—অর্থ নয়, কাম নয়, কর্ম নয়। স্বামীজীর অনুসরণে বলা যায়—যদি ঈশ্বর সত্য না হয়, তবে কি হবে এই সভ্যতায়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে?—এই জীবন-যাত্রার অর্থই বা কি? আর যদি ঈশ্বর সত্য হন তবে, যে বিদ্যা সভ্যতা সমাজ ও রাষ্ট্র সে পরম মঙ্গলময়কে লাভ করতে সাহায্য করে না, কি হবে সে-বিদ্যায় ও সভ্যতায়, সমাজে ও রাষ্ট্রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ-চেতনা তাই আগামী কালের মানবসভ্যতার অনন্য অবলম্বন। জীবনকে সর্বাবস্থায় কিভাবে ঈশ্বরময় করে রাখা যায় তা নানা উপদেশের মাধ্যমে কেবল যে বলে গেলেন তা নয়—জীবন্ত আদর্শ এক জীবন-বিগ্রহ রেখে গেলেন পশ্চাতে; শ্রীশ্রীমা সে বিগ্রহমূর্তি। ঈশ্বর-সাধনাকে পর্বতে কন্দরে সরিয়ে না দিয়ে ঘরের মধ্যে টেনে আনলেন। বলেছেন: 'ব্যাকুল হও' ...'এক বই ত দুই নাই; যে যা বলে, যদি আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর কাছে নিশ্চয়

পহঁছিবে। ব্যাকুলতা থাকলেই হ'ল।' 'এত তীর্থ এত জপ করছে, তবু হয় না কেন? ব্যাকুলতা নাই।'—এই সরলতা অকপটতা তিনি ফিরিয়ে এনেছেন বিচিত্র বহিরঙ্গ সভ্যতার কৃত্রিম জীবনযাত্রার মধ্যে।

এই মহা আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের ভাষ্যকার স্বামীজী। সমগ্র বিশ্বে এই ভাবধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন। আহ্বান করেছেন জগতের মনীষীদের মহাসমন্বয়ের জন্য তৈরী হ'তে -- সমন্বয়ধর্মসাধনায়; জীবনের ক্ষেত্রে হৃদয় মস্তিষ্ক ও হস্তের; সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাববন্ধনে।

ধর্ম-সত্য থেকেই উৎসারিত হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্য—সভ্যতা তাতেই রূপ পায়। নীতিবোধের উৎসও গভীর ধর্মবোধ। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—জীব ঈশ্বরের অংশ, সন্তান, এ ধর্ম-সত্য। সমাজক্ষেত্রে মানুষ পরস্পর ভাই ভাই, এই রূপ নেয়। সৌভ্রাতৃত্বের চেতনায় মানুষ এগিয়ে এল পারস্পরিক সহযোগিতায়—এরই একটি প্রকাশ মানবতাবাদ। তেমনি 'যত মত তত পথ' কেবল ধর্ম-সত্য হ'য়েই থাকবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নানামত অভীষ্টলাভে নানাপথরূপে স্বীকৃত হবে ও হচ্ছে। কেবল যে-কোন পথেই অকপট হ'তে হবে। 'মন-মুখ এক' করার প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রেই।

ত্যাগ, সত্য ও সমন্বয়—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে মহা আবির্ভাব সূচিত করছে। আজকের মত-পথে দ্বন্দ্বে বিভিন্ন মানবসভ্যতা শ্রীরামকৃষ্ণচরণতলেই সার্থক সামঞ্জস্য ও শান্তি পেতে পারে।

সর্বভূতে

শ্রীপ্রীতীশ মিত্র

সর্বভূতে ভগবান,
এই তত্ত্ব কর ধ্যান
তিনি ছাড়া নাহি কিছু আর;
যে তোমারে দুঃখ দেয়,
সে-ই কোলে টেনে নেয়,
প্রেমভরে কাছে এসে
লয় সেবাভার।

এই বিশ্বচরাচর,
পাপী, তাপী, আপামর,
সবই তিনি, সবে নিরন্তর
প্রাণভরে ভালবাসো,
হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ নাশো,
পাইবে বিমল শান্তি,
ক্লান্তি হবে দূর।*

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথিকা অনুসরণে

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

'স্মৃতিকথা' লেখা হইতেছে—আলমবাজার মঠে ভূতের কথা লেখানোর পর বাবা (স্বামী অখণ্ডানন্দজী) বলিতেছেন : "ভূত আছে কিনা—দেখিনি বলে মানতাম না। ঠাকুরকে 'ভূত নেই' বলায় তিনি বললেন, 'সে কিরে, আমি যে দেখেছি—আমি যেতে কষ্টে ছট্‌ফট্ করছিল, সেখান থেকে চলে এলুম, তবে বাঁচল।' এখানে মাঝে মাঝে দেখি - বিশেষতঃ আজকাল--অশরীরী ছায়া, ভৈরব-টৈরব হবে।"

সন্ধ্যার পর ঘরে খাটে শুইয়া 'স্মৃতিকথা' লেখাইতে লেখাইতে বাবা বলিতেছেন, "মঠে একদিন শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দজী) সঙ্গে কথা - আমাদের জীবন যেন মনে হয়েছিল ঠাকুরের সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর শুরু হ'ল সাধন-ভজন—গুরুভাইরা মিলে কখনও বরানগরে, কখনও পাহাড় নির্জনে তীর্থে তীর্থে। তারপর স্বামীজীকে ঘিরে—মঠ মিশন এইসব। স্বামীজীর সঙ্গে সত্যি মনে হয়েছিল—এবার বুঝি শেষ হয়েছে। শরৎ মহারাজ বললেন—সত্যি আমদের জীবন তাঁদের সঙ্গেই চলে গেছে। এসব যেন বাইরের ; ভেতরের কথা—তাঁরা ; ঠাকুরের কথা, স্বামীজীর কথা, সাধন-ভজনের কথা, এই সব যতই 'জাবর কাটা' যায় ততই ভাল, ততই আনন্দ।

"তাইতো এসব কথা লেখাবার ঝোঁক। অনবরত তাঁদের কথা স্মরণ হচ্ছে, মনে হচ্ছে—এইতো একমাত্র সুখ। শুয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত নেই, ভাবছি কি লেখাব, কার পর কোন্‌টা, সব মনে পড়ছে না কেন? অনেক কিছু মনে এসে সব তালগোল পাকিয়ে যায়, সবকথা প্রকাশ করা হয় না, বলা যায় তো লেখা যায় না।

"স্বামীজী বলেছিলেন, 'যখন পূর্বকথা ভাবতে চেষ্টা করি, দেখি যেন ফিলম্ চলেছে—কত দৃশ্য, কত ঘটনা! যা দেখেছি, যা দেখিনি—এমন কত যা হয়তো কখন দেখব না!' শশী মহারাজ বলেছিলেন, 'কি রকম হয় জানো?—যেন ফুটফুট ক'রে ফুল ফুটছে, ফুট ফুট ফুট। আবার কি রকম হয় শুনবে?…'

"ওদিকে (পশ্চিমে) একটা পাথর আছে,—বলে, তার ওপর শুলে পূর্বস্মৃতি সব জেগে ওঠে। আমার কিন্তু বাপু কিছু হ'ল না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে শুয়ে রইলুম। কি বা হবে জেনে? সব স্মৃতি গিয়ে তো ঠেকবে সেই মায়ের জঠরে - হাত পা গুটিয়ে…। ঐভাবেই তো জন্মেছি সব। আমার তো আর ইচ্ছে করে না। কি রে, তোদের আর ইচ্ছে করে জন্মাতে? এঃ!" উঠিয়া বসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন ও মনে মনে কি যেন প্রার্থনা করিলেন।

* * *

রেঙ্গুন থেকে এক ছোকরা আসিয়াছে দীক্ষার জন্য—ফুল চন্দন সাজাইয়া প্রস্তুত। এতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিল, একবার এদিকে দেখিতে আসিয়াছে। কামাইতে কামাইতে বাবা বলিলেন, "বেলা হয়ে গেছে। ওহে, আজ আত্মপূজা করগে। ঐ সব ফুল ফল দিয়ে নিজের পুজো করগে—'আত্মনে নমঃ।' আত্ম-

বিশ্বাস, আত্মশ্রদ্ধা আগে চাই—তবে তো হবে। ঠাকুর বলতেন, 'যার যে ইষ্ট, তার সে আত্মা।' তা হ'লে আত্মপূজা হ'লেই তো হ'ল। বুঝলে? ফুল-চন্দন দিয়ে নিজের পূজো কর, আর ফল মিষ্টিগুলো টপাটপ নিয়ে খেয়ে ফেল। হাঃ হাঃ, কেমন মনের মতো বিধান হ'ল? আজ 'আত্মপূজা', কাল দীক্ষা হবে। কেমন? সত্যি এবার থেকে এরকম নিয়ম ক'রে দিলে হয়—দীক্ষার আগের দিন 'আত্মপূজা' করতে হবে। কেমন মজা!. আমাদের সব নতুন নতুন, পুরানো একঘেয়ে ভাল লাগে না।"

ছেলেমানুষের মতো সরল হাসিতে ঘর ভরিয়া গেল। নিজের রহস্য-রসিকতায় নিজেই আত্মহারা! পরে খোঁজ করিতে বলিলেন—"আরে দেখ—সত্যি সত্যি তাই করলে নাকি। সব টপাটপ? খুব সরল তো?"

* * *

রেঙ্গুনের ভক্তটিকে বাবা বলিলেন, "পাপি খাও? খাওনা আবার, খুব খাও। কোথা থেকে ম্যাঙ্গোস্টিন এনেছ - কেন যে ও খায় তা তো বুঝি না। মিষ্টি আনতে পারনি? কিছু জানো না। ঠাকুরের স্থানে আসছ—মিষ্টি হাতে আসতে হয়। ঠাকুরের জন্যেই বলছি। আমি তো মিষ্টি খাই না। এখন থাক্, এখান থেকে গিয়ে মঠে (বেলুড় মঠে) যাবে—ভাল মিষ্টি কিছু নিয়ে ঠাকুরদর্শনে যেও বুঝলে?"

ঐ ভক্তটি একদিন সারারাত বাবাকে বাতাস করিয়াছে, অপরের পালা আসা সত্ত্বেও তাহাকে দেয় নাই। ভোরবেলা বাবার শীত করিতেছে, তবুও সে থামে নাই। সকালে বাবা বলিতেছেন, "আরে, ওর এখন নব অনুরাগ। সারারাত বাতাস করে, বললেও থামে না। করুক দু-দিন, তারপর তোমরা তো আছই।"

* * *

বাবা বলিতেছেন, "পয়সার সঙ্গে ১৪ বৎসর সংস্রব ছিল না। পাহাড়ে বনে পথে যদি একটা টাকা থাকত তাহ'লে আর ফিরতে হ'ত না। কিছু ছিল না, তাতেই লাঠির ওপর লাঠি মেরে আধমারা করেছিল। থাকলে যা হ'ত বুঝতেই পারছ। স্বামীজীকে খোঁজার অবস্থায় (কচ্ছদেশে) নারায়ণ সরোবরের পথে ডাকাতের হাতে পড়ি। শেষে যখন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা, তিনি সব শুনে—বিশেষতঃ সঙ্গে পয়সাকড়ি ছিল না শুনে বললেন, 'এই জন্যেই তো তোকে এত ভালবাসি।'

"এখন যখন ঠাকুরের কাজ, একটি পাই পয়সারও হিসাব রাখতে হবে, এ publio money (জনসাধারণের অর্থ)। সাধুদের হাতেই যখন এসব কাজ এসে পড়েছে, তখন দেখাতে হবে কাকে অনাসক্ত কর্ম বলে। একটি পয়সা দাম কমাবার জন্য কত বকাবকি করি। যা বললে—অমনি পকেট থেকে দিয়ে দিলে! কেন যে বকি তা কি ক'রে বুঝবে? ঠাকুর যখন সংসার পাতিয়েছেন, তখন সংসারীরা এখানে এসে শিখে যাবে—কি ক'রে সংসার করতে হয়।

"যখন ভ্রমণ করেছি, ইচ্ছে ক'রে বিপদের পথে গেছি। শক্ত পথে, কেন জানো? মনে মনে যখনই সন্দেহ আসত (ঠাকুর সহায় আছেন কিনা) তখনই তাঁকে ঐরকম ক'রে পরীক্ষা করতুম, যেন চ্যালেঞ্জ করতুম। প্রতিবারই তিনি হাসতে হাসতে জয়ী হয়েছেন।

"পাহাড়ে এক গ্রামে—প্রথমে এক ঘরে

আশ্রয় নিই, গৃহস্থবাড়ী। গরু বাছুর সব এক ঘরে। সন্ধ্যার পর বাঘ ডাকতে লাগল—সব ভয়ে কাঁপছে আমি ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম—কী, আমি সন্ন্যাসী। আমার প্রাণের ভয়! বাইরে একটা গাছের তলায় রাত কেটে গেল!"

* * *

বাবা বলিতেছেন: "এক সময় ভাব ভক্তি ভাল লাগত না—অদ্বৈততত্ত্ব ভাবছি। হঠাৎ দেখলাম দক্ষিণেশ্বরের ঘরে ঠাকুর যশোদা ও গোপালের দিকে তাকিয়ে ভাবস্থ, অপলক। গদগদভাবে আমায় ডেকে বলছেন—'দেখ্ দেখ্ কি ভাব!' দেখলাম গোপাল হামা দিয়ে পালাচ্ছে, আর যশোদা ননী হাতে পিছু পিছু যাচ্ছেন আর ডাকছেন, দেখতে দেখতে ঠাকুর তন্ময়, আর অস্ফুট স্বরে এক একবার বলছেন, 'দেখ্ দেখি কি ভাব!'

"হিমালয় দেখেছিলাম হরগৌরীর লীলাভূমি —শিব ও শক্তি, শিবশক্তি। শত শত পাহাড়-চূড়া—যেন শত শত অনাদি লিঙ্গ! ধ্যানমগ্ন শিবমূর্তি! আদি লীলাস্থল! ঐখানেই তো গৌরীর তপস্যা, ঐখানেই তো সব।"

* * *

বাবা বলিতেছেন, "সোজা হয়ে বসতে হয় —এমনি 'সমং কায়শিরোগ্রীবম্'। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসতে নেই, ঝুঁকে বসতে নেই। যারা ব্রহ্মচারী তারা কখন ব্যাঁকা হয়ে বসতে পারে না, মেরুদণ্ড সোজা। দেখনা, কি ভাবে বসি? পা নাচাতে নেই, হাত পা কিছু নড়বে না। গুরুজনের সামনে স্থির বিনীত।"

আশ্রমের কয়েকটি ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বলিতেছেন, "পগ্‌গ বেঁধে সব জানান দিয়ে এসে বসে—সন্ধ্যাবেলা নড়ে চড়ে কাশে, জানায় যে আমরা এসেছি, আমরা আছি, এই বছর ব্রহ্মচর্য দিতে হবে! আরে বাপু, ব্রহ্মচর্য আবার দেবে কি? দু-ঘণ্টা স্থির হয়ে একাসনে থাক্ দেখি, তাহ'লে ব্রহ্মচর্য আপনি হবে। যারা ব্রহ্মচর্য রাখতে চায়, তারা রাত্রে কম খাবে, দুধ স্পর্শ করবে না।

"আমাদের কথা আলাদা, আমরা কি মানুষ? শুধু চা খেয়ে, গাছের শেকড় খেয়ে কতদিন কাটিয়েছি, কখন হয়তো শুধু গম জুটেছে। এইখানেই তো ৫ মাস শুধু শাক খেয়ে কাটিয়েছি। গায়ের শির বেরিয়ে গেল—নীল মূর্তি। ডাক্তার বললেন 'আর বেশী দিন এরকম করলে eruption (ফোস্কা) বেরুবে, গা দিয়ে পুঁজ বেরুবে। আপনি তো কষ্ট পাবেনই, অপরেও কষ্ট পাবে।' শেষে তখন ভাত খাওয়া হ'ল।'—'আনন্দে চোখের জলে ভাত বেঁধে খাওয়ালে। তখন দুর্ভিক্ষ অনেক কমে গেছে—ধান হয়েছে। তারপর থেকেই এই পেটের গোলমাল, কিছুই ভাল হজম হয় না।"

* * *

সন্ধ্যাবেলা। ব'কে ক্যাম্পখাটে বসিয়া বাবা একজন ভক্তকে বলিতেছেন: "আহা! তোমার দুঃখের কথা আর বোলো না। কি করি, কাকে বলি (একটা উপায় ক'রে দিতে)। ঠাকুর, ঠাকুর!

"দেখ, কখনো দমে যাবে না—শত দুঃখেও কখনো সুখের প্রার্থনা করবে না। তিনি ঘা সইয়ে সইয়ে নিয়ে যান। তুলসীদাসের একটি দোঁহা অতি দুঃখের সময় দিনরাত মনে মনে বলতুম—'সুখমে বাজ পড়ু দুঃখ রহ সঙ্গ।' সুখ তাঁকে ভুলিয়ে দেয়, দুঃখ কেবলি তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয়।"

আর একদিন আর একটি ছোকরা ভক্তকে তার কথার উত্তরে বাবা বলিতেছেন, "হ্যাঁ,

এই বয়স; এখন কাম-ক্রোধের তাড়না তো হবেই; আর এর পারে যেতেও হবেই। যেখানেই থাকিস, আর যেখানেই থাকি—জানাবি। বুঝলি? সব কেটে যাবে; তাই যদি না যাবে, তবে এ সবের মানে কি?"

অন্য এক সময় আপন মনেই বাবা বলিতেছেন, (দূরে কাছে লোক আছে) "যাদের লোক-দেখানো ভক্তি তাদের টেকে না, ঐ লোকের দেখাদেখি বা লোকের ভয়ে চলে যায়। প্রথমটা খুব ঢলাঢলি—'বাবা, বাবা', শেষে চুপ; ডাকলেও আর সাড়া নেই। ও ভাল না, যা রয় সয়, বেশি দেখিয়ে কি লাভ? কার কিরকম ভক্তি সে তো দেখলেই বুঝতে পারি!"

জনৈক ভক্ত চিঠিতে প্রশ্ন করিয়াছে—'গুরু-মূর্তি আগে ধ্যান ক'রব, কি ইষ্টমূর্তি আগে? কোথায় ধ্যান করব?'

বাবা বলিলেন, "লিখে দাও—ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট, এর আবার আগে পরে কি? হৃদয়ে ধ্যানই প্রশস্ত—যেন তাঁকে দেখছি এই সামনাসামনি। আবার যেন হৃদয়-মন্দিরে তিনি রয়েছেন—আমি এসে দেখছি। যাদের ইচ্ছে, তারা দীক্ষাগুরুকেও প্রথম ভেবে নিতে পারে, যদি চিন্তার সুবিধা হয়; ওর কিছু নিয়ম নেই। তাঁর চিন্তাই দরকার।"

ব্রহ্মকুণ্ডে

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

ব্রহ্মকুণ্ডে বসে হেরি দৃশ্য মনোলোভা!
পূত গঙ্গা বহিতেছে বিস্তারিয়া শোভা
গাহিয়া অশ্রুতপূর্ব স্বর্গীয় সঙ্গীত!
প্রকৃতির লীলাভূমি অতি সুললিত।
খরস্রোতা গীতময়ী নিয়ত চঞ্চলা
সদা রঙ্গে কত মীন করে সেথা খেলা।
কত শত লোক আসে কত আর্তি নিয়া
মুক্তি লভে গঙ্গা-পদে সব সমর্পিয়া।

গঙ্গে, তব স্নিগ্ধ বায়ু জুড়াল এ দেহ!
তোমার করুণাস্পর্শে কি যে প্রীতি স্নেহ,
কি অসীম স্নিগ্ধ শান্তি! তব খর বেগ
মনোমাঝে জমেছিল যত কালো মেঘ
করিল নিঃশেষ সব। হিমাচলকন্যা,
জগৎপালিনী মাগো, তুমি চিরধন্যা!

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

"Wisdom, knowledge, wealth, men, strength, prowess, and whatever else nature provides us with, are only for diffusion…"

—Swami Vivekananda

Government over self is the truest Swaraj ; it is synonymous with Moksha or salvation." —Mahatma Gandhi

অধিকার ও কর্তব্য :

অধিকার ও কর্তব্য যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত এ-কথা ভারতীয় সমাজ- ও রাষ্ট্র-দার্শনিকরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁরা অধিকারের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেননি। তবে যেখানেই অধিকারের ব্যবস্থা করেছেন, সেখানেই দেখেছেন তা যেন সাম্যভিত্তিক হয়। উদাহরণস্বরূপ নারীর সমানাধিকারের উল্লেখ করা যেতে পারে। সায়নাচার্যের ভাষ্য অনুসারে ঋগ্বেদের যুগে সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য করা হ'ত না। মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এসে অবশ্য দেখা যায় যে, নারীর সমানাধিকার অনেকটা হরণ করা হয়েছে।[১] কিন্তু এখানেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়নি—নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কবি-দার্শনিকরা ছাড়েননি। সোমদেব তাঁর কথাসরিৎসাগরের নায়িকা রত্নাবতীর (রত্নপ্রভা নামেও পরিচিত) মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, নারীর সমানাধিকার-হরণ ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষের নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ।[২]

সাধারণের অধিকারের উপর প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন যে গুরুত্ব আরোপ করেছিল তা হলো 'বিরোধিতার অধিকার' (right of resistance)। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরোধিতাকে নৈতিক অধিকার ও নৈতিক কর্তব্য—উভয়ই বলে দাবি করেছেন।[৩] এই অধিকারের সমর্থন মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র এবং মহাভারতেও পাওয়া যায়। মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে, "ধর্ম হতে বিচ্যুত হলে বন্ধুবর্গ সহিত রাজাও দণ্ডদ্বারা হত হয়েন।"[৪] এবং মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত নিতে গেলে ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত ভীষ্মের উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে : 'যিনি প্রজারক্ষার অশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না, সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।'[৫] আবার বর্তমানে অধিকারসমূহকে 'বিভিন্ন স্বাধীনতা' (different liberties)—এই আখ্যাও দেওয়া হয়।

১ Radhakrishnan Hindu View of Life

২ কথাসরিৎসাগরের রচনাকাল নিয়ে মতবিরোধ আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে ধরে নিয়েও পণ্ডিতগণ বলেন যে, গল্প ও সংলাপ বহু পূর্বেকার।

৩ Kamala Lectures, II

৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় : সামাজিক প্রবন্ধ এবং মনু, ৭।১১১

৫ উদ্বোধন : ফাল্গুন সংখ্যা (১৩৭৮ ৮৭ পৃষ্ঠা

স্বাধীনতাই যে সুখ এবং পরাধীনতাই যে দুঃখ মনুসংহিতাতে এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।[৬] সুতরাং ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন অধিকারের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে—এই রকম ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল।[৭]

তবে প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে অধিকারের চেয়ে কর্তব্যই যে মৌলিকতর রাজনৈতিক আদর্শ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণে বর্তমানে আমরা যে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করে থাকি তা আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি।[৮]

এর অবশ্য আরও দুটো কারণ আছে। প্রথমতঃ, উল্লিখিত অধিকার সাম্যভিত্তিক করলেও, ভূ-পৃষ্ঠ যে সমতল—অর্থাৎ সব মানুষই যে সর্ববিষয়ে সমান—ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ তা কখনও স্বীকার করেননি। ফলে সবাই শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করবে—এই রকম কোন তত্ত্বও পরিস্ফুট হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন গ্রীকের মতো প্রাচীন ভারত সমাজ ও রাষ্ট্রকে কখনও অভিন্ন বলে গণ্য করেনি; বরং এই দুই সংস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সকল সময়ই সচেতন ছিল।

সমাজ ও রাষ্ট্র :

ভারতীয় সমাজ ছিল 'অন্তঃশাসনে শাসিত'। সুতরাং রাজশক্তি এক হাত থেকে অন্য হাতে গেলেই সমাজের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজে' (বাংলা ১৩১১ সাল বা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন, "আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমনভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই।" তাঁর বক্তব্য হলো রাজা যেমন করতেন রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা, অন্যদিকে সমাজ তেমন করত জলসেচের ব্যবস্থা। জলসেচের জন্য সমাজ রাজশক্তির মুখাপেক্ষী ছিল না বলে যুদ্ধের সময় জলসেচ-ব্যবস্থার কোন ব্যাঘাত ঘটত না। "রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই· কিন্তু আমাদের মর্মররামায়ণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁটালের বনচ্ছায়ে দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে···। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।"

রাজা তাঁর রাজধর্ম পালন করবেন আর প্রজারা আনুগত্য, করপ্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে যে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে যাবে এবং 'সমাজ' তার কর্মে নিযুক্ত থাকবে - এই কর্মবিভাগের মধ্যেই প্রাচীন ভারত 'স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের' (liberty and authority) সমন্বয়ের মূলসূত্রটি খুঁজে পেয়েছিল; রুশোর মত 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার' (general will of the community) কল্পনা করার প্রয়োজন ভারতীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকদের হয়নি। অবশ্য

---

৬ সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বং আত্মবশং সুখম্। মনু, ৪।১৬০

৭ N. Bandopadhyay : Development of Hinbu Polity and Political Theories. অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে, সংরক্ষণের অধিকার সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি কয়েকটি অধিকার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—সকলেরই ছিল।

৮ Ibid

একথা সত্য যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, রাজধর্মের অনুশাসন ইত্যাদি কারণে প্রাচীন ভারতে রাজক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র-দর্শনের দিক দিয়ে রাজাকে কখনও স্বৈরাচারী হিসাবে দেখা হয়নি। ধর্মশাসিত রাজা তাঁর রাজধর্ম যথোপযুক্তভাবে পালন করবেন—এই নির্দেশ ভারতীয় রাষ্ট্র-দর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়।[৯] ফলে রাজ-কর্তৃত্বকে ব্যাপকতম করতে ভারতীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকরা মোটেই কুণ্ঠিত হননি। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র।" কৌটিল্যও বলেছেন যে রাজাই রাজ্য।[১০] সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর উক্তি পূর্ণ স্বৈরাচারিতারই দ্যোতক, আর কৌটিল্যের উক্তি রাজ্য-মধ্যে রাজার গুরুত্বনির্দেশক মাত্র।

জৈব মতবাদ :

কৌটিল্য প্রভৃতি রাজাকে রাজ্য বলে অভিহিত করলেও রাজ্য বা রাষ্ট্রের[১১] অন্যান্য অঙ্গের (organs) উল্লেখ ভারতীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকগণ করেছেন। মোটামুটি সাতটি অঙ্গের উল্লেখই করা হয়েছে: (১) নৃপতি, (২) মন্ত্রি-পরিষদ, (৩) অমাত্য, (৪) জনপদ, (৫) কোষাগার, (৬) মিত্র এবং (৭) শক্তি (সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক মর্যাদা)।[১২] এগুলো অঙ্গ বলে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত। নৃপতি অবশ্য মূল অঙ্গ বা মস্তিষ্ক। তবে প্রাণীর মস্তিষ্কটিই যেমন প্রাণী নয়, রাজাও তেমনি রাজ্য বা রাষ্ট্র নন। অতএব, রাজাকেই রাজ্য বলে কোন কোন স্থানে ঘোষণা করা হলেও তা অস্বীকারও করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের এবং ঐ সব অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব নির্দেশ করে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকগণ ব্লুনট্স্লি (Bluntschle) এবং হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) মত আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের পূর্বসূরীর কাজই করেছেন।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অংশীদারী শাসন-ব্যবস্থা :

রাষ্ট্রের অঙ্গবিশ্লেষণে যে মন্ত্রি-পরিষদের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে প্রাধান্য ছিল ব্রাহ্মণের। অবশ্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রিপরিষদভুক্ত নাও হতে পারতেন। তবে রামায়ণের যুগ থেকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করে তবেই রাজকার্যে গুরুতর সিদ্ধান্তগ্রহণের নীতি প্রচলিত ছিল। জৈব মতবাদের আর একটি দিকই ছিল এই ব্যবস্থার ভিত্তি—নৃপতি ও ব্রাহ্মণকে পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে করা হত।[১৩] অবশ্য ত্যাগ ও মননশীলতার প্রতীক ব্রাহ্মণকে রাজার উর্ধ্বেই স্থান দেওয়া হত।[১৪] মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, ব্রাহ্মণকে বৃহস্পতির সঙ্গে এবং নৃপতিকে ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হত। ব্রাহ্মণের কাজ ছিল দণ্ডনীতির ব্যাখ্যা করা এবং ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য

---

৯ মহাভারত: শান্তিপর্ব, ৫৯।১২৫

১০ রাজা রাজ্যমিতি প্রকৃতিসংক্ষেপ: —অর্থশাস্ত্র ৮.২

১১ ঋগ্বেদ থেকে সুরু করে রাষ্ট্র শব্দটি সুপ্রচলিত ছিল

১২ রাষ্ট্রের অঙ্গনির্দেশে মনু, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কিছুটা প্রকারভেদ দেখা যায়।

১৩ Edmund Hopkins: Ruling Caste in Ancient India

১৪ Coomarswamy: Spiritual Authority and Temporal Power

করা। অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণের মাধ্যমেই রাজা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব লাভ করতেন—যে সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রতীক হ'লো শ্বেতচ্ছত্র।

তাই বলে কিন্তু প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ধর্মীয় রূপ (theocracy) গ্রহণ করেনি। ক্ষত্রিয় রাজাই ছিলেন শাসক, রাজ্যশাসনকার্যে তিনি কেবল ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবলের ওপর নির্ভর করতেন। অনুগীতাতে বলা হয়েছে, "রাজা পুণ্যার্থী এবং ব্রাহ্মণ সেই পুণ্যপথের প্রদর্শক মাত্র।"[১৪]

বর্ণকর্তৃত্ব :

বর্ণ বা জাতি (the caste) প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-দর্শনের অন্যতম মৌলিক ধারণা। ধারণাটি অবশ্য 'ধর্মের' সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বর্ণভেদের ভিত্তিতেই ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ওপর চারি বর্ণকে তার যথাযথ কর্তব্যসম্পাদনের, তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়।[১৫] সুতরাং বর্ণ বা জাতি চারটি পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। স্বামী বিবেকানন্দ এই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাকে 'সমাজতান্ত্রিক—সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক' ('socialistic, completely socialistic') বলে অভিহিত করেছেন।[১৬] এতে আবার প্লেটোর Republic-এ সমাজ-দেহে ন্যায়-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়।

বর্ণাশ্রমব্যবস্থা অবশ্য চিরস্থায়ী নয়—অর্থাৎ চিরকালই যে ক্ষত্রিয় শাসন করবে, ব্রাহ্মণ বিদ্যাচর্চায় ব্যস্ত থাকবেন, বৈশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবে এবং শূদ্র অন্যান্য বর্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকবে, এমন কোন কথা নেই। ব্রাহ্মণের যদি অধঃপতন ঘটে তবে শক্তির কেন্দ্র থেকে ব্রাহ্মণকে সরে থাকতে হবে; ক্ষত্রিয় 'ধর্মচ্যুত' হলে তাকে সিংহাসন হারাতে হবে। ক্ষত্রিয়ের অধঃপতন হলে বৈশ্য এবং বৈশ্যের পতন ঘটলে শূদ্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরে আবার শূদ্রকে সরিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জোট ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারে।

একে বলা হয় বর্ণকল্পতত্ত্ব (the cycle of caste)। মহাভারতের হরিবংশে এর প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, এবং একে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এর আধুনিক রূপ দান করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' নামক রাষ্ট্রদর্শনমূলক নিবন্ধে। সত্য-দ্রষ্টা স্বামীজী তাঁর তত্ত্বের ভিত্তিতে শূদ্র বা সর্বহারা শ্রমিকদের (proletariat) অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে।[১৭] ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জোটের ক্ষমতা সম্বন্ধেও তাঁর যে মন্তব্য, আধুনিক সমাজবাদী দেশগুলিতেও তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে দেখা যায়। বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, এই সকল দেশের কোনটিতেই বিপ্লব সমাপ্ত হয়ে সমভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি সুতরাং বিপ্লব প্রতিক্ষেত্রেই হলো অসমাপ্ত (unfinished)।

শ্রেণীস্বার্থ-সমন্বয় :

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত। বর্ণশাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করলেও অন্যান্য বর্ণ বা শ্রেণীর শোষণ বা

১৪ Aiyangar : Rajadharmakanda

১৬ An Unpublisied Lecture : Centenary Commemoration Volume

১৭ Reminiscences of Swami Vivekananda by his Eastern and Western admirers

নিষ্পেষণের কথা ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে নেই। শুধু রাজার কথা নয়, ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র যে বর্ণই ক্ষমতাসনে অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, সেই বর্ণ যে নিজের শ্রেণীস্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে—একথা ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন মোটেই স্বীকার করে না। বরং বলে যে, ঐভাবে আদর্শভ্রষ্ট হলে ক্ষমতাসন হতে সে অপসারিত হবে। এইভাবে শ্রেণীস্বার্থ এবং শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্তে 'সমন্বয়ের' আদর্শই হলো ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা।

প্রকৃত স্বাধীনতা :

রাষ্ট্রদর্শনের মাধ্যমে প্রাচীন ভারত প্রকৃত স্বাধীনতার (true freedom) পথ খুঁজেছিল। কেনেথ সণ্ডার্স বলেছেন, ভারতীয় ধর্ম শিল্পকলা ও দর্শনের মূল তত্ত্ব অনুধাবন করতে হলে বহুর মধ্যে ও পশ্চাতে একের সন্ধানের (search for the One behind and in the many) তাৎপর্য খুঁজতে হবে।[১৮] অনুরূপভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের প্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে প্রাচীন ভারতীয়দের প্রকৃত স্বাধীনতার অভিযানের সঙ্গী হতে হবে। এই প্রকৃত স্বাধীনতা হলো সমাজবদ্ধ জীবনে ধর্ম, অর্থ ও কামের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি সম্ভব করা।[১৯] এই সমন্বয়ের পথে চূড়ান্ত লক্ষ্য মোক্ষও লাভ করা সম্ভব বলে হিন্দু রাষ্ট্র-দার্শনিকরা মনে করতেন।[২০]

এই কারণে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কখনও চূড়ান্ত বলে মনে করেননি, এবং ফলে এর ওপর কখনও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে : "আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বর্তমান দিনে যারা স্বাধীন বলে অভিহিত তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়; তারা শক্তিমান মাত্র (We must never forget in the present day that those people who have got their political freedom are not necessarily free, they are merely powerful)"[২১]

'প্রকৃত স্বাধীনতা'র আর একটি দিক হলো নিজস্ব সম্প্রসারণ-পদ্ধতি ('one's own law of growth')। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকেই নিজস্ব ব্যক্তিত্বস্ফুরণের বা সম্প্রসারণের ধারা বেয়ে চলতে হবে; নতুবা অনুকরণের দাস হ'য়ে থেকে প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে পারবে না স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে এই বিষয়টির ওপর বারবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২২]

বিশ্বজনীন সমস্যা :

রাষ্ট্রদর্শনের ব্যবহারিক দিক হলো শাসন-ব্যবস্থার নীতি। এই ব্যবহারিক বা ফলিত দিক দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মাত্র দুটি : শাসকের ধর্মচেতনা এবং শাসিতের নৈতিক চরিত্র। শাসক যদি তাঁর শাসনভারকে পবিত্র কর্তব্য

১৮ Kenneth Saunders : Buddhism

১৯ D. S. Sarma : What is Hinduism

২০ Nirmal K. Bose : Selections from Gandhi, 47 f, আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধী এই অভিমতই সমর্থন করেছেন

২১ Tagore : Nationalism

২২ বিশেষ করে স্বামীজীর Lectures from Colombo to Almora বা গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ 'ভারতে বিবেকানন্দ' দ্রষ্টব্য। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের The Philosophy of Man-making গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

হিসেবে গ্রহণ করে 'রাজধর্ম' অনুসারে শাসন-কার্য-পরিচালনায় অগ্রসর হন এবং শাসিত বা নাগরিকগণের নৈতিক চরিত্র যদি ঠিকমত গঠিত হয়—তবে সুশাসনের কোন সমস্যাই থাকতে পারে না। আর এ দুটি যদি না থাকে তবে কোন কলাকৌশল, কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই মানুষের রাজনৈতিক যাত্রাপথ সুগম করতে পারে না। অতএব, ভারতীয় রাষ্ট্র দর্শনের মতে শাসন-ব্যবস্থার সমস্যা হলো শাসক ও শাসিত—উভয়েরই নৈতিক ভিত্তি (moral compass) সুগঠিত করার সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান রয়েছে ধর্ম বা কাম্য জীবন-পদ্ধতির মধ্যে।[২৩] ফরাসী দার্শনিক রুশো এই নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু কি করে এই বিশ্বজনীন সমস্যার সমাধান করতে হয় তার নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেননি; দিয়েছেন প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-দার্শনিকগণ। (ক্রমশঃ)

২৩ D. M. Brown: White Umbrella

তীর্থপথে

আনন্দ

পথে যেদিন নেমেছিলাম পথ ছিল দুস্তর,
ভেবেছিলাম বারে বারে, চলতে পারবো কি ?
দ্বিধা এসে দাঁড়িয়েছিল সারা হৃদয়'পর—
যা হয় হবে এগিয়ে যাবো, কিম্বা ফিরবো কি ?
দ্বিধা টুটে জয় মা বলে বাড়িয়েছিলাম পা,
বিপদ কত এসেওছিল, কেটেও গেছে পথে
চলা আমার তোমার কৃপায় থামে নাই তো, মা !

চলার পথের পাশেই ছিল ধারা ত্রিতাপহরা
ভেবেছিলাম নেয়ে সেথায় মিশবো তোমার পায়,
তাকিয়ে দেখি সেদিকটা যে আঁধার মেঘে ভরা—
কি দুর্ভোগ যে ঘিরবে পথে কে জানে আমায় !
যাবোই ভেবে জয় মা বলে যাত্রা করে দেখি
নিমেষ মাঝে সকল আঁধার সরিয়ে দিয়ে তুমি
চারিদিক যে আলোর বানে ভরিয়ে দিলে, এ কি !

ভয় দ্বিধা সব কাটিয়ে পথে নামে যে জন, মা,
বিপদে দাও ঘিরতে তারে, থামাতে দাও না !

দাক্ষিণাত্যভ্রমণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ঋদ্ধ্যানন্দ

অতিথিদ্বয়কে সময়মত বাসে তুলে দিতে হবে। ভদ্রলোক সকালে উঠেই আমাদের নিয়ে চললেন। ৫-৩০টায় বাস ছাড়ল। ত্রিনেলীভেলী ৯.৩০ টায়, নাগেরকয়েল ১২ টায় পৌঁছল। এখানে বাস বদল করে ১টায় নামলাম বিবেকানন্দপুরম্—কুমারিকা অন্তরীপ যাওয়ার একমাইল আগেই, রাস্তায়। আগেই সংবাদ দিয়েছিলাম। কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতেই আমাদের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। স্নান সেরে ক্যান্টিনে খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। এখানকার নিজস্ব একটি বাস আমাদের নিয়ে সমুদ্রতটে পৌঁছল। সেখান থেকে মোটরলঞ্চে করে বিবেকানন্দ রকের মন্দিরটি দেখতে যাই। এই যাবতীয় ব্যবস্থাই বিবেকানন্দ রক্ মেমোরিয়েল কমিটির দ্বারা করা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রকে নেমে পড়ি। লঞ্চভরতি লোক। ক্রমাগত দুই-তিনটি লঞ্চ যাওয়া-আসা করছে। প্রথমেই আমরা যাই 'শ্রীপদ মণ্ডপম্'। কথিত আছে, দেবী পার্বতী 'কন্যা' অবতারে মহাদেবকে পাওয়ার জন্য এই শিলাখণ্ডে বসে তপস্যা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯২ সালের ডিসেম্বরে কন্যাকুমারী-দর্শনে আসেন। কন্যার তপস্যা-পীঠ দর্শনের জন্য তিনি এত ব্যাকুল হয়েছিলেন যে, কয়েকটি পয়সা দিতে না পারায় কোনও জেলে তাঁকে পার করে না দেওয়াতে তিনি সাঁতার দিয়ে প্রায় আড়াই ফার্লং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেই শিলাখণ্ডে পৌঁছে ধ্যানস্থ হন। এখানেই ধ্যাননেত্রে তিনি ভারতের অতীত, বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন।

'শ্রীপদমণ্ডপম্'-এর ভিতরে প্রস্তরে দেবী কন্যাকুমারীর পদচিহ্ন অঙ্কিত, বেগুনী রং-এর। এই মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে আমরা এগিয়ে যাই 'সভামণ্ডপম্'-এর দিকে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮১´ এবং প্রস্থে ৫৮´ ফুট, দেখতে বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের মতো। মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র দেখা যায় ডানদিকে ও বাঁদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের ফটো পৃথক পৃথক কুঠরীতে স্থাপিত রয়েছে। গর্ভমন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত—দৃষ্টি রয়েছে সম্মুখস্থ কন্যা-কুমারীর 'শ্রীপদ'-এর দিকে। গর্ভমন্দিরের পাশেই ধ্যানমন্দির। এই 'রকে' বিদ্যুৎ-সরবরাহ সমুদ্রে ডোবানো কেবল-এর সাহায্যে করা হচ্ছে। বেতারযন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র-তীরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। এখনও এই 'রক্ মেমোরিয়েল্'-এর টুকিটাকি কাজ চলছে। কিছুক্ষণ পরেই আবার লঞ্চে করে ফিরে এলাম। এবার কন্যাকুমারীর মন্দির। সন্ধ্যা হয় হয়। দক্ষিণভারতের প্রায় সব মন্দিরেই কাপড় ও চাদর প'রে বা খালি গায়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়; সেলাই-করা কিছু গায়ে দেওয়া চলে না। অবশ্য এটি শুধু পুরুষের বেলায়ই প্রযোজ্য। সুন্দর মূর্তি, যেন ছোট একটি মেয়ে। চন্দনলিপ্ত বলে সাদা রং। মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

নাগেরকয়েলের বাস ধরে সুচীন্দ্রম্-এ নেমে গেলাম রাত ৮টার সময়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এক সঙ্গে এই মন্দিরে আছেন বলে একে

ত্রিমূর্তিমন্দিরও বলা হয়। রাত্রি ৯টার কাছাকাছি "বিবেকানন্দপুরম্ ফিরে এলাম, পরদিন ভোর ৪টায় হেঁটে একাই আবার গেলাম কন্যাকুমারীর মন্দিরে। মঙ্গলারতির পর দেবীর স্নানাভিষেক আরম্ভ হলো। স্নানের পরই অল্পক্ষণের জন্য একবার পর্দা সরানো হলো। কোথায় দেবী কন্যাকুমারী? কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী দেবীকে অন্ধকারে আর দেখাই যায় না! 'কালোয় কালো মিশে গেলো।' হঠাৎ পূজারী চন্দ্রহার পরালেন, অন্যান্য অলঙ্কারও। দেবী যেন তখন নিরাকার থেকে সাকারে ফিরে এলেন। তারপর আবার পর্দা টেনে দেওয়া হলো। আধ ঘণ্টা পরে আবার সেই আগের মূর্তি - চন্দন-চর্চিতা, বস্ত্রশোভিতা। প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম।

সমুদ্র-তটে ভিড়। সূর্যোদয় হবে। একদৃষ্টে সকলে পূবদিকে চেয়ে আছে। আকাশে রঙের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সূর্যোদয় হচ্ছে। প্রথমে অরুণোদয়, বিচ্ছুরিত রক্তিম রশ্মি, বৃহৎ আলোর থালার খানিকটা দিগন্তে দেখা দিল। এর পর যেন বড় (জলের) জালা উল্টো হয়ে উপর দিকে চলেছে; গোল নয়। এবার জল ছেড়ে ওপরে। উঠতে উঠতেই গোল, স্বাভাবিক আকার হলো। আর চাওয়া যায় না, তীব্রতা বেড়ে গেছে।

২৬শে জুন ত্রিবান্দ্রম যাত্রা। বাস মদ্ররাজ্য ত্যাগ করে কেরালা রাজ্যের ভিতর দিয়ে চললো। রাস্তার দু'ধারে নারিকেল, আম, কাঁঠাল গাছ। মনে হয় যেন আমরা বাগিচার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। কেরালা অনেকটা বাংলাদেশের মতো। সেই ধানক্ষেত, নদী-নালা! ত্রিবান্দ্রম মঙ্গলম্ আশ্রমে দুপুরে পৌঁছে বিকালে অনন্তশয়ান পদ্মনাভন্ মন্দির দেখে এলাম।

২৭শে জুন জনৈক বন্ধুর সহায়তায় থুম্বার পারমাণবিক কেন্দ্র দেখে এলাম। প্রায় ১২ মাইল দূরে, সমুদ্রতীরে। কন্টোল রুম, লাঞ্চিং প্যাড্, ওয়ার্কসপ্, অবজার্ভেশন রুম, টেষ্ট রুম্ ইত্যাদি। আজই রাত্রে ট্রেনে আঙ্গামালী রওয়ানা হতে হবে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। পরদিন ভোরে আঙ্গামালী পৌঁছই। তখনও বৃষ্টি চলছে। বৃষ্টি ছাতায় রোখা যায় না। রাস্তার জলের স্রোত, চলা মুস্কিল। কালাডী যাবো। অল্প দূর গিয়েই মেইন্‌রোড্ জংশনে অপেক্ষা করছি। কয়েকটি বাস্ পর পর চলে গেলো। জায়গা নেই বলে থামলো না। শেষে একটায় উঠে গেলাম। প্রায় ৮টায় আশ্রমে পৌঁছে একটু পরেই দেখে এলাম আচার্য শঙ্করের জন্মস্থান, তাঁর মায়ের শ্মশানবেদী, পূর্ণা বা পেরিয়ার নদী—বেগবতী ও জলে টইটম্বুর—কূল ছাপিয়ে যায়-যায়। বিকালে ৪টায় বেরিয়ে গেলাম 'আলওয়াই'র রাস্তা ধরে। একটি গির্জার ভিতর গিয়ে যিশুর ও একজন সেন্টের মূর্তি দর্শন করে আরও এগিয়ে গেলাম। কিছুদূরে অন্য একটি গ্রামের ভিতর অম্বিকাদেবীর মন্দির দর্শন করে ফিরে আসি। পুনরায় সন্ধ্যার সময় শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান-সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে আরতি দেখে ফিরি।

২৯শে জুন, সকালে কালাডী থেকে বাসে আঙ্গামালী, সেখান থেকে অন্য একটি বাসে ১০ টায় ত্রিচুর পৌঁছি। মালয়ালম্ ভাষায় 'ত্রি' মানে 'শ্রী' এবং 'উর' মানে 'গ্রাম'। তামিল ভাষায় 'তিরু' মানে 'শ্রী' এবং 'উর' মানে 'গ্রাম'। কাজেই তিরুপতি মানে শ্রীপতি, আর ত্রিচুর মানে শ্রীচুর (গ্রাম)। ত্রিচুর শহর থেকে একটি ট্যাক্সি করে 'ভিলাঙ্গান' গ্রামের আশ্রমে পৌঁছি তখন বেলা ১০½ টা।

বিকালে ৪টার সময় গুরুবায়ুর মন্দিরে গেলাম। প্রায় ১৬ মাইল দূরে। মন্দিরে প্রবেশ করার আগেই দেখা যায় একটি সুন্দর গরুড় পক্ষী তার ভক্ষ্য একটি বিষধর সর্পকে নিয়ে যেন উড্ডীয়মান। মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেবী আছেন। তবে এটি শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর মন্দির। বিগ্রহের বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে সাজানো হয়। কখনও বালগোপাল, কখনও বা মুরলীধর ইত্যাদি। গুরুবায়ুর মন্দিরের কাছেই একটি জঙ্গলে 'আয়াপ্পা'র মন্দির আছে। বৎসরে দুইবার দর্শন হয়।

পরদিন বুধবার, ৩০শে জুন, বাসে করে ত্রিচুর শহরে গিয়ে চিড়িয়াখানা দেখে এলাম ত্রিচুরের চিড়িয়াখানায় খুব বড় বড় বিষধর সাপ রয়েছে, যা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। একটি বড় শিবমন্দিরও দর্শন করা হলো।

১লা জুলাই ত্রিচুর শহরে এসে একটি টেম্পো নিয়ে সওয়া-দু-ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কালিকটের কাল্লাই আশ্রমে পৌঁছি। সন্ধ্যার দিকে বড় রাস্তা ধরে একটু ঘুরে ফিরে আসি।

২রা জুলাই শুক্রবার সওয়া-সাতটায় সকালে রওয়ানা হয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম করে পৌঁছলাম 'উটকামণ্ড' বা 'উটি' বিকালে। 'উটি' নীলগিরি পাহাড়ের উপর। রাস্তায় পর পর পেলাম আদিবরম্, বীথিরি, চুণ্ডালে, কুন্নানুর, মেপাদি, কেরোলিনা, পাণ্ডালুর, গুদালুর। 'উটি' আশ্রমে একটু জলযোগ করে স্বামীজীর শিষ্য 'গুড্‌উইনের' সমাধিতে মালা দিয়ে এলাম। গুড্‌উইনের উদ্দেশে স্বামীজীর রচিত কবিতাটি সেখানে খোদিত রয়েছে।

৩রা জুলাই শনিবার জনৈক ভক্তের সঙ্গে কোটাগিরির বাসে চড়ে খানিকটা পথ,—পরে পায়ে হেঁটে 'দোদাবেটা' শিখরে পৌঁছলাম। এটিই 'উটি' শহরের সর্বোচ্চ শিখর। এখান থেকে দেখা যায় ওয়েলিংটন, কুন্নুর, মেট্টু-পেলায়াম, কোইম্বাটুর, কেটিভেলী, এভালঞ্চি, মুকুর্তি শিখর, নীলগিরি শিখর, 'উটি' শহর, গুণ্ডালপেট্। যদিও সব পরিষ্কার দেখা যায় না, তবুও তীরচিহ্নিত করে দেখানো রয়েছে। 'দোদাবেটা'তে কিছুক্ষণ থাকার পর আবার ধীরে ধীরে নেমে এলাম। আমরা তিন জনই হেঁটে নামতে লাগলাম।

৪ঠা জুলাই। সকাল ৮টায় রওয়ানা হয়ে ১০টায় বাসে গুডালুর, নীলগিরি ও পশ্চিম-ঘাট পর্বত পার হয়ে গেলাম। এখান থেকে একটি রাস্তা গিয়েছে কালিকট্ বাঁদিকে, অন্যটি ডানদিকে মহীশূরে। ক্রমে পেলাম থেপ্পাকাড়ু ১১টায়, মহীশূরের পশু-সংরক্ষিত বনাঞ্চল, তার প্রধান কেন্দ্র বন্দীপুর। বনাঞ্চলে শালগাছ ও বাঁশই বেশী। বন পেরিয়ে গুণ্ডালুপেট্ পৌঁছি ১২টায়। এখানে দুপুরের খাওয়া হলো। তারপর নঞ্জনগড় হয়ে মহীশূর।

পরদিন সকালে চামুণ্ডীদেবী দর্শন করে আর্ট গ্যালারি ও চিড়িয়াখানা দেখে আশ্রমে ফিরে এলাম। বিকালে টিপুসুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম্ গেলাম। কাভেরীর তীরে। এখানে শ্রীরঙ্গনাথের বিগ্রহ। পাশেই টিপু সুল-তানের বন্দিশালা। তারপর কৃষ্ণরাজ বাঁধের কাছে 'বৃন্দাবন গার্ডেন' গেলাম। সন্ধ্যায় আলোতে ঝলমল। নানারকম ফোয়ারা নানা রংয়ের আলো।

মঙ্গলবার সকালে রওয়ানা হয়ে ট্রেনে মহীশূর হতে বাঙ্গালোরে পৌঁছি ১টায়। পরদিন বুধবারে সকালে সারাদিনের জন্য

টুরিস্ট বাসে শহর দেখতে বের হলাম। লালবাগ, বিশ্বশ্রেয়া মিউজিয়াম, বিধান সৌধ, মহীশূরের কুটীরশিল্প, গভর্ণমেন্ট স্যাণ্ডেল সোপ্ ফ্যাক্টরী, এইচ. এম্. টি. ওয়াচ্ ফ্যাক্টরী—তারপর উলসুর লেক্ দেখে সন্ধ্যায় ফিরে এলাম। পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম—গুরুপূর্ণিমা—বৃহস্পতিবার, ৮ই জুলাই।

৯ই জুলাই টুরিস্ট বাসে প্রথমে শ্রবণ বেলগোলা পৌঁছি ১১টায়। পাহাড়ের উপর চড়ে গোমটেশ্বর মূর্তি দর্শন করতে হয়। প্রায় ৫৮´ ফুট উঁচু মূর্তি। সেখান থেকে আবার বাসে বেলুর। এখানে চেন্নাকেশব-এর মূর্তি। 'চেন্না' মানে 'সুন্দর'। এই মন্দিরটি অতি সুন্দর—মন্দিরের ভিতর বাহির প্রচুর কারুকার্যমণ্ডিত। যে পাথরগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তা দেখতে অনেকটা ঢালাই-লোহার মত। এরপর 'হালিবিভু'র মন্দির দেখতে যাই, 'হালিবিভু'র অর্থ কানাড়া ভাষায় 'বিধ্বস্ত নগরী'। এটি শিবমন্দির। দুইটি পৃথক শিবলিঙ্গ ও দুইটি পৃথক নন্দী বা বৃষ, শিবের বাহন। রাত্রিযাপন করি 'হাসান' শহরে। খুব ভোরে পরদিন বাসে মাঙ্গালোরের দিকে যাত্রা করি। পশ্চিমঘাট পর্বত পার হলাম। দুপুরে ১২-৩০ টায় মাঙ্গালোর আশ্রমে পৌঁছি। রাস্তায় পেলাম সাক্লেশ্বর, উপ্পীনংগুডী, নেত্রাবতী নদী, বেণ্টাবল। বিকালে একটি প্রসিদ্ধ গির্জা দেখতে যাই; কিন্তু শনি-রবিবারে ভিতরে যেতে মানা আছে বলে বাইরে থেকে চিত্রাদি দেখেই চলে আসতে হল। তারপর মঞ্জুনাথ, গোরখনাথ ইত্যাদি দর্শন করে চলে এলাম মঙ্গলাদেবীর মন্দিরে। এই নামানুসারেই শহরের নাম মাঙ্গালোর অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ খৃষ্টান।

১১ই জুলাই সকালে বাসে উদিপি গিয়ে শ্রীকৃষ্ণমন্দির দর্শন করি। তারপর আবার অন্য বাসে কটোপাড়ি, মণিপাল, সোমেশ্বর। এখান থেকে ছোট ছোট বাসে পশ্চিমঘাট পার হয়ে আসতে হয় 'আগাম্বে'। তারপর আবার বড় বাসে শৃঙ্গেরী মঠে পৌঁছি ১টায়। অতিথিশালায় আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা হলো। বিশ্রামের পর ৪-৩০টায় তুঙ্গ নদীর অপর পারে মঠাধ্যক্ষ বর্তমান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর বাসস্থানে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হলো। ফিরে এসে মল্লিকার্জুন শিবমন্দির দেখতে যাই। এখানে আদি শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তি ও মন্দির রয়েছে। রাত্রি ৮-৩০টায় শান্তিপাঠ ও স্তোত্রপাঠসহ শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পূজা হয়েছিল। এইদিন বিশেষ পূজা ছিল। এখানে একটি সংস্কৃত টোলে শাস্ত্রাদিপাঠের ও পূজাদি শেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

পরদিন ভোরে ৪-৩০টায় বাসে করে 'কোপ্পা' হয়ে বিরুর, কডুর রেল ষ্টেশনে আসি। পরদিন সকালে ট্রেনে মিরাজ জংশনে পৌঁছি। সেখান থেকে বাসে পাণ্ডরপুর পৌঁছি ১২-৩০টায়। বিঠ্ঠলজীর মন্দির দর্শন করে বাস ষ্ট্যাণ্ডে আসি। দাক্ষিণাত্যের কোথাও বিগ্রহের কাছে যাওয়া যায় না। এখানেই দেখছি বিঠ্ঠলজীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে দেওয়া হয় সব যাত্রীদের। বাস ষ্ট্যাণ্ড্ হতে ৫টায় রওয়ানা হয়ে পুণা পৌঁছি রাত দুপুরে।

পরদিন পুণা জংশনে ... বোম্বাই ফেরার ট্রেন ধরি।



সেকাল-বাংলার সভা-সমাজ

ডক্টর অনিলচন্দ্র বসু*

স্কুল-কলেজের শিক্ষা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় সেবিষয়ে সেকাল বাংলার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা বিশেষ সচেতন ছিলেন। সেকাল বাংলার লোকেরাও কেবল স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তাই উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে শিক্ষা-প্রসারের প্রয়াস কেবল স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমিত ছিল না। স্কুল-কলেজের পরিপূরক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেকাল বাংলার শহরাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল অনেক সভা ও সমাজ। এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজে লব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন এবং শিক্ষাসমাপনান্তে কর্ম-জীবনেও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ। এছাড়াও বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির পথে এসব সভা-সমাজ যে বিশেষ অবদান জুগিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কোন কোন সভা বাংলাসাহিত্যের কবি ও সাহিত্যিককে যথোচিত সংবর্ধিত করে উৎসাহিত করতেও উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উল্লিখিত সভা-সমাজের কোন কোনটিতে ইংরেজীভাষা ব্যবহৃত হলেও বিশেষ কয়েকটি সভায় বাংলা ব্যতিরেকে অপর কোন বিদেশী ভাষার ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এগুলোতে বাংলা-ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান-ও সাহিত্য-বিষয়ক নানা আলোচনা, বিতর্ক ও বক্তৃতা হত। কোন কোন সভায় প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আলোচনা চলত, আবার কোন কোন সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোনীত ব্যক্তি বক্তৃতা করতেন। এসব সভা-সমাজের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্মবিষয়ের আলোচনা বা বিতর্ক এসব সভা-সমাজে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। অন্য ধর্মের প্রতি কটাক্ষ, বিদ্বেষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশঙ্কায় ধর্মসম্পর্কিত বিষয় আলোচনার বহির্ভূত ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসব সভা-সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সেকাল বাংলায় ধর্মসভারও সৃষ্টি হয়েছিল। এসব ধর্মসভার একটি বিশেষ কাজ ছিল ধর্মবিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা গ্রহণ করা।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার হিন্দুকলেজে "গৌড়ীয়-সমাজ" স্থাপিত হ'ল। উদ্দেশ্য ছিল এদেশের লোকের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ-সমাজের সদস্য ছিলেন। রামকমল সেন ছিলেন এ সমাজের সভাপতি আর সম্পাদক ছিলেন প্রসন্নকুমার বসু। সমাজের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য অনেকেই উৎসাহী ছিলেন। কাশীকান্ত ঘোষাল আপন বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী নানা গ্রন্থ থেকে সংকলন করে গৌড়ীয় ভাষায় "ব্যবহার-মুকুর" রচনা করেছিলেন। সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে ব্যবহার-মুকুরের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। যেহেতু অনুশীলনের দ্বারা বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হলে দেশের অনেক উপকার হবে, সেইহেতু সমাজের উদ্যোক্তারা এর দীর্ঘজীবন আশা করেছিলেন। সমাজ-স্থাপনকালে অনেকেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলেও উদ্যোক্তাদের আশানুযায়ী এ সমাজ বেশ কিছু

* অধ্যক্ষ, রানাঘাট কলেজ

কাল স্থায়ী হয়েছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে "এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু-এসোসিয়েশন" নামে আর একটি সভা স্থাপিত হল পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ে, এ সভার উদ্যোক্তা ছিলেন কোলকাতাস্থ সিমলার এঙ্গলো-হিন্দু স্কুল ও পটলডাঙ্গার হিন্দু কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্র আর ডেভিড হেয়ার স্বয়ং। এখানে কেবল বিদ্যাবিষয়ের আলোচনা এবং বিদ্যার অনুশীলন হত। প্রতিমাসে দুবার সভার অধিবেশন বসত। যখন যে-বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য যিনি নির্দিষ্ট হতেন তিনি অধিবেশনে সভাপতির অনুমতি নিয়ে বক্তৃতা করতেন। এ সভার সভ্য হবার নিয়ম ছিল অত্যন্ত কঠিন। সভ্য হবার জন্য প্রথমে একজন নাম প্রস্তাব করলে, অপরাপর সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হত, এবং মতাধিক্য ব্যতিরেকে সভ্য হবার কোন সুযোগ ছিল না।

প্রায় একই সময়ে পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখানাবাটীতে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। এর নাম ছিল "জ্ঞানসন্দীপনসভা"। প্রতিমাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রোববার রাত্রিবেলা এ সভার অধিবেশন বসত। বহু সুপণ্ডিত সভায় উপস্থিত হতেন এবং বিদ্যাবিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আলোচনা চলত। কার্যানুরোধে কোন সভ্য অধিবেশনে উপস্থিত হতে অক্ষম হলে, পত্র দিয়ে সম্পাদককে তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিতে হত। সম্পাদককে পত্র দিয়ে না জানিয়ে বার বার কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে, তাঁর সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হত।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে "নববিশিষ্টশিষ্টগণসভা" নামে আরও একটি সভা কোলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল। নামগতবর্ণবাহুল্যবশতঃ অনেকের উচ্চারণে অসুবিধা হত বলে এর নাম পরিবর্তন করে "বঙ্গরঞ্জিনী সভা" রাখা হয়েছিল। বঙ্গভাষার চর্চাই এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গভাষাচর্চার জন্য আরো অনেক সভা থাকলেও সেগুলোতে অপভাষার চর্চা হত বেশী, তাই পরজাতীয়ভাষানিপুণ এবং স্বভাষাদ্বেষী ব্যক্তির এ সভায় প্রবেশাধিকার ছিল না। কোলকাতার সিমলানিবাসী কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বঙ্গভাষা শুদ্ধরূপে লিখন ও পঠনার্থে এ সভা স্থাপন করেছিলেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন এ সভার সম্পাদক।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সিমলাসংলগ্ন রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুলে "সর্বতত্ত্বদীপিকা" নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গভাষার আলোচনা ও অনুশীলন এ সভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হবে—এমত পোষণ করতেন সভ্যেরা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এ সভার প্রথম সম্পাদক আর সভাপতি ছিলেন রমাপ্রসাদ রায়। প্রতি রোববার এ সভার অধিবেশন বসত। বঙ্গভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষা এ সভায় ব্যবহৃত হত না। এ বিষয়ে সভাপতির ছিল কড়া নির্দেশ। প্রতিমাসে সভাপতি-পরিবর্তনের ব্যবস্থা ছিল। উত্তমগৌড়ীয়ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে সভাপতি মনোনয়ন করার নিয়ম ছিল। সম্পাদকপদ চিরস্থায়ী হত, যদি তিনি কার্যে কোন ত্রুটি না করতেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠনঠনিয়া কলেজ স্ট্রীটে "জ্ঞানচন্দ্রোদয়সভা" স্থাপিত হয়েছিল। বিজ্ঞবর শ্যামাচরণ শর্মা ছিলেন এ সভার অধ্যক্ষ। প্রতি রোববার সন্ধ্যায় এ সভার অধিবেশন বসত। এ সভারও উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষা-

চর্চা। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় "তিমিরনাশক সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গভাষাশুদ্ধকরণই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঢাকা শহরের বহু বিদ্যার্থী এ সভার সভ্য ছিলেন। এর সভাপতি ছিলেন শ্যামাচরণ বসু।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগিতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পৈতৃক ভবনে "তত্ত্ব-বোধিনী সভা" স্থাপন করেছিলেন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এ সভা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ সভায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা হত না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন এ সভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সভার জ্ঞানবিজ্ঞান- ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা এ সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে জ্ঞানপিপাসু পাঠককে পরিতৃপ্ত করত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মাধ্যমে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মুখ্য হয়ে উঠেন। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক অক্ষয়-কুমারের ভূগোল প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রকৃষ্ট বাহন হয়ে উঠল।

মাত্র তের বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"র প্রতিষ্টা করেন। এ সভাকে কেন্দ্র করেই কালীপ্রসন্ন সিংহের কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি নিজে এ সভার সম্পাদক ছিলেন বেশ কিছুকালের জন্য। উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু, রাধানাথ বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ সভার সভ্য ছিলেন। সাধারণতঃ প্রতি শনিবারের সন্ধ্যায় এ সভার অধিবেশন বসত। আলোচিত হত নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয় এবং তথ্যবহুল মূল্যবান প্রবন্ধাদি পঠিত হত। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-রচনায় উৎসাহদানের জন্য প্রবন্ধপ্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হত এবং শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কেবল জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্য-আলোচনা ও অনুশীলনের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের সংবর্ধনাদি দ্বারা সাহিত্যানুশীলনে সাধারণকে উৎসাহিত করাও ছিল এ সভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলায় অমিত্রাক্ষরছন্দ-প্রবর্তনের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কবি মধু-সূদনকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। মধুসূদনের পর বিদ্যোৎসাহিনী সভা কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজী অনুবাদক পাদরী লঙ্ সাহেবকে সংবর্ধিত করেছিল। কল্যাণকর এবং সমাজসংস্কারক অনুষ্ঠানের সঙ্গেও বিদ্যোৎসাহিনী সভার যোগ ছিল। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ-প্রচলন সম্পর্কে আন্দোলন সুরু করেন, তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে "সোসাইটি ফর দি একুইজিসান অব জেনারেল নলেজ" বা সাধারণ জ্ঞানো-পার্জিকা সভার উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ সভা-প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং ডিরোজিয়োর একাডেমিক এসোসিয়ে-শনের সদস্যগণ। এ সভার সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, এবং রামতনু লাহিড়ী ও

প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন সম্পাদকদ্বয়। সেভাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছ'জন ছিলেন এ সভার অধ্যক্ষ। মুখ্যতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনার জন্য এ সভা প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক অবস্থারও পর্যালোচনা করা হত। এ সভার সভাপতি "নব্যবঙ্গ" তারাচাঁদ চক্রবর্তীর উৎসাহে ক্রমে ক্রমে এ সভার অধিবেশনে রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হতে লাগল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ বাগ্মী জর্জ টম্পসনকে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য ও উদারনৈতিক রাজ-নীতিবিদ জর্জ টম্পসন এ দেশের অগণিত জন-সাধারণের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে পূর্বেই শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেকাল বাংলায় কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রকাশ্য অধিবেশনেই জর্জ টম্পসনকে অকুণ্ঠ স্বাগত জানানো হয়েছিল। তারপর থেকে রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা যে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা অনস্বীকার্য।

জন্মদিনে

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

হে প্রভু, আমার হৃদি-মন্দিরে
তব জন্মোৎসব।
নিভৃত মানসে তোলে রোমাঞ্চ
এ তিথির অনুভব।
যুগে যুগে তুমি নব নব বেশে
জন্ম নিয়েছো প্রার্থিত দেশে
এ জনমে তুমি সবারে মিলালে
সাধনায় অভিনব।

আজি তাই প্রাতে এত সুন্দর
প্রথম অরুণোদয়,
পাখীর কূজন কুসুম-সুবাস
তাই এত মধুময়।
হে প্রভু, ক্ষণিক দাঁড়াও আসিয়া
নিখিল চিত্তে কলুষ নাশিয়া
মঙ্গলঘটে পূর্ণ করহে!
চিরশূন্যতা সব,
শান্তির বারি-সিঞ্চনে মুছি'
অশান্ত কলরব।

শ্রীশ্রীকালী মহাবিদ্যা

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী

দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালীর উপাসনাই সমধিক প্রচলিত। অন্যান্য শাক্ত দেবতার উপাসনাও প্রায়শঃ কালীমূর্তির উপরই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; স্বতন্ত্র মূর্তি করিবার প্রয়োজন হয় না। বহু পীঠস্থানেই কালীবিগ্রহে পীঠদেবীর পূজা হইয়া থাকে, যদিও পীঠদেবীর নাম ও ধ্যান অন্যরূপ। কালিকাদেবীর বহুবিধ মূর্তিভেদমধ্যে নিত্য উপাস্য মূর্তি দক্ষিণা কালী, ইঁহারই মন্ত্র গ্রহণ হয়। অন্যান্য মূর্তি নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজায় ব্যবহৃত হয় মাত্র। স্বয়ং মহাদেব মহাকালরূপে দক্ষিণাকালীর উপাসনা করিয়াছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে। বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণবংশ এই মহাবিদ্যার উপাসক। আধুনিককালে শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখ শক্তিসাধকগণ দক্ষিণাকালীর সাধনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

কালীমাহাত্ম্য

তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, কালী নিগুর্ণব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশিকা; ইনি আদিরূপা ও সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী। অপরাপর মহাবিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী কালিকারই ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। নিরুত্তর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সর্বাসাং সিদ্ধবিদ্যানাং প্রকৃতির্দক্ষিণা প্রিয়ে।

সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মধ্যে দক্ষিণাকালী সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ মূলীভূত কারণ। যোগিনী তন্ত্রে শিব বলিতেছেন,—

মহামহা ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যেয়ং কালিকা মতা।
যামাসাদ্য চ নির্বাণমুক্তিমেতি নরাধমঃ।
অস্যা উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ॥

(দ্বিতীয়ঃ পটলঃ)

এই কালিকাবিদ্যা মহামহা ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা দ্বারা মহাপাপিষ্ঠও নির্বাণ লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণ কালীর উপাসক।

তন্ত্রশাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছেন,—কালীর উপাসনা সর্বযুগে সকল জীবকেই সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে; পরন্তু কলিযুগে পরাপ্রকৃতি কালীই বিশেষভাবে জাগ্রতা; তাঁহার উপাসনাতেই জীবগণ শীঘ্র সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।

কুব্জিকা তন্ত্র বলেন,—'কালিকা মোক্ষদা দেবি কলৌ শীঘ্র-ফলপ্রদা'। মোক্ষদায়িনী কালিকার উপাসনাই কলিযুগে শীঘ্র ফলপ্রদান করে। পিচ্ছিলাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যদেব কলৌ যুগে।' মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন,—

শ্রীআদ্যা-কালিকা-মন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ।
সদা সর্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ॥

(৭।৮৬)

আদ্যা কালিকার মন্ত্র সর্বতোভাবে সিদ্ধমন্ত্র। এই মন্ত্র সকল সময়েই এবং সকল যুগেই সিদ্ধি প্রদান করে, বিশেষতঃ কলিযুগে এই মন্ত্র আশুফলপ্রদ হইয়া থাকে।

কালিকা-উপাসনা দ্বারা সাধক ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন। কালীতন্ত্রে ভৈরব বলিতেছেন,—

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বলং পুষ্টিং মহদ্‌যশঃ।
কবিত্বং ভুক্তি-মুক্তিং চ কালিকা-পাদ-
পূজনাৎ॥ (১১।১০)

কালীতত্ত্ব

কালীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কালনিয়ন্ত্রণাৎ কালী তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী"।

(১১।২৮)

কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম "কালী"। ইনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব দেবীকে বলিতেছেন,—

তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি ॥
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥
কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদ্ আদিভূতত্বাদ্ আদ্যা
কালীতি গীয়সে ॥　　(৪।৩০-৩২)

জগৎসংহারকারক মহাকাল তোমার একটি রূপমাত্র। এই মহাকাল মহাপ্রলয়সময়ে সমুদয় জগৎ গ্রাস করিবেন। সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া তিনি 'মহাকাল' নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। তুমি মহাকালকেও কলন বা গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম আদ্যা পরমা কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস করিয়া থাক, এই নিমিত্ত তোমার নাম 'কালী' এবং তুমি সকলের আদিভূতা। যেহেতু তুমি সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা অর্থাৎ কারণস্বরূপিণী, এই জন্য তোমাকে জ্ঞানিগণ "আদ্যাকালী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মহাপ্রলয়ে সমুদয় ধ্বংস করিয়া কালশক্তি কালীতে লীন হইয়া যায়। তখন তমোরূপিণী কালীই একমাত্র বর্তমান থাকেন।

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।

(মহানির্বাণতন্ত্র, ৩।২৫)

সৃষ্টির পূর্বে তমোরূপে একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। তোমার সেই রূপ বাক্য ও মনের অগোচর।

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, "তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ"। এই তমঃই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি কালিকা।

শ্রুতি ব্রহ্মের সর্বসংহারিণী শক্তির বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবতঃ ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥

(কঠোপনিষৎ, ১।২।২৫)

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁহার অন্নস্বরূপ এবং যম যাঁহার ব্যঞ্জনস্থানীয়, তিনি যেখানে থাকেন তাহা বিশেষরূপে কে জানে? অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বসংহারক স্বরূপটি অতি দুর্জ্ঞেয়। ইনিই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি কালিকা।

ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তে (১০ম মণ্ডল, ১২৭ সূক্ত) আমরা কালীতত্ত্ব-ভাবনার আদিরূপটি দেখিতে পাই.—

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥

(ঋগ্বেদ, ১০।১২৭।২)

অমরণধর্মা নিত্যা রাত্রিদেবী বিশ্বপ্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চগত উচ্চ নীচ বৃক্ষলতা গুল্মাদি স্বীয় আত্মচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত করিলেন।

দেবীপুরাণে এই রাত্রিদেবী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা"।

অর্থাৎ রাত্রিদেবী ঈশ্বরলয়রূপা ও ব্রহ্মমায়াত্মিকা।

কালীর রূপভেদ

তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীশ্রীকালীর বহুবিধ রূপভেদ বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের পূজাবিধান বিহিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শাক্তসাধকের ধ্যাননয়নে আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীকালী শুধু একরূপেই প্রকাশিতা হন নাই। তিনি

একা হইয়াও বহুরূপধারিণী। তাই সাধনার স্তর ও উপলব্ধিভেদে শ্রীশ্রীকালীরও বহুবিধ রূপভেদের কথা তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় তন্ত্রনিবন্ধকার শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকৃত তন্ত্রসার এবং শ্রীমৎ রঘুনাথতর্কবাগীশকৃত আগমতত্ত্ববিলাস গ্রন্থে কালীর নিম্নলিখিত রূপের বর্ণনা ও পূজাবিধান দৃষ্ট হয়। যথা :—(১) দক্ষিণাকালী, (২) মহাকালী, (৩) শ্মশানকালী, (৪) গুহ্যকালী, (৫) ভদ্রকালী, (৬) চামুণ্ডাকালী, (৭) সিদ্ধকালী, (৮) হংসকালী এবং (৯) কামকলাকালী।

কাশ্মীরদেশীয় আগমশাস্ত্রে কালীর আরও বহুবিধ রূপভেদ বর্ণিত হইয়াছে। অভিনবগুপ্তপাদকৃত তন্ত্রালোকে ও তন্ত্রসার গ্রন্থে এবং কালিদাস-কৃত চিদ্‌গগনচন্দ্রিকাতে কালীরূপে পরতত্ত্বের উপাসনা এবং কালীর রূপভেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। এই সকল রূপভেদের রহস্য অভিনবগুপ্তপাদ তদীয় তন্ত্রালোক গ্রন্থে এবং মহামহেশ্বর জয়রথ তন্ত্রালোকের টীকাতে বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে আদ্যাশক্তি কালিকার নিম্নলিখিত ত্রয়োদশটি রূপভেদ বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—(১) সৃষ্টিকালী, (২) স্থিতিকালী, (৩) সংহারকালী, (৪) রক্তকালী, (৫) স্বকালী বা সুকালী, (৬) যমকালী, (৭) মৃত্যুকালী, (৮) রুদ্রকালী (বা ভদ্রকালী), (৯) পরমার্ককালী, (১০) মার্তণ্ডকালী, (১১) কালাগ্নিরুদ্রকালী, (১২) মহাকালী এবং (১৩) মহাভৈরবঘোর-চণ্ডকালী। সিদ্ধান্তনাথ (বা শম্ভুনাথ)-কৃত 'ক্রমস্তুতি'তে ইঁহাদের ধ্যান দৃষ্ট হয়।

পুরশ্চর্যার্ণবের নবম তরঙ্গে কালীর নিম্নোক্ত মূর্তিভেদ বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—(১) দক্ষিণকালী, (২) মহাকালী, (৩) ভদ্রকালী, (৪) শ্মশানকালী, (৫) গুহ্যকালী, (৬) কামকলাকালী, (৭) সিদ্ধিকালী এবং (৮) সিদ্ধিলক্ষ্মী। জয়দ্রথযামলমতে কালীর মূর্তিভেদ যথা—(১) ডম্বরকালী, (২) গহনেশ্বরী, (৩) একতারা (৪) চণ্ডশাবরী, (৫) বজ্রবতী, (৬) রক্ষাকালী, (৭) ইন্দীবরীকালী, (৮) ধনদাকালী (৯) রমণ্যাকালী, (১০) ঈশানকালী, এবং (১১) মন্ত্রমাতা। সম্মোহনতন্ত্রে কালীর মূর্তিভেদ যথা :—(১) স্পর্শমণি, (২) চিন্তামণি, (৩) সিদ্ধকালী, (৪) বিদ্যারাজ্ঞী, (৫) কামকলা, (৬) হংসকালী এবং (৭) গুহ্যকালী।

গুহ্যকালীর পূজা নেপালে সমধিক প্রচলিত। গুহ্যকালীরও আবার সপ্তবিধ রূপভেদ ও মন্ত্রভেদ রহিয়াছে। ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, কুবের, যম, রাবণ, বলি, ইন্দ্র প্রভৃতি গুহ্যকালীর উপাসকমণ্ডলীর অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাকাল সংহিতাতে কামকলাকালীর উপাসকমণ্ডলী যথা—ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, ব্রহ্মা, মহাকাল, রাম, রাবণ, যম, বিবস্বান্, চন্দ্র, বিষ্ণু এবং ঋষিগণ।

দক্ষিণা কালী (দক্ষিণ-কালী)

শ্রীশ্রীকালীর বহুবিধ রূপভেদের মধ্যে "দক্ষিণাকালী"রূপে উপাসনাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। "করালবদনাং ঘোরাং" ইত্যাদি সুপ্রচলিত ধ্যানমন্ত্রটি দক্ষিণাকালীরই বর্ণনা। নির্বাণতন্ত্রের দশম পটলে "দক্ষিণাকালী" নামের তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ।
কালীনাম্না পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে॥

দক্ষিণদিগ্‌বর্তী দেশে অবস্থিত সূর্য-পুত্র যম 'কালী' নামে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করেন, এইজন্য দেবী 'দক্ষিণা কালী' নামে খ্যাতা।

পুরুষঃ দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগদ্যতে।
বাময়া দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে॥

'পুরুষকে 'দক্ষিণ' বলা হয়, শক্তিকে 'বামা' বলা হইয়া থাকে। বামা দক্ষিণকে জয় করিয়া মহামোক্ষ-প্রদানকারিণী হইয়াছেন। এইজন্য দেবী ত্রিলোকে 'দক্ষিণা কালী' নামে অভিহিতা।

নির্গুণঃ পুরুষঃ কাল্যা সৃজ্যতে লুপ্যতে যতঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে॥

দক্ষিণ অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষ কালী কর্তৃক সৃষ্ট ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এইজন্য দেবী ত্রিলোকে 'দক্ষিণা কালী' নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

কামাখ্যাতন্ত্রে অন্যপ্রকার নিরুক্তি দৃষ্ট হয়,—

যথা কর্মসমাপ্তৌ চ দক্ষিণা ফলসিদ্ধিদা।
তথা মুক্তিরসৌ দেবি সর্বেষাং ফলদায়িনী।
অতো হি দক্ষিণাকালী কথ্যতে বরবর্ণিনি॥

যেমন কর্মসমাপ্তিতে দক্ষিণা উক্ত কর্মের ফল-সিদ্ধি প্রদান করে, তেমনি দেবী সকলকে মুক্তিরূপ ফলদান করিয়া থাকেন; এই কারণে দেবী 'দক্ষিণা কালী' নামে কথিতা হন।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "বরদানেষু চতুরা তেনেয়ং দক্ষিণা স্মৃতা"। দেবী ভক্তগণকে বরদানে চতুরা বলিয়া 'দক্ষিণা কালী' নামে খ্যাতা।

মহাকাল-বিরচিত "কর্পূরাদি-স্তোত্রে" দক্ষিণা কালীর স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং উক্ত স্তোত্রের টীকায় শ্রীমদ্ বিমলানন্দ স্বামী দক্ষিণা-কালী-ধ্যানরহস্য উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ডের অন্তর্গত কালিকা উপনিষদে কালিকার ধ্যান এইভাবে সূত্রিত হইয়াছে,—"অভিনব-জলধরসঙ্কাশা ঘন-স্তনী কুটিলদংষ্ট্রা শবাসনা কালিকা ধ্যেয়া।" নবমেঘতুল্যা, নিবিড়স্তনবিশিষ্টা, করালদশনা এবং শবাসনারূপে কালিকাকে ধ্যান করিবে। এই ধ্যানের দ্বারা জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়—

"মত্বা শিবময়ো ভবেৎ।"

দক্ষিণা কালিকার ধ্যানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কালিকা উপনিষদে শিব দেবীকে বলিতেছেন,—

আবয়োঃ পাত্রভূতোঽসৌ সুকৃতী ত্যক্তকল্মষঃ।
জীবন্মুক্তো স বিজ্ঞেয়ো যঃ স্মরেদ্
ঘোরদক্ষিণাম্॥

যে সাধক এই ভীষণা দক্ষিণা কালিকাকে ধ্যান করে, সে আমাদের উভয়ের কৃপাপাত্র হয়। তাহাকে সুকৃতি, নিষ্পাপ ও জীবন্মুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কালী-সম্প্রদায়-সাহিত্য

শ্রীশ্রীকালী মহাবিদ্যা বিষয়ে মূলগ্রন্থ, টীকা টিপ্পনী ও প্রকরণ গ্রন্থাদি লইয়া এক বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক রহস্য, উপাসনাতত্ত্ব এবং সাধনসংক্রান্ত খুঁটিনাটির বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ আলোচ্য, যথা—জয়দ্রথযামল, কালীতন্ত্র, কালীকুলামৃত, মহাকালসংহিতা, ব্যোমকেশ-সংহিতা, কালীকুলক্রমার্চন, শ্যামারহস্য (পূর্ণানন্দ গিরি-কৃত), শাক্তক্রম, কালীবিলাস, কালিকার্চন মুকুর, কর্পূরস্তব ও তাহার টীকাদি, কালজ্ঞান, কালোত্তর, উত্তরতন্ত্র, চিদ্‌গগন-চন্দ্রিকা (কালিদাস-কৃত), শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের কালীখণ্ড ইত্যাদি। পুরশ্চর্যার্ণবের নবম-তরঙ্গের অন্তর্গত প্রথম মহাবিদ্যা-প্রকরণে একত্র বহু বিষয় সংগৃহীত আছে।

রসায়নী হেনরী ময়সন

অধ্যাপক স্বুবর্ণকমল রায়

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপয়িতাগণের জীবনধারা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দীনহীন পরিবারে জন্মলাভ করিয়াও নিজ কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতার দ্বারা জীবনে সফলকাম হইয়াছেন এবং বিশ্ব-বরেণ্য সাধকরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। আজ এরূপ একজন বিজ্ঞান-সাধকের সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

এই বিজ্ঞানীর নাম হেনরী ময়সন (Henry Moissan)। ইনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী রসায়নী। হেনরী ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করেন। শৈশবে তিনি ফ্রান্সের একটি ক্ষুদ্র শহরে পড়াশুনা করেন। তাঁহার স্কুলে জেম্‌স্ (James) নামে একজন প্রবীণ বিচক্ষণ বিজ্ঞান-শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকমহাশয় প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে থাকেন। হেনরীর পিতা একজন সামান্য রসায়নী ছিলেন। তাঁহার মোটেই আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। পিতা ও শিক্ষকের আওতায় লালিতপালিত হইয়া ময়সন অল্প বয়সেই বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাবান হন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগা—পিতার আর্থিক অনটনের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করার পূর্বেই তাঁহাকে স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা দুঃখ পাইয়াছেন তাহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মিঃ জেম্‌স্। ময়সন উপায়ান্তর না দেখিয়া চাকরির সন্ধানে রাজধানী প্যারিস (Paris) শহরে উপনীত হইয়া অনেক চেষ্টার পর একটি ঔষধের দোকানে সামান্য কর্মচারী-রূপে প্রবিষ্ট হন। ঔষধাদি গুছাইয়া ও বিক্রয় করিয়া তাঁহার লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় থাকিত না। তিনি নিজের অবস্থায় অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। লেখাপড়ার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে একটি গৃহ-শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিয়া তিনি আবার স্কুলে ভরতি হইলেন এবং এ কাজ ছাড়িয়া দিলেন। এই স্কুলে মিঃ ফ্রেমি (Fremy) ও ডেহেরান (Deheran) নামে দুইজন মহাপণ্ডিত তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া অতি আগ্রহে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময় গৃহশিক্ষকতার একমাত্র আয় হইতে তিনি সমস্ত খরচ নির্বাহ করিতেন। নিজের অদম্য উৎসাহ ও শিক্ষকদের সাহচর্যে তিনি অল্প-দিনের মধ্যেই ডিগ্রি লাভ করেন (১৮৭৪ খৃঃ)। ভাগ্যক্রমে এ সময় তিনি কয়েকজন অতি বিচক্ষণ ও সদ্‌ভাবাপন্ন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহারা ৬।৭ জন বন্ধু একত্র হইয়া বিবিধ সাংস্কৃতিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। এমনকি চিত্রবিদ্যাও বাদ যাইত না। এ সময় তিনি নিজ ভাষাতে এরূপ পারদর্শী হন যে, পরবর্তিকালে একজন বিচক্ষণ বক্তা ও লেখকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। শেষ জীবনে ময়সন তাঁহার এই বন্ধুদের কথা স্মরণ করিয়া খুবই আনন্দ পাইতেন।

হেনরী তাঁহার দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে বৃক্ষাদির রাসায়নিক দেহতত্ত্ব শিক্ষা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সময়টা ছিল জৈব (organic) রসায়নের যুগ। গবেষকগণ ইহাতেই ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু ময়সন মোড় ফিরাইয়া

দিলেন। তিনি অজৈব রসায়নে মনোনিবেশ করিলেন। শিক্ষকদের সহানুভূতি ও নিজের মানসিক দৃঢ়তা অচিরেই তাঁহাকে জয়মাল্য দান করিল। তিনি অজৈব রসায়নে যুগপ্রবর্তক-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তাঁহার তিনশত গবেষণা-নিবন্ধের প্রত্যেকটি অজৈব রসায়নের প্রেরণা যোগাইয়াছে। পণ্ডিতবরের হৃদয়ে অলীক কল্পনার স্থান ছিল না। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ কর্মযোগী। এই কর্মস্রোতের মধ্য দিয়া তিনি ১৮৭৯ খৃঃ ডক্টর উপাধি লাভ করেন এবং ২৭ বৎসর বয়সে অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ময়সন তাঁহার ক্ষুদ্র শহর ছাড়িবার পূর্বে লুগান (Lugan) নামক স্থানীয় একজন রসায়নিকের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হন। লুগানের একটি সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা ছিল। ডক্টর ময়সন এই মেয়েটিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন বেশ আনন্দপূর্ণ ছিল।

১৮৮৪ খৃঃ ময়সন যে বিখ্যাত গবেষণা আরম্ভ করেন তাহার ফলে ফ্লোরিন (Fluorine) নামক মৌলিকটি তাঁহার হাতে ধরা পড়ে। ফ্লোরিনের যোগিক বহুদিন যাবৎ বিজ্ঞান-সমাজে পরিচিত ছিল। কিন্তু মৌলিকটিকে উদ্ধার করা বড়ই বিপদসঙ্কুল ব্যাপার ছিল। কারণ ইহা একটি দারুণ পদার্থ যাহা যে-কোন জিনিসকে আক্রমণ করিতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া কতিপয় বিখ্যাত রসায়নীর প্রাণসংশয় হয় এবং কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। পৃথিবীর তদানীন্তন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ রসায়নী, যথা—ডেভি (Davy), গেলুজাক (Gay-Lussac) থেনার্ড (Thenard), ফ্রেমি (Fremy) পর্যন্ত ফ্লোরিন-উদ্ধারসংগ্রামে অগ্রসর হইয়া ভীষণ ধাক্কা খাইয়া পশ্চাৎপদ হন। ১৮৮৬ খৃঃ ময়সনের সহকর্মী মিঃ ডেব্রে (Debray) ফ্রান্স একাডেমীতে তাঁহাকে ফ্লোরিন আবিষ্কারকর্তা বলিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। কিন্তু তারপর একটি মজার ব্যাপার ঘটে। ফ্রান্স একাডেমীর প্রেসিডেন্ট কয়েকজন বিশিষ্ট রাসায়নিককে ময়সনের আবিষ্কারের সত্যতা নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁহারা যে দিন ময়সনের গবেষণাগারে তাঁহার ফ্লোরিন প্রস্তুতির সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য আসিলেন, সেদিন ময়সন কিছুতেই তাঁহার পরীক্ষণটি কার্যকরী করিতে পারিলেন না। তিনি লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, পরের দিন যখন নূতন করিয়া পরীক্ষণে চেষ্টিত হইলেন অমনি হু হু করিয়া ফ্লোরিন গ্যাস তাঁহার ভাণ্ডে আসিয়া জমা হইল। সংবাদ তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে প্রেরিত হইলে বিজ্ঞানিগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়া তাঁহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিলেন। এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে হেনরী ময়সনের নাম দেশবিদেশে ঘোষিত হইল। ফ্রান্স একাডেমী অনতিবিলম্বে তাঁহাকে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত গবেষণা-কেন্দ্র ইকলে ডে ফার্মাসীতে (Ecole De Pharmacia) অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই সর্বপ্রথম তিনি অতি উচ্চ একটি গবেষণাগারের নায়ক হইলেন। ইহাতে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইল। এবার তিনি হীরকখণ্ড প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই অমূল্য প্রকৃতিজাত পদার্থ সেদিন পর্যন্ত কেহ কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ার করিতে পারেন নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি অঙ্গারকে ৪০০০ ডিগ্রি তাপে বিগলিত করিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড প্রস্তুত করিলেন। এবার দুইটি কারণে দ্বিতীয় জয়-যাত্রার পথ উন্মুক্ত হইল। প্রথমতঃ কৃত্রিম

হীরকপ্রস্তুতির পথপ্রদর্শক হইলেন, দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এত উচ্চ উত্তাপসৃষ্টির পন্থা আবিষ্কার করিয়া গবেষণাক্ষেত্রে নূতন উদ্দীপনা আনিলেন। প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরী বিদ্যায় তাঁহার অভূতপূর্ব আদর হইল।

তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুসকল এই তাপের মধ্যে পড়িয়া রূপান্বিত হইতে লাগিল! উহাদের শেষ পরিণতি কোথায় জানিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এদিকে ময়সন উচ্চতাপে ধাতুসকলের সঙ্গে অঙ্গার-সংযোগে মনোনিবেশ করিলেন। ফলে ক্যালসিয়াম ও কার্বনের যৌগিক ক্যালসিয়াম কার্বাইড (Carbide) নামে একটি অপূর্ব পদার্থ তাঁহার হস্তগত হইল। এসিটিলিন গ্যাসের জনক এই পদার্থটি। মাত্র জলসংযোগে ইহা এসিটিলিন গ্যাস দান করে। যাঁহারা কার্বাইড আলো ব্যবহার করেন তাঁহারা জানেন অগ্নিসংযোগে এসিটিলিন কি চমৎকার উজ্জ্বল আলো দান করে। বিদ্যুৎহীন স্থানে বিবাহাদি উৎসবে, এবং উচ্চতাপ-সৃষ্টির ব্যাপারে আজও মহাত্মা ময়সনকে স্মরণ না করিয়া উপায় নাই।

মৃতপ্রায় অজৈব রসায়নে ময়সন যে পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার দ্বারা দেশবিদেশের গবেষকগণ খুবই উদ্বুদ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন নূতন গবেষণাক্ষেত্রের সূত্রপাত হইল। ময়সন এবার প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ সর্বত্র তাঁহার অধিকতর সমাদর আরম্ভ হইল। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সংসদ তাঁহাকে সভ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং ১৮৯৬ খৃঃ ইংরেজ বিজ্ঞান সংসদ ডেভি পদক দ্বারা ভূষিত করিলেন। ১৯০৩ খৃঃ জার্মানী হইতে আর একটি সম্মান আসিল এবং ঐ বৎসরই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হইল।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যর উইলিয়াম র‍্যামজে ময়সন সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন: "ময়সন একজন বিচক্ষণ বক্তা। তাঁহার বক্তৃতায় ছেলেরা যেরূপ ভিড় করিত তাহা কদাচিৎ দেখা যায়। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা ছাত্রদের কাছে অমূল্য ছিল। দুই ঘণ্টা, পৌনে দুই ঘণ্টা তিনি ছেলেদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। যেমন প্রাঞ্জল ভাষা ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যান, সেরূপ পরীক্ষণ দর্শন। তিনি বহুদিন শ্রোতাদের স্মৃতিপথে থাকিবেন ইত্যাদি।"

ময়সনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া দেশ-বিদেশ হইতে বহু ছাত্র প্যারিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অধীনে একটু স্থান পাওয়ার জন্য আকুতি-মিনতি করিতেন। ১৮৯৯ খৃঃ তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে দুইজন জার্মান, একজন অস্ট্রিয়ান, একজন ইংরাজ, একজন আমেরিকান ও দুইজন নরওয়েজিয়ান ছিলেন। তাঁহার গবেষণার ফল প্রায়শঃ ব্যবসাক্ষেত্রে প্রয়োজ্য ছিল। তিনি অত্যন্ত সুপরিপাটি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার গবেষণাগারে কোথাও আবর্জনা থাকিতে পরিত না। একবিন্দু জল কাহারও টেবিলে দেখিলে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার সাংসারিক জীবন খুব সুখী ছিল। তিনি অবসরসময়ে স্ত্রী-পুত্র সহ দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ময়সন দেহরক্ষা করেন। এপেনডিসাইটিস ব্যাধিতে তিনি মারা যান। অনেকের ধারণা মারাত্মক গ্যাস লইয়া গবেষণায় রত থাকাতে তাঁহার শরীর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। শেষদিনে তিনি বলিতেন, "আমার জীবনটা খুবই সাফল্যমণ্ডিত। আমি কাজে ও বাড়ীতে খুব আনন্দে থাকিতাম।"

সমালোচনা

হিন্দু ষড়দর্শন : স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ স্বরস্বতী। ২য় সং। প্রকাশিকা : শ্রীমতী অসীমা গোস্বামী, তুলসী-বীণা ট্রাস্ট, শ্রীরামপুর (হুগলী)। পৃঃ ১৫২। দাম ৮·০০ টাকা।

নাম হিন্দু ষড়দর্শন হলেও গ্রন্থখানিতে উত্তর মীমাংসাদর্শন বা বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয়নি। মাত্র ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায় (অধিকার ও প্রস্থান ; 'ব্রহ্ম ও মায়ার' ধারণা বোঝাবার কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে। একথা গ্রন্থকার অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছেন, এবং বলেছেন, "ভবিষ্যতে আর একখানা পুস্তিকায় বেদান্তের কথা সহজ করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।"

এই সহজ করে বলার মধ্যেই গ্রন্থখানির মূল্য এবং গ্রন্থকারের কৃতিত্ব। গ্রন্থখানির উৎস হল কয়েকটি বক্তৃতা যা পরে পুস্তকাকার গ্রহণ করে। স্বল্পপরিসর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে হিন্দুর প্রথম পাঁচটি দর্শনের—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং (পূর্ব) মীমাংসা—পরিচয় দেওয়া বিশেষ দুরূহ ব্যাপার, শ্রোতারা নির্বাচিত হলেও দুরূহ ব্যাপার। এই দুরূহ কার্যকে সহজসাধ্য করেছেন স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ। প্রথম দুটি বক্তৃতায় (গ্রন্থে অধ্যায়ে পরিণত) উপক্রমণিকা সমাপ্ত করে, বা তাঁর নিজের ভাষায় 'জমি তৈরী করে', পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন, এবং ব্রহ্ম ও মায়ার ধারণার অবতারণা করে বেদান্তকে ছুঁয়েও গেছেন। (অন্যান্য অধ্যায়েও 'ব্রহ্ম' ও 'মায়ার' উল্লেখ আছে—যেমন ৮৮ পৃষ্ঠা।) সুতরাং গ্রন্থখানিকে ষড়দর্শন বলে একেবারে যে অভিহিত করা যায় না, তাও নয়।

গ্রন্থখানি মোটেই পল্লবগ্রাহিতার ভিত্তিতে রচিত নয়, প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থকারের বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ হতে হয়। মূল বক্তব্যটি কিভাবে বলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিভাবে উপমার সাহায্য নিতে হয়, তা লেখকের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজী শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার কৌশলও তাঁর জানা আছে। বিশ্লেষণ-ব্যাপারে তাঁর শ্রদ্ধাও লক্ষণীয়। হিন্দুদর্শনের প্রচারকার্যে এটাও প্রয়োজন।

গ্রন্থখানির দুটি ত্রুটি উল্লেখ না করে পারলাম না : ভাষায় বেশ কিছু গুরুচণ্ডালী দোষ এবং একটি নির্ঘণ্টের (index) অভাব। দ্বিতীয়টির দরুন Reference Book হিসেবে গ্রন্থখানির মূল্য খানিকটা হ্রাস পেয়েছে সন্দেহ নেই। পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি দুটি দূর করলে দর্শন-পরিচয়মূলক বাংলা সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি ঘটবে। **—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়**

প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম : ডক্টর প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত :, গ্রন্থসংহিতা, কলিকাতা-৩১ : ১৭৬ পৃষ্ঠা : মূল্য ১২·০০ টাকা।

বাংলা ভাষায় প্রাচীন রাজধর্ম সম্বন্ধে এই গবেষণামূলক গ্রন্থখানিকে স্বাগত এবং গবেষককে অভিনন্দন জানাই। ইংরেজীতে এই ধরনের গ্রন্থ কিছু কিছু থাকলেও বাংলায় নেই বললেও চলে। ডক্টর প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত মহাশয় তাঁর 'নিবেদনে' মোটামুটি দু'খানি বাংলা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন : মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ত-

তার্থ প্রণীত 'প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি' এবং শ্রীসুখময় সপ্ততীর্থ-রচিত 'মহাভারতের সমাজ'। ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে তিনি মাত্র একখানির নামোল্লেখ করেছেন: মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পাণ্ডুরাং বামন কানের History of Dharmasastra। ইংরেজীতে আরও বেশ কয়েকখানি পুস্তক আছে—যথা, জয়াসয়ালের Hindu Polity, আয়েঙ্গারের Rajdharmakanda, স্যর রামস্বামী আয়ারের Indian Political Theories, অধ্যাপক বিনয় সরকারের The Political Institutions and Theories of the Hindus ইত্যাদি। ডক্টর দত্ত অবশ্য নিবেদনে উপরি-উক্ত তিনখানি গ্রন্থ এবং মূল রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতিসার ও কামন্দকীয় নীতিসারের ওপরই নির্ভর করেছেন। মূল গ্রন্থগুলি থেকে প্রয়োজনীয় শ্লোক, উক্তি ইত্যাদি উদ্ধৃত করে যে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে তিনি প্রাচীন ভারতে 'রাজধর্মের' প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যিই মূল্যবান। উপরন্তু, 'ভারতীয়গণ রাষ্ট্রীয়চেতনাহীন'—গ্রন্থখানি এই অভিযোগের প্রতিবাদও বটে।

গ্রন্থখানি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ, রাজধর্মের তাৎপর্য, রাজধর্ম ও দণ্ড ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে রাজ্য বা রাষ্ট্রের গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অমাত্যসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়। চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা (decentralisation) স্থান পেয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যথাক্রমে পর্যালোচিত হয়েছে 'দুর্গপ্রকৃতি', রাজকোষ (treasury), 'বল' (force) বা রাজ্যরক্ষায় শক্তিপ্রয়োগের স্থান এবং সুহৃদ বা মিত্র বা মোটামুটি বর্তমানে যাকে কূটনৈতিক সম্পর্ক (diplomacy) বলে অভিহিত করা হয়। এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই লেখক কিছু না কিছু নতুন আলোকসম্পাত করে বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধ করেছেন, তা অনস্বীকার্য।

অবশ্য গ্রন্থখানি যে ত্রুটিবিহীন তা নয়। প্রথমত, এ ধরনের গ্রন্থে সাধারণত একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়ে থাকে, লেখক কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পাদটীকায় গ্রন্থনির্দেশিকা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। সব ক্ষেত্রে আবার এই গ্রন্থনির্দেশিকাও সম্পূর্ণ নয়। যেমন, ৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় Aristotle-এর Politics থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু বলা হয়নি কার অনুবাদ। কয়েকটি বিদেশী নামের উচ্চারণও সম্পূর্ণ নতুন—যেমন Bluntschli (ব্লুন্টস্‌লি ৩০ পৃষ্ঠা) ব্লান্টস্‌লি কেন হবে? আবার রাষ্ট্রের অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্য-আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন (৩৯ পৃষ্ঠা) 'বর্তমানে অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রাজ্যের চারিটি অঙ্গ ...'। (৫৮ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপভাবে, 'অর্থনীতিশাস্ত্র' ব্যবহৃত হয়েছে।) এখানে 'অর্থনীতিশাস্ত্রে'র পরিবর্তে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' শব্দটিই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। ভারতে কৌটিল্য প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থামূলক শাস্ত্রের নাম 'অর্থশাস্ত্র' করলেও পাশ্চাত্য জগতে অ্যারিস্টটলের সময় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতি (Political Science বা Politics) স্বীকৃতি পেয়ে আসছে, এবং ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথ তাঁর Wealth of Nations প্রকাশ করবার পর থেকে অর্থশাস্ত্রও (Economics) সম্পূর্ণ পৃথক বিদ্যায় পরিণত

হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় অর্থশাস্ত্র বা অর্থ-বিদ্যা (Political Economy) কথাটিও বর্তমানে আর চালু নয়।

এই রকম একটা ভুল ভূমিকা-লেখক অধ্যাপক ডক্টর কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ও করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'ব্রিটিশ গণ-তন্ত্রে তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে রাজা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহার কোন কাজই অন্যায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না— King can do no wrong—কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজতন্ত্রে রাজার অনুকূলে অবাধ ক্ষমতার অধীশ্বর বলিয়া কোন ঘোষণাপত্র দেওয়া হয় নাই।' (পৃ: ট) (The) king can do no wrong-এর অর্থ রাজার অবাধ ক্ষমতা নয়; অর্থ হল—রাজার (বা রানীর) নামে সম্পাদিত সকল কার্যাকার্যের জন্য মন্ত্রীরাই দায়ী। ইংলণ্ডেও রাজার অনুকূলে অবাধ ক্ষমতার অধীশ্বর বলে কোন ঘোষণাপত্র কখনও দেওয়া হয়েছে, এটা আমাদের জানা নেই বিখ্যাত মহাসনদ (Magna Carta) রাজার ক্ষমতা সংকুচিত করবারই ঘোষণাপত্র।

রাজধর্মের আলোচনায় ডক্টর দত্ত যে-সব প্রশাসনিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন—যেমন দুর্গনির্মাণ-পদ্ধতি, কূটনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি, তা ঠিক রাজধর্মের মধ্যে পড়ে কিনা, বিতর্কের বিষয়।

ভাষা সম্বন্ধে বক্তব্য হলো যে, সংস্কৃত-ঘেঁষা বলে বেশ একটু অস্বস্তি হয়। (যেমন ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে—'রাজা যাহাতে কোষবৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ…'। এখানে বোধহয় 'রাজকোষবৃদ্ধির দিকে' ব্যবহার করলে ভালো হ'ত।) অনেক ক্ষেত্রে বিশেষণ ও বিশেষ্যকে অযুক্তভাবে (যেমন সরলব্যবহার, উপযুক্তকাল ইত্যাদি) ব্যবহার করায় পাঠ করতে একটু অসুবিধা হয়। আলোচনা আরও বেশী অনুচ্ছেদে বিভক্ত হলে সুখপাঠ্য হত।

ত্রুটিগুলি পরবর্তী সংস্করণে দূর করলে গ্রন্থখানি সুন্দরতর হ'য়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের—যেমন, ৩৮ পৃষ্ঠায় জৈবমতবাদের (organic theory), ৫৫ ও ৭৫ পৃষ্ঠায় করবহনের সামর্থ্য (taxable capacity), ১০৬ পৃষ্ঠায় অত্যধিক গতিশীল প্রত্যক্ষ কর (steeply graduated direct tax)—ইত্যাদির পরিস্ফুটন করলে ডক্টর দত্ত প্রকৃত পথিকৃৎ বলে গণ্য হতে পারবেন।

তবুও ডক্টর প্রজারঞ্জন দত্তের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ভাবধারার পুনরুদ্ধারে তাঁকে পথিকৃৎ বলে অভিহিত করা না গেলেও, তাঁর 'প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম' যে অন্যতম অবদান তা সন্দেহাতীত। ত্রুটিগুলির উল্লেখ করলাম এই কারণে যে বর্তমান সংস্করণেও গ্রন্থখানি বিভিন্ন গবেষক, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রভৃতির কাছে বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। তাই ঘরে ঘরে না হলেও প্রত্যেক গ্রন্থাগারে গ্রন্থখানির স্থান হওয়া উচিত বলেই মনে করি।

—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বাগেরহাট অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন দুঃস্থ জনগণের সেবা ও পুনর্বাসনের কার্য (relief and rehabilitation) চালাইয়া যাইতেছেন। অন্যান্য অঞ্চলেও এই সেবাকার্য সম্প্রসারিত হইতে পারে।

বিবিধ

গত ২০. ৩. ৭২ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে শিক্ষানবিস ব্রহ্মচারীদের শিক্ষণ-কেন্দ্রের (Probationers' Training Centre) নবনির্মিত ত্রিতলের উদ্বোধন করিয়াছেন।

গত ৬.৩.৭২ অরুণাচল প্রদেশস্থিত তিরাপ নরোত্তমনগরে নামসাং-বড়ুরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রনিবাসটির উদ্বোধন করেন আসাম, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতির রাজ্যপাল শ্রী বি. কে. নেহরু। প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ছাত্রনিবাসটির ভিত্তিস্থাপন করেন স্বামী চিদাত্মানন্দজী। আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র উপজাতি-নেতা এবং বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

গত ২১.৩.৭২ মাদ্রাজ ত্যাগরায়নগরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন মেন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস (School Day) উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তামিলনাড়ুর গভর্নর শ্রী কে. কে. শাহ সভাপতিত্ব ও পুরস্কারবিতরণ করেন।

বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্র

বাংলাদেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ঢাকা, ফরিদপুর, বাগেরহাট, শ্রীহট্ট এবং দিনাজপুর কেন্দ্রে মঠের সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছেন। বাংলাদেশের অপর কেন্দ্রগুলি স্থানীয় ভক্তগণের সহায়তায় পুনর্গঠিত করা হইতেছে।

কার্যবিবরণী

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৭০ তম বর্ষের (এপ্রিল ১৯৭০-মার্চ ১৯৭১) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

শিবতীর্থ বারাণসীধামে রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রম শিবজ্ঞানে জীবসেবার পরমাদর্শ সমুজ্জ্বল রাখিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিষ্ঠা-সহকারে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের সেবায় নিরত রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের কর্মধারা :

ইনডোর জেনারেল হাসপাতাল : শয্যা-সংখ্যা ১৫০। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ২,৯৩৫ জন রোগীকে ভরতি করা হয়। গড়ে দৈনিক ১০০টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত থাকে। অস্ত্র-চিকিৎসার সংখ্যা ১,৩২৯। গঙ্গার ঘাট ও রাস্তা হইতে আনীত ৩১ জন আর্ত-নারায়ণের চিকিৎসা করা হয়। নির্মীয়মাণ অপারেশন থিয়েটার ও সার্জিক্যাল ব্লক সমাপ্তপ্রায়।

আউটডোর : বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ৪৫৮ জন রোগীর সমাগম হয়। সেবাশ্রমের শিবালা ব্রাঞ্চ সহ ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে আউটডোরে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪৮,৫৬৫, পুনরাবৃত্ত সংখ্যা ১,১৮,৬৩৯। অস্ত্রচিকিৎসা ও ইন্‌জেকশন যথাক্রমে ৯,৮০৪ ও ৪৪,৭১৯।

হোমিওপ্যাথি বিভাগ : লাকসা ও

শিবালা উত্তর স্থানে ৫ জন হোমিওপ্যাথ রোগীদের চিকিৎসা করেন।

ক্লিনিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল বিভাগ এবং এক্স-রে ও ইলেক্টো-থেরাপি বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বৃদ্ধ ও অসমর্থদের জন্য আশ্রয়ভবন: পুরুষদের আশ্রয়ভবনে ২৩ জন এবং মহিলাদের আশ্রয়ভবনে ৩৪ ছিলেন।

সাহায্য: ৫৬ জন অসমর্থ ও অসহায় বৃদ্ধাকে সাহায্য বাবদ ১,৯৩৭ টাকা ব্যয় করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৮৫০ টাকা মূল্যের কম্বল বিতরণ করা হয়।

গ্রন্থাগার: লাইব্রেরীতে ২,৭৩৫ খানি পুস্তক আছে, ৩টি দৈনিক ও ২৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

সেবাশ্রমের অধিকাংশ সেবার কাজ ত্যাগব্রতীদের দ্বারা হইয়া থাকে। বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্যে নিরত আছেন।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬৬-১৯৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষের সেবাই ভগবানের আরাধনা—এই বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া কয়েকজন ভক্ত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল আসানসোলে যে আশ্রমের সূত্রপাত করেন, তাহাই ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় এবং দুইটি জুনিয়র বেসিক স্কুল পরিচালিত হয়। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা—৮২৬। এখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প—এই তিনটি বিভাগে ছাত্রগণ তাহাদের ইচ্ছামত পড়িবার সুযোগ পায়। বেসিক বিদ্যালয় দুইটিতে ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১৩৭ ও ১৪১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল সন্তোষজনক; গত ৪ বৎসর যাবৎ ১০০% উত্তীর্ণ।

আশ্রম-ছাত্রাবাসে প্রতিবর্ষে গড়ে ৩০ জন ছাত্র থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবাসের ৩জন বিদ্যার্থীকে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে এবং ৫ জনকে আংশিক ব্যয়ে রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যার্থি-নিবাসে ৪০ জন ছাত্র থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ২,২৪৭ খানি পুস্তক আছে। অবৈতনিক পাঠাগারে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার্থে ২৬টি সাময়িক ও ৩ খানি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হয়।

দৈনন্দিন পূজা-ভজনাদি ব্যতীত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, বিশ্বকর্মাপূজা, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং অন্যান্য পুণ্যতিথিকৃত্যাদির সুচারু অনুষ্ঠান আশ্রমের কর্মধারার অন্তর্গত।

স্বাধীনতাদিবস, নেতাজীদিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রভৃতি উপলক্ষে ছাত্রগণ কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ সভায় বক্তৃতাদির মাধ্যমে দেশপ্রেম ও দেশসেবার ভাব অনির্বাণ রাখিবার প্রচেষ্টা করা হয়।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে অনাবৃষ্টিজনিত খরা-পীড়িত অঞ্চলে জনগণের সেবায় আসানসোল আশ্রম উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৬৮-৭১ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠ কর্তৃক ব্যাপকভাবে যে বন্যার্তসেবা ও শরণার্থিসেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও এই কেন্দ্র অংশ গ্রহণ করে।

উৎসব-সংবাদ

শশুরবেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে

১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৭-তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির পর প্রায় একহাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যায় রামায়ণগান হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ গঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী প্রমথানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৩রা হইতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব পালিত হইয়াছে। প্রথম দিনে পূজাপাঠাদির পর অপরাহ্নে মহাকুমা-শাসক শ্রীরমানাথ সমাদ্দারের সভাপতিত্বে আশ্রম বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরিত হয়, সন্ধ্যায় স্বামী নিরাময়ানন্দ সুললিতভাবে গীতা ব্যাখ্যা করেন।

৪ঠা মার্চ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ বিষয়টি সম্বন্ধে সভার প্রারম্ভে প্রস্তাবনারূপে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পার্ষদগণের জীবন-অনুধ্যানের মাধ্যমেই ঠাকুরকে যথাযথরূপে ধারণা করা সম্ভব। পরে স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী অমলানন্দ ভাষণ দেন।

৫ই মার্চ পূর্বাহ্নে পূজাপাঠাদি ও মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচহাজার ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ (সভাপতি), স্বামী অমলা-নন্দ, হলদিয়া শোধনাগারের প্রধান কার্যাধ্যক্ষ শ্রী এন. এস. ভি. শাস্ত্রী ও শ্রীপান্নালাল মাইতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে প্রথম দুইদিন শ্রীভুপেন চক্রবর্তী এবং তৃতীয় দিন শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় লীলাগীতি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

৬ই মার্চ সন্ধ্যায় ভারত সরকারের সৌজন্যে ৺চন্দ্র দাস ও সম্প্রদায় কর্তৃক দেহতত্ত্ব বিষয়ক বাউল-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটী-পরিচালিত সিদগোরা বিবেকানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে, উপরোক্ত বিদ্যালয় এবং ভুঁইয়াডির বিবেকানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী উৎসব ১৭ই মার্চ বৈকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী বিশ্বাশ্রয়া-নন্দ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং পুরস্কার-বিতরণ করেন।

১৮ই মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন।

১৯শে মার্চ রবিবার পূর্বাহ্নে বিবেকানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং রামকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যৌথ পুরস্কারবিতরণী উৎসব আশ্রমপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ইস্পাত কারখানার কে. এম. পি. এম. বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীচন্দ্র-কান্ত দ্বিবেদী এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (প্রধান অতিথি) ভাষণ দেন।

১৯শে মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে আশ্রম-প্রাঙ্গণে টাটা ইস্পাত কারখানার টাউন মেডি-কেল ও স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর শ্রী এস. কে. রাজার সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অধ্যাপক শিওকুমার নারায়ণ হিন্দীতে, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বাংলায় এবং সভাপতি মহাশয় ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে শ্রীরাজকৃষ্ণ গাঙ্গুলী

রামায়ণভারতী রামায়ণ গান করেন।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা

বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে গত ২২শে মার্চ শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণাপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠ ও কলিকাতাস্থ বিভিন্ন কেন্দ্রের শতাধিক সাধু-ব্রহ্মচারী সমবেত হন। দুই সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া মায়ের প্রসাদ ধারণ করেন।

দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৯.২.৭২ বেলা ৪টা ৪০ মিনিটের সময় স্বামী বাগীশ্বরানন্দ (১) কালাডি আশ্রমে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের (Cerebral thrombosis) ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৮৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য; তাঁহারই নিকট তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যথারীতি সঙ্ঘভুক্ত হন। কেরালাস্থিত মঠ-মিশনের তিরুভাল্লা, পালাই প্রভৃতি কেন্দ্রে স্বামী বাগীশ্বরানন্দ বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে নিরত থাকেন এবং এই প্রদেশে তাঁহার মহান ভাব প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ভক্তিপ্রবণ মাধুর্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

নিবেদন

১। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন পত্রিকা-সংক্রান্ত পত্রাদি বাংলায় লেখেন। উৎসবাদি সংক্রান্ত সংবাদও বাংলায় লিখিয়া পাঠানো প্রয়োজন।

২। পোষ্টাফিসের গোলমালের জন্য অনেকেই পত্রিকা পান না; তাঁহাদের অনেকেই ভাবেন আমাদের এখান হইতে ডাকে দেওয়া হয় নাই। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যেও পত্রিকা না পাইলে আমাদের জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে। — কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

মাতৃভবন (৭এ, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-২৬): রামকৃষ্ণ সারদা মিশন কর্তৃক পরিচালিত এই প্রসূতিসদনের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৯—মার্চ, ১৯৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসূতি-জননীগণের সেবাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মাতৃভবন প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার কর্মভার দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের উপর ন্যস্ত হয়। বর্তমানে এই প্রসূতি-হাসপাতালে ৫০টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ২৪টি শয্যার জন্য রোগিণীগণের কোন খরচপত্র দিতে হয় না। প্রতি বৎসর এখানে প্রায় ২,৫০০ রোগিণী ভরতি হইয়া সুচিকিৎসা-সেবা-পরিচর্যাদি লাভ করেন। হাসপাতালে অস্ত্রচিকিৎসার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অপারেশন থিয়েটারের প্রয়োজন খুবই অনুভূত হইতেছে। আউটডোর ক্লিনিক বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র শিশুদের চিকিৎসাদির জন্য শিশুবিভাগটি খোলা হয়। এখানে প্রধানতঃ নিকটস্থ বস্তী-বাসী শিশুদের স্বাস্থ্যের যত্ন লওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকগণের মধ্যে আছেন ৬জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ৫০টি বালক-বালিকাকে সকালের খাবার নিয়মিতভাবে সমবরাহ করা হইয়াছে। পূজা ও শীতের সময় নূতন কাপড় ও পশমী পোশাক দেওয়া হয়। সপ্তাহে ৬দিন ১০০টি শিশুকে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। বন্যার্তসেবায় ১০০০ ব্যক্তিকে খাদ্য বস্ত্র ঔষধাদি প্রদান করা হয়। রোগিণীগণের এবং স্থানীয় মহিলাগণের জন্য স্থাপিত গ্রন্থাগারে ১,১১৭ খানি গ্রন্থ আছে।

বালিগঞ্জ মহিলা সঙ্ঘের (৪২, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলিকাতা-১৯; সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর) রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সঙ্ঘের পঁচিশ বৎসরের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা অবলম্বন করিয়া সঙ্ঘটি স্থাপিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নরনারায়ণসেবাই সঙ্ঘের কার্যাবলীর প্রধান দুইটি ধারা। সঙ্ঘ দানলব্ধ সামান্য আয়ের দুই-তৃতীয়াংশই নরনারায়ণ-সেবায় ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছিল; গত পঁচিশ বৎসরে মোট আয় ২৯,৮২০ টাকার মধ্যে ২২,৯০৪ টাকা এই সেবাকার্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি—মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন এবং নিয়মিত পাঠচক্র—৺হরিদাস মজুমদার নির্দিষ্ট ১৬৬নং শরৎ বসু রোডে 'গীতা ভবন'-হলে অনুষ্ঠিত হয়। নরনারায়ণ-সেবার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য U. C. R. W. -এর সহযোগিতায় সঙ্ঘ কর্তৃক প্রায় ১৬ বৎসর ধরিয়া পরিচালিত একটি শিল্পকেন্দ্র—যাহার মাধ্যমে বাস্তুহারা মহিলাগণ মজুরী সাহায্য পাইয়াছেন, অশিক্ষিত ছেলে-মেয়ে ও বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালা, এবং শিক্ষিত পরিবারের ছোট ছেলে-মেয়েদের নীতি-ধর্ম-মূলক শিক্ষার জন্য রবিবাসরীয় আসর। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সঙ্ঘের

কর্মিগণ বিভিন্ন সাময়িক সেবাকার্য-পরিচালনায় যোগদান এবং আর্থিক সাহায্যও করিয়াছেন।

উৎসব-সংবাদ

ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীতে গত ৩রা হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ৩রা মার্চ উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। সকালে পূজাদি ও বিকালে অনুষ্ঠিত জনসভার পর সন্ধ্যায় 'শবরী' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। ৪ঠা মার্চ সকালে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ কঠোপনিষদ্ পাঠ করেন। পরে ভজন ও প্রসাদবিতরণ করা হয়। বিকালে সভা ও সন্ধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ৫ই মার্চ সকালে শোভাযাত্রা ও দুপুরে দেড়সহস্রাধিক নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে সভা ও সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন দিনে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়।

হাইলাকান্দি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির আশ্রমপ্রাঙ্গণে গত ১লা মার্চ হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম বার্ষিক উৎসব পূজা, পাঠ, ধর্মসভাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। লীলাগীতি, মহিলাসভা, বিবেকানন্দ-শিশুসঙ্ঘ কর্তৃক গান আবৃত্তি ও নাট্যাংশ, স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা মাতৃসঙ্গীত, ভজনকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ২টি ধর্মসভায় বেলুড় মঠের স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী সত্ত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষণ দেন। ৫ই মার্চ সমস্তদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি, কীর্তন এবং প্রায় দেড় হাজার নরনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি প্রাঙ্গণে গত ১৫ই হইতে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ১৫ই ও ১৬ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। ১৭ই মার্চ পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় ডিব্রুগড় জেলাশাসক শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস (সভাপতি) এবং স্বামী জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। ১৮ই মার্চ পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা হয়। সন্ধ্যায় জনসভায় ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস (সভাপতি) ও স্বামী জীবানন্দ স্বামীজীর জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। ১৯শে মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোচনা এবং মধ্যাহ্নে কীর্তন ও নারায়ণ-সেবা হয়।

এই উপলক্ষে আশ্রমের উদ্যোগে ১৮ই মার্চ স্থানীয় বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে এবং ১৯শে মার্চ স্থানীয় সারদা সঙ্ঘে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে স্বামী জীবানন্দ বক্তৃতা দেন।

চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৪শে হইতে ২৬শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিতপ্রবর সূর্যনারায়ণ তর্কতীর্থ ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমতী কস্তুরী গুপ্তা।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সান্ধ্য জনসভায় স্বামী

জীবানন্দ ও স্বামী দেবদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, এবং স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমায়ের জীবন, এবং শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন। বেলুড় জনশিক্ষামন্দিরের 'শ্রীরামকৃষ্ণচলচ্চিত্র', পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার 'মহা উদ্বোধন' নাটক ও রসরঙ্গের সভ্যগণের 'শ্রীরামকৃষ্ণগীতি-আলেখ্য' অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। সমাপ্তি দিবসে চারি সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গোদাপিয়াশালে (মেদিনীপুর) গত ২৬শে মার্চ পূজাপাঠাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই দিন প্রভাতে দশখানি গ্রামে প্রভাতফেরী হয় এবং মধ্যাহ্নে দেড়সহস্রাধিক নরনারীকে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন অধিকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বামী জ্ঞানঘনানন্দ ও উপাধ্যক্ষ শ্রীরতিমোহন সিংহ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা করেন

চাকদহ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘের মন্দিরে গত ১৮ই মার্চ হইতে ২২শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। কলিকাতার 'রসরঙ্গ' কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-গীতি, চতুঃপ্রহর শ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্তন ও রাম-গীতিসুধাকর শ্রীদ্বিজরাজ বন্দোপাধ্যায়ের রামায়ণগান উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১৯শে মার্চ প্রায় ৩ হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে ধর্ম-সভায় স্বামী নিবৃত্তানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন।

পরলোকে ধীরেন্দ্রলাল আচার্য

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, ধীরেন্দ্রলাল আচার্য ৫১ বৎসর বয়সে গত ২রা মার্চ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি চীফ্ বয়লার ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি এবং মিশনের বহু সেবাকার্যে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

গুন্টুর শহরে (অন্ধ্রপ্রদেশে) গত ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭১ গুন্টুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ পূজাদি করেন। দুপুরে প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহ্ণে স্থানীয় জেলাশাসকের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হয়। সভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দেন এবং সমিতির সম্পাদক শ্রী জি. আনকাইয়া কার্যবিবরণী পাঠ করেন। পরদিন মধ্যাহ্নে প্রায় একহাজার নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন এবং অপরাহ্ণে রাজমহেন্দ্রী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নাগেশানন্দের সভাপতিত্বে আর একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বোধস্বরূপানন্দ ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীবিশ্বনাথ শর্মা কথায় ও গানে 'হরিকথা কালক্ষেপম্' পরিবেশন করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রথম মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শহরে খুবই আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং মাদ্রাজ, রাজমহেন্দ্রী, তেনালী, নেলোর, বাপটলা প্রভৃতি দূর দূর স্থান হইতে বহুজন এই উৎসবে যোগদান করেন।

মন্দিরটির নির্মাণে পঞ্চাশহাজার টাকা লাগিয়াছে। মন্দিরের পাশেই একলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভবন নির্মিত হইয়াছে; চার বৎসর যাবৎ বিদ্যালয়টি চলিতেছে। ইহা ছাড়া সমিতিতে একটি পুস্তকালয়ও আছে

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।]　　১৫ই মাঘ।　　[২য় সংখ্যা।]

সখার প্রতি

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণসাক্ষী—শিশুর ক্রন্দন; হেথা সুখ ইচ্ছ, মতিমান্ ?
সাক্ষাৎ-নরক স্বর্গময়, কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীত-দাস বল কোথা যায় ?
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন উপার্জ্জন ;
ব্রত, ত্যাগ, তপস্যা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর-ধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্ম্মর-মুরতি তা কি সয় ?
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।
বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জ্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভব-ঘোর, এক তরী করে পারাপার—
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত, প্রেত আদি, দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব', 'দেব' বল আর কেবা ? কেবা বল সবারে চালায় ?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে ! প্রেমের প্রেরণ !!
হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখ-দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রচিত এই কবিতাটির চারটি পঙ্‌ক্তি এখানে নাই এবং 'পক্ষহীন' স্থলে 'লক্ষ্য-হীন' ছাপা হইয়াছে। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে ?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধি-রথে করি আরোহণ—
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ-সুখ করে আবর্ত্তন।
লক্ষ্য-হীন শোন বিহঙ্গম, এযে নহে পথ পালাবার
বারম্বার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থ হীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপ-মুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেম-সিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও", যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্ব-ভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

প্রাণায়াম

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

[স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত ইংরাজী "রাজ-যোগের" শুদ্ধানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য ১ম সংখ্যায় কিয়দংশ দিয়াছিলাম। এই রাজযোগ স্বামীজির গভীর সাধনা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তির ফল-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান-সাহায্যে কেমন সহজে বুঝান যায়, ইহা স্বামীজির রাজযোগ-পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমরা এ সংখ্যায়ও উহার কিয়দংশ দিলাম। ইহাতে অনেকে সাধন-বিষয়ে নূতন আলোক পাইবেন, ও রাজযোগ যে কি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে, তাহার আভাস পাইবেন।]

অনেকেই বিবেচনা করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়াবিশেষ, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি অল্পই সম্বন্ধ। প্রকৃত প্রাণায়াম সাধনে অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। শ্বাস-

প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটী উপায়মাত্র। প্রাণায়ামের অর্থ, প্রাণের সংযম। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমুদায় জগৎ দুটী পদার্থে নির্ম্মিত। তাহাদের মধ্যে একটীর নাম আকাশ। এই আকাশ একটী সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বানুস্যূত সত্তা। যে কোন বস্তুর আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই সূর্য্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। সর্ব্ব প্রাণীর শরীর—পশু-শরীর, উদ্ভিদ প্রভৃতি যে সকল রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্তু আমরা ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন বস্তু আছে, সমুদায়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই, ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহা সাধারণ অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন আকৃতি ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকেন। আবার কল্পান্তে সমুদায় কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ-- সকলই পুনর্ব্বার আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়।

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? এই প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণও সেই-রূপ জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদায়ই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদায় শক্তিগুলিই প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদায় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছেন—এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বুকাকর্ষণ-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ (nerve-current) অথবা চিন্তা শক্তিরূপ, দৈহিক সমুদায় ক্রিয়ারূপে প্রকাশ হইয়াছেন। চিন্তা-শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্য্যন্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। "যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?"* এই আকাশই গতিশূন্য হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের কোন প্রকার প্রকাশ ছিল না বটে, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, কেবল কল্পান্তে উহারা শান্ত ভাব ধারণ করে—অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে—পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর কার্য্য করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে পরিদৃশ্যমান সাকার বস্তুজাত উৎপন্ন হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে এই প্রাণও নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা ও উহাকে সংযম করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ।

* নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্ ইত্যাদি;
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্ ইত্যাদি।—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন ও উহাকে জয় করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা হইলে, জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য স্বস্থান-চ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য্য পর্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার শক্তি-লাভই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, তাহারা তাঁহার আজ্ঞা-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করে; মৃত ব্যক্তিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আগমন করে। প্রকৃতির সমুদায় শক্তিই তাঁহার আজ্ঞামাত্রে দাসবৎ কার্য্য করে। অজ্ঞ লোকেরা যোগীর এই সকল কার্য্য-কলাপ লোকাতীত বলিয়া মনে করে। হিন্দুদিগের একটী বিশেষত্ব এই যে. উহারা যে কোন তত্ত্বের যতদূর সম্ভব একটী সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে; উহার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে, তাহা পরে মীমাংসার জন্য রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" এমন কি বস্তু আছে যাহা জানিলে সমুদায় জানা যায়। এইরূপ, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, যত দর্শন আছে, সমুদায় কেবল, যে বস্তুকে জানিলে সমুদায়ই জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। যদি কোন লোক জগতের তত্ত্ব একটু একটু করিয়া জানিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার ত অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে অবশ্য এক এক কণা বালুকে পর্য্যন্ত পৃথগ্ভাবে জানিতে হইবে। তবেই দেখা গেল যে, এইরূপে সমুদায় জানা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এরূপভাবে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কোথায়? এক এক বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া মানুষের সর্ব্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন. এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ সত্তা রহিয়াছে, উহাকে ধরিতে বা জানিতে পারিলেই সমুদায় জানিতে পারা যায়। এইভাবেই বেদে সমুদায় জগৎকে এক সত্তা-সামান্যে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। যিনি এই 'অস্তি'-স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমুদায় জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত প্রণালীতেই সমুদায় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সামান্য শক্তিতে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে যতকিছু ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সমুদায়কেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ আপনার মন নহে, সকলের মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্যান্য যত দেহ আছে, সকলকেই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদায় শক্তির সমষ্টিস্বরূপ।

কি করিয়া এই প্রাণ জয় হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধনার্থী ব্যক্তিরই নিজের অত্যন্ত সমীপস্থ যাহা, তাহা হইতেই সাধন আরম্ভ করা উচিত— তাঁহার সমীপস্থ যাহা কিছু সমস্তই জয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। জগতস্থ সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত; আবার মন তাহা অপেক্ষাও

সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশটুকু এই শরীর ও মনকে চালাইতেছে সেই প্রাণটুকুই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত। এই যে ক্ষুদ্র প্রাণ-তরঙ্গ —যাহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণসমুদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তরঙ্গ। যদি আমরা এই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে পারি, তবে আমরা সমুদয় প্রাণ-সমুদ্রকে জয় করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন; তখন আর, কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তিনি একরূপ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ হন। আমরা সকল দেশেই দেখিতে পাই, এমন সকল সম্প্রদায় আছে, যাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণসংযম করিবার চেষ্টা করিতেছে। * * *

এই প্রাণই সমুদায় প্রাণীর অন্তরে জীবনী-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। মনোবৃত্তি ইহার সূক্ষ্ম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। যাহাকে আমরা সচরাচর মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবৃত্তি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির অনেক প্রকারভেদ আছে। যাহাকে আমরা সহজাতজ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-বিরহিত চিত্তবৃত্তি বলি, তাহা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য্যক্ষেত্র। আমাকে একটা মশক দংশন করিল; আমার হাত আপনা আপনি গিয়া উহাকে আঘাত করিতে গেল। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ একপ্রকারের মনোবৃত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়াগুলিই (reflex actions)* এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির অন্তর্গত। ইহা হইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে। উহাকে জ্ঞান-পূর্ব্বক মনোবৃত্তি বলে (conscious)। আমি বিচার করিয়া থাকি, চিন্তা করিয়া থাকি, সকল বিষয়ের দুদিক বিচার করিয়া দেখি, কিন্তু ইহাতেই সমুদায় মনোবৃত্তি ফুরাইল না। আমরা জানি, যুক্তি ও তর্ক অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচরণ করে। উহা আমাদিগকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, তাহার উপর উহার আর অধিকার নাই। যেস্থানটুকুর ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি অল্প—অতি সংকীর্ণ। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাইতেছি, নানাবিধ বিষয়, যাহা যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও ইহার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতু, সৌরজগতের অধিকারের অন্তর্ভূত না হইলেও যেমন কখন কখন ইহার ভিতর আসিয়া পড়ে ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ অনেক তত্ত্ব, যাহা আমাদের যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও যেন উহার অধিকারের ভিতর আসিয়া পড়ে। ইহা নিশ্চয় যে, উহারা ঐ সীমার বহির্দ্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচারশক্তি কিন্তু ঐ সীমা ছাড়াইয়া বড় অধিক দূর যাইতে পারে না। ঐ তত্ত্বসমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তির সীমার বহির্ভূত প্রদেশে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের বিচার যুক্তি তথায় পৌঁছিতেই পারে না। কিন্তু যোগীরা বলেন, ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরমসীমা,

* বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র, সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা না লইয়া আপনা আপনি কার্য্য করে, সেই কার্য্যকে reflex actions বলে।

তাহা কখনই হইতে পারে না। মন পূর্ব্বোক্ত দুইটী ভূমি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। সেই ভূমিকে আমরা জ্ঞানাতীত (পূর্ণচৈতন্য) ভূমি বলিতে পারি। যখন মন, সমাধি নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরূঢ় হয়, তখন উহা যুক্তির রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সমুদয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম শক্তিগুলি, যাহারা প্রাণেরই অবস্থা-ভেদ-মাত্র, তাহারা যদি ঠিক প্রকৃত-পথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা মনের উপর বিশেষ-ভাবে কার্য্য করে। মনও তখন পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত বা পূর্ণচৈতন্যভূমিতে চলিয়া যায় ও তথা হইতে কার্য্য করিতে থাকে।

কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই এক অখণ্ড বস্তুরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এক অখণ্ড বস্তুই যেন নানারূপে বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার সহিত সূর্য্যের কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ কেবল কথার কথা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দুস্বরূপ ঐ টেবিল আর আমি উহার অপর এক বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের আবর্ত্তস্বরূপ। ঐ আবর্ত্তগুলি আবার সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। মনে কর, কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত্ত রহিয়াছে, প্রতি আবর্ত্তে প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন জল আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে ও নূতন জলকণা-সমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এই জগৎও এইরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জড়রাশি মাত্র। আমরা উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তস্বরূপ। কতকগুলি ভূতসমষ্টি এই জগৎরূপ মহা আবর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন ঐ আবর্ত্তে ঘুরিয়া হয়ত মানব-দেহে প্রবেশ করিল, পরে হয়ত উহা জন্তুরূপ ধারণ করিল, আবার হয়ত কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে আর একপ্রকার আবর্ত্তের আকার ধারণ করিল। ক্রমাগত পরিবর্ত্তন! কোন বস্তুই স্থির নহে। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। ঐরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র! এক অখণ্ড জড়-রাশি মাত্র বিরাজমান রহিয়াছে; উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র, কোন বিন্দুর নাম সূর্য্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ, অপর বিন্দু হয়ত কোন খনিজ পদার্থ। ইহার কোনটীই সর্ব্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তুই সর্ব্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে; ভূতসকল একবার স্থূলভাব প্রাপ্ত ও আবার সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইতেছে। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদায় বস্তুই ইথার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদায় জড়বস্তুর প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সূক্ষ্ম স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ইথারই মনের স্বরূপ। সুতরাং সমুদায় মনোজগৎও এক অখণ্ড-স্বরূপ। যিনি নিজ মনোমধ্যে এই অতি সূক্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি দেখিতে পান, সমুদায় জগৎ কেবল সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টিমাত্র। কোন কোন ঔষধের শক্তিতে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে লইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় আমরা এই সূক্ষ্ম কম্পন (subtle vibration) স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি।

তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যর হম্ফ্রি ডেভির (Sir Humphrey Davy) বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনক বাষ্প (laughing gas) তাঁহাকে অভিভূত করিলে, তিনি স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; ক্ষণেক পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, বলিলেন, সমুদায় জগৎ কেবল ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের জন্য সমুদায় স্থূল কম্পনগুলি (gross vibration) চলিয়া গিয়া কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনগুলি—যাহা তাঁহার মতে মন, তাহাই বর্ত্তমান ছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দেখিতেছিলেন, কেবল এক অনন্ত ভাবরাশি; তিনি সূক্ষ্ম কম্পনগুলি মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদায় জগৎ তাঁহার নিকট যেন এক মহাভাব-সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটী ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত্ত।

এইরূপে আমরা অন্তর্জগতের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম। আর অবশেষে যখন আমরা বাহ্য, অন্তর, সকল জগৎ ছাড়াইয়া সেই আত্মার সমীপে যাই, তখন সেখানে এক অখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই, অনুভব করি। সর্ব্বপ্রকার গতিসমূহের অন্তরালে সেই এক অখণ্ড সত্তা আপন মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, এমনকি, এই পরিদৃশ্যমান গতিসমূহের মধ্যেও—শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও—এক অখণ্ড ভাব বিদ্যমান। এ সকল এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ আজকালকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রও উহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াছে যে, শক্তি-সমষ্টি সর্ব্বত্রই সমান; আরও ইহার মতে এই শক্তিসমষ্টি দুইরূপে অবস্থিতি করে, কখন স্তিমিত বা অব্যক্ত অবস্থায় আবার কখন ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে। ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করে; এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়া কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করিতেছে। এই শক্তিরূপী প্রাণের সংযমের নামই প্রাণায়াম।

শ্রীশ্রীমুকুন্দমালা-স্তোত্রম্।

স্বামিরামকৃষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভক্তাপায়ভুজঙ্গগারুড়মণিস্ত্রৈলোক্যরক্ষামণিঃ
গোপীলোচনচাতকাম্বুদমণিঃ সৌন্দর্য্যমুদ্রামণিঃ।
যঃ কান্তামণিরুক্মিণীঘনকুচদ্বন্দ্বৈকভূষামণিঃ
শ্রেয়ো দেবশিখামণির্দ্দিশতু নো গোপালচূড়ামণিঃ॥ ২২॥

যিনি ভক্তগণের বিপত্তিসর্পসমূহের গড়ুরমণিস্বরূপ, যিনি ত্রিভুবনের রক্ষাকবচস্বরূপ, যিনি গোপীগণের নেত্রচাতকসমূহের মেঘরত্নস্বরূপ, যিনি সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট আদর্শস্বরূপ, যিনি রমণীরত্ন শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর ঘন স্তনদ্বয়ের একমাত্র অলঙ্কাররত্নস্বরূপ, যিনি যাবতীয়

দেবগণের মস্তকের মণিস্বরূপ, যিনি গোপালকগণের শিরোভূষণস্বরূপ, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শক্রচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্বাক্যসম্পূজ্য মন্ত্রম্
সংসারোত্তারমন্ত্রং সমুপচিততমঃসঙ্ঘনির্যাণমন্ত্রম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রং ব্যসনভুজঙ্গসন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্রম্।
জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্॥ ২৩॥

যে মন্ত্রে শক্রনাশ হয় সমুদয় উপনিষদ্‌বাক্য যে মন্ত্রের পূজা করেন, যাহাতে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি নাশ হয়, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, বিপত্তিরূপ সর্পদংশন হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জন্ম সফল হয়, হে জিহ্বে! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সতত জপ কর।

ব্যামোহপ্রশমৌষধম্ মুনিমনোবৃত্তিপ্রবৃত্ত্যৌষধম্
দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধম্ ত্রিভুবনীসঞ্জীবনৈকৌষধম্।
ভক্তাত্যন্তহিতৌষধম্ ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধম্
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধম্ পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্॥ ২৪॥

হে মনঃ! যে ঔষধ মোহ নাশ করে, মুনিগণের মনকে সদ্‌বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত করায়, দৈত্যরাজগণের দুঃখ জন্মায়, ত্রিভুবনকে জীবিত রাখে, ভক্তগণের সাতিশয় হিতসাধন করে, সংসারের ভয় নাশ করে, সমস্ত মঙ্গল লাভ করায়, তুমি সেই দিব্য শ্রীকৃষ্ণৌষধ পান কর।

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতম্ বেদব্রতান্যন্বহম্
মেদশ্ছেদফলানি পূর্ত্তবিষয়ঃ সর্ব্বে হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ॥ ২৫॥

যে নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ না করিয়া বেদাভ্যাস করিলে তাহা অরণ্যরোদনের ন্যায় হয়, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানসকল হিংসিত পশুর মেদোমাংসভোজনেই পর্য্যবসিত হয়, অতিথিশালা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকর্ম্মসকল ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় হয়, নানাবিধ তীর্থে স্নান গজস্নানের* ন্যায় নিষ্ফল হয়, সেই দেববর নারায়ণই সর্ব্বোপরি জয়লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

* হস্তীদের স্নান করাইয়া বাঁধিয়া না রাখিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ ধূলি মাখিয়া অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে।



দিব্য বাণী

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—
সত্যং বদ।
ধর্মঞ্চর।
স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।
...
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।
ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।...

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১।১১।১

শিষ্যগণ করি যবে পাঠ সমাপন
বরণ করিতে যায় গার্হস্থ্য জীবন,
গুরু তাহাদের কন সে জীবন-পথে
কিভাবে চলিবে লব্ধ বিদ্যার আলোতে :

"(এখন শিক্ষিত তুমি, জীবন তোমার
সমাজ-জীবন'পরে প্রভাব বিস্তার
করিবে বিপুলভাবে ;—এই কথা যেন
কোনদিন নাহি হয় তব বিস্মরণ।
তোমার প্রতিটি কর্ম, প্রতি ব্যবহার
হয় যেন অনবদ্য, হয় সদাচার।)
কবে সত্য কথা, ধর্ম-অনুষ্ঠানে রত
রবে সদা। শাস্ত্রপাঠে হবে না বিরত।
সত্য হতে, ধর্ম হতে হোয়ো না বিচ্যুত,
ধনদ মঙ্গল কর্মে রবে নিয়োজিত।

মাতৃদেবো ভব।
পিতৃদেবো ভব।
আচার্যদেবো ভব।
অতিথিদেবো ভব।*
যান্যনবদ্যানি কর্মাণি।
তানি সেবিতব্যানি।
নো ইতরাণি।

"মাতা, পিতা, আচার্য ও অতিথিরে সদা
সেবিবে দেবতা-জ্ঞানে, কো'রো না অন্যথা।
যা কিছু করিবে তুমি তা যেন সতত
হয় অনিন্দিত, হয় শিষ্টানুমোদিত।
নিন্দিত অভদ্র কর্ম কো'রো না কখন ;

---

* যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সংযোগ : দরিদ্রদেবো ভব। মূর্খদেবো ভব। —"পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব' ; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব' ; দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।"

যান্যস্মাকং সুচরিতানি।
তানি ত্বয়োপাস্যানি ॥ ২
নো ইতরাণি।

আমরা, আচার্যগণও হেন আচরণ
করি যদি, যাহা নয় শিষ্টজনোচিত,
যাহা নয় সদাচার—রহিবে বিরত
তদনুকরণ হতে ; শুধু লবে তাহা
আমাদেরো আচরণে সদাচার যাহা।

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ।
তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্।
শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্
শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্।
ভিয়া দেয়ম্।
সংবিদা দেয়ম্।

"শ্রেষ্ঠ যাঁরা, উচ্চাসনে তাঁহাদেরে বরি'
লইবে সহজভাবে (—সে আসন হেরি
ঈর্ষাবশে দীর্ঘশ্বাস যেন নাহি ঝরে)!
যখন করিবে দান, দিবে শ্রদ্ধাভরে।
কখনো কো'রো না দান শ্রদ্ধা-বিরহিত।
দিও না যা মূল্যহীন। বিনয়াবনত
সতর্ক হইয়া সদা, লজ্জা-ভয়-সহ,
মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে দানে রত হো'য়ো।

অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা
বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ ॥ ৩
যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ।
যুক্তা আযুক্তাঃ।
অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ।
যথা তে তত্র বর্তেরন্।
তথা তত্র বর্তেথাঃ।...

"(জটিল জীবন-পথে চলিতে চলিতে)
কোন আচরণে কিংবা কোন কর্তব্যেতে
সংশয় যদ্যপি জাগে, তাহলে তখন
দেখিবে অপর সব সুধী-র জীবন ;
কেবল পণ্ডিত নয়—শক্তি আছে যাঁর
ভাল-মন্দ নিজে নিজে করিতে বিচার,
অপরের দ্বারা যাঁরা হন না চালিত,
নহে রুক্ষমতি, নহে কামনা-তাড়িত—
যাঁরা সদা ধর্মকামী, যাঁহারা ব্রাহ্মণ—
ভগবানে স্থিরমতি, তাঁহারা তখন
তোমার সন্দেহ যাহে সেই আচরণ
সেই কর্ম যে-ভাবেতে করেন সাধন,
তুমিও তাহাই কো'রো। (জীবন তাঁদের
আঁধার ঘুচাবে তব জীবন-পথের।)

এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ।
এষা বেদোপনিষদ্ ॥ ৪

"ইহাই শাস্ত্রের বিধি—ইহাই আদেশ,
বেদ-বেদান্তেরো কথা, এই-ই উপদেশ।"

কথাপ্রসঙ্গে

অবহেলিত উত্তরসন্ততি

যুববিক্ষোভের ও বিপথগামিত্বের ঝড়ের যে ভয়াবহ রূপ আমরা সম্প্রতি দেখিয়াছি, যাহার জের এখনো কিছু চলিতেছে, তাহার কারণ খুঁজিয়াছেন ও তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন বহুজন। অনেকের মতে, বহু কারণের মধ্যে বেকার-সমস্যাই উহার প্রধান কারণ। মনে হয়, আমাদের অবহেলাই উহার প্রধান কারণ। মাতা-পিতা, শিক্ষক, সমাজ, রাষ্ট্র—সকলেরই নিকট হইতে ইহারা অবহেলা পাইয়াছে, শিশুকাল হইতেই; যতদিকে এবং যতখানি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল ইহাদের প্রতি, তাহা দেওয়া হয় নাই। শিশু ও যুবজীবনকে জাতীয় আদর্শনিষ্ঠ করিতে হইলে, তাহার অন্তরের সদ্‌বৃত্তিগুলি জাগাইতে হইলে, সর্বোপরি বহুবিধ বিপরীতভাব ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া আদর্শকে আজীবন আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো মানসিকশক্তি-সম্পন্ন করিতে হইলে তাহাদের প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেরূপ সহানুভূতিশীল আচরণ প্রয়োজন, যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা তাহারা কিছুই পায় নাই। ফলে আজ তাহারা একটি আদর্শকে ধরিয়া দুদিন পরে সেটি ছাড়িয়া অপর একটিকে ধরিতেছে, দুদিন পরে আবার আর একটিকে। মনে হয়, সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই তাহারা এরূপ করিতেছে; জীবনের কোন স্থায়ী অবলম্বন, সামগ্রিকভাবে জীবনের কোন স্থির লক্ষ্যের সন্ধান তাহারা পায় নাই।

যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, অতীতকে আর ফিরাইয়া আনা যায় না। কিন্তু তাহা হইতে এখনো যদি আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করি এবং নিজেদের দোষত্রুটি-সংশোধনে মনোযোগী না হই, তাহা হইলে পরবর্তী পুরুষ (generation), এখন যাহারা শিশু, তাহাদেরও ভবিষ্যৎ অনুরূপ হইবে। সেজন্য সেদিকে আমাদের সকলেরই বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, এখন হইতেই।

আমরা সকলেই জানি, জীবন-গঠনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা, মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের—যাঁহাদের কথার নয় জীবনেরই প্রভাব অধিকতর প্রভাবান্বিত করে শিশুদের, তাঁহাদের আদর্শ জীবন, এবং শিশুদের জীবন-গঠনের অনুকূল পরিবেশ। এসব অবশ্য বলা মাত্রই হয় না; চেষ্টাসত্ত্বেও বর্তমানে অনেক কিছু করা সম্ভব নয়, ইহাও ঠিক কথা; কিন্তু কতকগুলি জিনিস, বিশেষ করিয়া শিক্ষার ব্যাপারে, এখনি করা সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষার সংস্কার লইয়া বহু বিষয় আলোচিত হইলেও তাহা শিক্ষার বহিরঙ্গ লইয়াই হইতেছে, তাহার অন্তর লইয়া নহে;—পাঠ্যবিষয়, সংগঠন, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদিতেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, শিক্ষার্থীর অন্তরটিকে বিকশিত, সবল ও জাতীয়ভাবস্নাত করিবার কোন ব্যবস্থা সেখানে নাই বলিলেই চলে। কোন ব্যবস্থা না থাকার চেয়েও ভয়ের কথা হইল, সেদিকে এখনো আমাদের দৃষ্টিই নাই।

শুধু উপদেশ দিয়া অপরের জীবন গঠন করা যায় না, উহার জন্য আদর্শ জীবনের সংস্পর্শ চাই, ইহা আমাদের জানা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্য বলিয়াছিলেন: আদর্শ শিক্ষকের জীবন 'জ্বলন্ত পাবক-সদৃশ' হওয়া চাই; উহার স্পর্শেই শিক্ষার্থীর জীবনদীপ আপনি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। অবশ্য কথাটি বলা হইতেছে জীবনগঠন প্রসঙ্গে; রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শিখাইবার জন্য শিক্ষকের সে-সব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলেই চলে, তাহার জীবন যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে, কৃতবিদ্য হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করিবার জন্য শিক্ষার্থীকে যদি আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, জাতীয়ভাবস্নাত, নিঃস্বার্থপর, মানবপ্রেমিক ও সেবাপরায়ণ করিয়া গড়িয়া তোলা শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে শিক্ষকের জীবনও আদর্শনিষ্ঠ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনটির প্রতিই আমরা এখনো অমনোযোগী। সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় লাগাইবার জন্য কৃতবিদ্য যুবকের হাতে বিদ্যাসমৃদ্ধ সুমার্জিত বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ শাণিত ছুরিকাখানি তুলিয়া দিতেই আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ব্যস্ত, সেটিকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনো অপব্যবহার না করিয়া আজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবাতে লাগাইবার মতো তাহার মনোবলবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি এ শিক্ষাব্যবস্থায় নাই।

তাছাড়া, বলিষ্ঠ সংস্কারসম্পন্ন বহু বিদ্যার্থী আছে যাহারা আদর্শ জীবনের সংস্পর্শ ব্যতিরেকেই কেবল পুস্তকলব্ধ যথোপযুক্ত চিন্তার মাধ্যমেই নিজেদের জীবনগঠন করিতে সক্ষম; কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় তাহাদের নিকট সে চিন্তাগুলিকে পৌঁছাইয়া দিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। যুগ যুগব্যাপী একটি স্থির লক্ষ্যাভিমুখে চলার অভিজ্ঞতালব্ধ যে অমূল্য চিন্তাগুলি আমাদের জাতীয় চিন্তার রত্নভাণ্ডারে রহিয়াছে—যেগুলি আর জীবনের পরীক্ষার স্তরে নাই, জীবনসত্যের স্তরে বহু পূর্বেই উন্নীত—সেগুলিকেও শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, তাহার জন্য চেষ্টা নাই, চেষ্টার প্রয়োজন-বোধও নাই। আমাদের উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে জীবনসত্য সম্বন্ধে, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে-সব গম্ভীর সর্বকালীন চিন্তা রহিয়াছে, শিক্ষার্থীদের নিকট তাহা পরিবেশনের কোন ব্যবস্থাই নাই; অপরদিকে বিদেশ হইতে স্বল্পমূল্য পুস্তক-পুস্তিকা আসিয়া সারা দেশে সেখানকার চিন্তা ও মতবাদ ছড়াইয়া দিতেছে—শিশুদের নিকট পর্যন্ত তাহাদের উপযোগী এই জাতীয় পুস্তক অবাধে পৌঁছিতেছে। ইহা বিদেশের কৃতিত্ব—ইহা বন্ধ করিবার কথা বলিতেছি না; তবে এই সঙ্গে আমাদের জাতীয় চিন্তাধারাও শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো, সর্বাগ্রে পৌঁছানো প্রয়োজন। স্বামীজীর ভাষায়, 'আমাদের পৈতৃক সম্পদ' সকলের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। তাহার সঙ্গে চতুর্দিক হইতে বিদেশী চিন্তা আসার পথও খোলা রাখিতে হইবে, 'আসুক চারিদিক হইতে কিরণধারা।' পৃথিবী আজ ছোট হইয়া গিয়াছে—পৃথিবীর সব দেশের চিন্তাই আজ মানবসাধারণের সম্পত্তি। উহাতে অংশীদার হইবার পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টাই সঙ্কীর্ণতা, যাহা দুর্বলতারই নামান্তর, যাহা কখনো জীবনগঠনে সহায়ক হইতে পারে না। কিন্তু নিজের দেশের অমূল্য চিন্তাভাণ্ডারের দিকে না তাকাইয়া কেবল বিদেশের চিন্তার সহিত পরিচিত হওয়ার ব্যাকুলতা জাতীয়তার মৃত্যুর পূর্বাভাস।

২

আমরা যেন শিক্ষার্থীদের জীবনগঠনের

উপযোগী ব্যবস্থা করিতে আর বিলম্ব না করি—অন্ততঃ শিশুরা যেন প্রথম হইতেই ইহার জন্য যথেষ্ট আলোক, সহানুভূতি ও অনুকূল পরিবেশ পায়।

প্রথমতঃ, শিক্ষক ও মাতাপিতাকে জাতীয় আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে; বেশ-পরিবর্তন বা কর্মস্থল-পরিবর্তনের মতো ইচ্ছামাত্রই অভ্যাসের পরিবর্তন সম্ভব নয়, ইহা যেমন সত্য, মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় সবই সম্ভব—ইহাও তেমনি সত্য। শিক্ষকনির্বাচনের সময়ও কেবল তাঁহার বিদ্যার মান নয়, জীবনের মানের দিকও বিবেচনা করিতে হইবে। উপনিষদের ভাষায়, 'যাঁহারা কেবল পণ্ডিত নন, যাঁহাদের আচরণও সাধুজনোচিত,' কেবল তাঁহারাই স্নাতকোত্তর জীবনেও আদর্শ-সংশয়স্থলে অনুকরণীয়।

দ্বিতীয়তঃ, স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বহু পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির চিন্তাগুলিকে বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণী হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য করিতে হইবে; অনুরূপভাবে প্রয়োজনমতো কোরান, বাইবেল প্রভৃতির অন্তর্গত সর্বকালীন উচ্চ ভাবগুলিকেও বলা বাহুল্য, যাহাদের নিকট পরিবেশিত হইতেছে, তাহাদের উপযোগী অংশ বাছিয়া লইয়া এবং তাহাদের উপযোগী করিয়া লিখিয়া ইহা করিতে হইবে। ইহাতে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ব্যাহত হইবে, বা সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হইবে বলিয়া ভয় করিবার কিছু নাই- সব ধর্মেরই শাস্ত্রের মধ্যে সর্বজনীন, সর্বকালীন, উদার, মনুষ্যত্বের উদ্বোধক ভাব অজস্র পরিমাণে রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বরং সঙ্কীর্ণতা বাড়ায়।

তৃতীয়তঃ, ভারতীয়তার মূল ভিত্তি সংযম ও একাগ্রতার প্রতি যুব-মনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতে হইবে; ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইবার দিকেও। কারণ বুদ্ধি কেবল পথ দেখাইতে পারে, জীবনকে বাঞ্ছিত পথে চালাইবার শক্তি তাহার নাই—মন নিজের যে পথ ভাল লাগে সে পথেই জীবনকে টানিয়া লইয়া যায়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই। মনের রাশ টানিবার শক্তিই ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির তারতম্যেই ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটে, বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যে নয়। সংযম ও একাগ্রতার সহিত ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনও ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাই ছাত্রজীবনে অপরিহার্য।

তবে এসবগুলিই কেবল পড়িয়া বা শুনিয়া হয় না—ইহার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অভ্যাস। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে যেখানে যাহা এবং যতখানি উপযোগী তদনুসারে এসবের নিয়মিত অভ্যাসের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এ ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের জাতীয় শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে, শিক্ষার্থীদের জীবন গঠিত হইবে না। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পূর্বে এই অভ্যাসই প্রধান অঙ্গ ছিল; দীর্ঘকাল ইহার একান্ত অভাব হইয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পরও এবং যুববিক্ষোভের সমস্যায় বারবার জর্জরিত হইয়াও আমরা এখনো ইহার ব্যবস্থা করি নাই। আমাদের মনে হয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার লইয়া ভাবিবার সময় সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন কিভাবে আধুনিক কালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহার পুনঃপ্রবর্তন করা যায়।

এ কাজের জন্য বিস্তারিত চিন্তা স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা হইতে পাওয়া যাইবে। স্বামীজীর ভাবানুগ শিক্ষাপ্রবর্তন-

পরীক্ষায় আজীবন প্রয়াসী জনৈক শিক্ষাব্রতীর ভাষায় বলা যায়, 'পবিত্রতা, অনাড়ম্বর জীবন, সুনিয়ন্ত্রিত কর্মতৎপরতা এবং শান্ত ধ্যান হ'তে যা কিছু পাওয়া যায়, তার সব কিছু পরিবেশন করার বিশেষ আয়োজন করতে হবে ছাত্রজীবনে'—কেবল বৌদ্ধিক জ্ঞান নয়, যুব-মন যাহাতে ছাত্রজীবনেই এ সবের আস্বাদ কিছুটা পায়, তাহার জন্য শিক্ষালয়গুলিতে নিয়মিত অভ্যাসের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া ছাত্রাবাসগুলিতে আমরা এ ব্যবস্থা এখনি করিতে পারি। এই ছাত্রাবাসগুলির পরিচালকগণের কেবল পরিচালনা-দক্ষতা থাকিলেই চলিবে না, তাহাদের জীবনও আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই—এবং সে-জীবনের স্পর্শ ছাত্রদের কাছে পৌঁছানো চাই।

আলডাস হাক্সলি সারাজগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজনীয়তা বহুপূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন। আমরা এখনো ভারতেই তাহা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি না!

৩

মোট কথা, বিলম্ব আর করা চলে না, কেবল বিদেশী পদ্ধতিতে নয়, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি এবং ইহা লইয়া যিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তারাশি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া উভয়ের সমন্বয়ের পথ আমাদের বাহির করিতে হইবে, যাহা আধুনিক ভারতের উপযোগী। "আমাদের লক্ষ্য এই যে, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষাই আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় সনাতন রীতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।" "এই প্রাচীন জাতির পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধি প্রত্যেকের ভিতর আশৈশব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; ঐ মূল ছন্দেই তাহার জীবনগাথা গ্রথিত করিতে হইবে,—উহারই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে নিজের ঐশ্বর্য-মান-যশকে, নিজের পাশ্চাত্য বিদ্যা-বিজ্ঞানাদির শিক্ষাকে আনয়ন করিতে পারিলে আমাদের আদর্শ ও চরিত্রের মূল রহস্য সমাধান করা হইল।"

"জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা।"

"মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয়, ততই তাহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ইহাই রহস্য।"

"আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ।"

"বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?—না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।"

"ব্রহ্মচর্যবান্ ব্যক্তির মস্তিকে প্রবল শক্তি—মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

নববর্ষ

বনফুল

নববর্ষেতে আমরাই পুরাতন
এই ক্ষোভে হায় বিষণ্ণ ছিল মন।
সহসা কে যেন কহিল কানের কাছে
তোমার চেয়েও আরও পুরাতন আছে।
অরূপ হইতে রূপে ও রূপান্তরে
সেই পুরাতন যুগে ও যুগান্তরে
নিত্য নূতন বাণী যে বহিয়া আনে
নূতন ছন্দে শোভায় সুরে ও গানে।
নূতনের মাঝে হাসে চির পুরাতন
যদিও তাহার নিতি নব প্রসাধন।
পুরানো আকাশে আসে পুরাতন উষা
কিন্তু তাহার নিত্য নূতন ভূষা।

"কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার নামই ব্রহ্মচর্য।"

"পাশবকার্য থেকে যে যৌনশক্তি উত্থিত হয়, তাকে ঊর্ধ্বদিকে মানবশরীরের মহাবিদ্যুদাধার মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে তা 'ওজঃ' বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়।...এই 'ওজস্' হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, একমাত্র মনুষ্যশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। যাঁর ভেতরে সমগ্র পাশব যৌনশক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি একজন দেবতা। তাঁর কথায় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় জগৎ নবজীবন লাভ করে।...কোন শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না; তবে তাকে শুধু ঈপ্সিত পথে চালিত করা যেতে পারে। অতএব যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের অধিকারে আছে, তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঐ শক্তিকে পাশব হতে না দিয়ে আধ্যাত্মিক করে তুলতে হবে।"

"ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

'শ্রী-ম'-স্মরণে

শ্রীসুকোমল বসু

রামকৃষ্ণের মধুর বাণীর ছিলে তুমি লিপিকার
'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' তো অপূর্ব উদ্ধার!
নিখুঁত চিত্র এঁকেছ যা তুমি—জীবন্ত তার রূপ!
লীলা-সৌরভে সুরভিত যেন সাত-তীর্থের ধুপ!!
কখনো ঠাকুর বসেছেন এসে ছোট-খাটটির 'পরে
বহুদূর হ'তে ভক্তরা এসে জমায়েৎ সেই ঘরে।
কখনো সরল কথায় করেন তত্ত্বের ব্যাখ্যান
কখনো হঠাৎ সমাধিমগ্ন—পশ্চিমাস্যে ধ্যান!
মা-কালীর সাথে শিশুর মতই 'মা-মা' ডাকে কথা বলা,
ফুরায়নি তাঁর কথা তবু যবে রোগে রুধিয়াছে গলা!
ন'বৎ-খানার একটি অংশ ঝাঁটি-বেড়া দিয়ে ছাওয়া
তারই ফাঁক দিয়ে সারদা-মায়ের ঠাকুরের পানে চাওয়া!
'কথামৃত'টি পাঠ করি যবে—তখন যে হয় মনে
আমিও সঙ্গে ব'সে আছি যেন সে ঘরেই এক কোণে!
শিক্ষকতার দায়িত্ব আর সংসার হ'ল মিছে
ছায়ার মতই ঘুরেছিলে তুমি ঠাকুরের পিছে পিছে!
চিত্রকরই যে নও তুমি শুধু, নও শুধু লিপিকার
ভক্ত-সাধক—কৃপার সাগরে তুমি রস-উৎসার!
ফল-হারিণীর অমাবস্যায় তব তিরোধান-তিথি
তোমার স্মরণে জানাই প্রণাম—জানাই প্রাণের প্রীতি!

'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।' ধর্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য, শ্রোতার সুনিপুণ হওয়াও আবশ্যক। স্বামীজী ভক্তিযোগে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। "জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক।" অনেক বই পড়েও আধ্যাত্মিক উন্নতি আমাদের নাও হ'তে পারে। আবার একখানা বই না পড়েও লাটু মহারাজ অধ্যাত্ম-চেতনার চরমে পৌঁছেছিলেন। আত্মা কেবল আর এক আত্মা থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে।

শিষ্য মুমুক্ষু না হ'লে, তার মনে প্রকৃত ধর্মপিপাসা না জাগলে কোন কিছুই হবার নয়। আর ধর্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা সাধনাসাপেক্ষ। মনের সমস্ত ভালবাসার প্রবাহকে ঈশ্বরমুখী করা কি এক জন্মের কাজ? মানুষের স্বভাবের মধ্যে শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ দুই-ই রয়েছে। অল্পে আমাদের সুখ নেই—একথা সত্য। অনন্তের দিকে ব্যগ্র বাহু দুটি বাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর ছায়ায় মানুষ কাঁদছে—এর মতো সত্য কি আর কিছু আছে? তবু যা ফুরিয়ে যায়, যা ভেল্কি, যা জল-বুদ্বুদ তারও একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে মানব-চেতনার কাছে। আমরা কাঞ্চন ভালোবাসি, খ্যাতির প্রতি আমাদের একটা মজ্জাগত মোহ আছে, রিপুর তাড়না আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে। আর এই সকল মায়াকে শাস্ত্রে দৈবী ও দুরত্যয়া বলা হয়েছে। দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে অতিক্রম না করতে পারলে ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা কোনকালেই সম্ভব নয়। 'You cannot serve God and Mammon at the same time.'

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো ঈশ্বর-ভাবনার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চেতনায় অনুক্ষণ বইতে থাকলে তখনই তাকে ভক্তি বলা যেতে পারে। যে-মন একশোখানা হয়ে ছড়িয়ে আছে নানা বিষয়চিন্তার মধ্যে—তাকে দিগ্‌দিগন্ত থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরের পাদপদ্মে জড়ো করা কি চাট্টিখানি কথা? বায়ুকে আমরা শাসনে আনতে পারি? সে যে-দিক থেকে খুশি সেই দিক থেকে বয়,—যে-দিক পানে খুশি সেই দিকেই ধায়। মানুষের মনটাও অবাধ্য বাতাসের মতো। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, সমস্ত মনটাকে আমার দিকে ফেরাও। তা হ'লে আমাকে লাভ করবে তুমি। অর্জুন বললেন, বায়ুকে শাসন করা যেমন দুঃসাধ্য মনকে শাসন করাও তেমনি দুঃসাধ্য—'তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।' শিষ্যকে অভয় দিয়ে আচার্য বললেন, অভ্যাসের এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মত্ত হস্তীর মতো যে মন তাকেও শাসন করা যায়। 'অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।'

মনকে আয়ত্তের মধ্যে আনা একটা সুকঠিন ব্যাপার। নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম শত শত জন্ম ধ'রে চললেও আশ্চর্য হবার কি আছে? 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।' স্বার্থ-সাধ-মান কি সহজে মন থেকে যেতে চায়? তারা চূর্ণ হ'লে তবেই হৃদয় শ্মশান হয় আর হৃদয়কে শ্মশান করতে পারলে শ্যামা তখন স্বয়ং এসে ভক্ত-হৃদয়ে তাঁর নৃত্য শুরু করেন। Nature

abhors vacuum. কিন্তু ভগবানের বেলায় এর ঠিক উলটো। আমাদের শূন্য হৃদয়ের উপরে ভগবানের লোলুপ দৃষ্টি। হৃদয়ে বাসনার লেশমাত্র থাকতে ভগবান সেখানে ঢুকবেন না। তাই নির্বাসনা হবার ব্যাকুলতা থেকে বেরিয়ে এসেছে গীতাঞ্জলির একাধিক কবিতা, যাদের ধুয়াটা হচ্ছে:

"তোমার আগুন উঠুক হে জ্ব'লে,
কৃপা করিও না দুর্বল ব'লে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই,—
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।"

সুতার একগাছি ফেঁসো বাইরে থাকতে সুতা তো ছুঁচের মধ্যে যাবে না। কামনার বিন্দুবিসর্গ থাকতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। তাই অধ্যাত্মরাজ্যের প্রথম ও শেষ কথাটি হোলো চিত্তের স্থিরতা। মন্মনা ভব। ভগবান বলছেন তাঁর প্রিয়তম সখাকে: 'মনটাকে পরিপূর্ণ ক'রে রাখো আমার চিন্তা দিয়ে, আমার অস্তিত্ব দিয়ে।' চেতনার অণু-পরমাণুকে ঈশ্বর-চিন্তা দিয়ে ভরিয়ে রাখার মধ্যে মনের একাগ্রতার পরিচয়। মনকে একাগ্র করতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! যত মুস্কিল তো ঐ বেবাগা পাগলা মনটাকে নিয়ে। মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে লাগিয়ে রাখতে গেলে দেখা যাবে, যত রাজ্যের ছাই-ভস্ম চিন্তারাশি এসে ঈশ্বরচিন্তাকে চেতনার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য যেন কোমর বেঁধে লেগেছে। এমনি একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে চেতনার কেন্দ্রে ধ্যেয় বস্তুর চিন্তাকে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অনির্বাণ রাখতে পারাই হচ্ছে the secret of will—ইচ্ছাশক্তির আসল কাজ। মন থেকে ঈশ্বরচিন্তাকে তাড়িয়ে দিতে অন্যান্য মানসিক প্রবণতাগুলি যখন বদ্ধপরিকর তখনও যারা ভগবচ্চিন্তাকে চিত্তের কেন্দ্রস্থলে দৃঢ়তার সঙ্গে রাখতে পারে তারাই তো বীর। সংগ্রামেরও যেমন শেষ নেই, পরাজয়ও তেমনি পদে পদে। তবু "সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।"

সমস্ত পরাজয়কে তুচ্ছ ক'রে ঈশ্বরে মন রাখার এই যে পুনঃ পুনঃ প্রযত্ন—ভগবানের জন্য মন ব্যাকুল না হ'লে এই প্রযত্ন সম্ভব নয়। 'কুশলোঽস্য লব্ধা।' শিষ্য সুনিপুণ না হ'লে ব্রহ্মবিৎ কামগন্ধহীন আচার্য তাকে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ঠাঁই দিতে স্বতঃই নারাজ হবেন। ঠাকুর বলতেন, কেশব বাছ-বিচার ক'রে শিষ্য করেন না। তাই তাঁর দলে ভাঙন লেগেই আছে। ঠাকুর যাঁদের কৃপা করেছেন তাঁদের কেউ তাঁকে ছেড়ে যাননি। তাঁরা চিরতরে তাঁর চরণমূলে নিজেদের তরুণ জীবনগুলিকে উজাড় ক'রে সঁপে দিয়েছেন। ঠাকুর দেখতেন তাঁর কাছে যারা এসেছে নবজীবনের সন্ধানে তাদের মধ্যে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা এবং অধ্যবসায় আছে কিনা। এই তিনের সমাবেশ যদি কারও মধ্যে দেখতে পেতেন, ব্যস, অমনি তাকে ধরতেন। তিন ডাক ডেকে সে চির-দিনের জন্য নিশ্চুপ হ'য়ে যেতো। নরেন, রাখাল, তারক, গঙ্গাধর, লেটো, শশী, শরৎ, হরিপ্রসন্ন, বাবুরাম—চারিদিক থেকে এসে যারা তাঁর পদপ্রান্তে সমবেত হোলো তাদের সকলকেই তিনি দাঁড় করিয়ে দিলেন বৈরাগ্যের কঠিন রাস্তায় একেবারে মুক্ত আকাশের নীচে। তাদের কাউকে তিনি সংসারে নীড় বাঁধতে দিলেন না, দিলেন না কাউকে অর্থলক্ষ্য করতে।

কেন ঠাকুর এত বিচার ক'রে শিষ্য বাছাই করতেন? স্বামীজীর ভাষায় ভক্তিযোগ গ্রন্থে এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, "যাঁহার ভিতরে অপরিস্ফুট ভাবেও ধর্মের বীজ নিহিত নাই,

কেহই তাঁহাকে এতটুকু তত্ত্বজ্ঞানও দিতে পারে না।" যার ভিতরে ধর্মের রাস্তায় চলবার একটা সহজাত প্রবণতা আছে তারই মধ্যে গুরু তাঁর শক্তিকে সঞ্চারিত করতে পারেন। ভূমি যেখানে প্রস্তুত নয় সেখানে সতেজ বীজ উপ্ত হলেও সে বীজ অঙ্কুরিত না হওয়াই স্বাভাবিক। খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম ম্যাকডুগাল তাঁর Psychology বইতে লিখেছেন: "প্রত্যেক জীবই—সে পশু, শিশু অথবা মানব যাই হোক না কেন—এইভাবে বা ঐভাবে যে কাজ করে তার কারণ, যে-সকল প্রবণতা সে রক্তের মধ্যে সহজাত সংস্কার হিসাবে বহন ক'রে আনে, সেই প্রবণতাগুলি তাকে এই লক্ষ্যের অথবা ঐ লক্ষ্যের পানে পরিচালিত হ'তে প্রণোদিত করে।" এই সহজাত সংস্কারগুলির প্রভাবেই আমাদের আচরণগুলি সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের বাছাই করার ব্যাপারে এই সংস্কারের উপরে তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। যারা তাঁর কাছে আসতো তাদের মজ্জাগত প্রবণতাগুলি কোন্ দিকে সেদিকে থাকতো তাঁর শ্যেনদৃষ্টি। দক্ষিণেশ্বরভ্রমণের একটা অলস কৌতূহলের বশে আসতো যারা তাদের তিনি বলতেন 'বিল্‌ডিং টিল্‌ডিং' ঘুরে ঘুরে দেখতে। মন যাদের আদৌ প্রস্তুত নয় ঈশ্বরীয় কথা শুনবার জন্য, কি লাভ তাদের কাছে তত্ত্বকথা নিবেদন ক'রে? ঠাকুর যেমন বলতেন, তরোয়ালের চোটে কুমীরের চামড়ার কিছুই হয় না; পাথরের দেয়ালে পেরেক বসে না। খ্রীষ্টের সেই বীজবপনের সুন্দর দৃষ্টান্তটি—বীজ সে ছড়ায় ঠিকই, কিন্তু তাদের সবগুলো কি অঙ্কুরিত হয়? কিছু পাখীতে খেয়ে যায়। কিছু পড়ে পাথরে। কিছু পড়ে বনের মধ্যে। সেগুলো আর অঙ্কুরিত হয় না।

আসলে আমাদের মজ্জাগত সংস্কারগুলির প্রভাবেই আমরা আচরণের দিক থেকে কেউ আত্মকেন্দ্রিক, কেউ বা আত্মভোলা মানবপ্রেমিক। অনেকে বলে থাকেন, honesty is the best policy, সততার সঙ্গে কাজ করলে আখেরে আমরা লাভবান হবোই। এই লাভ-লোকসান চুল-চেরা বিচার ক'রে কি সত্যই আমরা দৈনন্দিন জীবনে কাজ ক'রে থাকি? পুরস্কারের লোভ এবং শাস্তির ভয়, পার্থিব সুখের প্রত্যাশা অথবা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা,—আমাদের আচরণের উপরে এদের প্রভাব নেই অথবা থাকা উচিত নয়, এমন কথা ম্যাকডুগাল বলেননি। তিনি বলছেন, ইংরেজ দার্শনিকদের (Utilitarians) সুখবাদকে অত বেশী গুরুত্ব দেওয়ার কোন মানে হয় না। যাঁরা বলেন জ্ঞান এবং সততা একই, তাঁদের বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণকেও ম্যাকডুগাল খুব গুরুত্ব দেননি। আসলে আবাল্যলব্ধ মানুষের সংস্কারগুলিই (the impulses with which he is innately endowed) তার আচরণগুলিকে একটা বিশেষ লক্ষ্যের পানে পরিচালিত করে। আমাদের নৈতিক চরিত্রের বিকাশসাধনের ব্যাপারে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি-তর্কের কোন ভূমিকা নেই—এমন কথা বলেননি ম্যাকডুগাল। কিন্তু সে ভূমিকা গৌণ (secondary)। আসলে গীতায় শ্রদ্ধাকে বা beliefকে জীবনগড়ার ব্যাপারে যে মূল্য দেওয়া হয়েছে, ম্যাকডুগালের Psychology 'The Study of Behaviour' গ্রন্থেও শ্রদ্ধাকে সেই মূল্য দেওয়া হয়েছে। 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।' যার শ্রদ্ধা যেমন তার জীবনও তেমনি। আমাদের শ্রদ্ধাগুলির রঙে আপনা থেকেই রাঙিয়ে যায় আমাদের সমস্ত নৈতিক সত্তা।

ম্যাকডুগাল বলেছেন, "Even when we reason with strictest logic, we commonly reason from premises which are beliefs acquired in this unreasoning fashion." এমন কি আমরা যখন ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মগুলির দিকে শ্যেনদৃষ্টি রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হই তখনও আমরা সাধারণতঃ এমন সব 'প্রেমিস্' থেকে আমাদের তর্ক চালিয়ে যাই যারা আসলে পরিবেশ থেকে পাওয়া কতকগুলি বিশ্বাসমাত্র।—এমন রাস্তায় এসে সেই সব বিশ্বাস চুপি চুপি মনে বাসা বেঁধেছে যে রাস্তায় লজিক কখনো হাঁটে না।

মানবচরিত্রের এই মজ্জাগত প্রবণতাগুলিকে যথোপযুক্ত মূল্য না দিয়ে তার বৌদ্ধিক দিকটাকে আমরা যখন গুরুত্ব দিতে, যাই তখন আমরা বিষম ভুল ক'রে বসি। জীবনের অগ্নিপরীক্ষার সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে বুদ্ধি আমাদের আচরণগুলিকে কতখানি প্রভাবিত করে এবং আজন্ম-সঞ্চিত প্রবণতাগুলিই বা সেগুলিকে কতটা নিয়ন্ত্রিত করে—তা বুঝতে এত বেগ পেতে হবে কেন? ম্যাকডুগাল মনোবিজ্ঞানের একটা তত্ত্বহিসাবে যা আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই একই সত্যের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন।

সহযাত্রীদের উপবাসের উপক্রম দেখে নবকুমার একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে বনে প্রবেশ করলেন। কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হোলো না। ইতিমধ্যে জোয়ার এলো কলকল্লোলে। আরোহীরা নবকুমারকে সমুদ্রতীরে ফেলে চলে গেল। এই ঘটনার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন—মানবচরিত্রের রহস্য বুঝতে তা আমাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে, বিশেষ ক'রে ম্যাকডুগালের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

"ইহা শুনিয়া কেহ যদি প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস-নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রেরই যেন প্রতিধ্বনি ম্যাকডুগালের লেখায় : 'We must sweep away every trace of the doctrine that conduct proceeds essentially from a calculation of satisfaction to be yielded by this or that course.…'ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের অতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ বিচার ক'রে মানুষ কাজ করে—একথা সত্য হলে নবকুমার কখনো কুঠারহস্তে একাকী বনে প্রবেশ করতেন না। গীতায় স্বভাবের ও স্বধর্মের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই মজ্জাগত প্রবণতার দিকে লক্ষ্য না রেখে মানুষকে যখন আমরা নিজের মতো ক'রে বানাবার চেষ্টা করি—তখন শিক্ষাব্রতী হিসাবে একটা বিষম ভুল ক'রে বসি।

ঠাকুর ছিলেন জাত-শিক্ষাব্রতী। শিষ্যদের ব্যক্তিগত প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তাদের এক একজনকে গড়েছিলেন। বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দ করেই গড়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দের উপাদান ছিল স্বতন্ত্র। তাই ব্রহ্মানন্দের প্রকৃতির কোমলতার বশে গিয়েই তাকে ব্রহ্মানন্দ তৈরী করলেন।

আর মানুষতৈরীর পদ্ধতিতেও জাত-শিক্ষাব্রতীর পরিচয়। হাসি-খুশি-ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাঝে মাঝে শিষ্যদের চেতনায় গভীরতম তত্ত্বের বীজ বপন ক'রে চলেছেন। শিষ্যেরা যেন তাঁর সমবয়সী প্রিয়তম সখা। সদাহাস্যময় আচার্যের সঙ্গে যেন তারা নিত্য বন-ভোজনে মেতে আছে। আসল কাজে গুরু কিন্তু ঠিক আছেন। লাটু একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোচ্ছে সাধকের ঐ জড়তাকে কখনো প্রশ্রয় দেওয়া যায়? লাটু ঠাকুরের কাছ থেকে মৃদু বকুনি খেলেন। অনেক রাত্রে শিষ্যদের ঘুম ভাঙিয়ে গুরু তাদের ধ্যানে বসিয়ে দিচ্ছেন। তারা কিভাবে বসে ধ্যান করছে—সে দিকেও গুরুর অতন্দ্র দৃষ্টি। কিন্তু সবই চলেছে একটা আনন্দময় পরিবেশে স্বাভাবিক ছন্দে। বেদী নেই, লজিকের রাস্তা ধরে তর্ক-যুক্তির কোন বাড়াবাড়ি নেই, আচার্যের আসন থেকে গুরু-গম্ভীর ভাষায় লেকচার নেই, উপাসনায় কোন যান্ত্রিকতাও নেই।

আছে একটা কামগন্ধহীন শুভ্রশুচি অদ্ভুত জীবন, আছে শিষ্যদের জন্য হৃদয়ে প্রেম, যে-প্রেমের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, আছে সত্যো একটা জীবন্ত জ্বলন্ত অনুরাগ, আর আছে ক্ষণে ক্ষণে ভাব-সমাধি। সেই সমাধিভূমি থেকে নেমে এসে গুরু যা বলেন তা উপলব্ধিগত সত্যের দিব্য অনুভূতি থেকে। চিন্ময়ী জগজ্জননী পিছন থেকে কথাগুলি কণ্ঠে ঠেলে ঠেলে দেন। তাই তো তাদের শক্তি এমন অমোঘ, এমন মর্মস্পর্শী। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতির সূর্যকিরণে তাঁর প্রত্যেকটি কথা ঝল্‌মল্ করে, যেন এক-একটি হীরকখণ্ড।

এইবার প্রবন্ধ শেষ করি গুরু-শিষ্য সম্পর্কে স্বামীজীর কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে। অনেকের ধারণা যেন-তেন-প্রকারেণ একজন গুরু পাকড়ে তাঁর কাছে মন্ত্র নিলেই ধর্মজীবন-যাপনের রাস্তা সুগম হয়ে যাবে। কিন্তু তাই কি? ধর্মের রাস্তা যদি এত সহজই হবে তবে ঐ রাস্তাকে উপনিষদে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' বলা হয়েছে কেন? আর গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, তা দেখবার প্রয়োজন নেই? স্বামীজী ভক্তিযোগ গ্রন্থে বলছেন:

> "গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন পদার্থবিজ্ঞান শিখাইতে হইলে শিক্ষক যাহাই হউক না কেন, কিছু আসিয়া যায় না। কারণ উহাতে কেবল বুদ্ধি-বৃত্তির চালনা—বুদ্ধিবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ সতেজ করারই প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শিক্ষক অশুদ্ধচিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি আবার ধর্ম কি শিখাইবে?"

আর যার মধ্যে পবিত্রতা প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা এবং অধ্যবসায় নেই, তার মধ্যে গুরু কেমন ক'রে শক্তিসঞ্চার করবেন? স্বামীজী বলছেন, "বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুকৃষ্ট থাকা আবশ্যক।" আর একটা বড়ো কথা বলেছেন স্বামীজী—"আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে, আসিয়াও থাকে।" ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের যোগাযোগ প্রকৃতির এই অলঙ্ঘ্য নিয়মেই। এই নৈসর্গিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মেই মেরি ম্যাক্‌ডেলেন্‌কে খৃষ্ট কৃপা করলেন, রূপ-সনাতন মহাপ্রভুর অনুগমন করলেন রাজকার্যে ইস্তফা দিয়ে। গুরুর সন্ধানে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করা প্রয়োজন হয় না। 'কুশলোঽস্য লব্ধা'-র 'আশ্চর্যো বক্তা' ভগবদ্‌বিধানে জুটে যাবেই।

গীতার আহ্বান

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥’

এক পুণ্য শুক্লা একাদশী তিথিতে ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সাময়িকভাবে শোকসংবিগ্ন বিষাদাহত মোহগ্রস্ত অর্জুনকে সর্বভীতিপ্রণাশক অভয়-মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।’ বলেছিলেন—অর্জুন, ক্লীবতাচ্ছন্ন হোয়ো না, পবিত্র জ্ঞানাগ্নিতে স্বকৃত কর্ম ও তার আসক্তি দগ্ধ ক’রে ওঠো, জাগো, যুদ্ধ ক’রে জয়লাভ কর। সে আজ পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের আসন্ন যুদ্ধে সংগ্রামোদ্যত সেনানীবৃন্দের সংগ্রাম-কোলাহলের মধ্যে একান্তে উচ্চারিত সেই কালজয়ী মহতী বাণী আজও ভারতের আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন প্রভৃতি অত্যাচারী ক্ষমতালুব্ধ রাজন্যবর্গের অন্যায়-অত্যাচার-কুচক্র-জর্জরিত, উদ্‌ভ্রান্ত-উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ‘খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত’কে ‘এক ধর্মরাজ্যপাশে’ বেঁধে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন। ভরতকুল-গৌরব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন সেই ধর্মরাজ্যের মধ্যমণি, সহায়ক অর্জুন, আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন মহতীপ্রেরণা উদ্বোধক এবং প্রতিষ্ঠাতা। মগধরাজ জরাসন্ধকে কৃষ্ণ ঠিক এরই পূর্বাভাস দিয়ে বলেছিলেন,

‘বয়ং হি শক্তা ধর্মস্য রক্ষণে ধর্মচারিণঃ।’—ধর্মাচরণকারী আমরাই একমাত্র ধর্ম রক্ষণে সমর্থ। একথার প্রমাণ তিনি কাজে দিয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ও কর্ম যে কত দৃঢ়—কত বলিষ্ঠ, মহাভারত থেকেই আমরা তা জানতে পারি। নির্যাতনের কথা স্মরণ ক’রে ফণিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধা ও ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীকে লক্ষ্য ক’রে তিনি বলেছিলেন, নির্যাতনকারীরা, দুষ্কৃতকারীরা বিনষ্ট হবেই,

‘চলেদ্ধি হিমবান্ শৈলঃ পৃথিবী শতধা ফলেৎ।
দ্যৌঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মোঘং মে
বচো ভবেৎ ॥’

অর্থাৎ, হিমালয় পাহাড় সচল হতে পারে, পৃথিবী শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ’তে পারে, নক্ষত্রাবলীসহ আকাশ খসে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি যে কথা বলেছি, তা কোন দিন ব্যর্থ হবে না। শ্রীকৃষ্ণের একথা যে সত্যই অমোঘ তার প্রমাণ মহাভারতের ঘটনাবলী—

ষ্ঠির কর্তৃক রাজ্যগ্রহণ এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে অক্ষুণ্ণ গৌরবে কৃষ্ণাদর্শ গীতার সশ্রদ্ধ সমাদর।

ভারতীয় মনীষায় মানবিক চরিত্র-গঠনই ধর্মাচরণ। আদি ধর্মপ্রবক্তা মহর্ষি মনু চরিত্র-গঠনমূলক ধর্মের যে দশটি লক্ষণ আবিষ্কার ও নির্দেশ করেছিলেন ভারতবর্ষ তাকেই মানুষের নিত্যকালীন ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে। এই চরিত্র-গঠনরূপ মনুষ্যত্ব বা ধর্ম মানুষের স্বয়ং অনুশীলনসাপেক্ষ। চারিত্রিক অধঃপতনই অধর্মের অভ্যুত্থান; অসংযত অননুশীলিত প্রাকৃত বা জীবতা-সীমিত অবস্থাই মানবজীবনে ধর্মের গ্লানিময় অবস্থা। যে সমাজের মানুষ

অনুশীলন এবং অভ্যাস-সাপেক্ষ—কাম-ক্রোধাদি থেকে উদ্ভূত বেগ বা চাঞ্চল্যসমূহের ধারণে সমর্থ হয়, সেই মানবসমাজই ধর্ম-অধ্যুষিত সুখ-সমৃদ্ধ সমাজ বলে গণ্য। সেই সমাজই ধার্মিক-পরিচালিত মানব-সমাজ। সুতরাং, ধর্ম যখন স্বয়ং অনুশীলিত চরিত্র-সাপেক্ষ, ধর্মের উত্থান-পতনও তখন যুগে যুগে ঘটে থাকে। ইতিহাস-পুরাণে এই উত্থান-পতনের স্পষ্টোক্তি আছে। বিভিন্ন সময়ে অবতারগণের আবির্ভাবও তারই ইঙ্গিত বহন করে। সেদিক থেকে বিচার ক'রে দেখতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু আগে থেকেই ভারতীয় সমাজে এই চারিত্রিক অধঃপতনরূপ গ্লানিপূর্ণ অধর্মের অভ্যুত্থান শুরু হয়েছেল, একথা বলতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক কালে সেই চারিত্রিক অধঃপতন, গোটা সমাজকে বিষাক্ত ক'রে, অবশেষে তার চরম পরিণতি-রূপ রাজনৈতিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছিল। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ যে এই ক্ষমতাদ্বন্দ্বের অংশীদার ছিল না, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ, ধর্মই যেখানে বিপর্যস্ত, গ্লানিপূর্ণ, উর্দ্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের কেউ-ই সেখানে বাদ পড়তে পারে না; ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ-রাষ্ট্র সবকিছুই সেখানে কলুষিত। মহাভারতের সমকালীন ধর্মের এই গ্লানিময় অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরকে নাড়া দিয়েছিল। এই সঙ্কট কুখতে প্রথমে তিনি একাই দাঁড়িয়েছিলেন। অবশেষে সহায়ক-রূপে পেলেন পাণ্ডবদের। সমন্বিত সশ্রদ্ধ নিষ্কাম জ্ঞান ও কর্মের মূর্ত বিগ্রহ কৃষ্ণ-পাণ্ডব মিলে তথাকথিত অভ্যুত্থিত অধর্মের মুখোমুখী হলেন। অমোঘ ধর্মশক্তির কাছে একে একে জরাসন্ধ-শিশুপাল জয়দ্রথ-দুর্যোধন প্রভৃতি অধার্মিক নৃপতিবৃন্দ পরাজিত হলেন। কংসবধ আগেই হয়েছিল। গাছ যত বড় ও দৃঢ় হোক না কেন মূলকে দুর্বল করলে সহজেই তাকে ভূপাতিত করা যায়। তেমনি অধর্মবিস্তারের মূল এসব নরপতিদের পতনের সাথে সাথেই অভ্যুত্থিত অধর্মের মূলোচ্ছেদ হ'ল। তার পরেই এল সমাজসংস্কারের পালা। কৃষ্ণ-সহায়ক যুধিষ্ঠির রাজদণ্ড হাতে সে ভার নিলেন।

এ তো গেল শ্রীকৃষ্ণের সমকালীন অধর্ম-বিপর্যস্ত ভারতের ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট। আধুনিক ভারতেও এই অধর্মের অভ্যুত্থান প্রকট।

ব্যক্তিই যে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি, একথা কোন যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা না রেখেই বলা যায়। ব্যক্তি যদি ব্যক্তিত্ব বা মনুষ্যত্বরূপ স্বধর্ম-প্রতিষ্ঠ না হয়, অর্থাৎ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজ নিজ চরিত্রকে সংযত না রাখে, তাহলে তার জীবনস্থ সেই অনিয়ন্ত্রিত-প্রাকৃত-বেগ-পরিচালিত চিন্তা-কর্ম-আচরণ সব কিছুই পারস্পরিক সহযোগিতা-নিরপেক্ষ স্বৈরাচারে পরিপূর্ণ বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিজীবন হ'য়ে পড়ে সম্পূর্ণ কেন্দ্রচ্যুত। ভয়-ভীতি-আতঙ্ক-স্বার্থ-পরতা-অসহযোগিতা-নিষ্ঠুরতা-বিচার-বিশ্লেষণ-হীন স্বয়ম্মন্যতা-দুর্নীতি-দম্ভ-অহংকার-ক্ষমতা-লুব্ধতা প্রভৃতি তো তারই পরিণামফল। উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তি-জীবনের এসব অমানবিক দুর্গুণ প্রথমেই পারিবারিক সুস্থতা ও শান্তিকে কলুষিত ক'রে সংক্রামক ব্যাধির মতোই সমাজ-জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তা রাজনীতিতেও প্রবেশ করে। আজ তাই আমাদের ব্যক্তি-জীবনকে ভারতের চিরন্তন আদর্শে, গীতার আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

যুগে যুগে বহু বিভিন্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যে ভারত নিজেকে রক্ষা ক'রে এসেছে, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা-অন্ধকারের মধ্যেও যে ভারত নিজের স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে, যে অভয়-বাণীকে অবলম্বন করে বহু বিপর্যয় ও পতন-সঙ্কটের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছে, সেই পথই আজও তাকে রক্ষা করবে। উদার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত, শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় জীবন বাণীরূপ গীতার আদর্শ সেই জাগরণের পথ। সে বাণী নবরূপে পুনরুদ্দোষিত হয়েছে আধুনিক যুগে। ভয় কি? আত্মশক্তিতে নির্ভর এবং বিশ্লেষিত বিশ্বাসই সেই পথ। নিজেকে নিজের পতনের কারণ না ক'রে সর্বতোভাবে নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করাই সেই পথ। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসই নিজের পতনের কারণ। এই কথাই তো দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতোপদেশের মধ্যে বলেছেন—

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।'

নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করবে, কখনও নিজেকে অবসন্ন অর্থাৎ তমোগুণ-প্রভাবিত হ'য়ে অধঃপাতিত করবে না। এখন কথা হ'ল 'নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করবে, নিজেকে অধঃপাতিত করবে না'—একথার তাৎপর্য কি!

ঈশ্বর-ব্রহ্ম-আত্মা যে কারো পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না বা দান করেন না একথা গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবেই রয়েছে। সুতরাং, আত্মা শব্দের বাচ্য যে এখানে ঈশ্বর-ব্রহ্ম-প্রভু নহেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। এখানে আত্মা অর্থে নরত্বাভিমানী জীবকেই বুঝানো হ'য়েছে। আত্মার বন্ধন বা মুক্তি কোনটাই নেই। পক্ষান্তরে বন্ধন এবং মুক্তি উভয়ই নরত্বাভিমানী জীবের, তাই 'উদ্ধার' বলতে এখানে সেই মানবাভিমানী জীবেরই উদ্ধার বুঝতে হবে। এবারে একটু বিশদ ব্যাখ্যায় আসা যাক।

অবসন্নতা বা অবসাদ তমোগুণের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'নাত্মানমবসাদয়েৎ' অর্থাৎ নিজেকে কখনই অবসন্ন করবে না। এ কথার তাৎপর্য কি? আমরা দেখেছি 'নিজ' অর্থে এখানে মানবাভিমানী জীব। এই 'মানবাভি-মানী জীব' কথাটা ঈশোপনিষদে স্বীকৃত। এখন কথা হ'ল—জীবের ওপর কোন্ অবস্থায় 'মানবাভিমান' আরোপিত হ'তে পারে? বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গেলে জীবতা ও মানবতার স্বরূপগত লক্ষণের সাথে পরিচয় থাকা দরকার।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে আমরা কতকগুলি বৃত্তি বর্জনের উপদেশ পাই; যেমন—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য ইত্যাদি। অথচ এগুলি সাধারণ জীবনে অপরিহার্যরূপেই দেখা দেয় এবং জীবনের অস্তিত্বকাল পর্যন্ত অপরিহার্যরূপেই থাকে। ভাষান্তরে এদের জৈববৃত্তিও বলা হয়। এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন, এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্প। সেজন্য বর্জন অর্থে সাধারণতঃ এই বৃত্তিগুলিকে সংযত করা বুঝায়। এই বৃত্তিনিচয়কে সংযত বা স্বীয় বশে রাখতে গেলে নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার্জনের প্রয়োজন। অথচ সে গুণ বা ক্ষমতা স্বাভাবিক বা প্রাকৃত নিয়মের মধ্যে নেই। এগুলি প্রাকৃত নিয়মের অতিরিক্ত ব'লে, এদের অতিজৈব বা অতি প্রাকৃত গুণ বলা যেতে পারে। সেগুলি কি কি? মহর্ষি মনু এই অতিজৈব গুণগুলিকে দশটি ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন: ধৈর্য, ক্ষমা, দম (মানসিক

চাঞ্চল্য দমন), অস্তেয় (অচৌর্য বা অকপটতা), শুচিতা. জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সংযম, ধী, বিদ্যা (জ্ঞানার্জন), সত্যতা এবং অক্রোধ। পাঠক অনায়াসেই বুঝতে পারছেন যে. এই দশটি গুণ অর্জন মানবেতর কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়, আবার মানুষের মধ্যেও প্রাকৃত নিয়মে এরা থাকে না। অনুশীলন এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসসাপেক্ষ এই দশটি গুণকেই আমরা অতিজৈব বা মানবীয় বিশেষ ক্ষমতাবলে চিহ্নিত করতে চাই। মানুষ এদের ধারণ ক'রে অতিরিক্ত গুণসম্পন্ন হয় ব'লে মনু এই দশটিকেই একমাত্র ধর্মের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। যে বৃত্তি-গুলিকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বর্জন বা সংযমের উপদেশ পাই—উল্লিখিত দশটি গুণের অনুশীলন অভ্যাসের মাধ্যমেই তা সম্ভব। এই অভ্যাসই মানুষকে অধিক অর্থাৎ অতিরিক্ত ও নির্বিশেষ জৈবভাবের অপেক্ষায় বিশেষ গুণ-সম্পন্ন করে তোলে। অন্য একটি শ্লোকেও একথার দৃঢ় সমর্থন মেলে :

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন প্রভৃতি বৃত্তিগুলি এখানে মানুষের বিশেষ ও অতিরিক্ত গুণ বলে উল্লিখিত হয়নি, বরং এই বৃত্তি-পরিচালিত জীবনকে জৈব-জীবনই বলা হয়েছে। অতিরিক্ত এবং বিশেষ গুণ-ক্ষমতাহীন মানুষকে পাশব জীবনের সাথে সমান করেই দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ধর্মকে বলা হয়েছে মানুষের অধিক, বিশেষ গুণ। মানুষ এই অধিক, বিশেষ গুণ-শূন্য হ'লে পশুতে-মানুষে কোন প্রভেদ থাকে না। এবারে আমরা আগের কথাতেই ফিরে যাই। আমরা দেখেছি যে, মনুবর্ণিত দশটি গুণ, ক্ষমতা, যাকে তিনি ধর্মের লক্ষণ বলেছেন, তা মানুষের স্বীয় অনুশীলনের অপেক্ষা করে। এখানে দেখছি, ধর্ম হ'ল মানুষের অধিক, বিশেষ ক্ষমতা বা গুণ। সুতরাং উভয় শ্লোকের তাৎপর্য বিচার ক'রে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'তে পারি যে, মনু যে দশটি গুণকে ধর্মের লক্ষণ বলেছেন, অতিরিক্ত এবং বিশেষ গুণের সঙ্গে তা অভিন্ন। অতিরিক্ত এবং এই বিশেষ নামে অভিহিত ধর্মের সাথে মানবীয় ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, মানবতা প্রভৃতিরও কোন প্রভেদ নেই—অর্থাৎ মনুষ্যত্বই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ; এই মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিত্বই মানুষ। মানুষ' বলতে কেবল কোন রক্তমাংসের শরীরকে বোঝায় না ; এই মনুষ্যত্বই মানুষের নিজত্ব বা স্বকীয়ত্ব। এবারে আগের কথায় ফিরে আসি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' নিজেকে নিজের দ্বারা উদ্ধার কর। একই কথা—মানবিক গুণের দ্বারা নিজের মনুষ্যত্বকে উদ্ধার—উন্নত—কর। 'নাত্মানম-বসাদয়েৎ'—নিজেকে কখনও অবসন্ন ক'রো না। অবসাদ, অবসন্নতা এখানে তমোগুণাচ্ছন্ন অর্থে। প্রাকৃত অবস্থায় জীবকে তমোগুণাচ্ছন্ন বলা হয়েছে। তমোগুণ এবং অবসাদ এখানে অভিন্নার্থক। তমোগুণের কোন নিজস্ব চেষ্টা নেই। স্বকীয় চেষ্টা রজঃসত্ত্বের প্রভাবে ঘটে। স্বকীয় চেষ্টায় এই গুণ দুটির অভ্যাস করলে মানুষের উপর জৈব প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে। শ্লোকান্তরে শ্রীকৃষ্ণ সে কথাও বলেছেন :

'ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥'

তাৎপর্য এই যে, সত্ত্বগুণাধিক্যের উৎকর্ষ বা উন্নতি সর্বাধিক, রজোগুণের মধ্যম এবং

তমোগুণাচ্ছন্নদের কোন উন্নতি বা উৎকর্ষ নেই। পক্ষান্তরে তমোগুণ নিকৃষ্ট। তমোগুণ চেষ্টারহিত করে, জড়ত্ব এনে দেয়। তমোগুণাচ্ছন্ন বা স্বীয় উন্নতির চেষ্টাবিহীন মানুষকে তাই জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থ বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটাই পরিষ্কার হয় যে, মানবগুণ—মানবিকতা—মনুষ্যত্ব—মানব-চরিত্র বা মানবধর্ম সম্পূর্ণরূপে মানুষের অভ্যাস-সাপেক্ষ। অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের মধ্যে যে তমোগুণ-প্রাধান্যরূপ আহার-নিদ্রাদি, লোভ মোহাদি জৈব ভাব থাকে, স্বীয় চেষ্টায় তাকে ধৈর্য-ক্ষমা প্রভৃতির মাধ্যমে সংযত রাখাই নিজের মানবীয় আচরণ দ্বারা মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা। যে মানুষ তা না করে সে মানবিক গৌরবের অধিকারী নয়। মানুষ যদি তার স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য-অতিজীবতা—ধর্ম নামক অতিরিক্ত এবং বিশেষ গুণের অধিকারী হতে চায়—তবে তার এই মানবিকতায় উন্নীতকরণের ক্ষমতাকে তমোগুণাচ্ছন্ন ক'রে রাখলে চলবে না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বললেন, 'নাত্মানমবসাদয়েৎ'। অবসাদ, আড়ষ্টতা মানবিক ধর্মের বিপরীত, উন্নতির প্রতিবন্ধক; সুতরাং নিরলসভাবে আত্মোন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাবে। মানুষ যদি তার জীবনস্থ জীবতাকে মানবিকতায় রূপান্তরিত না করে, তবে সে নিজেই নিজের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করে; আর, মানবাচরণ অভ্যাসকারী নিজেই নিজের বন্ধু —'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।'

এতক্ষণ আমরা যে মানবগুণের পর্যালোচনা করলাম, গীতায় তাকে দৈব গুণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণোচ্চারিত দৈব গুণ-গুলি হ'ল: 'নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান এবং যোগে তৎপরতা, দান, ইন্দ্রিয়দমন, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অকপটতা, করুণা, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, অদ্রোহ (পরপীড়নে অনিচ্ছা) এবং নাতিমানিতা।' কয়েকটি বিষয় বাদে চরিত্রগঠনের পক্ষে যে গুণগুলির প্রয়োজন তাতে মনু-শ্রীকৃষ্ণে কোন পার্থক্য নেই।

জনজীবনের এই স্বকীয়ত্ব বা মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠাহীন নিছক দেহকেন্দ্রিক মানবাভিমানে উন্মত্ত-উদ্‌ভ্রান্ত উৎকেন্দ্রিক অবস্থাই অধর্মের অভ্যুত্থান বা ধর্মের গ্লানিময় অবস্থা। একদা দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই গ্লানিময় অবস্থা দেখেই শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে এসেছিলেন ধর্মের গ্লানি-মোচনে। দৃঢ় সুকঠিন কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'বয়ং হি শক্তা ধর্মস্য রক্ষণে ধর্মচারিণঃ।' আজ শ্রীকৃষ্ণ স্থূলদেহে নেই, কিন্তু ভারতবর্ষ কোনদিন শ্রীকৃষ্ণহীন নয়। যে মানবীয় আদর্শ দিয়ে কৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবনকে বিভূষিত করেছিলেন, গীতায় বর্ণিত সেই মানবিক আদর্শই তাঁর মূর্ত রূপ। কোন ব্যক্তির জীবনাদর্শের সঙ্গে যদি তার বাণীর কোন প্রভেদ না থাকে-তবে, সেই জীবনাদর্শই যে সে ব্যক্তির শাশ্বত রূপ, একথা কোন যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না। সে ব্যক্তি তাঁর বাণীনিবদ্ধ আদর্শে চিরজাগ্রত—তাঁর বাণীর মধ্যে নিত্য অবতীর্ণ। গীতাই ভারতের শাশ্বত শ্রীকৃষ্ণ। যে এই গীতার আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত করে, নিঃসন্দেহে সে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শেরই উপাসক। একমাত্র সে-ই শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধাশীল—জীবনের মর্মমূলে যে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করে, জীবন তার কৃষ্ণময়।

ভারতের বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায়,

গীতাবর্ণিত আদর্শই, ভারতের শাশ্বত আদর্শই আমাদের পথপ্রদর্শক, অভ্যুত্থিত অধর্ম-নিবারণ এবং ধর্মের গ্লানিমোচনে সক্ষম। আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রতিমুহূর্তে এই কথা মনে রেখে নিজেদের নিজস্বরূপ মানবিকতায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করি। ব্যক্তি জীবনগঠনে সচেষ্ট হলেই জাতীয় জীবন গড়ে ওঠে। ভারতের শাশ্বত বাণী, গীতার বাণীই নবযুগে কম্বুকণ্ঠে আমাদের সজাগ ক'রে দিচ্ছে, 'ওঠো, জাগো !'—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত !'

অন্তরতম

শ্রীশান্তশীল দাশ

বাহিরেতে কোলাহল, কত অন্ধকার :
সেই শব্দ, সেই কালো অন্তরে আমার
কখনো পশে না যেন, সেখানে নিভৃতে
তোমার আসনখানি নিঃশব্দ সঙ্গীতে
বিরাজ করুক নিত্য, আর স্নিগ্ধ জ্যোতি
তোমার রূপের ওই, হে হৃদয়পতি,
থাকুক অটুট হয়ে, আর কিছু নয় ;
তুমি থাক পূর্ণ ক'রে আমার হৃদয়।
সে-নিভৃতে নিত্য হোক তোমার অর্চনা,
সর্ব আড়ম্বরমুক্ত পূজার্ঘ্য রচনা ;
অন্তরে প্রেমের মন্ত্র স্বতঃ উৎসারণ,
গানে গানে সেই মন্ত্রে তোমার চরণ
বন্দনা করুক নিত্য চিত্ত অসংশয়—
পূর্ণ কর এ প্রার্থনা, হে অন্তরময়।

বিদ্যা, বিনয় ও বিপ্লব

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপরের তিনটি কথাই রকমারি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেই হিসেবে প্রথমেই এদের পারস্পরিক যোগ-সম্পর্কে কিছু বলে বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। বর্তমান নিবন্ধে এদের কি অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা পরিষ্কার করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। এক কথায় বলা যায়, 'সামান্য' (general) অর্থে কথাগুলোকে ব্যবহার করলে এদের অন্যান্য সম্পর্ক বোঝা যায়। যুগের প্রয়োজনে এ উপলব্ধির প্রয়োজন এখন সমধিক শেষের কথাটিই প্রথমে ধরা যাক। হাল আমলে 'বিপ্লব' কথাটি মুখে মুখে ঘুরছে; পত্রপত্রিকাতে এর এন্তার আলোচনাও হচ্ছে। মোটামুটিভাবে এক বিশেষ particular) অর্থে এটি প্রযুক্ত হচ্ছে, তা হ'ল সংস্কৃত পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' এছাড়া শিল্পবিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি বহু বিপ্লবের কথাই হরবখত্ লিখিত, পঠিত ও আলোচিত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধে ঐ সব 'বিশেষ' বিপ্লব, যাদের গুরুত্বও অনস্বীকার্য এবং নিঃসন্দেহে ভাবনার বিষয়, আলোচিত হবে না। আগেই বলা হয়েছে, 'সামান্য' অর্থে এখানে বিপ্লবের ব্যবহার হবে। এধরনের প্রয়োগের সুবিধে হ'ল এই যে, সব রকম 'বিশেষ' বিপ্লবই এর আওতার মধ্যে পড়ে। সুতরাং সামান্য অর্থে বিপ্লবের জন্য যা যা প্রয়োজন, বিশেষ অর্থেও সেসব মৌল শর্ত নিশ্চয়ই পূরণ করতে হবে। নতুবা বিপ্লব আদপেই হবে না, তা যত তারস্বরেই 'বিপ্লব', 'বিপ্লব' বলে চীৎকার করা হোক না কেন।

'বিপ্লব' (বি+প্লু+অপ্) কথাটির সামান্য অর্থ হ'ল 'বিশেষ প্লাবন' বা ভাসিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ কর্মের জোয়ার বইয়ে দেওয়া। বর্তমানে সাধারণভাবে একটা ভুল ভাব প্রচলিত হয়েছে—তা হ'ল বিপ্লব মানে পুরণোকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেওয়া। পুরনো সমাজব্যবস্থা, পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থা, পুরনো আর্থিক কাঠামো, পুরনো শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চয়ই পালটানো প্রয়োজন; ক্ষেত্রবিশেষে আমূল সংস্কারও দরকার হতে পারে। কিন্তু এ তো নেহাত ই ঋণাত্মক দিক্। মূল কথা হ'ল, এগুলো পালটে দিয়ে এদের জায়গায় কি বসানো হচ্ছে তার সম্পর্কে শুধু স্বচ্ছ ধারণাই নয়, তাকে কর্মে রূপায়ণের জন্য চাই অদম্য উৎসাহ ও উদ্যোগ। সুতরাং জোরটা আসলে পড়া উচিত ধনাত্মক দিকের ওপর, ঋণাত্মক দিকের উপর নয়; কর্মের ওপর, বিকর্মের ওপর নয়। অর্থাৎ গঠনমূলক কর্মের প্লাবন বইয়ে দিতে পারলেই বিপ্লব সার্থক হবে (তা যে বিপ্লবই হোক না কেন), নচেৎ নয়। কেবলমাত্র কথার কচকচিতে বা নিছক ভাঙাচোরার মধ্যে দিয়ে কোন সত্যিকারের বিপ্লব আসে না, আসতে পারে না।

'বিদ্যা' (বিদ্+ক্যপ্—ণ+স্ত্রী টাপ্) কথাটিও বহু অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, যেমন, জ্ঞানসাধন, তত্ত্বজ্ঞান, মন্ত্রশক্তি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে চৌর্যবিদ্যা পর্যন্ত। কিন্তু সামান্য অর্থে এর অর্থ হল জানা; কারণ সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু যার অর্থ হ'ল জানা, তার থেকেই শব্দটির উৎপত্তি। এখন এই জানা নানা রকম হতে

পারে—বই পড়ে জানা, লোকের মুখে শুনে জানা বা নিজে দেখে বা পরীক্ষা ক'রে জানা। যে বিষয়েই আমরা জানতে চাই না কেন, সূত্র হিসেবে 'পড়ার থেকে শোনা ভাল, শোনার থেকে দেখা ভাল' এই ক্রমই সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, অর্থনীতির ক্ষেত্রেই হোক, রাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক বা জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই সঠিক জানা বা বিদ্যার সবিশেষ প্রয়োজন। ঠিক ঠিক না জানলে যা কিছু করা হবে তাতেই ভুলের অনুপ্রবেশ ঘটবে। যা কিছু পড়ে জানা যায় বা শুনে জানা যায়, তাকে অবশ্যই যথাসম্ভব দেখে জানার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। তবে কারুর একার পক্ষে সব পড়া বা শোনা বা দেখা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়; তাই যৌথ কর্মসূচী ছাড়া গতি নেই। পড়ে, শুনে এবং দেখে জানতে হবে, তবেই জানা বা বিদ্যা পূর্ণ হবে। তার ভিত্তিতে কর্ম করা সম্ভব হবে, নতুবা কর্মের নামে বিকর্মই বেশী হবে। হাল আমলে এই বিকর্মের বিস্তার, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে, বিপুল আকারে দেখা দিয়েছে।

এখন 'বিনয়' (বি+নী+অচ্) কথাটির সামান্য অর্থে আসা যাক্। এটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা, 'বিশেষ নয়ন' বা সৎপথপ্রবর্তন, শিষ্টাচার, প্রণতি, ইন্দ্রিয়জয়, শাসন, আনুকূল্য, ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত অর্থটিই ধরা হবে, কারণ ওটিই ব্যুৎপত্তিগত এবং সামান্য অর্থ। বিনয়ের প্রয়োজন এবং প্রয়োগ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, কেননা একযুগের সমস্যা ও তার নিরাকরণের জন্য যে সৎপথ তা অন্যযুগের সমস্যা ও সমাধানের সৎপথের সঙ্গে ঠিক এক নয়। এককালের বিনয় আর এককালের বিনয়ের ঠিক প্রতিচ্ছবি হতে পারে না; কিন্তু নিসংশয়ে একথা বলা চলে যে, বিনয় চাই-ই চাই, নইলে বিদ্যা যে হয় কানা আর বিপ্লব যে হয় অকার্যকর।

বর্তমান লেখকের মনে 'বিদ্যা, বিনয় ও বিপ্লব' তিনটি শব্দমাত্র নয়, একসূত্রে গাঁথা কর্মসূচীও বটে 'সূত্রে মণিগণাঃ ইব'। বিপ্লব, তা যে বিপ্লবই হোক না কেন, আনতে গেলে বিদ্যা ও বিনয় অত্যাবশ্যক। প্রথমেই জানতে হবে, যাদের জন্য বিপ্লব তারা কতটা কর্মের প্লাবনে সাড়া দিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়তঃ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন ও তাকে কর্মে রূপায়িত করার জন্য বিপুল ও সার্বিক গণ-উদ্যোগ। এর জন্য প্রয়োজন— স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান। এই সুসংহত কর্ম-কাণ্ডের জন্য চাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব—যে নেতৃত্ব শুধু পুরনো, অকেজো, যুগপ্রয়োজনে অব্যবহার্য ব্যবস্থাগুলিকে ভেঙে ফেলতেই পারে এমন নয়, তার পরিবর্তে নতুন কর্মের জোয়ার বইয়ে দিয়ে সারা সমাজদেহে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রকৃতির প্লাবনের কিছু ছবি স্বতই মনে আসে। যারা পদ্মা-পারের মানুষ, তারা নিশ্চয়ই স্বচক্ষে দেখেছেন ভাঙনকূলের ছবি। একপারে ভয়াবহ ভাঙনে জনপদাবলুপ্ত এবং পদ্মার গর্ভে তার আশ্রয়-গ্রহণ; কিন্তু অচিরেই অপরপারে পালমাটি-পরিপুষ্ট অসাধারণ ফলন-সম্ভবা ভূমির আনন্দময় সলিলোত্থান এবং আবির্ভাব। ভাঙা-গড়ার কাজ একসঙ্গে চলছে, বস্তুতঃ গড়ার কাজ যুগপৎ না চললে ধ্বংসই হ'ত একমাত্র পরিণাম। কিন্তু প্রকৃতির ক্রিয়াকাণ্ডে এক-পেশে ব্যাপার খুব কম (নেই এমন নয়)— বিপুল বিধ্বংসের পাশেই থাকে সুবিশাল সৃষ্টির প্রক্রিয়া। মানুষের সজ্ঞান বিপ্লব-প্রচেষ্টাও

অনুরূপ হতে বাধ্য, না হলে তা মানুষের কোন কাজেই আসবে না। মনে করা যাক্, একতরফা কালাপাহাড়ী ধ্বংসই হতে থাকল বছরের পর বছর ধরে! তাকে কি সত্যিকারের বিপ্লব বলা উচিত হবে? এককথায় উত্তর, 'না'। এ যেন চাঁদের অন্ধকার আধখানা; আলোকিত আধখানা না পেলে চাঁদ আর যেমন আমাদের কাছে থাকে না, পূর্ণ অমাবস্যা হয়ে যায়, তেমনি মানুষের যে বিপ্লবী কর্ম-প্রচেষ্টা নিছক ভেঙ্গে ফেলাতেই পর্যবসিত, তা শুধু নিবিড়তর তিমিরেই ঠেলে দেয়, তাতে বিদ্যুৎ-চমক যতই থাক না কেন। তাই বিপ্লবের গড়ার দিক্, তার আলোর দিক্, প্রসন্ন দিকের ওপর জোর দিতেই হবে। এখানেও সেই 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্ তেন মাং পাহি নিত্যম্', নতুবা বিপ্লব হবে বন্ধ্যা নারীর পুত্রাকাঙ্ক্ষার সামিল।

যে-কোন বিপ্লবকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে আবশ্যিক উপাদান হিসেবে চাই বিদ্যা ও বিনয়। পুরনো ব্যবস্থাগুলির ত্রুটি যেমন জানতে হবে, তেমনই জানতে হবে নতুন কি কি করা অত্যাবশ্যক এবং তা করতে হলে যথোপযুক্ত উপায় কি। এর জন্য জনগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার রূপায়ণের প্রস্তুতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শুধু বই-পড়া বিদ্যে থাকলেই কাজ এগুবে না। ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে না শিখলে এবিষয়ে নেতৃত্ব করাও অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষে এযাবৎ চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয়েছে—এদের মধ্যে গ্রামোন্নয়নকল্পে সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা (Community Development Project) ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extention Service) খুবই উল্লেখযোগ্য। সারা ভারতের গ্রামোন্নয়ন এদের লক্ষ্য। কাগজে-কলমে পরিকল্পনাগুলো যথেষ্ট ব্যাপক ও উচ্চাশাপরিপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবিক গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে গত বিশ বছরে খুব বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। এখানে ওখানে কম-বেশী কিছু উন্নতি হয়েছে নিশ্চয়ই; কিন্তু যে ধরনের উন্নতিতে সারা গ্রাম-ভারতে (সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশী গ্রামে) সাড়া পড়ে যাবে এবং ভারত তার বিপুল মনুষ্য-সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে 'জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' এমনটি তো হয়নি। এর মূল কারণ বিদ্যার অভাব অর্থাৎ গ্রাম-ভারত বা আসল ভারতকে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা, তার সমস্যাবলীকে নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হৃদয়ঙ্গম করা ও তাদের মোকাবিলার প্রয়াস ঠিকমত করা হয়-নি।

কিছু বৈঠক ক'রে এবং জনগণের সহযোগিতা চাই বলে কিছু বক্তৃতা ও বিবৃতি দিলেই গ্রামীণ জীবনে কর্মের স্রোত বয় না; অতএব বিপ্লব 'দূর্ অস্ত্'।

অথবা সাম্প্রতিককালের আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য বিগত ২২।২৩ বছরে বিভিন্ন কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, যথা, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মুদালিয়র কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার জন্য রাধাকৃষ্ণন কমিশন, কোঠারী কমিশন ইত্যাদি। এই কমিশনগুলি দীর্ঘদিন সারা ভারত ঘুরে বহু তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যবান্ সুপারিশসহ তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রকমারি ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়েছে; কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষার সংহতি ও প্রগতির নিতান্ত অভাবই

ক্রমশঃ পরিস্ফুট হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটাই ধরা যাক। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ত্রি-বার্ষিক স্নাতক ব্যবস্থা চালু হয়েছে বেশ কিছুদিন। কিন্তু গত কয়েক বছরে এখানে শিক্ষার যে হাল হয়েছে তা অতীব করুণ। তরুণচিত্তে বর্তমান শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত না হয়ে ঘৃণা ও অবজ্ঞার উদয় হয়েছে। তার ফলে বিদ্যা ও বিনয়ের সমাধি তো রচিত হয়েছেই, বিপ্লব শ্লোগানে পরিণত হয়েছে মাত্র। যথার্থ বিদ্যার অভাব আমাদের দেশে এখন উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। শুধু অন্ধ অনুকরণ চলছে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তেমন। বহুদিন পূর্বে স্বামীজীর উচ্চারিত সাবধান-বাণী—'অনুকরণ, কাপুরুষের মতো অনুকরণই প্রগতির পথে সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা'—এখানে উল্লেখ্য। যতদিন বিদেশী বাকা, বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী আচার-ব্যবহারের অবাধ, নির্বিচার অনুকরণই শুধু চলবে, ততদিন না পারব আমরা আমাদের ঠিক ঠিক জানতে, না পারব বিদেশীদের যথার্থ প্রগতিপন্থী চিন্তা ও কর্মধারাকে স্বাঙ্গীকৃত করতে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজা দরকার, যাতে করে সারা দেশকে মর্মে গ্রহণ করার মত মানসিকতা জন্মে—দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাধনাকে ঠিক জানা হয় অর্থাৎ 'বিদ্যা' হয়। তাহলেই বিপ্লবের দৃঢ়ভূমি প্রস্তুত হবে, নতুবা নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের অক্ষয় বাণী আবারও মনে ভেসে আসছে, 'মানব-জীবনের লক্ষ্য বাস্তবকে আদর্শায়িত করা নয়, আদর্শকে বাস্তবায়িত করা।' তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, আদর্শটি স্থির করা, তরুণচিত্তকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা ও তার রূপায়ণের জন্য তাদের সমগ্র শক্তিকে কাজে লাগানো। পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশে মনুষ্য-সম্পদের এত অ-ব্যবহার ও অপব্যবহার হয় কিনা জানি না। সম্মুখে সমস্যা আমাদের, অবক্ষয়ের পথে ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, না মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াব এবং সত্যিকারের বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাব। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টিই শ্রেয়ের পথ; তার জন্য চাই কঠিন পরিশ্রম, চরিত্রবল এবং ত্যাগ-স্বীকার। হিতোপদেশের পুরনো প্রবচন—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'—এখনও প্রযোজ্য। এ বিনয় শুধু শালীনতা বা শিষ্টাচার নয় (যথার্থ বিদ্যা সর্বদাই এসব গুণের বর্ধক), বিশেষ নয়ন বা সৎপথপ্রবর্তনও বটে। ঠিক ঠিক না জানলে ঠিক পথ বাতলানোও সম্ভব নয়। অর্ধেক জেনে বা আদৌ না জেনে যে পথ অবলম্বন করা হয়, তার ফল ভাল হয় না। স্বাধীনতোত্তর ভারতে তার ভূরি ভূরি নজীর। সুতরাং বিদ্যার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের অভাবও ঘটেছে। তাই চতুর্দিকে দেখতে পাই অবিদ্যা বা অপবিদ্যা আর তারই সঙ্গে কুৎসিত অশালীনতা, এবং সৎপথপ্রবর্তনের বা বিনয়ের অভাব। সুতরাং বিদ্যার অনুপস্থিতি বিনয়েরও অনুপস্থিতির কারণ হয়েছে; বিপ্লব আসন্ন না হয়ে ক্রমশঃ দূরে সরে সরে যাচ্ছে।

তাহলে কি করা কর্তব্য? অবিদ্যা ও অবিনয়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া এবং পৃথিবীর অনেক প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির মতো লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথ ধরা (প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, রোম ইত্যাদির মত), না নতুন কর্মোদ্যোগে মেতে ওঠা এবং 'সামান্য' অর্থে বিপ্লব সাধন করা। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' যদি সত্য বলে বিশ্বাস করি, তবে বিপ্লব এখানে অনিবার্য। তবে সে বিপ্লবের রূপরেখাকে

ভারতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হতেই হবে। ভারতের যা কিছু সুস্থ, সবল, সর্বজনীন ঐতিহ্য তাকে সমূলে বিনাশ করে বিপ্লব আনার প্রচেষ্টা হলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই প্রথমেই জানতে হবে, এ-রকম সুস্থ সর্বজনীন ঐতিহ্য আমাদের কি আছে এবং কতটা আছে এবং তাদের বর্তমান ভারতীয় জীবনে কি আকারে প্রয়োগ করা যায়। তারপর জানতে হবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে এবং কিভাবে তা হয়েছে এবং যথার্থ অগ্রগতি আমরাই বা কি তাদের কাছ থেকে শিখতে পারি। গত দুশো-আড়াইশো বছরে অনেক দেশ বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, শারীরিক ও মানসিক দক্ষতায় আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। এসব বিষয়ে তাদের সমকক্ষ হতে গেলে প্রচণ্ড পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনা প্রয়োজন। জাতীয় জীবনে কর্মের প্লাবন বা বিপ্লব এলেই তা হতে পারে, নচেৎ নয়। তাই বিপ্লব চাই-ই চাই। কিন্তু তার ক্ষেত্র কি প্রস্তুত হয়েছে? ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অবশ্য তৈরীই আছে; কিন্তু জনসাধারণের মানসক্ষেত্র তৈরী হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ চরিত্রবলে বলীয়ান্ সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব। স্বামীজীর ভাষায়, 'চরিত্র, একমাত্র চরিত্রই, আখেরে জয়ী হয়।' সুতরাং যখন দেখি, সারাদেশে এর অভাব, তখন মনে হয়, বিপ্লব এখনো দূরবর্তী। কিন্তু ইতিহাসের খেলা বড় অদ্ভুত। ঘনকৃষ্ণ মেঘেও রূপালি সীমারেখার উদ্ভাস হয় ক্ষণে ক্ষণে। ঊষার আলো ফুটবার আগের অন্ধকার নাকি রাত্রির গভীরতম অন্ধকার। ভারতের জাতীয় জীবনেও কি নূতন ঊষার আলো ফুটতে যাচ্ছে? ঘন তমিস্রার মধ্যে নূতন আলোর প্লাবনের আওয়াজ ভেসে আসছে। তাই এখনই জাতির মানসক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে লেগে যেতে হবে। তার জন্যে চাই যথার্থ বিদ্যা, যথার্থ বিনয়। কবির বাণী 'ঐ মহামানব আসে!' তাহলেই সার্থক হবে।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

গুরুপূর্ণিমার দিন একটি ভক্ত ঠাকুরকে পায়স ভোগ দিয়াছে। দুপুরে সে সাক্ষাৎভাবে গুরুদেবের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। বাবা এইমাত্র চান করিয়া ঘরে বসিয়াই ইষ্ট স্মরণ করিতেছেন। পূজারী আসিয়া জানাইল—'পায়েস-ভোগ বেশ ভালো হইয়াছে।' ভক্তটির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে শুদ্ধভাষায় উচ্চারণের ভঙ্গীতে বাবা বলিতেছেন, "সুবুদ্ধির উদয় হইল!" তারপর আরও দু-একজন পুষ্পাঞ্জলি দিলে বলিলেন, "(আশ্রমের) এরা এ-সব জানে না!"

সন্ধ্যাবেলা। বকে ক্যাম্পখাটে মহারাজ শুইয়া আছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন কথা না হওয়ায় ভক্তটি গুরুপূর্ণিমার সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিল। বাবা বলিলেন, "কেন, কি বৃত্তান্ত, জানি না তো। দেখতে হয়, আছে সব, কোথা থেকে শুরু—কতদিন থেকে। এই সময় চাতুর্মাস্য শুরু হয়, সব গুরুর কাছে আসে। পশ্চিমে খুব ধুম, এদিকে চল্ নেই। হিমালয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতাম, তিথি নক্ষত্র জানতাম না, তবে বছরের একটি দিনের হিসেব রাখতাম—শিবরাত্তিরের পর দ্বিতীয়া; উপোস করতাম—ব্যস্। দিন মাস বছর কোথা দিয়ে আসত—কোথা দিয়ে চলে যেত!"

একজন আগন্তুক (ভক্ত?) হাত তুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়াছে। বাবা তাহাকে খুব বকিলেন ও সেই উপলক্ষে বলিতেছেন, "প্রণাম তো নয়, যেন কুড়ুলে কোপ, বলি দিচ্ছে। সাধু-সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতেও জানে না? প্রণাম কত রকম আছে,—কি জানো তোমরা? 'জানুভ্যাঞ্চ তথা পদ্ভ্যাং উরসা শিরসা ধিয়া।' দাঁড়িয়ে প্রণাম অগ্রাহ্য। কত লোককে শেখাতে হয়েছে। প্রণামের কত নিয়ম আছে—শুয়ে থাকলে, বা চলন্ত অবস্থায়, কি তেল মাখলে, কি যখন অন্যমনস্ক তখন প্রণাম করতে নেই। অশুচি, অসুস্থ অবস্থায়ও প্রণাম করতে নেই। আজকাল কেউ বা করে কুড়ুলে প্রণাম, আর কেউ বা ভক্তির আতিশয্যে যখন তখন, যেখানে সেখানে। কেউ জানে না এসব। এবার মঠে শুয়ে আছি—বেলা ২টার সময়—না বলে না কয়ে একজন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। আমি তো চমকে উঠেছি। বললাম, লোককে শিক্ষা দিচ্ছ তোমরা। আর তোমাদের এইটুকু শিক্ষা হয়নি—ঘুমন্ত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। পরে উঠে বসে বললাম, নাও—এবার একবার ভাল ক'রে প্রণাম কর।"

*　　*　　*

এড়োয়ানি গ্রামের একটি মুসলমান ভক্ত চিঠি লিখিয়াছে: পুত্রবধূ মারা গিয়াছে, বড় শোকসন্তপ্ত, যদি কাহাকেও পাঠাইয়া দেন, শান্তি পাই...ইত্যাদি। বাবা চিঠিপড়া শুনিয়া খুব মর্মাহত হইলেন, "আহা! বড় শোক পেয়েছে এই বুড়ো বয়সে! সেই দুর্ভিক্ষের সময় ৪০ বছর আগে একবার দেখা, এখনও লেখে—কেমন শুদ্ধ বাংলা—'আপনার স্নেহস্রাবী পত্র পাইলে আনন্দিত হইব!' আগে একবার লিখেছিল—'আপনাকে ধ্যান করি,

তাহলে মনে বল পাই, সেবাশক্তির সঞ্চার হয়।' এখানে নিজে আসতে চায় না বা আমাকেও যেতে বলে না। বলে কি—'সেই তরুণ সন্ন্যাসীর রূপই আমার মনে অঙ্কিত আছে—সেই ভাল।' রাঢ়ের মাঠ, ধানের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। একবার যাওনা সব। শোক-তাপ পেয়েছে, খুশী হবে। সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠন, স্লাইড্ নিয়ে যাবে, প্রচার-কাজও হবে।"

* * *

পুরানো কথার প্রসঙ্গে একদিন বলিলেন "দিল্লীতে সন্ধ্যাবেলা একটা পার্কে বেঞ্চে বসে আছি। ঠাকুরের ভক্ত না হ'লে কারো বাড়িতে উঠব না—ভাবটা এই। দু'জন মাড়োয়ারী বাঙ্গালী সাধু দেখে পাশে এসে ব'সল। একথা সেকথা—খানিক পরে টাকা দিতে চায়। বলি—'না'। তখন বলে—'দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে একবার টাকা দিতে গেছলাম—তিনি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।' তখন পরিচয় হ'ল—ও সেই লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারী।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা হল্-এ বাবার চোখে কম্প্রেস দেওয়া হইতেছে; একজন বয়স্ক সাধু দিতেছেন। খানিক পরে বাবা বলিলেন, "কোন্ দিকে দিচ্ছ? বাঁ দিকে, না ডানদিকে ব্যথা?" সাধুটি জোর করিয়া বলিলেন, 'আপনার ভুল হচ্ছে—ব্যথা বাঁ দিকে।' বাবা একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, "আমি ভুল বলিনি; আমাদের ও রকম ভুল হয় না।" তখন সাধুটি নরম হইয়া বলিলেন, 'আমরা শিখতে এসেছি—আশীর্বাদ করুন।' বাবা আরও নরম হইয়া বলিলেন, 'তাই বলো, আশীর্বাদ তো করছিই; আর আশীর্বাদ করতে করতেই যেন যেতে পারি।"

* * *

আশ্রমের একটি অন্তেবাসী, এখনও ছাত্রাবস্থা, দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ। তাহার ধারণা—যেহেতু দীক্ষা হইয়াছে, অতএব সন্ধ্যা গায়ত্রী যজ্ঞোপবীত কিছুই আর দরকার নাই। এই কথা বাবার কানে ওঠায় তিনি খুব রাগ করিলেন, বলিলেন, "জানতাম না তো'—, পৈতে ফেলে দিয়েছে। সে কি! ব্রাহ্মণের ছেলে। ঠাকুর মন্মথকে পৈতে পরিয়েছিলেন। স্বামীজী কত লোককে পৈতে দিয়ে গেছেন। আর এখানে এ কি কাণ্ড! আজই বলছি।"

* * *

বাবা ঘরে শুইয়া আছেন। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। একটি ভক্ত আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় বাবার কোন আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। বাবা বলিলেন, "কে? —? তোর গায়ে কি জামা কাপড় রে? সাদা না গেরুয়া? আমি দেখলুম কে একজন গেরুয়াপরা ঠিক তোর জায়গায় দাঁড়িয়ে। মাথায় তোর মতো, তবে একটু মোটা-সোটা। মণি * ঘরে নেই তো?"

* * *

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গিয়া শ্রাবণও যায় যায়। তিনটি দিনের মতো তিনটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে কেবলই চিঠি আসিতেছে—ভক্তকে এবার ফিরিতে হইবে। বাবার ইচ্ছা আরও কিছুদিন কাটাইয়া যায়। একদিন ঠাকুরের পাকা ভোগ দিবার কথা হইয়াছে। বহরমপুরের

* স্বামী ভক্তানন্দ

ভক্তেরা আসিবে—এক রবিবার, ঠাকুরকে রাধাবল্লভী, ছানাবড়া প্রভৃতি ভোগ দেওয়া হইবে, কিন্তু বৃষ্টি লাগিয়াই রহিয়াছে। শেষে ভক্ত বলিল—এখন যাই, পাকাভোগের সময় আসিব।

শেষ পর্যন্ত বাবা রাজী হইলেন। সেদিন এক বুধবার। সকাল হইতে স্নান করিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ভক্ত যাইবার জন্য প্রস্তুত, বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়াছে। বাবা গল্প আরম্ভ করিলেন, কত কথা বলিলেন—তার মধ্যে কতকগুলি :

"যদি সত্যি ভগবান লাভ করতে চাও তো সেখানে গিয়ে শান্তি পাবে না। যে-রকম surrounding (পরিবেশ)-এর ভেতর থাকবে, মনও সেইরকম হয়ে যাবে। সাধুদের সঙ্গে থাকলে সাধু, সংসারীদের সঙ্গে সংসারী। যারা বিয়ে করবে না, তারা কি করতে সংসারে থাকবে? মা-বাবার কাছে তো জীবনের এত বছর কেটে গেল! আমার কাছে আর একটা বছরও কাটাতে নেই? আচ্ছা, যাচ্ছ—এখন যাও, ডাকলেই আবার আসতে হবে। আর মনে রাখবে সব কথা—যখন যা বলেছি। সেই common sense (সাধারণ বুদ্ধি)-এর কথা মনে আছে তো? যখন যেটি জানবার খুঁটিয়ে জেনে নেবে। আর সকলের কাছে সব কথা বলবে না।"

দশটার ট্রেনের বাঁশি বাজিয়া উঠিল। হুহু করিয়া ট্রেন আসিতেছে আশ্রম হইতে দেখা যাইতেছে। ভক্ত তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া যাত্রা করিতে চায়—ছুটিয়া ট্রেন ধরিবে। বাবা হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, "আর তুমি এ ট্রেনে গেছ!"

যাওয়া হইল না। জামা কাপড় পরিয়া যাত্রা করিয়াই ভক্ত বসিয়া রহিল। বিকলের গাড়িতে সে যাইবেই। বিকালে বাবাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি একচোট খুব হাসিলেন। বলিলেন, "কোথা যাবে? দেখছ না, ঠাকুর যেতে দিচ্ছেন না?" শেষে বলিলেন, "আচ্ছা এস। পাকাভোগের সময় আসতে হবে।"

* * *

কলিকাতা আসিয়াও ভক্তের নিস্তার নাই। আবার কবে যাইবে, কবে পাকাভোগ হইবে ইত্যাদি চিন্তা। দুই-তিন সপ্তাহ পরে চিঠি আসিল 'আগামী রবিবার পাকাভোগের কথা পাকা হইয়াছে, তবে বৃষ্টি লাগিয়া রহিয়াছে। ভক্তের ভয় হইল—আবার না কাঁচিয়া যায়। পাকাভোগ কাঁচিল না, কাঁচিয়া গেল ভক্তের যাওয়া। যে শনিবার রাত্রিতে সে শিয়ালদহে সারগাছির ট্রেন ধরিবে—সেই শনিবার রাত্রে সে হাওড়ায় হইল কাশীর যাত্রী।

কাশী হইতে বাবাকে ৺অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথের নির্মাল্য পাঠাইল, কয়েকদিন পরে ঠাকুরের পাকাভোগের প্রসাদসহ আশীর্বাদী পত্র আসিল : "এখান হইতে গিয়া মাকে লইয়া কাশী গিয়াছ—খুব ভাগ্যের কথা। পাকা-ভোগের দিন তোমার না আসা ভালই হইয়াছে।—'যতটুকু রয় সয়'। মা-বাবাকে অসন্তুষ্ট করিতে নাই। গুরুকৃপায় সংসার-বন্ধন কাটিয়া যাইবে।"

কলিকাতায় ফিরিবার পর মহালয়ার দিন ভক্ত বাবার একপত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার শরীর খারাপ। শীঘ্র একবার দেখিয়া যাইও।"

দেবীপক্ষ। ভক্ত আবার তাহার চিরবাঞ্ছিত পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

অক্টোবর, ১৯৩৬। প্রণাম করিয়া উঠিলে

বাবা বলিলেন, "ভোরবেলা ভাবছিলাম—'স্মৃতিকথা' কে লিখবে? দেখলাম কি, তুই এসে দাঁড়িয়ে।" একটু পরে বলিলেন, "কাজে লেগে যাও; কাজের লোক ক'রব তোমাকে (এইকথা বলিয়া পিঠে একটা চাপড় মারিলেন)—তোমারও কাজ, আমারও কাজ।"

পরদিন হইতে কাজ শুরু হইয়া গেল। মাটিতে আসন পাতিয়া ডেস্কের উপর লিখিতে লিখিতে একসময় ভক্ত পাশে কাহার সঙ্গে কি একটু কথা কহিয়াছে—বাবা শুনিতে পাইয়াছেন। আস্তে আস্তে পিছনে আসিয়া বলিতেছেন, "কাজের সময় কথা বলবে না, শুনবেও না। স্বামীজী একদিন কাগজ পড়ছিলেন—আমি ঠেলা দিয়ে ডাকছি। একমনে পড়ছেন, শেষে বললেন, 'আমার কটা মন?' যখন যেটা করবে সারা মনটা তাতেই ঢেলে দেবে, তখন কথাবার্তা সব বন্ধ।"

'স্মৃতিকথা'র কপি তৈরী হইতেছে—প্রেসে যাইবে। 'বসুমতী'র সহিত চিঠিপত্র লেখা হইয়া গিয়াছে। ভক্ত শুধু বলিল—'উদ্বোধনে' যাইবে না কেন? বাবা বলিলেন, 'উদ্বোধন' তো আমাদের আছেই. 'বসুমতী'ও আমাদের। উপেন বাবু ঠাকুরের কত ভক্ত। বসুমতীই তো আমাদের প্রথম কাগজ, তারপর তো উদ্বোধন হ'ল।

* * *

পূজার কয়দিন মাতৃসকাশে কাটাইয়া ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় সারগাছি ফিরিলে বাবা বলিলেন, "আমি জানতুম আজ তুমি ঠিক আসবে।" পরদিন সকালে বলিলেন, "আমার এখন কি ভাল লাগে জানিস্?—যেন একটা নির্জনে কোথাও পাহাড়ে কি বনে—নদীর ধারে ছোট্ট কুটিরে কেউ খুঁজে বার করতে পারবে না। ওরা কি বলে জানিস?—বলে সারগাছি কি কম নির্জন? আপনি যেখানেই যাবেন—আমরা ঠিক খুঁজে বার ক'রব। এখন আর কি চাই জানিস? —সেই নির্জনে, সঙ্গে দু-চারটি ছেলে-ছোকরা থাকবে, যারা বেশ সব কথা শুনবে, ভালবেসে সেবা করবে, প্রতিবাদ করবে না; স্মৃতিকথা, ভ্রমণ-কথা সব লেখাব। যারা আমায় ভালবেসে সেবা করে তাদের কাছে আমি ছোটছেলের মতো হয়ে যাই, আমায় নিয়ে তারা যেমন ইচ্ছে নাড়াচাড়া করতে পারে, আমি তাদের হয়ে যাই। (আপন মনে গাহিতে লাগিলেন) 'দরদী বিনে প্রাণ বাঁচে না।' আমাদের হাত ধরে ঠাকুর এই সব গান গাইতেন।"

পরে এক সময় 'স্মৃতিকথা'র পাণ্ডুলিপির খেই হারিয়ে গেছে—কোন্ লেখার পর কোন্ লেখা ধরা যাচ্ছে না—বলাতে বলিলেন, "খেই হারিয়ে গেছে, গুলিয়ে গেছে—গেছেই তো। এই দেখনা—হাড় মাংস মেদ মজ্জা সব মিশিয়ে গুলিয়েই তো এই শরীরটা হয়েছে। যারা ব্রহ্মজ্ঞান আদর্শ ক'রে এসেছে—তাদের তো এর ভেতর থেকেই খেই বার করে নিতে হবে। একি সোজা কথা?"

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

"The king who properly inflicts punishment prospers, but he who is voluptuous, partial and deceitful will be destroyed." Manu—(trans.—Buhler in Vol. XXV of The Sacred Books of the East). ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা মোটামুটি তিনটি যুগের পটভূমিকায় করা যায় : প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে বাছাই করলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং কৌটিল্যেরই নামোল্লেখ করতে হয়। মধ্যযুগে আছেন শুক্রনীতি-বা নীতিসার-প্রণেতা শুক্রাচার্য। অনেকে অবশ্য কামন্দককেই প্রথম নীতিসার-প্রণেতা বলে ধরে থাকেন। তা'হলে তাঁর স্থান নির্দেশ করতে হয় প্রাচীন যুগে

আধুনিক যুগে মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র-চিন্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের রচনায়। তারপর আছেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী। অবশ্য রাজা রামমোহন-চিন্তা রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ধ্যানধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল; এবং কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও রাজনৈতিক তত্ত্ব, প্রশ্ন ও আচরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর করেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তবুও কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল সুরটি ধরা যায় প্রথমোক্ত চারজনের মধ্যেই। এঁদের রাষ্ট্র-চিন্তায় পাশ্চাত্য ভাবধারণার ছায়া কিছু কিছু পড়লেও চারিত্রিক লক্ষণে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ ভারতীয়ই রয়ে গেছে। তাই আধুনিক যুগের প্রসঙ্গে এঁদের চারজনকে নিয়েই আলোচনা করব।

এখন প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করা যাক।

প্রাচীন যুগ :

প্রাচীন যুগেও আমাদের নির্বাচিত চারজনের মধ্যে মনুকেই প্রাচীনতম বলে ধরা হয়।

মনু :

মনু কে? কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে লিখেছেন : সৃষ্টির প্রত্যুষে চারদিকে যখন মৎস্যন্যায় বিরাজ করেছিল, মানুষ মনু বৈবস্বতকে নরপতি নির্বাচিত করে।[১] সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে বিশেষ স্থান না পেলেও কৌটিল্যের এই অভিমত সামাজিক চুক্তি মতবাদেরই দ্যোতক, এবং কৌটিল্য এখানে কিছুটা হবসের (Hobbes) এবং কিছুটা লকের (Locke) সঙ্গে নিশ্চয়ই তুলনীয়। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে এইভাবে নির্বাচিত নরপতিকে 'মহাসম্মত' বলা হয়।[২] রামায়ণে মনুকে ঠিক মহাসম্মত বলে অভিহিত করা না হলেও মনুই যে পৃথিবীর আদি পালক, তার সমর্থন মহাকাব্যে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে মহতেজস্বী মনু

১ অর্থশাস্ত্র ১।১৩

২ 'মহাসম্মতে'র ধারণা বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন থেকেই হিন্দু রাষ্ট্রদর্শনে এসেছে বলে মনে করা হয়·· ।—Beni Prasad : Theory of Government in Ancient India

হলেন লোকপালক।[৩] পদ্মপুরাণে আবার মনুকে সূর্যপুত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে

এই মহাসম্মত, লোকপালক সূর্যপুত্র মনুই কি বিধিশাস্ত্রের--ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

পুরাণে মনুকে প্রথম মানব, প্রথম নৃপতি, বিধিশাস্ত্র-প্রণেতৃবর্গের মধ্যে প্রথম বলে অভিহিত করা হলেও, অনেকের মতে, মনু হলো বিধিশাস্ত্র-প্রণেতৃবর্গের সমষ্টিরই আখ্যা, কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়।[৪] এঁরা বলেন, মনুসংহিতার প্রণেতৃবর্গ তাঁদের বিধিশাস্ত্রকে প্রামাণ্য রূপ দেবার জন্যে মনু নামটি ব্যবহার করেছিলেন। যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রপ্রণেতাগণের অনেকে নিজেদের ধর্মনীতির ধারক ও বাহক বলেই মনে করতেন, মৌলিকচিন্তাবিদ বলে নয়। মনুর অনেক শ্লোক যে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত, তার কারণ আর কিছু নয়।

বর্তমান রূপে মনুসংহিতার রচনাকালও বিতর্কের বিষয়। পুরাণে রচনাকাল সভ্যতার প্রত্যূষ বলে বর্ণনা করা হলেও কোন কোন ঐতিহাসিক মনুসংহিতাকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুঙ্গবংশের রাজত্বকালে কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের রচনা বলেই মনে করেন। তা হলেও কিন্তু হিন্দু বিধিশাস্ত্র-প্রণেতাদের মধ্যে মনুকেই প্রাচীনতম বলে ধরা হয়, কারণ বশিষ্ঠ ও গৌতমের রচনায় মনু থেকে কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেসব শ্লোকের সন্ধান অবশ্য বর্তমান মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না। সব দিক বিচার করে পণ্ডিতপ্রবর কানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমাদের কাছে যে মনুসংহিতা মনুসংহিতা বলে পরিচিত তা সুসম্বদ্ধ হয়ে সংহিতার রূপ ধারণ করে খৃষ্টপূর্ব ২০০ সাল থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি আরও মনে করেন, মনুসংহিতার একটি পূর্ববর্তী রূপ থাকা খুবই সম্ভব।[৫]

যবেই রচিত হোক না কেন, অথবা যবেই সুসম্বদ্ধ রূপ ধারণ করে সংহিতার পর্যায়ভুক্ত হোক না কেন, মনুসংহিতাকে শুধু বিধিশাস্ত্রের ওপর প্রণীত অন্যতম গ্রন্থ (a mere law-book) বলে বর্ণনা করা ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। অধ্যাপক কিথের মতে (A. B. Keith) মতে, মনুসংহিতা নিঃসন্দেহে লুক্রেসিয়াসের (Lucretious) কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। ঐ কাব্যের মতই মনুসংহিতা এক জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি।[৬]

মনুসংহিতায় আছে সৃষ্টিতত্ত্ব, আইনের উৎস, রাজধর্মের বিভিন্ন দিক, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, সমাজে নারীর স্থান, এমনকি আর্যসন্তান-উৎপাদনের জন্যে দাম্পত্য জীবন-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী পর্যন্ত। সামগ্রিকভাবে মনুসংহিতা ধর্মকেন্দ্রিক হিন্দু জীবনবেদেরই পরিচায়ক। মনুসংহিতাই প্রথম 'অর্থশাস্ত্র' বা শাসন-সম্পর্কিত জাতিসমষ্টি যা সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ করে ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে।

---

৩ আদিপর্ব ৬।৪

৪ বলা হয়, মোট ১৪ জন মনু পরপর পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সপ্তম মনু মহাপ্রলয় অতিক্রম করে পৃথিবীতে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনিই সাধারণতঃ মনু আখ্যা পেয়ে থাকেন।··· Thomas: Hindu Religion, Customs and Manners

৫ History of Dharmasatra 1

৬ A History of Sanskrit Literature

মনুসংহিতার প্রকৃত পুনরুদ্ধার এবং পরিচিতির জন্যে আমরা দু'জন বৈদেশিকের কাছে বিশেষভাবে ঋণী: ওয়ারেন হেস্টিংস এবং ভাষাবিদ স্যর উইলিয়াম জোনস্‌। মনুসংহিতার শ্লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে মুখে ঘুরলেও শ্লোকগুলি ঠিক 'সংহিতাকারে' পাওয়া যেত না। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালতে ব্যবহারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস অনেকগুলি শ্লোকের অনুবাদ করান। তারপর স্যর উইলিয়াম জোনস্‌ শ্লোকগুলির সংকলন শুরু করেন, এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে (১৭৯৪) Institutes of Hindu Law নামে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য মনুসংহিতা বা মানবধর্মসূত্র বা মনুস্মৃতি প্রকাশিত হয়।[৭] তারপর অবশ্য গবেষণার ফলে বিভিন্ন ভাষায় মনুসংহিতার বিভিন্ন সংস্করণ বেরিয়েছে।

মনুসংহিতা:

মনুসংহিতার আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো রাজধর্ম বা রাজকর্তব্য-পালনবিধি। এই রাজধর্মই ধর্মশাস্ত্রের মূল অংশ।

কৌটিল্য মহাসম্মত মতবাদ অনেকাংশে সমর্থন করলেও মনুসংহিতায় কিন্তু ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনু বলেন, সৃষ্টির প্রভাতে যখন বিভিন্ন জীব ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ছিল তখন ঈশ্বর তাদের রক্ষার জন্য নৃপতির সৃষ্টি করেন।

মনুর মতে রাজা রাজধর্ম পালন করেন প্রধানতঃ দণ্ডের মাধ্যমে। রাজা যদি অক্লান্ত-ভাবে দণ্ডনীতি পরিচালনা না করেন তবে রাজ্যে মৎস্যন্যায়ের উদ্ভব ঘটবে—বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে ধরে ভক্ষণ করে, সবলও তেমনি দুর্বলকে ধরে ভক্ষণ করতে শুরু করবে।[৮]

অতএব সারা বিশ্বই দণ্ডদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কারণ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ লোকের সন্ধান পাওয়াই যায় না।[৯]

এক্ষেত্রে অর্থাৎ মানুষের চরিত্র-বিশ্লেষণ-ব্যাপারে মনু গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস এবং ইংরেজ দার্শনিক হবসের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এর পরেই মনু গিয়ে পড়েছিল প্রকৃত রাজ-ধর্মের ক্ষেত্রে। "যে নরপতি যথোচিতভাবে দণ্ডনীতি পরিচালন করেন, তিনি ধর্ম অর্থ ও কাম্যবস্তুর অধিকারী হয়ে প্রকৃত সুখ ভোগ করেন, কিন্তু আত্মসুখমগ্ন যে নৃপতি দণ্ডদান-ব্যাপারে পক্ষপাত ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি বিনষ্ট হবেনই, এমনকি অন্যায় দণ্ডের মাধ্যমেই বিনষ্ট হতে পারেন।"

তারপর মনু বলেছেন, দণ্ডের একটা নিজস্ব পবিত্রতা আছে; সুতরাং অপবিত্র ব্যক্তিদের দ্বারা দণ্ডনীতি-পরিচালনা সম্ভব নয়। যদি ধর্মবিচ্যুত নৃপতি দণ্ডনীতি পরিচালনা করেন তবে আত্মীয়-পরিজন সহ তিনি নিজেই নিহত হন।

দণ্ডনীতি পরিচালনা রাজার একার দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ মহৎফলদায়ক কার্য—রাজ্যশাসন—একজনের পক্ষে সম্পাদন করা কঠিন।[১০] অতএব নৃপতিকে অমাত্য নিয়োগ করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই দণ্ডনীতি পরিচালনা করতে হবে। এই অমাত্যদের মধ্যে অবশ্য প্রধান হবেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

মনুর এই নির্দেশ গণতন্ত্রেরই দ্যোতক।

৭ মনুসংহিতা মানবধর্মসূত্র বা মনুস্মৃতি নামেও অভিহিত।

৮ মনু ৭।৩৯

৯ মনু ৭।২২

১০ ঐ ৭।৫৫

নৃপতিকে যে বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী হয়ে তবে রাজ্যশাসন করতে হবে, এই নির্দেশ দিয়েই মনু ক্ষান্ত হননি। বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দণ্ডনীতি-পরিচালনায় নৃপতির যে মতিভ্রম হতে পারে, মনু একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন।[১১] এই ঘোষণা এ্যারিস্টটল-নির্দেশিত গণতন্ত্রের অন্যতর উৎকর্ষের দ্যোতক। এ্যারিস্টটল বলেছেন: কতক লোক এক বিষয়ের একটা দিক দেখতে পায়, কতক লোক আর একটা দিক দেখতে পায়, কিন্তু সকলে মিলে বিষয়টিকে সমগ্রভাবেই দেখতে পায়।[১২] অতএব, পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে তবেই প্রশাসন-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। দণ্ডনীতি-পরিচালনাই প্রশাসন; এ ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করা চলবে না।

অবশ্য অমাত্য-নিয়োগ-ব্যাপারে নৃপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাই চূড়ান্তভাবে কার্যকর তবে তাঁকে কুলশীলগুণাবলী বিচার করে অমাত্য নিয়োগ করতে হবে। সুতরাং মনুর নির্দেশকে আধুনিক অর্থে 'গণতান্ত্রিক' না বলে কল্যাণধর্মী সংকীর্ণতন্ত্র (benevolent oligarchy) আখ্যা দেওয়া যায়। এই সংকীর্ণতন্ত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অংশীদারী ভিত্তিতে—বিদ্যাবত্তা ও শৌর্যবীর্যের সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে ক্রমবিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গণতান্ত্রিকতার আভাষ যে এতে আছে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

কূটনীতি:

মনুসংহিতাতে কূটনীতি-সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই কার্যও রাজধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়েছে, নৃপতি অভিজাত পরিবার থেকে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ কুশলী ব্যক্তিগণকে রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন, এবং তাঁদের কাছ থেকে বিদেশী নৃপতিদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

প্রতিরক্ষা:

মনুসংহিতায় রাজার যে বিভিন্ন কর্তব্যের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্গনির্মাণ-পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, দুর্গনির্মাণ রাজধর্মের অন্যতম উপাদান প্রতিরক্ষাব্যবস্থার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত মাত্র, নিজস্ব প্রকৃতিবলে কোন স্বতন্ত্র উপাদান নয়।

দুর্গনির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি বিষয় আছে যাকে মোটামুটি ভৌগোলিক রাজনীতির (Geo-Politics) অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করা যায়। নৃপতিকে যদি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং দণ্ডনীতি-সুপরিচালনা করতে হয় তবে তাঁকে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশেই বাস করতে হবে।[১৩]

প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে নৃপতি সেই ভাবেই দণ্ডনীতি পরিচালনা করবেন যাতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকার্য সুসম্পাদিত হয়, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথাযথ প্রতিপালিত হন এবং ধর্মানুষ্ঠান সুপরিচালিত হয়। কৃষক যেমন আগাছাগুলিকে উৎপাটিত করে শস্য রক্ষা করে, নৃপতিকে তেমনি যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহারের ভিত্তিতে রাজধর্ম পালন করতে হবে।

---

১১ মনু ৭।৩২

১২ Barker: Principles of Social and Political Theory

১৩ মনু ৭।৩৯

করনীতি :

রাজ্যের কার্যনির্বাহের জন্য করসংগ্রহ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু নৃপতি বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর এমনভাবে কর ধার্য করবেন যাতে রাজকর্তব্য-নির্বাহে কোনরকম অসুবিধা না হয়, আবার করপ্রদানকারীরাও যেন প্রপীড়িত না হয়। "জোঁক যেমন শোণিত শোষণ করে, গো-বৎস যেমন দুগ্ধ পান করে অথবা ভ্রমর যেমন মধু আহরণ করে, রাজাও তেমনিভাবে কর সংগ্রহ করবেন।"[১৪]

মনুর এই নির্দেশের মধ্যে দুটি আধুনিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়: (ক) করবহনের সামর্থ্য (taxable capacity) (খ) করসংগ্রহের নীতি (canons of taxation)। আধুনিক সরকারী আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত শাস্ত্রে (Public Finance) নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ধার্য করের পরিমাণ যেন করবহনের সামর্থ্যকে অতিক্রম না করে এবং কর-ব্যবস্থা যেন কয়েকটি সুচিন্তিত নীতির (canons) ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নীতিগুলির উদ্দেশ্য হ'লো দ্বিবিধ: পর্যাপ্ত পরিমাণে কর সংগ্রহ করা, এবং করপ্রদানকারী যাতে প্রপীড়িত না হয়, তাও দেখা। পাশ্চাত্য জগতে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রথম নীতি নির্দেশ করেছিলেন আঠার শতকের ইংরেজ চিন্তাবীর এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith); ভারতে করেছিলেন তার অনেক শতক আগে মনু।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে জীবনধারণ করে তাদের ওপর মনু করধার্য করতে বলেছেন, কিন্তু সামান্য পরিমাণে। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত না হয় তা দেখা।

১৪ ঐ ৭।১২৯

সমাজ-দর্শন :

মনুসংহিতায় যে সমাজ-দর্শন পরিস্ফুট হয়েছে, রাজধর্মের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজ তখন অন্তঃশাসনে শাসিত থাকলেও প্রাচীন হিন্দু-রাষ্ট্রব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে ঐ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে মনু বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার সংরক্ষণ, আর্যসন্তানোৎপাদন এবং সমাজে নারীর স্থান ও কর্তব্য নির্ধারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই সব বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ তৎকালীন পটভূমিকাতেই ন্যায়ের (Justice) ভিত্তিতে হিন্দু-রাষ্ট্রব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে।

উপসংহার :

মনুসংহিতাকে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-দর্শনের সূচনা বলে মেনে নিলে ঐ রাষ্ট্রদর্শনের সব মুখ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধানই এতে পাওয়া যায়: (ক) ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন ধর্মভিত্তিক—ধর্ম বা এক মহান জীবন-পদ্ধতির ধারণাই এই দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু, (খ) এই কারণে হিন্দু-বিধিব্যবস্থা (legal system) কর্তব্য বা দায়িত্ব থেকেই শুরু হয়েছে, অধিকার থেকে নয়, (গ) ধর্মশাস্ত্রের প্রাচীন অংশ হ'লো রাজধর্ম, (ঘ) শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যৌথ ব্যবস্থা, (ঙ) গণতন্ত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র-দর্শনের মূলকথা না বলেও ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে গণতান্ত্রিকতার আভাস প্রদান, (চ) বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ-সংহতি আনয়নের প্রচেষ্টা এবং (ছ) আদর্শের অনুসন্ধানে নিয়োজিত রাষ্ট্রদর্শন—আদর্শ হলো সমাজের নৈতিক চেতনা সম্প্রসারিত ক'রে

সমাজকে ন্যায়ভিত্তিক করা।[১৫]

এই ন্যায়ই সকল রাষ্ট্রদর্শনের লক্ষ্যবস্তু। হিন্দুরা এর সন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন প্রাচীনতম কাল থেকে। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রদর্শনেরও—স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রদর্শনেরও—মূল বৈশিষ্ট্য ঐ একই। সুতরাং বলা যায়, ভগবান মনু-প্রবর্তিত অভিযান পুণ্যতীর্থ ভারতভূমিতে আজও চলবে। (ক্রমশঃ)

১৫ D. M. Brown : White Umbrella

ভয়ের কিছুই নাই !

সুব্রহ্মণ্য ভারতী

[অনুবাদিকা : শ্রীমতী বিভা সরকার]

অখিল ভুবন ভীষণ বিরূপ হয় না যদি কভু
মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় কিছু নেই—ভয় কিছু নেই তবু।
নিন্দা ঘৃণায় জীবনে তোর যদি বা ধিক্কারে
মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় কিছু নেই, ভয় কিছু নেই ওরে !
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাঙ্গা হয় যদিরে ভাগ্যলিপি ভাই
তবুও ওরে। ভয়ের কিছুই নাইরে কিছুই নাই।…
বন্ধু পরম গরল যদি জোর করে পান করায়
মাভৈঃ মাভৈঃ তবুও যেন চিত্ত নাহি ডরায়।
রক্তাক্ত-হাত সৈন্য যদি শাসায় ত্রাসে ভাই
তবুও মাভৈঃ ভয়ের কিছুই নাইরে কিছুই নাই।
মাথার ওপর যদি কভু আকাশ ভেঙেও পড়ে
মাভৈঃ মাভৈঃ নির্ভীক রও সেই প্রলয়ের ঝড়ে !

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে মধু যোগী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভূমিকা :

শ্রীধাম কামারপুকুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের কত ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর বাল্যলীলা-রঙ্গের সাক্ষী ও সহায়ক, তার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-বৃত্তান্তে প্রসঙ্গতঃ তাঁদের মাত্র কয়েক জনের নাম ও কিঞ্চিৎ বিবরণী লিপিবদ্ধ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত মধু যোগী (যুগী) সেই ভাগ্যবানদেরই অন্যতম। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'পুঁথি'তে এঁর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পরিমাণে তা স্বল্প হ'লেও, শ্রীভগবানের নর-লীলানুধ্যানে, এর মাধুর্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ অনুরাগী ভক্তবৃন্দের নিকট এগুলিও পরম উপভোগ্য ও অশেষ সমাদরযোগ্য।

পরিচিতি :

শ্রীযুক্ত মধু যোগী ছিলেন কামারপুকুরের অধিবাসী এবং মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অতি নিকট প্রতিবেশী। চাটুযো-কুটীরের সম্মুখস্থিত শিবমন্দিরের অনতিদূরে এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ড জুড়ে তাঁর বাসভবন ছিল। কথিত আছে, উক্ত শিবমন্দিরটি তাঁরই পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ঐ মন্দিরটি "যোগীদের শিবমন্দির" নামে প্রসিদ্ধ। অনুসন্ধানে জানা যায়, কামারপুকুরে এই একটিমাত্রই যোগী-পরিবারের বসতি ছিল। এই পরিবারটি ছিল যেমন বর্ধিষ্ণু, তেমনি ধনাঢ্য ও রুচিমান। মধু যোগী মহাশয় ছিলেন এই পরিবারের মুখ্য কর্তা।

বর্তমানে সেখানে উক্ত যোগী-পরিবারের কোনও বংশধর বা আত্মীয়-জ্ঞাতির বসতি নেই। তবে, তাঁদের পিতৃ-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত সেই বিখ্যাত শিবমন্দিরটি অদ্যাবধি সেই বংশের ইষ্টপ্রাণতা ও ধর্মকীর্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য সগৌরবে বহন ক'রছে। শোনা যায়, উক্ত যোগী-বংশধরগণ বেশ কিছুকাল পূর্বে ঐ স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন ক'রেছেন, সে-স্থানটি বর্তমানে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্গত।

মধু যোগী মহাশয় জাতিতে ছিলেন তন্তুবায়। সম্ভবতঃ তাঁর পুরা নাম ছিল মধুসূদন নাথ। কিন্তু গ্রামবাসিগণের সম্ভাষণ-প্রথায় ও উচ্চারণ-সৌকর্যে তিনি সংক্ষেপে 'মধুযুগী' নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ। প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে তাঁর এই সংক্ষেপিত নামেরই উল্লেখ সর্বত্র দেখা যায়। যা হোক, তিনি অতিশয় ভক্তিমান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। শিবোপাসনা ঐ বংশে পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। মনে হয়, তিনি ৺গোরক্ষনাথজীউ-প্রবর্তিত শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত "নাথপন্থী" ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মধু যোগী ঐ পল্লীর একজন বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ও জোতদার ছিলেন। তাঁর ভবনটি ছিল অতি বৃহৎ এবং দুই-তিন মহলে বিভক্ত। চাষ-আবাদের জমি-জমা হতে তিনি প্রচুর শস্যসামগ্রী পেতেন। ঐগুলির সংরক্ষণাদির জন্য তাঁর অন্দরমহল ও বহির্বাটীর মধ্যবর্তী অঙ্গনে সারি সারি ধানের মরাই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর ভবনের সর্বত্র সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা ও লক্ষ্মীশ্রী-ভাব বিরাজ ক'রত। তাঁর ভবনটিও বেশ রুচিসম্পন্ন ও কায়দাদুরস্ত

ভাবে নির্মিত ছিল। তাঁর পরিবারের সকলেরই আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন ছিল মার্জিত। এই বংশের পারিবারিক শাসন-শৃঙ্খলা পল্লী-বাসীদের মুগ্ধ ক'রত। তাঁর পরিবারের অন্তঃ-পুরচারিণীদের বহু বিধি-নিষেধের মধ্যে জীবন যাপন ক'রতে হ'ত। তাঁর অন্দর-মহলে কঠোর অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল।

মধু যোগী মহাশয় পল্লীর একজন বিশেষ গণ্য-মান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মধুর স্বভাব ও সদাশয়তার জন্য প্রতিবেশীরা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর ক'রত। তিনি দেব-দ্বিজ-পরায়ণ ছিলেন। দান-ধ্যান এবং পরো-পকারাদি বিষয়ে তাঁর প্রচুর উৎসাহ ছিল।

যোগীদের শিবমন্দির:

চাটুয্যে মহাশয় যখন ৺গয়াধামে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে একদিন শ্রীমতী চন্দ্রমণি এক আশ্চর্য অনুভূতি লাভ করেন। তিনি সেদিন যোগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে উক্ত বয়স্যাদের সঙ্গে আলাপন ক'রছিলেন। এমন সময় তিনি দেখেন যে, ঐ মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ হ'তে স্বচ্ছ-শুভ্র জ্যোতি নির্গত হচ্ছে এবং সেই জ্যোতিতে অচিরে ঐ মন্দিরগর্ভ পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। পরক্ষণে সেই জ্যোতিরাশি সেখান হ'তে বায়ুর ন্যায় তরঙ্গা-কারে প্রবাহিত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয়। তিনি তখন অপার বিস্ময়ে ঐ কথা উপস্থিত বয়স্যাদের ব'লতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঐ জ্যোতির তরঙ্গমালা তাঁকে চারিদিক হ'তে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং প্রবল বেগে তাঁর উদরে প্রবেশ করে। তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি স্তম্ভিতা ও মূর্ছিতা হয়ে পড়েন।

"শিবের মণ্ডপ এক আছিল অদূরে।
দেখিলেন আসে কিবা বায়ুরূপাকারে॥
আসিয়া প্রবেশ কৈল গর্ভেতে তাঁহার।
ভয়ার্তা হইলা আই দেখিয়া ব্যাপার॥"—পুঁথি

তাঁকে সহসা মূর্ছিতা হ'য়ে পড়ে যেতে দেখে ঐ বয়স্যারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হন। অবশেষে, তাঁদেরই শুশ্রূষায় তিনি ধীরে ধীরে বাহ্য-সংজ্ঞা ফিরে পান। তখন তিনি তাঁর ঐ দিব্যদর্শন ও অনুভূতির সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁদের নিকট ব্যক্ত করেন। ঐ কথা শুনে তাঁরা অবাক্ হন। পরে তাঁরা তাঁকে নানাভাবে বোঝান এবং বলেন, "তোমার বায়ুরোগ হ'য়েছে।" তার উত্তরে তিনি তাঁদের বলেন—"আমার কিন্তু সেই হ'তে বোধ হচ্ছে, ঐ জ্যোতি যেন আমার উদরে প্রবেশ ক'রে রয়েছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হ'য়েছে।"—এ কথা শুনে তাঁরা তাঁকে 'নির্বোধ', 'পাগল' ইত্যাদি ব'লে তিরস্কার করেন। তাঁরা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, "মনের ভ্রম হতে অথবা বায়ুগুল্ম নামক ব্যাধি হ'তে তোমার ঐরূপ বোধ হচ্ছে।" যা হোক, তাঁরা তাঁকে এই দর্শন এবং অনুভবের কথা আর অপর কারও নিকট ব'লতে নিষেধ করেন।

"যে তিন নারীর সঙ্গে কথা হ'তেছিল।
আই ঠাকুরাণী তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া কহিল॥
নানা জনে নানা মতে নানা কথা কহে।
অবাক্ হইয়া আই দাঁড়াইয়া রহে॥"—পুঁথি

ক্ষুদিরাম ৺গয়াধাম হ'তে প্রত্যাবর্তন ক'রলে, চন্দ্রাদেবী তাঁর পূর্বোক্ত স্বপ্ন এবং উদরে শিব-জ্যোতি প্রবেশের বৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত বলেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁর ঐ স্বপ্ন ও অনুভবের নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেন। তিনি তখন ব্রাহ্মণীকে নানাভাবে বোঝান এবং বলেন—এখন হ'তে ঐরূপ দর্শন ও অনুভূতির কথা, আমাকে ভিন্ন আর কাউকে

বলবে না। শ্রীশ্রীরঘুবীর কৃপা ক'রে যা দেখান, তা মঙ্গলের জন্য।—এ-কথা মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাকবে। ৺গয়াধামে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীগদাধর আমাকেও অলৌকিক উপায়ে জানিয়েছেন. আমাদের আবার পুত্রমুখ দর্শন ক'রতে হবে।

"ব্রাহ্মণ বুঝিল তত্ত্ব ভার্যার কথায়।
ল'য়ে তাঁরে সংগোপনে কতই বুঝায়॥
এ অতি মঙ্গল কথা না করিবে ভয়।
হইবে গোকুল চাঁদ ভবনে উদয়॥"—পুঁথি

লীলাবার্তা :

মধু যোগীদের শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গ হ'তে সেদিন শ্রীমতী চন্দ্রার গর্ভে যে জ্যোতি প্রবেশ করে, তারই ফলে তিনি সন্তানসম্ভবা হন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, চন্দ্রমণির ঐ দিব্য গর্ভেই অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব ঘটে। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং"—"আমার দিব্য জন্ম এবং কর্ম।" পরমহংসদেবের জন্মসূচক ঐ দিব্য ঘটনাবলীর দ্বারা শ্রীভগবানের উক্ত বাণীর অভ্রান্ততা স্বতঃপ্রমাণিত।

মধু যোগী শ্রীমান্ গদাধরকে বিশেষ স্নেহ-প্রীতি ও মমতার চক্ষে দেখতেন। তাঁর ভবনে অতি বাল্যকাল হ'তেই গদাধরের গতায়াত লক্ষিত হয়। তার সুললিত পুঁথিপাঠ ও কীর্তনাদি-শ্রবণেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ দেখা যায়। তিনি আদর ক'রে তাকে মধ্যে মধ্যে নিজ ভবনে নিয়ে যেতেন এবং সেখানে তার পাঠ-কীর্তনাদির ব্যবস্থা ক'রতেন। তার ঐ মনোহর অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেখানে দলে দলে উপস্থিত হ'ত।

গদাধর পাঠশালে প্রবেশ করার পর অল্পকাল মধ্যেই সরলবানানযুক্ত ছন্দোবদ্ধ 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'ধ্রুবোপাখ্যান', 'দাতাকর্ণ-সংবাদ' প্রভৃতি পুঁথি প'ড়ে কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে। ধ্রুব-প্রহ্লাদের ঈশ্বরানুরাগ ও ভগবদ্‌বিশ্বাস তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এ-জন্য সে পুঁথিগুলি মধুর সুর ক'রে প'ড়ত এবং উপস্থিত ছাত্রবন্ধুদেরও শোনাত। গুরুমহাশয়ের ভয়ে পাঠশালে সে মনোমত ক'রে ঐ পাঠ ক'রতে সাহসী হ'ত না। অথচ ঐ বিষয়ে তার নিজের এবং সহপাঠী বন্ধুদের অনুরাগ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন স্থির হয় যে, পাঠশালার ছুটির পর অন্যত্র কোথাও সে পুঁথি পাঠ ক'রবে এবং বন্ধুদেরও শোনাবে।

"সেই হেতু পুঁথিপাঠ হ'ত অন্য স্থানে।
মধু যুগী জেতে তাঁতি তাঁহার ভবনে॥
পাঠশালে ছুটি হলে শিশু গদাধর।
পড়েন প্রহ্লাদ-কথা করিয়া আদর॥"—পুঁথি

ছুটির পর সে তার সহচরদের নিয়ে গ্রামের যে-সব স্থানে পুঁথিপাঠ ক'রত, মধু যোগী মহাশয়ের ভবন সেগুলির অন্যতম। তাঁর গৃহে ঐ সময় প্রায়ই তার পাঠ হ'ত। তিনি তাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিতও ক'রতেন। তার মনোহর পাঠে আকৃষ্ট হ'য়ে প্রতিবেশী বহু নর-নারীও সেখানে উপস্থিত হ'ত। সে কথক-ঠাকুরদের মত বিচিত্র ভঙ্গিমা ও মধুর সুর সহযোগে কোন দিন প্রহ্লাদচরিত্র, কোন দিন ধ্রুবোপাখ্যান, কোন দিন বা রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ ক'রত। তার ঐ পাঠ-শ্রবণে সমাগত সকলেই বিমোহিত হ'ত।

শ্রীযুক্ত মধু যোগীর ভবনে গদাধরের পুঁথি-পাঠের একটি অতি মনোহর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সেদিন সে অত্যন্ত অনুরাগভরে সেখানে পাঠ ক'রছিল। প্রতিবেশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা,

যুবক-যুবতী, বালক বালিকা নির্বিশেষে বহু শ্রোতা সেখানে সমবেত হয়েছিল। তারা তাকে চারধারে ঘিরে ব'সে তন্ময় হ'য়ে তার পাঠ উপভোগ ক'রছিল। সে-সময় অদূরে এক আমগাছের ডালে এক হনুমান ব'সেছিল। সেও যেন পরম আকৃষ্ট চিত্তে তার ঐ মনোহর পুঁথিপাঠ শুনছিল।

কিছুক্ষণ পরে সেই হনুমান, না জানি কোন্ ভাবের প্রেরণায়, ঐ আমগাছ হ'তে নীচে নেমে আসে। সেখানে অত নর-নারীর সমাগম, কিন্তু সেদিকে তার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একেবারে পাঠরত গদাধরের নিকটে এসে উপস্থিত হয় এবং তার চরণে হাত দু'টি রেখে, সেখানে মাথা লুটিয়ে প'ড়ে থাকে। বনের পশুর ঐরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখে উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে বিমোহিত হয়। গদাধর যতক্ষণ পুঁথিপাঠ করে, ততক্ষণ সে ঐ একই ভাবে সেখানে প'ড়ে থাকে। অবশেষে পাঠ সাঙ্গ হ'লে সে পুঁথিখানি হনুটির মাথায় ছুঁইয়ে দেয়। তখন সে করযোড়ে গদাধরকে প্রণতি জানিয়ে আবার ঐ আমগাছের ডালে গিয়ে বসে। এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে সমাগত শ্রোতারা যারপর নাই মুগ্ধ হয়।

"যত কিছু বিদ্যমান কামারপুকুরে।
স্থাবর জঙ্গম কিবা জীবের আকারে
প্রভু অবতারে তারা দেবদেবী যত।
প্রভুর আজ্ঞায় সব সঙ্গে সমাগত॥"—পুঁথি

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি-প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ফিরে আসেন। অন্যান্য প্রতিবেশীদের মত যোগী-পরিবারের কুলবতীরাও তাঁর স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের সংবাদে পরম আহ্লাদিতা হয়। তারা তাঁর দর্শন ও সাহচর্যলাভের জন্য একান্ত লালায়িতা হ'লেও সেই সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিতা।

"কুলবতীগণ সব থাকে অন্তঃপুরে।
উপায়বিহীনা আসে বাড়ির বাহিরে
বধূরা প্রভুর কথা শুনে মাত্র কানে।
উগ্রতর প্রাণে সাধ প্রভু-দরশনে॥"—পুঁথি

বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ কুলবতীদের হৃদয়ের বাসনা ও মনোবেদনা হৃদয়ঙ্গম করেন। ঐ সময়ে একদিন পল্লীর একদল যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আনন্দ-আহ্লাদে মত্ত হয়। সেই যুবকদের দলে যোগী পরিবারের জনকয়েক সমবয়সীও ছিল। তারা কে কেমন বিয়ে ক'রেছে—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উপস্থিত বন্ধুরা নানা জল্পনা-কল্পনা ও রহস্য-পরিহাস শুরু করে। কিন্তু তারা ঐ বিষয়ে তাদের নিকট হ'তে কোনই সংবাদ সংগ্রহ ক'রতে না পেরে অবশেষে গদাধরকে সে-বিষয়ের ভার দেয়।

"কে কেমন কৈলে বিয়ে দেখিতে না পাই।
উপায় অবশ্য কিছু করিবে গদাই॥
শুন কিবা করিলেন প্রভু গদাধর।
প্রতিবাসীদের সঙ্গে কৌতুক সুন্দর॥"—পুঁথি

ঐ ঘটনার দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন ছিল গ্রামের হাটবার। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়েছে, চারদিক ক্ষীণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন সময় ঐ যোগীদের বধূরা কেহ কেহ দেখে যে, তাদের ধানের মড়াই-এর আড়ালে এক যুবতী রমণী দাঁড়িয়ে আছে। তার পরণে লালপেড়ে শাড়ি, হাতে রূপার পইছা, মাথায় সুতার চুবড়ি; মুখখানি আকণ্ঠ ঘোমটায় ঢাকা। তাকে অসহায়া মনে ক'রে তারা সহানুভূতিভরে তার নিকট উপস্থিত হয় এবং পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করে।

তখন সে অতি সলজ্জভাবে মুখখানি ফিরিয়ে মৃদু-মধুর স্বরে জানায় যে, সে তেলিদের মেয়ে; ভিন্ন গ্রাম হ'তে হাটে সুতা

বেচতে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সঙ্গিনীরা তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। এখন একাকিনী বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব। এ কারণে সে নিতান্তই বিপন্না। অতএব ঐ রাত্রির মতো তাদের গৃহে সে একটু আশ্রয় পেলে বিশেষ অনুগৃহীতা হবে।

"একাকিনী ঘরে যাই হেন শক্তি নাই।
সন্ধ্যা তাহে তোমাদের ঘরে এনু ভাই॥

তার সুন্দর গৌরবর্ণ, মনোহর রূপ-লাবণ্য, নিটোল স্বাস্থ্য ও সুমধুর বাক্যালাপ তাদের পরম আকৃষ্ট করে। তারা তাকে সযত্নে অন্তঃপুরে আশ্রয় দেয় এবং তাকে ক্ষুধার্তা ভেবে মুড়ি, গুড় প্রভৃতি খেতে দেয়। সে তখন বিনীতভাবে তাদের জানায় যে, তার আদৌ ক্ষুধা নেই, রাতে কেবল একটু আশ্রয় পেলেই যথেষ্ট হবে। অতঃপর তারা সবাই তাকে ঘিরে মড়ায়ের পাশে বসে এবং তার সঙ্গে গল্প-সল্প শুরু করে। তার মধুর প্রকৃতি ও সরল আলাপনে তারা আমূল বিমুগ্ধা হয় এবং তার প্রতি পরমাত্মীয়সুলভ মমতা ও আকর্ষণ অনুভব করে। তার ফলে, তারা তাকে ছেড়ে কেউই উঠতে চায় না। তারা নিজেদের গৃহকর্মাদি এমনকি নিদ্রিত অভুক্ত শিশুদের কথাও ভুলে যায়। আলাপন-প্রসঙ্গে রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড (প্রায় সাড়ে আটটা) হয়।

এদিকে ঘরে এক দুগ্ধপোষ্য ঘুমন্ত শিশু ক্ষুধার তাড়নায় জেগে ওঠে এবং কান্না শুরু করে। এতেও তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ হয় না। অবশেষে সে যখন তুমুল কান্না আরম্ভ করে, তখন তার মায়ের হুঁশ হয় এবং দ্রুতপদে তার কাছে ছুটে যায়। তারপর সে তাড়াতাড়ি ঐ শিশুকে কোলে নিয়ে দুধের বাটি ও ঝিনুক সহ আবার সেই আগন্তুকের নিকট উপস্থিত হয়। তখন ঐ আগন্তুক রমণী শশব্যস্তে ক্ষুধার্ত শিশুটিকে তার মায়ের কোল হ'তে নিজের কোলে তুলে নেয় এবং তাকে ঝিনুকে ক'রে সযত্নে দুধ খাওয়াতে শুরু করে। শিশুটিও বেশ শান্তিতে তার কোলে শুয়ে দুধ খেতে থাকে।

"সোহাগে মায়ের মত গঁদলে গঁদলে।
উদর ভরিয়া দুধ খাওয়ান ছাওয়ালে॥"—পুঁথি

এদিকে বাটীস্থ সকলের আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'তে চলেছে। ছেলে-মেয়েরা আহার করার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়েছে। তখন বধূরা কেহ কেহ দ্রুতপদে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করে এবং আহারের আয়োজনে নিযুক্তা হয়। কিছুক্ষণ পরে ঐ বাড়ির নিকটে ঘন ঘন ডাক শুরু হয়—'গদাই' 'গদাই'। তখন ঐ আগন্তুক রমণী কচি শিশুটিকে তার মায়ের কোলে দিয়ে, "যাচ্ছি গো দাদা, যাই" ব'লে সহাস্যে দ্রুতপদে সেখান হ'তে প্রস্থান করে।

উপস্থিত বধূদের তখন বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, মহারঙ্গকর গদাধর ঐভাবে ছদ্মবেশে এসে তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল। তার ঐ অভিনব রঙ্গলীলার কথা ভেবে তাদের আহ্লাদ ও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তার ঐ মধুর রঙ্গের সংবাদ অবগত হ'য়ে বাড়ির পুরুষেরাও পরম চমৎকৃত হয়।*

"ব্যাপার পড়িয়া গেল তাঁতিদের ঘরে।
পুরুষ স্ত্রীলোক যত হেসে হেসে মরে॥
ভবন আনন্দময় রঙ্গেতে প্রভুর।
শুন রামকৃষ্ণ-লীলা শ্রুতিসুমধুর॥"—পুঁথি

* কামারপুকুরের বণিকপল্লীর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস পাইনের অন্তঃপুরে তন্তুবায় রমণীর বেশে গদাধরের প্রবেশ এবং কুলবতীদের সঙ্গে অনুরূপ রঙ্গলীলার একটি মধুর বৃত্তান্ত 'লীলাপ্রসঙ্গ' (১ম ভাগ—পৃঃ ১২৯ ১৩১) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়।—লেখক

অ্যাপোলো-১৬ চন্দ্রাভিযান

শিবদাস

চাঁদে পঞ্চমবার পদার্পণ ক'রল মানুষ—অ্যাপোলো-১৬ চন্দ্রাভিযানে। অ্যাপোলো-১১ থেকে এ্যাপোলো ১৬ পর্যন্ত ছয়টি চন্দ্রাভিযানের মধ্যে একটিতে অ্যাপোলো-১৩ অভিযানে, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মহাকাশযাত্রীদের চাঁদে না নেমেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

অন্যান্য অভিযানের মতোই কেপ কেনেডির উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদের বুকে অবতরণ করা ও পর্যবেক্ষণাদি সেরে পুনরায় ফিরে আসা প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি প্রায় একই পদ্ধতিতে হয়েছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠের যেখানে নামা হয়েছিল, সে অঞ্চলের নাম ডেকার্তে অঞ্চল। চাঁদের মানচিত্রে এ স্থানটি ৯ ডিগ্রী ১ সেকেণ্ড দক্ষিণ, ৩০ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড পূর্ব। পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দিকটি আমরা দেখতে পাই, এঅঞ্চলটি তার সর্বোচ্চ অঞ্চল।

এবারকার অভিযানের বৈশিষ্ট্য- পৃথিবী থেকে কিছু জীবাণু, ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস অভিযাত্রীরা কয়েকটি পাত্রে পুরে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। চাঁদ থেকে ফেরার সময় প্রায় মাঝ পথে মহাকাশচারী ম্যাটিংলি ঐ পাত্রগুলি নিয়ে মূল-যান থেকে বেরিয়ে এসে মহাশূন্যে সেগুলিকে কিছুক্ষণ অনাবৃত রাখেন--যাতে মহাজাগতিক রশ্মির সরাসরি সংস্পর্শে আসতে পারে সেগুলি। পৃথিবীতে ফিরে পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে এই মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে এদের ভেতর কি পরিবর্তন এসেছে। আমরা জানি, জীবদেহে এই মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবের জন্যই খুব বেশীদিন মহাকাশে থাকা এখনো মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত। কয়েক রকম গাছের বীজ ও চিংড়ি মাছের ডিমও এবারে চাঁদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, চাঁদের পরিবেশে তাদের কি পরিবর্তন হয় তা দেখার জন্য।

চাঁদের বুকে এবারে যে সব যন্ত্রপাতি বসিয়ে আসা হ'ল, তার মধ্যে নতুন হচ্ছে মহাকাশে অতি-বেগুনী রশ্মির বিকিরণ পরীক্ষা ক'রে তার ফলাফল পৃথিবীতে পাঠাবার যন্ত্র (আলট্রাভায়োলেট ক্যামেরা স্পেকট্রোস্কোপ) ; এই রশ্মির সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর একটি ফটোও তুলেছেন অভিযাত্রীরা। অ্যাপোলো- ৫-র মতো এবারের অভিযানেও চাঁদের গাড়ী নিয়ে যাওয়া ও তাতে চ'ড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘোরাফেরা করা হয়েছিল এবারের সংগৃহীত চাঁদের পাথর থেকে চাঁদ ও সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে বলেও বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

গত ১৬ই এপ্রিল রাত ১১টা ২৪ মিঃ সময়ে (সবই ভারতীয় সময়) অ্যাপোলো-১৬ উৎক্ষিপ্ত হয়। ২১শে এপ্রিল রাত ২টায় সময় চন্দ্র-যান চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। ২৯শে এপ্রিল রাত ২টার সময় মহাকাশচারীরা ফিরে এসে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করেন। এবার অধিনায়ক ছিলেন জন ডব্লিউ. ইয়ং, মূল-যানের চালক টমাস কে. ম্যাটিংলি এবং চন্দ্র-যানের চালক, চার্লস এম. ডিউক। ইয়ং ও ডিউক চাঁদে নেমেছিলেন।

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন (অষ্টম ভাগ)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরিবেশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩০৯; মূল্য আট টাকা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মর্মকথা বক্ষে ধারণ করিয়া 'শ্রীম-দর্শনে'র সাতটি ভাগই ভক্তসমাজে সমাদৃত। বর্তমান অষ্টম ভাগটির আশ্রয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বয়ের উদার অমৃতময়ী বাণী। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী যিনি 'কথামৃতে'র মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, সেই মাষ্টার মহাশয়ের জীবনে সমন্বয়ের আলো কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাও নিপুণ লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপিত। বিভিন্ন অধ্যায়ে পরিবেশিত আকর্ষণীয় কয়েকটি বিষয় : ভারত আবার উঠবে আত্মজ্ঞান-মহিমায়, সাধু শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য, জীবত্ব নাই অবতারে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে কর্মে আঁট হয়, ঠাকুরের ভাব যে ধারণ করে সে ধন্য।

'তাঁর জিনিস তাঁকে দেওয়ার নামই সন্ন্যাস'—শ্রীম-র উক্তিটি (পৃ: ১৮৯) ভক্তহৃদয়ে ত্যাগের মহিমা প্রকাশ করিতে সমর্থ: 'তাঁকে সব দিতে হবে, সবাইকে। কেন? না, সবই যে তাঁর। তুমি মালিক হয়ে গেছ। তুমি যে অপরের ধনে ধনী। কিন্তু এ জ্ঞান ভুলে গেছ। অধিকন্তু অভিমান করছো, আমার এই সব ধন দৌলত…। কোন্‌টা তোমার, বিচার করে দেখনা একবার। এই শরীরটাই কি তোমার? তুমি রক্তমাংস সৃষ্টি করতে পার? তারপর মন প্রাণ বুদ্ধি? এ সবই তাঁর! সবই ঈশ্বরের, আমরা বলছি আমাদের। তাঁর জিনিস তাঁকে দেওয়ার নামই সন্ন্যাস। তুমি দাস হয়ে থাক। অভিমানটাকে বল— তুমি ঈশ্বরের দাস।'

ভক্ত এবং ধর্মনিরপেক্ষ সকল পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে।

ভাগবত-পরিষৎ-পত্রিকা (আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৭৮): কার্যালয় কালিদাস চতুষ্পাঠী, চন্দননগর। পৃষ্ঠা ৪২।

সমস্যাসঙ্কুল বর্তমান জীবনে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলার ব্রত লইয়া পত্রিকাখানির যে আত্মপ্রকাশ, তাহা লেখাগুলির মাধ্যমে পরিস্ফুট। ভারতের শাশ্বত ভাগবত জীবন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষের অনুভূতিতে কিরূপ প্রোজ্জ্বল, তাহা তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। 'সাম্য-মৈত্রী ও পরমাত্মার উদ্গাতা যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক নিবন্ধটি সুন্দর। পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবন্দনা—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন। প্রকাশক রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ১৫, মূল্য ২৫ পয়সা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ ও ভক্তগণের পুণ্যচরিত্র স্মরণ মনন অনুধ্যান পরম মঙ্গলপ্রদ। ইহাতে তাঁহারই অপার করুণা ও মহিমা অনুভূত হয়। এই 'ভক্তবন্দনা' ভক্তহৃদয় স্পর্শ করিবে।

'যে জন স্মরেন নিতি শত ভক্ত জন,
রামকৃষ্ণনামে খণ্ডে ভবের বন্ধন।'

পুস্তিকাটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভবানীপুর গদাধর আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুরসেবায় উৎসর্গীকৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে শ্রীহট্ট, দিনাজপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বাগেরহাট কেন্দ্রের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ঐ কেন্দ্রগুলির নিকটস্থ অঞ্চলসমূহে দুঃস্থ জনগণের সেবা ও পুনর্বাসনের কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। অন্যান্য অঞ্চলেও এই সেবাকার্য সম্প্রসারিত হইতে পারে।

প্রার্থনা-গৃহের উদ্বোধন

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ১৩ই এপ্রিল নূতন প্রার্থনা-গৃহের উদ্বোধন করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। প্রায় ৫০ জন সাধু এবং ৪৫০ জন ভক্ত এই মনোরম অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

এই উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী ধর্মালোচনা ও সভা আয়োজিত হইয়াছিল। ১৩ই স্বামী ভূতেশানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ১৪ই স্বামী ব্যোমানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৪ই আয়োজিত সভায় প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর সভাপতি এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী ভক্ত্যানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ বক্তা ছিলেন। ১৫ই বেদান্ত-সম্মেলনে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন এবং স্থানীয় কয়েকজন মণ্ডলেশ্বর হিন্দু ষড়্দর্শন বিষয়ে ভাষণ দেন।

কার্যবিবরণী

বোম্বাই খার-এ (Khar, Bombay-52 AS) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী (এপ্রিল হইতে মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রমের কাজ শুরু করা হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এখানে নিজস্ব আশ্রম-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। এই আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরও দুই জন সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পুণ্য সান্নিধ্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের উল্লেখযোগ্য কার্যধারা—

আশ্রম বিভাগ : শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিয়মিত পূজা, উপাসনা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে আশ্রমের সাধুগণ ধর্মালোচনা করেন। আশ্রমে হিন্দীতে শ্রীমদ্ভাগবত ও ইংরেজীতে ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা এবং দাদর পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে মারাঠী ভাষায় নিয়মিত ধর্মালোচনা উল্লেখযোগ্য।

একাদশীতে শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন হয়। অন্যান্য বৎসরের মতো এই বৎসরেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মোৎসব মনোজ্ঞভাবে হইয়াছিল।

মিশন বিভাগ : ছাত্রাবাসে ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ৭৬ জন কলেজের ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৬,৮১৮। পাঠাগারে বিভিন্ন ভাষার ১৪৪ খানি দৈনিক সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। প্রতিদিন আগ্রহশীল পাঠকবৃন্দ পাঠাগারে সমবেত হইয়া পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেন। গ্রাহকগণ ১২,৫৩৪ খানি পুস্তক পড়িতে লইয়া যান।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের আউটডোরে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক সেকশনে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৬৭,১৪২ (অ্যালোপ্যাথিক ৮৬,৭০০)।

সুপরিচালিত ইনডোরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার হইয়া থাকে। এখানে প্লাস্টিক সার্জারি চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে।

রিলিফ: বোম্বাই মিশনের সেবাকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের যে-কোন প্রান্তে যখন রিলিফ করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই এই কেন্দ্র অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হইয়া উঠে। পশ্চিমবঙ্গ বন্যার্তসেবা, শরণার্থিসেবা, সৌরাষ্ট্র বন্যাত্রাণ এবং কচ্ছ খরাত্রাণ কার্যের জন্য এই কেন্দ্র কর্তৃক উপযুক্ত অর্থ ও জিনিসপত্র সংগৃহীত হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বিগত ১৬ই হইতে ২০শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত পাঁচদিন-ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৭ তম জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়। ১৬ই ফেব্রুআরি সকালে ভজন, পাঠ প্রভৃতির পর শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাড়ে দশটায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ এবং পরে প্রায় ৫ হাজার ভক্ত নরনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই ফেব্রুআরি সান্ধ্য আরাত্রিকান্তে শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন। ১৮ই ফেব্রুআরি রাত্রে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের বাঁকুড়া আই. ও. ডাব্লিউ-এর কর্মিবৃন্দ কর্তৃক 'রাজলক্ষ্মী' যাত্রা অভিনীত হয়। ১৯শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের বাঁকুড়া শাখার সদস্যবৃন্দ কর্তৃক 'উৎসব' নাটকটি অভিনীত হয়। ২০শে ফেব্রুআরি সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লরীতে লইয়া স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রী ও ভক্তগণ বেদপাঠ, ভজন ও জয়ধ্বনি সহকারে বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করেন। স্থানীয় পুলিশের ব্যাণ্ড পার্টিও এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিক্রমার পূর্বে ও পরে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐদিন বিকালে আশ্রমের বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এক জনসভায় স্বামী প্রমথানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধরচনা ও কবিতা-আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় যাহারা স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহারা কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করে। আর প্রত্যেক বিভাগে প্রথম হইতে তৃতীয় স্থানাধিকারীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ গুপ্ত এবং অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পরে সভাপতি তাঁহার ভাষণ দেন।

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৭ তম জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে ২৪শে ও ২৫শে মার্চ সভা হয়। ২৪শে মার্চ আশ্রমবিদ্যালয়গুলির পারিতোষিক-বিতরণী সভাতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ। সভার পূর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ড্রিল ও ব্রতচারী নৃত্য দেখায়। ধর্মসভাতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় ২,৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রিতে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জনশিক্ষা বিভাগ হইতে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। ২৬শে মার্চ কাকদ্বীপে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ভক্তদের উৎসাহে এক সুনির্মিত প্যাণ্ডেলে সভা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী প্রভানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ। সভান্তে ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২০শে মার্চ উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহা সমারোহের সহিত পালিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি হয়। দুপুরে প্রায় দেড়-হাজার ভক্ত বসিয়া তৃপ্তিসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী শিবময়ানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী আপ্তকামানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই দিন ঐ বিদ্যালয়ে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের উদ্যোগে একদিনের একটি শিক্ষাশিবির পরিচালিত হয়।

বহরমপুর : সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বহরমপুর শাখায় ৮ই, ৯ই ও ১০ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব-উৎসব মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। শুক্রবার অপরাহ্নে জনসভায় সভাপতি ও বক্তা ছিলেন যথাক্রমে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ। তাঁহারা উভয়েই যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। শনিবারের ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও বক্তা স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার পবিত্র চরিত্র আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের তাত্ত্বিক দিকটি আলোচনা করেন। রবিবার পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর গান পরিবেশন করেন শ্রীপাঁচকড়ি চক্রবর্তী। মধ্যাহ্নে ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা জজ শ্রীতারাভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। বক্তা ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথই যে বর্তমান যুগের অশান্তি-নিবারণের উপায়—ইহাই ছিল উক্ত দিনের আলোচ্য বিষয়। স্বামীজীর প্রার্থনা "মা, আমায় মানুষ কর"—ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

তিন দিনই সভার পর বাঁকুড়া-নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গীতিসুধাকরের

রামায়ণগান জনসমাবেশকে পরিতৃপ্ত করে।

দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি:

স্বামী দেশিকানন্দ

গত ৬ই এপ্রিল, ১৯৭২, রাত্রি ৭টা ৫০ মিনিটের সময় স্বামী দেশিকানন্দ বাঙ্গালোর নার্সিং হোমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে তিনি ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ৮৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং স্বামী নির্মলানন্দজীর নিকট হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালোর, বোম্বাই প্রভৃতি কেন্দ্রের কর্মী এবং মহীশূর ও সালেম কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অবসর-জীবন যাপন করিতে-ছিলেন। গত জানুয়ারি মাসে চিকিৎসার জন্য তিনি বাঙ্গালোরে আসেন। কঠোরতা-পরায়ণ ও ধ্যানপ্রবণ সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি। যাঁহারা তাঁহার পূত সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিকট তিনি অত্যন্ত সম্মানার্হ ছিলেন।

স্বামী পরমাত্মানন্দ

গত ২৮. ৪. ৭২ সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে ৮৩ বৎসর বয়সে স্বামী পরমাত্মানন্দ হৃদ্‌রোগে মাদ্রাজে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। মহীশূর বেদান্ত কলেজে তিনি কিছুকাল কর্মনিরত থাকেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল মাদ্রাজ মঠে অতিবাহিত হয়, এখানে বিশেষ করিয়া প্রকাশন-বিভাগের কর্মেই তিনি দীর্ঘকাল ব্যাপৃত ছিলেন। তামিল ভাষায় তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণবিজয়ম্' তামিল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সরল অনাড়ম্বর জীবন ও মাধুর্যময় স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন।

স্বামী সুখানন্দ

গত ২৯.৪.৭২ বেলা ১১ টার সময় স্বামী সুখানন্দ ৮২ বৎসর বয়সে কাঞ্চীপুরমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি কেন্দ্রে তিনি বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত থাকেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি কাঞ্চীপুরম্ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অনাড়ম্বর তপস্যাপূত জীবন ও মধুর ব্যবহার তাঁহাকে সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় করিয়াছিল। আদর্শ সাধু-জীবনের জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন।

এই সন্ন্যাসিত্রয়ের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নাটশাল (মেদিনীপুর): গত ২২শে হইতে ২৭শে মার্চ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৭ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন ১৪ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় স্বামী বিশোকাত্মানন্দ (সভাপতি), শ্রীভূপালপ্রসাদ মণ্ডল (প্রধান অতিথি) ও অন্যান্য বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। উৎসবের প্রথম দিন ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। শেষ দুই দিন রামায়ণগান বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

নিউ দিল্লী ২৩: সরোজিনী নগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২রা এপ্রিল রবিবার ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

৮ই এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় ভারত সেবক সমাজ প্রাঙ্গণে স্বামী বন্দনানন্দের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। লেডী আরউইন স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্ত বাংলায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রী বি. ডি. জৈন হিন্দীতে স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। অতঃপর স্বামী বন্দনানন্দ সভাপতির ভাষণ দেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় প্রায় ৬০০ জনসমাগম হইয়াছিল।

এণ্টালি (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের ৭২তম বাৎসরিক উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব পাঁচদিনব্যাপী (২রা হইতে ৬ই এপ্রিল, ৭২) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারিগণের যোগদান উৎসবটিকে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে। স্বামী চিদাত্মানন্দ তাঁহার ভাষণে 'অবতার কেন আসেন?' ও 'গৃহীর কর্তব্য' মনোজ্ঞভাবে বিশ্লেষণ করেন। এই উপলক্ষে আনুমানিক এক হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ৭ই এপ্রিল বৈকালে স্থানীয় আশ্রম-পরিচালিত প্রাইমারী বিদ্যালয়ে আয়োজিত সভায় পুরস্কার-বিতরণ ও সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ; স্বামী যুক্তানন্দ ভাষণ দেন। ৯ই এপ্রিল প্রত্যূষে শোভাযাত্রায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ নগর-পরিক্রমা করে। পূজান্তে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তিনদিনই পূজা-পাঠাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনই স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী যুক্তানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা এবং শেষের দিন স্বামীজীর উপরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রতিদিনই সভান্তে শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী রামায়ণগান পরিবেশন করেন।

নূতনপুকুর (২৪ পরগনা): গত ৯ই এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৭তম

জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রমের বাৎসরিক আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেলা ৮টা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতাদি পাঠ হয়। বৈকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডলের ভক্তি-সঙ্গীত ও শ্রীরাধানাথ অধিকারীর ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরম তৃপ্তিদান করে। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনবেদের বিশদ পর্যালোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী জীবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর জীবনালোকে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার প্রাধান্য দেন। উৎসবে তিন শতাধিক ব্যক্তি বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের ১০৯তম জন্মোৎসব তাঁহার পুণ্য জন্মস্থান বিষ্ণুপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে গত ৯ই এপ্রিল সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী অখণ্ড অনুষ্ঠানে—তীর্থপরিক্রমা, পূজা, পাঠ, হোম, নরনারায়ণসেবা, লীলাকীর্তন, ভজন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মচারী দেবদাস গীতা ব্যাখ্যা করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ (সভাপতি), স্বামী জয়ানন্দ এবং শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। সকলের বক্তৃতাই সময়োপযোগী হইয়াছিল। শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মস্থানে উপযুক্ত মন্দির নির্মাণের কথা সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করেন। উৎসবে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরলোকে

আমরা গভীর দুঃখের সহিত তিনজন ভক্তের পরলোকগমনের কথা জানাইতেছি:

বেলা দত্তগুপ্তা

নিউ আলিপুর সারদা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বেলা দত্তগুপ্তা গত ২৪ শে জানুআরি পরলোকগমন করিয়াছেন। সারদা সমিতি ছাড়াও বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্তা ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন তিনি।

অটলবিহারী দে

হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অটলবিহারী দে গত ১০ই মার্চ ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সঙ্ঘের মন্দিরাদি তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় নির্মিত হয়। চুঁচুড়া কোর্টের একজন শীর্ষস্থানীয় উকিল ছিলেন তিনি।

রামেশ্বরী দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ রামেশ্বরী দেবী গত ১০ই এপ্রিল পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ইঁহাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

অনুষ্ঠান-সূচী

[বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে]

(জ্যৈষ্ঠ—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯)

তিথি-কৃত্য

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	৩রা জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	১৭ই মে
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখী পূর্ণিমা	১৪ই জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	২৮শে মে
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২২শে শ্রাবণ	সোমবার	৭ই আগস্ট
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৮ই ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২৪শে আগস্ট
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৫ই ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	৩১শে আগস্ট
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২১শে ভাদ্র	বুধবার	৬ই সেপ্টেম্বর
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৫ই আশ্বিন	রবিবার	১লা অক্টোবর
স্বামী অখণ্ডানন্দ	মহালয়া	২১শে আশ্বিন	শনিবার	৭ই অক্টোবর
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	২রা অগ্রহায়ণ	শনিবার	১৮ই নভেম্বর
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৪ঠা অগ্রহায়ণ	সোমবার	২০শে নভেম্বর
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২৯শে অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	১৫ই ডিসেম্বর

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখী অমাবস্যা	২৭শে জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	১০ই জুন
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১২ই আষাঢ়	সোমবার	২৬শে জুন
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৮ আশ্বিন	শনিবার	১৪ই অক্টোবর
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৯শে কার্তিক	রবিবার	৫ই নভেম্বর

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত মাঘ মাস হইতে উদ্বোধন পত্রিকায় উহার ১ম বর্ষের পুনর্মুদ্রণ চলিতেছে; সেই পুনর্মুদ্রিত অংশে উদ্বোধনের তৎকালীন যে ঠিকানা আছে, কেহ কেহ সেই ঠিকানায় উদ্বোধন অফিসে পত্র লিখিতেছেন। সে ঠিকানায় এখন যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক পত্রগুলি আমাদের দিয়া যাইতেছেন বলিয়াই আমরা সেগুলি পাইতেছি। সেজন্য, সঙ্কোচবোধ করিলেও আমরা অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা যেন পত্রাদি উদ্বোধন অফিসের বর্তমান ঠিকানাতেই (১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩) পাঠান, ৭৪ বৎসর পূর্বের ঠিকানায় নয়।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্]

শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যম্ কে ন প্রাপুর্বাঞ্ছিতম্ পাপিনোঽপি।
হা নঃ পূর্ব্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিন্ তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিদুঃখম্ ॥ ২৬ ॥

এরূপ কে পাপ-কর্ম্মা আছে যে, শ্রীমন্নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই ? হায়! পূর্ব্ব জীবনে আমাদের জিহ্বা সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি পায় নাই, সেই জন্যই আমাদের গর্ভবাসাদিরূপ বহুবিধ যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে।

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ২৭ ॥

হে মধুকৈটভনাশিন্! হে ত্রিলোকপতে! তোমার প্রতি আমার এই একমাত্র অনুগ্রহ প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে তোমার দাসানুদাসের যে পরিচারক, তাহার দাসানুদাসের যে সেবক, তাহার সেবক বলিয়া অঙ্গীকার কর। তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল হইবে।

নাথে নঃ পুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমম্ কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদম্
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্ ॥ ২৮ ॥

যিনি সর্ব্বপুরুষের শ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকের অধিপতি, যাঁহাকে হৃদয় দ্বারা সেবা করিতে হয়, যিনি নিজের পদ দান করিতেও কাতর হয়েন না, সেই দেবদেব নারায়ণ থাকিতেও, যে কেহ কতিপয় গ্রামের ভূম্যধিকারী সে যদিও অতি নীচপ্রকৃতি ও কৃপণস্বভাব হয়, তথাপি আমরা তাহার দাসত্ব করিবার জন্য লালায়িত হই। অহো, আমরা কি মূঢ় ও নির্বোধ!

মদন পরিহর স্থিতিং মদীয়ে মনসি মুকুন্দ পদারবিন্দধাম্নি।
হরনয়নকৃশানুনা কৃশোঽসি স্মরসি ন চক্রপরাক্রমং মুরারেঃ ॥ ২৯ ॥

হে মদন! আমার মন মুকুন্দের পাদপদ্ম রাখিবার স্থান, সুতরাং তাহা আর অধিকার করিতে সাহস করিও না। তুমি ইতিপূর্ব্বেই মঙ্গলময় সদাশিবের নয়নাগ্নি দ্বারা অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, মুর শত্রুর মহাপরাক্রম কি তোমার স্মরণ নাই ?

তত্ত্বং ব্রুবাণানি পরং পরস্মাৎ মধু ক্ষরন্তীব সতাং ফলানি।
প্রাবর্ত্তয় প্রাঞ্জলিরস্মি জিহ্বে নামানি নারায়ণগোচরাণি ॥ ৩০ ॥

হে জিহ্বে! আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমার নিকট ইহাই প্রার্থনা করি যে, যে পবিত্র নামসকল নারায়ণকে সাক্ষাৎকৃত করায়, যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ববস্তু জানাইয়া দেয়, যে সমুদয়কে সাধুগণ মধুক্ষরণকারী ফলের ন্যায় উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই সুমধুর নাম-সকল তুমি উচ্চারণ কর।

ইদং শরীরং পরিণামপেশলম্ পতত্যবশ্যং শ্লথসন্ধিজর্জ্জরম্ ।
কিমৌষধৈঃ ক্লিশ্যসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ম্ কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥ ৩১ ॥

এই দেহ পরিণামী অর্থাৎ বিনশ্বর, সুতরাং এক সময়ে শিথিলসন্ধি ও জরাজর্জ্জরিত হইয়া ইহার নাশ হইবেই হইবে। অতএব হে মূর্খ, দুর্বুদ্ধে! কেন নানাবিধ ঔষধ খাইয়া যন্ত্রণা পাইতেছ? সর্ব্বরোগবিনাশী কৃষ্ণনাম-রসায়ন পান কর (তোমার সকল যন্ত্রণাই দূর হইবে)।

দারা বারাকরবরসুতা তে তনূজো বিরিঞ্চিঃ
স্তোতা বেদাস্তব সুরগণো ভৃত্যবর্গঃ প্রসাদঃ।
মুক্তির্মায়া জগদবিকলম্ তাবকী দেবকী তে
মাতা মিত্রং বলরিপুসুত স্বয্যতোঽন্যান্ ন জানে ॥ ৩২ ॥

জলনিধির কন্যা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী তোমার ভার্য্যা, ব্রহ্মা তোমার দেহ হইতে জন্মিয়াছেন, বেদসমুদয় তোমার স্তব পাঠ করেন, দেবতাগণ তোমার ভৃত্যস্থানীয়, তুমি প্রসন্ন হইলে মুক্তি দান কর, এই সমগ্র জগৎ তোমার মায়া, তোমার মাতা দেবকী, তোমার মিত্র ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন। ইহা ছাড়া তোমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু জানি না।

কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগত্রয় গুরুঃ কৃষ্ণং নমস্যাম্যহম্
কৃষ্ণেনামরশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য দাসোঽস্ম্যহম্
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলম্ হে কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিজগতের গুরু কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি সর্ব্বদা কৃষ্ণকেই নমস্কার করিব। দেব-শত্রুগণ কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার। কৃষ্ণ হইতেই এই জগৎ সমুত্থিত হইয়াছে। আমি কৃষ্ণের দাস। অখিল চরাচর জগৎ কৃষ্ণেই অবস্থিত রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমি আমায় রক্ষা কর।

স ত্বং প্রসীদ ভগবন্ কুরু ময্যনাথে বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল ত্বম্।
সংসারসাগরনিমগ্নমনন্তদীনম্ উদ্ধর্ত্তুমর্হসি হরে পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ৩৪ ॥

হে ভগবন্! তুমি উক্ত গুণবিশিষ্ট, সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিষ্ণো, আমি অনাথ, আমায় কৃপা কর, কারণ তুমি অতি দয়াময়। সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমি চিরকাল কষ্ট পাইতেছি, হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বসন্তাপহারিন্! সুতরাং আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।

নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজম্ করোমি নারায়ণপূজনং সদা।
বদামি নারায়ণনাম নির্ম্মলম্ স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

আমি যেন নারায়ণের পাদপদ্মে নমস্কার করি, সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করি, তাঁহার নির্ম্মল নাম নিয়ত জপ করি, এবং তাঁহারই নিত্য তত্ত্ব যেন ধ্যান করি।

শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে।
পদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে শ্রীরাম পদ্মাক্ষ হরে মুরারে ॥ ৩৬ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ অহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

হে শ্রীনাথ! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে ভক্তপ্রিয়! হে চক্রপাণে! হে শ্রীপদ্মনাভ! হে অচ্যুত! হে কৈটভারে! হে শ্রীরাম! হে পদ্মনেত্র! হে হরে! হে মুররিপো! হে অনন্ত! হে বৈকুণ্ঠপতে! হে মুকুন্দ! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! এইরূপে তোমায় ডাকিবার শক্তি থাকিলেও, কেহই ডাকে না। অহো! মানবগণ বিপদকে আলিঙ্গন করিতেই অগ্রসর হয়।

ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুমনন্তমব্যয়ম্ হৃৎপদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্।
সমাহিতানাং সততাভয়প্রদম্ তে যান্তি সিদ্ধিং পরমাঞ্চ বৈষ্ণবীম্॥ ৩৮ ॥

যিনি সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত এবং অচ্যুত, যিনি হৃৎপদ্মকোষে সর্ব্বদাই বাস করেন, যিনি তাঁহাতে একাগ্রচিত্তদের সর্ব্বদা অভয় দিয়া থাকেন, যে সকল সৎপুরুষ সেই শ্রীহরির ধ্যান করেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

ক্ষীরসাগরতরঙ্গশীকরাসারতারকিতচারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গোত্থ বিন্দুবর্ষণে যাঁহার মনোহর মূর্ত্তি তারকাবলীর দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যিনি অনন্ত-নামক নাগের দেহরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সেই মধুরিপু লক্ষ্মীপতিকে নমস্কার।

যস্য প্রিয়ৌ শ্রুতধরৌ কবিলোকবীরৌ মিত্রে দ্বিজন্মবরপদ্মশরাবভূতাম্।
তেনাম্বুজাক্ষচরণাম্বুজষট্‌পদেন রাজ্ঞা কৃতা কৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ ॥ ৪০ ॥

বেদজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্ম ও শর* নামে যাঁহার দুই অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, যিনি কমলনয়নের শ্রীপাদপদ্মের ভ্রমর-স্বরূপ, এই স্তোত্র সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ কুলশেখর নামক রাজার রচিত।

ওঁ তৎ সৎ

কর্ম্ম

(বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক 'রামকৃষ্ণ মিশনে' পঠিত।)

সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন, "ভাল মন্দ দুটি কথা, ভালটি তার করা ভাল।" এ ছত্রের সার্থকতা সকল জীবনেই উপলব্ধি হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা পাই, কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হওয়া অপেক্ষা আর ক্লেশ নাই। আত্মদর্শনে যাঁহার

* "পদ্ম" ও "শর" এ দুটি গুণপ্রকাশক উপাধিস্বরূপ। পদ্মদর্শন করিলেই চিত্তে আনন্দের উদয় হয় এবং শর-দর্শন করিলেই শত্রুগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি কোন শমগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রজা পালন করিতেন। এবং এক ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠের সাহায্যে শত্রুদিগকে দূরে রাখিতেন। ইহাই "পদ্ম" ও "শর" গ্রহণের অভিপ্রায়।

চিত্ত স্থির হইয়াছে, যাঁহার মন সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া নিষ্কম্প দীপের ন্যায় অবস্থান করে, তাঁহারই কেবল কর্ম্ম থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল এরূপ চঞ্চল যে, তাঁহারও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়েরা করিতে থাকে, তবে সামান্য জীবে কিরূপে কর্ম্ম হইতে অবসর পাইবে? চঞ্চলা মহামায়া বা প্রকৃতি বলুন, এক পলের জন্য স্থির নন; বিদ্যা বা অবিদ্যাশৃঙ্খলে জীবকে আবদ্ধ করিয়া দিবানিশি চালাইতেছেন। এ শৃঙ্খল ছেদ ব্যতীত চঞ্চলতা দূর হইবে না। কার্য্য শ্রমে ক্লান্ত হইয়া মনে হয়, কত দিনে নিশ্চিন্ত হইব? কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক, কিরূপে নিশ্চিন্ত হইব, এই দুশ্চিন্তা শতগুণে চঞ্চল করে। আবার যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে অনুভব হয় যে, আপেক্ষিক অবস্থায় নিশ্চিন্তের নাম মৃত্যু।

আমরা বলি নিশ্চিন্ত হইব; মনে করি, নিশ্চিন্ত হইতে চাই; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা চাহি না, চাহি বিলাস। কিন্তু বিলাসীও স্থির নন, তাঁহারও অন্যের ন্যায় অনবরত পরিশ্রম করিতে হয়। জীবিকানির্ব্বাহে যখন শ্রম করিতাম, তখন ভাবিতাম, যথেষ্ট অর্থ পাইলেই শ্রমের হাত এড়াইব, আনন্দে দিন যাইবে। কিন্তু অর্থোপার্জনের পর দেখিলাম, শতগুণে দুর্ভাবনা ও শ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, শ্রমহারিণী নিদ্রাও ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতেছেন; অর্থ-উপার্জ্জন অপেক্ষা অর্থ-রক্ষা করা দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে। ভাবিলাম—না, যা হয় হবে, অর্থ না থাকে, কি করিব, আর ভাবিতে পারি না; এ অবস্থায়ও শ্রমের হাত এড়াইতে পারিলাম না। কিছু ত করিতে হইবে, কি করি, কি করি, এ এক বিষম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। আমোদ করি, সেও এক মহা বিপদ; কাল যে সকল উপকরণে আমোদ হইয়াছে, আজ আর তাহাতে আমোদ পাই না—নূতন চাই। যেমন অন্নের অভাব ছিল, অন্নকষ্টে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতাম; আমোদের উপকরণ-অভাবও তদ্রূপ মহাযন্ত্রণাপ্রদ; কত পরিশ্রম করিব, সেইরূপই পরিশ্রম করিতে হয়, অভাবও রহিল। অন্নাভাব ছিল, ইন্দ্রিয়ের তাড়না তাদৃশ ছিল না, এখন ইন্দ্রিয়েরা শতদন্তে দংশন করিতেছে, ভোগে ভোগ-তৃষা প্রবল হইয়া দিন রাত যন্ত্রণা দিতেছে।

একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আমায় বলিয়াছিলেন, "সকলে মনে করিয়া থাকে আমরা সুখী, তা নয়; অপর অপর শত চিন্তা যদি দূর করিয়া দি, তথাপি কি করি, কি করি, ঘুচে না, ভোগ-প্রয়াসে জীবন উপেক্ষা করিয়া পরগৃহে প্রবেশ; জেলখানা শিয়রে রাখিয়া, কুৎসিত চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া, অহরহ তৃষানলে দগ্ধ হইয়া, ভোগ অন্বেষণ করি, তৃপ্তি নাই, কেবলই যন্ত্রণা।" ধনীর এ বাক্যটি সম্পূর্ণ সত্য। দেখিতেছি, কার্য্যে পরিশ্রমের হাত এড়াইতে পারিলাম না। যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার কি উপায় আছে? ব্যাকুলভাবে নিজে নিজে এ প্রশ্ন করিলে প্রসন্নচিত্ত গুরু উপদেশ দিবেন, ধীরে ধীরে বিবেকীকে বুঝাইয়া দিবেন—অবিদ্যা এরূপ তীব্র যন্ত্রণা দিতেছেন, বিদ্যামায়ার শরণাপন্ন হও; এত দিন সুখ অন্বেষণে দুঃখ পাইয়াছ; আমার অভাব, আমার অভাব ভাবিয়াই দগ্ধ হইয়াছ; আমার অভাব পূরণে ব্যস্ত না হইয়া অন্যের অভাব পূরণে যত্নবান থাক। অবিদ্যা-শৃঙ্খল-জড়িত জীব এ কথা বুঝে না। আমার অভাবের জন্য নয়, কার অভাবের জন্য করিব? বিবেকী চিত্ত উত্তর করেন, এই ত যন্ত্রণা দেখিলে। এরূপ যুক্তিসঙ্গত কথা একেবারে ধারণা হয় না। মনে মনে

নানা অবস্থার সৃষ্টি করিতে থাকি, প্রচুর অর্থ হউক—যেন দস্যু-ভয় থাকে না,—অতি ব্যয়ে যেন ক্ষয় না হয়, যাহা চাই, তখনই যেন তাহা পাই। অবিবেকী মন এই সুখের অবস্থা কল্পনা করে—যে কল্পনা অষ্টসিদ্ধি লাভে উপদেশ দেয়। আমি সে অবস্থা কল্পনা করিয়াছিলাম। বিবেক আমার মনে উদয় হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, এ দৈত্যের অবস্থা, সখা-শূন্য সংসার। ভস্মাক্ষের ন্যায় একা বসিয়া স্বার্থচালিত শক্তির তাড়নায় ঘোর নরককুণ্ড হৃদয়ে কাটিতে হয়। যাহা চাই তাহা পাই; এ সুখের বিষয় বটে. কিন্তু একটা দুর্জয় অবস্থা আছে। কি চাই, জানি না; যাহা যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি; আর নূতন কি চাহিব? এরূপ অবস্থা অষ্ট-সিদ্ধ কেন, অনেক ধনাঢ্য সভ্য প্রদেশে দেখা যায়। এই অভাবে চালিত হইয়া কত শত নরনারী অস্বাভাবিক পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তৃপ্তি নাই, পাপই বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্বে আমি মনে মনে করিতাম, অসুর-দমনের নিমিত্ত ভগবানকে এরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে কেন? লীলা বলিয়া আমার মনে তৃপ্তি জন্মিত না। এ কথার উত্তর এখন মনে করি যে, কল্পতরু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া অসুরেরা দুর্দম হইত, অপরিমেয় শক্তি পাইত। সে শক্তি যদি স্বার্থচালিত না হইয়া নিষ্কামভাবে চালিত হইত, তাহা হইলে, সে অসুর দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, ভগবানে লয় হইত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিশাইয়া যাইত। কিন্তু অসুরেরা স্বার্থপর, ভগবান্ নিঃস্বার্থ। অসুর-তাড়নায় জীবের দুঃখে দয়াময় অবতীর্ণ হন, এবং কেবল অনিবার্য্য দয়া-শক্তি-প্রভাবে বরপ্রদত্ত আসুরিক দুর্দম শক্তি পরাভূত হইত। অবতারকে নিজ শক্তির সহিত সংগ্রামে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

বিচারে দেখা যায়, রিপুর তাড়নাই দুঃখ, স্বার্থ থাকিলে সে তাড়না ঘুচিবেই না। আবার কলুষিত মন কুযুক্তি তুলে উপদেশ দেয়—কৈ আমার জন্য কি করিয়াছি, দুটি পেটের জন্য কে ভাবে? পুত্র কলত্র ও আশ্রিত ব্যক্তির নিমিত্ত ক্লেশ করি। মায়া-মুগ্ধ মন বুঝিতে দেয় না যে, আমারই স্বার্থ শত মূর্তি ধারণ করিয়াছে; আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার আশ্রিত, তাহাদের দুঃখে দুঃখ পাইব, এই নিমিত্ত তাহাদের হিত অন্বেষণ করি। পরের পুত্র মরিয়া যদি আমার মুমূর্ষু পুত্র বাঁচে, তাহা আমার সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা। যাহারা আমার তাহারা সুখে থাকুক, আর সমস্ত পৃথিবী কেন ধ্বংস হউক না,—এই মহা স্বার্থসাধনকে পরকার্য্য বলি। কিন্তু যুক্তি পরাভূত হইলে মায়া পরাভূত হন না। অবিদ্যা বলিতে থাকেন, স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া অন্ততঃ এক দিনও ত সুখ ভোগ করিয়াছ, নিঃস্বার্থ হইলে, তাহাও ত হইত না। এরূপ মহা ভ্রমকল্পনা অবিদ্যা-মায়াই করিতে পারেন। ভ্রমের উপর দুর্জ্জয় ভ্রম—নিঃস্বার্থ অবস্থায় আনন্দ নাই!

বিদ্যামায়া—যাহার অনুগত হইতে ভয় পাও, ভাব, কত কি কঠোর কার্য্য করিতে হইবে; অবিদ্যামায়ার বশীভূত হইয়া সেইরূপই কঠোর কার্য্য করিতেছে (ছ)। মায়া-জয়-সঙ্কল্পে বিদ্যামায়া-চালিত গৃহ-ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিয়া ভাব এই দেখ, এ নিরাশ্রয়—উঃ, না জানি, আমার এ অবস্থা হইলে কি কষ্ট হইত। যদি ভাবিয়া দেখিতে, বুঝিতে, তাঁহাকে তরুতলে দেখিয়া ভয় পাইয়াছ, কিন্তু গ্রামে গ্রামে তরুতলে বসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ।

বীরপুরুষ ! রণক্ষেত্রে ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় বারিধারা, ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছ। ধনী ধন-অন্বেষণে, মানী মানের দায়ে, ভোগী ভোগ-বাসনায়, বহুদিন এই তরুতল আশ্রয় করিয়াছ, কেবল ঐ ত্যাগী সন্ন্যাসীর সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া তরুতল আনন্দধাম করিয়াছেন, আর তুমি অবকাশমত তোমার বাবুইবাসা অট্টালিকায় বসিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি সহায় করিয়া বিপদসাগরে অকূল পাথার ভাবিয়াছ। দেখিতেছ, তৃতীয় প্রহর অতীত, সন্ন্যাসীর অন্ন নাই, তোমারও কাল সমস্ত দিন মোকদ্দমায় বিব্রত থাকিয়া উদরে অন্ন যায় নাই ; অন্যান্য দিন তোমারও অন্ন আইসে, তাহারও অন্ন আইসে। প্রভেদ, তাঁহার ঈশ্বরে নির্ভর, তুমি অন্নচিন্তায় কাতর। ধন-রক্ষা-চিন্তা কেবল অন্ন-চিন্তার প্রতিরূপ মাত্র। কিঞ্চিৎ স্থির-চিত্ত হইলেই বুঝা যায় যে, এই যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের যে সকল কষ্ট মনে মনে কল্পনা করিতেছি, তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক কষ্ট করি, বা না করি, অন্ততঃ জীবনযাত্রায় তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি ও করিতেছি। গুরুসেবায় বিরক্তি, পুত্রের সেবা করিতেছি ; ভগবানের উপাসনা না করিয়া রমণীর উপাসনা করিতেছি ; তীর্থ-ভ্রমণের পরিবর্ত্তে নানা দুর্গম স্থানে যাইতেছি ; দেবদর্শনে অনাসক্ত হইয়া ভয়ে আমা অপেক্ষা শক্তিমানের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় যাইতেছি। ইহা অপেক্ষাও ঘৃণিত অবস্থা কখন কখন হয়। বেশ্যার উপাসনা, রাজপুরুষের তাড়না, শৌণ্ডিকালয়ে গমন, কারাগারে অবস্থান হইয়া থাকে। প্রভেদ এই, শান্তির পরিবর্ত্তে হৃদয় অশান্তির আগার করি।

যদি বিদ্যামায়ার সংসারে এখন যাহা করিতেছি, তাহাই করিতে হয়, তবে সে অবস্থায় শান্তি কোথায় ? শান্তি আছে। এই সকল কার্য্যই করিতে হয় বটে, কিন্তু অপর উদ্দেশ্যে কার্য্য চালিত হয়। শীতকাল, একখানি বস্ত্র আছে ; অবিদ্যা মায়ার বশীভূত হইয়া আমি গাত্র আচ্ছাদন করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্ত অন্যের সহিত কলহ হয়। বিদ্যামায়ায়ও কলহ আছে, অপরকে বলি, তুমি আমা অপেক্ষা শীতার্ত্ত হইয়াছ, অতএব তুমি এই বস্ত্রে অঙ্গ আবরণ কর, তিনিও সেইরূপ বলেন, কলহ হয়। পৌরাণিক গল্পে আছে, শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির কলি-যুগকে বন্ধনমুক্ত করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, পথে দেখেন, একজন ব্রাহ্মণের সহিত একজন কৃষক কলহ করিতেছেন ; হলফলকে সুবর্ণ উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, তোমার শ্রমে উঠিয়াছে, তুমি এর অধিকারী ; কৃষক বলিতেছে, কোথাকার ঠাকুর তুমি, আমি ব্রহ্মস্ব লইব ? তোমার ক্ষেত্রের সোনা আমি লইব কেন ? তারপর যখন রাজা যুধিষ্ঠির কলিকে মুক্তি প্রদান করিয়া ফেরেন, দেখেন সেই কলহ। এখন উভয়ে বিপরীত কথা বলিতেছে, ব্রাহ্মণ বলে, আমার ক্ষেত্র, আমার সোনা ; কৃষক বলে, আমার শ্রমে উঠিয়াছে, আমিই অধিকারী। অবিদ্যা ও বিদ্যার কলহ এই।

তবে কি করি, সন্ন্যাসী হই ; এ বৈরাগ্য অবিদ্যা-মায়ার। মায়াবী রাক্ষসী সুন্দরী সাজিয়াছে মাত্র। এ ভোগ ইচ্ছায় সন্ন্যাস ; গৈরিক পরিধান, জটা বা কোন মুণ্ডন, সন্ন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ নয়। বাসনার তাড়না যিনি অনুভব করিয়া বাসনা-দমনের চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন ; নতুবা গৈরিক বসন বিড়ম্বনা। একটী

থিয়েটারের লোক বলিয়াছিল, "দেখি, আর দিন কতক দেখি, যদি প্রোপ্রাইটার ম্যানেজার করে ভাল, নচেৎ পরমহংসের দলে মিশিব।" বাসনা-জড়িত গৈরিকবসনধারীও সেইরূপ। কামিনীকাঞ্চনে চিত্ত সমভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু অভিমান শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন, "গৃহীর অভিমান কুচগাছের শিকড়, সহজেই উৎপাটিত হয়; কিন্তু সন্ন্যাস অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোনক্রমে উৎপাটিত হয় না।" তবে কি করিব? জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের উপদেশ গ্রহণ কর। গৃহী হও, সন্ন্যাসী হও, তাঁহাদিগের উপদেশ ধ্রুবতারার ন্যায় পথ দেখাইয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, গৃহী, যাহা করিতেছ কর; স্ত্রী-পুত্রের সেবায় যেরূপ নিযুক্ত আছ সেইরূপই থাক, কেবল—মনে মনে অনবরত চিন্তা কর, তুমি ঈশ্বরের দাস। যেমন পরগৃহে দাসী থাকিয়া পরের সন্তান লালন-পালন করে, তুমিও তাহাই করিতেছ, তোমার ঘর হেথা নয়, এরা সব তোমার নয়. এইটি হৃদয়ে নিশ্চিত করিবার চেষ্টা পাও; এ চেষ্টায় নিয়ত ঈশ্বরচিন্তা থাকিবে, বিবেক উদয় হইবে, বিবেক প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিবে, এ সকল তোমার নয়, অপরের পুত্রের সহিত তোমার পুত্রের প্রভেদ থাকিবে না। যে বিষয়মোহ তোমায় আবদ্ধ করিয়াছিল, পঙ্ক হইতে পদ্মের ন্যায়, কলুষিত হৃদয়ে প্রেমকলিকা ফুটাইবে; স্থান ও ব্যক্তিতে তোমার মমতা আর আবদ্ধ থাকিবে না, তোমার দয়া জগদ্ব্যাপী হইবে; শত্রুমিত্র দুটি কথা ভুলিয়া যাইবে, অতি ক্ষুদ্র জীব তোমার দয়ার অধিকারী হইবে। শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছা লয় হইবে, তখন তুমি সত্ত্বগুণের অধিকারী, গুণপ্রভাবে গুণগরিমা দূর হইবে। তাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন, তোমার অপেক্ষা নাই, তুমি না থাকিলে সে সমস্ত কার্য্য সমভাবে হইতে থাকিবে, আমি ইহা করিব, এ সঙ্কল্প আর উদয় হইবে না; যাহা এতদিন ভাবিয়াছিলে—তুমি করিয়াছ, তাহা তিনি করিয়াছেন—দেখিতে পাইবে। আমি ও আমার গরিমা একেবারে পরাভূত হইবে। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে। মৃত্যুঞ্জয় অবস্থায় জীবন মরণ সমান।

আবার মনে কূট-তর্ক উঠিতেছে, 'তবে ত সংসারই ভাল। এই যে গৈরিকধারী তরুতলবাসী, ও ভণ্ড।' বিবেক বুঝাইয়া দিবেন, তা নয়। উনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন, তাহার কারণ এই, আপন চিত্তের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াছেন। আমার পুত্র, আমার নয় ভগবানের, এ ধারণা নিয়ত রাখা কঠিন, এই বিচার করিয়া তিনি স্বতন্ত্র অবস্থান করিতেছেন। 'আমার' 'আমার' শব্দ সংসারে অনবরত হইতেছে। আমার নয়, এরূপ ধারণা কিরূপে করিবেন? তাঁহাকে উমাচরণ বলিয়া ডাকিয়াছে, তিনি উমাচরণ হইয়াছেন; 'তাঁদের' বাটী শুনিয়াছেন, তাঁদের বাটীই জানেন। এ সকল কথা মিছা, যদি তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় সতর্ক থাকিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি নিদ্রায় দেখেন, সেই বাল্য সংস্কার রহিয়াছে। দূরদেশে অবস্থান, আত্মগোপন, অনবরত চেষ্টা, তিতিক্ষা, বিবেক ইহাতেও সংস্কারের দাগ ঘুচে না, তাই তিনি স্বতন্ত্র আছেন—দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া স্বতন্ত্র আছেন, দুর্জ্জয় সংগ্রাম বোধে পলাইয়াছেন। তিনি অভিমানী নন, ভীত! অর্থ নাড়িতে সাহস করেন না, রমণীর সঙ্গ সর্প সহবাস জ্ঞান করেন। অশান্ত হৃদয় শান্তির

অনুসন্ধান করিতেছে। পরমহংসদেব একদিন তাঁহার এক বালক শিষ্যকে বলেন যে, "তোমার শরীরে যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার প্রচুর ধন-লাভের সম্ভাবনা, তোমার নিকট ধন থাকিলে ভালই হয়, সদ্ব্যয় হয়, কি বল ধনী হইবে?" বালক শুনিয়া আকুল, চরণে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল, ভগবান আমায় রক্ষা করুন, আমার যেন ধন না হয়। কামের তাড়নায়, কেহ কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিসে কাম যাইবে, কিরূপে কামিনীর কটাক্ষ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া উপায় চাহিয়া থাকেন। সেই অর্থ-ভীরু, কামিনী-ভীরু লোকেরাই পরে সন্ন্যাসী হন। কুসুম-শয্যায় লালিত, স্বর্ণপাত্রে পালিত, হয়ত তোমার আমার দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, ভয়ে, অভিমানে নয়। ইঁহাদের ভণ্ড বলিলে অপরাধ হয়। তাঁহারা সন্ন্যাসী, তথাপি কার্য্য করেন। পরমহংসদেবের উপদেশমত আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস জানিয়া তাঁহারা জীবের শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকেন। নর-নারী ভগবানের নানা রূপ, এই ধারণায় তাঁহাদের সেবা করেন। ভিক্ষা-লব্ধ দুগ্ধ বুভুক্ষুকে দিয়া বুভুক্ষুর সেবায় অবকাশ পাইয়া দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিতে যান। অনবরত কর্ম করিতেছেন, অলস(তা)হীন হইয়া কর্ম করিতেছেন, জীবন উপেক্ষা করিয়া পরহিত-চিন্তায় নিযুক্ত আছেন। সুখ দুঃখ জীবনধারণে অনিবার্য্য অবস্থামাত্র জানেন, সুখে স্পৃহা, দুঃখে বিদ্বেষ আর নাই; তবে পরহিতে জীবন অর্পিত, অতএব সুখ-দুঃখ পরকার্য্যেই অনুভব করেন। শান্তি দেবী তাঁহাদের হৃদয়ে বসিয়া আছেন। যাঁহার দাস, তাঁহারই কার্য্য করিতেছেন, কার্য্যে শক্তি তিনিই দিতেছেন; আপনাকে দুর্ব্বল জানেন সুতরাং যখন কোন মহৎ কার্য্যসাধনে সক্ষম হন ভগবানের হস্ত দেখিতে পান, আর অভিমান থাকে না। যদি কখন অশান্তি হয়, তাহার কারণ পরহিতে ব্যাঘাত। আপনাদিগকে সেতুবন্ধে কাষ্ঠবিড়াল জ্ঞান করেন, কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে তিনি শত সহস্র ধন্যবাদ দেন। কার্য্যফল উপেক্ষা করিয়া কার্য্যই তাঁহাদের প্রিয়। পাকাফলের ন্যায় যখন কার্য্যবন্ধন খসিয়া পড়িবে তখন ত্রিগুণাতীত হইবেন; এখন কার্য্য করেন, কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সেই যুদ্ধে মৃত্যু তাঁহার অভিলাষ, কর্ম্ম করিতে (করিতে) যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হয়। যিনি কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চান, যাঁহার কর্ম্ম আপন হইতে ঘুচে নাই, অথচ কর্ম্মত্যাগী অভিমান করেন, তিনি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন। ভগবান রামকৃষ্ণের এরূপ কর্ম্মস্পৃহা বলবান ছিল যে, একদিন জাহ্নবীজলে দেখেন, পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার করপুটে জল থাকে না, কাঁদিয়া আকুল, যাকে তাকে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, এ আমার কি হইল! কর্ম্মক্ষয় করিয়াছেন, তথাপি কর্ম্ম করিতেন। অতি কঠোর কর্ম্ম—জীবন উপেক্ষা করিয়া জীবকে পরমার্থ দান। নির্ম্মল চরণ পাপীর স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যাইত, তথাপি শ্রীচরণ সকলের নিমিত্ত ছিল। মুখ দিয়া শোণিত উঠিতেছে, শিক্ষাদানে বিরত নন। জীবের দুঃখে দুখিত; সঙ্কল্পরহিত মনে শত শত জন্মগ্রহণ সঙ্কল্প।

[ক্রমশঃ



দিব্য বাণী

যথাপি রুচিরং পুষ্পং বর্ণবন্ত অগন্ধকম্।
সুভাষিতাঽফলা চৈবং ভবতি বাগকুর্বতঃ ॥
যথাপি রুচিরং পুষ্পং বর্ণবন্ত সগন্ধকম্।
সুভাষিতা চ বাগেবং কুর্বতঃ সফলা ভবেৎ ॥
অল্পমাত্রশ্চ গন্ধোঽয়ং তাগরশ্চন্দনশ্চ যঃ।
শীলবতাঞ্চ যো গন্ধো দেবেষু বাতি চোত্তমঃ।

—বুদ্ধদেব (ধর্মপদম্)

হোক না মনোহর বর্ণে সুন্দর,
গন্ধহীন ফুল সদা যে আনাদৃত!
কাজে না করি, কথা শুধু যে বলে সদা
সে কথা নিষ্ফল, হোক না সুভাষিত।
(তার সে উপদেশ পশে না মরমেতে,
নিজেও ফল তার পায় না জীবনেতে।)

গন্ধে মনোহর, বর্ণে সুন্দর
পুষ্প সমাদৃত হয় যে সব ঠাঁই;
আপনি আচরিয়া সু-কথা ছড়াইয়া
দেয় যে, ফল তার সে-কথা দেয় তাই।
টগর চন্দন সুবাসে ভরে মন;
কতটা দূরে আর গন্ধ যায় তার?
শীলতা আচরণ করে যে, তার মন
সুবাস বিতরে যা তুলনা নাই তার।
তাহার ভাবরাশি ভূলোক ভরে দিয়ে
ছোটে যে অসীমেতে দ্যুলোক পরশিয়ে।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রদ্ধানিবেদন-প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধের শেষ কথা

অম্বপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে আহার করিবার অল্প কয়েকদিন পরেই তথাগত বুদ্ধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। বুঝিলেন এই রোগেই তাঁহার দেহত্যাগ হইবে। কিন্তু নিজ শক্তিবলে তিনি তাহা হইতে দিলেন না। ভিক্ষুগণকে তিনি বর্ষাকাল অন্যত্র কাটাইতে আদেশ দিয়াছেন। বর্ষান্তে তাঁহারা তথাগতের নিকট ফিরিয়া আসিবার পর, তাঁহাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহার উত্তর দিয়া তাঁহার শেষ আদেশ জানাইয়া তবে দেহত্যাগ করিবেন।

অম্বপালী বারবনিতা ছিলেন। তাঁহাকে বুদ্ধ কৃপা করিলেন দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অবতারগণের বৈশিষ্ট্য তো এখানেই। যাহাদের আমরা হীন অধম, পতিত বলিয়া দূরে রাখি, অবতারগণ তাহাদেরও কৃপা করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা হইতে একটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন—ভারতে সে-সময় একজন অবতার আসার সময় হইয়াছে। এই সত্য তাঁহার চিত্তে এত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে, তৎকালে ধর্মবীর বলিয়া খ্যাত প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনকথা তিনি যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। দেখিয়া তাঁহার ধারণা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণই সেই অবতার। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আরো দু-একটি তথ্য তাঁহার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহার বিষয় জানেন, এ বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারেন, এমন এক ব্যক্তির অপেক্ষায় ছিলেন তিনি (তখনো স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই)। এমন একজনের সঙ্গে দেখাও হইল একদিন; তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি পূর্বে শ্রদ্ধাবান্ থাকিলেও তখন কোন কারণে একটু বিরূপ ছিলেন। ম্যাকসমূলার তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাই বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কিছু উঁচুদরের লোক ছিলেন না, কথা বলিতেন গ্রাম্য ভাষায়, বেশ্যা, মাতাল, ইহাদেরও প্রশ্রয় দিতেন। শুনিয়া ম্যাকসমূলার লাফাইয়া উঠিলেন—এই তথ্যটিই তো খুঁজিতেছিলাম, এইটিই তো অবতারের বৈশিষ্ট্য—পতিত, অধমকেও উদ্ধার করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনা দেখিয়া এবং তাঁহার কথা হইতেও একথা জানা যায় যে, করুণায় বিগলিত হইয়া এইসব ব্যক্তির সব পাপের ফল অবতারগণ নিজেরাই ভোগ করিয়া যান। অম্বপালীকে কৃপা করার স্বল্পকাল মধ্যেই ভগবান বুদ্ধের এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়াও এই কথাই মনে জাগাইয়া তোলে।

তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত কারণ অবশ্য কর্মকার চুন্দের গৃহে ভিক্ষারূপে অন্নসহ শূকরমাংসের ব্যঞ্জন গ্রহণ। কিন্তু তাহার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে একথা বলিয়াছিলেন। এজন্য ভিক্ষুগণকে তাঁহার নিকট আনাইতেও বলিয়াছিলেন।

মহানির্বাণলাভের দিন কুশীনগরের নিকটস্থ একটি বনে দুটি শালবৃক্ষের মাঝখানে বুদ্ধ

শেষ শয্যা রচনার কথা বলিলেন আনন্দকে— একখানি বস্ত্র দুই-ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিবেন তাহাও বলিলেন।

শেষ সময়ে তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্ত অবতার আচার্যাদিগণের, মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের তাহাই চরম কথা।

স্বাভাবিক কারণেই ভিক্ষুগণ ও আনন্দের হৃদয়ে বিষাদের ঝড় উঠিয়াছিল—তথাগত চলিয়া যাইতেছেন, কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিব? সংঘের কি হইবে? আনন্দ সে কথা বলিয়াই ফেলিলেন, বারবার অনুরোধ করিলেন তথাগতকে আরো কিছুকাল দেহধারণ করিয়া থাকিবার জন্য বুদ্ধদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আত্মবিশ্বাস অবলম্বন করিয়া সত্য-দীপের আলোকে পথ দেখিয়া চলিবে, বাহির হইতে কোন সাহায্যের উপর কখনো নির্ভর করিও না; ইহা যতদিন করিতে পারিবে, আমি না থাকিলেও কোন ভয় নাই।'

আনন্দের মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি যেন তথাগতের পূজায়—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে নিরত তখন। যে শালবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব শয়ান, তাহার শাখাশীর্ষগুলি তখন নবপ্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকে সজ্জিত;—আনন্দের মনে হইল, তথাগতের পূজার জন্য প্রকৃতি যেন এভাবে ফুলের তোড়া নিবেদন করিতেছে। দু-একটি ফুল ঝরিয়াও পড়িতেছে তাঁহার চরণে। দিব্য সঙ্গীতের ধ্বনিও শুনিলেন আনন্দ। আনন্দ বলিয়াই ফেলিলেন, 'তথাগত! আপনি চলিয়া যাইতেছেন, দেবগণ এবং প্রকৃতিদেবী তাই আপনার পূজা করিতেছেন।'

বুদ্ধদেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আনন্দ! এভাবে তথাগতের পূজা—তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না; তথাগতের কথামতো যে জীবনগঠন করে, সেই-ই তথাগতের প্রতি ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে।'

একথা তিনি পূর্বেও বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করার প্রসঙ্গে। বলিয়াছিলেন, 'প্রণাম করিলেই শ্রদ্ধা জানানো হয় না, তথাগতের কথামতো জীবনযাপনই তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।'

মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনকালে তাঁহাদের প্রণাম করার, বিভিন্নাকার পূজা করার প্রয়োজন অবশ্য আছে; যে-কোন আকারেই হউক, বাহ্যানুষ্ঠান ছাড়া সাধারণ মানুষের চলে না। কিন্তু সে শ্রদ্ধানিবেদন যদি ঐ খানেই শেষ হয়, আমরা যেন না ভুলি, তাহার মূল্য কিছুই নাই। ঐ সঙ্গে থাকা চাই আসল শ্রদ্ধানিবেদন, তাঁহাদের কথামতো জীবনগঠন করা, আত্মবিশ্বাস অবলম্বনে সত্যের আলোকে পথ দেখিয়া চলা, যাহা ভগবান বুদ্ধের শেষ কথা।

রাজা রামমোহন রায়

ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত, 'নিঃস্বার্থকর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত' রামমোহন রায় যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পরাধীন ভারতের উপর রাজশক্তির রথে আসীন একটি বিদেশী ধর্ম ও সভ্যতার সুদীর্ঘকালের প্রভাব সবে শেষ হইয়া রাজশক্তির চাকচিক্যমণ্ডিত আর একটি সভ্যতা ও ধর্মের, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খৃষ্টধর্মের প্রভাব সবে বিস্তৃত হইতে শুরু হইয়াছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকের 'মানদণ্ড' 'রাজদণ্ডরূপে' দেখা দিলেও পরিবর্তনকালের ডামাডোল কাটাইয়া তাহার প্রভাব সুপ্র 'ত করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল;

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন এবং গভর্নর জেনারেলরূপে ওয়ারেন হেস্টিংসের আগমন ইহার সুপ্রতিষ্ঠাকালের সূচক—একথা বোধ হয় বলা চলে। আর ঘটনার অদ্ভুত যোগাযোগ—বিদেশী সভ্যতা ও ধর্মের এই দ্বিতীয় প্রভাবের, যাহা নিজের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের তৎকালীন নাস্তিক ভাব ও বৈজ্ঞানিক চিন্তারাশি আনিয়া বিপুল-শক্তিময় প্লাবনে শতাব্দীকালের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মকে বিলুপ্তপ্রায় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য ভারতের যে নিজস্ব আস্তিক্য-ভাবদীপ্ত, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্‌, উদার, আধুনিক যুগের সর্ববিধ চিন্তার সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষক ভাবরাশির প্রয়োজন ছিল তাহারও আধার আবির্ভূত হয় ঠিক এই সময়েই—১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসের বিস্ময় তিনি—সেই যুগে, সেই পরিবেশে, একাধারে তাঁহার মধ্যে এত বিভিন্নক্ষেত্রপ্রসারী কর্মের ও বিভিন্নমুখী আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়াছিল—বর্তমান আধুনিক উন্নত ভারতের অনেকগুলি মূল চিন্তাই যে চিন্তার পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করার সময় হইতেই রাজা রামমোহনের ধর্মসংস্কারপ্রচেষ্টা, যাহাকে তিনি সব সংস্কার-প্রচেষ্টার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তব রূপ ধারণ করিতে থাকিলেও ইহার প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার রচনা প্রকাশের মাধ্যমে; আর মানসিক ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই—যৌবনের প্রারম্ভেই সাকারোপাসনা ও বহু সামাজিক অনিষ্টকর প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায়। ভারতীয় জাতির মর্মবাণী যে ধর্ম, এবং তাহারও মূল যে বেদান্তের সু-উচ্চ সর্বজনীন উদার ভাবরাশির মধ্যে নিহিত, ইহা তিনি সঠিক-ভাবেই ধরিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বেদান্তের এই চিন্তাগুলির সহিত সাধারণ মানুষের অ-পরিচিতিই তৎকালীন ধর্মসাধনার ও সর্ববিধ নৈতিক ও সামাজিক সংকীর্ণতা ও অবনতির কারণ। শুধু তাহাই নয়, হিন্দুধর্মের সব শাস্ত্র তো বটেই, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির ধর্মেরও শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া যুক্তির আলোকে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সব ধর্মেই ঈশ্বরের একত্বের কথা আছে এবং পৃথিবীর সব দেশের মানুষই যে-কোন আকারেই হউক, ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী। এই বিপুলবিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে তিনি এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছিলেন যে, সারা পৃথিবীর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌ মানুষ যে ধর্ম চায়, তাহা বেদান্তেই আছে। বেদান্তকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কার-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, ইহার দ্বারাই ভারতীয় জাতির মধ্যে তৎকালে পুঞ্জীভূত সব সঙ্কীর্ণতা, সব মূঢ়তা বিদূরিত হইবে। এমনকি, ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে সংহতির প্রয়োজন, তাহাও এভাবে বেদান্তের ভাব-প্রচারের মাধ্যমে আসিবে; পৃথিবীর সব মানুষকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিতেও ইহা সমর্থ।

রামমোহন রায় হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, নিত্য নিয়মিতভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতেন,

কৈশোরে নিত্য ভাগবতপাঠ ও যৌবনে তন্ত্র-সাধনাও করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। অশিক্ষিত ও অবুদ্ধিমান্ মানুষের জন্য সাকারোপাসনার প্রয়োজনীয়তা আছে, একথাও তিনি মানিতেন। তথাপি তাঁহার সাকারোপাসনার বিরুদ্ধাচরণের কারণ বোধ হয়, এই সাকারোপাসনা ও তৎসংশ্লিষ্ট কুসংস্কাররাশিই তৎকালীন সর্ববিধ নৈতিক ও সামাজিক অবনতির মূল বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সাকারোপাসনার প্রতি এ বিরূপতা শৈশবেই তাঁহার মধ্যে প্রকট হয় এবং এজন্য মাতাপিতার রোষভাজনও হন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁহার বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার অন্য একটি গুরুতর প্রয়োজনও তাঁহার জীবিতকালে কিছুটা এবং পরবর্তীকালে বিশেষভাবে সিদ্ধ করিয়াছিল ;—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আত্মীয়সভা ও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়) একদল শিক্ষিত ব্যক্তিকে, বিশেষ করিয়া বাংলার খৃষ্টধর্ম ও -সভ্যতা গ্রহণ করা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রধানতঃ বাংলাদেশেই ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইলেও এবং ঐ ধর্মানুরাগীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও সময় এবং পরিবেশের দিক দিয়া বিচার করিলে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতাকে খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবনে ভাসিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করার কাজে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের দান অতুলনীয়। ভারতের ইতিহাস চিরদিন ইহা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিবে।

বেদান্তের চরম কথা যে ব্রাহ্মধর্মে উপাসিত সগুণ নিরাকার ব্রহ্ম নয়, নির্গুণ নিরাকার বাক্যমনাতীত, নামরূপাতীত অদ্বয় সত্তা, রামমোহন তাহা জানিতেন, সে কথা বলিয়াছেনও। তাঁহার সঙ্গীতেও বহুস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। 'অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত তিনগুণে', 'বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি', ইত্যাদি। সর্বসাধারণের মধ্যে বেদান্তের সত্য ছড়াইয়া দিবার জন্য তিনি অনেকগুলি উপনিষদের অনুবাদকালে আচার্য শঙ্করের 'আত্মানাত্মবিবেক'-ও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই নির্গুণ নিরাকার অদ্বয় সত্তার তো উপাসনা হয় না, মনের ধারণার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোন রূপ বা গুণ সেখানে নাই বলিয়া তাঁহাকে চিন্তাও করা যায় না। উপাসনার জন্য, চিন্তার জন্য, প্রার্থনা জানাইবার জন্য ভগবানের সাকার না হইলেও সগুণ সত্তার প্রয়োজন—যাঁহাকে জগতের স্রষ্টা, পালক প্রভৃতি ভাবা যায়। আবার অশিক্ষিত অবুদ্ধিমান মানুষের জন্য কেবল সগুণ নয়, সাকার উপাসনারও যে প্রয়োজন আছে, তাহাও তিনি জানিতেন ; এইজন্যই কয়েকটি পুরাণ ও তন্ত্রকে বিশেষ করিয়া মহানির্বাণ তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কারণ, এই সব শাস্ত্রে সাধারণ মানুষের জন্য সাকারোপাসনা ও অনুষ্ঠানের কথা থাকিলেও এগুলির উদ্দেশ্য এসবের মাধ্যমে মানুষকে বেদান্তোক্ত চরম সত্যের দিকেই লইয়া যাওয়া। মনে হয় সাকার-উপাসনা-সম্পর্কিত কুফলের হাত হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই উহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া তিনি বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ (খৃষ্ট-ও মুসলমান-ধর্মোক্ত একেশ্বরবাদের অনুরূপ), সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের ভিতর ধর্মের নামে আগত দোষগুলির বিরুদ্ধেই নয়, রামমোহন মুসলমানধর্ম ও খৃষ্টানধর্মের ত্রিত্ববাদের ভিতরকার সমজাতীয় দোষগুলিরও তীব্র

সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিছুদিন খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের প্রচারে উইলিয়ম এ্যাডামকে সহায়তাও করিয়াছিলেন। প্রথমটি করিয়াছিলেন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার পার্শী ভাষায় রচিত 'তুহ্ফৎ-উল-মুওয়াহিদ্দিন' গ্রন্থের মাধ্যমে ; দ্বিতীয়টি আরম্ভ হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে।

ভারতকে কেবল বিদেশী সভ্যতা ও ধর্মের প্রভাব হইতে রক্ষা করার জন্য নয়, কেবল তাহাকে সামাজিক ও নৈতিক অবনতি হইতে তুলিয়া আনার জন্য নয়, ভারতকে সর্ববিষয়ে আধুনিকভাবাপন্ন হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করাইবার জন্যই তিনি বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজীবন কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভারত যাহাতে বেদান্তের মূল ভাবকে আশ্রয় করিয়া, জাতীয় নিজস্বতাকে বজায় রাখিয়াই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ সজাগ ছিলেন। ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার মূল উদ্দেশ্য ইহাই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও তিনি সফল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পথে অগ্রসর করানোও তাঁহার ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ডক্টর টুকারম্যানকে এক পত্রে (১৮ই জানুআরি, ১৮২৪) তিনি লিখিয়াছিলেন, "পরিতাপের বিষয়, হিন্দুরা বর্তমানে যে ধর্ম-পদ্ধতিকে আঁকড়ে আছে, রাজনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির পথে তাদের অগ্রসর করাতে তা সুপরিকল্পিত নয়। জাতিভেদপ্রথা তাদের অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করেছে, ভাগের পর ভাগ করেছে; যার ফলে তাদের ভেতর থেকে দেশপ্রেমের ভাবই লুপ্ত হয়েছে। হাজার রকমের ধর্মীয় কৃত্য-অনুষ্ঠানাদির বন্ধনে প'ড়ে বড় রকমের কোন কাজ করার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে তারা ;···আমি মনে করি, অন্ততঃ তাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই তাদের ধর্মে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

মোট কথা, ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে যাহা কিছু বাধা বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা সরাইয়া ফেলিবার জন্য, এবং যাহা কিছু কল্যাণকর বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা প্রবর্তনের জন্য রাজা রামমোহন রায় নির্ভীকভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে আজীবন কাজ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য নিজ আত্মীয়স্বজন ও বাহিরের বহুজনের কাছ হইতে বহু বিরূপতা, বহু আঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে ; তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তর্ক ও নিন্দার ঝড় তুলিয়াছিলেন হিন্দু ও খৃষ্টানাদি ধর্মের বহু পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যুক্তির নিকট কেহই দাঁড়াইতে পারেন নাই। এই নিঃস্বার্থ কর্মযোগী পরমসত্তার তুষ্টিবিধানের জন্য, তাঁহার মুখ চাহিয়াই কাজ করিয়া গিয়াছেন, মানুষের মুখের দিকে কখনো চাহেন নাই: "আন্তরিক সত্যান্বেষণের প্রেরণায় ও বিবেকের নির্দেশে আমি যে পন্থা অনুসরণ করছি, লোকে যাই বলুক, সেই পরমসত্তার কাছে আমার সব উদ্দেশ্যই স্বীকৃতি পাবে, এই সান্ত্বনা।" স্বামী বিবেকানন্দ নিঃস্বার্থ সেবার প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "গোলাপ যেমন নিজের স্বভাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছে বলে সে মোটেই টের পায় না, তুমিও সেইভাবে দিয়ে যাও। সেই মহান হিন্দুসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটাই ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন।···তিনি নামযশ একদম

চাইতেন না, নিজের জন্ম কোন ফলাকাঙ্খা করতেন না।" //

সুদীর্ঘ সহস্রবৎসরের অমানিশার অবসানে ভারতের ভাগ্যাকাশ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে যে সুপ্রভাতের বিপুল আলোর প্লাবনে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রভাতী শুকতারার মতো উদিত হইয়া নবযুগের সে সুপ্রভাতের সূচনা করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত, আধুনিক যুগের পথিকৃৎ সেই বিশ্বকল্যাণকামীকে তাঁহার দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কবিগুরুর ভাষাতেই মানবিকতার জয়যাত্রার পথে প্রেরণা চাহিতেছি:

"দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।"

শ্রীজগন্নাথস্তোত্র

শ্রীচৈতন্য

[অনুবাদক: শ্রীযশোদাকান্ত রায়]

যমুনাতটের বনভূমি যাঁর
সংগীতরবে চিরমুখর,
গোপরমণীর বদনকমলে
পীযূষপিয়াসী সেই ভ্রমর,
ব্রহ্মা-মহেশ-ইন্দ্র-গণেশ-
লক্ষ্মী-পূজিত চরণ, স্বামী,
হে জগন্নাথ, কৃপা করে হও
আমার নয়নপথগামী।

বাম করে শোভে বংশী যাঁহার
শিখিপাখা শোভে চূড়ার 'পরে,
পীতবাস যাঁর কটিতট ঘিরে
চোখে কটাক্ষ বিলাস করে,
বৃন্দাবনের মধুর লীলায়
পরিচয় যার নিত্য পাই,
হে জগন্নাথ, হে হৃদয়নাথ
নয়ন সমুখে থাকো সদাই।

সাগরবেলায় কনক-আভায়
শোভমান নীলশৈলশিরে
বসতি যাঁহার প্রাসাদ-উপম
অতি সুশোভন শ্রীমন্দিরে,
মাঝে সুভদ্রা পাশে বলরাম,
দেবগণ যাঁর পূজে চরণ,
জগতের স্বামী, এই যাচি আমি
দেখা দাও মোরে দীন-শরণ।

করুণারসের পারাবার যিনি
শ্যামল সজল জলদ সম
রমা ও বাণীর আনন্দনিধি
আনন বিকচ কমলোপম,
দেবতাগণের যিনি আরাধ্য
বেদ বেদান্ত বন্দে যাকে
জগন্নাথ স্বামী, অতি দীন আমি
এসো এসো মোর আঁখির আগে।

সাগরোদ্ভবা লক্ষ্মী সঙ্গে
ভ্রমিছেন যিনি দিব্য রথে
ভূদেববৃন্দ-বন্দিত যিনি
গীতমুখরিত গমন-পথে,
পদে পদে যাঁর করুণাপাথার
উথলিয়া উঠে আশীর্বাদ
জগদ্বন্ধু হে জগন্নাথ,
দেখা দিয়ে মোর পূরাও সাধ।

প্রজাপতি যাঁরে ধরেছেন শিরে
অমূল্য শিরোভূষণ মানি
কমল নয়ন নীলাচলবাসী
নাগশিরে ধৃত চরণখানি
প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়া রাধায়
যিনি আনন্দরসে বিভোর
জগন্নাথ স্বামী, অকিঞ্চন আমি
দাঁড়াও নয়ন সুমুখে মোর।

চাহি না রাজ্য রত্ন বিভব
মণিকাঞ্চন অতুল শোভা
চাহি না চাহি না সুন্দরী বধূ
মুগ্ধ জীবের মানসলোভা,
মহাদেব যাঁর গুণকীর্তনে
রহেন মগ্ন নিত্যকাল
জগন্নাথ স্বামী, মিনতি আমার
দেখা দাও দেখা দাও দয়াল।

নিঃসার এই সংসার তুমি
অপনীত কর হে সুরপতি
সঞ্চিত পাপসিন্ধু অপার
ঘুচাও ঘুচাও হে যদুপতি,
আর্ত জনের তুমি আশ্রয়
স্থির নিশ্চয় জেনেছি আমি
হে জগন্নাথ, কৃপা করে হও
আমার নয়নপথগামী।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

একদিন বিকালে বাবা (স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ) স্ত্রী-চরিত্র, অবতার-চরিত্র, জ্ঞান-ভক্তি, মায়া- মুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যে বিষয়গুলি ঠিক ঠিক মনে ছিল, সেই রাত্রেই সেগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয় যথা :

"স্ত্রী শরীরে সুখ-সম্ভোগ বেশী, শোক-দুঃখ বেশী, আবার ভাব-ভক্তিও বেশী ; খুব চট্ ক'রে হয়, মহামায়ারই তো মায়া। মহা-ভারতের স্ত্রী-পর্বে আছে কুরুক্ষেত্রে এসে মেয়েদের কি বিলাপ, কি করুণ কান্না !

"ভঙ্গাস্বন রাজা পুরুষ ছিল—এক ঋষির শাপে স্ত্রী-শরীর হ'ল। ছেলেপিলে হ'ল, শাপের শেষে আবার পূর্বশরীর ফিরে পেল ; কিন্তু তখন দুঃখ—স্ত্রী-শরীরের স্বামী-পুত্রকে ছেড়ে যেতে হবে ব'লে। কি ভয়ঙ্কর মায়া !

"রাজপুতানার দক্ষিণ অঞ্চলে যখন ভ্রমণ করছি, তখন একদিন কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এক শিবমন্দিরে উঠি। সেখানে একটি মারাঠী বিধবা মেয়ে মন্দিরের সেবা ক'রত। যে ক-দিন ছিলাম, একটু দেখাশুনা ক'রত। শেষ দিন তার জন্য প্রার্থনা জানাই, তার যেন সাধনার উপযোগী পুরুষ-শরীর হয়, তাতে সে আপত্তি জানিয়ে বলে—'না, এই ভাল।'

"বুদ্ধ কখনও স্ত্রী-শরীরে জন্মাননি। বোধি-সত্ত্ব সব পুরুষ। হাতি হয়ে জন্মেছেন—তা পুরুষ-হাতি।

"অবতার-পুরুষের সব লক্ষণ আছে। তাঁর শোক মোহ ভ্রম—এ সব হবে না। সর্বদা আদর্শ জীবন। কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম কেন? তাঁর কখনও শোক মোহ ভ্রম হয়নি।

"সমুদ্রে জলকেলি হচ্ছে—সব মত্ত, রুক্মিণী বলরাম সব। খেলা থেকে শেষে মারামারি হয় হয়। কৃষ্ণ দেখলেন—এখনি বুঝি যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি জল থেকে উঠে পড়লেন, তীরে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে নিজের পীতবাস ওড়াতে লাগলেন। দেখ সর্বদা সচেতন ! এদিকে বলরাম কৃষ্ণের অভাব অনুভব করছেন। কই কৃষ্ণ? কৃষ্ণ তো নেই। তাই খেলা আর ভাল লাগছে না। তিনিও উঠে পড়লেন। তারপর একে একে সব। এখানে একটা মজার কথা আছে। জলক্রীড়ার পর আহারের প্রচুর ব্যবস্থা—নানা প্রকার মদ্য ও মাংস।

"আবার দেখ কৃষ্ণ আদর্শ সংসারী। সংসারীর এক প্রধান কর্তব্য—অতিথিসৎকার, অতিথি যখন যেমন চাইবে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে, নারায়ণজ্ঞানে তাঁর সেবা করতে হবে। দুর্বাসা এসেছেন কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে, দেখতে—তিনি কেমন সংসারধর্ম করছেন ! দুর্বাসার নামেই সবাই চটা, কিন্তু জান না তো—তাঁর শাপে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যায়। এর নাম কোপরূপী কৃপা। তারপর দুর্বাসা এসে কৃষ্ণকে বলছেন, 'কি-ভাবে সেবা করবে?' কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রভু যেভাবে চান, দাস প্রস্তুত।' দুর্বাসা বললেন, 'সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ, তোমরা দু-জনে আজ আমার সেবা করবে—জল তুলে চান করাবে, উনুন ধরিয়ে রান্না ক'রে খাওয়াবে। তারপর যা যা ব'লব, সব করবে।'

কৃষ্ণ ও রুক্মিণী একে একে সব করছেন। খেতে বসিয়ে রুক্মিণী বাতাস করছেন। খাওয়ার পর মুনি-ঠাকুর বললেন, 'পা টেপো।' বিশ্রাম-শেষে বললেন, 'চল, বেড়াতে নিয়ে যাবে গাড়ি ক'রে।' গাড়ি এল। বললেন, 'ঘোড়া চাই না, তোমরা দু-জনে টানবে।' তখনও দুজনেই অনাহারে, কারণ অতিথি এখনও অতৃপ্ত। সকলে খুব চটে গেছে, কিন্তু কৃষ্ণ নির্বিকার, সহাস্য। তখনি ঘোড়া খুলে দিয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে দু-জনে গাড়ি টেনে নিয়ে চললেন, হাত-পা ছড়ে রক্ত পড়ছে। দুর্বাসা আর থাকতে পারলেন না, গাড়ি থেকে নেমে পদতলে, বললেন, 'প্রভু, বুঝেছি—কেন আপনি এত করছেন।' এই হ'ল অবতার-জীবন—জগৎকে আদর্শ দেখানো!

"রামের ভ্রম—বালি-বধ, শোক-মোহ-সীতা-বিলাপ। তাই ঠাকুর বলতেন, 'রাম বারো আনা।' কিন্তু কৃষ্ণ ষোল আনা—টং ক'রে বাজে—যেখানেই বাজাও না। অবতার-জীবনের একটু মজা আছে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে অবতার আসেন না। যেখানে বহু দিন ধরে বহু লোক দুঃখে কষ্টে জর্জরিত হয়ে অহরহ ভগবানকে ডাকছে, সরল কাতর প্রাণে জানাচ্ছে, 'প্রভু, আর এমন ক'রব না, জ্বালা-যন্ত্রণা শেষ কর, দেখা দাও'—এই ব'লে তার সমস্ত কর্মফল তাঁর চরণে সমর্পণ করছে, অথবা ধর্মগ্লানি দেখে সাধকেরা দিনরাত তাঁকে ডাকছে—'প্রভু, এস, ধর্মস্থাপন করতে!' তখনই কাল পূর্ণ হ'লে জীবের সঞ্চিত ও সমর্পিত কর্মফল ভুগবার জন্য এবং ধর্মস্থাপন করবার জন্য তিনি আসেন। জীব-উদ্ধার আর কিছুই নয়—আত্মজ্ঞান দেওয়া, সংসার-মায়ার বন্ধন কেটে দেওয়া, জন্মমৃত্যুর শেষ করা।

"জীবের কর্মফল তাঁকে ভোগ করতে হয়, তাই তো অবতার-জীবনে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এত দুঃখকষ্ট ভোগ, নইলে তাঁর নিজের তো কোন কর্ম বা কর্মফল নেই। আবার অবতারপুরুষকে যারা ভালবাসতে সাহস করবে, তাদেরও ঐরকম কিছুটা কর্মফল ভোগ করতে হয়। ভালবাসতে হ'লে দুঃখকষ্টের ভারও নিতে হবে, এই-রকম যতদূর যায়, তারপর যথাপূর্বম্।

"হাঁ, মেয়েরাই বেশী ভক্ত, তাদের খুব নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। তাদের থেকেই তো পুরুষেরা ভক্ত হয়, কতকটা দেখাদেখি, কতকটা ছোঁয়াচ লেগে। মঠের যত ভক্ত—কি দেশে, কি বিদেশে, বেশির ভাগ মেয়েরাই এনেছে। একজন—নাম ক'রব না—মঠে আসত, মোটরেই বসে থাকত কোট-প্যান্ট প'রে। স্ত্রীকে ব'লত, 'যাও, শীগগির সেরে এস।' শেষে ভক্ত হয়ে গেল।

"কমলা নেহেরু জহরলালকে লুকিয়ে লুকিয়ে জপ ক'রত, কাঁদত। দাদার (মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ) অসুখের সময় দেখা, কঠিন রোগে ভুগছে, কিন্তু মুখে কি হাসি! বলে—'বড় দুঃখ, কাঁদতে পারি না।' বললাম, 'ঠাকুরঘরে যাও, ঠাকুর আশা পূর্ণ করবেন।' চলে যাবার সময় আবার প্রণাম ক'রে গেল—দেখি চোখ দু-টি জবাফুল।"

কথাপ্রসঙ্গে বাবা একদিন বলিতে লাগিলেন, "নফর কুণ্ডুর স্মৃতিসভায় গেছি শরৎ মহারাজের সঙ্গে। শেষে কিছু বলতে হ'ল। সকলে দৃষ্টান্ত দিচ্ছে—সার ফিলিপ সিডনি, ইত্যাদি সব। এঁরা খুবই বড়, কিন্তু আমার কেমন লাগল! কেন, আমাদের দেশে কি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ নেই! দধীচির কথা বললুম। এই তুচ্ছ হাড় মাংস-

এ তো মরবেই, এ তো শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য।* এর দ্বারা যদি কারো কোন উপকার হয় তো হোক না। দেবতারাও মানুষের ত্যাগের অপেক্ষা রাখে।

"লেকচার শুনে শরৎ মহারাজ বলেন, 'ভাই, তোমার আর মুর্শিদাবাদ যাওয়া হবে না। এখানেই আমাদের অনেক কাজ হবে।' শেষে পালিয়ে আসি।

"'পরোপকার' কেন বল? পর কে? সবই আপন। ভাগবতে আছে শুধু 'উপকার', 'পরহিতব্রত' কেন? লোকহিতব্রত।"

এই সময় তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—'স্মৃতিকথায়' এক জায়গায় লেখা হইয়াছে 'পরদুঃখকাতর', তাই বলিলেন, "'পরদুঃখকাতর' কেটে দাও, লেখ 'লোকদুঃখকাতর'। পর-উপকারে কাহার উপকার?—পড়নি? —আমার নিজের। এই তো স্বামীজীর কর্মযোগ—সেবাধর্ম।"

"যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে 'শক্তু ও বেজির গল্প' প্রমাণ করছে ত্যাগ ও সেবাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের স্বার্থটা ত্যাগ, আর আত্মবুদ্ধিতে সবার সেবা, দয়া নয়। এই তো কর্মযোগ—এরই নাম সেবাধর্ম। উপায়ও যা, উদ্দেশ্যও তাই। সেবায় চিত্তশুদ্ধি, সেবায় হৃদয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন।

"আত্মজ্ঞান হ'লে তবে বিশ্বপ্রেম। আজকাল সব বিশ্বপ্রেমের ছড়াছড়ি। ঠাকুর বলতেন, 'প্রেম নয়, প্যাম্।' আত্মজ্ঞানের পর বিশ্বপ্রেম। তখন বোঝা যায়—স্বামীজীর 'ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।...জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥' জীবসেবাই শিবসেবা। জীব আর আছে কে? সবই তো শিব।"

* শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১০।৯-১০) দধীচির উক্তি :—
এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ। যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ। যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥

এক উৎস

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

আমার অন্তরে
তোমার ধর্মের বাণী প্রত্যেকটি স্তরে
নিভৃতে সঞ্চিত আছে; তাই ধমনীতে
অস্থি মজ্জা প্রশিরায় ছুটন্ত শোণিতে
অস্থির স্পন্দন তার উৎকণ্ঠিত হ'য়ে
শুনতে যে পাই; দীপ্ত সেই বাণী বয়ে
নিজেকে সার্থক মানি; তার আলো দেখে
ক্ষুদ্রতা অন্ধতা যতো দীন চিত্ত থেকে
নির্বাসে দিয়েছি আমি স্বেচ্ছায় নিঃশেষে
নিজেকে নামিয়ে পথে অবধূত-বেশে।
শাশ্বত সে ধর্ম থেকে নির্বারিত স্রোতে
অফুরন্ত প্রাণ পেয়ে সতেজ সত্তাতে
আমি আজ প্রাণবন্ত; তাই আমি কবি,
তাই আমি যোগাসীন, ধার্মিক, বিপ্লবী!

রামমোহন ঃ দ্বিশতবার্ষিকীর আলোকে

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

একাধিক অর্থে রামমোহন নবভারতের অগ্রদূত। জীবনে, মননে ও ব্যক্তিত্বে তাঁর মধ্যেই আমরা একালের মানুষকে প্রথম দেখেছি। আবার ভারতের বাণীকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেবার ব্রত যাঁরা এযুগে গ্রহণ করেছেন, সেই সংস্কৃতিদূতদের মধ্যেও তিনি প্রথমগণ্য। আধুনিক পৃথিবীর মানসচিত্রে তিনি যেমন ভারতবাসী তেমনি বিশ্বমানব।

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে আমরা যে গৌরব দিয়ে থাকি, সে তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীকে অন্ধকারাচ্ছন্নরূপে দেখাই প্রচলিত অভ্যাস। অন্ধকারের পটভূমিতেই আলোকের অভ্যুদয় স্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবু মনে রাখতে হবে অন্ধকারেই নিহিত থাকে নূতন দিনের সম্ভাবনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যতই ভাঙচুর দেখা দিক, মনে রাখতে হবে, এই শতাব্দীরই সাধক কবি রামপ্রসাদ বা কমলাকান্ত, বিস্ময়কর প্রতিভা ভারতচন্দ্র, আর রামমোহনের যৌবন-কাল অবধি জীবন- চেতনার ধাত্রীও এই অষ্টাদশ শতাব্দী।

মোগল সভ্যতার উত্তরাধিকার রাম-মোহনকে যে আভিজাত্য দিয়েছে, তাঁর পোষাকে, ব্যবহারে, ভাষাশিক্ষায় ও জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বজনের সঙ্গে হৃদয়-সম্বন্ধ-স্থাপনে যে মার্জিত রুচি সঞ্চার করেছে, সমকালীন ইংরেজতনয়েরা যে তার চেয়ে বেশী সভ্যতার অধিকারী ছিলেন, তা মনে করার কারণ নেই। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণ্য-উত্তরাধিকারের ফলে ভারতীয় সাধনার অন্তর্মুখী প্রবণতা ও সর্বকর্মের অন্তরালে পরম সত্যের অভিমুখী অবিরাম প্রচেষ্টাও তাঁর স্বাভাবিক মনোধর্ম ছিল। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে ইংরেজ ও ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার যখন তাঁর কাছে উন্মুক্ত হ'লো তখন ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক জীবনদর্শনের সঙ্গেও তিনি অনায়াসে যুক্ত হতে পেরেছেন। মননশক্তির যে বিপুল ধারণী-শক্তিতে একটি জাতির মানসভিত্তি স্থাপিত হয় তাঁর একক ব্যক্তিত্বেই সেই শক্তি অনেক পরিমাণে নিহিত ছিল।

পুরুষানুক্রমে রামমোহনের পিতৃপিতামহেরা বিষয়কর্মে নিপুণ প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রায়রায়ান' উপাধি পেয়েছিলেন বাংলার তদানীন্তন মুসলমান রাজদরবারে। আপন আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পত্রে রামমোহন তাঁর পিতৃপুরুষদের বিষয়াসক্তি-প্রসঙ্গেই মাতৃকুলের ধর্মপরায়ণতার কথাও উল্লেখ করেছেন। সাংসারিক সমুন্নতির বাসনা ত্যাগ করে তাঁর মাতৃকুল যে ধর্মীয় প্রশান্তির আদর্শকেই বরণ করেছিলেন, সেজন্য রাম-মোহনের পরিতৃপ্তিও এ পত্রে[১] লক্ষণীয়। বাংলার সমাজজীবনে বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার

১ S. D. Collet: The Life and Letters of Raja Rammohan Ray: pp 496-497: Third Edn. 1962. পত্রটি ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে যাবার কিছুদিন আগে রামমোহন কলিকাতায় তাঁর বন্ধু মিঃ গর্ডনকে লেখেন বলে অনুমিত।

দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত। রামমোহনের পিতৃকুল বৈষ্ণব, মাতৃকুল শাক্ত। পিতা রামলোচন রায় এবং মাতা তারিণী দেবী—এ দু'জনের মধ্যে মায়ের সঙ্গেই রামমোহনের চরিত্রের সবচেয়ে মিল এবং বিরোধ। প্রথম শৈশবে বিষ্ণুভক্ত রামমোহন নাকি প্রতিদিন ভাগবতের একটি অধ্যায় শেষ না করে জলগ্রহণ করতেন না। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের (পরবর্তী কালে হরিহরানন্দ অবধূত) সঙ্গে পরিচয়ের ফলে শক্তিপ্রভাব তাঁর জীবনে দেখা দেয়। এর মধ্যে সেকালের রীতি-অনুসারে আরবী-ফারসীতে পাঠগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। নন্দকুমারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সংস্কৃতচর্চায় এবং তন্ত্রশাস্ত্রে রামমোহনের প্রবণতার সূচনা। সেকালের রীতি-অনুসারে এরই মধ্যে রামমোহনের তিনটি বিবাহ সম্পন্ন। প্রথমা পত্নীর অকাল-বিয়োগের পরে তাঁর যখন ন'বছর বয়স, তখনই পিতার উদ্যোগে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর দু'বার বিয়ে হয়। পরবর্তী জীবনে এই দুই পত্নীর কথা তাঁর জীবনীগুলিতে খুব কমই আলোচিত।

পনেরো বছর বয়সের সময় রামমোহন একবার উত্তর তিব্বত অঞ্চলে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ধর্মজিজ্ঞাসা। হয়তো তরুণ বয়সেই পিতার সঙ্গে মতামতের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকার ফলে এ যাত্রা। তবু, পরবর্তী কালে অনেক দিন তিনি বৈষয়িক ক্ষেত্রে পিতার সহযোগীই ছিলেন। মতামতের স্বাতন্ত্র্য মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করলেও তখন অবধি স্থায়ী মনান্তর ঘটেনি।

আরবী পড়তে রামমোহন পাটনায় গিয়েছিলেন এবং সংস্কৃত পড়েছিলেন কাশীতে—একথাটি আজকাল কেউ কেউ স্বীকার করেন না। কিন্তু যেখানেই পড়ে থাকুন সংস্কৃতচর্চা তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মতোই করেছিলেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের বিস্তার ও শাস্ত্রীয় বিতর্কে পারঙ্গমতায় তা প্রমাণিত। তাছাড়া আরবী ফারসীতে রীতিমতো দখল সেকালের মুসলমান রাজদরবারের প্রয়োজনেই ভালোভাবে হয়েছিল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ অবধি ধীরে ধীরে রামমোহনের আর্থিক সৌভাগ্য যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি তার বাবা ও দাদার দুর্দশা দেখা দিতে থাকে। এর বছর চারেক আগে পিতৃসম্পত্তি ভাগ হবার সময় রামমোহন পিতার কলকাতার বাড়িটি পেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁর কলকাতায় স্থায়িভাবে আসার সূত্রপাত। সেকালে বাঙালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের পক্ষে আর্থিক উন্নতির যে সব পন্থা ছিল—রামমোহন বিচক্ষণতার সঙ্গে তার সব কয়টিই গ্রহণ করেছিলেন। পৈতৃক ও নিজ-উপার্জিত ভূসম্পত্তির আয়, বিদেশীদের ঋণদান করে তার সুদ আদায়, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরি—ইত্যাদি নানা পন্থায় রামমোহন বছর দশেকের মধ্যেই যা সঞ্চয় করেছিলেন, তার দ্বারা ১৮১৫ থেকে কলকাতায় স্থায়িভাবে এবং রীতিমতো জাঁকজমকের সঙ্গেই তিনি বাস করতে পেরেছিলেন। এতো অল্প সময়ে অর্থোপার্জনে তাঁর দক্ষতাকে কেউ কেউ সন্দেহের চোখে দেখলেও, মোটের উপর রামমোহনের প্রখর বিষয়বুদ্ধির স্বীকৃতি সকলেই দিয়েছেন। এই অর্থ-সঞ্চয়ের ভিত্তিতেই তাঁর পরবর্তী জীবনের বহুমুখী কর্মসাধনা সম্ভবপর হয়েছিল।

কর্মসূত্রে কালেক্টর জন ডিগ্‌বীর অধীনে কাজ করার (১৮০৫—১৮১৪) সময়েই রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে।

আবার এই কাজে তিনি যখন রংপুরে ছিলেন, তখন হরিহরানন্দ স্বামীও এসে সেখানে মিলিত হন। রামমোহন সেসময় ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতচর্চাও বিশেষভাবে করেন। ডিগ্‌বী ছুটি নিয়ে স্বদেশযাত্রা করার পর রামমোহন কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীতে একটি এবং মানিকতলায় আর একটি বাড়ি কিনেছিলেন। কলকাতার ধনী, বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে এই সময় থেকেই তিনি বাংলার সংস্কৃতি-জগতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে এই সময়ের মধ্যে দু'-একটি ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে। ঋণের দায়ে সেকালের আইন অনুসারে তাঁর বাবা ও দাদা দু'জনেই জেলে গিয়েছিলেন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রামমোহন তাঁদের এই দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করার বিশেষ কোনো চেষ্টাই করেননি। এর কারণ হয়তো তাঁর ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পারিবারিক মতভেদ। কিন্তু মতভেদ যত বড়োই হউক, আপনজনের এত বড়ো দুর্গতিতে নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা এর দ্বারা হয় না। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মায়ের সঙ্গে বিরোধ হয়তো এই কারণেই তীব্রতর হয়েছিল। ১৮০৩-এ রামমোহনের পিতৃবিয়োগ এবং ১৮১২-তে বড়ো ভাই জগমোহনের মৃত্যু ঘটে।

আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পত্রে রামমোহন তাঁর প্রথম বয়সে পৌত্তলিকতাবিরোধী যে রচনাটির উল্লেখ করেছেন সেটি মুদ্রিত হয়নি। মুদ্রিত রচনাবলীর মধ্যে তাঁর প্রথম রচনা ফারসী ভাষায় রচিত "তুহ্‌ফাহ্‌তউল মুওয়াহ্‌হিদীন" (১৮০৩-৪)। প্রথম জীবনে প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাসী হ'লেও ইসলামী মতবাদের প্রভাবে তাঁর চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তার প্রমাণ এই প্রথম গ্রন্থে ভালোভাবেই মেলে। এ বইয়ের আরবীতে লেখা ভূমিকার ইংরেজী অনুবাদ থেকে কিছুটা অংশ—"I travelled in the remotest parts of the world, in plains as well as in hilly lands, and found the inhabitants thereof agreeing generally in believing in the personality of One Being, who is the source of all that exists and its governor, and disagreeing in giving peculiar attributes to that Being and in holding different creeds consisting of the doctrines of religion and precepts of haram (forbidden) and halal (lawful). From this induction it has been known to me that turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human beings and is common to all individuals of mankind equally."—"পৃথিবীর নানা প্রত্যন্তদেশে—সমতল ও পার্বত্য ভূমিতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি সে-সব দেশের মানুষেরা এক পরমসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী—যে পরমসত্তা যা কিছু অস্তিত্ববান তারই উৎসরূপ এবং নিয়ন্তা। এই পরমসত্তায় বিভিন্ন গুণ আরোপ করা নিয়ে, ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে এবং কোন্‌টা শাস্ত্রীয় (হালাল) আর কোন্‌টা অশাস্ত্রীয় (হারাম)—এই নিয়ে যা কিছু মতভেদ। আরোহপদ্ধতিতে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এক অনন্ত সত্তার প্রতি অনুরাগ মানবমানসের স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং মানবজাতির প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই তা সমানভাবে প্রকাশিত।"

তুহ্‌ফাতউল মুওয়াহ্‌হিদীন বা "একেশ্বর-

বাদীদের প্রতি উপহার"-গ্রন্থে রামমোহন যে নিরাকার অথচ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করেছেন, তা সর্বপ্রকার অলৌকিক প্রকাশের বিরোধী ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে কোনো বিশেষ প্রেরিত দূত-কল্পনার অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, প্রত্যক্ষ বিশ্ববিধানের মধ্যেই পরমসত্যের প্রকাশ সম্বন্ধে নিঃসংশয়। ইসলামের মোতাজেলা (সম্প্রদায়ত্যাগী এবং মোয়াহ্‌হেদী (ঈশ্বরের একত্ববাদী) সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাই এ সময়ে রামমোহনের পক্ষে প্রধান অবলম্বন ছিল। পরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী ইংরেজ দার্শনিকদের সঙ্গে রামমোহনের গভীরতর পরিচয় ঘটে। ফলে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের মতবাদ প্রসারিত হয়ে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান--এই তিনটি ধর্মমতের ক্ষেত্রেই একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে এক বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের সূচনা করে।

একেশ্বরবাদের আদর্শে রামমোহনের ক্রম-উত্তরণে পারিবারিক দিক থেকে তিনি যে নানাভাবে বাধা পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁর রচনাবলী ও চিঠিপত্রের নানা জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পত্রে রামমোহন স্পষ্টতঃই লিখেছেন যে, ষোল বৎসর বয়সে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি বই (পাণ্ডুলিপি) লেখার ফলে তিনি নিকট আত্মীয়জনদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এই সময়ই তিনি ভারতে এবং ভারতের বাইরেও কোনো কোনো দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই পত্রে অবশ্য তাঁর এ-জাতীয় ভ্রমণের অন্যতম কারণ হিসাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরক্তির কথাও বলা হয়েছে।* সব মিলিয়ে রামমোহনের ধর্মীয় মতবাদের স্বাতন্ত্র্য যে তরুণ বয়স থেকেই সূচিত—একথাটি মোটামুটিভাবে স্বীকার করা চলে।

কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের পরে রামমোহন তাঁর ধর্মপ্রত্যয়ের প্রেরণাতেই 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (দুটিই ১৮১৫-তে প্রকাশিত) বই দুইটি প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ Translation of an Abridgement of Vedant or The Resolution of All the Veds (১৮১৬)-গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন তাঁর বেদান্ত-প্রচারের উদ্দেশ্যের কথা বিবৃত করে লিখেছেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্য এতকাল সংস্কৃতের আবরণে ঢাকা ছিল। ফলে প্রচলিত দেশাচার ও সংস্কারই ধর্মের স্থানে এতকাল পূজো পেয়ে এসেছে। বাংলা ও হিন্দুস্থানীতে তাই তিনি বেদান্তগ্রন্থ ও বেদান্তসারের অনুবাদ করে বিনামূল্যে প্রচার করেছিলেন। সমকালীন অনেক য়ুরোপীয় মনীষীর ধারণা ছিল যে, বহুদেবতার উপাসক হ'লেও হিন্দুরা মূলতঃ এক ব্রহ্মের পূজারী। রামমোহন এ ধারণার প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে, অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই সেকথা জানে। বহিরঙ্গ পূজা, আচার-বিচার, দেবতাদের প্রতি ভয় ও ভক্তিই তাদের জীবনের নিয়ামক। পৌত্তলিকতাকেই রামমোহন হিন্দুসমাজের অধঃপতনের জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী করেছেন। বেদান্ত-প্রচারের দ্বারা দেশবাসীর অন্তরে ধর্মের

✓

* Collet : Raja Rammohan Ray : p 497

সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে ধারণালাভে সহায়তা হবে—এটিই তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য।*

সবশেষে তাঁর মন্তব্য—"By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system. But these, however accumulated, I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive when my humble endeavours will be viewed with justice—perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation: my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly!"

"আন্তরিক সত্যান্বেষণের প্রেরণায় ও বিবেকের নির্দেশে আমি যে পন্থা অনুসরণ করেছি, তার ফলে ব্রাহ্মণবংশে জাত আমাকে নিকট আত্মীয়দের অনুযোগ ও অভিযোগের পাত্র হতে হয়েছে। মতামতের ক্ষেত্রে এঁদের পক্ষপাত অতি তীব্র এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার কল্যাণে এঁদের সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেশী। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এ সবই আমি এই ভেবে শান্তচিত্তে বহন করবো যে, হয়তো একদিন আমার এই প্রচেষ্টা সুবিচার পাবে, এমন কি কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকৃত হ'বে। সেই পরমসত্তার কাছে আমার সব উদ্দেশ্যই স্বীকৃতি পাবে—যিনি গোপনে লক্ষ্য ক'রে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।—লোকে যাই বলুক, এই সান্ত্বনা আমার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"

বেদান্তপ্রচারে রামমোহনের এই প্রযত্ন যে কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বেদান্তের প্রভাব লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এক্ষেত্রে একথাও স্মরণীয় যে, রামমোহনের এই ইংরেজী গ্রন্থটি পরবৎসরই (১৮১৭) জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। কেন উপনিষদের অনুবাদ সমেত এই গ্রন্থটি রামমোহন-বন্ধু জন ডিগবীর প্রচেষ্টায় ওই বৎসরেই ইংল্যাণ্ডেও প্রকাশিত হয়েছিল। রামমোহনের চিন্তাধারা এই সময় থেকেই বিশ্বমনীষি-সমাজের আকর্ষণ করে। ‡

[ক্রমশঃ]

* The English Works of Raja Rammohan Ray: Panini Press Edn. 1906: pp 3-5

‡ রামমোহন রায়: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'ইহ চেদবেদীৎ...'

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রুতি নিজমুখে ঘোষণা করিয়াছেন—

'ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,
ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।...'

(কেন উপঃ ২।৫)

—এই জীবনেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান হয় তবেই মানবের সত্যলাভ হইল, সে ধন্য হইল। এই জন্মে লাভ না হইলে মহান্ বিনাশ অর্থাৎ সুদীর্ঘ সংসারগতি অব্যাহত রহিল। সুতরাং বিবেকী পুরুষগণ স্থাবরজঙ্গম সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারপূর্বক 'আমি-আমার'-রূপ সংসারবন্ধন হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান---ইহাই শ্রুতি চান।

সংসার দুঃখের আগার। ইহা সর্বজনবিদিত। দুঃখনিবৃত্তি সকলেরই কাম্য। কিন্তু সে দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি? সর্বপ্রকার দুঃখনিরসনের জন্যই মানুষ লৌকিক, অলৌকিক কত ভাবেই তো চেষ্টা করে, তাহা দ্বারা কিছু দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তি কখন কখন হইলেও উহারা আবার আসিয়া হাজির হয়, উহা দূর হইয়াও যেন হয় না। অতএব উহাকে ঠিক ঠিক দুঃখনিবৃত্তি বলা যায় না। দুঃখের বিরোধী সুখ। তাই মানুষ সুখপ্রাপ্তি দ্বারা দুঃখ দূর করিবার নানা উপায়-অন্বেষণে সদা ব্যাপৃত। বিষয়লাভ ও ভোগে সে সুখ পায়, সেইজন্য বিষয়-সম্পাদনে সে কতই না উদ্‌গ্রীব! কিন্তু ঐ বিষয়সুখও তো স্থায়ী হয় না! কোন্ মুহূর্তে পুনঃ দুঃখ আসিয়া তাহাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিবে সেই ভয়ে সে সদা কাতর। তাই মাতৃবৎ পরমহিতৈষিণী শ্রুতি করুণাপরবশ হইয়া স্থায়ী সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় বলিতেছেন,—'ইহ চেদবেদীৎ...'। এই জীবনে এই শরীরেই যদি ব্রহ্মকে জান তবেই বাঞ্ছিত সুখপ্রাপ্তি ও সর্বদুঃখনিবৃত্তি ঘটিবে। কারণ ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ।

ব্রহ্মজ্ঞানে দুঃখনিবৃত্তি হয় কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মকে জানিলে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দুঃখনিবৃত্তি হইবে কেন? দুঃখ বাস্তব, রূঢ় সত্য। ইহা সকলেরই অনুভূত। কোন সত্য বস্তুরই তো জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি দেখা যায় না। সম্মুখস্থিত বৃক্ষটিকে আমি জানিলাম। কিন্তু কই, সেই বৃক্ষজ্ঞানদ্বারা সেই বৃক্ষ বা অন্য কিছুর নিবৃত্তি বা বিনাশ তো ঘটিল না। বৃক্ষটিকে বিনাশ করিতে হইলে তাহাতে অগ্নিসংযোগরূপ ক্রিয়ার আবশ্যক হইবে। কিন্তু যখন মন্দান্ধকারে ঐ বৃক্ষে আমার পুরুষভ্রম হয়, তখন আলোকাদির সাহায্যে ঐ বৃক্ষজ্ঞান হইলে সেই জ্ঞানের দ্বারা ঐ পুরুষ-ভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

দুঃখ কল্পিত :

সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা কল্পিত বস্তুরই, ভ্রান্তিরই নিবৃত্তি হইতে পারে, কোন বাস্তব বস্তুর নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির কথা। অতএব দুঃখ আমাতে, আমার স্বরূপে, নিশ্চিতই কল্পিত, উহা বাস্তব হইতে পারে না।—

'ভ্রান্ত্যারোপিত সংসারো বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ।
রজ্জ্বারোপিত সর্পো ন ঘণ্টাঘোষান্নিবর্ততে॥'

—ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে আরোপিত সংসারদুঃখ বিচারপ্রসূত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, কোন

কর্মের দ্বারা নহে। কারণ রজ্জুতে কল্পিত সর্প কি কখনও ঘণ্টাবাদনাদি কর্মদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে? তাহা কখনই হয় না। একমাত্র রজ্জুজ্ঞানই সেই কল্পিত সর্পের নিবর্তক।

ব্রহ্মকে অর্থাৎ আত্মাকে জানাই সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, —ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। ব্রহ্মকে না জানিলে বিনাশ অর্থাৎ সংসারচক্রে পুনঃপুনঃ আবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পুরাণ বলেন, চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে জীব মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন—'জন্তুনাং নরজন্ম দুর্লভম্' - সর্ব প্রাণিদেহের মধ্যে এই মনুষ্যদেহ-প্রাপ্তি বড়ই দুর্লভ। মনুষ্যশরীর জগন্নির্মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই শরীরেই তিনি জীবকে বিবেক, সদসদ্‌বিচারের ও তদনুযায়ী কর্ম করিবার যোগ্যতা দিয়াছেন, যাহার সম্যক্ উপযোগসহায়ে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দময় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। একবার অন্য যোনিতে জন্ম হইলে সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার কবে মনুষ্যদেহ লাভ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সেইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—'ইহ চেৎ' —অর্থাৎ যে মনুষ্যশরীর জীব লাভ করিয়াছে উহাকে ব্যর্থ ভোগবিলাসের মধ্যে বিপথগামী না করিয়া এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞানলাভের সম্যক্ চেষ্টা কর্তব্য।

ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি কি প্রকার :

শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায় ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? কোন বস্তুকে জানিলেই আমি তো সেই বস্তুর রূপ ধারণ করি না। আমি একটি বৃক্ষকে জানিলাম, তাহাতে সেই বৃক্ষ তো আমি কখনও হইয়া যাই না। তবে ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রহ্ম হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। ভ্রান্তিবশতঃই সে নিজেকে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন সংসারী জীব মনে করিতেছে। জ্ঞানদ্বারা সেই ভ্রান্তিই নিবৃত্ত হয়। তখন জীব নিজের সেই পূর্ব রূপটিই যেন ফিরিয়া পায়। তাই বলা হয় জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও নিত্যনিবৃত্তের পুনঃনিবৃত্তি :

ব্রহ্মপ্রাপ্তি কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নহে। ইহা প্রাপ্ত বস্তুরই পুনঃপ্রাপ্তি মাত্র। প্রাপ্ত বস্তু যখন অজ্ঞানবশতঃ অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতিভাত হয় তখন সেই বস্তুর জ্ঞানদ্বারা ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে ঐ বস্তু লাভ হইল, এইরূপ উপচার হয় মাত্র। কণ্ঠস্থিত হার ভ্রান্তিবশতঃ মনে হয় উহা হারাইয়া গিয়াছে, পরে হার কণ্ঠেই রহিয়াছে দেখিয়া লোকে বলে যে হার পাইয়াছি। বাস্তবিক উহা অপ্রাপ্ত ছিল না, প্রাপ্তই ছিল, জ্ঞান দ্বারা কেবল ভ্রান্তিমাত্র নিবৃত্ত হইল। ব্রহ্মপ্রাপ্তিও তদ্রূপ। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ, কোনপ্রকার দুঃখের গন্ধলেশমাত্রও তাহাতে নাই। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও জীব নিজেকে দুঃখী বলিয়া অনুভব করিতেছে, এবং সেই দুঃখনিবৃত্তির জন্য অশেষ চেষ্টাও সে করিতেছে। দুঃখ বস্তুতঃ নিজেতে কোনওকালেই নাই, অথচ সে তাহা অনুভব করিতেছে। সুতরাং এই দুঃখও একটি ভ্রান্তি, ইহাই অবশ্য বলিতে হইবে। যে রজ্জুতে সর্প কোনকালেই নাই, তাহাতে যদি আমি সর্প দর্শন করি, তবে সেই সর্প ও তাদ্বিষয়ক জ্ঞানকে অবশ্যই ভ্রান্তি বলিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভ্রান্তি একমাত্র জ্ঞানদ্বারা নিরসনীয়। কারণ পরস্পরবিরোধী বলিয়া একমাত্র আলোই

যেরূপ অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ, পরস্পর-বিরোধী বলিয়া তদ্রূপ একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। 'জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্'—(পঞ্চপাদিকা)। ব্রহ্মজ্ঞানে সর্বদুঃখ নিবৃত্ত হয়—ইহা বলাও একটি উপচার মাত্র। কারণ যে দুঃখ ব্রহ্মে কোনকালেই নাই, তাহা আবার দূর হইবে কিরূপে? সুতরাং দুঃখ-প্রতীতি—এই ভ্রান্তিমাত্র দূর হইল বলিতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, নিত্য-প্রাপ্ত বস্তুরই পুনঃপ্রাপ্তি এবং নিত্য নিবৃত্তের পুনঃনিবৃত্তি—ইহা একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই হয়, কর্ম উপাসনা বা অন্য কোন উপায়েই নহে। আচার্য নরহরি বলিয়াছেন :—

'জানাতি বা ন জানাতি ব্রহ্ম জীবস্য জীবনম্।
জানাতি চেৎ মহান্ লাভো ন জানাতি
মহদ্ভয়ম্ ॥'—

জীব সদাই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা সে জানুক বা না জানুক। তবে জানিলে মহালাভ, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি, পরমানন্দস্বরূপপ্রাপ্তি। আর না জানিলে মহাভয় অর্থাৎ এই সংসার-চক্রে বারবার নিষ্পিষ্ট হওয়া, এই ভ্রান্তিগর্তে পুনঃপুনঃ পতন।

ব্রহ্মের স্বরূপ :

ব্রহ্ম কিরূপ? উত্তরে শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সদ্রূপ, চিদ্রূপ ও আনন্দরূপ। ইহা দ্বারা তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বা ধর্মের সমষ্টি ব্রহ্ম—এরূপ বুঝায় না। একই অনির্বচনীয় তত্ত্বের এই সংজ্ঞাত্রয়।

সৎ-চিৎ-আনন্দ—নিষেধে তাৎপর্য :

সংজ্ঞা থাকিলে ব্রহ্ম অনির্বচনীয় হইবেন কি প্রকারে, এইরূপ শঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি বলেন—'অথাত আদেশো নেতি নেতীতি'। নিষেধমার্গই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়, ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। সর্ব স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ প্রপঞ্চের, সর্ব দৃশ্যের নিষেধের অবধীভূত যে অনির্বাচ্য তত্ত্ব অবশেষ থাকেন, তাহাই ব্রহ্ম। তবে অনির্বাচ্য ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হয় কেন? উত্তরে বলা যায় যে ইহারও নিষেধেই তাৎপর্য। ব্রহ্ম কোন জড় পদার্থ নহেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে বলা হয় 'চিৎ'। পুনঃ তিনি অসত্তারূপ নহেন, সেইজন্য তাঁহাকে বলা হয় 'সৎ' এবং তিনি দুঃখরূপ নহেন বলিয়া তাঁহাকে 'আনন্দ-স্বরূপ' বলা হয় মাত্র।

চিৎ : এই চিৎ, সৎ ও আনন্দের অনুভব কি করিয়া হয়, সে বিষয়ে এক্ষণে বিচার করা যাউক। ব্রহ্ম চিদ্রূপ অর্থাৎ সদা প্রকাশমান স্ফুরণরূপ। কিন্তু সদা প্রকাশমান বস্তুর তো সদাই অনুভব হওয়া উচিত, তাহা হয় না কেন? উত্তরে বলা যায় যে, উহা সদা অনুভূত কারণ—

'অদৃষ্ট্বা দর্পণং নৈব তদন্তস্থেক্ষণং তথা।
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ ॥'—
(পঞ্চদশী ১৩।১০২)

—প্রথম দর্পণকে না দেখিয়া তাহাতে প্রতিবিম্ব যেরূপ কেহ দেখিতে পারে না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেও প্রথম অনুভব না করিয়া নামরূপাত্মক পদার্থ কেহ জানিতে পারে না।

সব জ্ঞানে চিৎ-এরই অনুভব :

ব্রহ্ম সদা অনুভূত। কিন্তু সেই অনুভবকে আমরা ভ্রান্তিবশতঃ বিষয়সহ মিশ্রিত করিয়া উহা বিষয়ানুভব বলিয়া মনে করি। সুতরাং আমরা ব্রহ্মকে জানিয়াও যেন জানিতেছি না। দৃষ্টান্ত সহায়ে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি একটি পুষ্প দেখিতেছি। কেবল পুষ্পই কি দেখি? না, তাহা নহে। আলোক বিনা পুষ্প দেখা যায় না, কারণ

অন্ধকারে সম্মুখস্থ পুষ্পও দৃষ্টিগোচর হয় না। 'যৎসত্ত্বে যৎসত্ত্বং যদসত্ত্বে যদসত্ত্বম্'—যাহা থাকিলে অন্য পদার্থটিও থাকে, যাহা না থাকিলে ঐ অন্য পদার্থটিও থাকে না—সেইস্থানে ঐ অন্য পদার্থটি পূর্ববস্তুরূপ। যেমন মৃত্তিকা থাকিলে ঘট আছে, মৃত্তিকা না থাকিলে ঘট নাই, অতএব ঘট মৃদ্-রূপ। বর্তমান স্থলেও আলোক থাকিলে পুষ্প দৃষ্টিগোচর হয়, আলোক না থাকিলে হয় না। অতএব আলোকাকার বা আলোক-পরিব্যাপ্ত পুষ্পই আমরা দেখি, শুধু পুষ্প দেখি না। পুষ্পরূপ উপাধি যেন আলোককে তদাকার করিয়া দিয়াছে। পুনঃ ঐ আলোক দেখি চক্ষুবৃত্তিদ্বারা। সুতরাং আলোকাকার চক্ষুবৃত্তিও অনুভব করি। চক্ষু বন্ধ থাকিলে পুষ্প বা আলোক কিছুই দেখা যাইবে না। চক্ষুবৃত্তির পশ্চাতে মন না থাকিলেও আবার চলিবে না। মন অন্য বিষয়ে মগ্ন থাকিলে খোলা চোখেও আমরা কোন বস্তু দেখিতে পাই না। মন বিষয়াকার হইলে তবেই সেই বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব। এইরূপ আলোক ও চক্ষুবৃত্তির মাধ্যমে পুষ্পাকার মনোবৃত্তি ঐ পুষ্পরূপ উপাধির অধিষ্ঠানচৈতন্যে ব্যাপ্ত অজ্ঞান নাশ করিলে তখন ঐ চৈতন্যেরই ভান হয়, ঐ চিদংশেরই ভান হয়, পুষ্পের নহে। নামরূপাত্মক পুষ্পের একটা মিথ্যা প্রতীতি বা অবভাস হয় মাত্র। বস্তুতঃ অনুভব এক চিৎ-তত্ত্বেরই হইয়া থাকে। এই রূপে দেখা যায় যে সর্ববিষয়ে জ্ঞানে এক চিৎ-অনুভবই হইয়া থাকে। বৃত্তি সর্বদা সত্তা ও চিৎ-কেই বিষয় করে, নামরূপকে কখনই করে না। ঘটের নামরূপ কেহ কোন দিন চোখে দেখে নাই বা দেখিবেও না। মৃত্তিকাকেই সকলে দেখে। কিন্তু অজ্ঞানী এ বিষয় জানে না। সে মনে করে যে, সে ঘট দেখিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এ বিষয়ে সচেতন নহি। কিন্তু এই অনুভবও যেন খণ্ডখণ্ড বিষয়ে চিত্তের খণ্ড-খণ্ডরূপে অনুভব।

ব্রহ্মানুভব :

শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনবলে চিত্ত যখন অখণ্ড ব্রহ্মাকার ধারণ করে, তখন সেই বৃত্তিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা ব্রহ্মাবরক ব্যাপক মূল অজ্ঞান বা মায়ার নাশ হইলেই তখন পূর্ণ অখণ্ড চিদ্ অনুভব হয়। তৎপশ্চাৎ সর্ববিষয়-জ্ঞান কালেও (তখন) এক ব্যাপক অখণ্ড চৈতন্যেরই অনুভব হইতে থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'প্রতিবোধবিদিতং মতম্'—(কেন, উপঃ ১।২.৪) অন্তঃকরণের প্রতি বিষয়াকার বৃত্তির প্রকাশক এক ব্যাপক চৈতন্যের অনুভবই ব্রহ্মানুভব। ইহাই ব্যবহারকালেও ব্রহ্মানুভব। আবার চিত্ত নির্বিকল্প হইলে সমাধি-অবস্থায়ও সেই ব্রহ্মানুভবই হয়। প্রভেদ এই যে, ব্যবহারকালীন ব্রহ্মানুভবে নামরূপাত্মক দ্বৈতের একটা প্রতীতি বা প্রতিভাস থাকে মাত্র, সমাধি-অবস্থার ব্রহ্মানুভবে সেটুকুও থাকে না।

'ব্যুত্থিতো বা সমাধির্বা বৃত্তিঃ সর্বা চিদাকৃতিঃ'—ইহারই নাম 'জ্ঞানসমাধি' বা 'সহজসমাধি'। জ্ঞানীর সমাধি সর্বদা সর্বাবস্থায় বর্তমান, তাহার জন্য আর চেষ্টা বা যত্ন করিতে হয় না।

সৎ : ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সর্ব পদার্থে অনুস্যূতরূপে তিনিই প্রতিভাত হন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক ব্রহ্মসমুদ্রে মায়িক নামরূপের বিচিত্র বিলাসের নামই সৃষ্টি। তরঙ্গফেন-বুদ্বুদাদিবিকারের মধ্যে সর্বত্র যেমন একমাত্র

জলই রহিয়াছে, সর্ব দৃশ্যের মধ্যেও তদ্রূপ এক ব্রহ্মই রহিয়াছেন। 'ঘট আছে', 'পট আছে'—সর্ববস্তুই এইরূপে সত্তাসহ মিলিতরূপেই প্রতিভাত হয়। ঘট কি বস্তু, ইহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহা কপালসমষ্টিমাত্র। কপালখণ্ডসমূহও মৃত্তিকাচূর্ণ ব্যতীত আর কিছু নহে। ঐ চূর্ণসকলও পার্থিব অণুসমুদায়রূপ। অণুসমূহও পৃথিবীতন্মাত্রা সহ অভিন্ন। পৃথিবীতন্মাত্রাও জলতন্মাত্রা হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদ্রূপ। এইরূপে উহাও ক্রমে তেজ, বায়ু ও সর্বশেষে আকাশতন্মাত্রারূপ। আকাশতন্মাত্রাও অহংকার হইতে উৎপন্ন। অহংকারও ক্রমে মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মূল প্রকৃতিও স্বতন্ত্রসত্তারহিত বলিয়া সদ্‌ব্রহ্মরূপ।—এইরূপে দেখা যায় যে, জগতে যত বস্তুই আছে, তাহা সদ্‌ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। এক ব্রহ্মসত্তাই সর্বনামরূপের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু আমরা মোহবশতঃ তাহা ধরিতে অপারগ। ঐ সত্তা পৃথক পৃথক বস্তুসমূহেরই স্বভাব বা ধর্ম মনে করিয়া আমরা ভ্রান্ত হইয়া থাকি।

আনন্দ: ব্রহ্মের সৎ-চিৎ রূপটি সর্বত্র সর্বাবস্থায় সর্ব-অনুভবে অনুগতরূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি। সত্ত্বগুণের পরিণাম দয়া, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে, কামক্রোধাদি রাজসিক বৃত্তিতে ও জড়তা, তন্দ্রাদি কালে তমোগুণাক্রান্ত চিত্তে সমভাবেই সত্তারও স্ফুরণ ও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দ-রূপটি সর্বাবস্থায় ভান হয় না কেন? উত্তরে দৃষ্টান্ত সহায়ে বলা যাইতে পারে যে, অগ্নির আলোতে প্রকাশ ও উষ্ণতা উভয়ই বিদ্যমান থাকিলেও উহার প্রকাশ দূরবর্তী স্থান হইতেও উপলব্ধ হয়, কিন্তু অগ্নির উষ্ণতার অনুভব করিতে হইলে যেমন অগ্নির নিকট যাইতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সৎ ও চিৎ অংশের অনুভব সর্ব বৃত্তিতে হইলেও আনন্দাংশের অনুভব একমাত্র সাত্ত্বিক শান্ত চিত্তবৃত্তিতেই হইয়া থাকে। চিত্ত শান্ত হইলে তখনই আনন্দানুভব হয়।

বিষয়ানন্দের সহিত সকলেই পরিচিত। বিষয়লাভের জন্য পুরুষ কত ব্যাকুল। তখন ঐ চঞ্চল চিত্তে দুঃখই অনুভূত হয় সুখ নহে। বিক্ষেপ, চাঞ্চল্যই দুঃখ। বিষয়লাভ হইলে তখন চিত্তের সেই চাঞ্চল্য কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়। ঐ শান্ত অবস্থা সত্ত্বগুণের পরিণাম। এই অবস্থা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকে না। কারণ চিত্ত পুনরায় আপন স্বভাববশে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া থাকে। সে যাহাই হউক, ঐ স্বল্পকালস্থায়ী সত্ত্বগুণাক্রান্ত চিত্তে স্বরূপানন্দ প্রতিফলিত হয়। উহাই বিষয়ানন্দ। আনন্দ বাহ্য পদার্থে নাই। আনন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সুতরাং বস্তুতঃ জীবের নিজের স্বরূপ হইতেই আনন্দ বাহ্য পদার্থে আরোপিত হইতেছে মাত্র। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ জীব উহা বিষয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছে। চিত্তের বিষয়াকারতা রুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্ত পূর্ণ নির্বিষয় হইলে তখন অন্তরে পরিপূর্ণ আনন্দের প্রকাশ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাই স্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দানুভব। বর্তমান শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আমি'—সংশয়বিপর্যয়রহিত এইরূপ অভেদজ্ঞান হইলে তবেই লোকে কৃতকৃত্যতা লাভ করে ও সর্ব সংসারবন্ধন-সর্বদুঃখ-নিবৃত্তি হয়, নতুবা 'মহতী বিনষ্টিঃ'—অনিবার্য সংসারদুঃখ আসিয়া জীবকে চিরতরে অভিভূত করিয়া থাকে।

অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তি :

শ্রুতি ব্রহ্মাত্মৈকাজ্ঞান অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের কথাই মুক্তিলাভের উপায়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পুনঃ শতমুখে শ্রুতি ভেদ-দর্শনের নিন্দাও বহু স্থলে করিয়াছেন। যথা—'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' —(কঠ,উপ, ২।১।১০,১১) আত্মাতে ভেদদর্শী পুরুষ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হয়। 'যদা হোবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে. অথ তস্য ভয়ং ভবতি।' (তৈ.উপঃ ২।৭)—যখনই অজ্ঞানী এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয় ;—ইত্যাদি। অভেদেই শ্রুতির তাৎপর্য না হইলে ভেদ-দর্শনের এইরূপ নিন্দা কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। এইজন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার (ব্রহ্ম) অভেদ-বোধনেই সর্বশ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে সমন্বিত. ইহাই সিদ্ধান্ত।

আত্মা অর্থ আমি। আমা হইতে ভিন্ন যাহা, তাহা আমি নই। আমা হইতে অভিন্ন যাহা, তাহাই আমি। বিচারদৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, শরীর মন, ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য, সুতরাং উহারা আমা হইতে ভিন্ন এবং ভিন্ন বলিয়াই সেগুলি আমি নই। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই পরস্পরব্যভিচারী অবস্থাত্রয়ের মধ্যে এক সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে অনুগত আমিই সদা বিদ্যমান। ব্রহ্মের লক্ষণও শ্রুতি সৎ-চিৎ-আনন্দরূপেই নির্ণয় করিয়াছেন। কোন ভেদক ধর্ম না থাকাতে এবং জীব ও ব্রহ্ম একই লক্ষণবিশিষ্ট হওয়ায় উভয়েই অভিন্নস্বরূপ, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই।

ভেদ সর্বলোকপ্রত্যক্ষ। জন্মাবধি লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিতেই অভ্যস্ত। তাই ভেদসংস্কার সকলেরই প্রতি প্রবল। ভেদ ছাড়া লোকে কিছু ভাবিতেই পারে না। সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি সকলেরই কাম্য। উহাও লোকে ভেদজ্ঞান সহায়েই লাভ করিতে চায়। জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি—এ বিষয়ে সকল দার্শনিকই একমত হইলেও এক অদ্বৈত বেদান্ত ব্যতীত অপর সকলেই বলেন যে, ঐ জ্ঞান ভেদ-জ্ঞান। যথা—

সাংখ্য বলেন—বিচার সহায়ে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য-বোধই ত্রিবিধদুঃখধ্বংসরূপ মুক্তির হেতু। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য। অসঙ্গ চিৎ ও বিভু পুরুষ বহু।

পাতঞ্জল মতে—নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা পুরুষের জ্ঞানই মুক্তিহেতু। অন্যান্য বিষয়ে ইঁহারা সাংখ্য সহ একমত, কেবল ঈশ্বর অধিক স্বীকার করেন।

ন্যায়, বৈশেষিক মতে—যাবতীয় পদার্থ হইতে ভিন্ন আত্মার জ্ঞান হইলেই একবিংশতি দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

পূর্বমীমাংসা মতে—বৈদিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তিই মোক্ষ। একমাত্র উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তই বলেন যে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

একাদশীর উপবাস-কথা

পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ

অহোরাত্রভোজনাভাবঃ উপবাসঃ। উপ—সমীপে বাসঃ—অবস্থানং উপবাসঃ অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপে সাধকবর্গের বিশেষভাবে অর্চনাদির নাম উপবাস। এই শব্দটির পারিভাষিক অর্থে একাদশী, শ্রীরামনবমী, দুর্গাষ্টমী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি বহুতর দিবসকে উপবাস বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন।

ইত্থঞ্চ নিত্য-কুর্বাণঃ কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্।
হরের্দিনে বিশেষেণ কুর্যাৎ তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ॥

(পূর্বোক্তপ্রকারে) যিনি নিত্য কৃষ্ণপূজা-মহোৎসব করিতেছেন, তিনি উভয়পক্ষের শ্রীহরিবাসরে বিশেষভাবে উক্ত মহোৎসব সম্পাদন করিবেন।

হরিবাসর ব্রতবিশেষ। ব্রত কাহাকে বলে? কেহ কেহ বলেন, সঙ্কল্পই ব্রত। আবার কেহ কেহ বলেন, স্বকর্তব্য বিষয়ক নিয়ত সঙ্কল্পই ব্রত। সঙ্কল্প জ্ঞানবিশেষ। অতএব ভাবপক্ষে অর্থাৎ বিধিপক্ষে 'ইহাই আমার কর্তব্য' এই প্রকার। এবং অভাব-পক্ষে অর্থাৎ নিষেধপক্ষে 'এইটি আমার অকর্তব্য'—এই প্রকার জ্ঞানই সঙ্কল্প শব্দের অর্থ। এইজন্যই অভিধানে মানসকর্মই সঙ্কল্প-শব্দের অর্থ অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সঙ্কল্প-বিষয়ক কর্মবিশেষই ব্রত শব্দের অর্থ। ঐ কর্ম প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক ভেদে দ্বিবিধ। দ্রব্যবিশেষের ভোজন ও পূজা প্রবৃত্তিরূপক কর্ম। তবে উপবাসাদি নিবৃত্তিরূপ কর্ম। নিবৃত্তিরূপ কর্ম আবার নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ত্রিবিধ। একাদশ্যাদিব্রত নিত্য-কর্ম। চান্দ্রায়ণাদিব্রত নৈমিত্তিক কর্ম। আর বিশেষ-বিশেষ দিনে উপবাসাদি ব্রতরূপ বিশেষ বিশেষ কর্ম কাম্যকর্ম।

একাদশী ব্রত নিত্য। বিধিবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি, নিষেধবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি, অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ এবং করণে শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফল শ্রবণহেতু একাদশী ব্রতকে নিত্যব্রত বলা হয়।

তন্মধ্যে বিধিবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি যথা—

"একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ" ইতি কণ্বঃ—এতদর্থ যথা, একাদশীতে উপবাস করিবে, কখনও বাদ দিবে না।

নিষেধবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি যথা—

"ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরি-বাসরে" ইতি পাদ্মে—তদর্থ যথা, হরিবাসর প্রাপ্ত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না।

উপবাসের লক্ষণ—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বভোগবিবর্জিতঃ॥

অস্যার্থঃ—সকলপ্রকার পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত, এবং সর্বভোগ পরিত্যাগপূর্বক গুণের সহিত বাসকেই উপবাস বলা হয়।

ভোগ কি শাতাতপ বলিয়াছেন—

গন্ধালঙ্কারবাসাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবনমঞ্জনম্॥

গন্ধ, অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য, অনুলেপন, দন্তধাবন ও অঞ্জন—এই সকল এবং অসত্য-ভাষণ, অসদালাপ, ক্রীড়া, মৈথুন ও নিদ্রা প্রভৃতিও উপবাসদিনে বর্জনীয়। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, সত্য ও আমিষবর্জন পরায়ণ হইয়াই

ব্রতসকল অনুষ্ঠান করিতে হয়।

উপবাসকৃতগুণলক্ষণং যথা—

তজ্জপ্যং তজ্জপধ্যানং তৎকথাশ্রবণাদিকম্।

তদর্চনঞ্চ তন্নামকীর্তনশ্রবণাদয়ঃ ॥

উপবাসকৃতা হ্যেতা গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ

শ্রীভগবানের অর্থাৎ যাঁহার যে দেবতা ইষ্ট বা আরাধ্য তাঁহার মন্ত্র, তদীয় নাম বা মন্ত্রের জপের সহিত তাঁহার ধ্যান, তৎকথাশ্রবণাদি, তদর্চন ও তাঁহার নামকীর্তন এবং নামশ্রবণ প্রভৃতিকে পণ্ডিতেরা উপবাসের গুণ বলিয়া থাকেন।

উপবাসের পরদিনে স্নান ও পূজাদি-সমাপনান্তে ইষ্টদেবতা বা ভগবানের উদ্দেশে উপবাস-ফল সমর্পণ করিবে।

অর্পণমন্ত্র যথা—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।

প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥

অস্যার্থঃ—হে কেশব, আমি অজ্ঞানতিমিরান্ধ; হে নাথ, আপনি প্রসন্ন হইয়া হাস্যবদনে আমাকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করুন।

তদনন্তর নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্বক সামার্থ্যানুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তুলসী-ভক্ষণ সহকারে দ্বাদশীর পারণকার্য সমাধা করিবেন। আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন—তোমাদের জ্ঞান হোক, চৈতন্য হোক।

একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে, ৪র্থ অধ্যায়ে সপ্তদ্বীপা-বসুন্ধরাধিপতি রাজা অম্বরীষ এক বৎসরকাল যথারীতি একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করিলে ভগবান নারায়ণ তাঁহার চক্ররূপী অস্ত্রটিকে অম্বরীষের রক্ষার্থে আদেশ দিয়াছিলেন। অম্বরীষ তাহা জানিতেন না অর্থাৎ অম্বরীষের অলক্ষিতে থাকিয়া রাজার যাবতীয় বিঘ্ন নাশ করিতেন।

বৎসরান্তে দ্বাদশীর প্রাতঃকালে অর্থাৎ একাদশীর পারণের পূর্বে দুর্বাসা বহুতর শিষ্য সহ অম্বরীষ রাজাকে পারণার্থে বলিলে রাজা বলিলেন—আমি আপনার সশিষ্য পারণের উপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্য আয়োজন করিতেছি। আপনি স্নানাদি সমাপনান্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

তখন দুর্বাসা যমুনায় স্নানার্থে যাইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বলিলেন—মহারাজ, পারণের কাল অতিক্রান্ত হইলে আপনার ব্রত নষ্ট হইবেই, পরন্তু মহাপাপে লিপ্ত হইবেন।

পারণকালনির্ণয় স্কন্দপুরাণে যথা—

পারণেঽহনি সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীং যো
ব্যতিক্রমেৎ।

ত্রয়োদশ্যান্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মনি নারকী ॥

অর্থাৎ পারণদিনে দ্বাদশী থাকিলে ও তাহা লঙ্ঘন করিয়া ত্রয়োদশীতে ভোজন করিলে শতজন্ম নরকভোগ হয়। অতএব এ স্থলে একদিকে ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন, অন্যদিকে ব্রত-নাশের জন্য নরক, এমতাবস্থায় ঋষিসকল বলিলেন—

অম্ভসা কেবলেনাথ কুরুষ ব্রতপারণম্।

আহুরব্ভক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতঞ্চ তৎ ॥

ভা. ৯.৪।৪০

অতএব একবিন্দু জল জিহ্বাতে দিয়া পারণ রক্ষা করুন। ইহা ভক্ষণ এবং অভক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে বলিয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণকে অতিক্রম জন্য পাপও হইবে না এবং ব্রতরক্ষাও হইবে। এইভাবে রাজা পারণ সমাপন করিবার পরই দুর্বাসা সর্বজ্ঞ শক্তিতে সমস্ত বিষয় বুঝিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া একটি জটা উৎ-পাটন করিলে কালানল উৎপন্ন হইল; তখন বলিলেন—রাজাকে ভস্মীভূত কর।

তখন সেই কালাগ্নি রাজা অম্বরীষকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অলক্ষিত ভগবচ্চক্র উত্থিত হইয়া কালাগ্নিকে নির্বাপিত করতঃ দুর্বাসা ঋষিকে দগ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে দুর্বাসা শিবলোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াও কোনরূপ সহায় না দেখিয়া শেষে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিলেন—

সংদহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা
তৎপাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ।
আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো
কৃতাগসং মাঽব হি বিশ্বভাবন॥

ভা. ৯।৪।৬১

অস্যানুবাদঃ—ভগবানের চক্রাগ্নি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কম্পিতকলেবরে ভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিয়াছিলেন—হে ভক্তজনপালক, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে ত্রিলোক রক্ষক, আপনার নিকটে অত্যন্ত অপরাধী আমাকে রক্ষা করুন।

দুর্বাসা এইরূপ বলিলে ভগবান বলিয়াছিলেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং-
স্ত্যক্তুমুৎসহে॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ।

ঐ. ৬৩, ৬৫, ৬৮

ব্রহ্মংস্তদ্‌গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৭১

অস্যার্থঃ—আমি ভক্তের অধীন, অতএব আমার কর্তব্য বলিয়া কিছুই নাই। সাধুসকল আমার মন হরণ করেন, অতএব ভক্তবর্গের কর্তব্যই আমার কর্তব্য। দেখুন, ভক্তগণ পত্নী পুত্র ধনরত্ন দেহ গেহ সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক আমারই শরণ লন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমার কর্তব্য কিছুই নাই। বেশী কি বলিব—সাধুসকলই আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়; এজন্য আমাকে ভিন্ন তাঁহারা কিছুই জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন কিছুই জানি না, তবে আপনি যে আমার নিকটে আসিয়াছেন তাহা বিফল হইবে না, আমি আপনার সঙ্কটমোচনের উপায় বলিতেছি। তাহা করিলেই শান্তি লাভ করিবেন অর্থাৎ নাভাগপুত্র মহাভাগ্যবান ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই আপনার মঙ্গল ও শান্তি হইবে।

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্বাসাচক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ॥

ঐ. ৯।৫।১

—চক্রপীড়িত দুর্বাসা ভগবানের আদেশমত পুনরায় অম্বরীষের নিকট আসিয়া রাজার পদ ধারণপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অম্বরীষ পাদস্পর্শে বিলজ্জিত হইয়া চক্রকে বলিয়াছিলেন—

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ॥

ঐ. ১০

যদি আমি দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়া থাকি, যদি আমি ক্ষত্রিয়োচিত স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি অথবা আমার পূর্বপুরুষগণের সহিত যদি আমি ব্রাহ্মণবর্গকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, তবে সেইসকল পুণ্যের বিনিময়ে এই ব্রাহ্মণ চক্রতাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করুন। এইরূপ প্রার্থনা করিলে চক্র ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন দুর্বাসা বলিয়াছিলেন—

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে॥

ঐ. ১৪

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥

ঐ. ১৫

রাজন্ননুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ॥

ঐ. ১৭

ভগবদ্ভক্তের অত্যাশ্চর্য মহত্ত্ব আজ আমি স্বয়ং দর্শন করিলাম। আমি এই দু-এক ঘণ্টা পূর্বে যাঁহার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তিনি সমস্ত পুণ্য কর্মের বিনিময়ে আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। অতএব সাধু-মহাত্মাগণের দুস্ত্যজনীয় বা দুষ্কর কার্য কিছুই নাই, কারণ তাঁহারা ভগবানকে ঐকান্তিকভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। হে মহারাজ, আপনার এই করুণার্দ্র হৃদয় দ্বারা আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আমার অপরাধ গণ্য না করিয়া সর্বতোভাবে আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। তৎপর রাজা ব্রাহ্মণ দুর্বাসাকে যথারীতি ভোজন করাইয়া সসম্মানে বিদায় দিয়াছিলেন। অতএব একাদশীর ব্রতের মাহাত্ম্য অলৌকিক—ইহাই এই অম্বরীষের উপাখ্যানে বর্ণিত হইল। আরও বহু স্থলে এইরূপ একদশীব্রতের অলৌকিক মাহাত্ম্য দেখা যায়, তন্মধ্যে রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর ব্রত ভক্তমালগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :

রুক্মাঙ্গদ মহারাজ মহাভাগ্যবান্।
ছলে একাদশীব্রতে হৈলা কৃপাবান্॥
অপূর্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে।
নানামত সৌগন্ধি আছয়ে ফুল ফুটে॥
কৌতুকে দেবতাঙ্গনা পুষ্পের চয়নে।
নিতি নিতি আইসে যায় দৈবে একদিনে॥
বেগুনের কাঁটা এক ফুটিল চরণে।
গতিরোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে॥

বাগানের মালি রাজাকে বলিলে রাজা আসিয়া বৃত্তান্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উপায় কি করিব। দেবকন্যা বলিলেন, তোমার রাজধানীতে গত দিনে যদি কেহ একাদশীব্রত অর্থাৎ উপবাস করিয়া থাকে এবং সে যদি কিঞ্চিৎ ফল আমাকে দেয়, সেই পুণ্যে আমি অনায়াসে স্বর্গে যাইব। রাজার অনুমতি অনুসারে একটি বণিকের দাসী কলহ করিয়া সেইদিন দিবারাত্র জল পর্যন্ত না খাইয়া ছিল। তাহাকে লইয়া রাজার নিকটে যাইলে রাজা দেবকন্যার কথামত বণিকের দাসীকে সঙ্গে আনিলেন।

দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা।
তাহার কিঞ্চিৎ ফল মোরে যদি দেহ।
বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ॥
দাসী বলে সে কি আমি কভু করি নাই।
হাসি হাসি দেবী কহে তোমারে বুঝাই॥
হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া।
উপবাসী রহ সর্বরজনী জাগিয়া॥
তাহার কিঞ্চিৎ ফল প্রদান করহ।
তুমিও বৈকুণ্ঠে চলে যাবে বন্ধুসহ॥
ইহা শুনি তারে কিছু ফল সমর্পিলা।
তৎক্ষণাতে দেবী নিজ স্থানে চলি গেলা॥

পরে রাজা আশ্চর্য হইয়া একাদশী দিনে পাত্রমিত্র বন্ধুবর্গ এমনকি পশুপক্ষীদিগকেও আহার না দিয়া সপরিবার বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন।

মুঞি পাপী অধম অধৈর্য-কলেবর।
জন্মাবধি হেন ব্রতের না হয় গোচর॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি হেন জনম পাইয়া।
আঁচলেতে গ্রন্থি দিনু কনক ঢাকিয়া॥
এই সব সদাচার লুপ্তপ্রায় জন্য
বিচার বুদ্ধি কিছু নাই, নাই মান্যামান্য।

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে ধর্মহীনতা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সদ্যমুক্ত বাংলাদেশও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইল। গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারত ও ভারতেতর বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করিয়া সাম্প্রতিক কালের পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই যে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে ঠিক ঠিক কি বুঝায় এবং কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-প্রবর্তন অবস্থাবিশেষে কেন অপরিহার্য হইয়া উঠে, এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ধর্ম বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি উহাও একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। দেখা যায় জগতে প্রচলিত সকল প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলিরই দুইটি দিক আছে—একটি উহাদের দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক দিক এবং অন্যটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের দিক। প্রথমটিতে সর্ব স্থান ও কালে অপরিবর্তনীয় সত্যসমূহের এবং দ্বিতীয়টিতে স্থান কাল ও পাত্রানুযায়ী পরিবর্তনশীল বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানসকলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মের উচ্চতম ভাবসকলের ধারণা ও তদনুযায়ী জীবনযাপন করিবার মত লোক সর্বকালেই অতীব দুর্লভ; গুরু নানকের কথায়—সত্য মহান, কিন্তু মহত্তর হইল সত্যনিষ্ঠ জীবন। (Truth is high, but higher still is truthful life). এই নিমিত্তই অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণের জন্যই বিশেষ করিয়া এইসকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, এসকলের মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণ লোকে ধর্মকে অনুষ্ঠান-সর্বস্ব করিয়া তোলে এবং ধর্মের উদার ভাবসকল ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইয়া পড়ে। জনসাধারণের এই অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ ধর্মান্ধ জনগণকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া ধর্মের নামে আপন আপন সামাজিক অথবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া লইতে চেষ্টিত হয়। ফলে, এই ধর্মান্ধতাপ্রসূত বিদ্বেষাগ্নি ব্যক্তিজীবন হইতে সমাজজীবনে এবং সমাজজীবন হইতে রাষ্ট্রজীবনেও ছড়াইয়া পড়ে। দেখা যায়, জনসাধারণের মধ্যে যেখানে শিক্ষার যত বেশী অভাব এবং চিন্তাশক্তি যত বেশী অল্প, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার সেখানে তত বেশী। এখানে শিক্ষা বলিতে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উভয়কেই বুঝিতে হইবে। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, জনগণের মধ্যে তথাকথিত শিক্ষার অভাব থাকিলেও তাহাদের সংস্কৃতি বহু যুগ ধরিয়া ধর্মবিষয়ে সহনশীলতা ও সহাবস্থানের ভাবকে একরূপ অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিল। ইহার কারণ মনে হয়, প্রাচীন আর্য ঋষিগণ আপন আপন ত্যাগতপস্যাপূত জীবনে যে মহান সত্যসকল উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা উদার সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই বহু

যুগ ধরিয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। কালক্রমে, যখন পরবর্তীকালে ত্যাগতপস্যার ভাব শিথিল হইয়া পড়িল এবং ইহলৌকিক ভোগবাসনা-চরিতার্থতাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন অবস্থা অন্যরূপ হইয়া উঠিল। সাধারণ লোকে (এস্থলে সাধারণ লোক বলিতে কেবলমাত্র অজ্ঞ জনসাধারণকেই নয়, যাহারা ধর্মের মূল তত্ত্বসকলের সম্যক্ আলোচনা অথবা উপলব্ধির চেষ্টা করেন নাই, এরূপ শিক্ষিত সমাজকেও বুঝিতে হইবে) অতঃপর ধর্মকে উহার উচ্চতম ভাব ও আদর্শের দিক হইতে না দেখিয়া উহা দ্বারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-সুবিধা অর্জনের দিক হইতেই বিচার-বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিল। সুযোগ বুঝিয়া সকল সম্প্রদায়েরই ত্যাগতপস্যা- ও উপলব্ধিবিহীন পুরোহিতগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া ইহাদের দ্বারা ধর্মের নামে সকল প্রকার অধর্মাচরণ করাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে লাগিল। যাহারা আপনাদিগকে শিক্ষিত ও উদারভাবাপন্ন বলিয়া মনে করেন, এরূপ অনেকের মধ্যেও এবিষয়ে এই দুর্বলতা এবং ধর্মের নামে বহু কুসংস্কার আসিয়া ঢুকিল। স্বার্থান্ধ পুরোহিতকুলের কবলে পড়িয়া ধর্মকর্ম কিরূপ হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়, তাহা আমাদের কাহারো অজানা নাই। আবার ধর্মের দোহাই দিয়াও স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবার লোভে নির্মম গণহত্যা ও ব্যভিচার সমাজ- ও রাষ্ট্রজীবনকে কিভাবে বিষাইয়া তুলে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। যে-সকল আচরণ নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য, আপন আপন গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের স্বার্থে সেই সকল আচরণ করিয়াই লোকে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুতঃ দেখাও যায় ধর্মের নামে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এবং নানা কালে যেরূপ অকথ্য অত্যাচার ঘটিয়াছে, অন্য কোনও কারণে সেরূপ ঘটে নাই। উহার কারণ এই যে, যে-বিবেকবুদ্ধি অথবা যথার্থ ধর্মবুদ্ধি অপরের প্রতি অন্যায় আচরণ হইতে মানুষকে বিরত রাখে এবং তাহাকে আত্মোন্নতির পথে পরিচালিত করে, উহাই যখন পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রভাবে অথবা বিকৃত শিক্ষাদীক্ষার ফলে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া অহিতকেই হিত এবং অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া ভাবাইতে আরম্ভ করে, তখন উহার গতিবেগ রোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কাজেই, ধর্মের নামে জগতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিতে দেখিয়া ধর্মমত অথবা ধর্মপথ মাত্রই যে বহুবিধ অনর্থের মূল এবং মাদকদ্রব্যের ন্যায় উহা মানবমনকে জড় ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই সাধন করিয়া থাকে—জগতের মহামনীষিগণের মধ্যেও কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলে উহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই থাকে না। মনে হয়, এইরূপ অভিজ্ঞতার ফলেই ইদানীন্তনকালে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন ও প্রয়াস দেখা দিয়াছে। ইহা ভিন্ন, বর্তমান কালে প্রায় প্রতিটি দেশেই বিভিন্নধর্মাবলম্বী-দের বাস। অতএব রাষ্ট্রীয় অথবা সমাজ-ব্যবস্থাকে কোন একটি বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মকলহেরই অবকাশ ঘটানো হয়। অন্য একটি দিক দিয়াও বিষয়টি বিবেচনার যোগ্য। হিন্দুই হৌক, মুসলমানই হৌক, খৃষ্টান অথবা বৌদ্ধই হৌক, বহু শতাব্দী পূর্বে

এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তৎকালীন প্রয়োজনানুরূপ অনুষ্ঠানসকল প্রবর্তিত হইয়াছিল, প্রগতিশীল জগৎ ও সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সেগুলির যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন না করিতে পারিলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা যে অর্থহীন গোঁড়ামিতে পরিণত হইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

সেইজন্যই মনে হয়, সকল ধর্মের মূল সত্যসকলকে অবিকৃত রাখিয়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসকলের যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করিয়া লইতে পারিলেই সমাজের তথা রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। হিন্দু যদি প্রকৃত ধার্মিক হয় এবং মুসলমান যদি নিরপেক্ষ ও উদার ভাবে মুসলমানধর্মের মূল তত্ত্বসকলের অনুবর্তী হয়, তাহা হইলেই নূতন পরিবেশে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনই গড়িয়া উঠিবে। হিন্দুকে মুসলমান অথবা মুসলমানকে হিন্দু হইতে হইবে অথবা উভয়কেই আপন আপন ধর্মমত ও পথ পরিত্যাগ করিয়া একত্র মিলিত হইতে হইবে এমন নহে। এই প্রসঙ্গে সম্রাট আকবরের "দীন এলাহি" ধর্মমতের কথাটিও মনে আসিয়া গেল। ধর্মের মাধ্যমে হিন্দুমুসলমানের মিলন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মহামতি আকবর উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নূতন এক ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হইয়াছিল, কেননা ধর্ম আধ্যাত্মিক-উপলব্ধিপ্রসূত; লৌকিক যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা উহার সমন্বয়সাধনকে প্রকৃত ধর্মসমন্বয় আখ্যা দেওয়া চলে না। অতএব সামাজিক অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এরূপ ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা দ্বারাও ঈপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। অপর পক্ষে, ধর্মকে রাজনৈতিক অথবা সামাজিক শাসন মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দান করিলে উহা দ্বারা অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। দেখা যায়, অতীতকালে যেখানে যেখানে রাজশক্তির বলে ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছে সাময়িকভাবে সেখানে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলেও প্রকৃত ধর্মভাবের প্রসার কমই হইয়াছে। ধর্ম অন্তরের জিনিস, বলপূর্বক কাহারও উপর উহা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী ফলিয়া থাকে। তবে, যেমন কোন বৃক্ষশিশুর বৃদ্ধির জন্য উন্মুক্ত আকাশ, অনুকূল পরিবেশ ও রৌদ্রজলের প্রয়োজন হয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের দিক হইতে নিরপেক্ষভাবে ততটুকু সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য।

কিন্তু ভয় আছে; ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে কোন ক্ষেত্রেই যেন আমরা ধর্মহীনতা মনে না করিয়া বসি। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িতে গিয়া যাহাতে ধর্মহীনতা প্রশ্রয় না পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন আছে। মনে হয়, ঠিক ঠিক ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে পরধর্মসহিষ্ণুতা মাত্র বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে না। পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা-বর্জনকে বড়জোর ধর্মনিরপেক্ষতার নেতিবাচক অর্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উহার প্রকৃত এবং ইতিবাচক অর্থ—পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা; আমাদিগকে শুধুমাত্র পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হইলেই চলিবে না, আমাদিগকে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও হইতে হইবে। কিন্তু পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হইলে ধর্মকে বর্জন করিয়া তো নয়ই, উহাকে পাশ কাটাইয়া

গিয়াও উহা কখন সম্ভব হইতে পারে না; অপরপক্ষে প্রত্যেক ধর্মের মূল তত্ত্বসকল শ্রদ্ধা ও ধৈর্যের সহিত অনুধাবন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঈশ্বর যদি এক এবং অদ্বিতীয় হন, তবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও পথের মধ্যে নিশ্চয়ই সেই পরম ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহার আভাসেই কেবল সত্যকারের ধর্মসমন্বয় ও ধর্ম লইয়া বিবাদ বিসংবাদের অবসান এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সার্থকভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে।

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কার ভালোবাসা পেলে, পেলে না কাহার—
তা নিয়ে কাঙাল চিত্তে কেন হাহাকার?
যাহা অল্প, কর্পূরের মতো উবে যায়—
তার মাঝে চির সুখ উন্মাদেই চায়!
অহং-এর বেড়া ঘেরা ক্ষেত্র চেতনার;
সীমিত মানব-প্রেম; নহে সে অপার।
তাই বলি ভিক্ষা-পাত্র বহি দ্বারে দ্বারে
কেন আর উঞ্ছবৃত্তি? ভালোবাসো তাঁরে
যাঁরে পেলে আর সবই তুচ্ছ মনে হয়;
চরম দুঃখেও শান্ত প্রসন্ন হৃদয়!
সর্বশোক অপগত! বহ্নি বাসনার
নির্বাপিত! নির্বাণের প্রশান্তি আত্মার!
চিত্ত হোক মধুকর পাদ-পদ্মে তাঁরই!
ছাড়ি দিব্যরত্ন কেন কাঁচের ভিখারী?

বিবেকানন্দ-মানসে উপনিষৎ

স্বামী জীবানন্দ

উপনিষৎ সর্বোত্তম পারমার্থিক জ্ঞানের অমৃতসিন্ধু। এই জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন ক'রে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন স্বামীজী. এর গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ ক'রে দেখেছিলেন অমূল্য রত্নরাজি। সেই রত্ন আহরণ ক'রে তিনি নিপুণ শিল্পীর মতো যুগোপযোগী গড়ন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের মধ্যে অনবদ্যভাবে সংস্থাপিত ক'রে জগদ্বাসীকে উপহার দিয়েছেন শাশ্বত অলঙ্কার।

প্রাচীন ভারতের মহাপ্রাজ্ঞ অনুভূতিমান ঋষিগণ যে পরম সত্য, চরম ঐক্য ও মহাসাম্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা ই ভাষারূপ পেয়ে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হয়ে নিবদ্ধ আছে বেদের সারভাগ উপনিষদে—জন্মজন্মসঞ্চিত অজ্ঞান অন্ধকার দূর ক'রে মানুষের অন্তরে জ্ঞানদীপ জ্বালিয়ে দিতে।

সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত ব্রহ্মই উপনিষদে প্রতিপাদিত সত্য। ভারতের সনাতন শাস্ত্রসমূহের মর্মমূলে উপনিষদেরই চিন্তাধারা। সর্বধর্মসমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর বহুবিচিত্র সুকঠোর সাধনার মাধ্যমে; স্বামীজীর সূক্ষ্মতম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল—শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বেদমূর্তি, উপনিষদের মহাজ্ঞান তাঁতে ওতপ্রোত, উপনিষদের ভাবে তিনি নিষ্ণাত, তাঁর সমস্ত কর্ম সেই মহাভাবে সুনিয়ন্ত্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোক থেকেই স্বামীজী কর্মপরিণত বেদান্তের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই তিনি জগতে অভিনবভাবে পরিবেশন করেছেন বেদান্তকে কার্যে পরিণত করবার উপায়, বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার অনুপম প্রণালী। স্বামীজীই বেদান্তের মহাবাণী, উপনিষদের উচ্চতম সত্য সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের যুক্তিবাদী মনের বোধগম্য ক'রে উপস্থাপিত করেছেন। বিবেকানন্দ-মানসে উপনিষৎ যুগোপযোগী ভাব নিয়ে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে সর্বত্র বিস্তারিত।

উপনিষৎসমুদ্র মন্থন ক'রে স্বামীজীই ভারতবাসীকে দিয়েছেন অভীঃ ভাব, তমোভাব কাটিয়ে উঠতে গেলে যা ব্যষ্টির জীবনে ও সমষ্টির কল্যাণে অপরিহার্য। অভীঃ-মন্ত্রের উদ্গাতার কণ্ঠে উপনিষদের মহামন্ত্র: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত,—'Arise, awake and stop not till the goal is reached.'—এই অগ্নিময়ী মৃতসঞ্জীবনী বাণী মানুষের অন্তর স্পর্শ ক'রে তাকে শিখিয়েছে ভয় পরিহার করতে, উদ্বুদ্ধ করেছে মহাকল্যাণে আত্মত্যাগে। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন উপনিষদের জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত, তাঁর কর্মকেন্দ্রের মর্মে মর্মে উপনিষদের চিন্তাধারা, তাঁর উপনিষৎপ্রীতি উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে ভাষণাবলীতে, তাঁর জ্ঞানসম্পৃক্ত রচনায়।

উপনিষৎ নিঃশেষে জন্মবন্ধন ছিন্ন ক'রে ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি ঘটায়, সমস্ত সীমার ঊর্ধ্বে যে সচ্চিদানন্দ, কার্যকারণাতীত সত্তা—তাঁকেই পূর্ণরূপে প্রকাশ ক'রে দেয়। যে উপনিষৎখানি স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেটি হচ্ছে কঠোপনিষৎ। কঠোপনিষদের ভাব ও ভাষায়

প্রাণভরে প্রশংসা করেছেন স্বামীজী। যে কাহিনী অবলম্বনে এই উপনিষদে আত্মতত্ত্ব পরিবেশিত, তারও তুলনা হয় না। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু বালক নচিকেতা, কী নির্ভীক, কী সত্যসন্ধ, শ্রদ্ধার প্রতিমূর্তি! আর যাঁর মুখ দিয়ে অপূর্ব আত্মতত্ত্ব নিঃসৃত হয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু নচিকেতার দুর্বার আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্ত ক'রে চিরন্তন সত্যের অপরোক্ষানুভূতি করিয়ে দিয়েছে, তিনি হলেন পরমতত্ত্ববিৎ সত্যাশ্রয়ী যম।

কবিত্বময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভে যে প্রশ্ন, স্বামীজী তার উল্লেখ করেছেন 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ' বক্তৃতায়। কেউ বলেন, 'মানুষ মরে গেলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না'; আবার কেউ বলেন, 'না, তখন তার অস্তিত্ব থাকে'। এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য? উপনিষদের ভাষায়—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।'

যেখানে সূর্য চন্দ্র তারকা সব নিষ্প্রভ, বিদ্যুৎসমূহেরও প্রকাশ-সামর্থ্য নেই, সেখানে পার্থিব অগ্নির স্থান কোথায়? তিনি প্রকাশ-মান ব'লেই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান হয়। সেই ব্রহ্মের দীপ্তিতে সব কিছুরই দীপ্তি!

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥'

স্বামীজীর মতে অতুলনীয় এ ভাষা। ক্রান্তদর্শী কবির কবিত্বের সঙ্গে শাশ্বতভাবের দ্যুতিময় মণিকাঞ্চনযোগ!

বেদান্তকেশরী স্বামীজীর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত মানুষের যথার্থ স্বরূপ, তিনি প্রত্যক্ষ করতেন তার চির-অবিনশ্বর সত্তা—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যোদ্ভাসিত স্বরূপ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরম উপলব্ধির কথা তাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে জগৎকে জানিয়ে দিয়েছে তাঁর বেদান্তানুভূতির ব্যাপকতা, অনন্ত হৃদয়বত্তা: শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্য-লোকের অধিবাসিবৃন্দ, আমি জেনেছি সেই পুরাতন মহান পুরুষকে; আদিত্যের ন্যায় তাঁর বর্ণ; সকল অন্ধকারের পারে তিনি, তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।'
'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥'

চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রাণের কথা উদ্ঘাটিত: 'অমৃতের পুত্র'—কী মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই মহা-পাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর মিথ্যা কলঙ্ক-আরোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে ক'রছ, দাও ফেলে ভ্রমজ্ঞান দূর ক'রে চিরতরে। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য বেদান্তই হবে সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ ধর্ম। অনিত্য বস্তুসমূহের

মধ্যে সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্ম বিদ্যমান 'নিত্যোঽনিত্যানাং…'। বহির্জগতে রূপরস-গন্ধস্পর্শময় বস্তুনিচয় নিখিল বিশ্বে বিচিত্রভাবে ফুটে উঠছে ; অবর্ণনীয় বৈচিত্র্য এখানে, কিন্তু Substratum অর্থাৎ অধিষ্ঠান চির-অপরি-বর্তনীয়। অন্তরে প্রত্যেকের সেই একই চৈতন্য বিদ্যমান। নামরূপের মাধ্যমেই জগতের অভিব্যক্তি, বৈচিত্র্যের প্রকাশ। সূর্যকিরণ দেখায় সাদা। কিন্তু সেই শ্বেত বর্ণ—সাতটি রঙের সংমিশ্রণ 'Vibgyor' (violet indigo, blue, green, yellow, orange, red) ; অর্থাৎ বেগুনী, নীল, আশমানী, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল—এই সাতটি রঙ আছে সূর্যের কিরণে। প্রাক্‌সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে আমরা দেখি কত বিচিত্র রঙের খেলা—মুহূর্তে মুহূর্তে পরি-বর্তনের মাধ্যমে শত শত রঙ আমাদের নয়ন মন বিমোহিত করে। দক্ষ চিত্রকর সাতটি রঙের মিশ্রণে হাজার হাজার রঙ তৈরি ক'রে তাঁর তুলি দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন। নামে রূপে গুণে ভাষায় বিচিত্রতা যত, সৌন্দর্যের প্রকাশও তত। নাম-রূপ-গুণ-ভাষার নানাত্ব স্বীকার ক'রে নিই আমরা, তাই ধর্মমতের নানাত্ব অবশ্য স্বীকার্য। একই সৎ চিৎ আনন্দ বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন ধর্মমতরূপে জগতে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুবিচিত্র সাধনানুভূত চিরন্তন সত্যের অপূর্ব বাঙ্ময় প্রকাশ 'যত মত তত পথ'—'অনন্ত মত অনন্ত পথ'। বহু মানুষের বহু ভাষা হবেই ; বহু মত, বহু পথও থাকবে কোন সন্দেহ নেই। একই পরিবারে দশ জনের দশ রকম ধর্ম থাকলেই বা কি, সেই শাশ্বত সত্য তো একই, স্বামীজীর মতে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ধর্ম হবে বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু পরম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য থাকবে দ্বন্দ্ববিহীন অনেক মত, অনেক পথ। সর্বসংস্কারমুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনা-লোকে উদ্ভাসিত হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী এক পরিবারভুক্ত হবে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী হয়েও এবং চিরন্তন সত্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা পোষণ করবে সর্বপ্রকার গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে। তখনই প্রকৃতপক্ষে 'বনের বেদান্ত' ঘরে ঘরে অনুশীলিত হবে।

উপনিষদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে স্বামীজী সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে তা বেশ বোঝা যায়। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর কোলাকুলি করবে। বিজ্ঞান যে ধর্মের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করবে, সে ধর্ম উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম। স্বামীজীর মতে—যখন কোন মহান্ বিজ্ঞানাচার্য বলেন, সবই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্তন করছেন—

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
　　রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
　　রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥'

—যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হয়ে নানারূপে প্রকাশিত, সেইরূপ সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছেন, আবার তিনি জগতের বাইরেও আছেন। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর মতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত, তা সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য : ধর্মচেতনা ব্যতীত বিজ্ঞান যেমন খঞ্জ, বিজ্ঞানচেতনা ব্যতীত ধর্ম তেমনি অন্ধ। সত্যদ্রষ্টা স্বামীজীর প্রাণের

বিজ্ঞান ও ধর্মের শুভ মিলনে

কল্যাণব্রতী মানবসমাজ একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। তখন ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নিয়ে মারামারি কাটাকাটির চিরতরে অবসান ঘটবে আর বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ক্রিয়া মানবকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সংঘটিত হবে। Art, science এবং religion সম্বন্ধে স্বামীজীর একই মর্মবাণী: Art, science and religion are but three different ways of expressing a single truth. কলা, বিজ্ঞান, ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করবার তিনটি উপায়। কলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বারা সেই চিরন্তন সত্যই প্রকাশিত হতে থাকলে মানবসমাজ যে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাবে, তাতে আর কোন সংশয়ই থাকতে পারে না। উপনিষদের মহাজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে সব কিছুর প্রকাশ হতে থাকবে। তখন সাহিত্য বিজ্ঞান ললিতকলা ও ধর্মের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হবে সেই দিব্য দ্যুতি—যার কেন্দ্রে উপনিষদের চিরন্তন সত্য।

আত্মতত্ত্ব শুধু বললে হবে না, আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে ভয়ের পারে অভয়ের রাজ্যে যাওয়া যাবে না, সর্বাবস্থায় পরমানন্দের উপলব্ধি হবে না। স্বামীজী একটি অদ্ভুত গল্প বলেছেন এই প্রসঙ্গে: একটি হরিণী হ্রদে তার প্রতিবিম্ব দেখিয়ে শাবককে বলেছিল, 'দেখ, আমার কত বল, কেমন ছুটতে পারি আমি! আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত দৃঢ়!' এমন সময় দূরে কুকুরের ডাক শোনা গেল। যাই শোনা, অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে তড়িৎগতিতে পলায়ন! খানিক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে শাবকের কাছে ফিরে এলে শাবক ব'লল, 'তুমি বলছিলে যে তোমার খুব বল তবে কুকুরের ডাক শুনে পালালে কেন?' হরিণী ব'লল, 'কুকুরের ডাক কানে গেলে আমার আর জ্ঞান থাকে না।' হরিণীর মতো আমরাও এমনি সারাটি জীবন ধ'রে ক'রে চলেছি! মুখেই কেবল বড় বড় কথা। স্বামীজী বলছেন, সেইজন্যই আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনতে হবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করতে হবে, তারপর ক্রমাগত ধ্যান করতে হবে, আত্মতত্ত্বে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত হলেই আত্মদর্শন। লক্ষ্য হ'ল আত্মদর্শন; উপায়—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।'

স্বামীজীর কথা: I have message for the West—পাশ্চাত্যের জন্য আমার বাণী আছে। সে বাণী তিনি পাশ্চাত্যবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কি সে বাণী? সে বাণী হচ্ছে আত্মার অমৃতত্বের বাণী, যা উপনিষদে বিধৃত। 'Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within by controlling nature, external and internal.'—আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। যে ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের কথা স্বামীজীর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উদাত্তকণ্ঠে নিঃসৃত হয়েছিল, তার মূর্ত বিগ্রহ স্বামীজী স্বয়ং। তাঁর মধ্যে প্রাচ্যের যা সব চেয়ে ভাল অর্থাৎ পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা এবং প্রতীচ্যের যা সর্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ কর্মোদ্যম, এই উভয়ের সার্থক মিলন ঘটেছিল, তাই তো মানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে তাঁর বাণীর আবেদন অপ্রতিরোধ্য, তর্কাতীত ও প্রাণস্পর্শী!

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে 'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব।' মাতা পিতা আচার্যকে দেবতুল্য জ্ঞান ক'রে

তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হতে ঋষিনির্দেশ। স্বামীজী এই সঙ্গে যুগোপযোগী মহাবাণী যুক্ত ক'রে দিয়েছেন—'দরিদ্রদেবো ভব'। দরিদ্ররাও তোমাদের দেবতা হোক, তাদেরও দেবতার স্থানে বসাও। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সর্ব দেশের রিক্ত বঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে স্বামীজী ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই চির-অবিনাশী সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপকে, যাঁকে তিনি নিরন্তর উপলব্ধি করতেন নিজের মধ্যে; তাই তো তাঁর কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে: যদি ভগবানকে চাও, মানুষের সেবায় দেহক্ষয় কর। শুধু দিয়ে যাও, প্রতিদানে কিছুই চেয়ো না। 'দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।' বিত্তে দরিদ্র, জ্ঞানে দরিদ্র, স্বাস্থ্যে দরিদ্র, এ সংসারে আরো কত রকমের দরিদ্র! ক্ষুধার্তের ক্ষুধা মেটাও; দাও অন্নহীনকে অন্ন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, কর্মহীনকে কর্ম, বিদ্যাহীনকে বিদ্যা। দাতার অহঙ্কার নিয়ে দিও না, দাও সেবার ভাব নিয়ে, পূজার ভাব নিয়ে। দেবোপাসনার মনোভাবে দরিদ্রের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর। স্বামীজী-প্রদত্ত 'দরিদ্রদেবো ভব' মহামন্ত্রের তাৎপর্য অতি গভীর ও ব্যাপক। এ হচ্ছে সেবার ভাব নিয়ে উপনিষদের জ্ঞানকে কর্মজীবনে পরিস্ফুট করবার অভিনব উপায়। হয়তো জগতে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন ধনদানের প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু তখনও মানুষের শোক থাকবে, অতএব প্রিয়জনের বিরহে শোকসন্তপ্ত অসহায় মানুষকে সান্ত্বনা দেবারও প্রয়োজন থাকবে, অজ্ঞান দূর করার জন্য জ্ঞানদীপ জ্বালারও প্রয়োজন থাকবে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের যতদিন না শান্তি হচ্ছে, ততদিন মানুষকে সেবা করার প্রয়োজনও থাকবে।

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন: বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে উড়িয়ে দেয় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নেই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নয়—নিজেকে শুকিয়ে ফেলা নয়। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করা। জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, একে আমরা যেমন জানি, যেভাবে জগৎ প্রতিভাত হচ্ছে, তা জগতের প্রকৃত স্বরূপ নয়। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখতে হবে—বাস্তবিক জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

স্বামীজী বার বার বলেছেন, বেদান্তের মতে অর্থাৎ উপনিষদের মতে—আমাদের নিজ আত্মাই সর্বোচ্চ স্বর্গ, মানবাত্মাই পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, সর্বপ্রকার স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যেভাবে সেই সত্যকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়, আর কোথাও তেমন সুস্পষ্টভাবে সত্যানুভব হয় না।

স্বামীজীর ঐকান্তিক ইচ্ছা—উপনিষদের আত্মতত্ত্ব সমগ্র জগতে প্রচার করতে হবে, যাতে আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষেরই এই তত্ত্ব সাধারণ সম্পত্তি হতে পারে। তখন এই উচ্চতম ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করতে থাকবে, আর আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য যে বায়ুতে নির্বাহ করছি, তার তালে তালে ধ্বনিত হবে—'তত্ত্বমসি'। অসংখ্য-চন্দ্রসূর্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ভাষণক্ষম প্রত্যেক জীবের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হবে- 'তত্ত্বমসি', 'তত্ত্বমসি', 'তত্ত্বমসি'!

ইশারউড এবং হিন্দুর সন্ন্যাসবাদ

স্বামী বাণগোবিন্দ পরমপন্থী

খৃষ্টোফার ইশারউড স্বনামখ্যাত লেখক। তাঁর লেখা উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইংরেজী সাহিত্যে তাঁকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। উপন্যাস-লেখক হলেও মুখ্যতঃ তিনি আধ্যাত্মিক চর্চার অনুরাগী। হলিউডে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সংস্পর্শে এসে তিনি ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যে আকৃষ্ট হন এবং এই প্রসঙ্গে কয়েকটি মনন-শীল বইও রচনা করেছেন এবং কিছু যুক্তভাবে সম্পাদনও করেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনায় ভারতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন সমুজ্জ্বল। স্বামী প্রভবানন্দের সঙ্গে যুক্তভাবে তাঁর গীতার ইংরেজী অনুবাদ বিশ্বসুধীমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। ইহা ব্যতীত Upanishad—the Breath Eternal এবং শঙ্করাচার্যের বিবেক-চূড়ামণি "The Crest-jewel of Discrimination" (Montor Edition-এ প্রকাশিত)। ইঁহারা যুগ্মভাবে অনুবাদ ও সম্পাদন করেছেন যা সাধারণ পাঠকের বেদান্তের মূল তত্ত্ব-গুলির সহিত পরিচয়ের পথ সুগম করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী (Ramkrishna and His Disciples ১৯৬৪) এবং বিবেকা-নন্দের জীবনী (John Yale সম্পাদিত What Religion is in the Words of Swami Vivekananda-এর মুখবন্ধরূপে এবং Teachings of Swami Vivekananda (1964)-এ পুনর্মুদ্রিত) শুধু তথ্যনির্ভর নয়, তাহাতে তাঁহার মহাপুরুষের জীবনী ও বাণীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন সুস্পষ্ট। এ ছাড়া তিনি An Approach to Vedanta (১৯৬৩)-এ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বিবৃত করেছেন। বেদান্ত ও আধুনিক জগতে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের রচনা-সংকলনের দুটি গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত Vedanta for the Western World এবং Vedanta for Modern Man (১৯৫১)। John Yale-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত "What Vedanta Means to Me"তে তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুন্দররূপে বিবৃত করেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁর প্রত্যয়নিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বেদান্তের মৌলিক চিন্তাধারা কিভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের প্রভাবিত করেছে এবং কতখানি তা আধুনিক জীবনে উপযোগী, এই নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধ-সংকলনে পাই। বেদান্ত যে কেবলমাত্র তর্কগ্রাহ্য এবং বিচারনিষ্ঠ দর্শন নয়, কিন্তু মানুষের সামগ্রিক জীবনে যে এর ব্যবহারিক উপ-যোগিতা আছে তা তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ব্যব-হারিক বেদান্ত (Practical Vedanta) বক্তৃতাবলীতে এর বিশদ আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ইশারউড বেদান্তের এই ব্যবহারিক দিকটির প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

'বেদান্ত যথার্থই বীজগণিতের মত—সাধারণভাবে ধর্মগুলির সংক্ষিপ্তসার—জীবনকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে, সেগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখিয়ে জীবনে কিভাবে চলতে হবে তা দেখিয়ে দেয়। আপনি

হয়তো ভক্ত, একটা সৎ কাজ নিয়ে আছেন। আপনি একজন টমাস একুইনাস বা অ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস বা জর্জ ফক্স হতে পারেন।... বিভিন্ন রুচির মানুষ বিভিন্ন পথ ধরে চলে।"[১]

এই একটি উদ্ধৃতিতে বেদান্তের জীবন-দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা প্রস্ফুটিত। ইশারউডের লেখার মধ্যে একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর সংবেদনশীল মন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি মমত্ববোধ। বিদেশী লেখক যাঁরা হিন্দু জীবনধারা নিয়ে বই লিখেছেন—অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাঁরা ভারতের চিন্তা এবং দর্শনকে বোঝাবার চেষ্টা করেননি, বরং তাঁরা অন্য ভাবেই দেখিয়েছেন। ইশারউড, সমারশেঠ মম্ এবং অলডাস হাক্স্‌লী এই দিক দিয়ে এক ব্যতিক্রম, মম্ তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসে, যেমন Razor's Edge, Narrow Corner এবং Painted Veil-এ ভারতীয় ও চৈনিক জীবনদর্শনের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। Razor's Edge-এ বেদান্তের 'মায়াবাদ'-এর যে সুন্দর ও নিখুঁত বিশ্লেষণ আছে তাতে তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাই। ঔপন্যাসিক এবং প্রবন্ধকার হিসাবে ইশারউড সাহিত্যে তাঁর সৃজনী প্রতিভার বিকাশ দেখিয়েছেন। উপন্যাস হিসাবে 'Mr. Norr's Change Train', 'The World in Evening' প্রভৃতি এবং প্রবন্ধ-সংকলন "Exhumation" উল্লেখযোগ্য।

২

ভারতীয় জীবনধারাকে অবলম্বন করে বিদেশী ও ভারতীয় লেখকেরা ইংরেজীতে বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন। সবগুলি উপন্যাসই মূলতঃ ভারতীয় জীবনধারা, তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ইঙ্গ-ভারতীয় লেখকরা সামাজিক পটভূমিকায় বিশেষভাবে তাঁদের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন এবং তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সমাজসচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিদেশী লেখকেরা সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা ছাড়াও প্রবাসী বিদেশীদের জীবনযাপনের চিত্রটি তুলে ধরেছেন—অনিবার্যভাবে ভারতীয় জীবনধারার প্রতিফলন হয়েছে। E. M. Forster-এর 'A Passage to India', ব্রুমফিল্ডের 'A Night in Bombay', 'Rain Came' মালাবার হিল, পার্লবাকের 'Come, My Beloved' এই প্রসঙ্গে নিদর্শনরূপে ধরা যেতে পারে—অন্যান্য লেখকদের আরো উল্লেখযোগ্য বই আছে। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে ভারতীয় জীবনধারার যথার্থ প্রতিফলন

১ Vedanta is really almost a kind of Algebra, a sort of way of thinking about religions in general since it provides a way of life as it were, grouping them and relates them all to each other. You can be a devotional person, let us say, a person who operates through good work. You can be a Thomas Acquinas or a St. Francis of Assisi or Gerorge Fox, the Quaker. You can find all these approaches to realisation in the Christian religion. Really it is more a matter of psychophysical type. I think more than anything else which religion you choose. Different ways appeal to different kinds of people. —Twentieth Century— Autumn, 1961

ঘটেনি—যাদের নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিরূপে ধরা চলে না। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পেরেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা বোঝাবার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করেছে। রাজা রাও-এর 'A Serpent and the Rope' ভারতীয় তথা হিন্দু জীবন-দর্শনকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তোলার একটি মহৎ প্রচেষ্টা হলেও আমাদের মনে হয় তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃতিতে কণ্টকাকীর্ণ হওয়ায় দুর্বল হয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই যেন তিনি দিয়েছেন, বিদেশে প্রবাসী হয়ে তিনি বইখানি লিখেছেন, কাজেই ভারতীয় জনচিত্তের সহিত তাঁর সংযোগ তেমন ছিল না এবং থাকলেও তা পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে নাই। মম্ এবং হাক্সলী হিন্দু জীবন এবং দর্শনকে বৃহত্তর পাঠকের সঙ্গে উপন্যাসের মাধ্যমে পরিচিত করার চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টা সার্থকও হয়েছে। তাঁরা উভয়ে চেষ্টা করেছেন হিন্দু দর্শনকে বোঝবার এবং নিজেরাও সে সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছেন। আরো কয়নার উপন্যাসে এক নায়কের মুখ দিয়ে মম্ বলেছেন: 'সত্যান্বেষণে ঘুরে বেড়ানোই আমার জীবন। সত্যের সঙ্গে কোন আপস চলে না। ভারতীয় চিন্তাশীলদের কাছে এ উপায় নয়, লক্ষ্য। সত্যই জীবনের চরম লক্ষ্য। যে জগৎ আমি ছেড়ে এসেছি, অনেক আগে কখনো কখনো তার জন্য লালসা জাগত—ওলন্দাজদের ক্লাবে গিয়ে সচিত্র পত্রিকাগুলি দেখতাম, লণ্ডনের ছবি চোখে পড়লেই মনটা খারাপ হত। কিন্তু এখন আমি জেনেছি, কেবল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেই শহরের সভ্যতাকে পুরোপুরি উপভোগ করা সম্ভব। অনেক পরে শেষে আমি এই শিখেছি যে, আমরাই, জীবন থেকে নির্বাসিতেরাই, জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য পাই।'[২]

তাঁর এই স্বীকৃতি গভীর ব্যঞ্জনাময় এইজন্য যে, সমগ্র ভারতীয় চিন্তাধারার মূল সুরটি এতে ধরা পড়েছে। অলডাস হাক্সলী তাঁর উপন্যাস 'Island'-এ বৌদ্ধ মহাযান নিয়ে আলোচনা করেছেন—কিভাবে এক ডাক্তারের জীবন মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তা তিনি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য বোধিসত্ত্বের সংকল্প ও আহ্বান তাঁকে মহাযানের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং দর্শনের ভিত্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক তিনি করতে চেয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিভেদ যাই থাকুক না কেন, 'দর্শন' বা চিন্তাধারা দুই হয় না—সেখানে ঐক্য এক স্থির বিন্দুরূপে ধরা যায়। এই দুই ধারা যদি মিলতে পারে তবে জগতের

২ "My life has been a journey in search of Truth and there can be no compromise with Truth but for the thinkers of India it is not a means but an end. Truth is the goal of life. Years ago I used sometimes to hanker for the world I had left behind me. I would go to the Dutch club and look at the illustrated papers and when I saw pictures of London my heart ached. But now I know that it is only the recluse who enjoys the civilisation of cities to the full. At long last I have learnt that it is we exiles from life who get most value from it." —Bantam Edition (1959) p. 96-7

রূপ কি নেবে তাই এই উপন্যাসের মাধ্যমে হাক্সলী পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ এবং প্রাচ্যের বৌদ্ধমহাযান-প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ—জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই চিরায়ত ভাবধারার মিলন হলে কি ঘটে, তাই দেখাবার চেষ্টায় উপন্যাসটিতে এই দুটি ভাবকে সমন্বিত করেছি।'*

Ape and Essence-এ তিনি ভারতীয় মানবিক মূল্যবোধের জয়গান করেছেন এবং গান্ধীজীর জীবনের পটভূমিকা লেখায় হিংসার চরম পরিণতির কথাই শুনিয়েছেন।

৩

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, পূর্ববর্তী লেখকরা হিন্দু জীবন-দর্শনের সামগ্রিক রূপটি মোটামুটিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক নিয়ে কেহ উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেননি। ঈশারউড তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস "A Meeting by the River" (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭)-এ হিন্দু জীবন-সাধনার অনালোচিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দুর সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে সেভাবে আলোচনা হয় নাই—যা হয়েছে তাও সামগ্রিকভাবে নয়। খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসবাদ একটি অনুষ্ঠানগত (organisational) আচার, কিন্তু হিন্দুর সন্ন্যাস বা চতুর্থাশ্রম কোন অনুষ্ঠানসাপেক্ষ নয়—দার্শনিক ভিত্তিতে বিধি-বিধানের বাইরে। তবুও দেখা যায় আচার্য শঙ্কর পরবর্তীকালে সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটি অনুষ্ঠান-গত নিয়মের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন। 'দশনামীর' প্রবর্তন ইহার প্রমাণ (মঠাম্নায় দ্রষ্টব্য)। উপনিষদ্-যুগে বিভিন্ন সন্ন্যাসোপনিষদের মাধ্যমে (জাবাল, আরুণি, নারদ, পরিব্রাজক, পরমহংস প্রভৃতি) সন্ন্যাস-জীবনের আচরিত বিধি-নিয়মকে একটি রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তীকালে 'যতি-ধর্ম-সংগ্রহে', 'নির্ণয়সিন্ধু'তে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুষ্ঠিত আচার এবং বিধি-বিধানগুলিকে একত্র করা হইয়াছে; অবশ্য বর্ণাশ্রমধর্ম-নির্ণয়প্রসঙ্গে পুরাণ এবং অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ আছে। বৌদ্ধধর্মেও ভিক্ষুভিক্ষুণী-দের আচরিত জীবনের নিয়মগুলি মহত্তর জীবনযাপনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে এবং বুদ্ধই প্রথম সঙ্ঘের মাধ্যমে সংসারবিরাগী যতিদের দেশকল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইহার আনুগত্যের মাধ্যমে এক নূতন রূপ দান করেন। হিন্দুর বর্ণাশ্রম সুপ্রাচীন এবং সন্ন্যাসও হিন্দুজীবনের অবশ্য কর্তব্যরূপে বিবেচিত। সন্ন্যাসের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন উদার ভাবধারা যেভাবে অনুসঞ্চারিত তা আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্ণাশ্রমের কঠোর নিয়মের বাইরে, সন্ন্যাসী বিশ্বজনীন উদার আলিঙ্গনে সবাইকে আপন করে নিয়েছেন—দেশ কাল জাতির সেখানে

* "Bringing together in the novel of the two traditions of East and West as represented by the scientific approach to life of West and spiritual and psychological approach of Mahayana Buddhism was an attempt to see what would happen if man made the use of the both worlds."

—Interview with B. B. C, Assam Tripura

বিচার নেই। হিন্দুর সন্ন্যাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইতিহাসাশ্রয়ী তেমন কোন আলোচনা হয় নাই অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়" সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একটি ইতিহাস। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের Hindu View of Life এবং ডঃ সুকুমার দত্তের Monasticism in India (Cultural Heritage of India, Vol, 11, 1962) হিন্দু সন্ন্যাস সম্বন্ধে কিছু দিগ্‌দর্শন ঘটিয়েছে। জি. এস. ঘুরের "Sadhus of India" সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ওম্বনী এলেন জামিসেমের Monasticism, Christian & Hindu Buddhist তুলনামূলক আলোচনা হলেও হিন্দুর সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাসীর জীবন, দর্শন বা মূলতত্ত্ব লেখক ফোটাতে পারেননি। বিদেশীরা অবশ্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন, বই লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি সকল ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আধুনিক কালে কিছু গভীর আলোচনা হয়েছে—যেমন The Saving Role of Renunciation and Service in Benighted World (বেদান্ত-কেশরী, Vol. 37, 1950-1951) নিঃসন্দেহে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যমূলক এবং তাত্ত্বিক আলোচনা। এছাড়া প্রবুদ্ধ ভারতে (Vol. 2XXII No 9 Sept. 1957 : Practice of Ascetic Austerities, জন মফিটের "Varieties of Contemporary Hindu Monasticism" (বেদান্ত-কেশরী, June-July 1970) এবং রোডারিক নীল—'Sadhus and Hippies' (Quest, No 65, April-June 1970) সাম্প্রতিক কালে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং বিদগ্ধ আলোচনার নিদর্শন এবং কিভাবে হিন্দু জনজীবনে ইহার প্রভাব সক্রিয় রয়েছে তার পরিচায়ক। মফিট এবং নীল দুজনই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সন্ন্যাস-জীবনের মূলকথা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে যেমন বুঝতে চেয়েছেন, তেমনই তুলে ধরবারও চেষ্টা করেছেন।

৪

ইশারউড তাঁর A Meeting by the River (Penguin, 1970)-এ নতুন পটভূমিকায় এবং দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুর সন্ন্যাস-জীবনকে দেখতে চেয়েছেন, কাজেই তাঁর সাম্প্রতিক এই সাহিত্যকৃতি আমাদের নতুন আস্বাদ যুগিয়েছে। বইটিতে তিনি নিপুণতার সঙ্গে সন্ন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন এবং অনেকখানি তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন বলে মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁদের ত্যাগভিত্তিক জীবনধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাঁর লেখার মধ্যে একটি নতুনত্ব ধরা পড়ে, সাধারণতঃ যা বিদেশীদের লেখায় চোখে পড়ে না। বইখানির কাহিনী-অংশটি মুখ্য নয়, কাহিনীর মাধ্যমে তিনি হিন্দু সন্ন্যাস-জীবনের মূলতত্ত্বকে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন, সমগ্র উপন্যাসখানি দুই ভাই-এর মধ্যে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে রূপ নিয়েছে। প্যাট্রিক ও টম্ অলিভার দুই ভাই ভিন্ন স্বভাবের এবং ভিন্ন প্রকৃতির। প্যাট্রিকের বিষয়মুখী স্বভাব কিন্তু অলিভার বিষয়ের বাইরে আধ্যাত্মিক প্রেরণার মধ্য দিয়ে সুখের সন্ধানী, এবং দুজনের এই মানসিক দিক পত্রালাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং অলিভারের ডায়ারীতেও তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে তাঁদের মাকে চিঠি দিয়ে বিশেষভাবে প্যাট্রিক অলিভারের

মানসিক ধারার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের নিকট উপন্যাসের বিষয়বস্তুই বড় কথা নয়। সাহিত্যের বিচারে পত্রধর্মী উপন্যাস কতখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা সাহিত্য-সমালোচকদের বিচার্য বিষয়। আমাদের আলোচ্য, গ্রন্থকার হিন্দুর সন্ন্যাস-জীবন কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং তা কতখানি সার্থক হয়েছে। উপন্যাসের বা রচনার মূল বক্তব্য যদি ঠিক ঠিক উপস্থাপিত করা যায় তবে তার মাধ্যমে সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হয়, কেননা সাহিত্যের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোন বিষয়ের রসগ্রহণ, যা থেকে পাঠক প্রেরণা পাবে সাহিত্য যদি সেই প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে তবেই তা রসোত্তীর্ণ।

এই উপন্যাসে লেখক একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন যে, হিন্দুর সন্ন্যাসবাদ পলায়নপর মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়, বরং জীবনের পরিপূর্ণতার সহায়ক। হিন্দুর সন্ন্যাস মানসিক প্রস্তুতির মধ্যে গ্রহণীয়। বর্ণাশ্রম-বিভাগে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু জীবনের শেষ পরিণতি এবং ঐ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই সমগ্র জীবনে প্রয়াস করে যেতে হবে চতুরাশ্রমের ক্রমিক আচরণের মধ্যে। কিন্তু মানুষের মনে যখনই বিষয় বা এষণা-ত্রয়[৪] পরিতৃপ্তি আনবে না তখনই সন্ন্যাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। বয়স বা কাল সেখানে লক্ষ্য নয়। এই বোধ বা বিচারই সন্ন্যাসের দিকে প্রত্যয়শীল এবং বিবেকী মানুষকে এগিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে রাসেলের একটি উক্তি লক্ষণীয়: 'আগে হোক পরে হোক, বিরাট ত্যাগ সকলেরই কাছে আসে; কারণ মৃত্যু, রোগ, দারিদ্র্য বা কর্তব্যের কঠোর নির্দেশ থেকে আমাদের শিখতেই হয় যে, জগৎ আমাদের জন্য সৃষ্ট হয়নি, আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি যত সুন্দরই হোক, তা থেকে ভাগ্য আমাদের বঞ্চিত করতে পারে।'[৫]

রাসেলের এই উক্তি তাৎপর্যময়, কেননা তিনি কোনদিন জীবনের নির্বেদের প্রতি বিশ্বাস করেননি। কেন মানুষের মনে নির্বেদ আসে—এই প্রশ্নের উত্তর নিজের অনুভূতির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ভর্তৃহরি তাই বলেছেন, জগতে সব কিছুই ভয়ান্বিত, কিন্তু বৈরাগ্য ভয়হীন। সুতরাং হিন্দুর সন্ন্যাস-জীবন বিতৃষ্ণাবাদ নয়, কিন্তু জীবনকে উপলব্ধি করবার সহায়ক। ইশারউড-এর ভাষায়, সন্ন্যাস ব্রতগ্রহণ-মাত্র নয়, মুক্তির রাজ্যে প্রবেশ, যা যথার্থ আনন্দ বলতে কি বোঝায় তার আস্বাদ দেয়: "Sannyas is far more than taking vows, it's entering into freedom. While I was out begging with the others this morning I feel utterly free,

৪ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা—দ্রঃ বৃ. উ. ৩।৫।১, ৪।৪।২২

৫ To every man sooner or later comes the great renunciation, since by death, by illness, by poverty or by stern voice of duty we must learn each one that the world was not made for us and that however beautiful may be the things we crave Fate may nevertheless forbid them."

—Freeman's Worship

as I hope to become, increasingly from the burden of being Oliver. So for the first time there were no barriers between us. I was not an alien and the others seemed to understand this. We kept smiling and laughing for no special reason. I am not saying this in self-pity but in amazement—up to day I'd lived my life without once knowing what it really meant to be happy. (p. 152)

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা

স্বসংবেদন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক : শ্রীজগদীশ্বর পাল, ১০ গ্যালিফ ষ্ট্রিট, (সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১), কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ৩৮৪। মূল্য দশ টাকা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সাধক ও বিদ্বৎ-সমাজে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়, সুপরিচিত। বিশেষ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্র ও ও সাধনায় গভীরপ্রদেশচারী তিনি। তাঁহার যে-কোনও রচনা তাই এ-দুয়েরই বিভায় দীপ্ত, পাঠকহৃদয় আলোকিত করিতে সমর্থ।

আলোচ্য গ্রন্থটি সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই সে কথা প্রযোজ্য হইলেও গ্রন্থটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধনপথে চলিতে চলিতে লেখক বিভিন্ন সময়ে নিজে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারই আলোকে দুচারটি করিয়া কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিজেরই জন্য। সম্প্রতি অনুরাগীদের অনুরোধে উহা প্রকাশ করিতে সম্মতি দিয়াছেন; ইহার পূর্বের অংশগুলি কীটদষ্ট হইয়াছে, মধ্যভাগ হইতে কিছু অংশ মাত্র প্রকাশিত। বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, নিজেরই জন্য লিখিয়া রাখা বলিয়া, সাধারণকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, এমনকি কোন ব্যক্তি-বিশেষকেও বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লেখা নয় বলিয়া তাহার চিন্তা ও জীবনের সহিত সুপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া অপরের পক্ষে গ্রন্থ-বিধৃত সব কথাগুলি ঠিকমতো বুঝিয়া উঠা ও সেগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করা কঠিন।

তবে শাস্ত্রবাক্য-অনুধাবনে এবং উহা উপলব্ধির জন্য সাধনে কতকগুলি সাধারণ সত্য আছে, ব্যক্তিমনের গঠনের তারতম্যেও যাহার ধারণায় তারতম্য খুব বেশী হয় না। গ্রন্থটিতে ব্যক্তিগত-উপলব্ধি-সঞ্জাত ধারণার মধ্যে ছড়ানো সেই-জাতীয় কথাগুলি অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহাদের চিন্তাধারা লেখকের চিন্তানুগ, সেই পথে যাঁহারা উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট, বলা বাহুল্য গ্রন্থটি তাঁহাদের নিকট খুবই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সুরসাগরের তীরে—শ্রীআর্যকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : বাপাপাণি পুস্তকালয়, ৫।ই, কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ১২৮; মূল্য পাঁচ টাকা।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের ভিত্তি সঙ্গীত-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। দৃঢ় অধ্যবসায়-সাপেক্ষ সাধনায় সঙ্গীত-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধকের

আয়ত্তে আসে। 'সুরসাগরের তীরে' সঙ্গীত-বিজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট পুস্তক। লেখক যে একজন অভিজ্ঞ সঙ্গীতবিদ্ ও গীতিকার, তার পরিচয় এই গ্রন্থে যথেষ্ট আছে। তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব তিনি রাগ-রাগিণীর পরিচয় কবিতার মাধ্যমে ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম তিনি 'দশ ঠাট'-এর পরিচয় দিয়াছেন:

"'বিলাবলে' সব শুদ্ধ কোমল কিছু নাই;
'ভৈরবে'তে রে ধা যর কোমল লাগা চাই।
'ভৈরবী'তে রে গা ধা নি কোমল স্বর হয়,
কড়ি মা ও কোমল রে ধা 'পূরবী'তেই রয়।...
ইত্যাদি।

কাফী, ভীমপলশ্রী, বাগেশ্রী. বৃন্দাবনীসারং, মেঘমল্লার, খাম্বাজ, ইমন কল্যাণ, কেদারা, ভূপালী, ছায়ানট, বসন্ত, পূরবী, ভৈরব, মালকোষ, মূলতান, দরবারী কানাড়া, মল্লার প্রভৃতি রাগিণীর সহিত সঙ্গীতশিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটাইবার জন্য যেরূপ প্রচেষ্টা পুস্তকখানিতে দেখা যায়, সেইরূপ প্রয়াস সাধারণত: দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রথম শিক্ষার্থিগণের নিকট এই সঙ্গীত-পুস্তক অত্যন্ত সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গানের ব্যাকরণ, যথা—স্বর, রস, মূর্চ্ছনা, ধ্বনি, নাদ, গ্রাম, মীড়, তান, তাল, মাত্রা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। সঙ্গীতের বিষয়বস্তু কঠিন হইলেও ছন্দোবদ্ধ হওয়ায় মুখস্থ করিতে পারিলে স্মৃতিতে রাখিবার সুবিধা হইবে। 'সুরসাগরের তীরে' নামটি উপযুক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতাচার্যগণেরও নিকট এই পুস্তকের যথোপযুক্ত মর্যাদা হইবে।

Sri **Aurobindo** (A life-sketch)—Haripada Mondal. Published by Calcutta Publishers, Calcutta-9. Pp. 100; Price Rs 2 50.

শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভাদীপ্ত বহুমুখী জীবন স্কুল-কলেজের বিদ্যার্থিগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী হিসাবে ইংরেজী-জানা পাঠকগণেরও গ্রহণযোগ্য।

পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ঐতিহ্য, জন্ম, শিক্ষা, দেশসেবা প্রভৃতি সংক্ষেপে অথচ মনোজ্ঞভাবে দেওয়া হইয়াছে। 'A Vision in Prison' পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দের যে আশ্চর্য অনুভূতি হইয়াছিল, তাহা লেখক নৈপুণ্যসহকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এখানে শ্রীঅরবিন্দের ভাষা তাঁর পত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে: "It is a fact that I was hearing constantly the Voice of Vivekananda speaking to me for a fortinight in the jail in my solitary meditation and felt his presence.' 'ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ' শীর্ষক পরিচ্ছেদটিতে উভয়ের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবৃত। রাজনীতি হইতে চিরবিদায়ের পর পণ্ডিচেরীতে তাঁহার তপস্যাপূত জীবনটিও আকর্ষণীয় হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

খেতড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের কার্যবিবরণী (এপ্রিল ১৯৭০—মার্চ ১৯৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজী খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন সেই পুণ্যস্মৃতিধন্য স্থানেই ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, একটি নার্সারি স্কুল, একটি মাতৃ-সদন (Maternity Home) পরিচালিত হইতেছে।

ফ্রি লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৪,২০৮, আলোচ্য বর্ষে সংযোজিত গ্রন্থসংখ্যা ৩৯৯। গ্রাহকগণ কর্তৃক পঠিত পুস্তকসংখ্যা ৫,৩৭৬। লাইব্রেরীর শিশুবিভাগে ৭৮৮ খানি বই রাখা হইয়াছে। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক, ৮টি সাপ্তাহিক, ৪টি পাক্ষিক, ১৬টি মাসিক ও ১টি ত্রৈমাসিক পত্রিকা লওয়া হয়। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ৫০।

৩ হইতে ১০ বৎসরের শিশুদের জন্য 'সারদা শিশুবিহার' ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাক্-প্রাথমিক নার্সারি বিভাগ ও প্রাথমিক বিভাগ—এই দুই সেকশনে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১১ (ছাত্রী ৭৬)। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৬০ জন বালক-বালিকা হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রাদায়ের। শিশুদের খেলাধুলার জন্য মনোরম 'বাল-উদ্যান' বিভিন্ন খেলার সরঞ্জামে সজ্জিত করা হইয়াছে।

মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণকেন্দ্রের কার্যও বিশেষ প্রশংসণীয়।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ধর্মসভাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্টজন্মদিন, শঙ্করজয়ন্তী প্রভৃতিও উদ্‌যাপিত হয়। হিন্দীতে গীতা ও উপনিষদ্ ক্লাস আশ্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্য।

কোয়েম্বাতুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (কোয়েম্বাতুর-২০) ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা দক্ষিণভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কোয়েম্বাতুরে ৪০০ একর বিশাল ভূখণ্ডের উপর বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত সুপরিচালিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, মনে হয় যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় :

১। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠাসমূহ :—

(ক) টিচার্স কলেজ—শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ১০০ জন বি. টি., ২৩ জন এম. এড, ২ জন পি. এইচ. ডি। পরীক্ষার ফল ৮৫% উত্তীর্ণ। টিচার্স কলেজের ২১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই কলেজের গবেষণা এবং এক্সটেনশন সারভিস প্রভৃতি বিভাগের কার্য বিশেষ প্রশংসনীয় ও সাফল্যমণ্ডিত।

(খ) গান্ধী বেসিক ট্রেনিং স্কুল : ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। দুই বৎসরের কোর্সে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৭, প্রথম বর্ষে ৪০ এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৩৭। পরীক্ষার ফল ৯০% উত্তীর্ণ।

(গ) মারুতি শারীর শিক্ষা কলেজ : হাই-স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষকতার কার্যে যাঁহারা ব্রতী হন, তাঁহাদের জন্য এই কলেজ দীর্ঘকাল ২২৫

যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক, ৯৯% উত্তীর্ণ।

২। মডেল স্কুলসমূহ :

(ক) সম্পূর্ণ আবাসিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় : ছাত্রসংখ্যা—১৮৩ তন্মধ্যে ৭ জন ফ্রি স্কলার। কোয়েম্বাতুর, নীলগিরি, মাদুরাই, রামনাদ, তিরুনেলভেলি. তিরুচিরাপল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের বিদ্যার্থীরা এখানে পড়াশুনার সুযোগলাভ করে।

(খ) স্বামী শিবানন্দ হাইস্কুল (বিদ্যালয় কলোনীর এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)—টিচার্স কলেজের আদর্শ বিদ্যালয় : ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৪০ (ছাত্রী ৬০)।

(গ) কলানিলয় (চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য)—বেসিক ট্রেনিং স্কুলের আদর্শ সিনিয়র বেসিক স্কুল। এখানে ৩৭৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৩৫ জনই ছাত্রী।

৩। গ্রামীণ বিদ্যায়তনসমূহ :

(ক) উচ্চতর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ : ছাত্রসংখ্যা ২০৬ ; রুর‍্যাল সারভিস পরীক্ষার ফল, গবেষণা এবং পরিবিস্তৃতি সন্তোষজনক।

(খ) কৃষিবিদ্যালয় : প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৬৭ ও ৬০। পরীক্ষার ফল ৮৭'৫% উত্তীর্ণ, ২৯ জন ফার্স্ট ক্লাস।

(গ) ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল : তিন বৎসরের কোর্সে মোট ছাত্রসংখ্যা ৫৪। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। এখানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা আছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের আরও দুইটি বিভাগ : অটোমোবাইল এবং এগ্রিকালচার‍্যাল। উভয় বিভাগই সুপরিচালিত। অটোমোবাইল সেকশনে ২৩০ জন ট্রেনিং পাইয়াছেন।

৪। আর্টস ও সায়েন্স কলেজ : এই মহাবিদ্যালয়ে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স এবং বি. এ., বি. এসসি. পড়িবার ব্যবস্থা আছে। মোট বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৫২৫ ; সর্ব বিভাগের পরীক্ষা-ফল সন্তোষজনক। বহু ছাত্রকে স্কলারসিপ ও কনসেশন দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনস্টিটুট, বিদ্যালয় প্রেস, আপ-টু-ডেট অ্যালোপ্যাথিক রুর‍্যাল ডিসপেন্সারী (চিকিৎসিতের সংখ্যা ২২,৫৯৬), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (পুস্তকসংখ্যা ৩৭,৬৯০), পুস্তকপ্রকাশন বিভাগ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রগতি উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষায়তনগুলির সহযোগিতায় একটি বিরাট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি-উদ্‌যাপন এবং মহোৎসবাদি ১৬ই হইতে গত ২০শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিবিধ অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৬ই ফেব্রুআরি বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া উষাকীর্তন সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা শিলং শহর পরিক্রমা করে, ইহাতে বিভিন্নভাষাভাষী এবং খাসী-প্রমুখ পার্বত্য উপজাতীয় ভক্ত নর-নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। আশ্রম-ভবনে ভক্ত-সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ। এই দিন

মধ্যাহ্নে তিন হাজারের অধিক নরনারী তৃপ্তি সহকারে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

১৭ই ফেব্রুআরি হইতে রবিবার ২০ ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আলোচনা-সভাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীস্বামীজী, শ্রীশ্রীমা এবং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অনুস্মরণ করা হয়। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় স্কুল-কলেজের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও ধর্মাবলম্বী নানা বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষণ, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, কণ্ঠ- ও যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উৎসাহী এইসব ছেলেমেয়ের প্রত্যেককেই আশ্রম পারিতোষিক-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য' পরিবেশন মনোজ্ঞ হইয়াছিল। প্রতিদিন সভাশেষে ধুবড়ীর শ্রীকমলকৃষ্ণ গোস্বামীর বাউল গান শ্রোতাদের প্রশংসা লাভ করে।

১৮ই ফেব্রুআরি শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমাতৃস্মরণ-সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত, প্রধান অতিথিরূপে মনোজ্ঞ মাতৃপ্রসঙ্গ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। সভানেত্রী শ্রীমতী দাশগুপ্তের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ খুবই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ ঐ দিনের সভায় তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধে মাতৃ-প্রশস্তি পাঠ করেন।

শনিবার ১৯শে ফেব্রুআরি বিবেকানন্দ-দিবসের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। মেঘালয় বিধানসভার অধ্যক্ষ অধ্যাপক আর. এস্. লিংডো ঐ দিনের সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন। অধ্যাপক প্রণব নন্দী, শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভাপতির ভাষণ উদ্দীপনাপূর্ণ ছিল। অধ্যাপক বিধু দত্ত ও অধ্যাপক বাসুদেব দত্তরায় যথাক্রমে স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রবিবার ২০শে ফেব্রুআরি উৎসবের সমাপ্তি-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণ-সভায় এক সুবিশাল জনসমাবেশে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত বি. কে নেহেরু সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। রাজ্যপালের মনস্বিতাময় দৃপ্ত ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হন। প্রধান বক্তারূপে স্বামী নিরাময়ানন্দের প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ সকলকে মুগ্ধ করে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক এস্. পি. রায়, শ্রীএম্. কে. চিন্তামণি এবং শ্রীমতি হেলিমন খং পাই। সভারম্ভে স্বামী অজজানন্দ মাননীয় রাজ্যপাল ও সমাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান।

স্বামী লোকেশানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি: গত ২৬.৫.৭২ ভোর ৪টা ১৫ মিনিটের সময় স্বামী লোকেশানন্দ (মহাবীর মহারাজ) লখ্‌নৌ সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন তিনি ফুসফুসের পীড়ায় অসুস্থ হইয়াছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এলাহাবাদ, বোম্বাই, ভুবনেশ্বর, লখ্‌নৌ এবং শ্যামলাতাল আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত থাকেন। চিকিৎসা-বিভাগের কর্মেই তিনি বেশির ভাগ ব্যাপৃত ছিলেন। হিমালয়স্থিত

শ্যামলাতাল কেন্দ্রেই ৩০ বৎসর যাবৎ তিনি আর্তনারায়ণের সেবারত ছিলেন ; সেখান হইতে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে লখ্‌নৌ কেন্দ্রে নামিয়া আসেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট তিনি তাঁহার স্নেহপূর্ণ মধুর স্বভাবের জন্য অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির-শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটির (কলিকাতা) শিশুবিভাগের তৃতীয় বার্ষিক জয়ন্তী উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)। এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য—শিশুবিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই উৎসব পরিচালনা করে। এই উপলক্ষে শ্রীনিয়োগী শিশু-শিল্পীদের আঁকা একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শ্রীনিয়োগী তাঁর ভাষণে বলেন যে, প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, ব্রতচারী ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া ভারতের পুরাণাদি হইতে মহাপুরুষদের জীবনী দ্বারা শিশুদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়, তা সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, এই বিভাগটি সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য-পুষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হিন্দুস্থান কেবল্‌স (বর্ধমান) রামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সমিতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব গত ১৯শে মার্চ পালিত হয়। স্বামী নিষ্ঠানন্দ পূজাদি সুসম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় চার হাজার নরনারী খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী চন্দ্রানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী চন্দ্রানন্দ মহারাজের সময়োপযোগী ভাষণ আধুনিক যুব-সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সভান্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি সঙ্গীতানুষ্ঠান দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

সমিতি কর্তৃক এই বৎসর একটি পাঠাগার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ও দর্শনকে কেন্দ্র করিয়া খোলা হইবে।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদে গত ১লা হইতে ৪ঠা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাব-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ১লা এপ্রিল পূজা-পাঠাদির পর শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন স্বামী নিবৃত্তানন্দ। দুপুরে এক হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় রামনাম-সংকীর্তন ও যাত্রা হয়। ২রা ও ৩রা এপ্রিল কালীকীর্তন, লীলাকীর্তন, দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণগান ও ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দজীর শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-ব্যাখ্যা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। ৪ঠা এপ্রিল মহিলা-ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণা মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। সারদা-লীলাগীতি ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত দ্বারা এই মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব গত ২২শে হইতে ২৫শে এপ্রিল পালিত হয়। ২২শে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকে. পি. ঘোষ, মুর্শিদাবাদ জেলা-

শাসক। প্রধান অতিথি শ্রীবাণীন্দ্রকুমার নাগ, প্রধান শিক্ষক পাঁচগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জীবনী আলোচিত হয়। ২৩শে ধর্মসভার সভাপতি—শ্রীশম্ভুনাথ সরকার, প্রধান অতিথি—স্বামী কালিকানন্দ; সভায় শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনালোচনা হয়।

এই চারদিনব্যাপী উৎসবে বাউল গান, কীর্তন, ভক্তিমূলক যাত্রাগান, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সিনেমা প্রদর্শনাদি হয়। মহোৎসবে প্রায় দেড় হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীসারদা সংঘ, কলিকাতা শাখার উদ্যোগে ৬নং মে ফেয়ার রোডে গত ২৬শে এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৩৭তম জন্মোৎসব পূজাপাঠাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১০১ ঘণ্টা অখণ্ড 'কথামৃত'-পাঠ এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য। একদিন রামকৃষ্ণলীলাগীতি পরিবেশিত হয়। উৎসবের শেষ দিনে তিন শতাধিক ভক্ত মহিলা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

আরিট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (মেদিনীপুর) গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমারোহের সহিত প্রতিপালিত হয়। ২৯শে এপ্রিল পূজা-পাঠাদি ও প্রসাদবিতরণ হয়। ঐদিন ও পরদিন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের সহযোগিতায় আরিট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির-প্রাঙ্গণে একটি যুবশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। ঐ শিবিরে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবনগঠনের বিষয় আলোচনা করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী জিনানন্দ, অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বর প্রামাণিক, শ্রীতারাপদ মাইতি প্রভৃতি। যুবশিক্ষণ শিবির-এ স্বামীজীর বাণী ও রচনা-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ এবং সমবেত প্রার্থনা ও সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

ভবানীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ২৩ পল্লী দুর্গোৎসব পূজাপ্রাঙ্গণে গত ৬ই এবং ৭ই মে শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৭তম শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন 'স্বামীজী দিবস'-এ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ। রাত্রে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার আয়োজন করা হয়। পরদিন প্রভাতফেরী, পূজা এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। বিকালে ধর্মসভায় প্রধান অতিথি স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের আসর এবং রাত্রে 'সাধক রামপ্রসাদ' যাত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাথোয়া (জলপাইগুড়ি) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৬ই ও ৭ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত ধর্ম-সভায় সেবাশ্রমের সম্পাদকের বিবরণীপাঠের পর স্বামী ইজ্যানন্দ (সভাপতি), শ্রীবীরেন্দ্র-চন্দ্র ঘোষ (প্রধান অতিথি), শ্রীএস. কে. দত্ত, ডাঃ হরিনারায়ণ দেবনাথ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। প্রায় দুইহাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণনগর (পশ্চিম ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৫ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন হইয়াছে। মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও স্বামী শিবা-নন্দজীর প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠা এবং পূজা-পাঠাদির পর মধ্যাহ্নে প্রায় ২৫০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষ্যে বিকালে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভান্তে প্রায় একহাজার নর-নারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারতির পর 'রাণী রাসমণি' সিনেমা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ।

মানুষ বিবিধ ভাব-বশে পরিচালিত হইয়া থাকে। কখন সে কর্ম্মকেই সত্য বলিয়া জানিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে আত্ম-সমর্পণ করে; আবার কখন বা চকিত হইয়া ভাবে, তাইত, কি করিতেছি। এই দ্বিবিধ ভাব-সংঘর্ষে মানুষের মনে হয়, কোথায় কে আছে, কোথায় কে কি করিতেছে। মানুষের আপনাকে বিশ্বাস হয় না, যতক্ষণ না সে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে, কোথায় কি আছে। আপনাকে হেয় মনে হয়—হইবার কারণ, আপনার সঙ্গে সদা সর্বদা বাস—আপনার সঙ্গে সর্বদা দেখাশুনা। Familiarity breeds contempt;—তাই মানুষ আপনাকে ফেলিয়া অপরকে দেখিতে যায়—আপনার দেশ ছাড়িয়া অপর দেশ, অপর জন দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হয়। ইহাতে শিক্ষাও হয়; অপর জাতির, অপর দেশের আচার ব্যবহারাদি দেখিয়া হৃদয় প্রশস্ত হয়, উদার ভাব সমুদয় হৃদয়কে অধিকার করে।

আমিও এই স্বভাব-বশে পরিচালিত হইয়া প্রায় ৭ মাস পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে যাত্রা করি। আমাদের মঠস্থ স্বামী সুরেশ্বরানন্দের সহিত মিলিত হইয়া আলমোড়া দিয়া তিব্বতস্থ মানস-সরোবর পর্য্যন্ত গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হই। এই মানস-সরোবরে সচরাচর বড় কেহ যায় না। এই ভ্রমণে অনেক নূতন বিষয় দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব গুহার কথা সাধারণের অবগতির জন্য লিখিলাম।—

আলমোড়া হইতে ১৩৫॥ মাইল পার্ব্বত্য পথে চলিয়া আসিয়াছি। এই পর্য্যন্ত ইংরাজের মাইল-ষ্টোন আছে। এই স্থানের নাম গার্বিয়াঙ্। এই স্থান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে কালাপানি নামক এক স্থান আছে। ইংরাজ বাহাদুর ঐ পর্যন্তই গমন করিয়াছেন। উহার উপরে তিব্বতীয়েরা ইংরাজদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই গার্বিয়াঙ্ জায়গাটী একটী পাহাড়ের উপর। যে সকল বাঙ্গালী কখন বিদেশে ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহারা পাহাড় কাহাকে বলে, তাই জানেন না, আর পাহাড়ের উপর মানুষ কি করিয়া থাকে, তাহাও বুঝিতে পারেন না। অনেকে রেলে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত গিয়াই পাহাড়ের রহস্য একরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। আর সাধারণের, পাহাড় এত দুর্গম বলিয়া ধারণা যে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। আমারও পূর্ব্বে এইরূপ ভাবই ছিল। প্রথম পাহাড় দেখি, বৈদ্যনাথ হইতে তপোবন যাইতে। তখন প্রথম সামান্য সামান্য প্রস্তর-খণ্ড দেখিয়া কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা কি বলিব?

লোকে পাহাড়কে যতদূর দুর্গম ভাবে, বাস্তবিক পাহাড় ততদূর দুর্গম নহে। আমরা চলিবার সময় কত দুর্গমতার কল্পনা করিয়াছিলাম। আলমোড়া হইতে চলিতে চলিতেই মনে হইত, এই বরফ আসিল এই বরফ আসিল। কোথায় বরফ? অবশ্য শীত-কালে পার্ব্বত্য-পথে চলা অসম্ভব, অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন থাকে, আর বর্ষাকালে পাহাড় মাঝে মাঝে খসিয়া পড়ায় অনেক বিপদাশঙ্কা আছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে

চলা বড় আনন্দ-প্রদ। পার্ব্বত্য-পথে চলাতে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে; নির্ঝর-সমূহের শীত ও নির্ম্মল সলিল-পানে সহজে রোগের সঞ্চার হইতে দেয় না।

'আলমোড়া হইতে আসিয়া যখন কাশীতে কিছুদিন ছিলাম, তখন গঙ্গার ঘাটে এক বাঙ্গালী আমাকে বলিল, 'আপনার সঙ্গে যিনি অন্য দিন স্নান করিতে আসিতেন, তিনি সেদিন বলিলেন, আমি হিমালয়ে ছিলাম। আমি একথা অপর অনেক ব্যক্তিকে বলাতে আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বাস্তবিকও যাহা ঋষি-দেবতার স্থান, সেখানে মানুষ কি করিয়া যাইবে?' অলস মস্তিষ্ক নানা প্রকার কাল্পনিক চিত্র প্রসব করে। আমাদের 'ঋষি মুনি'র জ্ঞান—যাত্রার শুভ্র শ্মশ্রু-ধারী নারদ মুনিকে দেখিয়া। আমাদের ত কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। ধ্যানের ভানে নানা প্রকার কাল্পনিক চিত্রে চিত্ত-রঞ্জন করি। তন্ত্রে আছে,

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং সিদ্ধির্বরাননে॥ (ক্রমশঃ)

স্বামী শুদ্ধানন্দ

পরমহংসদেবের সত্যনিষ্ঠা।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রদত্ত)

ভগবান্ রামকৃষ্ণ-দেবের অদ্ভুত সত্য-নিষ্ঠা দেখিয়াছি। তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিতেন যে, কলিতে যদি সত্যের উপর নিষ্ঠা থাকে, তবে আর কোন তপস্যার দরকার নাই। এক দিবস তিনি আহার করিতে বসিয়া দু একটী লোকের সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। আহারের দ্রব্য তাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য। একজন লোক আহারীয় দ্রব্য লইয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, আপনি আর কিছু গ্রহণ করুন। তিনি যখন ভগবৎকথা কহিতেন, তখন তাঁহার অন্য কোন দিকে জ্ঞান থাকিত না, তিনি সেই দিকেই একেবারে নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। তিনি অন্যমনস্কে বলিলেন—না, আর খাব না। তাঁহার আহার সমাপ্ত হইলে, নিকটস্থ ব্যক্তিগণ দেখিলেন তাঁহার আধ-পেটা খাওয়া হইয়াছে। সকলে বলিলেন, আপনি আর কিছু খান, আপনার ত পুরা খাওয়া হয় নাই। তিনিও দেখিলেন, পুরা খাওয়া হয় নাই। কিন্তু একবার 'না' বলিয়াছিলেন বলিয়া আর খাইতে পারিলেন না। বলিলেন, যখন একবার 'না' বলিয়াছি, তখন আর খাইব না।

আর একদিন প্রাতে তাঁহার একজন সেবককে বলিয়াছিলেন, অদ্য বৈকালের পর নিকটস্থ যদু মল্লিকের বাগানে যাইব। কিন্তু সে দিবস অনেক ভদ্রলোক তাঁহার দর্শনার্থ দক্ষিণেশ্বরে আইসে। তিনি তাহাদিগের সহিত ধর্ম্ম-কথায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। অনেক রাত্রে তাঁহার সেই কথা স্মরণ হইল। তিনি একবার বলিয়াছেন, যাইবেন। তিনি কি না যাইয়া স্থির থাকিতে পারেন? তৎক্ষণাৎ সেই সেবককে সঙ্গে করিয়া তথায়

চলিয়া গেলেন। তখন অনেক রাত্রি হওয়ায় বাগানের গেট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দরওয়ানকে ডাকাইয়া গেট খোলাইয়া বাগানের মধ্যে খানিক ক্ষণ বিচরণ করিলেন। তখন তাঁহার মন স্থির হইল।

তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, যাহার সত্যেতে নিষ্ঠা থাকে, সত্য-স্বরূপ ভগবান তাহার নিকট বাঁধা থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।

(প্রবুদ্ধ ভারত হইতে গৃহীত।)

গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের প্রবুদ্ধ ভারতে, উক্ত পত্রের এক প্রতিনিধির সহিত স্বামী বিবেকানন্দের যে কথোপকথন প্রকাশিত হয়, তাহাতে তিনি অনেক বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ; আমরা সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম নিয়ে দিলাম।—

স্বামীজী বলেন,—

ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর আমরাই কেবল, ভারতবর্ষের বাহিরে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছি। ভারতে এক্ষণে যে সকল হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; ১ম, রক্ষণশীল সম্প্রদায় (orthodox), ২য়, মুসলমানদিগের সময়ের সংস্কারক-দল ; ও ৩য়, আধুনিক সংস্কারক-দল। হিন্দুগণের ভিতরে কি সাধারণ সত্যে বিশ্বাস আছে, তাহা বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল হিন্দুর 'গোমাংস-ভক্ষণে বিরতি', এই বিষয়েই ঐক্য দেখা যায়। আমরা চাই তাহাদিগকে সনাতন বেদে শ্রদ্ধায় একীভূত করিতে। পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার সম্প্রদায়ের সহিতই আমাদের সহানুভূতি আছে। তবে আমাদিগকে অবশ্য 'ছুৎ-মার্গী' (Do'nt touchism) বলিয়া গণ্য করিতে চাহি না। ইহা সনাতন হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত নহে। ইহাতে জাতীয় ভাবের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। হিন্দু জাতি—কি দর্শন, কি শিল্প, কি গণিত, কোন বিষয়েই ন্যূন নহে, তবে চাই তাহার পক্ষে জাগরণ—পূর্ব্বাবস্থা-স্মরণ। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল বহিরুন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই শক্তির সম্মিলনের সময় আসিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তিতে দেখা যায়, আধ্যাত্মিক ভাব খুব প্রবল, অথচ বহিঃ-কার্য্যশীলতা কিছুমাত্র নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রবল হইলেই যে বহিঃ-কার্য্য বন্ধ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। ভারতে এই দুইটী একত্রীভূত করিতে পারিলে, আমরা জগতে এক মহা আদর্শ দেখাইতে পারিব। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্থল। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা কাহারও অবিদিত নাই, অথচ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কর্ম্ম-শীলই বা কে ছিল? আমার জীবন এই মহাপুরুষের প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বারা নিয়মিত। অপরে তাঁহাকে কে কতদূর শ্রদ্ধা করিবে, বলিতে পারি না, তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর, বলিতেও চাহি না। আমি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা কর, এরূপ প্রচার করি নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই

নিজে নিজে ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে হইবে, কারণ আমরা সকলেই ব্রহ্ম। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। ভারতকে এই দুইটী দিকে উন্নত করিতে পারিলেই ইহার অবশিষ্ট উন্নতি আপনা আপনিই হইবে।

একটি দুঃখের সংবাদ

আজ পাঠকবর্গকে এক দুঃখের সংবাদ দিতে হইল! ধর্ম্মনিষ্ঠ বাবু রামচন্দ্র দত্ত—একটী কর্ম্মঠ ও বিশ্বাসী ভক্ত—সেদিন ৪ঠা মাঘ রাত্রি ১১টার সময়, সমস্ত ফেলিয়া, ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন! কলিকাতা-নিবাসী অনেকেই এবং তাঁহার পরিচিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই বিশেষ শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন শিক্ষক ও সায়েন্স এসোসিয়েসনের একজন 'লেক্‌চারার' ছিলেন; তত্ত্বমঞ্জরীর সম্পাদক এবং কাঁকুড়গাছিস্থ যোগোদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ৪।৫ ঘণ্টা ব্যতীত, অহোরাত্রির মধ্যে কখনই তাঁহাকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে দেখা যাইত না। আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় জীবনের শেষ অধ্যায় সেই যোগোদ্যানেই সমাপ্ত করিলেন!

ম্যাক্‌সমুলার লিখিত পরমহংসদেবের জীবনচরিত।

কিছুকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্য সমুদয় বিষয়কেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। অনেক প্রাচ্যও তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে গিয়া স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নিন্দাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতেন। ক্রমশঃ কোলব্রুক্, সার উইলিয়ম্ জোন্‌স্ প্রভৃতি প্রাচ্য-তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাচ্য-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন। এডুইন আর্নল্ড প্রভৃতি কবিগণও অতি সরল ভাষায় প্রাচ্য তত্ত্ব অনেক প্রকাশ করাতে ইউরোপ আমেরিকার সাধারণেও প্রাচ্য-তত্ত্ব অনেক জানিতে পারেন। এক্ষণে প্রধানতঃ ম্যাক্‌সমুলার ও ডিউসেন প্রাচ্য গ্রন্থ ও দর্শনাদি পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যের ও প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যের জ্ঞান যতই লাভ করিবে ততই উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়া উভয়েরই উপকার হইবে। প্রোফেসার ম্যাক্‌সমুলার আমাদের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া এই সদ্ভাব বর্দ্ধনের আর একটী উপায় করিয়াছেন, এই-জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি বিলাতের বিখ্যাত Nineteenth Century নামক পত্রিকায় A Real Mahatman নাম দিয়া পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটী উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ দেন। এক্ষণে ইনি পরমহংসদেবের বিস্তারিত জীবনী ও উক্তি লিখিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের অন্যান্য ভক্তগণের নিকট প্রাপ্ত রামকৃষ্ণ জীবনী হইতে ও ভারতীয় নানা সংবাদ পত্র ও পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার প্রধান আকর্ষণ প্রোফেসারের ন্যায় পণ্ডিতের তীব্র সাবধান অথচ গভীর-সহানুভূতি-যুক্ত সমালোচনা। প্রোফেসার সুদূর ইংলণ্ডে বাস করিয়াও প্রাচ্যতত্ত্ব-

সকলের, বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজের, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ অনেক সময়ে এত সুন্দর বুঝিতে পারেন যে, অনেক এদেশী লোক তাহা পারেন না। পরমহংসদেবের জীবনী লিখিয়া ইনি আশা করেন রামকৃষ্ণদেব যেরূপ ভগবৎ-সত্তা সর্ব্বদা অনুভব করিতেন, সেই ভগবৎসত্তানুভূতি-রূপ সাধারণ সত্যে কালে হিন্দু ও অহিন্দু উভয়ে সম্মিলিত হইবেন।

এই পুস্তকের প্রথমে চতুরাশ্রম, সন্ন্যাসী ও যোগ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়া, পরে দয়ানন্দ সরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় শালিগ্রাম সিং বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেবকে ভারতীয় অন্যান্য মহাপুরুষগণ মধ্যে একজন মহাপুরুষ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশেষে বিবেকানন্দ স্বামী প্রেরিত রামকৃষ্ণ-জীবনী একরূপ যথাযথ দিয়াছেন। এই জীবনী পরমহংসদেবের সর্ব্বপ্রকার প্রকাশিত জীবনী হইতে অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও মনোরম। পাশ্চাত্য-জনসুলভ তীক্ষ্ণ বিচার-দৃষ্টিতে সমালোচনা করিয়াও ম্যাক্সমুলার ইঁহাকে একজন প্রকৃত মহাপুরুষ বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি পাশ্চাত্যদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য বেদান্ত সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে প্রায় ৪০০ উক্তির ইংরাজী অনুবাদ ও ঐ উক্তিগুলির একটী ভাষানুসারে সূচী দিয়া পুস্তক শেষ করিয়াছেন।

আমরা প্রোফেসারের সকল মতের সহিত এক না হইতে পারি, কিন্তু আমাদের ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণদেবের চরিত্র ম্যাক্সমুলারের ন্যায় একজন পণ্ডিতকে নিরপেক্ষ, সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়ে সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যদি ইঁহার ন্যায় সহানুভূতির সহিত প্রাচ্য তত্ত্বসমূহের সমালোচন করেন, তাহা হইলে যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মিলন এখন অতি দূরবর্তী প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা নিকটতর হইবে।

উদ্বোধন ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হইবার স্বল্পকাল পরেই, সকল গ্রাহকের নিকট পত্রিকা পাঠাইবার পূর্বেই, উহাতে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'সখার প্রতি' কবিতাটি ছাপাইতে যে ভুল হইয়াছিল [উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭৯, পৃঃ ২১৭ (পুনর্মুদ্রণ পৃঃ ২৩) দ্রষ্টব্য], তাহা সংশোধন করিয়া পুনর্মুদ্রিত হয়।

একই সংখ্যার দুইখানি কপি ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখিয়া পুরা সংখ্যাটিই যে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল, সেবিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি। একজন গ্রাহকের নিকট হইতে (শিলগুড়িনিবাসী ৺কার্ত্তিকচন্দ্র দে-র; স্মৃতিতে তাঁহার পুত্র কর্তৃক প্রদত্ত) সংশোধিত পুনর্মুদ্রিত কপিটি পাইয়াছি বলিয়া এই সিদ্ধান্তেও আসিয়াছি যে, সব গ্রাহকের নিকট পাঠাইবার পূর্বেই উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, স্বামীজীর স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'পক্ষ'-র পর যে ')' দেখা যায় [স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য], তাহা মূল লেখায় ছিল না, পরে সংযুক্ত; একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়, এবং সংখ্যাটির অবিলম্ব পুনর্মুদ্রণও ইহা সমর্থন করে।

পুনর্মুদ্রণে সংশোধিত : (প্রথম প্রকাশিত কবিতার) ৩১শ লাইন : "পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম……"। পূর্বে বাদ পড়া) সংযুক্ত : ২য় লাইনের পর— "দ্বন্দ্বযুক্ত চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান; 'স্বার্থ', 'স্বার্থ', সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?" ১০শ লাইনের পর— "ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়; নদীতীর, পর্বত-গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।"—সম্পাদক

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।]　　১লা ফাল্গুন।　　[৩য় সংখ্যা।]

।

[স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত]

ব্রহ্মা—দেবতাদিগের প্রথম ও প্রধান, শিষ্য-পরম্পরায় জ্ঞান প্রচার করিলেন; উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী[১] কালচক্রের মধ্যে কতিপয় অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ—জিনের প্রাদুর্ভাব হয় ও তাঁহাদের হইতে মানব-সমাজে জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ স্ফূর্ত্তি হয়; সেই প্রকার বৌদ্ধমতে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধনামধেয় মহাপুরুষদিগের বারম্বার আবির্ভাব; পৌরাণিকদিগের অবতারের অবতরণ, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশেষরূপে, অন্যান্য নিমিত্ত অবলম্বনেও; মহামনা স্পিতামা[২] জরতুষ্ট্র জ্ঞানদীপ্তি মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন; হজরৎ মুসা, ঈশা ও মহম্মদও তদ্বৎ অলৌকিক উপায়শালী হইয়া অলৌকিক পথে অলৌকিক জ্ঞান মানবসমাজে প্রচার করিলেন।

কয়েকজন মাত্র জিন হন, তাহা ছাড়া আর কাহারও জিন হইবার উপায় নাই, অনেকে মুক্ত হন মাত্র; বুদ্ধ নামক অবস্থা সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন; ব্রহ্মাদি- পদবী মাত্র, জীবমাত্রেরই হইবার সম্ভাবনা; জরতুষ্ট্র, মুসা, ঈশা, মহম্মদ—লোকবিশেষ, কার্য্যবিশেষের জন্য অবতীর্ণ; তদ্বৎ, পৌরাণিক অবতারগণ; সে আসনে অন্যের দৃষ্টিনিক্ষেপ বাতুলতা। আদম ফল খাইয়া জ্ঞান পাইলেন, 'নু' (Noah) জিহোবাদেবের অনুগ্রহে সামাজিক শিল্প শিখিলেন। ভারতে সকল শিল্পের অধিষ্ঠাতা—দেবগণ বা সিদ্ধপুরুষ; জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই অলৌকিক পুরুষদিগের কৃপা। 'গুরু বিন্ জ্ঞান নহি'; শিষ্যপরম্পরায় ঐ জ্ঞানবল গুরুমুখ হইতে না আসিলে, গুরুর কৃপা না হইলে, আর উপায় নাই।

আবার দার্শনিকেরা—বৈদান্তিকেরা—বলেন, জ্ঞান মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধন—আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে শিখাইবে? কুকর্ম্মের দ্বারা ঐ জ্ঞানের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়াছে, তাহা কাটিয়া যায় মাত্র।

১ ঊর্দ্ধগামিনী ও অধোগামিনী। ২ Zoroaster; স্পিতামা ইহার নাম; ইহার অর্থ শ্বেত। জরতুষ্ট্র কুলপরম্পরাগত নাম। ইনি পারসীদিগের প্রাচীন গুরু।

উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যার প্রচ্ছদপটে আদর্শবাণী ছিল "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" ৩য় সংখ্যার প্রচ্ছদপটে আছে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!" সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এই আদর্শবাণীই উদ্বোধনের প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে।—সম্পাদক

অথবা ঐ 'স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান' অনাচারের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সদাচারের দ্বারা পুনর্বিস্ফারিত হয়। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা, ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা, অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ—ইহাও পড়া যায়।

আধুনিকেরা, অপরদিকে, অনন্ত স্ফূর্ত্তির আধারস্বরূপ মানবমন দেখিতেছেন, উপযুক্ত দেশকালপাত্র পরস্পরের উপর ক্রিয়াবান হইতে পারিলেই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইবে, ইহাই সকলের ধারণা। আবার দেশকালের বিড়ম্বনা পাত্রের তেজে অতীত হওয়া যায়। সৎপাত্র কুদেশে, কুকালে পড়িলেও বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শক্তির বিকাশ করে। পাত্রের উপর, অধিকারীর উপর যে সমস্ত ভার চাপান হইয়াছিল, তাহাও কমিয়া আসিতেছে। সেদিনকার বর্ব্বর জাতিরাও যত্নগুণে সুসভ্য ও জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে—নিম্নস্তর উচ্চতম আসন অপ্রতিহত গতিতে লাভ করিতেছে। নরামিষ-ভোজী পিতামাতার সন্তানও সুবিনীত, বিদ্বান হইয়াছে, সাঁওতাল-বংশীয়েরাও ইংরাজের কৃপায় বাঙ্গালির পুত্রদিগের সহিত বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করিতেছে। পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা ঢের কমিয়া আসিয়াছে।

একদল আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রায় পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত পথে তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের একটি নির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্তকাল হইতে আছে, ঐ খাজানা পূর্ব্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরাধিকারী, জগতের পূজ্য। যাঁহাদের এপ্রকার পূর্ব্বপুরুষ নাই তাঁহাদের উপায়? কিছুই নাই। তবে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয়, উত্তর দিলেন—আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃত ফলে আগামী জন্মে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে।—আর এই যে আধুনিকেরা বহুবিদ্যার আবির্ভাব করিতেছেন—যাহা তোমরা জান না এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জানিতেন, তাহারও প্রমাণ নাই? পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন বৈকি। তবে লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ—।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকেরা এসকল কথায় আস্থা প্রকাশ করেন না।

অপরা ও পরা বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত, একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে, এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইতে পারে, কিন্তু সে বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থা-ভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন-ভেদ, বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।

'জ্ঞানমাত্রেই পুরুষ-বিশেষের দ্বারা অধিকৃত, এবং ঐসকল বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর বা প্রকৃতি বা কর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট হইয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করেন; তদ্ভিন্ন কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভের আর কোন উপায় নাই, এইটি স্থির সিদ্ধান্ত হইলে সমাজ হইতে উদ্যোগ উৎসাহাদি অন্তর্হিত হয়, উদ্ভাবনী শক্তি চর্চ্চাভাবে ক্রমশঃ বিলীন হয়, নূতন বস্তুতে আর কাহারও আগ্রহ হয় না, হইবার উপায়ও সমাজ ক্রমে বন্ধ করিয়া দেন। যদি ইহাই স্থির হইল যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বিশেষগণের দ্বারায় মানবের কল্যাণের পন্থা অনন্তকালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সেইসকল নির্দ্দেশের রেখামাত্র ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ হইবার ভয়ে,

সমাজ কঠোর শাসন দ্বারা মনুষ্যগণকে ঐ নির্দিষ্ট পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যদি সমাজ এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়, তবে মনুষ্যের পরিণাম, যন্ত্রের ন্যায় হইয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই যদি অগ্র হইতে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তবে চিন্তাশক্তির পর্য্যালোচনার আর ফল কি? ক্রমে ব্যবহারের অভাবে উদ্ভাবনীশক্তির লোপ ও তমোগুণপূর্ণ জড়তা আসিয়া পড়ে, সে সমাজ ক্রমশই অধোগতিতে গমন করিতে থাকে।

অপরদিকে, সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দেশবিহীন হইলেই যদি কল্যাণ হইত, তাহা হইলে চীন, হিন্দু, মিশর, বাবিল, ইরাণ, গ্রীস, রোম ও তাঁহাদের বংশধরদিগকে ছাড়িয়া সভ্যতা ও বিদ্যাশ্রী, জুলু কাফ্রি, হটেনটট্‌, সাঁওতাল, আন্দামানি ও অষ্ট্রেলীয়ান্ প্রভৃতি জাতিগণকেই আশ্রয় করিত।

অতএব মহাপুরুষদিগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথেরও গৌরব আছে, গুরুপরম্পরাগত জ্ঞানেরও বিশেষ বিধেয়তা আছে, জ্ঞানের সর্ব্বান্তর্যামিত্বও একটি অনন্ত সত্য। কিন্তু বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্য্য-স্মরণেই কালাতিপাত করে, ইহাও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বপুরুষদিগের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া যায়, এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ দুর্ব্বলতাই শক্তিহীন গর্ব্বিত হৃদয়কে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব-ঘোষণরূপ জীবনাধারমাত্র অবলম্বন করিতে শিখায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষেরা সমুদায়ই জানিতেন, কালবশে সেই জ্ঞানের অধিকাংশই লোপ হইয়া গিয়াছে, একথা সত্য হইলেও ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, ঐ লোপের কারণ, পরবর্ত্তীদের নিকট ঐ লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান; নূতন উদ্যোগ করিয়া, পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে বিশুদ্ধ চিত্তে আপনা হইতেই স্ফূর্ত্ত হয়, তাহাও চিত্তশুদ্ধিরূপ বহু আয়াস ও পরিশ্রমসাধ্য; আধিভৌতিক জ্ঞানে, যে সকল গুরুতর সত্য মানব-হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সেগুলিও সহসা উদ্ভূত দীপ্তির ন্যায় মনীষীদের মনে সমুদিত হইয়াছে, কিন্তু বন্য অসভ্য মনুষ্যের মনে তাহা হয় না। ইহাই প্রমাণ যে, আলোচনা ও বিদ্যাচর্চ্চারূপ কঠোর তপস্যাই তাহার কারণ।

অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জ্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্যে।

মহাপুরুষত্ব, ঋষিত্ব, অবতারত্ব বা লৌকিক বিদ্যায় মহাবীরত্ব সর্ব্বজীবের মধ্যে আছে, উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদি সহায়ে তাহা প্রকাশিত হয়। যে সমাজে ঐ প্রকার বীরগণের একবার প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সেথায় পুনর্ব্বার মনীষিগণের অভ্যুত্থান অধিক সম্ভব। গুরুসহায় সমাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেগপ্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত।

ভ্রম-সংশোধন : উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯, ২৭৮ পৃঃ, ৩২ লাইনে 'কোন' স্থলে 'কেশ' পড়ুন।—সম্পাদক



দিব্য বাণী

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
......যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ।
যাঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥

—মহাভারত, আদিপর্ব, ৮৫।১২—১৪

ঘৃতাহুতি পেলে তাহাতে যেমন শান্ত না হয়ে অগ্নি
বিস্তারে শিখা আরো লেলিহান, তেমনি কামনাবহ্নি
কাম্য বিষয় ভুঞ্জিতে পেলে হয় না তাহাতে শান্ত,
ভোগের লালসা তাহাতে বরং বেড়ে হয় দুর্দান্ত।
পৃথিবীর যত সম্পদ, যত শস্য, রমণী, স্বর্ণ—
(যত ভোগ আনে শব্দ ও রস, স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ)
কেহ যদি পায় একাকী সে-সব, তবুও হবে না তৃপ্ত,
জনেকেরো তৃষা মেটাতে সে-সব নয়কো যে পর্যাপ্ত।
প্রাণান্তিক এ তৃষা ঠিক থাকে শরীর হলেও জীর্ণ।
(যত ভোগ কর যতকাল, তৃষা হবে না কখনো শীর্ণ,
সীমাহীন ভোগে, সীমাহীন কালে এ-লালসা বিস্তীর্ণ।)
তাই ত্যজ ভোগতৃষ্ণারে ; 'ভোগে তৃপ্তি' এ মহাভ্রান্তি-
মুক্ত যে মন (স্থির, সংযত) সেই মনই পায় শান্তি।

কথাপ্রসঙ্গে

মানবিক পরিবেশ

১

পৃথিবীর পরিবেশ ক্রমেই মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া যাইবার দিকে চলিতেছে—এই আশঙ্কা আজ বহু মনীষীর মনে দেখা দিয়াছে, এবং উহার প্রতিকারের জন্যও নানাজন নানাভাবে ভাবিতেছেন। শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য নিত্য নূতন উপকরণ জোগাইতেছে, নিত্য নূতন মারণাস্ত্রও করিতেছে—ইহাকেই আমরা মানবসভ্যতার অগ্রগতি বলি। ফলে কলকারখানার সংখ্যা, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, জাহাজ প্রভৃতির সংখ্যা, শস্যরক্ষার জন্য বিষাক্ত কীটঘ্ন দ্রব্যের ব্যবহার, আণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং পরীক্ষার্থে আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ প্রভৃতি দিন দিনই পৃথিবীতে বাড়িয়া চলিয়াছে; সর্বাধিক বাড়িতেছে উন্নত দেশগুলিতে। ফলে কারখানা, গাড়ী, প্লেন প্রভৃতির ধোঁয়া, কারখানার পরিত্যক্ত পদার্থ, শস্যরক্ষার্থে ব্যবহৃত বিষ, পারমাণবিক বিস্ফোরণে উৎপন্ন এবং পারমাণবিক কারখানার তেজস্ক্রিয় পদার্থ, তৈল প্রভৃতি পৃথিবীর জল স্থল অন্তরীক্ষ সবই বিষাক্ত করিয়া, মানুষের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর পদার্থে পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। কেবল মানুষের নয়, অন্যান্য প্রাণীর পক্ষেও আবহাওয়া ক্রমশঃ দূষিত হইতেছে। ক্রমোন্নত বিজ্ঞান ও শিল্প মানুষের জন্য নিত্য নূতন ভোগোপকরণ আবিষ্কার করিয়াই চলিবে, সে সব উৎপাদনের জন্য নূতন নূতন কলকারখানাও স্থাপিত হইবে এবং অনুন্নত দেশগুলি যত উন্নত হইবে সে সব জায়গায় স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান উন্নত দেশগুলির মতোই শিল্পাদির প্রসার হইবে; এমন কি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাও সব দেশেই একদিন হইবে। তখন পৃথিবীর আবহাওয়া কতখানি দূষিত হইবে—মানুষ সে আবহাওয়ায় আদৌ বাঁচিতে পারিবে কি না—এই চিন্তাই এখন বহুজনকে ভাবাইয়া তুলিতেছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ অবশ্য আশা করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সে দূষিত আবহাওয়ায় বাঁচিবার মতো শক্তি ততদিনে অর্জন করিবে; অনেকের মতে মানুষ প্রয়োজনমতো ইহার প্রতিকার আবিষ্কার করিবে,—যতটা বলা হইতেছে, ততটা ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এবিষয়ে যাঁহারা চিন্তাকুল এসব কথা তাঁহাদের নিশ্চিন্ত করিতে পারিতেছে না।

এ ছাড়া মানুষের সুস্থ থাকার পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে আরো বহুভাবে, বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে। চোখে বেদনাদায়ক বিজ্ঞাপনের তীব্র আলোক, কানে বেদনাদায়ক যানাদির, বিশেষ করিয়া বিমানঘাটি-অঞ্চলে বিমানের তীব্র শব্দ এবং শহর-সভ্যতার অবদান বহুবিধ উদ্বেগের কারণ মানুষের মনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুস্থ পরিবেশকেও নষ্ট করিতেছে।

দ্রুত হারে পৃথিবীর জনসংখ্যাবৃদ্ধিও পরিবেশ কলুষিত করার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী।

২

এইসব কারণে আবহাওয়া ক্রমশই দূষিত হওয়ার প্রতিকারকল্পে রাষ্ট্রসঙ্ঘও চিন্তা করিতেছে। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকেই ২৭টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া নিউইয়র্কে বৈঠক ডাকিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবিষয়ে চিন্তা করিতে শুরু

করে এবং ১৯৭২ সালের ১৯ জুন স্টকহোমে ১১৫টি দেশের প্রতিনিধির বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে একটি আন্তর্জাতিক সনদ প্রণীত হইবার কথা।

এই সিদ্ধান্তের মোটামুটি কথা হইল, সব দেশ মিলিয়া পৃথিবীর পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও কলুষমুক্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য একুশটি নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, যার সার কথা :

কোন রাষ্ট্রই এমন কিছু করিতে পারিবে না, যাহার ফলে অপর রাষ্ট্রের আবহাওয়া দূষিত হয়।

বর্তমান মানুষের এবং তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পক্ষে যা ক্ষতিকর, প্রাণিজগৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পক্ষে যা ক্ষতিকর, এমন কোন কাজ কোন রাষ্ট্র যদি করে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে। মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া সব রাষ্ট্রেরই জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিতে হইবে। উন্নতি অব্যাহত রাখিয়াই আবহাওয়া যাহাতে কলুষমুক্ত করা যায়, সেদিকে সকলকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সব মানুষকেই, অন্ততঃ তরুণ সম্প্রদায় ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আবহাওয়া দূষিতকরণের ভয়াবহ পরিণাম ও তাহার প্রতিকার বিষয়ে অবহিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শেষে আর একটি প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় : কোন রাষ্ট্রের আবহাওয়া দূষিত হয় এমন কোন কাজের জন্য ঐ রাষ্ট্রের বা অপর রাষ্ট্রের কেহ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব ঐ রাষ্ট্রকেই লইতে হইবে।

৩

সিদ্ধান্তগুলি খুবই ভাল। ইহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলে মানবজাতির অশেষ কল্যাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, সিদ্ধান্তগুলি বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সব রাষ্ট্রেরই, 'অন্তঃস্থ না মুখস্থ' ?— অন্তরের কথা, না মুখের কথা, কথার কথা মাত্র ? প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপুঞ্জ যখন গঠিত হয়, অনেক ভক্ত উৎসাহিত হইয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সব দেশ একত্র হইয়া সিদ্ধান্ত লইয়াছে, এখন হইতে সকলে মিলিয়া মিশিয়া পৃথিবীর সব দেশের সমস্যার সমাধান করিবে, যাহাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয়। সব শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন : এসব কথা ওদের অন্তঃস্থ, না মুখস্থ ?—অর্থাৎ মনের কথা, না মুখের কথা ? সব সিদ্ধান্তগুলি সব রাষ্ট্রের যে অন্তঃস্থ নয়, সিদ্ধান্তগ্রহণের বৈঠকেই তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছে, আর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবটি সমর্থন করে নাই। আবার, পরীক্ষার জন্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সায় দিয়াও অপর একটি রাষ্ট্র সিদ্ধান্তগ্রহণের অল্পকিছুদিন পরেই নিজেই তাহা করিয়াছে।

এ তো প্রকাশ্য ব্যাপার। রাষ্ট্রগুলির কার অন্তরে কি আছে এবং নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের কল্যাণকর সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রসঙ্ঘেরই বা কতটুকু,—সে বিষয়ে আজ মানুষের মনে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। সাম্প্রতিক কালেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, যাহা মানবতাবিরোধী হইলেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা যে সব রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর সব মানুষের জন্য ভাবিয়া আকুল এবং বিশ্বকল্যাণের কথায় সোচ্চার, তাহারা কেহই কিছু করে নাই বা করিতে পারে নাই, করিতেছেও না বা করিতে পারিতেছে না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সিদ্ধান্ত খুবই

ভাল, কিন্তু বাঁধিবে কে ?

৪

শিল্পবিজ্ঞানাদিতে এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির অবস্থা আজ সঙ্কটাপন্ন। এই উন্নতির অবদান বিপুল শক্তি, বিশেষ করিয়া পারমাণবিক শক্তি মানুষের হাতে আসিয়াছে। ঐ শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলির সামান্য একটু সিদ্ধান্তের এদিক-ওদিক মানবসভ্যতাকেই লুপ্ত করিতে পারে, একটা পারমাণবিক যুদ্ধ হতাবশিষ্ট মানুষ ও তাহার উত্তরপুরুষের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিতে পারে।

বিশ্বকল্যাণের জন্য এত সংস্থা, এত বৈঠক, রাশিরাশি পরিকল্পনা ও বিবৃতি সত্ত্বেও এই আতঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া আজ মানুষকে চলিতে হইতেছে, নিরাপত্তার নিশ্চিত কোন আশ্বাস নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ থাকা সত্ত্বেও আজ তথাকথিত সুসভ্য মানুষ 'সঙ্ঘবদ্ধ নেকড়ের দল'-এর মতো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানবতার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। সভ্যতার ক্রমোন্নতিসত্ত্বেও এরূপ হইতেছে কেন ?

হইতেছে, কারণ সভ্যতার উন্নতি বলিতে আমরা বাহিরের উন্নতিই বুঝিতেছি। কোন্ দেশ কত উন্নত, তাহার মাপকাটি নাকি কোন্ দেশ কতখানি বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করে তাহাই। সম্প্রতি শুনিতেছি, কোন্‌দেশের পরিবেশ কত দূষিত, তাহাই তাহার উন্নতির মাপকাটি! আমাদের সভ্যতার উন্নতি সম্বন্ধে এ ধারণা যতদিন থাকিবে, মানুষের মানসিক উন্নতি, মানসিক আবহাওয়ার দিকে দৃষ্টি যতদিন না ফিরিবে, ততদিন বাহিরের আবহাওয়া কলুষিত হওয়া বন্ধ হইবে না। কারণ উন্নতি বলিতে যদি কেবল বাহিরের উন্নতিই বুঝি, বিশেষজ্ঞদের মতেই যাহার প্রতি পদক্ষেপ আবহাওয়াকে দূষিত করিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে উন্নতি অব্যাহত রাখিয়া আবহাওয়ার শুদ্ধিকরণের সিদ্ধান্ত কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে কি? পারমাণবিক অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের বৈঠক যতই বসুক, যে-সিদ্ধান্তই সেখানে লওয়া হউক, অপর রাষ্ট্রের মানুষের শুভাশুভের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমগ্র পৃথিবী বা তার অঞ্চলবিশেষকে করায়ত্ত রাখার ইচ্ছা যতদিন পারমাণবিক শক্তিতে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির থাকিবে, ততদিন তাহারা কেহ ঐ সব অস্ত্রের পরিমাণ ও ধ্বংসশক্তির বর্ধনে বিরত হইবে কি? আজ পর্যন্ত তাহার কোন লক্ষণ তো দেখা যাইতেছে না। আর নিজেকে অক্ষত রাখিয়া অপরকে শক্তিহীন করিবার সুযোগ আসিলে এগুলির ব্যবহারই বা রোধ করিবে কে?

একমাত্র মানুষের পরিশুদ্ধ মানসিক আবহাওয়াই ইহা রোধ করিতে পারে। মানুষের মানসিক আবহাওয়া আজ কলুষিত, ক্রমে অধিকতর কলুষিত হইয়া চলিয়াছে। এই কলুষিত মানসিক আবহাওয়াই বাহিরের আবহাওয়াকে কলুষিত এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক আবহাওয়াকে শুধু কলুষিত নয় আতঙ্কময় করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, রাজনীতিক্ষেত্রের বাহিরে বহু মনীষীর দৃষ্টি এদিকে পড়িলেও রাজনীতিক্ষেত্রে দু-একজন ছাড়া বিশেষ কেহই সর্বান্তঃকরণে এদিকে তাকাইতে পারেন নাই, মানুষের মানসিক উন্নতিকে দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে পারেন নাই, এমনকি উহার প্রয়োজনবোধও করেন না।

তথাপি আমরা আশা করিব, এদিকে মানুষের দৃষ্টি একদিন আসিবেই, এবং সেইদিনই পৃথিবীর আবহাওয়া যথার্থ কলুষতা-মুক্ত হইবে।

ধ্যান

স্বামী ধ্যানানন্দ

১

এ যুগে ধ্যান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলে, প্রথমেই বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে, যাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ছিল—'নরেন্দ্র ধ্যান-সিদ্ধ।' 'ধ্যানসিদ্ধ' একটি সমাসবদ্ধ পদ; তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস—ধ্যানের দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু এই ব্যাসবাক্যটি স্বামীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর ক্ষেত্রে বলতে হবে, ধ্যানে সিদ্ধ—সপ্তমীতৎপুরুষ। কারণ তিনি ঈশ্বরকোটি, জীবকোটি ন'ন। জীবকোটিরাই ধ্যানের দ্বারা সিদ্ধ হ'ন। স্বামীজী জন্ম থেকেই ধ্যানে সিদ্ধ—জন্মের পূর্বেও। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা: "আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার, চুনী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। ধ্যানস্থ দেখে বললুম, 'ও নরেন্দ্র!' একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।" (কথামৃত, ৪।২৪।৩)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছিলেন—'নরেন লোকশিক্ষা দিবে'—শুধু বলেননি, লিখেও দিয়েছিলেন। স্বামীজী ছিলেন লোকশিক্ষক। এদেশে লোকশিক্ষায় যুগপ্রয়োজনে কর্মের ওপর তাঁকে জোর দিতে হয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে তিনি ধ্যানের ওপরই জোর দিয়েছিলেন। দেহত্যাগের প্রায় দু' বছর আগে আমেরিকায় 'ধর্মসাধনা' নামে একটি অপূর্ব বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন—'তুমি দুই সহস্র আরোগ্য-নিকেতন নির্মাণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, যদি না তুমি আত্মানুভূতি লাভ করিয়া থাকো? তুমি মরিবে সামান্য কুকুরেরই মতো কুকুরের অনুভূতি লইয়া। কুকুর মৃত্যুকালে চীৎকার করে আর কাঁদে, কারণ সে জানে যে, সে জড়বস্তু এবং সে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।...স্থায়িত্ব তোমার নিজের অন্তরে ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। সেখানেই অপরিবর্তনীয়, অসীম আনন্দ রহিয়াছে। ধ্যানই সেখানে যাইবার দ্বার। প্রার্থনা, ক্রিয়াকাণ্ড এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপাসনা ধ্যানের প্রাথমিক শিক্ষামাত্র।... ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হই; তখন আত্মা আপনার সেই জন্মহীন, মৃত্যুহীন স্বরূপকে জানিতে পারে। তখন আর কোন দুঃখ থাকে না, এই পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না, ক্রমবিকাশও হয় না। আত্মা তখন জানে যে, সে সর্বদা পূর্ণ ও মুক্ত।' (বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩।২৬৫ ও ২৭০)।

২

'ধ্যৈ চিন্তায়াম্'—অর্থাৎ (ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী) 'ধ্যৈ' ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। এই 'ধ্যৈ' ধাতুর উত্তর ভাবে বা করণে অনট্ (পাণিনির 'ল্যুট্') প্রত্যয় ক'রে 'ধ্যান' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধ্যায়তে ইতি ধ্যানম্' (ভাবে), অর্থাৎ ধ্যান মানে চিন্তন বা চিন্তা। যদিও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল চিন্তা, রূঢ় অর্থাৎ

প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে প্রগাঢ় চিন্তা। আবার 'ধ্যায়তে অনেন ইতি ধ্যানম্' (করণে)—যার দ্বারা, যার সাহায্যে ধ্যান করা যায়, অর্থাৎ ধ্যেয় রূপ, গুণ ও চরিত্রাদিকেও 'ধ্যান' বলে। 'কালীর ধ্যান', 'শিবের ধ্যান' ইত্যাদি প্রচলিত প্রয়োগে ধ্যানের অর্থই হ'ল রূপ বা মূর্তি বিশেষের বর্ণনা, যার সাহায্যে ধ্যান করা হয়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতায় 'ধ্যান' শব্দটি নেই। 'ধ্যয়া' ব'লে একটি শব্দ, একবার মাত্রই, সেখানে পাওয়া যায়, সায়ণাচার্য যার অর্থ করেছেন 'ধ্যানেন'। 'ধ্যা' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'ধ্যয়া' হয়। সুতরাং ধ্যা ও ধ্যান একার্থক। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে এই 'ধ্যা' শব্দটি লোপ পেয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে 'ধ্যান' শব্দটির বহুল প্রচার ঘটেছে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে ধ্যানের সংজ্ঞাসূত্র হচ্ছে—'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্' (৩।২)। 'তত্র' কথাটি থাকাতে সংজ্ঞাসূত্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে না—অব্যবহিত পূর্ব সূত্রের অনুবৃত্তি থেকে যাচ্ছে। সুতরাং আগের সূত্রটির উল্লেখ না করলে এই সূত্রটির অর্থ পরিষ্কার হবে না। আগের সূত্রটি হচ্ছে 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা' (৩।১)। চিত্তকে বাহ্যদেশে কোন মূর্তিবিশেষে, সূর্য, চন্দ্র, ধ্রুবতারা ইত্যাদিতে, অথবা আভ্যন্তর প্রদেশে, নাভিমূল, হৃদয়, কণ্ঠকূপ ইত্যাদিতে নিবিষ্ট রাখার নাম ধারণা 'তত্র' অর্থাৎ ঐ ধারণার অবলম্বিত বিষয়টিতে প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) একতানতার নাম ধ্যান। অর্থাৎ যখন চিত্তে একই চিন্তাস্রোত তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, বিজাতীয় কোনও চিন্তা বাধা সৃষ্টি করে না, তখনই তাকে ধ্যান বলে। সহজ কথায় ধারণা গভীর হলেই হয় ধ্যান; আর ধ্যান গভীর হলেই হয় সমাধি।

আচার্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে (১৩।২৪) লিখেছেন—"ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণাণি মনসি উপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্ চেতয়িতরি একাগ্রতয়া যৎ চিন্তনং তদ্ ধ্যানম্। তথা 'ধ্যায়তীব বকো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীব পর্বতাঃ' (ছা. উ. ৭.৬।১) ইতি উপমোপদানাং তৈলধারাবৎ সন্ততঃ অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ো ধ্যানম্।" অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় থেকে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে নিরুদ্ধ ক'রে, মনকেও অন্তরাত্মাতে একাগ্র ক'রে যে চিন্তা তার নাম ধ্যান। 'বক যেন ধ্যান করছে, পৃথিবী যেন ধ্যান করছে, পর্বতগুলি যেন ধ্যান করছে' (উপনিষদের) এই এই সব উপমা থেকে বোঝা যায় যে, তৈলধারাবৎ সতত অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তিই হচ্ছে ধ্যান।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশে আছে—'ধ্যান এমন করবে যে তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে—ডাইলিউট (dilute) হয়ে যাবে; যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হয়, পাখিরা তার গায়ে বসে, কিন্তু সে টের পায় না' (২২শ সং, পৃঃ ১১৬)।

'কথামৃতে' আছে—'ধ্যানের অবস্থা কিরূপ জান? মনটি হ'য়ে যায়, তৈলধারার ন্যায়। এক চিন্তা ঈশ্বরের' (৩।২০।৩); 'ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনাও যায় না' (৩।১৪।১)।

'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ'-পুস্তকটিতে আছে—'খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে, সব সময়ই স্মরণ মনন হতে পারে। দিনরাত স্মরণ মনন রাখতে পারিস ত জানবি, মন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। রামানুজের মতে

ঐরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান' (৩য় সং, পৃঃ ১৬৪)—'বেদন-ধ্যান-উপাসনাদিশব্দবাচ্যং দর্শনসমানাকারাং স্মৃতিসন্তানম্'—গীতা, ১৮।৬৫, রামানুজভাষ্য।

৩

ধ্যানের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও সংজ্ঞা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হলেও, দার্শনিক মতবাদের বিভিন্নতার ফলে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্তের ধ্যান সম্পর্কিত মনোভাবেরও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অদ্বৈত বেদান্তীরা পাতঞ্জল যোগীদের বলছেন—"তোমরা ধ্যান করেছ, ধ্যানের চরমসীমায় নানা রকমের সমাধি— নির্বীজ সমাধি পর্যন্ত করেছ, কিন্তু এত কষ্ট করেও যখন তোমরা ঈশ্বর পুরুষ ও প্রকৃতি, এই তিন পদার্থ সত্য বলে মানছো, তোমরা পূর্ণজ্ঞানী নও। 'একং সদ্', 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—সত্যবস্তু একটিই, এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, নানা বলে এখানে কিছুই নেই, এই হ'ল বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অতএব তোমাদের ঐ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটি অঙ্গই ভাল (বেদান্তসার ২০১-২০৫ বাক্য দ্রষ্টব্য)। ওর পরে আর নানারকমের ধারণা, ধ্যান, সমাধি নিয়ে হাঙ্গামা কোরো না। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অদ্বিতীয় বস্তুকে অবলম্বন ক'রেই করো (ঐ, ২০৬-২১৪ বাক্য দ্রষ্টব্য)। আচার্যমুখে বেদান্তোক্ত আত্মা সম্বন্ধে শ্রবণ করো, মনন করো, নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করো। তবে আমাদের এই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান ঠিক তোমাদের ধ্যানের মতো নয়। তোমাদের ধ্যানে ভাবনা-প্রকর্ষের দিকে দৃষ্টি. কি ক'রে সেই ধ্যানকে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরিণত করা যায় তারই চেষ্টা। আমাদের ধ্যান বস্তু-পরীক্ষার মতো। একাগ্র মনের অনুসন্ধানী আলো দিয়ে একমাত্র সদ্‌বস্তু আত্মাকেই নিরীক্ষণ করার প্রয়াস. যে কথা গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন। ধ্যানকে আমরা বাদ দিতে পারি না—'ধ্যান-যোগঃ সম্যগ্‌দর্শনস্য অন্তরঙ্গম্' (গীতা, ৫।২৭ শংকর ভাষ্য ভূমিকা)—ধ্যানযোগ আত্মদর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন। কিন্তু তা অবলম্বন করতে হবে শ্রুত্যুক্ত একমেবাদ্বয়ং বস্তুকে জানবার জন্যই।

"আমরা বলি—'অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিম্ অনুতিষ্ঠসি' (অষ্টাবক্রসংহিতা, ১।১৫)—সমাধি বা গভীর ধ্যানের যে অনুষ্ঠান তুমি করছ, সেটাই তোমার বন্ধনস্বরূপ। দেখো সমাধিকে প্রত্যাখ্যান করেও আমরা স্বতই সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছি :

জাতে বিদ্বদনুগ্রহেণ সহজানন্দাগমে সাধকৈঃ
ঔদাস্যেন যথা যথা পরিহৃতঃ কষ্টঃ স
যোগোত্তমঃ।
আশ্চর্যং ন মনীষিতাপি নিবিড়া নিদ্রা যথেয়ং
বলাদ্
আয়াত্যেব তথা তথা মুনিমতো গাঢ়ঃ
সমাধিক্রমঃ॥

(বোধসার : দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪০০-৪০১)

অর্থাৎ অনুভূতিসম্পন্ন পুরুষের কৃপায় স্বাভাবিক আনন্দলাভ হলে, সাধকগণ কষ্টকর যোগোত্তম ঔদাস্যের সঙ্গেই পরিত্যাগ করেন। তবু কি আশ্চর্য, পতঞ্জলি-সম্মত গভীর সমাধি আপনিই জোর ক'রে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়, যেমন না চাইতেও গভীর নিদ্রা জোর ক'রে এসে থাকে।

"আমরা বলি—ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্‌বৃত্ত্যা
নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।

ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী ॥
(অপরোক্ষানুভূতি, শ্লোক ১২৩)
অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মই'-এই সদ্‌বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে. অন্য আর কিছুই অবলম্বন না ক'রে, চিত্তের যে পরমানন্দদায়িনী স্থিতি, তাই 'ধ্যান' নামে প্রসিদ্ধ।

"'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই জ্ঞানের ওপরই আমাদের জোর, ধ্যানের ওপর নয়।

"আমরা বলি—'ন হি বেদান্তেষু ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানাৎ অন্যৎ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন অবগম্যতে' (বৃহ উঃ ১।৪।৭, শাঙ্কর ভাষ্য) অর্থাৎ বেদান্তে মোক্ষের সাধন হিসাবে ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুই উপলব্ধ হয় না।

"আর যদিই বা তোমাদের এই কথা মেনে নিই যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধই মোক্ষের সাধন, তা'হলেও বলবো যে, আত্মজ্ঞান ও তদ্‌বিষয়ক স্মৃতিপ্রবাহ ব্যতীত চিত্তবৃত্তিনিরোধেরও আর কোন উপায় নেই—'ন হি আত্মবিজ্ঞান-তৎস্মৃতি-সন্তানব্যতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য সাধনমস্তি' (ঐ)।"

বেদান্তসম্বন্ধীয় একটি দীর্ঘ পত্রে স্বামী তুরীয়ানন্দজী লিখছেন—"স্বাধ্যায়, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, সমাধিকে কেহই goal (চরম লক্ষ্য) বলে না। 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' ইহাই বেদান্ত-বাক্য।"

(স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ১৩৫৭ সং, পৃঃ ১৬২) 'বিদিত্বা'—জেনে ; এই জানার ওপর জোর।

জ্ঞানযোগীদের মতো ভক্তিযোগীদেরও ধ্যানের ওপর জোর নেই। তাঁরা বলেন—শরণাগতিতেই সর্বার্থসিদ্ধি। শরণং তে প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ, তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্ বৈষ্ণবং পদম্' (ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধৃত গরুড় পুরাণের শ্লোক)—অর্থাৎ ধ্যানযোগ-বিবর্জিত হয়েও যাঁরা শুধু তোমার (ভগবানের) শরণাগত তাঁরা মৃত্যু অতিক্রম ক'রে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ ক'রে থাকেন। ভক্তিসন্দর্ভে ৬১-সংখ্যক শ্লোকের বিচারে শ্রীজীবগোস্বামী লিখছেন—মনোনিরোধরূপেণ যোগাভ্যাসেন ভক্তিকৈবল্যব্যভিচারঃ স্যাদ্ ইত্যাশক্য ভক্ত্যৈব ক্রিয়মাণয়া তদাসক্তত্বেন স্বত এব মনো-নিরোধোঽপি স্যাদ্ ইতি তন্মাত্র-তোপায়মাহ :—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে র্জন্মানি কর্মাণি
চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো
বিচরেদসঙ্গঃ ॥ (ভাগবত, ১১।২।৩৯)

তাৎপর্য এই যে, ভাগবতে অব্যবহিত পূর্বশ্লোকে 'মনো নিরুন্ধ্যাৎ' অর্থাৎ 'মনের নিরোধ করবে' এই নির্দেশ থাকায়, আশঙ্কা হতে পারে যে, কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই তা' হলে ভগবৎপ্রাপ্তি হবে না, ধ্যানের দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধেরও প্রয়োজন আছে, তার উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন যে, না, ভক্তি করতে করতে, ভক্তিতে আসক্তিহেতু মন আপনিই নিরুদ্ধ হবে, সুতরাং চক্রপাণি নারায়ণের সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম এবং ঐ জন্ম ও কর্মের বোধক লোকপ্রসিদ্ধ 'বাসুদেব', 'মধুসূদন' আদি নাম শ্রবণ ও কীর্তন ক'রে নিঃস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হয়ে বিচরণ করবে।

ভক্তের কথা হচ্ছে : 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্, অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্' (ভাগবত, ৭।৫।২৩)—এই নবধা ভক্তিতে তো সদা-অনুস্যূত রয়েছে 'স্মৃতি-সন্তান'—অর্থাৎ ভগবৎস্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা

[শেষাংশ ৩৬৯ পৃষ্ঠায়]

প্রাচীন ভারতে পুরোহিত ও কৌটিল্য

ডক্টর অনিলচন্দ্র বসু

প্রাচীন ভারতে কেবল যে যাগযজ্ঞাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই পুরোহিতের বিশেষ ভূমিকা ছিল তা' নয়, রাজ্য-প্রশাসনেও পুরোহিতের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিতান্তই অপরিহার্য ছিল। বৈদিক যুগে রত্নিনৃদের সভায় এবং উত্তরকালে মন্ত্রিসভায় পুরোহিতের স্থান ছিল সর্বোচ্চে, পুরোহিত রাজাকে ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন এবং রাজাও তাঁর পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কাজে উদ্যোগী হতেন না। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের পুরোহিত বৃহস্পতি যেমন নিয়তই তাঁর অগ্রবর্তী হয়ে তাঁকে পরিচালনা করতেন, সেরূপ পুরোহিতও পার্থিব রাজাকে অনুরূপভাবে সাহায্য করতেন। রাজনৈতিক ও ধর্মসম্পর্কিত ব্যাপারে রাজা পুরোহিতের উপদেশ ও নির্দেশ অনুসারে সরকারের নীতি ঘোষণা করে তা' কার্যকর করতে সচেষ্ট হতেন। বেদে আরো বলা হয়েছে—"পুরোহিতস্তাভিঃ রাজানং পরিগৃহ্য তিষ্ঠতি সমুদ্র ইব ভূমিম্"—অর্থাৎ সমুদ্র যেমন ভূমিকে বেষ্টন করে থাকে, পুরোহিতও ঠিক তেমনি তাঁর লৌকিক ও অলৌকিক শক্তি দিয়ে প্রতিনিয়তই রাজাকে বেষ্টন করে রক্ষা করতেন।

অথর্ববেদে পুরোহিতের আরো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে, এ বেদ থেকে জানা যায় যে, পুরোহিত কি শান্তি, কি বিগ্রহ—সকল সময়েই রাজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। প্রতিদিন পুরোহিত অথর্ব-মন্ত্র উচ্চারণ করে রাজার উপর মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন করতেন। এর ফলে সারাদিন এক অদৃশ্য রক্ষাকবচ রাজাকে আচ্ছাদন করে থাকত, সেজন্য কোনপ্রকার অশুভই তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। নানাপ্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজাকে মহাবীর ও সার্ব-ভৌম নরপতি করে তোলার জন্য পুরোহিতের চেষ্টার অবধি থাকত না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্থায়িত্বলাভের জন্য পুরোহিতই রাজার প্রতিনিধি হিসাবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন। পুরোহিত রাজার হয়ে যজ্ঞে হবিঃ প্রদান করতেন বলেই রাজা একরাট্ সম্রাট, সার্বভৌম শাসক, জনগণের নায়ক ও দেবোদ্দিষ্ট দ্রব্যের অর্ধাংশের ভাগী হতে পারতেন। বৃহস্পতি যেমন রাজা সোমকে রাজকীয় পোষাকে আচ্ছাদিত করেছিলেন বলেই তিনি অভিচারাদি সত্ত্বেও প্রজাবর্গের রক্ষক হতে পেরেছিলেন, তেমনি পুরোহিত-প্রদত্ত রাজপোষাক পরিধান করে রাজা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নিরাপদ দীর্ঘজীবন ও নানাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভে সক্ষম হতেন। এ বেদে আরো বলা হয়েছে যে, পুরোহিত তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি- ও মন্ত্রবলে আগন্তুক যে কোন বিপদ বা অশুভকে প্রতিহত করতে পারতেন। নানা-প্রকার উৎপাত, দুর্গ্রহ, দুর্যোগ ও সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি আকস্মিক ও নিশ্চিত বিপদ-আপদ থেকে পুরোহিত রাজা ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। যা' কিছু ক্ষতিকর, যা'কিছু ভয়ানক অশুভ তা' সবই পুরোহিত অলৌকিক শক্তিবলে প্রতি-হত করে রাজ্যের কল্যাণবিধানে তৎপর হতেন।

বেদের পর ব্রাহ্মণের যুগেও রাজার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে উপদেষ্টা ও পরিচালক হিসাবে পুরোহিতের ভূমিকা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজা প্রত্যেক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুরোহিতের উপদেশনির্দেশ প্রার্থনা করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, যে রাজা বিদ্বান ও বিচক্ষণ পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হন, সে রাজার প্রজারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং রাজার প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য প্রকাশ করে। এ ব্রাহ্মণে আরো বলা হয়েছে—"তস্য রাজা মিত্রং ভবতি, দ্বিষন্তমপবাধতে, যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণো রাষ্ট্রগোপঃ পুরোহিতঃ—" অর্থাৎ যে রাজার বিদ্বান, ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকেন এবং যে পুরোহিত রাষ্ট্ররক্ষা করতে সক্ষম, সে রাজার প্রতি অন্যান্য রাজারাও মিত্রভাবাপন্ন হন এবং তিনি শত্রুবিনাশ করতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, পুরোহিত যে রাজার অগ্রবর্তী হন, সকল প্রজা সে রাজার কাছে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেন। দেবতারা স্বর্গ জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ পুরোহিত বৃহস্পতি ছিলেন তাঁদের উপদেষ্টা ও পরিচালক। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, কখনো কখনো একজন বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ যুগপৎ একাধিক রাজ্যের পুরোহিতপদ অলঙ্কৃত করতেন। দেবভাগ শ্রৌতর্ষ ছিলেন কুরু ও সৃঞ্জয় এ উভয় রাজ্যের পুরোহিত। জালজাতুকর্ণ্য ছিলেন কাশী, কোশল ও বিদেহ—এ তিনটি রাজ্যের পুরোহিত। যাঁরা একাধিক রাজ্যে পুরোহিতের পদে বৃত হতেন, তাঁরা যে অসাধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পুরোহিতপদে বরণ করার আগে রাজাকে শপথগ্রহণ করে বলতে হত যে, তিনি কখনো পুরোহিতের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবমাননা প্রদর্শন করবেন না, এর অন্যথা করলে তিনি দৈবী বিপদের দ্বারা বিনষ্ট হবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এর প্রমাণ রয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বশিষ্ঠ সত্যহব্যকে আঘাত করার জন্য ক্ষত্রিয় রাজা অত্যরাতিকে বিষম মূল্য দিতে হয়েছিল। রামায়ণে বলা হয়েছে যে, রাজা যখন কোন দীর্ঘকালস্থায়ী যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকার জন্য রাজকার্য-পরিচালনায় অবকাশ পেতেন না, তখন পুরোহিতই তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করতেন; এখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিংহাসনে আরোহণের যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে যখন রাজতন্ত্র ব্যাহত হত, তখন পুরোহিতই প্রশাসন পরিচালনা করতেন।

আচার্য কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাজ্য-প্রশাসনে রাজার পরামর্শদাতা হিসাবে পুরোহিতের উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য ভূমিকার কথা বর্ণনা করেছেন। পুরোহিতের ভূমিকা রাজ্যপ্রশাসনে অপরিহার্য হলেও যে-কোন ব্রাহ্মণকে এ পদে বরণ করা হত না। পদের দায়িত্ব ও গুরুত্বের কথা বিশেষ বিবেচনা করে পুরোহিতের যোগ্যতা-প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলেছেন যে, অতি কুলসমৃদ্ধ ও শীলবিশিষ্ট, ষড়ঙ্গের সঙ্গে সমস্ত বেদে পারঙ্গম, দৈব বা জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শকুনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, দণ্ডনীতিশাস্ত্রে নিপুণ এবং দৈবী ও মানুষী বিপৎপ্রতিকারের জন্য অথর্বমন্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ব্রাহ্মণকেই কেবল পুরোহিতপদে বরণ করাই বিধেয়। রাজা ও পুরোহিতের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কৌটিল্য বলেছেন,—"তমাচার্যং শিষ্যঃ পিতরং পুত্রো ভৃত্যঃ

স্বামিনমিবানুবর্তেত"—অর্থাৎ শিষ্য যেমন আচার্যের, পুত্র যেমন পিতার এবং ভৃত্য যেমন প্রভুর অনুবর্তন করে, রাজাও তেমনি পুরোহিতের অনুবর্তন করবেন।

শান্তির সময়ে যেমন তেমনি বিগ্রহের প্রাক্কালেও পুরোহিতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচিত হয়েছে আচার্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে রাজা সেনাগণকে আহ্বান করে যুদ্ধ করতে আদেশ দেবেন, তারপর মন্ত্রিগণ ও পুরোহিত তাদের আদেশ দেবেন। এরপর মন্ত্রিগণের ন্যায় পুরোহিতও সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করে তাদের মধ্যে বলসঞ্চয়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দেবেন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরও পুরোহিত অথর্ববেদোক্ত প্রক্রিয়ায় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবেন। এ ছাড়া যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য পুরোহিত আশীর্বচন পাঠ করবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পুরোহিতের ভূমিকা সম্পর্কে কৌটিল্য অথর্ববেদোক্ত তথ্যের মোটামুটি অনুবর্তন করেছেন এবং সেজন্য আচার্য কৌটিল্য অথর্ববেদকে অর্থশাস্ত্রের অন্যতম উৎস বলে সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করেছেন। কৌটিল্য পুরোহিতকে উচ্চরাজনীতিবিদ্‌দের অন্যতম বলে বিবেচনা করেছেন। রাজ্যের মন্ত্রিগণের মতো পুরোহিতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। সেজন্য রাজ্যের মন্ত্রিগণের গুণাবলীবর্ণনাপ্রসঙ্গে কৌটিল্য পুরোহিতের গুণাবলী ও যোগ্যতার উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্যের মতে রাজ্যের মন্ত্রিগণের মতো পুরোহিতও অতিপ্রয়োজনীয় রাজকর্মচারী, পুরোহিতের দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সভাদের দ্বারা সুরক্ষিত ক্ষত্র রাজা অপরাজেয় হয়। কৌটিল্য আরো বলেছেন যে মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিত রাজার অমাত্যদের চরিত্র এবং লক্ষণাদির বিচার করবার অধিকারী। রাজ্যপ্রশাসনে মন্ত্রিগণের দায়িত্ব যতটুকু, পুরোহিতের দায়িত্বও তার চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতকে বাদ দিয়ে ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় কোন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে যখন বৈদিক যজ্ঞক্রিয়াপ্রধান কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য ছিল, তখন পুরোহিত স্বাভাবিক ভাবেই কি ধর্মানুষ্ঠানে, কি রাজকার্য-পরিচালনায় প্রাধান্য পেয়েছিল, কিন্তু আরণ্যক উপনিষদের যুগে যখন বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল, তখন এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমশঃ পুরোহিতের প্রাধান্যও হ্রাস পেতে লাগল। তাছাড়া, জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে পুরোহিতের স্থান ও প্রাধান্য হারিয়ে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে লাগল। অবশ্য জাতকের কোন কোন গল্পে তখনও পুরোহিতের প্রভাবের চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল—একথা অস্বীকার করা যায় না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আচার্য কৌটিল্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মতো পুরোহিতের উপরও গুরুত্ব এবং প্রাধান্য আরোপ করলেও পুরোহিতকে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। গুপ্তোত্তর যুগের প্রত্নলিপি থেকেও জানা যায় যে, পুরোহিত তখন আর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন না, সেজন্য পুরোহিতকে পৃথক করে দেখানো হয়েছিল। যদিও পুরোহিত মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়লেন, তথাপি রাজার উপর পুরোহিতের নৈতিক প্রভাব একেবারেই লোপ পেল না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে শুক্রনীতিসারে পুরোহিতকে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। এই সময় শ্মশ্রু-শোভিত Mr. Philip (মিঃ ফিলিপ) নামক একজন আমেরিকান আসিলেন। আসলে তিনি অস্ট্রিয়ান—দুঃসাহসী পাইলট বা বিমান-চালক। মহাযুদ্ধে বহুবার আটলাণ্টিক পার হন, যুদ্ধশেষে আমেরিকায় যান। স্ত্রীর সাহচর্যে বেদান্ত-চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া স্বামী পরমানন্দের আশ্রমে যোগদান করেন। কালিফোর্নিয়ার ড্যাম-ভাঙার প্রবল বন্যায় তাঁহার স্ত্রী ভাসিয়া যান। তারপর আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধানে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন, বেলুড়ে ছিলেন।

মিস ম্যাকলাউড (Miss Mcleod) তাঁহাকে সারগাছি পাঠাইয়া দেন। সন্ধ্যাবেলা মিঃ ফিলিপ আসিয়া পৌঁছিয়াই হাঁটু গাড়িয়া স্বামী অখণ্ডানন্দকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে তিনি আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারীর দিকে দেখাইয়া ফিলিপকে বলিলেন, "He is your brother, he will serve you. Yes....privilege of service. Everyone is my Atman. When I serve others, I serve my Self. (সে তোমার ভাই, তোমাকে সেবা করবে। হাঁ,—সেবার সুযোগ ও অধিকার! সবাই আমার আত্মা। যখন আমি অপরকে সেবা করি, নিজের (আত্মার)-ই সেবা করি।)" তারপর ফিলিপ তাঁহার জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। তাঁহার মাথার পিছন দিকে হাত বুলাইয়া বাবা কি দেখিলেন, পরে নিজের কাপড় দেখাইয়া বলিলেন, "Do you like this—the garment of renunciation? You like it! You are a born tyagi. You are Self. (তুমি এটা—এই ত্যাগের পরিচ্ছদ পছন্দ কর? হাঁ, তুমি পছন্দ কর! তুমি আজন্ম ত্যাগী। তুমি)"

তখন ফিলিপ বলিতে লাগিলেন—কিভাবে তিনি ৪০ বৎসর বয়সে এক ৫০ বৎসর বয়স্কার সহিত পরিণীত হন, এবং তাঁহারই সম্পর্কে তিনি জীবনের নূতন পথ পাইয়াছেন। বন্যাপ্লাবিতা স্ত্রীর মৃতদেহের হাতে ছোট একটি বই ধরা ছিল—'Light on Life' ('জীবন-পথের আলো')। বইখানিতে তখনও বন্যা-জলের দাগ রহিয়াছে। বইখানি দেখাইতে দেখাইতে তিনি সত্যই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—খৃষ্টান ধর্মসাহিত্যের বই তাঁহাকে দিতে পারে নাই। তিনি প্রায় ৮।১০ হাজার বই পড়িয়াছেন। এই বইখানি তাঁহাকে আলো দিয়াছে। কিন্তু এখন তিনি শান্তি চান, বেদান্তের শান্ত শুভ্র আলোকসম্পাতে তিনি এক নবজীবন চান।

বাবা বলিলেন, "'Imitation of Christ' is a great book. It helps a Spiritual life of renunciation. We had that book in our first monastery. It is a very nice book. ('ঈশানুসরণ' একখানা মহাগ্রন্থ। ইহা ত্যাগপূত আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে সহায়ক। আমাদের প্রথম মঠে এই গ্রন্থখানি ছিল—খুব চমৎকার বই।)"

তারপর কি মনে করিয়া ফিলিপকে লইয়া বাবা ঘরে গেলেন, মোমবাতির আলোর কাছে

গিয়া তাঁহাকে খুব ভালো করিয়া দেখিলেন এবং কিছু প্রশ্নাদি করিলেন। পরে সন্তুষ্ট হইয়া উভয়ে বাহিরে আসিলেন। পরে ফিলিপ বলেন—স্বপ্নে তিনি বাবাকে দেখিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার শুভদিনে হোম করিয়া বাবা ফিলিপকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করিলেন এবং নাম দিলেন 'পরমচৈতন্য'। দাড়ি-চুল কামানোর পর মুণ্ডিতমস্তক ফিলিপকে শুভ্র ধুতিচাদর-পরা ব্রহ্মচারীর বেশে চমৎকার দেখাইতেছিল। নবজাত শিশুর চাঞ্চল্যে ও আনন্দে সারাটি আশ্রম তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং বারবার বলিতেছেন, 'I am Baba's youngest child ('আমি বাবার কনিষ্ঠ সন্তান।') সারা বৈকালবেলা তিনি ঠাকুরঘরের কাছে হাতজোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; কোনদিন হয়তো কোন গাছের তলায় বসিয়া ধ্যান করিতেন, এবং বলিতেন, "I must realise myself while in India. This is a great country. How you love so much, I wonder! So much love I have never found anywhere. (ভারতে যে-কয়দিন আছি তার মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করবই। ভারত একটি মহান্ দেশ। আশ্চর্য, তোমরা কি ক'রে এত ভালবাসো! এমন ভালবাসা আমি কখনো কোথাও পাইনি।"

ফিলিপের বিছানাপত্র কিছুই ছিল না। একটা কম্বলের উপর চাদর পাতিয়া হাতে মাথা দিয়া শুইত। আর একটা লংক্লথের চাদর গায়ে দিত। গরম জামা-কাপড়ের মধ্যে ছিল—কোট ও প্যাণ্ট।

একদিন সকালে একটি সুতার সার্ট গায়ে ফিলিপ ধ্যান করিতেছে—ঘরে খাটের উপর। পিছন হইতে বাবা আসিয়া তাঁহার নূতন একটি সাদা পশমের আলোয়ান ফিলিপের গায়ে দিয়া হাসিতে লাগিলেন; মাথার চুলগুলি জটার মতো ঝুলিয়া পড়িয়াছিল; সে এক অপূর্ব শোভা!

সেইদিন বিকালে ফিলিপ চুপি চুপি ভক্তকে বলিতেছে, 'Do you know who Baba is? Baba is Shiva. Is n't it? (বাবা কে জানো? বাবা শিব। তাই নয় কি?)' ভক্ত বিস্ময়ে আনন্দে চুপ করিয়া রহিল, একটু ঘাড় নাড়িল।

সন্ধ্যাবেলা একদিন পূর্বকথা বলিতে বলিতে বাবা সাধন ত্যাগ বৈরাগ্যের অনেক কথা বলিলেন:

"হরিদ্বারে হৃষীকেশে মাধুকরী করতাম—ছত্রের ঘণ্টার অনেক পরে যেতাম। মাঈ ব'লত—ঘণ্টী নেহি শুনা? আমি বলতাম—ঘণ্টী শুনেগা, কেয়া ধেয়ানমে রহে গা মাঈ? মাঈ ব'লত—অভি তো কুচ্ নেহি হ্যায়—সবুর করো বেটা।

"আমরা তো পাহাড়ে সব ভুলে থাকতুম। কিন্তু ঠাকুর যখন সংসার করালেন তখন সংসারীকেও হার মানাতে হবে। খুঁটিনাটি সব করতে হবে—দেখছিস্ না?"

কি কথায় একজন বলিয়াছে—মনে থাকে না। বাবা একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "মনে থাকে না?" তারপর স্বর নামাইয়া বলিলেন, "মনে তো আমারও থাকত না। তিব্বতে বাংলা ভুলে গেছলাম। আবার ধীরে ধীরে মনে প'ড়ত। তেমনি মনে করলেই মনে আসে, মনে রাখলেই মনে থাকে।"

বৈরাগ্যের প্রসঙ্গ আবার আসিয়া পড়িল—বাবা বলিলেন, "'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—বৃহদারণ্যক উপনিষদের [illegible]

বৈরাগ্যের দিন ক্ষণ নেই। বয়স ধরাবাঁধা নেই। 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী' বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য শঙ্কর বলেছেন। এসব বৈরাগ্যের কথা। বৈরাগ্য হ'লে বেরিয়ে পড়বে, চলে যাবে যেদিকে খুশি —প্রাচী, প্রতীচী, উদীচী দিকটিক ঠিক নেই। আবার আছে—'ব্যুত্থায়…ভিক্ষাচর্যং চরন্তি'। ভিক্ষার নিয়ম আছে ভিক্ষার জন্য যখন তখন যাবে না। বাড়ির সকলের খাওয়া হয়ে গেলে যাবে—'বাঙ্গারে ভুক্তবর্জনে'—আগুন নিভে গেলে, এঁটো কাঁটা উঠে গেলে। তখন যতটুকু পাবে তাতেই সন্তুষ্ট হ'তে হবে।"

সন্ধ্যার পর বাবা বুকার ওয়াশিংটনের কথা বলিতেছেন: "ইংরেজ বাপ, নিগ্রো মা। পড়েছ 'Up From Slavery'? সেবা ও শিক্ষার কথা—নিজ-হাতে ইট গড়ে স্কুলবাড়ি তৈরী হ'ল। পাঁজা পোড়াতে পারে না—বারবার failure (বিফলতা)। শেষে সব হ'ল। সে একটা mission (মহৎ উদ্দেশ্য) নিয়ে জন্মেছে। সে কি কিছুতে থামে, না দমে? সে করবেই। শরৎ মহারাজ বইখানা আমাকে দেন এবং বলেন, 'ভাই, তোমার যেমন মহলায় কুঁড়েঘরে সেবাকার্য আরম্ভ তেমনই।'

"প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ওর সঙ্গে বসে খান। সবাই রুজভেল্টকে মারতে যায়।

"এখানকার এক ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলে, 'তোমরা মানুষকে ঘৃণা কর।' আমি মুখের সামনে বলে দিই—'তোমরা কর না?' ঐ দৃষ্টান্ত দিই; তখন চুপ, শেষে বলে, 'Christianity is not yet ripe in America'—(খৃষ্টধর্ম এখনও আমেরিকায় পরিপক্ব হয়নি)। যাই হোক, সেই থেকে বন্ধু হয়ে গেল, হক্ কথা বলেছি কিনা! ওটা English nature (ইংরেজ স্বভাব)। বাঙালীকে হক্ কথা বলো, সে সারাজীবন তোমার শত্রুতা করবে।'

"জাপান কি সুন্দর, স্বামীজী লিখতেন, যেন ছবির মতো আঁকা রয়েছে! শহর গ্রাম চেনা যায় না—এক রকম। বরাবর পাকা রাস্তা, আর তার দুধারে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বাড়ি, বাগানঘেরা ফুলের টবে ফুল ফলের গাছে ফল।"

পূর্ব প্রসঙ্গ ঘুরিয়া আসিল—"দেশী রাজাদের চেয়ে ইংরেজরাজ ঢের ভাল, এদের administration (শাসনব্যবস্থা)-এর criticism (সমালোচনা) করতে পারো এবং করছেও তো কত লোক, আর ওদের সম্বন্ধে একটু কোন কথা বললে—spy (গুপ্তচর) আছে, রিপোর্ট চলে যাবে। তারপর বিচার অনুসন্ধান কিছুই নেই, হামাম বা অন্ধকূপে মৃত্যুর দিন গণনা। এখন বেড়েছে—আগে অত ছিল না। অবশ্য ব্রিটিশ রিজেন্ট আছে, সবই জানে, সবই দেখছে।"

কিছুদিন হইতে বাবার ইচ্ছা হইয়াছে—সেবকেরা কয়েকজন গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠন লইয়া যায় এবং উহার সাহায্যে গ্রামবাসীদের নানান কথা বুঝাইয়া দেয়। প্রথমেই যাইতে হইবে সেই শোকসন্তপ্ত এড়োয়ানি গ্রামের মুসলমান ভক্তটির বাড়িতে। তদুপলক্ষে ম্যাজিক লণ্ঠনটি সারানো হইয়াছে। মার্কিন ব্রহ্মচারী পরমচৈতন্য যন্ত্রবিদ্, সেই সব করিয়াছে। আজ সন্ধ্যাবেলা হলের পশ্চিম দেওয়ালে পর্দা টাঙানো হইয়াছে। ব্রহ্মচারী নির্ভয়চৈতন্য স্লাইড বুঝাইয়া দিবেন। হলের পূর্বপ্রান্তে বেতের চেয়ারে বাবা বসিয়া আছেন; দুইজন সেবক তাঁহার দুই পায়ের হাঁটুতে বাতের ঔষধ মালিশ করিয়া দিতেছে।

প্রথমেই ম্যাজিক লণ্ঠন পরীক্ষার জন্য স্বামীজীর ছবি দেওয়া হইল, বেশ সুন্দর ফোকাস্ হইয়াছে। বাবা দেখিয়া খুব খুশী হইলেন, বলিলেন, "দেখেছিস্ কী মূর্তি !"

তখনকার বাবার সেই টান-করা সোজা শিরোগ্রীবা এবং তেজোব্যঞ্জক ভাব দেখিয়া সেবকের মনে হইল—স্বামীজীর ভাবে ভরপুর বলিয়াই কি উভয়ের মুখমণ্ডলের এত সাদৃশ্য !

একটু পরে বাবা বলিতেছেন, "দেখ্, স্বামীজীর দেখা পাওয়া সহজ, তিনি দেখা দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। ঠাকুর এত সহজ নন। এ যুগের লোক স্বামীজীর ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবে। এইজন্য দেখছিস্ না—লোকে স্বামীজীর ভাবই আগে নিচ্ছে, বেশী নিচ্ছে। এইসব সেবাকার্য, দেশপ্রেম—এর ভেতর দিয়েই field (জমি) তৈরী হ'ল। তারপর spiritual। আধ্যাত্মিক।" ওদিকে স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র', পর্দায় উঠিয়াছে···পড়া হইতে লাগিল—'হে ভারত ভুলিও না···।' পড়া শেষ হইলে সব চুপচাপ—গম্ভীর।

একটু পরে বাবা বলিলেন, "স্বামীজীর যে এই স্বদেশপ্রেম—এ অত সোজা নয়। এ patriotism (প্যাট্রিয়টিজম্) নয়—এ দেশাত্মবোধ। সাধারণ লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ। তাই দেহেরই সেবাযত্নে বিভোর। এ হচ্ছে দেশাত্মবোধ—সারা দেশের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিয়ে চিন্তা। এই শেষ নয়, এরপরও আছে বিশ্বাত্মবোধ, সকলের জন্য চিন্তা।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর একজন জিজ্ঞাসা করিল—'এতদিন এত কাজ হচ্ছে mass (জনসাধারণ)-এর কিছু উন্নতি হয়েছে কি ?' বাবা বলিলেন, "কি বা কাজ হয়েছে—যা হওয়া উচিত ছিল তার তুলনায়! আর এই বিরাট mass (জনগণ)—স্বামীজী যাকে বলেছেন sleeping leviathan (ঘুমন্ত জলজন্তু)—একে জাগানো কি মুখের কথা, না হুজুগের কাজ? ধীরে ধীরে তাকে touch (স্পর্শ) করতে হবে in spirit of sympathy and service (সহানুভূতি ও সেবার ভাবে)। হঠাৎ চমকভাঙা—যা মাঝে মাঝে হচ্ছে—mass response (গণজাগরণ) যাকে মনে করে ও বলে politician (রাজনীতিক)-রা তার বিশেষ কোন স্থায়ী দাম নেই। mass awakening (গণজাগরণ) হবে slow and sure (ধীরে ও নিশ্চিত)-ভাবে, যেমন হয়েছে ও হচ্ছে—জাপান, রাশিয়া, টার্কী ও চায়নায় সানইয়াৎসেন্ ও কামালপাশা প্রভৃতি দ্বারা। স্বামীজীরও তাই প্রধান লক্ষ্য ছিল mass education (জনসাধারণের শিক্ষা)। পত্তন তো ক'রে গেছেন—তারপর ধীরে ধীরে হবে, মড়াকে চেতানো—একি সহজ ব্যাপার? হাজার বছরের slaves (ক্রীতদাস)!"

"তবে আমরাই প্রথম—গ্রামে গ্রামে চাষার কুটিরে কুটিরে ঘুরেছি। সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মের বুলি না ব'লে—ব'লে বেড়িয়েছি সাধারণ জ্ঞানের কথা, নতুন ফসল চাষের কথা, স্বাস্থ্যরক্ষার দু-চারটে কথা—জল পরিষ্কার ক'রে ছেঁকে খাবে, মড়কের সময় পার তো ফুটিয়ে খাবে। কি ক'রে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি করা যায়, ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়, তার চেষ্টা করেছি, আর বলেছি কিছু কিছু জমানো উচিত অসময়ের জন্য। আশ্রমের কপি-চাষ দেখে কত লোক শিখে নিল। তারপর গুটিপোকার পলু-চাষ তো আমরাই ধরালাম এদের, আশ্রমে কতদিন ঐ কাজ হয়েছে। ওদের রোজগারে যা বাঁচত, আমার কাছে জমা রাখত অসময়ের জন্য। এখনও অনেকেরই মজুরীর পয়সা কেটে—জমা রেখে

দিই, বলি অমুক না, যেদিন কাজকর্ম করতে পারবি না—সেদিন নিবি।

"শরৎ চাটুজ্যের ভাই বেদানন্দ এখানে অনেকদিন ছিল। শরৎবাবু একবার দেখা করতে আসেন [বলরাম-মন্দিরে]। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) সঙ্গে দেখা, বললেন, 'এখানে অখণ্ডানন্দ স্বামী আছেন?' আমার কাছে এসে বললেন. 'আমি সাধু-সন্ন্যাসী দেখতে আসিনি। শুনেছি, আপনি মানুষকে ভালবাসেন, চাষার কুটিরে কুটিরে ঘুরে বেড়ান, তাই আপনাকে দেখতে এলাম। আপনি যে ভাব নিয়ে কাজ করেন, আমি সেই ভাব নিয়ে বই লিখেছি, গল্প লিখেছি, যাতে ভাবটা ছড়ায়।' পরে তাঁর অনেক বই পাঠান। কতকগুলি বেশ লাগলো—পল্লীসমাজ, পণ্ডিত মশাই; আরগুলি কেমন যেন মুলো-খাওয়া ঢেকুর।"

* * *

আল্লা

সুব্রহ্মণ্য ভারতী

[অনুবাদিকা : শ্রীমতী বিভা সরকার]

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরা সীমাহীন মহাশূন্যে ঘোরে
অহোরাত্র অন্তকাল শ্রান্তিহীন যুগে যুগান্তরে।
অক্লান্ত তাদের তুমি ইচ্ছামত করিছ চালনা
অব্যক্ত অনন্ত প্রভু! কোন মন্ত্রে করি গো বন্দনা!

চিরমিথ্যাবাদী যারা জ্ঞানহীন আসুরী দুর্জন,
সজ্জনের উপদেশ উপেক্ষায় না করে গ্রহণ
মৃত্যুভয় হতে তবু সে সবারে ত্রাণ সমভাবে
তোমার চরণ স্মরি হয় তারা স্মরণার্থী যবে।

ইশারউড এবং হিন্দুর সন্ন্যাসবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী বাণগোবিন্দ পরমপন্থী

অলিভার একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক, সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাকে বিষয়মুখী করতে পারেনি। নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কে পদ-মর্যাদাসম্পন্ন এক চাকরিতে নিযুক্ত ছিল, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কাজের পারদর্শিতার জন্য সে প্রশংসা অর্জন করে। পদমর্যাদা এবং আর্থিক কৌলীন্যে এই চাকরি তার জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করে দিত এবং হয়ত একদিন সে ব্যাঙ্কের অধিকর্তার (ডাইরেক্টর) পদে উন্নীত হত; কিন্তু সে এই জীবন গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। কোয়েকারদের (Quakers) সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং সেবাব্রতী জীবনকে নিজের আদর্শ হিসাবে সে বেছে নেয়। এর পরেই রেডক্রসের এক চাকরি পেয়ে ম্যুনিখে আসে এবং সেখানেই তার পরিচয় ঘটে হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে যা তার সারাজীবনের গতিকে সম্পূর্ণভাবে নতুনদিকে প্রবাহিত করে দেয়—জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরও সে হয়ত পেল এবং মনে তার শান্তিও এসে গেল। ইশারউড তার এই সময়কার মনের অবস্থা চমৎকার তুলে ধরেছেন তারই জবানীতে: "It was while I was in Munich that first time that I got to know a Hindu monk who had been living there for some years. He'd formed a small group who used to meet with him several times a week to practise meditation and study Vedanta Philosophy. I ran across this monk quite by accident as it then seemed to me, anyway in a public library and we begun talking, something about him fascinated me, from the first moment; it was his very quite unemphatic air of assurance. What I mean is nearly all the people who had ever struck me as having great assurance were also self-assertive and complacent, in fact downright stupid. So I felt I was meeting a new sort of human being almost. He was not at all impressive physically. He was small and frail and skiny, with untidy grey hair cut rather short and he can't have weighed much more than a hundred pounds. He was in his middle fifties but looked older except that his eyes were young, very clear and bright. He had as I say, this extraordinary calm assurance without being in least aggressive." (পৃঃ ১৩)। অলিভার শান্ত সমাহিত এই সন্ন্যাসীর মধ্যে নতুন আলোক পেল—কোয়েকারদের মতবাদ তার মনে আর তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। অধ্যাত্মবাদ বা মিস্টিসিজম তাকে অনেক সময় বিহ্বল করে তুললেও সে হিন্দু অধ্যাত্মবাদের ব্যবহারিক এবং দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় লক্ষ্য করল। আরম্ভ হোল আধ্যাত্মিক যাত্রা। হিন্দু সন্ন্যাসীকে নানা প্রশ্ন করতে সুরু করল—প্রতি প্রশ্নে তার অনেক সংশয় ধীরে ধীরে নিরসন হতে লাগল। প্রথম দিনে লাইব্রেরীতে যে সাক্ষাৎকার হয় সেখানেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করল। রেডক্রসের

কাজের শেষে মিলিত হত স্বামীজীর সঙ্গে—তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথা হোত। এমনও সময় গেছে যখন তিনি কোন কথা বলতেন না অথচ পাওয়া যেত মানসিক এক প্রশান্তি। তার সে অভিজ্ঞতা নিজেই বর্ণনা করছে: "Whereas when I got back to the Swami's room and sat down quietly with him—he often sat a long time without talking, which was disconcerting at first but I got used to it—it was like coming out of a doze and acking myself—When was I, all day long? and then answering, I don't know exactly but this is where I am when I am awake." (পৃ:-১৫)। গুরু তাঁর মৌন ব্যাখ্যান দিয়ে শিষ্যের সংশয় নিরসন করেন, কেননা তিনি শিষ্যের অন্তরের কথা ধরতে পারেন আর তার মানসিক ব্যবস্থিতি—"গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ" অর্থাৎ কি না মন যখন শান্ত ও ধীর এবং স্বচ্ছ হয় তখন আয়নার মতো অথবা নিস্তরঙ্গ হ্রদের নীচের জিনিসের মতো ধরা পড়ে মনের সব কিছু কথা এবং উভয়ে উভয়কে তখন বুঝতে পারেন। যোগ-সমাহিত চিত্তে শিষ্যের সংশয় তাঁর নিকট ধরা পড়ে—তিনিও তখন তাঁর সংযোগ-শক্তিতে তা বুঝিয়ে দেন, ধরিয়ে দেন। পল ব্রান্টন অনুরূপ এক বিচিত্র অনুভূতির কথা আমাদের শুনিয়েছেন। রমন মহর্ষির সামনে গিয়ে যখন তিনি প্রথম বসলেন তখন তার মনের সমস্ত সংশয় আপনা আপনিই নিরসন হতে লাগল। অনেক প্রশ্ন তিনি লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু জিজ্ঞাসার আর প্রয়োজন হল না, নিজের থেকে সমাধান হয়ে গেল। তিনি লিখছেন: "For it does not now seem to matter whether I solve the problem which have hitherto troubled me—I know only that a steady river of quietness seems to be flowing near me, that a great peace is penetrating the inner reaches of my being and that my thought-tortured brain is beginning to arrive at some rest."[৬] এর পরেই অলিভার তাঁর দিব্য সান্নিধ্যে আরো নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে একত্র থাকতে লাগল। সে দেখল স্বামীজীর শরীর সুস্থ নয়, কাজেই সেবাশুশ্রূষার মাধ্যমে আরো গভীর-ভাবে আপন হতে চেষ্টা করল। এই শুক্র-শুশ্রূষা এবং সান্নিধ্যের মাধ্যমে শিষ্যের ভিতরে অনুসঞ্চারিত হয় আধ্যাত্মিকতার বিচিত্র অনুভূতি। নারদ বলেছেন, মহাপুরুষদের কৃপাই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি বা সোপান—মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব। অলিভারকে তিনি তার কাজ করে যেতে বললেন যাতে তাকে কর্মবিমুখ না করে কর্মের মধ্য দিয়ে আসে বিষয়-বিতৃষ্ণা—কর্মত্যাগের মধ্য দিয়ে নয়। স্বামীজীর নিকট তিনি এই কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলেন কেননা হিন্দুধর্ম তো কর্মবিমুখতা শেখায় না বরং কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মোন্নতির সন্ধান দেয় এবং উপযুক্ত কর্মকে সাধনার অঙ্গ বলা হয়েছে। গীতায় যেমন বলা হয়েছে: মানব স্বকর্ম দ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করে সিদ্ধিলাভ করে (১৮।৪৬)। ইশারউড গীতার আদর্শকে এইভাবে তুলে ধরেছেন: "That is an idea which is always being spread around about the Hindus that they disdain activity and withdraw from it and it is complete libel. They absolutely agree that the world's work has to be.

৬ A Search in Secret India (1947), p 101

done; only they point out that the attitude of the worker towards work is all important and that in the cultures of the West this attitude is usually distorted." (P. 17)

তিন বৎসর পর গুরুর নিকট তার ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা। এর মধ্যেই তাঁর দেহরক্ষা হয়—গুরুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সে ভারতে এল সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য। মাকে চিঠিতে জানিয়ে এল সব ছেড়ে সে ভারতে চলছে এক মহত্তর শান্তির জন্য গুরুর নির্দেশে। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের জন্য তাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে এবং যে পরম জীবনের আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাকেই সে সম্ভব করতে চায়। গঙ্গার ধারে আশ্রমবাসের আনন্দের কথা মাকে এবং প্যাট্রিককে জানাল—লিখল কি এক মহৎ অনির্বচনীয় ভাব তাকে ঘিরে রেখেছে। ভারতের দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও সে এক পরম প্রশান্তি অনুভব করছে। অলিভার তার মানসিক অবস্থা তার ডায়েরিতে চিঠি লেখার ফাঁকে ফাঁকে লিখে রাখত এবং এর থেকেই তার প্রত্যয়শীল মনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুর যদিও পার্থিব শরীর নেই—তবুও তাঁর দিব্যভাব তাকে ঘিরে রেখেছিল—তার কাছে গুরু নিত্য সত্যরূপে বর্তমান ছিলেন। গুরুর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস, নিষ্ঠা তাকে আধ্যাত্মিকতায় সচেতন রেখেছিল—দিয়েছিল এক নতুন জীবনের স্পর্শ। গুরুর মধ্য দিয়েই তো আমরা পাই দিব্য জীবনের সন্ধান ও অনুভূতি। তাঁর নির্দেশিত পথেই পাই অজানা রাজ্যের খবর—চির দিশারী তিনি জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করেন আমাদের অন্তরকে। এই অনুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন: "I have known a man who said he knew that God exists. After living with him for five years and watching him closely, watching the way he lived, I am able to say that I believe (nearly all of the time) that he really did know. I also believe in the possibility of my having the kind of experience which gave him that knowledge. I may be poisoned with hatred and half-mad but nevertheless I am his disciple. That man chose me for his disciple and he can never desert me. I have got to believe this and know that he's with me always even if I do'nt feel his presence. As long as he is with me, what can I possibly fear?" (P. 41) গুরু না হলে—তিনি পথ না দেখিয়ে দিলে আমরা আত্মানুভূতির সন্ধান পাই না। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। যখন এই শ্রদ্ধা জ্ঞানে ও আচরণে পরিস্ফুট হবে তখনই প্রত্যয়শীল মনে জাগিয়ে তুলবে এক পরম আকূতি। মানুষ যখন আর্ত হয় তখনই হয় জিজ্ঞাসু। জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে গুরু তাকে দেন রহস্যের সন্ধান—তখনই তার নির্দেশিত সাধনায় হয় অর্থার্থী অর্থাৎ কি না পরিপ্রশ্নের উত্তরে যা জানা গেছে তাকে ধরবার বোঝবার চেষ্টা করে। এইভাবে যখন সে জানতে পারে বিশ্বরহস্য, জীবনের রহস্য, তখন হয় জ্ঞানবান। ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে মোক্ষ অধিগত হয়—তখন দুটি আলাদা থাকে না। অলিভার তাঁর অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই বিচিত্র সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাই পার্থিব শরীর না থাকলেও গুরুকৃপায় দেখতে পাচ্ছেন ব্যবধানের গণ্ডি তাঁদের মধ্যে নেই। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনেই ব্যেপে রয়েছেন।

"I know the Swami was dead and I know that nevertheless he was now

with me and that he was with me always, wherever I am. While he was in the body, he was not always with me—that is obvious. If I was away at work we could only be together in our thoughts at best. But now we are never separated. I woke up actually knowing that I can't say that I still know it in that absolute sense as I write these words but I can still vividly remember how I felt at that time. My eyes keep filling with tears of joy remembering it." (পৃ:-১৩৯)। "আমি জানি স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু যেখানে গেছি তিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন সর্বদা, এখনো আছেন"—গুরুর প্রতি এই আত্মনিবেদন এবং তাঁর দিব্য সত্তার প্রতি এই ঐকান্তিক দৃঢ় বিশ্বাস অলিভারকে আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে নিয়েছে। ইশারউড অন্যত্রও গুরুবাদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন: "I only know that as far as I am concerned, the Guru-disciple relationship is at the centre of everything that religion means to me. It is the one reality of which I am never in doubt—the one guarantee that I shall ultimately surmount my own weakness and find knowledge of celestial peace and joy. If, having known this relationship I could in some terrible way be deperived of it again, then my life would become a nightmare of guilt, boredom and self-disgust. Personally I do not worry much about this, because I do not believe that the Guru can ever abandon his disciples, even if he should want to do so. I believe that their relationship survives death, accident, even betrayal. I believe, for example, that Christ cannot disown even Judas."[৭] "গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নিত্য—এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়, আমার ধর্মবোধের কেন্দ্র। এই বিশ্বাসবলেই আমি মুক্ত হয়ে যাব। এ বিশ্বাস গেলে জীবন আমার দুঃস্বপ্ন হবে;—কিন্তু তা হবার নয়, গুরু ইচ্ছে করলেও শিষ্যকে ত্যাগ করতে পারবেন না।"

এই উদ্ধৃতিগুলিতে আমরা লক্ষ্য করছি, কতখানি সংবেদনশীল মন নিয়ে ইশারউড হিন্দু দর্শনের তত্ত্বগুলি বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে গুরুকৃপার মাধ্যমে—যার স্বীকৃতির পরিচয় আমরা তাঁর লেখায় পাচ্ছি, অলিভার-এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অনুভূতির কথাই আমাদের শুনিয়েছেন। তাই প্যাট্রিকের চেষ্টা তাকে তার ধৃত আদর্শ থেকে চ্যুত করতে পারেনি। "দীক্ষা" এবং গুরুকে আমরা এত সহজ করে নিয়েছি যে, মনে করি গুরুগ্রহণ করলেই জীবনের সব হয়ে গেল। গুরু যেমন শিষ্যের সকল কিছু গ্রহণ করে নেন, তেমনি শিষ্যেরও দায়িত্ব তাঁর নির্দেশিত সাধনপথে এগিয়ে যাওয়া এবং চলার পথে দৃঢ়তা রক্ষা করা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে গুরুর প্রয়োজন—তা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই হোক বা সাধারণ জাগতিক ক্ষেত্রেই হোক। সকল ধর্মে তাই গুরুবাদ স্বীকৃত কিন্তু হিন্দু দর্শনে এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সাধনক্ষেত্রে তা অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত। অলিভারের জীবনে যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে

৭ What Vedanta Means to Me—Ed by John R. Yale (1961) p 49

এসেছে এবং যে মনোবল সে দেখিয়েছে তা সম্ভব হয়েছে গুরুর প্রতি ঐকান্তিকতার জন্য। তার ডায়েরির মধ্যে সে সুন্দরভাবে দেখিয়েছে সন্ন্যাসের আদর্শ এবং সাধারণ সংসারের সংঘাত তাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। প্যাট্রিক যখন দেখল তার ভাই তার আদর্শে অবিচল তখন অলিভারকে নিজেদের মধ্যে আনার আর চেষ্টা করেনি, তার আদর্শ বোঝবার জন্য চেষ্টা করেছে এবং অলিভারের অনুসৃত পথকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছে: "Still, I am not concerned about Olly's future. I feel sure now that nothing is going to defeat him in the long run. People with his kind of strength work on their own destinies almos tinspite of themselves, no matter what perverse disciplines and rules they insist on observing. However much Olly may try to persuade himself that he believes in humility, obedience and anonymity—he is quite incapable of remaining a holy nobody. I believe he is going to make something extraordinary out of being a Swami—something peculiarity of his own." (পৃ. ১৪৫)। এরই সঙ্গে প্যাট্রিক অলিভারের সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় আচার-অনুষ্ঠানগুলি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করেছে, লক্ষ্য করেছে কীভাবে ধীরে ধীরে তার ভাই-এর পরিবর্তন হচ্ছে। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে আত্মশ্রাদ্ধ, যা জগৎকল্যাণের জন্য নিজেকে আহুতি, তার মনে সাড়া দিয়েছে। বিশ্বকল্যাণের জন্য যারা এগিয়ে যায়—তাদের তো নবজন্ম হয় এবং তাদের তো ক্ষয় নাই, কবির ভাষায়—

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

অলিভারের সন্ন্যাসের দিনে খবর দিয়ে তাদের মাকে প্যাট্রিক লিখছে:

"He looked even taller than usual .. wonderfully handsome, with long flame-coloured robe falling to his feet. You would have been proud of him, I know and am happy to see how well he seems suited to his new robe in life, I was so proud to walk beside him and know that everybody knows he is my brother." (পৃঃ ১৫১)। "পা পর্যন্ত ঝোলানো অগ্নি-বর্ণ পোষাক-পরিহিত তাকে সাধারণ অবস্থায় যেমন দেখাতো তার চেয়েও বেশী দীর্ঘদেহ বলে মনে হচ্ছিল, অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। জীবনের নতুন বেশে কী সুন্দর মানিয়েছে তাকে —এ জেনে আমি সুখী। তার সঙ্গে বেড়াতে যেতাম—সবাই আমাকে তার ভাই বলে জানে—তাই কী গর্ব যে আমার হ'ত তখন!" মাকে প্যাট্রিক এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে বংশমধ্যে একজন সন্ন্যাস নিলে তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন উদ্ধার পায়—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—এবং এই বিশ্বাস সত্যই মহনীয়। প্যাট্রিকের চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে ইশারউড সাধারণভাবে দুটি বিষয় তুলে ধরেছেন: একটি হচ্ছে বিদেশীরা কিভাবে ভারতীয় জীবনধারা, শহর-পরিবেশকে দেখে এবং বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়; অন্য দিকে কিভাবে আবার তার আধ্যাত্মিক সম্পদ বোঝবার চেষ্টা করে। প্যাট্রিকের কতকগুলি মন্তব্য হয়ত আমাদের নিকট বিসদৃশ ঠেকতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেই সে সেগুলি বোঝবারও চেষ্টা করেছে। মঠে এসে যখন দেখল সকলেই মোহন্ত মহারাজকে প্রণাম করছে তাতে সে খানিকটা বিরক্তি বোধ করে, হীনমন্যতার লক্ষণ হিসাবে। কেননা মানুষের

পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধী। এ ধারণা শুধু তাদের নয়—আমাদের দেশে আধুনিক মনেও সংশয় এনেছে। এই প্রণামের পিছনে যে এক বিরাট তাৎপর্য আছে প্যাট্রিকের জবানীতে লেখক তা তুলে ধরেছেন : And then a memory came to me—it seemed absurdly irrelevant at first—from my time in the Army—an old sergeant patiently arguing with a prim anarchistically-minded young recruit who didn't see why one man should be made to kowtow to another, as he put it, and the sergeant told him, 'Don't be so daft, lad, it's not the man you're saluting, it's the uniform.' And then I saw, in a flash that perhaps the same principle was in operation here (পৃঃ-৭৮)। "প্রথমে খুবই বিসদৃশ ঠেকতো এটি। হঠাৎ সেনাবিভাগে আমার থাকাকালীন একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো, এবং চকিতে মনে হল, এক্ষেত্রেও তো তাই—সম্মান দেখানো হচ্ছে বেশকে—ব্যক্তিকে নয়।" সন্ন্যাসের বেশ গেরুয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য প্রণামের এই স্বীকৃতি ; যিনি তা ব্যবহার করে নিজের জীবনে সে আদর্শকে সঞ্জীবিত রেখেছেন এবং তার মর্যাদাকে আপন করে নিয়েছেন, তাঁকেই এই শ্রদ্ধানিবেদন।"

হিন্দু সন্ন্যাসীদের আর একটি দিক তার মনকে আকৃষ্ট করেছিল—তা হচ্ছে তাঁরা গৃহস্থ বা সংসারীদের প্রতি উদাসীন নন ; বরং লক্ষ্য করেছেন তাঁদের প্রতি এঁদের মমত্ববোধ এবং দরদ। তিনি লিখেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় সন্ত-সাধুদের মধ্যে গোঁড়ামি দেখা গেছে কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীরা এই গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। তাঁরা জানেন, যদি কেউ ঠিক ঠিক গার্হস্থ্য জীবন পালন করে, তবে তাও আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়ক হয় ; কিন্তু যারা বৈরাগ্যময় জীবন যাপন করতে চান তাঁদের ব্রহ্মচর্য-জীবনের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি দরকার। কাজেই উভয়ই উভয়ের পরিপূরক এবং হিন্দু দর্শনের অধিকারবাদ তাকে উদার হতে শিক্ষা দিয়েছে (দ্রঃ পৃঃ ১০৭)।

নদীর ধারে দেখা ছোট্ট বইটির মধ্যে হিন্দুর চতুরাশ্রমের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসের দর্শন, আচার এবং অনুষ্ঠানের একটি সুন্দর বিশ্লেষণ পাই। আমাদের মনে হয় এই বিশ্লেষণ অনেকাংশে সার্থক হয়েছে এবং এই সার্থকতার পিছনে রয়েছে গ্রন্থকারের স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি। সন্ন্যাসের মহনীয় জীবন এবং আদর্শ হয়ত কিছুসংখ্যক সাধারণ লোকের জন্য স্তিমিত হয়েছে কিন্তু আজও তা হিন্দুজন-জীবনের প্রেরণার উৎস। সকলের জন্য সন্ন্যাসের বিধান হয় নাই ; যারা সক্ষম, যারা এই আদর্শে বিশ্বাসী তাদের জন্য এর বিধান। বুদ্ধ বলতেন, কেবল কেশমুণ্ডন করে তো কেউ ভিক্ষু হতে পারে না, আগে ক্লেশ-এর মুণ্ডন চাই অর্থাৎ কি-না মানসিক প্রস্তুতি—'ক্লেশানাং মুণ্ডনং ন তু কেশানাং' (দ্রষ্টব্য : ধর্মপদ ১।৯-১০)। অলিভারের জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে আমরা এই আদর্শ লক্ষ্য করি। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঐশ্বর্য, ভোগলিপ্সা, নাম, যশ ছেড়ে মানুষ সুখী হতে পারে, না প্রচুর ভোগের মধ্যে, বিত্তের মধ্যে মানুষ নিজেকে সুখী করতে পারে? 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—নচিকেতার এই জিজ্ঞাসা আজও মানুষের মনকে উদ্বেলিত করে। সন্ন্যাসীর জীবনে জ্ঞান, কর্ম এবং আপন সাধনার মাধ্যমে স্বাত্মানুভূতি যেমন আকাঙ্ক্ষা, তেমনি আবার জগদ্ধিতায় তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন। সেইজন্য তাঁরা পরম প্রশান্তিতে আত্মস্থিত। কিন্তু অলিভার এই

ত্যাগনিষ্ঠ জীবনে সুখী হতে পেরেছিল, না তার নতুন কিছুর জন্য হঠাৎ এই উদ্দীপনা—এ প্রশ্নও জাগতে পারে। ঈশারউড দেখিয়েছেন যে, অলিভার মহৎ সুখের সন্ধান পেয়েছিল এবং তার জীবনে সন্ন্যাস সার্থক হয়েছিল। সমগ্র উপন্যাসের মূল সুর এই জিজ্ঞাসার মধ্যে এবং এর উত্তরও আমরা পাচ্ছি প্যাট্রিকের জবানীতে।

"Is Oliver happy ? Yes, mother." লিখেছে প্যাট্রিক, "I sincerely believe that he is. Of course it is a kind of happiness which could never be entirely understood by you or me. I know although I am sure you have not let him guess it by so much as the faintest hint that you've grieved. Olly has never found himself a partner in life and given you grandchildren. If one has once known everything that a happy marriage and a home can be, then it is hard, I admit not to feel that happiness is marriage and that those who have not experienced it are simply unlucky. But we must not let ourselves be too smug about this, must we ? All through from history one can find plenty of examples of the other way of life—I don't mean only in the sphere of religion, take Lawrence of Arabia or Van Pough for example—those people who apparently need and prefer to go it alone. I suppose Olly is like that and perhaps it's what is meant by saying that someone is in God's hands. That phrase always sounds terribly chilly and bleak to me—but it's certainly something one can respect." (পৃঃ ৪৫)। "অলিভার সুখী কি ?—হ্যাঁ, মা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে সুখী। তবে সে সুখ যে কি—তুমি বা আমি তা ঠিকমতো কখনো ধারণা করতে পারব না। আমি জানি বিয়ে না করার জন্য, তোমাকে নাতি-নাতনি উপহার না দেওয়ার জন্য দুঃখিত হয়েছ—এরকমের সামান্য আভাসও তুমি তাকে দাওনি।... বিবাহই সুখ, যারা এর আস্বাদ না পায় তারা খুবই দুর্ভাগা—একথা আমার মনে হয় না।... একক জীবন-যাপনের উদাহরণ ইতিহাসে তো প্রচুর রয়েছে—কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও। আমার মনে হয়, অলিভ তাদের দলের—ঈশ্বরার্পিত বলতে যা বোঝায়, সেই দলের।"

আমার ধারণা, অনুসন্ধিৎসু পাঠক হিন্দু সন্ন্যাস, দর্শন ও জীবনের একটি পরিচ্ছন্ন আলেখ্য এই বই-এ পাবেন।



রামমোহন ঃ দ্বিশতবার্ষিকীর আলোকে

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাংলাসাহিত্যে রামমোহনের অন্যতম প্রধান পরিচয় বেদান্তের প্রথম অনুবাদকরূপে। পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকার দ্বারা উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মবাদী ধারণার শ্লোকগুলি বিশেষভাবে বাঙালী সমাজে পরিচিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে উপনিষদের অদ্বৈতবাদী শ্লোকগুলি বর্জন করেছেন,[1] রামমোহন তা করেন নি, করা সম্ভবও ছিল না। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' বাদ দিলে তিনি পাঁচটি উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য) অনুবাদ ও কিছু পরিমাণে ভাষ্যরচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্র থেকে ইচ্ছামতো সঙ্কলন করেছেন। অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা রামমোহনের কল্পনায় ছিল না। যদিচ তিনি অদ্বৈদবাদের চেয়ে একেশ্বরবাদের প্রতি প্রবণতাই বেশী দেখিয়েছেন। ইসলাম ও খ্রীষ্টান মতবাদের একেশ্বরবাদী চেতনার সঙ্গে আমাদের ধর্মচেতনার সাদৃশ্য অনুসন্ধানেই তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী। একেশ্বরবাদী মনোভাবের ফলে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনার সম্ভাবনা—সেই দিকটিই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশী। অদ্বৈতবাদী সাধনা যে ভারতীয় দর্শনের পরমপ্রজ্ঞার উদাহরণ--এ বিষয়ে তাঁর কোনো দ্বিমত ছিল বলে মনে হয় না। শাস্ত্রালোচনায় তাঁর পদপ্রদর্শক তাঁরই ভাষায় "ভগবান শঙ্করাচার্য"।

রামমোহনের বেদান্তপ্রচারের মূলে কী মনোভাব সক্রিয় ছিল এবং সমকালীন পণ্ডিত-সমাজের দিক থেকে তিনি কোন্ কোন্ দিক থেকে বাধা পেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁরই ভাষায় কিছু উদাহরণ. পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করি—

(১)···যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে পঞ্চাশদধিক পাঁচশত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত। কিন্তু ওই সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।[2]

(২)···আর এক অধিক আশ্চর্য এই যে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর তাহার উপাসনা হইতে পারে না।[3]

(৩) ["ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না অতএব

১ মণিকা মহলানবীশ সম্পাদিত 'কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী'-গ্রন্থে কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৫

২ বেদান্তগ্রন্থ : ভূমিকা : পৃঃ ৩ : রামমোহন গ্রন্থাবলী [১] সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।

৩ বেদান্তগ্রন্থ : ভূমিকা : পৃঃ ৪

সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কিরূপে হইতে পারে"—এই সমালোচনার উত্তর]...নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্যকর্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্যসকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কিরূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই..."[৪]

(৪) [রামমোহনের একব্রহ্ম-উপাসনার আদর্শকে যাঁরা কেবল ব্যক্তিগত মত মনে করে উপেক্ষা করতেন, তাঁদের উদ্দেশে রামমোহনের বক্তব্য]

...এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন। এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদূ সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন...। আর পূর্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান্ বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্র কিরূপে করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্মস্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন...।'[৫]

১৮১৫ খৃঃ-তে প্রকাশিত রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থের এই ভাষা সমকালীন বাংলা গদ্যের মানদণ্ডে রীতিমতো উচ্চমানের। এর আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের যে সব বিচ্ছিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়, অথবা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির যে ভাষা পাওয়া যায়, তার পাশাপাশি রাখলে রামমোহনের গদ্যভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা ও বক্তব্য স্থাপনের ঋজুতা দুইই প্রশংসনীয়। কিন্তু সৃজনমূলক সাহিত্যকর্মে এ-জাতীয় গদ্যের উপযোগিতা নেই, একথা অবশ্যই মানতে হয়। রামমোহনের অন্বিষ্ট জাতীয়মানসে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ স্থাপন। সেদিক থেকে তাঁর বাংলা ও ইংরেজীতে যুগপৎ লেখনী-চালনার নৈপুণ্য পরবর্তী বাংলাসাহিত্যে ও বাঙালীর মননে ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রভাবশীল।

প্রচলিত সামাজিক আচার লঙ্ঘনের দুঃসাহস রামমোহনের জীবনে নানাক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। বেদান্তপ্রচারের ক্ষেত্রেও এ দুঃসাহস তাঁকে স্বাভাবিক বুদ্ধির শাণিত আত্মপ্রকাশে প্রদীপ্ত করে তুলেছে। সেকালে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, "বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়।" এ-জাতীয় মনোভাব একালেও একেবারে লোপ পায় নি। পুরোহিততন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি এই মনোভাব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' মন্তব্য করেছেন—"যে বলে, আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভুতপ্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য,

৪ তদেব : অনুষ্ঠান : পৃঃ ১১
৫ তদেব : অনুষ্ঠান : পৃঃ ১০
৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান ভারত : পৃঃ ২৩৩ [১ম সং.]

তাহা অন্যকে কেন দিব? আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক। গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাচক্রমধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়; সর্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ববিদ্যা নাশ · ”।*

স্বামীজী পুরোহিততন্ত্রের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা বলেছেন, তার অন্য একটি দিক রামমোহনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। মহাভারত, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র তো সকলের সামনেই পড়া হয় এবং সব শ্রেণীর লোকেরাই অল্পবিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান এইসব গ্রন্থের মাধ্যমে পেয়ে থাকেন। কিন্তু এদের মূলেও তো সেই বেদ-উপনিষদেরই জ্ঞান। সুতরাং যিনি মহাভারত শূদ্রের সামনে পড়েন, তিনি কেমন করে বেদান্ত পড়তে অস্বীকার করবেন? মহাভারতকে বলা হয় পঞ্চম বেদ। আধ্যাত্মিক কারণেই তা বলা হয়। গীতা তো সব উপনিষদের সারাংশ। পণ্ডিতেরা যাই বলুন, সাধারণ মানুষ বেদ-বেদান্তের কথা নানাভাবে আগে থেকেই জেনে আসছে। তাতে যখন কোনো পাপ হয় নি, তখন মূল বেদান্ত পড়লেও হবে না।

এইভাবে বেদান্তের গুহানিহিত জ্ঞানকে সর্বজনের প্রাঙ্গণে উন্মোচিত করার সাধুবাদ রামমোহনের প্রাপ্য হলেও বেদান্তদর্শনের দুরূহতার জন্য অতি অল্প লোকেই এর প্রতি সেকালে আকৃষ্ট হয়েছেন। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে রামমোহনের অবিরাম প্রচারও অনেকটাই শক্তির অপব্যয়। কারণ, বেদান্তের বহুবিধ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দার্শনিক পরিণামের মধ্যে বিচারশীল ব্যক্তি কোন্‌টিকে গ্রহণ করবেন তা যেমন নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তেমনি মূর্তিপূজা বর্জন করলেই যে সমুচ্চ আধ্যাত্মিকতায় সকলের সমান অধিকার হবে—একথাও স্বীকার করা যায় না। অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে সব সাধক ও মহাপুরুষ ঈশ্বরের রূপময় প্রকাশ অবলম্বনেই মহত্তম মনুষ্যত্বের ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তাঁদের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা নিছক বুদ্ধিবাদপ্রসূত বিচার-বিতর্কের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের সামগ্রী! ভারতীয় ধর্মচেতনার সামগ্রিক স্বরূপটি উপলব্ধির চেষ্টা না করে বিতর্কের সূচনা করতে গিয়ে পরবর্তী-কালে ব্রাহ্মসমাজ যে এক গণ্ডীবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছেন, রামমোহনের চিন্তাধারাতেই তার সূচনা।

ঈশোপনিষদের 'অনুষ্ঠান'-অংশে' রামমোহন সেইসব ব্যক্তির মিথ্যা রচনার প্রতিবাদ করেছেন, যাঁরা বেদান্তগ্রন্থের মতকে রামমোহনের নিজস্ব মত বলে চালাতে চেয়েছিলেন। লিখেছেন, তাহলে তো কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাসকেই রামায়ণ-মহাভারতের মূল লেখক বলতে হয়! বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করার অপরাধেই যে রামমোহনের বিরুদ্ধে এসব রটনা—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রামমোহনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তির উল্লেখও ওইসঙ্গেই লক্ষণীয়। এক হিসাবে আজকের দিনে

রামমোহন গ্রন্থাবলী : ১ : অনুষ্ঠান : পৃঃ ২০৪ [সা. প. সং]
রামমোহন গ্রন্থাবলী : ১ : তলবকার (কেন) উপনিষৎ : পৃ ১৯০

সেইটিই আমাদের বেশী ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে।

উপনিষদ-পঞ্চকের মধ্যে রামমোহন সর্বপ্রথম অনুবাদ করেছিলেন তলবকার বা কেন-উপনিষৎ। এই উপনিষদেই "উমা হৈমবতী"র আখ্যানটি রয়েছে। রামমোহনের ভাষায়—"ব্রহ্ম সকলের কর্তা এবং দুর্জ্ঞেয় হয়েন ইহা দেখাইবার নিমিত্তে··এক আখ্যায়িকা অর্থাৎ এক বৃত্তান্ত কহিতেছেন।"[৮] মূল উপনিষদের ভাষা ও রামমোহনের অনুবাদের একটু অংশ—"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি" ব্রহ্ম দেবতাদের নিমিত্তে নিশ্চয় জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাসুরসংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগ্যে জয় দেয়াইলেন সেই ব্রহ্মের জয়েতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকল আপন আপন মহিমাকে প্রাপ্ত হইলেন আর তাঁহারা মনে করিলেন যে আমাদিগ্যেরী এ জয় আর আমাদিগ্যেরী এ মহিমা অর্থাৎ এ জয়ের সাক্ষাৎ কর্তা আর এ মহিমার সাক্ষাৎ কর্তা আমরাই হই। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব তন্ন ব্যাজানত কিমিদং যক্ষমিতি॥ সেই অন্তর্যামী ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যাভিমান জানিলেন পাছে দেবতাসকল এই মিথ্যাভিমানের দ্বারা অসুরের ন্যায় নষ্ট হয়েন এই হেতু তাঁহাদিগ্যে জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিস্ময়ের হেতু মায়ানির্মিত অদ্ভুতরূপে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাদিগ্যের চক্ষুর গোচর হইলেন।"[৯] ব্রহ্মশক্তির এই আবির্ভাবই 'উমা হৈমবতী'রূপে কেন উপনিষদে উল্লেখিত। পরবর্তীকালে ভারতীয় শক্তিবাদের মূলে এ কাহিনীর প্রেরণা অনেকখানি।

কিন্তু রামমোহনের অনুবাদ পড়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, "যদি ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন, আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহো একপ্রকার সাকার হইলেন।"[১০] এ-জাতীয় যুক্তি উত্থাপনে রামমোহন স্বভাবতঃই বিরক্ত হয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে এ কেবল আখ্যায়িকা, "এরূপ আদেশ মায়িক"[১১] "ইহা না হইলে উপনিষদের পূর্বাপরের একবাক্যতা থাকে না।"[১২]

কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় যুক্তিটি একটু বিচিত্র। "দ্বিতীয় এই যে ব্রহ্মমায়া কল্পনায় আব্রহ্মস্তম্ব-পর্যন্ত নামরূপেতে দেখাইতেছেন তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় মায়া কল্পনা করিয়া দেখান কোন আশ্চর্য আর যেহোঁ যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দ সকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাণিসমূহকে বোধ করাইতেছেন তাঁহার কি আশ্চর্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান।"[১৩] ব্রহ্মের রূপময় প্রকাশকে এভাবে স্বীকৃতি দেওয়া রামমোহনের মতো নিরাকারবাদীর ক্ষেত্রে একটু আশ্চর্য ঠেকলেও পরবর্তীকালে সমগ্র ব্রাহ্ম-আন্দোলনকেই সাকার-নিরাকার তত্ত্বের অহেতুক সংঘাত এই জাতীয় স্ববিরোধিতার ফলেই দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। রামমোহনের বেদান্তচর্চা বুদ্ধিগত। শাস্ত্র-বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি কিছু পরিমাণে পথপ্রদর্শক

৯ রামমোহন গ্রন্থাবলী : ১ : তলবকার (কেন) উপনিষৎ : পৃ :১৯০

১০, ১১, ১২, ১৩ তদেব : ঈশোপনিষৎ : অনুষ্ঠান : পৃঃ ২০৪—২০৫

১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : ১ম ভাগ : পৃঃ ২০ : ১৩৭৭ সং

হইলেও প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই সব অধ্যাত্মশাস্ত্রের লক্ষ্য। সেদিক থেকে আধুনিক ভারতবর্ষে সাকার ও নিরাকার এ দুই সাধনমার্গেই যিনি পরম উপলব্ধির অধিকারী, সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃত' থেকে এ দুই আপাত-বিপরীত ধারণার সমন্বয় কীভাবে সাধিত হয়েছে, তা আমরা রামমোহনের রচনাবলীর পাশাপাশি মনে রাখতে পারি।

'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত [শ্রী'ম'] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় যে নিরভিমানতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভৎ'সনায় তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন তা নিজের সম্বন্ধে কতটা মোহমুক্ত হ'লে মানুষের পক্ষে সম্ভব, সেকথা পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ জীবনী বা আত্মজীবনীগ্রন্থের কথা মনে করলেই বুঝতে পারা যায়। অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় কারণগুলি ব্যক্তিগত। তৃতীয় কারণটির সঙ্গে সমকালীন ব্রাহ্ম চিন্তাধারার যোগ রয়েছে মহেন্দ্রনাথ তখন নববিধানে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাদি শুনে মুগ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে ?...

মাষ্টার—আজ্ঞা নিরাকারে; আমার এইটি ভাল লাগে

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালোই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে,—এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।...

মাষ্টার—আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল! কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি ত ন'ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝিতে পারিলেন না! বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করো ; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন। তিনি এই জগৎ ক'রেছেন, চন্দ্র, সূর্য, ঋতু, মানুষ, জীবজন্তু করেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে, কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। ওর জন্য তোমার মাথাব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয় তার চেষ্টা কর।"[১৪]

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

"A society which puts a halo of sanctity round its tradition gains an inestimable advantage of power and permanence."—

Radhakrishnan : Hindu View of Life

যাজ্ঞবল্ক্য :

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন : আত্মবিলুপ্তিই ছিল উপনিষদের ঋষিদের সাধারণ ধর্ম, সত্যপ্রচারই ছিল তাঁদের আদর্শ। ফলে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মপ্রচার-বিমুখ। এইকারণে আমরা এইসব চিরস্মরণীয় চিন্তাবিদ্‌দের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারি না, এমনকি তাঁরা স্বনামে আত্মপ্রচার করেছেন কিনা তাও জানবার উপায় নাই।[১]

শুধু উপনিষদের ঋষিদের সম্বন্ধেই নয়, ধর্মশাস্ত্রকার, স্মৃতিকার সকলের সম্বন্ধেই রাধাকৃষ্ণণের উদ্ধৃত অভিমতটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি না যে, স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য কে ছিলেন, বা ঠিক কোন্ সময়ের লোক। তবে অধিকাংশ গবেষকই মনে করেন যে শুক্ল যজুর্বেদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের সহিত জড়িত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এবং স্মৃতিকার যজ্ঞবল্ক্য একই ব্যক্তি নন।[২]

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের পরিচয়ে এই শেষোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নন।

স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্যকে বিখ্যাত করে তোলেন বিজ্ঞানেশ্বর। বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন।[৩]

তাঁর 'মিতাক্ষরা' নামে সংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যেরই সূত্রের টীকা ও সঙ্কলন মাত্র। 'মিতাক্ষরা' অনুসারে বিজ্ঞানেশ্বর ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য। এখন 'শিষ্য' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলা কঠিন। যদি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে যাজ্ঞবল্ক্য মধ্যযুগের চিন্তাবিদ্ হতে বাধ্য, আর যদি ভাবশিষ্যের অর্থে হয় তবে যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদব্যাসের পূর্বসূরী বললেও আপত্তি করার কিছু নেই। এও হতে পারে যে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নামের সঙ্গে জড়িত বিধি-সম্পর্কিত অনেকগুলি সূত্র উপনিষদের সময় থেকেই চলে আসছিল। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ কিছু কিছু সূত্র যোগ করেন, এবং বিজ্ঞানেশ্বর সংলাপের আকারে সামগ্রিকভাবে সূত্রগুলির সঙ্কলন ও টীকা রচনা করে পরিবেশন করেন। বিজ্ঞানেশ্বরের হাতে সংহিতার রূপ ধারণ করার আগে যাজ্ঞবল্ক্য-সূত্রগুলিকে ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ বলে গণ্য করা হতো।

যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি :—মনুর সঙ্গে পার্থক্য :

যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি মনুর চেয়ে আকারে অনেক ক্ষুদ্র এবং অনেক বেশী সুসংবদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে মনুর সাতাশশো শ্লোক মাত্র একহাজারের সামান্য কিছু বেশী শ্লোকে আবদ্ধ

১ History of Indian Philosophy

২ Radhakumud Mukherjee : Hindu Civilisation

৩ Basham : The Wonder That Was India

হয়েছে। এর মধ্যে আবার নূতন নূতন বিষয়ও আছে—যেমন, বিনায়ক-পূজা, গ্রহস্বস্ত্যয়ন, পাঁচপ্রকারের শুচিতাপরীক্ষার বিশদ বিবরণ, জীবদেহের গঠন ও চিকিৎসা-বিদ্যা সম্পর্কিত ব্যাপার ইত্যাদি। এগুলি অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়।

তবে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত এমন কয়েকটি বিষয় আছে যাদের ক্ষেত্রে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে সম্পূর্ণ মতানৈক্য দেখা যায়—যেমন, ভিন্নবর্ণে বিবাহ, নিয়োগ-প্রথা, উত্তরাধিকার, দ্যূতক্রীড়া, বিচারালয়ে প্রমাণ-ব্যবস্থা, দণ্ডদানবিধি, মালিকানা-তত্ত্ব ও স্বত্ব-ভোগ ইত্যাদি।

মনু ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন। (৩।১৩), যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু এরূপ বিবাহকে সম্পূর্ণ নিন্দনীয় বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন (১।৫৬)। অপরদিকে আবার মনু নিয়োগ-প্রথাকে নিন্দা করলেও (৯।৫৯ - ৫৯-৬৮) যাজ্ঞবল্ক্য করেননি (১।৬৮,৬৯)।

সম্পত্তিতে বিধবার উত্তরাধিকার সম্পর্কে মনু কোন মত প্রকাশ না করলেও যাজ্ঞবল্ক্য বিধবাকেই উত্তরাধিকার তালিকায় শীর্ষস্থান দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারী ও উত্তরাধি-কারিণীদেরও নিয়মিত পর্যায়ভুক্ত করেছেন (২।১৩৫)।

দ্যূতক্রীড়াকে মনু মোটেই সমর্থন করেননি (৯।২২৪-২৬), যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু দ্যূতক্রীড়াকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করে এর থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন (২।২-৩)।

শুদ্ধিবিচার (ordeal), প্রমাণপত্রের স্বাক্ষর, বিচারালয়ে দণ্ডদানবিধি, মালিকানা ও স্বত্ব-ভাগ ইত্যাদি ব্যাপারেও মনুর চেয়েও যাজ্ঞবল্ক্য অনেক সুসংবদ্ধ ও আধুনিকদৃষ্টি-সম্পন্ন। এই কারণে মনে হয় যে, স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য মনুর চেয়ে অনেক আধুনিক যুগের লোক।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, মনুর মতো যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন সমাজবিধি-প্রণেতা, এবং অনেকের মতে তিনি মিথিলা বা বৈদিকযুগের বিদেহরাজ্যের জন্য এইসব বিধি রচনা করেছিলেন। এখানে আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের অঙ্গীভূত হলেও যাজ্ঞ-বল্ক্যের ন্যায় অনেক ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের সীমারেখা অতি অস্পষ্ট।

সমাজব্যবস্থা ঃ [যাজ্ঞবল্ক্য-বর্ণিত সমাজ-ব্যবস্থা পিরামিডাকার এবং বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত প্রত্যেক স্তরের শাসনভার সম্প্রদায়ের (community) হস্তে ন্যস্ত। প্রথম স্তর বা ভিত্তিস্থলে আছে গ্রামীণ সম্প্রদায়, যাকে যাজ্ঞবল্ক্য 'সমূহ' ক্রমে অভিহিত করেছেন। 'সমূহের' কার্য-নির্বাহকদের বলা হয়েছে 'কার্যচিন্তক'। 'কার্য-চিন্তক' নিযুক্ত করতে হবে বিধিশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ, কলুষহীন এবং নির্লোভ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। কোন 'কার্যচিন্তক' যদি সমূহের অর্থ আত্মসাৎ করে তবে যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে তার এগারো গুণ অর্থদণ্ডের নির্দেশ যাজ্ঞবল্ক্য দিয়েছেন (২।১৯০)।

যাজ্ঞবল্ক্য 'সমূহকে' 'গণ' বা সাধারণতন্ত্র বলেও অভিহিত করেছেন। মনে হয় সমূহ বা গণের মধ্যে পার্থক্য হলো স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণভেদ নিয়ে—অর্থাৎ অধিকতর স্বায়ত্তশাসিত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি গণ আখ্যা পেয়েছে। গণের গঠনতন্ত্রকে বলা হয়েছে 'সম্বিৎ'। সম্বিৎ লঙ্ঘনের শাস্তি হলো নির্বাসন।

রাষ্ট্রদর্শন :

এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের সমাজবিধি এসে পড়েছে রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে, কারণ নির্বাসন হলো আইনানুমোদিত শাস্তির ব্যবস্থা, এবং আইনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নির্দেশ করে। তবে 'গণের' যখন নির্বাসনদণ্ডের ক্ষমতা রয়েছে তখন 'গণ' যে বিশেষ মাত্রায় স্বায়ত্ত-শাসিত তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করলে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সংস্থাগুলি হলো কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ, এবং জনপদ (প্রদেশ)। এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও বিধি-ব্যবস্থা আছে, যাদের রাজা মেনে নিতে বাধ্য (১।৩৬৮)

কুল ও শ্রেণী আবার বিচারালয়ও বটে, এদের মধ্যে ঊর্ধ্বতম শ্রেণীকে ইউরোপের মধ্যযুগের ট্রেডগিল্ডের (trade guilds) সহিত তুলনা করা যায়। একই বৃত্তিভুক্ত সকল লোককে নিয়ে শ্রেণী গঠিত। আবার বিভিন্ন বৃত্তিভুক্ত সকল শ্রেণীর সমবায়ে সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থাও যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে আছে (২।৩)।

রাজধর্ম :

এই স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় রাজধর্মের প্রকৃতি ঠিক কি? এক কথায় বলা যায় রাজধর্ম হলো ধর্মানুমোদিত দণ্ডব্যবস্থা ছাড়া কুল, জাতি, শ্রেণী, জনপদ প্রভৃতি সকল স্বায়ত্তশাসন-মূলক সংস্থাকেই নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে নিয়মানুবর্তী করে রাখা (১।১৬৮)। এই দিক দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য অনেকাংশে পাশ্চাত্য বহুত্ববাদীদের (Pluralists) সঙ্গে তুলনীয়। অপরদিকে কিন্তু বহুত্ববাদীরা সমাজব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পারেননি, যাজ্ঞবল্ক্য পেরেছেন। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের বহুত্ববাদ হলো শুদ্ধীকৃত বহুত্ববাদ (Sublimated Pluralism)। পরম্পরাগত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা পরিবর্ত হিসাবে এই শুদ্ধীকৃত বহুত্ববাদীয় রাষ্ট্রদর্শনে স্থায়িভাবে স্থান করে নিতে পারে, একথা পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-দার্শনিকগণ স্বীকার না করে পারেননি।[৪]

আঙ্গিক মতবাদ : মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিভুক্ত সাধারণ বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো আঙ্গিক মতবাদ (Organismic theory) রাজ্যের সাতটি অঙ্গ : রাজা, অমাত্য, জনপদ (ভূখণ্ড ও জনসমষ্টির সমন্বয়), রাজস্ব (কোষ), দণ্ড বা বিচারব্যবস্থা, সুহৃৎ ও সামরিক শক্তি (দুর্গ)। এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের তত্ত্ব মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়া অন্যান্য মনীষীর রচনাতেও পাওয়া যায়। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় চিন্তাবিদের পার্থক্য হলো যে যাজ্ঞবল্ক্য সাতটি অঙ্গের কোনটিকে প্রধান বলে নির্দেশ করেননি, অথবা এদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেননি। করলে হয়ত তাঁর পিরামিডাকার স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হতো। রাজাকে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর কর্তব্যকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যাজ্ঞবল্ক্য স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুলতে চেয়েছেন বলেই মনে হয়

দণ্ডনীতি :

যথাযথ দণ্ডনীতি পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের সংহতিরক্ষাই রাজধর্ম। যথাযথ দণ্ডনীতি পরিচালনা বা ন্যায়দণ্ডের (Justice) জন্য রাজা অমাত্যগণের (সভ্যগণের) সাহায্য নেবেন, কিন্তু বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করবেন স্বয়ং (১।৩৫৯-৬০)। আবার বলা হয়েছে, রাজা ব্রাহ্মণদের সহযোগে ধর্মশাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ

৪ Laski : Grammar of Politics, Crisis in the Theory of the State

পক্ষপাতশূন্য হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

দণ্ডনীতি-পরিচালনায় যাজ্ঞবল্ক্যের এই নির্দেশের মধ্যে আধুনিক জুরি-ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না কি ?

ন্যায়দণ্ড-পরিচালনায় কোন্ কোন্ বিবাদের পুনর্বিচার করা কর্তব্য যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। বলপ্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শনের দ্বারা কোন বিপদের নিষ্পত্তি করা থাকলে অথবা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর চোখের বাইরে কোন ঘটনা ঘটে থাকলে রাজা তার পুনর্বিচারের ব্যবস্থা করবেন (২।৩২)। সহজেই বোঝা যায় যে নৃপতি-পরিচালিত বিচার-ব্যবস্থা গুরুতর অপরাধ অথবা আপিল বিচারের জন্য। এই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুবার আগেই অনেক বিবাদের নিষ্পত্তি 'কুল' 'শ্রেণী' 'গণ' ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে যায়।

পিতৃবৎপালন তত্ত্ব :

যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে মনুর ন্যায় প্রজাদের প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজীতে বলে, বাকিংহাম প্রাসাদ (বা রাণী) আছেন জেনে প্রজারা সুখে নিদ্রা যায়। সদৃশ উক্তি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও পাওয়া যায়—সেখানে বলা হয়েছে প্রজাদের অভয়দান রাজার অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য।

উপসংহার :

শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভূয়োদর্শনজাত কিছু কিছু নির্দেশ যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে আছে। তবুও বলা যায় এই স্মৃতি বহলাংশে আদর্শবাদেরই দ্যোতক। আজকাল অনেক লিখিত সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principle of State Policy) সন্নিবিষ্ট হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের নিজেদের এবং আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের উল্লেখ করা যায়, কারণ লর্ড এ্যাকটনের (Lord Acton) অনুকরণে বলা যায় যে, ক্ষমতা পদাধিকারীকে আদর্শভ্রষ্ট করে এবং পূর্ণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ আদর্শভ্রষ্ট করে ("Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.")[৫] এই সত্য ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ বহু যুগ পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন, এবং বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন মিথিলার (বিদেহ) জন্য সমাজসংহিতা-প্রণেতা যাজ্ঞবল্ক্য।

(ক্রমশঃ)

৫ Letter in Life of Mandell Creighton

কর জাগ্রত

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

প্রভু, কর জাগ্রত পূর্ণ চেতনা
যা আছে আমাতে রুদ্ধ,
হে পরশমণি, পরশে তোমার
কর এ চিত্তে শুদ্ধ !
উন্মোচি মায়া-মোহ-নির্মোক
আলোকোচ্ছ্বাসে ভরো মনোলোক,

তোমারি দীপ্ত আলোকে করহে
সব আবরণ লুপ্ত !
তুমিই শুদ্ধচেতনাস্বরূপ
আমার 'আমি'-তে দীপ্ত,
কর জাগ্রত সে মহাসত্যে,
রেখো না চিত্তে লিপ্ত !

[৩৪৪ পৃষ্ঠার পর]

'দর্শনসমানাকারং স্মৃতিসন্তানম্' (গীতা ১৮।৬৫ রামানুজভাষ্য)—এই স্মৃতিপ্রবাহ তো দর্শনেরই সমান। ধ্যানাসনে বসেই যে তা হবে, অন্য সময়ে হবে না, এ রকম তো নয়। 'তদ্-বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা' (নারদ-ভক্তিসূত্র, সংখ্যা ১৯)। যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ভগবদ্‌বিস্মৃতি ঘটলে, ভক্ত পরমব্যাকুল হয়ে পড়েন। 'চোখ বুঁজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই তিনি নেই?' (কথামৃত, ৩।১৬।১)—এই হচ্ছে ভক্তের প্রাণের কথা—তাঁর চরম আদর্শ। নারদভক্তিসূত্রে আছে—কর্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষাও ভক্তি শ্রেষ্ঠ—'সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা' (সূত্র ২৫)। ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলছেন—'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব, ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা' (১১।১৪।২০)—অর্থাৎ হে উদ্ধব, পতঞ্জলির যোগ, কপিলের সাংখ্য, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ আদি ধর্ম আমাকে সে রকম বশীভূত করতে পারে না, প্রগাঢ় ভক্তি যেমন করে।

ভক্ত চান তাঁর ইষ্টকে দর্শন করতে, ইষ্টের সঙ্গে কথা বলতে। সে দর্শন, সে সম্ভাষণ যে আসনে বসে ধ্যান ক'রে করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। স্বামী তুরীয়ানন্দজী লিখছেন: "যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিয়াও সমাধি হয়, পাতঞ্জল যোগসূত্রের 'সমাধিরীশ্বর-প্রণিধানাৎ' সূত্রেই ইহা ব্যক্ত আছে। অপি চ 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা' এই সূত্রেও ইহা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার ব্যাসদেব এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জিতঃ ঈশ্বরঃ তম্ অনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যানমাত্রেণ। তদ্-অভিধ্যানমাত্রাদপি যোগিনঃ আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলং চ ভবতি ইতি।' অতএব যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিলেও সমাধি হইতে পারে, এ বিষয়ে ইহাই বিশিষ্ট প্রমাণ। এ সম্বন্ধে ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত কাচিৎ গোপীর গুণময় দেহত্যাগে ভগবদ্‌গতিলাভও স্মরণ করিবার বিষয়।

'কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহম্ ঐক্যং
সৌহৃদমেব বা।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥'

তন্ময়ত্বলাভ এবং সমাধিতে কি কিছু ইতর-বিশেষ আছে? তাৎপর্য এই—ভাব ও উপায়ের ভিন্নতা, নচেৎ বস্তুলাভ ও তাহার ফল একই।" (স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১৩২)

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে উদ্ধব মথুরা থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে বিরহকাতরা গোপীদের ধ্যান করতে উপদেশ দেওয়ায়, গোপীরা উত্তর দিয়েছিলেন—'উদ্ধব! তুমি কৃষ্ণসখা, পরম জ্ঞানী, আমাদের ধ্যান করতে বলছো, কিন্তু যে মন দিয়ে আমরা ধ্যান করবো তা কি আর আমাদের আছে? সে মন যে অনেকদিন হ'ল কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে।' উদ্ধব গোপীদের কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন। বুঝলেন, গোপীরা ধ্যানের চেয়েও বড় জিনিস পেয়েছেন—তার নাম প্রেম। তিনি গোপীদের গুরু ব'লে প্রণাম করে চলে এলেন।

(লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, ১১শ সং পৃঃ ২২৪-২২৫)

গোপীরা প্রেম লাভ করেছিলেন ব'লে তাঁরা ধ্যানবিধির পারে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ করতে হলেও ধ্যানের মাধ্যমেই তা লভ্য—এই হ'ল সাধারণ নিয়ম। ভাগবতেও আছে, শুকদেব বলছেন:

যাবন্ন যায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ (২।২।১৪)

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বসাক্ষী, পরাবর বিশ্বেশ্বরে রাগানুগা ভক্তি হচ্ছে, ততক্ষণ দিনের কর্মশেষে তাঁর স্থূলরূপ নিত্য তৎপর হয়ে ধ্যান করবে। টীকাতে শ্রীধরস্বামী 'ভক্তিযোগঃ' ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'ভক্তিযোগঃ প্রেম-লক্ষণঃ।'

জ্ঞানীরাও যে ধ্যানবিধির পারে, আচার্য শঙ্কর তাঁর রচনায় বারংবার সে কথার উল্লেখ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, সুনিপুণ অধিকারী গুরুমুখ থেকে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য শ্রবণ করা মাত্রই জ্ঞান লাভ করতে পারেন; সে ক্ষেত্রে তাঁকে "ধ্যান করো" এই উপদেশ দেওয়াও যা, আর কন্যার বিবাহ দিয়ে বরকে হত্যা করাও তা—'ন হি বরঘাতায় কন্যাম্ উদ্বাহয়ন্তি' (ব্রঃ সূঃ ৪।১।২ ভাষ্য)। তবুও শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বহু স্থলেই ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন; এমন কি যেখানে মূলে আপাতদৃষ্টিতে ধ্যানের কোন কথাই নেই, সেখানেও বহু আড়ম্বরের সঙ্গে ধ্যানের কথা টেনে এনেছেন। যেমন, কেনোপনিষদে আচার্য শিষ্যকে বলছেন—যদি মনে ক'রে থাকো যে, ব্রহ্মকে ভালভাবে জেনেছ, তাহলে অল্পই জেনেছ; ব্রহ্ম-মীমাংসা করণীয় ইত্যাদি। তদুত্তরে শিষ্য বলছেন—আমি মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে ভালভাবে জেনেছি, ইত্যাদি (২।১-২)। শঙ্করের মতে শিষ্যের এই কথায় যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তা ধ্যানের ফলেই সম্ভব—'শিষ্যঃ একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্… স্বানুভবং কৃত্বা…উবাচ—নাহং মন্যে সুবেদেতি'। মূলে কিন্তু 'একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ স্বানুভবং কৃত্বা'—এসব কিছুই নেই। এ যেন, ঠাকুর-মা বলছেন—'সন্ধ্যা হয়েছে', আর নাতনী উত্তরে বলছে—'দিচ্ছি'। নাতনীর কথাটি ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয় ঠাকুর-মার কথার ব্যঞ্জনা হচ্ছে—'তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়ার সময় হয়েছে।' এখানেও শিষ্যের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করকে আচার্যের ব্রহ্ম-মীমাংসা করণীয় ইত্যাদি কথার ব্যঞ্জনাটি পরিস্ফুট করতে হয়েছে। এই রকম গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের 'জ্ঞানযোগ' কথাটি শঙ্কর 'জ্ঞান' ও 'যোগ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং যোগের পরিষ্কার অর্থ করেছেন 'ধ্যান'। শাঙ্কর ভাষ্য থেকে এই ধরনের আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই দু'টিই এখানে যথেষ্ট মনে করি।

ঋষি শ্বেতাশ্বতর বলেছেন- ব্রহ্মবিচার-পরায়ণ ঋষিরা বিশ্বের মূলকারণ নিয়ে অনেক ভেবেও কিছু ঠিক করতে না পেরে ধ্যান-যোগের শরণ নিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, পরমদেবতার আত্মভূতা শক্তিই এই জগতের মূল কারণ -'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' ইত্যাদি (১।৩)।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে ধ্যানের মহিমা কীর্তিত হয়েছে—ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করতে বলা হয়েছে।

এইভাবে দেখা যায় ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত। বস্তুত ধ্যান সম্পর্কে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে আসনে বসে যথারীতি ধ্যানাভ্যাস সকল সম্প্রদায়েই পরিলক্ষিত হয়। ধ্যানকে বাদ দিয়ে কর্ম হোক একেবারে পূর্ণ জ্ঞান বা পরাভক্তি কোনটাই হয় না। নিষ্কাম

কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলেও চিত্তবিক্ষেপ যায় না। চিত্তবিক্ষেপ দূর করার জন্য ধ্যানাভ্যাস করতেই হয়। তাই ধ্যানাভ্যাস সম্বন্ধে আমরা এখানে বিশদ আলোচনা করব। রাজযোগী বা জ্ঞানযোগী হবার যোগ্য সাধক খুব কমই দেখা যায়। ভক্তিযোগই অধিকাংশ মানুষের পক্ষে উপযোগী। তাই মুখ্যতঃ সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি, যদিও এই আলোচনার অনেকাংশই সকল সম্প্রদায়ের সাধকের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য।

সর্বশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ধ্যান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সকল কথাই বলা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান সূত্রাকারে ধ্যানের কথা বলেছেন এবং সম্পূর্ণ ষষ্ঠাধ্যায়, যার নাম ধ্যানযোগাধ্যায়, তাতে ঐ সূত্রেরই বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন—"ধ্যানযোগং সম্যগ্‌দর্শনস্য অন্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামি ইতি, তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকান্ উপদিশতি স্ম" (৫।২৭, ভূমিকাভাষ্য); "ধ্যানযোগস্য সম্যগ্‌দর্শনং প্রতি অন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ 'স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ' ইত্যাদয়ঃ উপদিষ্টাঃ, তেষাম্ বৃত্তিস্থানীয়ঃ অয়ং ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ আরভ্যতে" (৬।১, ভূমিকাভাষ্য) গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের সারসংক্ষেপ :—

> কর্মযোগ সাধককে ধ্যানযোগের অধিকারী করে সত্য, কিন্তু ধ্যানে আরূঢ় হতে হলে ক্রমশঃ কর্মকে কমাতেই হবে ; পুরুষকার চাই ; একান্তে পবিত্র স্থানে কুশাসনের ওপর মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্ত্র বিছিয়ে আসন করবে, আসনটি যেন খুব উঁচুতে বা খুব নীচুতে না হয়। শরীর মস্তক ও গ্রীবা সিধে রাখবে—বাইরের কিছু দেখবে না—একাকী ধ্যান করবে। শরীরধারণের অতিরিক্ত কারুর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে না ; ব্রহ্মচারী ও ঈশ্বরপরায়ণ হবে ; আহারে, বিহারে ও নিদ্রায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করবে। ধৈর্য সহকারে ধীরে ধীরে মনকে আত্মসংস্থ করবে। মন শব্দাদি বিষয়ে গেলে প্রত্যাহারের দ্বারা আত্মাতেই স্থির রাখবে। চঞ্চল মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই ক্রমে ধ্যানস্থ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—যার যে ইষ্ট, তার সে আত্মা। সুতরাং ভক্তিযোগী গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের আত্মধ্যানকে তাঁর ইষ্টেরই ধ্যান ব'লে বুঝে নেবেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও 'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো' ইত্যাদি ৫১,৫২ ও ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে ষষ্ঠাধ্যায়েরই সার-নিষ্কর্ষ উল্লিখিত হয়েছে। ৫২ সংখ্যক শ্লোকের 'ধ্যানযোগপরো নিত্যম্' অংশটির ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলেছেন : 'নিত্যগ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্তব্যাভাবপ্রদর্শনার্থম্', অর্থাৎ 'নিত্যম্' শব্দটি প্রয়োগ ক'রে ভগবান দেখাচ্ছেন, যে ধ্যানীর পক্ষে ধ্যান ছাড়া মন্ত্রজপ, মন্দিরে প্রদক্ষিণ ইত্যাদি অন্য কোনও কর্তব্য নেই। ধ্যানসিদ্ধির জন্য কাজ যে কতদূর কমানো যেতে পারে তা শঙ্কর পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। ধ্যানের আসল রহস্য প্রথম অনুচ্ছেদেই স্বামীজীর উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে—'ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হই।' পরিবেশ তো ভুলতে হবেই—নিজের দেহকে পর্যন্ত। সুতরাং মন্দিরাদিতে প্রদক্ষিণ তো ধ্যানারূঢ় হ'তে বাধা সৃষ্টি করবেই।

ধ্যান করতে হয় আসনে বসে। ব্রহ্মসূত্রের আসীনাধিকরণে ৪টি সূত্রে (৪।১।৭-১০) এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করা হয়েছে। শুয়ে, দাঁড়িয়েও সমাধি পর্যন্ত হতে পারে, 'স্বামী

সারদানন্দজীর পত্রমালা'য় আমরা পাই (পৃ: ১০১)। তোতাপুরী শুয়ে শুয়েও ধ্যান করতেন। কিন্তু সকলের জন্য এ নিয়ম নয়—প্রবর্তকের জন্য তো নয়ই। শঙ্কর বলছেন—শুয়ে ধ্যান করলে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা, দাঁড়িয়ে করলে শরীরকে দণ্ডায়মান রাখার প্রযত্নের ফলে মন 'সূক্ষ্মবস্তুনিরীক্ষণক্ষম' হয় না (ব্র. সূ ৪।১।৭ ভাষ্য)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও (২।৮) বলা হয়েছে—বিদ্বান্ ব্যক্তি মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড উন্নত ও সরল রেখে, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়ে নিরুদ্ধ ক'রে ব্রহ্মরূপ ভেলার সাহায্যে সংসারের ভয়াবহ স্রোতসমূহ পার হবেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে ধ্যানের প্রকার ও প্রণালী সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত) :

'প্রথম অবস্থায় একটু নির্জনে বসে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। তারপর যখন ঠিক অভ্যাস হয় তখন যেখানে সেখানে ধ্যান করতে পার। যেমন গাছ যখন ছোট থাকে তখন তাকে যত্ন ক'রে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, তা' না হলে গরু-ছাগলে খেয়ে নষ্ট ক'রে ফেলে। পরে যখন গুঁড়ি মোটা হয় তাতে দশটা গরু ছাগল বাঁধলেও কিছুই করতে পারে না।' (২২ শ সং, পৃ: ৯৪)

'ধ্যান করবে মনে, বনে আর কোণে।' (পৃ: ৯৩)

'সত্ত্বগুণীর ধ্যান কিরূপ জান? তারা রাত্রে মশারি খাটিয়ে তার ভেতর বসে ধ্যান করে। লোকে মনে করে, সে ঘুমুচ্ছে। তাদের বাহ্যিক লোক-দেখান ভাব একেবারে নেই (পৃ: ১১৬)

'(সাধকের) ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে এক প্রকার নিদ্রার মতন আসে, তাকে যোগ-নিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপদর্শন পায়।' (পৃ: ১১৬)

"'ধ্যান-সিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার ঠাঁই'। ধ্যান-সিদ্ধ কাদের বলে জান? যাঁরা ধ্যান করতে বসলেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়।" (পৃ: ১২৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত :

'পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়।' (৪।২১।৫)

'ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়, একে বলে শিবযোগ।' (৫।১৪।১)

'ধ্যানের সময় নাসাগ্রে দৃষ্টি— তাকে বলে বিষ্ণুযোগ।' (৫।১৪।১)

'ধ্যান চক্ষু বুঁজেও হয়, চক্ষু চেয়েও হয়।' (২।৫।২)

'ধ্যান তোমার যেখানে অভিরুচি করতে পার।' (৫।১৪।১)

'ধ্যান হৃদয়ে অথবা সহস্রারে হতে পারে। এগুলি আইনের ধ্যান।' (৫।১৪।১)

'জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাংটা বলতো। জলে জল, অধ: উর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে—ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে। অনন্ত সমুদ্র—জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ 'আমি'টি যদি যায় তা হলে যা আছে তাই,

মুখে বলবার কিছু নাই। জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার ক'রে। চিদাকাশ, আত্মা পাখি! পাখি খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ ধরে না।'

(৩।২১।৩)

'ধ্যান করবার সময় ভাববে, যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখচ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বলছি কেন? —সে পাদপদ্ম যে বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধলে লাগবে তাই।'

(গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ১১ শ সং, পৃঃ ৮৯)

'ধ্যান করবার সময় ইষ্ট চিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সেই দিকে সর্বদা রাখবে। দেখেচ তো, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ-প্রদীপ জ্বালতে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখতে হয়, সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্বদা জেলে রাখতে হয়। সংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ভেতরে চেয়ে দেখতে হয়, সে প্রদীপটা জলচে কিনা।' (ঐ, পৃঃ ৮৯-৯০)

'ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা করবার আগে ভাবতুম, যেন মনের ভেতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্ছি! মনের ভেতর নানান্ আবর্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্তা, বাসনা ইত্যাদি) থাকে কিনা! সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ্ করে তার ভেতর ইষ্টকে এনে বসাচ্ছি!—এই রকম কোরো!' (ঐ, পৃঃ ৯০)

শ্রীশ্রীমায়ের কথা :

'ধ্যান জপ কর। ধ্যান করতে করতে মন এমন স্থির হয়ে যাবে যে, ধ্যান আর ছাড়তে ইচ্ছা হবে না। যেদিন ধ্যান না হবে, জোর করে ধ্যান করবার আবশ্যক নেই—সেদিন প্রণাম করেই উঠবে। যেদিন হবে আপনিই হবে।' (১ম, ৩য় সং, পৃঃ ৩২৪)

"ধ্যান না হয় জপ করবে, 'জপাৎ সিদ্ধি'। জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে। ধ্যান হল ভাল, না হয়, জোর করে ধ্যান করবার দরকার নেই।" (ঐ, পৃঃ ৩২৪)

'নিত্য ধ্যান করবে, কাঁচা মন কিনা! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা ক'রে ভগবানে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল—পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি।' (ঐ, পৃঃ ৩২৬)

'যখন জপ করতে করতে ভগবানের রূপ-দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। ধ্যান হল ত সবই হল।'

(২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৯৯)

'মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মন স্থির করবার জন্য একটু একটু নিঃশ্বাস বন্ধ করে ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়। তাতে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ওভাবে বেশী করতে নেই, মাথা গরম হয়। ভগবানদর্শন বল, ধ্যান বল, সবই মন। মন স্থির হলে সবই হয়।' (ঐ, পৃঃ ১৯৯)

'কাজ না করলে কি মন ভাল থাকে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যান চিন্তা করা যায়? তাই কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল থাকে।' (ঐ, পৃঃ ৬৭)

'কাশীপুর বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান।

কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি! তাঁর মহা-সমাধির স্থান—সিদ্ধস্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।' (ঐ, পৃঃ ১৫৪)

'জপ করতে করতে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। ধ্যানে প্রথমে মুখটি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপ ধ্যান না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি করে?' (পৃঃ ২৪৪)

'মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছুতেই কিছুই হবার নয়। সেদিন দেখলে ত, একজন জোর করে জপধ্যান বেশী করে করতে গিয়ে মাথাটি বিগড়ে এলেন? মাথাটি যদি বিগড়াল ত আর রইল কি? ইস্ক্রুপের প্যাঁচের একটু এধার আর ওধার। এক প্যাঁচ আলগা হলেই হয় পাগল হল, না হয় মহামায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে মনে করে, আমি বেশ আছি। আর উল্টো দিকে এক প্যাঁচ কসা হলেই ঠিক পথে শান্তি ও আনন্দ পায়। সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন করে প্রার্থনা করতে হয়—প্রভু, সদ্‌বুদ্ধি দাও। সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন?' (পৃঃ ২৪৫)

'ধ্যান-জপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার। কারণ কখন যে ক্ষণ বয়, বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না। সেজন্য যতই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার।' (পৃঃ ২৭৩)

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা:

'কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে-কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।...প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে পারতুম না; মন-নিরোধ হয়ে যেত, কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীমূর্তির পূজা।' (১ম সং, ৯।২৫-২৬)

'আমরা স্থূলদেহধারী এবং আমাদের মনও রূপ চিন্তা করিতে বাধ্য। ধর্ম এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং বাহ্য রূপও অনুধ্যানের সাহায্য করে। কোন রূপ ব্যতিরেকে তুমি ঈশ্বরের চিন্তা (ধ্যান) করিতে পার না। চিন্তা করিতে গেলে কোন না কোন রূপ আসিবেই, কারণ চিন্তা ও প্রতীক অবিচ্ছেদ্য। সেই রূপের উপর মন স্থির করিতে চেষ্টা কর।' (১ম সং, ৩।৪৮০)

'গুরুমূর্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্তি বসাইতে হয়। এ-স্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য। মনুষ্যে ঈশ্বর-আরোপ বড়ই মুশকিল; কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়।' (১ম সং, ৮।২৫)

'সুষুম্নার ধ্যান করা বিশেষ প্রয়োজন। ভাব-চক্ষে কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে পারো, এইটিই সবচেয়ে ভাল উপায়। ঐভাবে দর্শন পেলে বহুক্ষণ তার ধ্যান করবে। সুষুম্না একটি অতি সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ময়, সুত্রাকার,

প্রাণময় পথ - মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে, মুক্তির এই পথ দিয়েই কুণ্ডলিনীকে ওপরে তুলতে হবে।' (১ম সং, ১।২০২)

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ :

'প্রথম প্রথম ধ্যান ত মনের সঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্ট-পাদপদ্মে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান ধারণা করে brain (মস্তিষ্ককে) খুব exert করতে (বেশী খাটাতে) নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে, তখন এক আসনে বসে দুই চার ঘণ্টা ধ্যান ধারণা করলেও কোন কষ্ট হবে না ; বরং সুষুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ refreshed (স্বচ্ছন্দ হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।' (৩য় সং, পৃঃ ৩১)

'ধ্যান করা কি সহজ কথা ? একটু বেশী খেলে ত সেদিন আর মন বসল না। এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলি চেপেচুপে রাখতে পারলে তবে ধ্যান করা সম্ভব হয়। ওদের যে কোন একটি জোর করলেই ধ্যান হবে না।' (পৃঃ ৩১-৩২)

'ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না, আবার মন স্থির না হলে ধ্যান হয় না। মন স্থির হলে ধ্যান করব, এইরূপ ভাবলে আর কখনও ধ্যান করা হবে না। দুই-ই একসঙ্গে করতে হবে। মনের বাসনাদি সব কিছুই নয়, ধ্যানের সময় ভাববে—'সব অসৎ'। এইরূপ ভাবতে ভাবতে ক্রমে মনেতে সৎভাবের impression (সংস্কার) হবে। অসৎভাব মন থেকে যেমন তাড়াবে, সৎভাবও তেমনি আসতে থাকবে। ধ্যান করতে করতে অনেক সময় জ্যোতি-দর্শন হয়, আবার কখন কখন প্রণব-ধ্বনি বা ঘণ্টাধ্বনি অথবা অন্য কিছু দূরের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওসব কিছুই নয়। আরও এগিয়ে যেতে হবে। তবে, ওসব লক্ষণ ভাল। ঐরূপ হলে বুঝতে হবে ঠিক ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি।' (পৃঃ ৩২)

'ধ্যান করবার সময় একটা আনন্দময় স্বরূপ চিন্তা করে নিতে হবে—তাতে nerves (স্নায়ুগুলো) soothed (শান্ত) হয়ে যাবে। ইষ্টমূর্তিকে সহাস্য আনন্দময় ভেবে চিন্তা করতে হয়, নইলে শুঁট্‌কো ধ্যান হয়ে যাবে।' (পৃঃ ১০০)

'জপের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিচিন্তা করতে হয়, নইলে জপ ভাল হয় না। পূর্ণ মূর্তির ধ্যান না হলেও যেটুকু সামনে আসে তাই নিয়ে ধ্যান আরম্ভ করবি। প্রথমে পাদপদ্ম থেকে আরম্ভ করবি। না পারলেও struggle (বারবার চেষ্টা) করবি। না এলে ছাড়বি কেন ? করতেই হবে। ধ্যান কি সহজে হয় ? করতে করতেই হবে। ধ্যানের next stepই (পরের অবস্থা) সমাধি।' (পৃঃ ১০০-১০১)

'সাধারণতঃ হৃদয়ে ধ্যান করাই ভাল। দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ছা ইষ্টদর্শন হবে। পার্শ্বে, হৃদয়ে, পশ্চাতে, বাহিরে সবখানেই ধ্যান করা যায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে জ্যোতিঃ-দর্শন হয়, কিন্তু ঐরূপ জ্যোতিঃ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। তারপর জ্যোতিঃঘন দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় হয়ে যায়। কখন কখন বা দীর্ঘ প্রণবধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। দর্শন অনুভূতির রাজ্যে কি ইতি আছে ? যত

এগোও অনন্ত! অনন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিঃ টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ—তা নয়।' (পৃঃ ১০১-১০২)

'ধ্যানকালে ইষ্টমূর্তিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয়—যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলোকিত। চৈতন্যস্বরূপ (immaterial) ভাববে। এইরূপ ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু খুললে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর একটা জগৎ। এ জগৎটা যেন তা ছাড়া, এটা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।' (পৃঃ ১০৪-১০৫)

'প্রশ্ন—মহারাজ, ধ্যানের সময় যদি তাঁকে সর্বব্যাপী ভাবা যায়, সেটাও তো ধ্যান ?

মহারাজ—এটা তো করতেই হয়, তবে একটু পরে। তখন সেই ইষ্টকে সকলের মধ্যে—জলে স্থলে, পাতায় পাতায়, আকাশে নক্ষত্রে, পাহাড়ে পর্বতে—সর্বত্র অনুভব হয়।' (পৃঃ ১০৫)

'প্রশ্ন—ধ্যান কি, মহারাজ ? মূর্তিচিন্তা তো ?

মহারাজ—মূর্তিচিন্তা আবার নির্গুণ-চিন্তা দুই-ই।

প্রশ্ন—আচ্ছা, মহারাজ, কে মূর্তিচিন্তার, কে নির্গুণ-চিন্তার অধিকারী—গুরুই তো সে সব ঠিক করে দেন ?

মহারাজ—হাঁ, তবে মনই গুরু। মনে কখনও মূর্তিচিন্তা করতে ভাল লাগে, কখনও বা নির্গুণ-চিন্তা ভাল লাগে। বাইরের গুরু তো সব সময়ে মিলে না। সাধনভজনে লেগে থাকলে মনই সব বুঝতে পারে। মনই সব দেখিয়ে দেবে।' (পৃঃ ১০৭)

শিবানন্দ-বাণী :

'রাত্রেই ধ্যানজপের প্রশস্ত সময়। যতটুকু সময়ের জন্যই হোক একবার নিজেকে সব কাজকর্ম থেকে আলাদা করে ফেলবে। সে সময়ে মন থেকে সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, নিজেকে সব থেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ করে ফেলবে। দিনান্তে অন্ততঃ একবার এটা করতেই হবে—তা যতক্ষণের জন্যই হোক্।' (১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ৭৩)

'ভগবদ্ধ্যান করতে করতে নিজের অহং একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে; তখন কেবল তিনিই থাকবেন। মনের এই অবস্থা যখন হবে তখনই তোমাদের দ্বারা ঠিক ঠিক জনহিতকর কাজ হবে।' (ঐ, পৃঃ ৭৪)

'ঠাকুরের এক এক অঙ্গ ধ্যান করবে। প্রথমতঃ শ্রীচরণ ধ্যান করলে, ক্রমে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পরে ঠাকুরের মূর্তি সমস্তটা একেবারে ধ্যানে আনবার চেষ্টা করবে। পুরোপুরি সমস্ত মূর্তি একেবারে ধ্যান করতে পারলেই ভাল।' (ঐ, পৃঃ ১১৬-১৭)

'ধ্যান করার পরেই আসন ছেড়ে চলে যেতে নেই, তাতে ভাব দৃঢ় হয় না; বরং ধ্যানভঙ্গের পরে নিজ আসনে বসেই অন্ততঃ খানিকক্ষণ ধ্যানের বিষয় ভাবতে হয়। এর পরে ধ্যানের অনুকূল খুব ভাল ভাল স্তবাদি পাঠ করতে হয়। তাতে ধ্যানের ভাব ও আনন্দ আরও ঘনীভূত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। আসন-ত্যাগের পরও খানিকক্ষণ কারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলে আপন মনে স্মরণ মনন করতে হয়। তাতে অনুভব হয়, যেন সেই ধ্যানের নেশা লেগে রয়েছে। ওতে প্রাণে খুব আনন্দও এনে দেয় এবং একটা উচ্চ ভাব আশ্রয় করে থাকবার খুব সহায়তা করে।' (ঐ, পৃঃ ৭)

'তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা। যে কোন রকমে প্রেমের সহিত তাঁর শ্রীমূর্তি চিন্তা বা তাঁর গুণ

ভাবনা করাই ধ্যান।' (২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৫)

'ধ্যানের বহু প্রকার আছে। খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন; আর ভাববেন যে, তাঁর শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতিতে আপনার হৃদয়কন্দর আলোকিত হয়ে গেছে। এই রকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব আনন্দে মন প্রাণ ভরে যাবে, ক্রমে ক্রমে মূর্তিরও লয় হয়ে যাবে এবং কেবল চৈতন্যময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে—এও একপ্রকারের ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে—পরে পরে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন। আসল কথা হল আন্তরিক-ভাবে তাঁকে ডাকা। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে। আপনার কখন কি প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাঁকে কি ভাবে ডাকতে হবে—সে সব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন।' (ঐ, পৃঃ ১৭)

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী :

'শ্রীমূর্তি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে সেই মূর্তি কল্পনা করতঃ প্রেমের সহিত খুব প্রার্থনা ও তাঁর গুণভাবনা করিবে।··· জপের সময়ও মূর্তিকল্পনা নিশ্চয় করিবে। ধ্যেয় মূর্তি নাভি, হৃদয়, ভ্রূ-মধ্যে এবং সহস্রারে কল্পনা করিবে।' (১৩৬০ সনের সং, পৃঃ ৬৩)

'হিমালয়ের নির্জনতা এবং প্রাকৃতিক শোভা ভক্তের চিত্তে বড়ই শান্তি দেয় এবং ভগবানের ধ্যানের সাহায্য করে। প্রাকৃতিক শোভা অনেকের মনের বৃত্তি বহির্মুখী করিয়া রাখে, তবে অসৎ বিষয়ে নয়। ধ্যানের গভীরতা হইলে বহির্জগতের শোভা মনকে তত আকৃষ্ট করিতে পারে না। তবে ব্যুত্থান-অবস্থায় অর্থাৎ ধ্যানের পরে মন যখন বাহ্য বিষয় দর্শন-শ্রবণাদি করে তখন প্রাকৃতিক শোভাদিতে (বিশেষ হিমালয়ের) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে এক প্রকার পবিত্র আনন্দ অনুভূত হয়. তাহা ভগবৎ-ধ্যানের অনুকূল।' (পৃঃ ১৭৪-৭৫)

'যে ভাবেই হউক জপে বা ধ্যানে, জপ ধ্যান মিশাইয়া বা তাঁহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া (সেও এক প্রকার ধ্যান)—যে রূপেই হোক, মনটা তাহাতে রাখিতে পারিলেই উত্তম। সময়ের জন্য তত চিন্তা করিও না। যতটা সময় সহজে অর্থাৎ বিনা কষ্টে তাঁহাকে দিতে পার ততটাই ভাল। অধিক টানাটানি করিও না।' (পৃঃ ১৮৭)

'ধ্যানের সময় এইরূপ চিন্তা করিবে যেন তোমার হৃদয়পদ্মে ঠাকুর তোমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন এবং তুমিও তাঁহার দিকে প্রেমভক্তিভরে দেখিতেছ—এইরূপ চিন্তা করাই ধ্যান।···তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই তোমার জীবনের সর্বস্ব—এইভাব সর্বদা মনে রাখিবে, তাহা হইলে ধ্যানের সময় মন খুব একাগ্র হইবে।' (পৃঃ ২৩৪-৩৫)

'তুমি অনায়াসে ঠাকুরের আসন বদলাইতে পার। অর্থাৎ তুষারমণ্ডিত উচ্চপর্বতশৃঙ্গোপরি, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপরে, জ্যোতির ভিতর বা পদ্মের উপর ঠাকুরকে ভাবনা করিতে পার—এ সকল উৎভ্রান্ত কল্পনা নহে। ইহার পর আরও কত দেখিবে যাহা তোমার চিন্তা-শক্তির বাহিরে।' (পৃঃ ২৪৭)

'ধ্যানের পূর্বে প্রথমে গুরুমূর্তি ধ্যান করিলে ভাল. পরে সেই গুরুস্থানে ঠাকুরের মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হইবেই হইবে। দাঁড়ান অবস্থায়ই হউক বা বসা অবস্থায়ই হউক, যাহা তোমার ভাল লাগে তাহাই করিবে। সম্পূর্ণ মূর্তি ধ্যান করিতে পারিলেই ভাল, নচেৎ শ্রীপাদপদ্ম বা শ্রীমুখ বা হৃদয়। হৃদয়ে ধ্যান করিলে ভাল হয়, কখন কখন তাহা না পারিলে তিনি সামনে আছেন, এই ভাবনা করিয়া ধ্যান করিও।' (২৫৭-৫৮) (ক্রমশঃ)

পরলোকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ২৮শে জুন বিকালে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য কিছুদিন পূর্বে তিনি কলিকাতায় একটি নার্সিং হোমে ভরতি হইয়াছিলেন, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখান হইতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিট্যুটে তাঁহার দেহ লইয়া যাওয়া হয় এবং পরদিন ২৯শে জুন সেখান হইতে শোভাযাত্রা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া পার্ক সার্কাসে আনিয়া সেখানকার গ্যাস চেম্বারে ব্রাহ্মমতে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

তাঁহার অভাব শিক্ষাক্ষেত্রে অপূরণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস. সি. পাশ করিবার পর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এম. এ. উপাধি লাভ করেন। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইয়া ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। পরে ১৯৪৮ খৃঃ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার ভিতর বিদ্যার অন্য একটি শাখার আলোক ক্রমোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। ইংল্যাণ্ড হইতে কৃতবিদ্য হইয়া ফিরিবার সময় তিনি কার্ল পিয়ার্সনের জার্নাল জীববিদ্যাবিষয়ক পরিসংখ্যান-তালিকাগুলি লইয়া আসেন। পরিসংখ্যান-বিদ্যায় তাঁহার আগ্রহ এগুলি হইতেই প্রথম বিকশিত হয় এবং উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়া এই বিষয়ে তাঁহাকে গবেষণায় ব্রতী করে, এবং পরবর্তীকালে ইহার অগ্রগতিতে তাঁহার কয়েকটি মৌলিক অবদান তাঁহাকে বিশ্ব-বিখ্যাত করিয়া তোলে। পরিসংখ্যানের যে-কোন আন্তর্জাতিক প্রকরণ-গ্রন্থে এবং উচ্চ-শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে তাঁহার নামোল্লেখ আজ অপরিহার্য। কলিকাতার বরানগরে অবস্থিত স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটিকে পরিসংখ্যান-শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলেন; শেষ পর্যন্ত তিনি কর্মসচিবরূপে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, ১০ বৎসর ইহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের পরিসংখ্যান-বিষয়ে পরামর্শদাতা এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পরিকল্পনা কমিশনের সভ্য হন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিসংখ্যান বিভাগের বিভিন্ন উপশাখায় চেয়ারম্যানরূপে এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বিভাগের চেয়ারম্যানরূপেও তিনি কাজ করেন। ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া এবং অন্য স্থানেও তিনি বহু উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন (নবম ও দশম ভাগ)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরিবেশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ২৪৩ ও ও ২২০। মূল্য ৮৲+৮৲।

'শ্রীম-দর্শন'-এর নবম ও দশম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইবেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত ৮টি ভাগ ভক্ত-সমাজে যে সমাদৃত হইয়াছে বর্তমান ভাগ-দুইটির আত্মপ্রকাশ তাহাই সূচনা করে

নবম ভাগে ২২টি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত। ইহার মধ্যে দুইটি অধ্যায়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' সম্বন্ধে অপূর্ব আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে। অধ্যায় দুইটির নাম : 'কথামৃতপাঠ শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ,' 'কথামৃত জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় গ্রন্থ'।

নবম ভাগে দশম পৃষ্ঠায় উক্তিটি অনুধাবন-যোগ্য : "শ্রীরামকৃষ্ণ—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের সকল ধর্মাচার্যগণের সমষ্টিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ম্লান ধর্মকে পুনর্জীবন দান করতে এসেছেন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মিলন-মন্দিরে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ ও প্রচার-বিগ্রহ।"

দশম ভাগে 'মুখস্থ থেকে মনঃস্থ হয়', 'সর্ব-শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি লাভ হয় ঈশ্বরদর্শনে', 'জীব শিব জ্ঞানে বিশ্বশান্তি', 'ভক্তিপথেও ব্রহ্মজ্ঞান হয়'—এই অধ্যায়গুলিতে শ্রীম-র শ্রীরামকৃষ্ণানুধ্যান সার্থকভাবে অভিব্যঞ্জিত।

নবম ও দশম—উভয় ভাগই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল

Nivedita - Sri Bhupendranath Roy, Retired Headmaster. Published from Golamara High School, P. O. Golamara, Dist. Purulia. Pp. 34 ; Price 50p.

ইংরেজীতে লেখা এই পুস্তিকায় মহিমময়ী ভগিনী নিবেদিতার অনবদ্য জীবনের একটিমাত্র অধ্যায় উদ্ঘাটনের প্রয়াস করা হইয়াছে। নিবেদিতা তাঁহার আচার্যদেবের দর্শন পাইলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে সত্যানু-সন্ধানের জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল, তাহা দেখানো হইয়াছে। এই মহাপুণ্যক্ষণে তিনি যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ করিয়া জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা, তাঁহার জীবনের গতি-প্রকৃতি স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকটি তরুণ-বয়স্কদের জন্য লিখিত।

অভীঃ (১৯৭১-৭২)—রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১২০।

এবারের 'অভীঃ' পত্রিকাখানিতে কঠোপ-নিষদের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে ও স্বামীজীর বাণী-সংকলনটিতে অভীর ভাব অভিব্যঞ্জিত। সুলিখিত প্রবন্ধ, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, কবিতা—বিভিন্ন দিক হইতে পত্রিকাটিকে মনোজ্ঞ করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই প্রযত্ন সাফল্যমণ্ডিতও। বাংলা ও ইংরেজী—প্রত্যেকটি লেখাই পড়িবার মতো।

'Education and Crisis in Values' প্রবন্ধটি সময়োপযোগী।

মরুতৃষা—নমিতা ধরচৌধুরী। প্রকাশক: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১০৪বি, আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ৮৩; মূল্য তিন টাকা।

'মরুতৃষা' কাব্যগ্রন্থ। এখানে ২৫টি কবিতার সমাবেশ। মানুষের আন্তর ও বাহ্য দুই প্রকৃতিরই বিচারমূলক পরিচয় দিবার প্রচেষ্টা দেখা যায় কবিতাগুলিতে। ভাষায় আবেগ ও সারল্য বিদ্যমান।

কাব্যরসিকদিগের নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে, মনে হয়।

উদ্বোধন কার্যালয়ের নবপ্রকাশিত পুস্তক

[প্রকাশক: স্বামী নিরাময়ানন্দ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩]

১। **দিব্যপ্রসঙ্গ:** স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃ: ২০০; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের একান্ত সেবকরূপে তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল; তাঁহাদের মুখে যে সব কথা শুনিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই কিছু এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও তিনটি বিষয় এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে: (১) পুরানো বেলুড় মঠের একটি মানচিত্রসহ মঠের পুরানো দিনের বহু বিস্মৃত কথা; (২) বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুপূর্বিক কাহিনী; (৩) এই মন্দিরের গঠন-বৈশিষ্ট্যের ও উহার নির্মাণকার্যের নির্ভুল একটি বিবরণ (পরিশিষ্টে সংযুক্ত)।

২। **শিশুদের বিবেকানন্দ:** স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃ: ৫৬; মূল্য—আড়াই টাকা।

শিশুদের উপযোগী সহজ ভাষায় লিখিত সচিত্র এই গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়; এবারে চিত্রগুলি নূতন করিয়া আঁকাইয়া এবং আরও কিছু পরিবর্তনসহ অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া নূতন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থটি উচ্চমানের পুরু ম্যাপ-লিথো কাগজে (ক্রাউন ¼ সাইজ) ছাপা। এক পৃষ্ঠায় ছবি, অপর পৃষ্ঠায় লেখা—এরূপ ২৭টি চারিবর্ণে অঙ্কিত ছবি ও ২৭টি গল্পে শিশুদের উপযোগী করিয়া স্বামীজীর জীবন ও বাণী ইহাতে পরিবেশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

গুজরাতে কলোনীর উদ্বোধন

১৯৭০ খৃষ্টাব্দে গুজরাতে প্রবল বারি-বর্ষণের ফলে বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। বিবেকানন্দ নগরে রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বসবাসের জন্য একটি কলোনী তৈরি করা হইয়াছে। এখানে ৫৩টি পাকা বাড়ি নির্মিত হইয়াছে। গত ৮. ৫. ৭২ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঘনশ্যামভাই ওঝা এই কলোনীটির উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশে রিলিফ

বাংলাদেশে দুঃস্থ জনগণের সেবাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাগেরহাট, বরিশাল, ঢাকা, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও শ্রীহট্ট আশ্রমের মাধ্যমে ৮টি সেবাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। এই রিলিফ-সেণ্টারগুলিতে অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭,৭৮,৬৬৫·১৪ টাকা। গত ২৯. ৬. ৭২ পর্যন্ত অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিতরণ করা হইয়াছে—ধুতি ও শাড়ী ৮২,৬২০, কম্বল ১৪,৩০০, পশমী সোয়েটার ৮,৩০৭, লুঙ্গী ২,৪৫০, গামছা ৬৩০, জামার কাপড় ১,৬৭৬ গজ, মশারি ৯১৭, পুরাতন বস্ত্রাদি ১৮,০০০, শিশুখাদ্য ৬,৭৯৬ কেজি. এবং আটা ডাল ও চিড়া ৭,৬১০ কেজি। পানীয় জলের জন্য ৮৫টি নলকূপ বসানো করা হইয়াছে এবং বসবাসের জন্য ৫০৬টি ঘর তৈরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহার মধ্যে বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রায় ৭,০০০ পরিবারের মধ্যে ৮,০২৮ খানি ধুতি ও শাড়ী, ২,৬৩৭ খানি কম্বল, ১৫০ খানি লুঙ্গি, ৪৭০৫ খানি পুরাতন বস্ত্র, ৪৩ কুইণ্টাল ৫০ কেজি চিড়া, ৫ কুইণ্টাল ৫৭ কেজি গুড়, ৯ কুইণ্টাল ৫৬ কেজি লবণ, ২ কুইণ্টাল ৪ কেজি বিস্কুট, ২,৪০০ পাউণ্ড রুটি, এবং ৪৭১ কেজি শিশুখাদ্য প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছে। ২৩টি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু ও বালক-বালিকাদের দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে। দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থীকে টিফিন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ বসানো হইয়াছে এবং একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে। বাগের-হাট থানার দশানি গ্রামে ১০০টি টালির এবং ফকিরহাট থানার কুমারখালি গ্রামে ১৫০টি টিনের ঘরের নির্মাণকার্য চলিতেছে।

অনাথছাত্রনিবাস

গত ২৭. ৫. ৭২ শ্রীলঙ্কার বাট্টিকালোয়ায় আশ্রম ও অনাথছাত্রনিবাসের নূতন ভবনের উদ্বোধন করা হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ৯ই, ১০ই ও ১১ই জুন উদ্‌যা-পিত হইয়াছে। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ণিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শতাধিক ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। ৯ই জুন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর শ্রীসুধীর-কুমার চৌধুরী রামায়ণ গান করেন। ১০ই জুন সকালে ভজন সঙ্গীতাদির পর সাড়ে আটটায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সমবেত ভক্ত

বৃন্দের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ভক্তবৃন্দকে সমবেত-ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণে আহ্বান জানান এবং সাপ্তাহিক, পাক্ষিক অথবা মাসিক পাঠচক্রের মাধ্যমে পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারে ব্রতী হইতে বলেন। বৈকালিক ভজন ও সন্ধ্যারতির পর এই দিনও শ্রীসুধীর চৌধুরী রামায়ণগানে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। ১১ই জুন প্রত্যূষে মঙ্গলারতির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ এক শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। এই দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ আশ্রমে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় আশ্রমাধ্যক্ষ বন্যার কবলমুক্ত আশ্রমের সাংগঠনিক ও আর্থিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া আশ্রমের পরিচালনায় মালদহবাসী সকলের সহায়তা কামনা করেন। পরে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী তাঁহাদের সুচিন্তিত ভাষণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনালোকে ধর্ম'।

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন (রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-৫৫) কেন্দ্রের ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন দিল্লীতে সাধারণভাবে কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান স্থানে নিজস্ব ভবনে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির ও বিরাট সভাগৃহ আকর্ষণীয় বস্তু। এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, ক্রি টি. বি. ক্লিনিক, আউটডোর হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী ও সারদামন্দির পরিচালিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সাময়িক বক্তৃতাদির মাধ্যমে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব প্রচারিত হইয়াছে। 'রামচরিতমানস' অবলম্বনে হিন্দীতে ৪৯ টি আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এখানকার গ্রন্থাগারটি বৃহদায়তন, শিশু-বিভাগের গ্রন্থ সমেত পুস্তকসংখ্যা ২৪,৪৩৪ আলোচ্য বর্ষে দেড়সহস্রাধিক নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত পুস্তকসংখ্যা ১৯,৫৯৬। পাঠাগারে ১৫ টি সংবাদপত্র এবং প্রায় দেড়শত সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। গড়ে দৈনিক উপস্থিতি —৩২৯।

লাইব্রেরীর বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রবিভাগটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানে এই সেকশনের পুস্তকসংখ্যা ৩,৪৫০। প্রতিদিন গড়ে ১০২ জন বিদ্যার্থী এখানে পড়াশুনা করেন। ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন।

যক্ষ্মা-ক্লিনিকটি আর্যসমাজ রোড ক্যারলবাগে অবস্থিত। আলোচ্য বর্ষে এই ক্লিনিকের বহির্বিভাগে ২,৫৫৬ (১,১৭,১০৯ পুনরাবৃত্ত) রোগী চিকিৎসা লাভ করেন, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১,৭০৫। অন্তর্বিভাগে পর্যবেক্ষণ-ওয়ার্ডে ২৩৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন। আউটডোর হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীতে

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬৮,৬৫২, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৭,৩৫৪। স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণ এই হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য নামে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সারদা মহিলা সমিতি শিক্ষা-সেবা-সংস্কৃতিমূলক কার্যধারা যোগ্যতার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালকবালিকাদিগকে ভজন, সঙ্গীত, প্রার্থনাদির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৪০টি বালকবালিকা যোগদান করিয়াছিল। সমিতিতে শাস্ত্রালোচনারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বর্তমানে 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' অবলম্বনে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব দিল্লী মিশন কর্তৃক সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজীর ১০৯ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি ও বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী ২,২১৫ জনের মধ্যে কৃতকার্য প্রতিযোগীদের ২১০টি পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৬তম জন্মোৎসবে নরনারায়ণ-সেবা ছিল উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ, গুরুনানক, তুলসীদাস প্রভৃতির জন্মদিন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

স্বামী পরাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, স্বামী পরাত্মানন্দ (গিরিশ মহারাজ) গত ১৫.৬.৭২ বেলা ১টার সময় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি হৃদ্‌রোগে ও অন্যান্য অসুখে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজেরই নিকট তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা স্টুডেন্টস্ হোম, দেওঘর বিদ্যাপীঠ এবং বেলুড় মঠ ইত্যাদি ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বারাণসী, কনখল ও বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত ছিলেন। সরল অনাড়ম্বর সাধুজীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তাঁহার সহৃদয় অন্তঃকরণ সকলকেই আকৃষ্ট করিত। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে অবসর-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বার্ধক্য এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৭শে ও ২৮শে মে 'মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইনস্টিটিউট' প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের ১১০ তম জন্মোৎসব পালিত হয়। ২৭শে মে সকালে অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভজন এবং স্বামী নিরত্যানন্দ স্বামীজীর বাণী পাঠ করেন। বিকালে আয়োজিত জনসভায় সম্পাদকের কার্যবিবরণী-পাঠের পর স্বামী

জীবানন্দ (সভাপতি), শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় (প্রধান অতিথি), শ্রী এম. এন. শুক্লা ও শ্রীতুষার দাশের বক্তৃতার পর 'ইচ্ছাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায়' 'বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য' পরিবেশন করেন। ২৮শে মে উত্তর কলিকাতার বিবেকানন্দ শিশু সংসদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'শিশুমেলা' আয়োজিত হয়, ৭ম স্কাউট গ্রুপ ও বিবেকানন্দ শিশু সংসদ যোগ দেন। সান্ধ্য সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ (সভাপতি), ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্মা, ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত, স্বামীজীর জীবন ও চিন্তা বিষয়ে যুবকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। শেষে শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষের তত্ত্বাবধানে যৌগিক ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়।

হাফলং (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে গত মে মাসে স্থানীয় জগন্নাথ হলে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী পরশিবানন্দ, শ্রী সোনারাম থাউসেন (সভাপতি) ও শ্রী বি. চাংকাকতি (প্রধান অতিথি) শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

ইহা ছাড়া আরো কয়েক স্থানে বিভিন্ন দিনে ধর্মালোচনা করেন স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। হাফলং শহরে ও মাইবং-এ সমিতির নিজস্ব জমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও তিনটি ছাত্রাবাস আছে। ইহা ছাড়া সাপ্তাহিক আলোচনা, সাময়িক উৎসব, টাইপ টেলারিং প্রভৃতির শিক্ষণ, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির মাধ্যমে সমিতি স্থানীয় উপজাতীয় জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে।

শ্রীসারদা সঙ্ঘের (কলিকাতা) বার্ষিক সভা গত ২৬ জুন, সোমবার গোলপার্ক ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচার-এর বিবেকানন্দ হলে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মাতৃস্তব, সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ এবং ডঃ রমা চৌধুরীর স্বাগত-ভাষণের পরে স্বামী ঈশানানন্দ তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সুমধুর প্রসঙ্গ করেন। তিনি বলেন, 'সত্যাশ্রয়ী ঠাকুর সত্যকে আশ্রয় করে থাকতে বলে গেছেন।' সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ জপধ্যানের উপর খুব জোর দিয়া বলেন, নিয়মিত জপধ্যান না করিলে সেবার ভাব ঠিক রাখিয়া কাজ করা, কাজকে পূজায় রূপায়িত করা, সম্ভব নয়। শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর সুললিত সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

পরলোকে অক্রুরচন্দ্র ধর

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, অক্রুরচন্দ্র ধর গত ১৭ই জুন বেলা ৩-৩০ মিনিটে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কবি এবং লেখক হিসাবে তিনি উভয় বাংলায় সুপরিচিত। 'উদ্বোধনে' তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মভূমি লাখপুর শিমুলিয়া, ঢাকা (বাংলাদেশ) ছাড়িয়া হুগলী জেলার নবগ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত আষাঢ় সংখ্যায় ২৮৪ পৃষ্ঠা, ১ম কলম, ২৫শ লাইনে '১৯১৫' স্থলে '১৮১৫' পড়ুন।

কর্ম্ম ।

(বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 'রামকৃষ্ণ মিশনে' পঠিত ।)

। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।

অবিবেকী মন, ভাবিতেছি, কি করিব ? সন্ন্যাসী হই । কিন্তু পরমহংসদেব বলিতেন "যে মূঢ় বাসনা থাকিতে গৈরিক বসন পরিধান করে, তার ইহকালও যায়, পরকালও যায়।" যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন শরাসন ত্যাগ করিয়া কমণ্ডলু ধারণ করিতে চান, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার একটী চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে বিরত হইতে চান, তখন তিনি তমোগুণে আবদ্ধ। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, মুখ অপ্রসন্ন, ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। এ সকল তমোগুণের লক্ষণ। ভগবানের উপদেশে তাঁহার তমঃ দূর হইল; রজোগুণে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার ভয় নাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান। অর্জ্জুন তাহাতে দেখিতে পান যে, তাঁহার বিপক্ষেরা মৃত, যাহাকে তিনি মহাবলশালী বিপক্ষ জ্ঞান করিতেন, যে অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণকে দুর্জ্জয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, দেখেন, তাহারা হত হইয়া রহিয়াছে, আর তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে না, তিনি নিমিত্ত মাত্র, তাঁহার চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত কার্য্য। কার্য্য ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, এই জন্যই কার্য্য, নতুবা প্রয়োজন নাই। গীতা শুনিয়া এ সমস্তের আভাস পাইয়াছিলেন, কার্য্য করিতে লাগিলেন; কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গোড়ো গোয়ালার নিকট কৌরববিজয়ী বিজয় পরাস্ত হইয়া নিশ্চিত করিলেন, শক্তি তাঁহার নয়, কৃষ্ণের শক্তিতে তিনি বিশ্ববিজয়ী ছিলেন। তাঁহার সত্ত্বগুণ উপস্থিত হইল, সন্ন্যাসের উপযুক্ত হইয়া মহাসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আমি গৃহী, তমোগুণপূর্ণ, আলস্যে অভিভূত হইয়া ভয়ে নিঃস্বার্থপরতার ভান করিয়া সহজ-সন্ন্যাস স্বার্থ-তৃপ্তির নিমিত্ত যদি গ্রহণ করি, তাহা বিড়ম্বনা। ত্যাগী জ্ঞানে নরপতি পদে শির নুয়াইবে, অর্থ দিবে, বিম্বাধরীগঞ্জিনী রাজরাণী পদসেবা করিতে নিভৃতে রজনী-যোগে আসিবে, সাধুব্যক্তি প্রণাম করিবেন, এসকল সহ্য করিবার শক্তি বাসনা-জড়িত ব্যক্তির নাই। ইহকালেই তাহার দণ্ড আরম্ভ হইবে। সমাজঘৃণিত, ধর্ম্মবর্জ্জিত কারামৃত্যুর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহকাল, পরকাল উভয়ই যাইবে। এ দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর সকলেই দেখিতে পান। সংসারে ভণ্ডামি করিয়া বরং চলে, তাহার উপায় আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভানে, ঈশ্বরের সহিত বঞ্চনা, চক্রীর সহিত চক্র, মূঢ় ব্যতীত এরূপ সাহস কেহ করে না। পৌরাণিক কথা আছে যে, শ্রীরামের সহিত সংগ্রামে কাতর হইয়া রাবণ অম্বিকার শরণাপন্ন হন, অম্বিকাও আশ্রয় দেন। কিন্তু মহাদেব বলিলেন, দেবি, সরিয়া আইস। রাবণ উত্তর করেন, দেব-দেব, আমি ত চিরদিনই আপনার সেবক, আমার প্রতি বিরূপ কেন ? মহাদেব বলেন, পাপিষ্ঠ, তুই যদি সম্মুখ সমরে রামকে আবাহন করিয়া সীতা হরণ করিতে যাইতিস্, আমি শূল হস্তে লইয়া তোর সহায় হইতাম। দেবকন্যা, নাগকন্যা হরণ করিয়াছিস্,

আমারই বলে, ইহাতে আমি বিরূপ হই নাই, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভান করিয়া কুলাঙ্গনা অপহরণ করিয়াছিস্। তোর বিনাশ নিকট ; তোর কার্য্যে সন্ন্যাসীকে আর গৃহস্থ বিশ্বাস করিবে না, তোর পূজা আর আমি গ্রহণ করিব না।

সন্ন্যাসী না হইয়াও আমারও উপায় আছে। ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মের শরণাপন্ন হই। সাধ্যমত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি ; আমি দুর্ব্বল বটে, ধর্ম্ম আমায় বল দিবেন। দেখাদেখি সন্ন্যাসের ভান করিব না, তাহা হইলে লাভে মূলে সমস্ত হারাইব। একটী গল্প আছে—একজন কাঠুরিয়া, নদী পার হইতে হইতে তাহার কুঠারখানি জলে পড়িয়া যায়, কাতর হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রর্থনা করিল, দেব, আমার জীবন-উপায় কুঠারখানি দাও। এক-খানি রূপার কুঠার ভাসিয়া উঠিল। কাঠুরিয়া দেখিল, কুঠার তার নয়। সে তাহার দেবতাকে বলিল, এ কুঠার আমার নয়, আমার খানি দাও। রূপার কুঠার ডুবিয়া সোনার কুঠার ভাসিল। কাঠুরিয়া আবার সেইমত বলিল। অবশেষে আপনার কুঠারখানি ভাসিতে দেখিয়া পরম আনন্দে গ্রহণ করিল। বিশ্বকর্ম্মা সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্বর্ণ রৌপ্য কুঠারও তাহাকে দিলেন। অপর একজন কাঠুরিয়া তাহা দেখিয়াছিল। তাহার কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করিল, রূপার কুঠার উঠিল, সোনার কুঠার উঠিল। লোভী কাঠুরিয়া আমার নয়, আমার নয়, বলিল। পরে তাহার নিজের কুঠার ভাসিয়া উঠিলে লইতে যায়, মনে ভাবিতেছে, অপর দুইখানিও পাইবে, তাহার কুঠারখানি ডুবিয়া গেল। দেখাদেখি সন্ন্যাসের এইরূপই ফল হইয়া থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষায় নির্ম্মল কার্য্য হয় না।

অবিদ্যা বারাঙ্গনার ন্যায় হাবভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত বারাঙ্গনার হস্তে পরিত্রাণ আছে ; যেখানে তাহারা থাকে, সেস্থান পরিত্যাগ করিলে হয়, হাবভাব না দেখিলে হয়, কুৎসিত রোগের ভয়ে, লোকলজ্জায়, ঘৃণায়, অনেকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় ; কিন্তু এ নটী তোমার বাসনা। দিবারাত্র যাহাকে ধ্যান করিয়াছ, নিদ্রার সময় যাহাকে ইষ্টস্মরণ ত্যাগ করিয়া আদরে বক্ষে ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছ, যাহার নিমিত্ত ভগবান মোক্ষপ্রদ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভয়ে পলায়ন কর, এ-নটী তোমার বাসনা, সুন্দর বেশভূষা করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আশা দূতীবেশে কত কথা কহিয়াছে, কল্পনা কতই সম্ভোগ রচনা করিয়াছে, তাহাকে পাইবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত, হাত বাড়াইলেই পাও, কিন্তু নটী সরিয়া দাঁড়াইল। ধরি ধরি, ধরা যায় না। ধরা দিলে দেখ, অতি কুৎসিতা। কিন্তু বহুরূপিণী আবার অন্য মনোহারিণীরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মানা। আবার ছুট, আবার ঐ ফল। ফলাকাঙ্ক্ষার অর্থই, কুৎসিতা বারাঙ্গনা অবিদ্যামায়ার উপাসনা। ফলকামনায় ধর্ম্ম কর—ধর্ম্ম বিশ্বাসঘাতক নন—মুটে বিদায় করিবেন। মনে কর, একবার ধনকামনায় ধর্ম্ম করিয়াছ, ধন পাইবে, সংসারে ধন অতি অবিদ্যাবলশালী। ধন পাইয়াছ, আর ধর্ম্মের উপাসনা নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও। দেখিতে পাও, অনেকেই ধনমদে ধর্ম্ম ভুলিয়াছেন। তোমারও ভুলিবার সম্ভাবনা। যাহাতে লোক মুগ্ধ থাকে, সেই সমস্ত তাহার সর্ব্বস্ব হয়, অন্য চিন্তা স্থান পায় না। এ কথাটী বালককেও যুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারিরা তাঁহাকে প্রলোভন

দেখাইতে আসিয়াছিল। বলে, টাকা দিতেছি, আপনি তাণ্ডারা খুলুন, এ টাকা ত আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি? এ কথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিলেন, আমি বল্লুম 'না'। আমি বুদ্ধিমান, জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এতে আপত্তি কি?" তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাঁহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্তকালস্রোতে কেহ কখন দেখে নাই, ভঙ্গীর সহিত পরমহংসদেব বলিলেন, (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে) "ও মনে পড়বেক্, আবার আস্‌তে হবেক্।" যে মহাত্মা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শত শত জন্মগ্রহণে কৃতসংকল্প, সুকর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে দেহধারণে কুণ্ঠিত দেখিলাম।

তিনি উপদেশ দিতেন, সে উপদেশের মর্ম্ম আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলি। তিনি ধ্যান করিতে বলিতেন; ধ্যান করিতে করিতে কুক্কুর, বিড়াল, বাঁদর, বেশ্যা, লোটো, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাতে বলিতেন, ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতেছ, মনে করিবে, কিন্তু যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে, তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না।' ধ্যানস্থ বাসনা আশু ফলপ্রদ হয়, সে ফল অতি কুফল। অবিদ্যার ফল—মানবকে নিরয়গামী করিবার ফল। কুতর্ক উঠিয়া মনকে বলিতে থাকে, ফলের কামনায় ঈশ্বর-উপাসনা করিব না, তবে কেন তাঁর উপাসনা? ধন পাইব, মান পাইব, নরনারী দাসদাসী হইবে, এই ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সিদ্ধ পুরুষের ত ইহাই হইয়া থাকে, আর কি হয়? ইহাই হয় সত্য, যাহা সংসারী জীব বাসনা করে, ঈশ্বরসেবায় তাহাই পায়, কিন্তু সে তাহা পাইয়াছে কিনা, তাহা জানে না, যদি জানে, জানিলেও কিছু তৃপ্তি নাই। কি এক পরম তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাতে তাহার সকলই তুচ্ছ, ঈশ্বরের সেবায় তাহার আনন্দ, শিশুর পিতা-মাতার সেবার ন্যায় তাহার আনন্দ; শিশু দেখে, তাহার পিতার ভোজনের সময় ভৃত্য আসিয়া ব্যজন করে, সেও আনন্দে পাখা হাতে করিয়া ভৃত্যের উপর ঈর্ষ্যা করিয়া ব্যজন করিতে গিয়া পাখা গায়ে মারিয়া কি একটী অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করে; তাহার পিতাও ব্যজন পরিবর্ত্তে পাখার আঘাত খাইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই শিশুর কথা যেথা সেথা বলে, শিশুকে নানাবিধ বসন ভূষণ ভোজ্য সামগ্রী দেয়, কিন্তু তাহাতে শিশুর লক্ষ্য নাই; ভোজন অন্তে ভৃত্য পদসেবা করিতেছে, টর টর করিয়া আসিয়া পদসেবা করিতে বসে, পদসেবা না করিতে পাইলে তাহার ক্ষোভ। সে সেবা করে, পিতা হাসে, সেও হাসে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। জগৎপিতার সেবকও সেইরূপ। পিতার সেবার নিমিত্ত কোটী কোটী দেবদূত উপস্থিত আছে, পিতার সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি সেবক সেবা করিতে যায়। আনন্দময় পিতা আনন্দে হাসেন, সেবকও আনন্দে হাসে; মান, মর্য্যাদা, ধন, জন যাহা আনন্দময় পিতা তাহাকে আনন্দে বিতরণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। বালভাবাপন্ন ঈশ্বর-সেবক সেবায় কি আনন্দ, কেবল তিনিই বুঝেন; এ জগৎপিতার বালক পিতৃসেবার প্রয়াসী, আনন্দময় পিতৃসেবায় আনন্দময় হইয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্ববিৎ হিউম (Hume) সাহেব বলেন

যে, সৎকার্য্য এতই সৎ, তাহাতে ঐহিক এত আনন্দ যে, পাদরিরা তাহার পারমার্থিক ফল কেমন বর্ণনা করেন, তাহা বুঝিতে পারেন না। এই কার্য্যই ত আনন্দ, যিনি সৎকার্য্যশীল, একথার মর্ম্ম কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন। পাপের পথ যে কণ্টকময়, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বহুরূপিণী মায়া মনোহরণ করিতেছেন, মুগ্ধচিত্ত কাঁটার উপর ছুটে, পিশাচী জানিয়াও পিশাচী বলে না—মুগ্ধচিত্ত বিবেক-রহিত!

যৌবন-পদার্পণে, ভোগ্যবস্তুদর্শনে, আশার প্রলোভনে, সংসার সুখাগার ভাবি। মায়ার বৈষম্য উপলব্ধি হয় না, বুঝিতে পারি না যে, সুন্দর সংসার মৃত্যুর ক্রীড়াস্থল। ক্ষয়ের নাম বৃদ্ধি; যতই দিন যায়, ততই মৃত্যুর নিকট অগ্রসর হই। সুখ দুঃখের সুচনা মাত্র। দেখিতে পাই, যে সকল বস্তু আমার প্রয়োজন বিবেচনা করি, ধন-বিনিময়ে তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু ধন হইলে ধনের মায়ায় ধন বিনিময় করিতে পারিব কিনা, সে সকল বস্তু ভোগের শক্তি আছে কিনা, ভোগের শক্তি থাকিলে সে সকল সুখপ্রদ কিনা, এসকল প্রশ্ন হৃদয়ে উঠে না। ধনই একমাত্র কামনা হইয়া উঠে। ভোগের নিমিত্ত, সঞ্চয়ের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের নিমিত্ত, ধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হয়। কিন্তু চিত্তের তমোগুণবশতঃ তাহা সুলভ পরিশ্রমে অর্জ্জন করিতে চাহে। কেহ বা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, পরিশ্রমে কাতর না হইয়া নিয়ত কার্য্যে বিরত থাকে, কিন্তু কার্য্যের এমনই গুণ, সকাম কার্য্য হইলেও অনেক পাপস্পৃহা নিবারণ করে। শ্রমী লোক মিথ্যা কথা, মিথ্যা গল্প, পরচর্চ্চা, অহেতু পরের অনিষ্ট কল্পনা, জুয়াচুরি, ঠকবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। যিনি যথার্থ কার্য্যকুশল, তিনি অনেকটা বুঝিতে পারেন, নীতি-বিরোধী হইলে কার্য্যে তাদৃশ সুফল ফলে না; যোল আনা দেওয়া নেওয়া করেন, নিজ লাভের নিমিত্তই প্রতারণা করেন না। সকাম কার্য্যে যদি এরূপ হয়, তবে নিষ্কাম কার্য্যে যে অমৃত উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আপত্তি উঠে যে, আমার পুত্রকলত্র ভাসাইয়া দিয়া কি নিষ্কাম কর্ম্ম করিব? পরমহংসদেব উপদেশ দিয়াছেন, সত্য, যে "ঈশ্বরের কার্য্য ভাবিয়া কার্য্য করিব," কিন্তু পরকে আপনার পুত্রের ন্যায় কিরূপে করিব? চেষ্টা, আর অপর উপায় নাই। তুমি যদি নিষ্কাম কার্য্য কর, তাহাতে যদি অমৃত লাভ হয়, তোমার পুত্র পরিবারও তোমার দৃষ্টান্তে নিষ্কাম কার্য্যে ব্রতী হইয়া আনন্দের অধিকারী হইবেন। সকাম হইয়া পরিবারের জন্য অর্থ রাখিয়া যাইতে চাও, কিন্তু নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও যে, সংসারে সকলেই অর্থ রাখিয়া যায়, কিন্তু যাহাদের নিমিত্ত রাখে, প্রায় তাহাদের ভোগ হয় না। যদি কোন উত্তরাধিকারী ধনরক্ষায় সমর্থ হন, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যকের ন্যায় ধন রক্ষা করিতেছেন এবং শত শত কুকার্য্য করিতেছেন, যাহার জন্য তুমি দায়ী। দেখিতে পাইবে, স্ত্রীর নিমিত্ত ধন রাখিয়া গিয়া অনেকেই পিতৃপিতামহের আবাস ব্যভিচারের বিহারস্থল করিয়াছেন, পুত্রকে ধন দিয়া লম্পট, পরপীড়ক, অত্যাচারী করিয়াছেন। অর্থ-দানে দুষ্কর্ম্মান্বিত উত্তরাধিকারী প্রায়ই দেখিতে পাইবেন, কিন্তু যে মহাত্মা নিজের সন্তানের নিমিত্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উত্তরাধিকারী এই অতুল সম্পত্তি করগত করিয়াছেন, তিনি আপনার হিত, উত্তরাধিকারীর হিত, জগতের হিত, পরহিত উদ্দেশ্যে, হিতকারী দৃষ্টান্তে, মহাহিত সাধনে

সক্ষম হইয়াছেন। তিনি যথার্থ মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। পশুর সহিত কেবল তাঁহারই মনুষ্যত্ব প্রভেদ, নচেৎ স্বার্থদ্বারা পাশব কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য হয় না, যিনি মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান, মনুষ্যত্ব যাঁহার আকাঙ্ক্ষা তিনি নিষ্কাম কার্য্যের আদর করিবেন।

উপসংহারে আমার ভক্তের চরণে প্রার্থনা, যেন কার্য্যে আমার অধিকার হয়, কিন্তু ফলাফল ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারি। আমি মনে মনে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমি যতই কেন নিষ্কাম কার্য্যের চেষ্টা করি না, আমার কলুষিত মন অতি সৎকার্য্যের সহিত দোষ মিশ্রিত করিবে; ফল ত আমার আয়ত্তাধীন নয়। সুফল ফলিবে বিবেচনায় কার্য্য করিতে গিয়া কত অন্যায় ফল ফলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চোর অন্যের বাটীতে চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাকে জীবন উপেক্ষা করিয়া ধরিলাম, জেলে দিলাম, তাহাদের পরিবারবর্গকে অনাথ করিলাম; দয়া করিয়া একজনকে চাকরি দিলাম, কর্ম্মক্ষম শত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলাম; নিষ্কাম কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে সক্ষম হই না, আমার মন কলুষিত। নিষ্কাম কর্ম্ম মুখে বলা যায়, কিন্তু দেখিতে পাই, কেবল ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারেন। অতএব কার্য্যের ফল যেন আমি ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করি। অতি কঠিন কার্য্যে সক্ষম হইয়া যেন কার্য্যগরিমা না রাখি। শাস্ত্রে শুনিতে পাই, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, কার্য্যের গরিমা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহাদের একটী তৃণের উপরেও অধিকার নাই। সত্যই, কাহারও কার্য্যের উপর অধিকার নাই। নিজ জীবন সমালোচনায় পদে পদে তাহার উপলব্ধি হইবে। আমি কর্ত্তা নই, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য হয় নাই, একটু স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর আমায় কার্য্যে অধিকার দিন, কিন্তু ফলাফল ও কার্য্যগরিমা তাঁর, 'আমার' যেন স্বপ্নেও না বলি।

অন্নচিন্তা।

অন্ন-চিন্তা-বিহ্বল বাঙ্গালাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে দারিদ্র্যের ভীষণ ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে দারিদ্র্য ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিতেছে, তাহার কিসে প্রতীকার হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই বিষম অন্ন-চিন্তা-সমস্যা বিষয়ে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের একান্ত ঔদাসীন্য। দেশে দারিদ্র্যাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে দিলে, রাজনীতি বল, ধর্ম্মনীতি বল, আর সমাজ-সংস্কার বল,—সকলই সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। সচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দই নীতি ও সংস্কারের ভিত্তি, কিন্তু সেই ভিত্তি দৃঢ় না করিয়া, তদুপরে রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকা স্থাপন করিতে প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। এতদ্দ্বারা কেহ না মনে করেন যে, আমরা সংস্কারের বিরোধী অথবা সংস্কারকদিগের উদ্যম ও উৎসাহের আমরা অপক্ষপাতী।

এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইবার পূর্ব্বে ইহার মূল অন্বেষণ করা আবশ্যক। রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইলে, তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করা অতি সহজ।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ ছিল এবং এইক্ষণেই বা কিরূপ হইয়াছে, এই দুইটী অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে এখনই বুঝিতে পারা যাইবে, রোগের মূল কি ?

ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, জন-সংখ্যা ও ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ নির্ভর করে। দিন যতই যাইতেছে, সমাজের কলেবর ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু সমাজের অভিনব অবস্থায় লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িত, মৃত্যুসংখ্যা তখন প্রবল থাকায় জন্মসংখ্যার বৃদ্ধিতে কিছু ক্ষতি করিতে পারিত না। সেকালে মৃত্যুসংখ্যার পরিমাণ অধিক ছিল। সভ্যতার প্রাচুর্ভাববশতঃ এবং শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে এক্ষণে মৃত্যুসংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। তখনকার মারীভয়ে লোকে সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা ব্যতীত, স্বাস্থ্য-বিষয়ক জ্ঞান, তখনকার লোকের অপেক্ষা এখনকার লোকদিগের মধ্যে সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান থাকিলে মানুষে সাবধানে থাকিতে পারে, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে,—গ্রাম, নগর, গৃহ, দ্বার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে, সুতরাং সহজে লোক মরিতে পায় না। সহর ও পল্লীগ্রামের চিত্র পরস্পর নিকটে রাখিয়া দৃষ্টি করিলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন একটী পল্লীগ্রামের আয়তন, মোট অধিবাসীর সংখ্যা এবং বার্ষিক গড় মৃত্যুসংখ্যার সহিত কলিকাতা মহানগরীর মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, কলিকাতার সাধারণ স্বাস্থ্য, পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতা, জল নিকাশের সুব্যবস্থা, চিকিৎসকের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি নানা কারণে কলিকাতার গড় মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম। মফস্বলের যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে, তথাকার মৃত্যুসংখ্যা আবার সুদূর ও অগম্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অনেক কম। ইহা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে লোক-বৃদ্ধির একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তবে তাহা সাক্ষাৎ হউক বা পরোক্ষ হউক।

পুনরায় শান্তি ও বিগ্রহের সহিত লোক সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধিরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এক একটা যুদ্ধ বিগ্রহে এক এক দিনে কত সহস্র সহস্র লোক কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কালকবলে পতিত হয়, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রকৃত যুদ্ধে যাহারা মরে, তাহারা ত মরেই,—তাহা ব্যতীত বিজয়ী সেনাগণের লুণ্ঠন ও প্রপীড়নে এবং হত্যায় কত শত জীবন যে নষ্ট হয় তাহারও সংখ্যা নাই। তাহার পরে, যুদ্ধ বিগ্রহের আশুফলস্বরূপ দেশমধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়, অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হয়, শব-দেহ বিগলিত হইয়া ভীষণ মহামারী উপস্থিত করে। এই সকল কারণে কত শত নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সংখ্যা নাই,—তাহা আদমসুমারিতেও * পাওয়া যায় না। শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহও বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত নেপোলিয়ান যে ভীষণ যুদ্ধাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

* আদমসুমারি—লোকসংখ্যা-গণনা, Census

সেই অমিততেজ মহাপুরুষ যখনই যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই দশ, বিশ, পঞ্চাশ, ষাট হাজার মনুষ্য-শরীর হেমন্ত-বাত্যাহত পত্রের ন্যায় ভূমিশায়ী হইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে কত সংসার উৎসন্ন গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? এক্ষণে ত সহজে যুদ্ধ উপস্থিত হয়ই না, এবং হইলেও তাহা অধিক দিন স্থায়ী অথবা বর্ব্বরকালের ন্যায় অযথা শোণিত-স্রোতে ধরা প্লাবিত হইতে পায় না।

সাময়িক দুর্ভিক্ষেও লোক-বৃদ্ধির স্রোত অনেক পরিমাণে দমন করিয়া থাকে। দেশমধ্যে দারিদ্র্যের প্রবাহ বহমান হওয়া অপেক্ষা সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হওয়া বরং শ্রেয়। অনশনে জীবন ধারণ করিয়া, দারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষে, যুদ্ধ বিগ্রহে, বা মহামারিতে প্রাণত্যাগ করা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

দুর্ভিক্ষের দিনে যেসকল মহানুভব ব্যক্তিগণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ মুক্ত-হস্ত হয়েন,—যে সকল মহাত্মাগণ এই শাপগ্রস্ত নরনারীগণের সাহায্যার্থ দেহ মন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা ধন্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈদৃশ সাময়িক সাহায্যে দেশের স্থায়ী কোন উপকার হয় না। অনাহারী নরনারীগণকে অন্ন দান করা যেমন মহৎ কার্য্য, অন্য দিকে, তাহারা যাহাতে অন্ন-কষ্টের ও দারিদ্র্যের ক্রীড়াপুত্তলী হইতে না পায়, তাহারও উপায় চিন্তা করা উচিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতীকারের প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দিন দিন যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই অনুপাতে যদি দেশের ধন বৃদ্ধি হইত, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে দেশে দারিদ্র্য স্থান পাইত না, বরং ইংরাজ-রাজের শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়া, আমরা সমধিক পরিমাণে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিতাম,—আত্মীয় পরিজন লইয়া সুখে দিন কয়টা কাটাইয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুসভ্য রাজনীতি ও শান্তিময় রাজ্য লোক-বৃদ্ধির বিশেষ অনুকূল, এইজন্য ইংরাজের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা এত অধিক। ইংরাজ রাজত্বের পক্ষে ইহা মহা গরিমার কথা, এবং ভারতবাসীর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়! তবে পরিতাপের বিষয় দারিদ্র্য-বিস্তার। দারিদ্র্য নিবারণের উপায় আমাদিগের স্ব স্ব আয়ত্তাধীন কিন্তু আমরা নিতান্ত অদূরদর্শী ও অকর্ম্মণ্য। তাহা না হইলে এরূপ শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়া শিক্ষার সাহায্য পাইয়াও আমরা স্ব স্ব উন্নতি-কল্পে মনো-নিবেশ না করি কেন? সমাজের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধন করিবার এমন সুযোগ ভারতে কখন ঘটে নাই।

এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, ইংরাজি শিক্ষা ও বিলাতি সভ্যতার দোষে আমাদিগের এইরূপ দারিদ্র্য ঘটিতেছে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে, আমাদিগের নিজ শিক্ষার দোষে আমাদিগের দুর্গতি ঘটিতেছে। আমরা ইউরোপীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি না এবং মিশিবার সুযোগ পাই না, অথচ আমরা তাহাদিগের আচার ব্যবহার নকল করিয়া থাকি, ইহাই যত অনর্থের মূল। ইংরাজের পোষাক, ইংরাজের আহার, ইংরাজের সামাজিক আচার ব্যবহার, ইংরাজের দেশের, ইংরাজ জাতির উপযোগী, তোমার আমার নহে। আমরা সাহেবের বাহ্যিক বেশভূষা ও আচরণ অনুকরণ করি,

কিন্তু আমরা তাহাদিগের সেই অদম্য উৎসাহ, অচল অধ্যবসায়, কার্য্যে তৎপরতা প্রভৃতি যেসকল সদ্‌গুণ থাকায় আজ ইংরাজ জাতি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, সেসকল সদ্‌গুণরাশির অনুকরণ আমরা করি নাই এবং করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইংরাজ অসুরের ন্যায় পরিশ্রম করিতে জানে, গণ্ডারের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কাজেই কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্রোরপতি হইয়া বিলাত চলিয়া যায়, আমাদিগের কুলিগিরি সার! আমরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহার করিয়া বেলা ১১টার মধ্যেও আপিসে গিয়া পৌঁছিতে পারি না, কাজেই সাহেব কর্ণ-মর্দ্দন করিয়া দেন, আর আমরা এমনই নির্লজ্জ যে, আবার সেইজন্য রাজদ্বারে নালিশ করিতে যাই! সাহেবেরা কাজ চায়, কাজের জন্য আহারাদির কথা মনে আনিবার অবসর পায় না,—আর আমরা আহার নিদ্রার জন্য কাজ ভুলিয়া যাই। সাহেব ও বাঙ্গালির এই প্রভেদ—এবং প্রভেদটুকু বড় সামান্য নহে,—আকাশ—পাতাল—। [ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তন্ত্রে আছে,

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং সিদ্ধির্বরাননে।

আর, রামপ্রসাদও গাহিয়াছিলেন, 'তীর্থ-গমন মিছা ভ্রমণ, মন উচাটন কোরো না রে।' এইসকল মহাজনবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আমাদের নিজেদের বিলাস-গৃহকেই তীর্থ ভাবিয়া সেখানেই বিচরণ করি, আর মনে মনে গিরি-কন্দরে যোগাসনে উপবিষ্ট দীর্ঘ-শ্মশ্রু পুরুষ-বিশেষের কল্পনা করি।

কল্পনা ছাড়িতে হইবে, কার্য্যতঃ দেখিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতি কল্পনা পাইলে আর কিছু চাহে না; বাঙ্গালী জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা', বিদ্যাপতির 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল' চাহে। জাতীয় জীবনে এসকলেরও উপযুক্ত স্থান আছে, তবে শুধু কল্পনা-তরঙ্গে গা ঢালিলে চলিবে না। যে কল্পনা মদিরার মত্ততার ন্যায়, প্রতিক্রিয়ায় মানুষকে অবসন্ন ও নিস্তেজ করে, যে কল্পনা-প্রিয়তা নানারূপ অপার্থিব ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়া, এই দুঃখময় সংসারকে আরও দুঃখময় করিয়া দিতে চাহে, যে কল্পনা দৈব বা অদৃষ্ট নামে অপরূপ জীবের সৃজন করিয়া, তাহারই হস্তে আত্ম-সমর্পণ করাইয়া, সর্ব্বপ্রকার উন্নতি—যাহার উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করে—সেই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে শিখায়, হে বাঙ্গালী, ধীরে ধীরে তাহা ত্যাগ করিতে শিখ; কার্য্য-গত-প্রাণ ও বীর্য্যবান হও।

প্রসঙ্গ-ক্রমে, বাঙ্গালীর গুণের কথাও বলিব। ভ্রমণে বুঝিয়াছি, বাঙ্গালীর উপর, ভারতীয় সকল জাতিরই বুদ্ধিমান বলিয়া খুব বিশ্বাস। বাঙ্গালী যেন বিদেশীয়ের নিকট চিরকাল এ গৌরব রাখিতে পারে। (ক্রমশঃ)



দিব্য বাণী

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৫।১০

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

(পূজা-জ্ঞানে কাজ করে যেই জন
কখনো তারে
কর্মের ফল বাঁধিতে নারে।)
ঈশ্বর-তরে করা যায় যাহা
তাছাড়া যা কিছু আর
করে লোক, সেই কর্মের ফল
বন্ধন আনে তার।
ঈশ্বরার্থে কাজ কর অনাসক্ত হয়ে—
ফল না চেয়ে॥

(তিনি প্রভু আমি দাস তাঁর—এই
ভাব নিয়ে) যেই কর্ম করে
ফলে আসক্তি না রেখে, নিজেরে
সঁপে দিয়ে তাঁর চরণ 'পরে,
কাজ করিলেও সে কাজের ফলে,
পাপে, সে লিপ্ত হয় না তবু,
পদ্মের পাতা জলেতে যেমন
থাকিলেও জলে ভেজে না কভু॥

কথাপ্রসঙ্গে

ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগ

লক্ষ্য ও তাহা লাভের উপায়

ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে অভ্যাসের ফলে মন যখন ভগবান ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তায় যায় না, সম্পূর্ণ স্থির হয়, তখন সেই 'নান্যগামী' চিত্তের দ্বারাই মানুষ ভগবানলাভ করে—"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্য-গামিনা। পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানু-

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একথা বলিয়াছিলেন। ভগবানলাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়—অভ্যাসসহায়ে তাঁহাতে চিত্ত স্থির করা। এই অভ্যাস-সাধনার পথ অবশ্য বহু আছে—জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির পথ, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক: চিত্তকে ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তায় না যাইতে দেওয়া, নান্যগামী করা।

সব পথেরই লক্ষ্যও যে এক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেকথাও বহুভাবে বলিয়াছেন। সে লক্ষ্য হইল স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহাতীত অদ্বিতীয় পরম সত্তার সঙ্গে নিজের একাত্মানুভূতি। ইহাই ভগবানলাভ, পরমপদপ্রাপ্তি, ব্রহ্মলাভ নিজেকে জীবাত্মা আর ভগবানকে পরমাত্মা বলিয়া ভাবিলেও লক্ষ্য উভয়ের একত্বানুভূতি। ভগবানকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিলেও লক্ষ্য ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদবোধ। ভগবানকে বাসুদেবাদি সাকার রূপে, আমাদের অন্তর্যামী চালক রূপে, সর্বব্যাপী পরম পুরুষ রূপে, ঈশ্বর রূপে ভাবিলেও লক্ষ্য তাঁহার সহিত অনন্যতা—একত্ববোধ—'অনন্য ভক্তিতেই সেই পরম পুরুষকে পাওয়া যায়', 'জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।'

গীতার পটভূমি

ভগবানের চিন্তায় এরূপ অনন্যচিত্ততা-অভ্যাসের জন্য কোন্ পথটি সর্বসাধারণের উপযোগী? অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মূল বক্তব্য সেইটিই। গীতার পটভূমিও সেভাবেই রচিত।

গীতার পটভূমি আমাদের সকলেরই বিদিত। কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আত্মীয়গণ ও শিক্ষাগুরুকে বিপক্ষে যুদ্ধার্থ সজ্জিত দেখিয়া অর্জুন সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া বসিলেন, 'যুদ্ধ করিব না, আমার অঙ্গ অবশ হইয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীর কাঁপিতেছে—হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িতেছে।'

পূর্বেই বলিয়াছি, গীতা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইলেও আমাদের সকলের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিয়াছেন, আমাদের সকলেরই সমস্যার সমাধানকল্পে বলিয়াছেন। এই পটভূমিটি তাই অনবদ্য। কোন শান্ত নির্জন তপোবনে, অরণ্যে বা গিরিগুহায় শিষ্যের সহিত বসিয়া নয়, রাজা জনক বা পরীক্ষিতের দ্বারা আয়োজিত ধর্মালোচনা-সভার মতো কোন সভায় নয়, শিষ্যের সংশয়ের সমাধান করিতেছেন সমস্যার মাঝখানে, বাস্তব পরিবেশে দাঁড়াইয়া। এখানেই পটভূমিটির বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ হইতে দূরে থাকিয়া আমরা যখন কোন উচ্চতত্ত্ব শুনি বা চিন্তা করি, তখন ভাবি বাস্তবক্ষেত্রে অসীম মনোবল লইয়াই চলিতে পারিব, সমস্যা বলিয়া কিছু থাকিবে না। কিন্তু ইহা তো আমাদের সকলেরই জানা

কথা, কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই ঠিক সেরূপ হয় না, স্বামী বিবেকানন্দের কথিত গল্পের সেই হরিণের মতোই অবস্থা হয় আমাদের। হরিণটি তার শাবকের কাছে নিজ শক্তির গর্ব করিতেছিল, শাবকটি হাঁ করিয়া শুনিতেছিল। এমন সময় শিকারী কুকুর ডাকিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণটি শাবককে ফেলিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। শাবকটি কোনরূপে জঙ্গলে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল। কুকুর চলিয়া যাইবার পর হরিণ ফিরিয়া আসিলে সে প্রশ্ন করিল, 'মা, এটা কি হ'ল? তুমি তোমার শক্তির এত গর্ব করছিলে, আর কুকুরের ডাক শুনেই পালিয়ে গেলে—এত ভয় পেয়েছিলে যে আমার কথা চিন্তা করারও সময় পাওনি!' হরিণটি বলিল, 'বাবা, এরকমই হয়। অন্য সময় আমি নিজেকে শক্তিমান ভাবি, কিন্তু কুকুরের ডাক শুনলেই কেন জানি না সব গুলিয়ে যায়।' গল্পটি বলিয়া স্বামীজী মন্তব্য করিয়াছেন, আমাদেরও এমনি হয়, আমরা অন্য সময় মনে করি ঠিক আছি, কিন্তু ইন্দ্রিয়-রূপ কুকুর যখন ডাকিয়া উঠে, তখন সব গুলাইয়া যায়।

গীতার পটভূমিতে দেখি, অর্জুনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল; কুকুর অবশ্য এখানে ইন্দ্রিয় নয়—অর্জুন জিতেন্দ্রিয়—কুকুর এখানে স্বজন-স্নেহ। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে, এমনকি যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনার সময় হইতেই এ বিষয় লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের একাধিকবার কথা হইয়াছে, জ্ঞাতিভ্রাতা গুরু পিতামহাদির সঙ্গে যে কারণেই হউক, আদৌ যুদ্ধ করা উচিত কি না। শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুন সে-সব সময় নিঃসংশয়চিত্তও হইয়াছিলেন। হইয়াছিলেন বলিয়াই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আত্মীয়গণকে দেখা মাত্র স্বজনস্নেহরূপী কুকুর ডাকিয়া উঠিল, আর সে ডাক শোনা মাত্র মহাবীর, নির্ভীক, যুদ্ধে চিরবিজয়ী অর্জুনেরও দেহমন অবসন্ন হইল, গাণ্ডীব হস্তচ্যুত হইল।

ইহা হৃদয়-দৌর্বল্য। জীবনযুদ্ধে আমাদের বহুবার এই ধরণের দুর্বলতার সম্মুখীন হইতে হয়। অন্তর্যামিরূপে ভগবান যাঁহাদের অন্তর হইতে শ্রীকৃষ্ণের মতো বজ্রকণ্ঠে সজাগ করিয়া দেন, তাঁহারাই ইহা কাটাইয়া উঠিতে পারেন।

যখন আমরা এই দুর্বলতার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে চাই তখন যেরূপ আচরণ করি, গীতার পটভূমিতে তাহাও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আমরা তখন দুর্বলতা-বশে নিজে যাহা করিতেছি, সেটিকেই আদর্শ বলিয়া, দুর্বলতাকেই মহত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিতে চাই, যাহা আদর্শ তাহা জীবনে রূপায়িত করিতে চাই না। গীতার পটভূমিতেও তাহাই দেখানো হইয়াছে—অর্জুনও ঠিক তাহাই করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি বুঝাইতে লাগিলেন, তাঁহার যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত যেন দুর্বলতা নয়, উহা উচ্চ আদর্শসম্মত। বলিলেন, ইহাই তো মনুষ্যত্ব—আত্মীয় ও গুরুজনদের হত্যা করিয়া তাঁহাদের রক্তমাখা রাজ্য ভোগ না করিয়া তিনি বরং ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীদের মতো ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিবেন। বলিলেন—এ যুদ্ধ করা মহা পাপ-কর্ম, বড়ই সৌভাগ্য যে এই পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই এ বিষয়ে সজাগ হইয়াছেন! বলিলেন, এ কর্মে শুধু তাঁহাদেরই পাপ হইবে না, ইহার পরিণাম সমাজকেও ধর্মহীন করিয়া সেখানে বহু অনর্থ সৃষ্টি করিবে। আর বলিলেন, তিনি রাজ্য, নামযশ, সুখভোগ এসব কিছুই তো চান না, তিনি শ্রেয়ঃ, জীবনের

পরমকল্যাণ চান, ভগবানলাভ করিতে চান—এ যুদ্ধ তো তাহার পরিপন্থী!

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে বাস্তবক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয়, যে সব সন্দেহ জাগে, মন যেভাবে আমাদের প্রতারণা করিতে চায় তাহারই সুস্পষ্ট ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশদানচ্ছলে আমাদের কল্যাণ-পথের উপর আলোকসম্পাত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে স্পষ্টাক্ষরে দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার এই যুদ্ধ না করার ইচ্ছা মনের দুর্বলতা-সঞ্জাত, কোন উচ্চ আদর্শ-প্রণোদিত নয়। পরে তাঁহার দুর্বলতাচ্ছন্ন মনে যে-সব সন্দেহের উদয় হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া সমগ্র গীতায় বিস্তারিতভাবে তাহা বলিয়াছেন।

প্রথমেই জীবনের একটি মহাসত্যকে তুলিয়া ধরিলেন অর্জুনের কাছে: গুরু ও আত্মীয়গণকে বিনাশ করিতে হইবে ভাবিয়াই তো তোমার এত কথা? কিন্তু বিনাশ বলিয়া, মৃত্যু বলিয়া মানুষের কিছু নাই-ই। আমরা সবাই জন্মের পূর্বে ছিলাম, মৃত্যুর পরেও থাকিব। যেটি জন্মায় ও বিনষ্ট হয়, সেটি আমাদের দেহ, আমরা নই। এ দেহ হইতে আমরা পৃথক, যেমন আমাদের পোষাক হইতে আমরা পৃথক্। একটি পোষাক ছাড়িয়া ফেলা কি আমাদের বিনাশ? নিশ্চয়ই নয়। দেহত্যাগও ঠিক ঐরকমই। একটি দেহ ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলা হয়, নূতন দেহ গ্রহণকে বলা হয় জন্ম। এভাবে একটি দেহ গ্রহণ করিয়া এবং জীর্ণ হইলে তাহা ত্যাগ করিয়া অপর একটি নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া আসল মানুষ, দেহী, অমর জীব জন্ম-জন্মান্তরের পথে চলে। অগ্নি, বায়ু, জল, অস্ত্র—কোন কিছুরই সাধ্য নাই যে, মানুষের এই আসল সত্তাকে বিনষ্ট করে—তাহারা বিনাশ করিতে পারে শুধু দেহীর পোষাককে, দেহকে। কাজেই ইহা লইয়া এত ভাবিবার কি আছে?

পাপের কথায় বলিলেন: কোন কর্ম করিবার সময় যদি আমরা সুখ, সাফল্য প্রভৃতি কিছু লাভের আশায় তাহা করি, কর্মে আসক্ত হইয়া করি, তাহা হইলেই সে কর্মের শুভাশুভ, পাপ-পুণ্যাদি ফল অবশ্য আমাদের স্পর্শ করে। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করিয়া কাজ করিলে কর্মফল আর আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি যেইভাবে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে কোন পাপ বা পুণ্য তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী—ভগবানলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে না করিয়া যাগযজ্ঞাদি কর্মের মাধ্যমে ইহলোক ও স্বর্গাদি পরলোকে ভোগকেই যাহারা সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলিয়া মনে করে, পাপ-পুণ্য তাহাদেরই স্পর্শ করে। ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত এবং সে আসক্তির ফলে বিবেকহীনচিত্ত সেই সব ব্যক্তিদের কথামতো যাহারা চলে, দেহান্তে স্বর্গেই যাক আর সেখানেই যাক বারবার তাহাদের জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হইতে হয়। পাপপুণ্য তাহাদেরই কথা।

এ পাপের কথায় পরে বলিয়াছেন, পাপ-পুণ্যের রাজ্যের অতীত চরম সত্যকে আশ্রয় করিলে তাহার ফলেই কর্মজনিত সব পাপের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়—'জ্ঞানাগ্নিতে সব কর্মফল পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়', 'আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সব পাপ হইতে মুক্ত করিব।' ভগবানের শরণাগতি আর জ্ঞানলাভ—উভয়ই চরম সত্যকে আশ্রয়

করা—দেহ-মন-বুদ্ধিতে আমাদের যে 'আমি'-বোধ জাগে, সেখান হইতে তাহাকে সরাইয়া লওয়া;—যাহা ছাড়া জ্ঞানলাভও হয় না, যথার্থ শরণাগতিও আসে না।

শ্রেয়োলাভের, জীবনের পরমকল্যাণলাভের কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া এবং কর্মের সাফল্য ও অসাফল্যে চিত্তকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত বা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে না দিয়া সর্বাবস্থায় অচঞ্চল রাখিয়া—যোগস্থ হইয়া—কাজ কর, এই যুদ্ধই কর, তাহা হইলে ইহারই মাধ্যমে জীবনের পরমকল্যাণলাভ, শ্রেয়োলাভ, ভগবানলাভ করিতে পারিবে। কোন কর্ম-বিশেষ নয়, ঠিক ভাব লইয়া উহা করিতেছ কি না তাহাই হইল কর্মের মাধ্যমে শ্রেয়োলাভের মূল কথা। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, আসক্ত হইয়া যে কর্ম করিলে তাহার ফল আমাদের জন্ম-জন্মান্তর-চক্রে ঘুরাইতে থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া, অনাসক্ত হইয়া, বা কেবল ঈশ্বরের তৃপ্ত্যর্থে সেই কর্মই করিলে তাহা আর আমাদের বন্ধনের কারণ হয় না, তাহাই ভগবানলাভ করাইয়া দেয়। দেহের বিনাশেও যে 'আমি'-বোধ বিনষ্ট না হইয়া বারবার দেহান্তর গ্রহণ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের পথে ভ্রমণ করে, আমাদের সেই জীবত্বও, মনবুদ্ধি প্রভৃতিতে 'আমি'-বোধও চরম সত্য নয়। স্থূলদেহ যেমন আমাদের স্থূল পোষাক, এই মনবুদ্ধি প্রভৃতিও তেমনি আমাদের সূক্ষ্ম পোষাক। আসলে আমরা সকলেই সর্ববিধ দেহরহিত নিত্যানন্দময় পরম সত্তা, যাহাকে ভগবান বাসুদেবও তাঁহার নিজের অব্যক্ত পরমভাব, তাঁহার পরম ধাম, বিষ্ণুর পরম পদ প্রভৃতি বলিতেছেন, যাহাকে ব্রহ্ম বলিতেছেন। ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া, অনাসক্ত হইয়া, সাম্যে স্থিত হইয়া, বা ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে কর্ম করিলে তাহার ফলে চিত্ত ক্রমে বাসনাশূন্য হইয়া সমাহিত হয় এবং তখন এই সর্ববিধ দেহাতীত চরম পরম সত্য প্রত্যক্ষ হয়। এই নিত্য অদ্বয় সত্তাকে নিজ স্বরূপ-রূপে প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব পর্যন্তই নিজেকে দেহী বলিয়া, জীব বলিয়া মনে হয়; এবং ইহা যে ঈশ্বরেরও পরম ভাব, স্বরূপ, তাহা না বুঝিয়া তাঁহাকেও দেহবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

এ যুদ্ধ করিলে তাহার পরিণাম সমাজকে অধর্মগ্রস্ত করিয়া বহু অকল্যাণের আকর করিয়া তুলিবে,—অর্জুনের এই কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধ করিলে নয়, না করিলেই তাহার পরিণাম সমাজে বিষময় হইবে; কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তাহাই আদর্শজ্ঞানে অনুসরণ করে। (এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে, অর্জুনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলেই কঠোর কর্তব্য সম্মুখে আসিলে হৃদয়-দৌর্বল্যকেই আদর্শের চাকচিক্যমণ্ডিত করিয়া তাহা সাধনে বিরত হইবে।)

কর্মযোগ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের যুদ্ধ না করিবার মূল কারণটিকে, স্বজন-হত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া দুর্বলতাকে, নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন শুধু কথায় বলিয়া নয়, প্রত্যক্ষ করাইয়া যে, ঈশ্বরেচ্ছাতেই বিশ্বের ছোট-বড় সব ঘটনাই ঘটিতেছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই দুর্যোধনাদির বিনাশকাল সমাগত, তাহারা বিনষ্ট হইবেই—অর্জুন উহার নিমিত্ত মাত্র; আর,

স্বয়ং সেই ঈশ্বর, ধরাধামে অবতীর্ণ এই প্রথম নয়, ইহার পূর্বেও তিনি বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। সনাতন ধর্মের দুটি তত্ত্ব, পুনর্জন্মবাদ ও অবতারবাদ শ্রীকৃষ্ণের মুখে

শুনিয়াও অর্জুনের সর্বসংশয় ছিন্ন হয় নাই, তাই প্রত্যক্ষের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষই যে সর্ব-সংশয় ছিন্ন করিতে পারে, এবং সে প্রত্যক্ষ যে কেবল মন্দিরাদিতে বসিয়াই নয় কর্মক্ষেত্রেও হইতে পারে,—যুদ্ধক্ষেত্রের মতো কর্মক্ষেত্রও যে মন্দিরে রূপায়িত হইতে পারে—এ ঘটনাটি যেন সেই সত্যেরই মূর্ত প্রকাশ।

আরো একটি কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন: মানুষের সংস্কার বড় প্রবল জিনিস, কাজেই প্রত্যেকের সংস্কারানুগ পথকেই ঈশ্বর-লাভের পথে রূপায়িত করাই সর্বাধিক ফলপ্রসূ। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া জ্ঞানপথে, রাজযোগের পথে, কর্মের পথে, ভক্তির পথে—সব পথেই সত্যলাভ বা ঈশ্বরলাভ করা যায় ঠিকই; পথ ভিন্ন হইলেও সবই একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়, বিভিন্ন লক্ষ্যে নয়। তবে পথ-নির্বাচন করিতে হয় সংস্কারানুযায়ী। সংস্কারের বিপরীত পথে চলিলে সংস্কারই জোর করিয়া সেখান হইতে ফিরাইয়া আনে।

কর্মের সংস্কারই—অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক, যুদ্ধ বা কোন রাজনৈতিক কাজ হউক, ক্ষেত-কারখানাদিতে উৎপাদন বা ব্যবসা হউক, কি চাকরিই হউক—কোন না কোন প্রকার কাজ করার সংস্কার আমাদের অধিকাংশেরই মধ্যে প্রবল। সব ছাড়িয়া সর্বক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় কাটাইবার অধিকারী কয়জন? জোর করিয়া সব ছাড়িয়া আমরা অনেকেই হয়তো নির্জনে চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু সেখানেও যদি মনে কর্মক্ষেত্রের, সংসারের, বিষয়ের চিন্তা উঠে, তাহাতে লাভ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তাহা ত্যাগ নয়, তাহা মিথ্যাচার। আবার, পূর্ণ সংযম অবলম্বনে রাজযোগের পথে চলিবার মতো সংস্কারই বা কয়জনের আছে? কর্মের সংস্কারই আমাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রবল। আর, ভক্তিপথেও আমরা সকলেই চলিতে পারি।

ভগবানলাভের জন্য এই সর্বসাধারণের উপযোগী পথই, ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগের পথই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন।

জ্ঞান বা ভক্তি কোন ভাব আশ্রয় না করিয়াও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, অনাসক্ত হইয়া সমত্ববুদ্ধি লইয়া কর্ম করিতে পারিলে তাহাতেই ভগবানলাভ হয় সত্য, কিন্তু জ্ঞান বা ভক্তির আশ্রয় ছাড়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য বা অনাসক্ত হওয়া বা সমত্ববুদ্ধি আসা বড় কঠিন। জ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম করার অধিকারীও বিরল; আমি দেহ-মনাদির অতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ—কাজকর্ম যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা প্রকৃতির নিয়মে চালিত হইয়া দেহমন প্রভৃতিই করিতেছে, আমি কিছুই করিতেছি না—এ ভাব লইয়া কাজ করিতে পারে কয়জন?

কিন্তু পরম সত্তাকে আমাদেরই মতো একজন দেহমনাদি বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাবিয়া, যেমন বাসুদেবকে ভগবান ভাবিয়া, তাঁহার তৃপ্তির জন্য কাজ করিতেছি, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র—যেমন করাইতেছেন তেমনি করিতেছি, কর্মফল তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছি—ফলে আমার প্রয়োজন নাই, আমি তাহার শরণাগত, তিনি যাহাতে আমার কল্যাণ বোঝেন সেইরূপ কর্মই করাইতেছেন—ইত্যাদি ভাব অবলম্বনে কর্ম আমরা সকলেই করিতে পারি। কাজতো আমাদের করিতেই হইতেছে, শুধু এই সহজ পথে, ভক্তি-আশ্রয়ে ভাবটির একটু মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া। ইহা আমরা ইচ্ছা করিলে সকলেই পারি।

কাজ করিবার সময় এই ভাব যাহাতে

আমরা বজায় রাখিতে পারি তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কাজ কর, যুদ্ধ কর, সেই সঙ্গে সর্বদা আমাকে স্মরণ কর।

'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।'

এভাবে চলিবার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। মন কি আর বলিলেই সর্বদা ভগবানের চিন্তায় স্থির থাকিবে? কাজের সময় সে কি বলিলেই 'তিনি করাইতেছেন,' 'তাঁহার পূজা করিতেছি' ইত্যাদি ভাবে সর্বদা স্থিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিবে? মোটেই না। মন অতি চঞ্চল, ভগবানকে ছাড়িয়া 'আমি-আমার' ভাবেই বার বার সে ফিরিয়া আসিবে। তবে অভ্যাসের দ্বারা এই চঞ্চল মনকে বশে আনা যায়। এই প্রসঙ্গেই অভ্যাসের কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পূর্বে একবার বলিয়াছেন। 'সর্বদা আমাকে স্মরণ কর, কাজও কর'— একথা বলিবার পর সেই অভ্যাসের কথাই তাই আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন। কাজ এবং ভগবৎ-স্মরণ একসঙ্গে করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা কর। এই অভ্যাসের ফলেই চিত্ত ক্রমে ভগবানে সর্বক্ষণ স্থির থাকিবে। সেই অনন্যচিত্ততার ফলেই ভগবানলাভ হইবে।

কর্মের ভিতর, সংসারের ভিতর থাকিয়াই যাঁহাদের ভগবানলাভের পথে চলিতে হইবে —যাঁহাদের সংখ্যাই সর্বাধিক - তাঁহাদের জন্য করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'মামনুস্মর যুধ্য চ' এই উপদেশই আধুনিক যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে: এক হাত দিয়া ভগবানের পাদপদ্ম ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাত দিয়া কাজ কর কর। যখন এভাবে ভগবৎ-স্মরণ ও কাজ একই সঙ্গে করিবার অভ্যাসের ফলে অনন্যচিত্ত হইতে পারিবে, তখন তিনিই কাজ কমাইয়া দিবেন, তখন দুই হাত দিয়াই তাঁহার পাদপদ্ম আঁকড়াইয়া ধরিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মকে পূজায় রূপায়িত করা'—কর্মক্ষেত্রকে পূজামন্দিরে পরিণত করা—একই বাণী অন্য ভাষায় উক্ত।

"কর্মযোগ—কর্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি [শশধর পণ্ডিত] যা শিখাচ্ছ। অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হ'য়ে, ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে পূজা জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।" ১।১১।৪

"তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করা;—কি না, কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না। যেমন পূজা জপ তপ ক'রছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয় কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।" ১।১০।৬

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত) নিউ ইয়র্ক

৭ই মার্চ, ১৮৯৯

প্রিয় রামদয়ালবাবু,

বিশেষ অনুগ্রহ করে ২৬শে জানুআরি যে পত্রখানি আপনি লিখেছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আমাদের প্রিয় যোগেন থাইসিসে ভুগছে জেনে খুবই দুঃখিত। তাকে আমার ভালবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন; বলবেন, তার সুস্থতা ও আশু রোগমুক্তির জন্য আমি সর্বদাই প্রার্থনা করছি।

অনুগ্রহ করে তার স্বাস্থ্যের বিস্তারিত বিবরণ জানাবেন কি? আপনার কি মনে হয়, আমাদের প্রিয় ভ্রাতাকে আমরা হারাতে চলেছি?

মিস্ নোবেল এমন চমৎকারভাবে কাজ করছে জেনে আমি খুশী। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

'উদ্বোধন' দেখেও খুব আনন্দ হ'ল। খুব সুন্দর হয়েছে। রাজাকে আমার ভালবাসা জানাবেন এবং বলবেন, তাঁর চিঠি আমি পেয়েছি। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উৎসবের পূর্ণ বিবরণ আপনার কাছ থেকে পাবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

মিস্ মুলারের জন্য দুঃখিত। গত রবিবার মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনাদের সকলেরই খুব সুখ্যাতি করছিলেন তিনি।

ভালবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ

আপনাদের **অভেদানন্দ**

কৃষ্ণ কিশোর এলো বনভবনে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

কৃষ্ণ কিশোর এলো বনভবনে।
লাগিল পুলক দোলা পরাণ মনে॥
বাঁশরীর তালে তালে যমুনার জল
বহিয়া চলিছে ঐ নৃত্য-উছল
মঞ্জির বাজে তার মধু পবনে॥

শাখে শাখে জাগে আজি শ্যামলশোভা
আকাশের রাঙা রং কি মনলোভা;
রক্ত কমল ফোটে দীঘির বুকে
মরাল নাচিয়া ফেরে কি মহাসুখে—
নন্দন বুঝি নেমে এলো ভুবনে॥

ধ্যান

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধ্যানানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র :

"ধ্যান করিবার পূর্বে ধ্যান করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। একেবারে ধ্যান-অভ্যাস অতি কঠিন ব্যাপার। প্রথমে মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া একটি বিশেষ চিন্তায় আনিবার চেষ্টা করা উচিত, ইহার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার অভ্যস্ত হইলে মনকে শরীরের কোনও বিশেষ স্থানে—যেমন নাসিকাগ্র, ভ্রূমধ্য বা হৃদয়ে, যেখানে সুবিধা হয় এক স্থানে রাখিতে পারিলে তাহাকে ধারণা বলে। যখন এই ধারণা-অভ্যাস দৃঢ় হয়, তাহার পর ধ্যান করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। এক বস্তুতে অথবা ভাবে চিন্তাপ্রবাহ তৈলধারার ন্যায় অচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত করিতে পারিলে তাহাই ধ্যান নামে কথিত হয়। তৈলধারার ন্যায় অচ্ছিন্ন বলিবার হেতু এই যে, মধ্যে কোনও রূপ ব্যবধান থাকিবে না। চিন্তাস্রোত নিয়তভাবে ধ্যেয় বস্তুতে প্রবাহিত করিতে হইবে। দীর্ঘকাল এইরূপ অভ্যাস করিতে পারিলে মনের সংযমশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ধ্যান করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে। প্রথমতঃ স্থূল বস্তুরই ধ্যান-অভ্যাস করিতে হয়, যেমন কোনও দেবমূর্তি। প্রথমে পূর্ণ মূর্তির ধ্যান করা সহজ নয় বলিয়া দেহের বিশেষ কোনও অঙ্গ, যেমন মুখ অথবা চরণের ধ্যান করিতে অভ্যাস করা উচিত। অভ্যাস পরিপক্ক হইলে সম্পূর্ণ মূর্তির ধ্যান সহজ হইয়া আইসে। এইরূপে ক্রমে উহা সূক্ষ্ম অরূপের ধ্যানে পর্যবসিত হইতে পারিবে। কিন্তু এই সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; কারণ ধ্যান করিতে গিয়া মনের লয়, বিক্ষেপ ইত্যাদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাহাতে তাহা না হয়, সে বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হয়। 'কোন বিষয়ের চিন্তা করিয়া মীমাংসা করিবার সময়ও মন একাগ্র হয়'—এইরূপ যাহা লিখিয়াছ, তাহা ধ্যানের অঙ্গ।" (১৩৫৭ সনের সং, পৃঃ ৩১৩-১৪)।

সৎকথা :

"'আমি আছি আর আমার ইষ্ট আছেন, এ জগতে আর কেউ নেই'—একেই বলে ধ্যান। অভ্যাস করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে, এই ভাব দৃঢ় হয়; তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান হয়।" (২য় সং, পৃঃ ১৪৮)

'কর্ম করবে না, কেবল ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ করে। সকাল ও সন্ধ্যা ধ্যান-জপের বেশ প্রশস্ত সময়। যার যে নামে রুচি ও যে মূর্তিতে ধ্যান বসে—শ্রদ্ধা হয়, সে সেই নাম জপ করবে। সেই মূর্তি ধ্যান করবে।…শ্রীদুর্গামূর্তি ধ্যান করতে হলে প্রতিমার যেরূপ মূর্তি আছে ঐ মূর্তি একমনে চিন্তা, ধ্যান করবে।' (পৃঃ ১৪৭)

পত্রমালা :

'নামের ধ্যান কিরূপে করিতে হয় জানিতে চাহিয়াছ। নাম উচ্চারণ করিলে যে শব্দ হয় সেই শব্দে মন একাগ্র করিতে চেষ্টা করিবে। উহাতেই মন স্থির ও শান্ত হইয়া আসিবে। শাস্ত্রে বলে 'নামই ব্রহ্ম'। নাম করিতে করিতেই আনন্দ আসিবে।' (পৃঃ ১১৬)

'ধ্যান করিবার কালে জ্যোতির্ময় মূর্তি চিন্তা করিতে যদি না পার, ছবিতে দৃষ্ট মূর্তি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ছবিতে দৃষ্ট মূর্তির মতই চিন্তা করিবে। পদ্মের উপর উপবিষ্ট মূর্তি চিন্তা করিতে যাইলে যদি পদ্মের চিন্তা চলিয়া যায়, কেবল মূর্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাই করিবে। উদ্দেশ্য মূর্তি দেখা—পদ্ম দেখা নহে। ঐ সকলের চিন্তা কেবল মনকে সমাহিত করিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই করিতে হয়। অতএব যেরূপ ভাবিলে, যাহা করিলে, মন তাঁহার দিকে যায়, তাহাই করিবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।' (পৃঃ ৬১)।

৫

প্রাচীন শাস্ত্রে আমরা নানা রকমের ধ্যানের উল্লেখ পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে হৃদয়কমলে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কঠ, মুণ্ডক আদি উপনিষদেও আত্মধ্যানের কথা আছে। এ ছাড়া ধ্যানবিন্দু, গোপালোত্তরতাপনী, রামরহস্য, দক্ষিণামূর্তি ইত্যাদি উপনিষদ্-গুলিতেও বিশেষ বিশেষ ধ্যানের কথা পাওয়া যায়। গীতোক্ত ধ্যানযোগ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'রাজযোগ' গ্রন্থে কূর্মপুরাণে উল্লিখিত দু'টি ধ্যানের কথা বলেছেন :

(ক) "চিন্তা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার মূলদেশ, জ্ঞান উহার মৃণালস্বরূপ, যোগীর অষ্টসিদ্ধি ঐ পদ্মের অষ্টদলস্বরূপ আর বৈরাগ্য উহার অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকা। যে যোগী অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত হইলেও উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বহির্দেশবর্তী অষ্টদলরূপে এবং অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকাকে পরবৈরাগ্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত হইলে তাহাতেও বৈরাগ্য-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পদ্মের অভ্যন্তরে —হিরণ্ময়, সর্বশক্তিমান, অস্পর্শ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত কিরণসমূহ পরিব্যাপ্ত—পরম জ্যোতির চিন্তা কর, তাঁহাকে ধ্যান কর।" (রাজযোগ, ১৪শ সং, পৃঃ ১১৭)

(খ) 'চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর ঐ আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখাবৎ জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইতেছে ; ঐ জ্যোতিঃ-শিখাকে নিজ আত্মারূপে চিন্তা কর, আবার ঐ জ্যোতির অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ময় আকাশের চিন্তা কর ; উহা তোমার আত্মার আত্মা পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বর। হৃদয়ে উহাকে ধ্যান কর।' (ঐ, পৃঃ ১১৭)

প্রথম ধ্যানটি রাজযোগীদের উপযোগী। দ্বিতীয় ধ্যানটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ-সূক্ত থেকে কূর্মপুরাণে গৃহীত এবং যাঁরা বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের অনুরাগী সমর্থক তাঁদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও উপাদেয়। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে আচার্য রামানুজ এই ধ্যানের উল্লেখ করেছেন ('লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি', ৩।৩।৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

এখন, পাতঞ্জল যোগদর্শনোক্ত কয়েকটি ধ্যানের উল্লেখ করা হচ্ছে :—

(ক) সূত্র : 'বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী' (১।৩৬)।

'এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন এক পদ্ম রহিয়াছে ; তাহার কর্ণিকা অধোমুখী ; উহার মধ্য দিয়া সুষুম্না গিয়াছে। তৎপরে পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর যে, ঐ পদ্ম কর্ণিকার সহিত ঊর্ধ্বমুখ হইয়াছে, আর ঐ পদ্মের মহাজ্যোতিঃ রহিয়াছে। ঐ জ্যোতির ধ্যান কর।'

(রাজযোগ, পৃঃ ১৭৯)

(খ) সূত্র : 'বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্' (১।৩৭)

'কোন সাধুপুরুষের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, যাঁহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু যাঁহাকে তুমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত বলিয়া জান, তাঁহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর। তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে (নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছ ও প্রশান্ত), সুতরাং তাঁহার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলে তোমার অন্তঃকরণ শান্ত হইবে।'

(ঐ, পৃঃ ১৮০)

(গ) সূত্র : 'স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা' (১।৩৮)

'কখন কখন লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা আসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়া অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে, সে তাহা শুনিতেছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে। জাগরণের পর ঐ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ স্বপ্নটিকে সত্য বলিয়া চিন্তা কর, উহার ধ্যান কর।' (ঐ, পৃঃ ১৮০)

(ঘ) সূত্র : 'যথাভিমতধ্যানাদ্ বা' (১।৩৯)

'যে কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাস—যে কোন স্থান তুমি খুব ভালবাস, যে কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাস, যে কোন ভাব তুমি খুব ভালবাস, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর।' (ঐ, পৃঃ ১৮১)

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের অতি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। ধ্যানের প্রণালী ও ধ্যানের ফল সেখানে উক্ত হয়েছে। স্থূল ধ্যান যে পরিশেষে ধ্যাতৃ-ধ্যান-ধ্যেয়-ভেদশূন্য নির্বিকল্প সমাধিতে পর্যবসিত হয়, তাও বলা হয়েছে।

তন্ত্রসার, ক্রমদীপিকা আদি গ্রন্থেও নানা ধ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে এই গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল না।

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে লিখেছেন—'ধ্যানং রূপগুণক্রীড়াসেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনম্' (পূর্ববিভাগ, ২য় লহরী, ৭৭ (শ্লোকার্ধ), অর্থাৎ ধ্যান হচ্ছে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলাচরিত বা মানস উপচারে সেবা-পূজাদির সুষ্ঠু চিন্তা। 'সুষ্ঠু'-শব্দটির ব্যঞ্জনা হচ্ছে—একাগ্রতা, প্রত্যয়ের একতানতা, অনুরাগ ইত্যাদি। ভগবানের রূপের ধ্যানই একমাত্র ধ্যান নয়—তাঁর গুণাবলীর, জীবনের ঘটনাবলীর চিন্তাও, মানস পূজাও ধ্যান। রুচি অনুযায়ী একটি, দু'টি বা সব ক'টি ধ্যানই করা যেতে পারে।

৬

ধ্যান সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ধ্যানে বহু বিঘ্ন—মহর্ষি পতঞ্জলির মতে নয়টি : (১) ব্যাধি (২) স্ত্যান অর্থাৎ মানসিক জড়তা (৩) সংশয় অর্থাৎ ধ্যান সম্ভব কিনা সন্দেহ (৪) প্রমাদ বা অনবধানতা (৫) আলস্য (৬) বিষয়ে অবিরতি অর্থাৎ বিষয়প্রবণতা (৭) ভ্রান্তিদর্শন বা বিপরীত জ্ঞান, যেমন, ধ্যানাভ্যাস ক'রে একটু-আধটু জ্যোতি দর্শন করাকেই ধ্যানসিদ্ধি বলে মনে করা (৮) ধ্যানভূমির অর্থাৎ একাগ্রতার অপ্রাপ্তি এবং (৯) অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ ধ্যানভূমি লাভ করেও তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারা।

যোগদর্শনের সমাধিপাদের ৩০-সংখ্যক সূত্রে এই নয়টি অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে। এই অন্তরায়গুলির ফলে, দুঃখ, চিত্তের ক্ষোভ, শরীরের অঙ্গসমূহের কম্পন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের অসমত্ব—এই সব উপসর্গের উৎপত্তির কথা

৩১-সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে। এই সব অন্তরায় দূর করার উপায় ৩২-৩৯-সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বরের বাচক ওঙ্কারের জপের দ্বারাই যে সব বাধা অপসারিত হয় তা' ২৯-সংখ্যক সূত্রে উক্ত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'রাজযোগ'-গ্রন্থে এই সূত্র-গুলির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান্ মন্তব্য করেছেন।

আচার্য শংকরের পরমগুরু গৌড়পাদ তাঁর মাণ্ডূক্যকারিকার দু'টি শ্লোকে (৩।৪৪-৪৫) সংক্ষেপে চারটি অন্তরায়ের কথা বলেছেন—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ। পরবর্তীকালে বেদান্তসারাদি গ্রন্থে এই চারটি অন্তরায়ের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। যদিও বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প সমাধির প্রসঙ্গেই এই অন্তরায়-চতুষ্টয়ের কথা বলা হয়েছে, তবু ধ্যানের ক্ষেত্রেও এগুলি প্রযোজ্য—রসাস্বাদের অর্থ ধ্যানের ক্ষেত্রে অনুরূপ হবে। লয় হচ্ছে নিদ্রা ; বিক্ষেপ, চিত্তের বহির্মুখীনতা ; কষায়, স্তান বা স্তব্ধীভাব ; রসাস্বাদ, জ্যোতিদর্শন, দেবমূর্ত্যাদি দর্শন ইত্যাদিতে আসক্ত হওয়া। এই আসক্তির ফলে ধ্যানের চরম লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

গৌড়পাদের 'রসাস্বাদ' হচ্ছে সবিকল্প সমাধির আনন্দেই আসক্ত হয়ে থাকা ; ইষ্টদর্শন, ইষ্ট-সম্ভাষণ, যার জন্য জীবের প্রাণান্ত সাধনা, এ সবই তাঁর মতে রসাস্বাদ, আরও কঠোর ও নীরস ভাষায়—'মূলাবিদ্যা'। তোতাপুরী-রামকৃষ্ণ সংবাদে এই রসাস্বাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই। তবে, ও বড় দূরের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—যাদের কষ্টে সৃষ্টে একটু ভক্তি হচ্ছে তাদের এ সব কথা বেশী শুনতে নেই।

ধ্যানের অন্য প্রকারের অন্তরায় হ'ল, ধ্যানৈশ্বর্যলাভ। ধ্যানের ফলে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, দিব্যগন্ধ, দিব্যস্পর্শ, দিব্য-আস্বাদ আদি বহুবিধ শক্তি এসে উপস্থিত হয়। দেবগণও ধ্যানীকে প্রলোভিত করেন ; যদিও এগুলি ধ্যানে অগ্রগতির সূচক, তবু এগুলিতে আসক্ত হয়ে পড়লে সাধকের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি এগুলিকে উপসর্গ বলে উল্লেখ করেছেন।

(যোগসূত্র, ৩।৩৮, ৩।৫১-৫২ দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলেছেন যে, এগুলি চরম-সিদ্ধির পথে অন্তরায়।

৭

ধ্যানের অধিকারী কে ? আচার্য শঙ্করের মতে গীতার ষষ্ঠাধ্যায় সন্ন্যাসীর জন্য অর্থাৎ সন্ন্যাসী না হলে ধ্যানের অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁর প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যে যুগে গীতা উপদেশ করেছিলেন, তখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ; গৃহস্থরাই তখন কর্মযোগী, সন্ন্যাসীরা সর্বকর্ম ত্যাগ ক'রে ধ্যানযোগী। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের 'আরুরুক্ষো-র্মুনের্যোগং' ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকটির তাৎপর্যই তাই। এ ছাড়া, 'একাকী ধ্যান করবে', 'নির্জনে ধ্যান করবে' ইত্যাদি শ্রীভগবানের নির্দেশগুলিও শঙ্কর স্বপক্ষ-স্থাপনে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায় শঙ্করের হাতে পড়া যদি সম্ভব হ'ত—ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌দের মতে অসম্ভব—তাহ'লে সেখানেও 'স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরতঃ' ইত্যাদি যে-সব কথা রয়েছে, তাতে শঙ্কর যে ঐ ধ্যানযোগ অধ্যায়টিও ভগবান সন্ন্যাসীদেরই জন্য বলেছেন, নিঃসন্দেহে এই মত ব্যক্ত

করতেন—বিশেষতঃ সব উপদেশের শেষে যখন তিনি উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে তপস্যার জন্য পাঠালেন।

এখন কথা এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম তো এখন আর নেই। যুগপ্রয়োজনে সন্ন্যাসীরাও এখন কর্মযোগী—শুধু শমদমাদি সহায়ে আত্মধ্যান নিয়েই তাঁরা বসে নেই। প্রাচীনকালে গৃহস্থরা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে সব লোকহিতকর কর্ম করতেন, বর্তমান কালে সন্ন্যাসীরাও সেগুলি করছেন। সুতরাং কালচক্রে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সীমারেখাই যখন পরিবর্তিত, তখন গীতা ও ভাগবতের ধ্যানযোগ শুধু সন্ন্যাসীদেরই জন্য, এ কথার স্বার্থকতা বর্তমান যুগে আছে কি? ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে লৌকিক কর্ম করেও সন্ন্যাসীরা যদি ধ্যানের অধিকারী হতে পারেন, তাহলে ঐ ভাবে কর্মব্যাপৃত থেকে গৃহস্থদেরও ধ্যানযোগী হতে অনতিক্রমণীয় অন্তরায় আছে কি? আসল কথা, অন্তরে সন্ন্যাসী হতে হবে। ঈশ্বরলাভ ছাড়া অন্য কোনও বাসনা ভেতরে থাকলে ধ্যান হবে না। বিষয়ের আকর্ষণ মনকে বহির্মুখ করবেই। যতদিন পর্যন্ত না বিষয়ে বৈরাগ্য হচ্ছে, ততদিন ধ্যানের অধিকারী হওয়া যায় না।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণার পর ধ্যানের অধিকারী হওয়া যায়। ধারণা ধ্যান ও সমাধি—এই ত্রয়ীকে মহর্ষি 'সংযম' আখ্যা দিয়েছেন। আমরা বলতে পারি ধ্যানেরই অধঃসীমা হচ্ছে ধারণা এবং উর্ধ্বসীমা হচ্ছে সমাধি। প্রত্যাহারও ধ্যানেরই প্রারম্ভিক অবস্থা। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের 'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্' ইত্যাদি শ্লোকই (২৬-সংখ্যক) এ বিষয়ে প্রমাণ। আর বর্তমান যুগের যা অবস্থা, তা'তে প্রাণায়াম নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। আসনে তো বসতেই হয়। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে, যম নিয়মটি থাকা চাই। যাঁর যম-নিয়ম আছে, তাঁর ধ্যানেরও অধিকার আছে। এর মানে এই নয় যে, আগে যম-নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিই, তারপরে ধ্যান করবো। যম-নিয়মে যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর ভগবানলাভ নিশ্চয়ই হয়েছে। ভগবানলাভ হলেই তবে 'অহিংসা', 'সত্য', 'সন্তোষ' ইত্যাদি দৈবী সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং যম-নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করতে করতেই ধ্যানেরও অভ্যাস করতে হয়। যম নিয়মের কথা যোগসূত্রের সাধনপাদের ৩০ ও ৩২-সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে এবং যম-নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হলে যে ফল লাভ হয় তা ৩৫-৪৫ সূত্রে উক্ত হয়েছে।

৮

কিন্তু অধিকারীতে বিস্তর ভেদ আছে। সকলেরই এক অবস্থা নয়। অবস্থাভেদে ব্যবস্থা। সকল স্তরের অধিকারীর জন্যই ব্যবস্থা আছে। শ্রীমা সারদাদেবীকে একজন বলেছিলেন—'মা, ধ্যান-ট্যান তো কিছুই হয় না।' তার উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন—'তা নাই বা হ'ল। ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৭৪)। প্রবর্তকের জন্য স্বামী বিরজানন্দজী একটি পত্রে লিখছেন—'ধ্যান প্রথম থেকে হওয়া শক্ত। অনেকদিন ধরে অভ্যাস করলে তবে হয়। প্রথম প্রথম যেমন করছো ফটোর দিকে খানিকক্ষণ স্থির নেত্রে একমনে চেয়ে থাকবে ও সেই মূর্তি হৃদয়ে আঁকবার ও রাখবার চেষ্টা করবে। যত তাঁকে ভালবাসবে ও আপনার বলে জানবে তত ধ্যান জমবে' (অতীতের স্মৃতি, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১২০-২১)।

এ ছাড়া জপ রয়েছে। ধ্যান অঙ্গী, জপ অঙ্গ। জপ করতে করতেই তা' ধ্যানে পরিণত হয়। 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে আছে—'খুব জপ কর বাবা, খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এ যুগে যোগ যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে' (পৃঃ ১৬৩)।

স্বামী শিবানন্দজী জনৈক ভক্তকে বলছেন—'একমনে খুব নাম জপ করে যান ; দেখবেন ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ স্থায়ী হলে তাও এক রকমের ধ্যান' (শিবানন্দ বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৭)। অপর এক ভক্তকে বলছেন- 'প্রথম প্রথম ধ্যান হওয়া একটু মুস্কিল। তাঁর কৃপায় তাঁর নাম করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে যখন তাঁর উপর একটা ভালবাসা আসবে তখন ধ্যান অতি সহজে হয়ে যাবে।···তাঁর পবিত্র নাম জপ করতে করতে আপনিই ক্রমে ধ্যান হবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব একাগ্রভাবে ভাববে যে, তিনি সস্নেহে তোমার দিকে চেয়ে আছেন। সেই ভাবনা একভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেই ধ্যান' (ঐ, পৃঃ ৩-৪)। একটি পত্রে লিখছেন—'জপ করিতে করিতে ধ্যান আপনি আসিবে, প্রভুর শ্রীমূর্তি হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, আনন্দ ও প্রেম অনুভব করিবে ; তিনি যে তোমার হৃদয়ের দেবতা, পরমাত্মীয়—এই ধারণা হইবে।' (মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পৃঃ ২৩৪)

স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলছেন—'জপ ঠিক ঠিক হলে ধ্যান আপনা-আপনিই হবে। তারপর ধ্যান যখন তৈলধারার মত চলবে, তখন বাহ্যিক জপ ফুরিয়ে যাবে।' (সৎকথা, পৃঃ ১৪৭)।

এ ছাড়া প্রার্থনা রয়েছে। স্বামী প্রেমানন্দজী একটি পত্রে লিখছেন—'ধ্যান কি কথার কথা, যার তার হবার নয়। জগৎশুদ্ধ লোকেরই ঐ কথা ; কেউ ফুটে বলে ফেলে, কেউ বা চেপে রাখে মাত্র। ঠাকুরকে মনে মনে ডাকবে, প্রার্থনা করবে ও আপনার ভেবে আব্‌দার করবে। সময়ে ঠিক হবে, ভাবনা নেই, তিনি পরম দয়াল।' (স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, পৃঃ ৬০)। 'মহাপুরুষজীর পত্রাবলী'তে আছে—"তাঁহার কৃপায় প্রার্থনাতেই সব পাইবে। 'বালানাং রোদনং বলম্'—বালকের রোদনই বল ; 'মা দাও, মা দাও' বলিয়া কান্না ছাড়া তাহার আর কোন শক্তি নাই। ভক্তেরও ঠিক তাহাই। তাহার ভক্তি-প্রীতির অভাব হইলেই বালকের ন্যায় প্রভুর শ্রীচরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা ছাড়া তাহার অন্য গতি নাই। ঠাকুর আমাদের বারংবার এই কথাই বলিতেন। কখন কেহ যদি তাঁহার কাছে বলিত, 'মহাশয়, আমার ভাল ধ্যানজপ হচ্ছে না', অমনি তিনি বলিতেন, 'ওরে, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর ; মা সব দেবেন।' তাই তোমায় বলি কেবল তাঁহার কৃপার জন্য প্রার্থনা কর।" (পৃঃ ১৮৬)। 'শিবানন্দ-বাণী'তে আছে—"প্রথমটা ধ্যান করার চেষ্টা না করে চির পবিত্র, কামকাঞ্চনবর্জিত, 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' পরম কারুণিক, যুগাচার্য, জগদ্‌গুরু সেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তির সামনে বসে খুব কাতর ভাবে বালকের ন্যায় কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করবে। বলবে—'প্রভু, তুমি জগতের উদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করেছ এবং জীবের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছ, আমি অতি দীন-হীন, ভজনহীন, পূজনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন, দয়া ক'রে আমায় বিশ্বাস,

ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা দাও, আমার মানব-জন্ম সফল হোক্। তুমি কৃপা ক'রে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও—আমায় দেখা দাও।'" (শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪)।

মহাপুরুষজী বলতেন—প্রার্থনার দ্বারাই ধ্যানের কাজ অনেকটা হয়ে যায়। বাস্তবিক ঠিক ঠিক আন্তরিক প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করি—ইষ্টের জীবন্ত উপস্থিতি উপলব্ধি করি। প্রার্থনার শক্তি অসীম। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই প্রার্থনার মহিমা স্বীকৃত হয়েছে। মৌখিক বা যান্ত্রিক প্রার্থনা ছেড়ে দিয়ে, ব্যাকুল অন্তরে যদি আমরা প্রার্থনাশীল হই, তাহলে অচিরেই আমরা ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি।

৯

ধ্যানের চরম ফলের কথা আমরা প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশে স্বামীজীর বক্তৃতা-উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছি। এখানে আনুষঙ্গিক ফলের কথা বলা হচ্ছে :

ধ্যানের ফলে শরীরের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় এবং মনও আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়।

'একঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকার পর বাহ্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে তোমার মনে হইবে যে, ঐ সময়টুকুতে তুমি জীবনে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শান্তি উপভোগ করিয়াছ। ধ্যানই তোমার শরীর-যন্ত্রটিকে বিশ্রাম দেবার একমাত্র উপায়। গভীরতম নিদ্রাতেও ঐরূপ বিশ্রাম পাইতে পার না।'

(বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩।৪১২)

ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় তা নয়, উহাতে শরীরেরও উন্নতি হয়, ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।'

('ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ', পৃঃ ৩১)

'যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন এক আসনে বসে দুই-চার ঘণ্টা ধ্যান ধারণা করলেও কোন কষ্ট হবে না; বরং সুষুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ refreshed (স্বচ্ছন্দ) হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।'　　(ঐ, পৃঃ ৩১)

'ধ্যানেরই এমন একটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মন উঠলে শরীরের সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। সুষুপ্তির পরে যেমন শরীর বেশ সতেজ বোধ হয়, তার চাইতেও বেশী সতেজ বোধ হয় ঐ ধ্যানের অবস্থায়। আর একটা অব্যক্ত আনন্দে সমস্ত দেহ মন ভরে যায়। আমি তো যখনই শরীর ক্লান্ত বোধ করি তখনই শরীর থেকে মন তুলে নিয়ে ঐ ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে থাকি—ব্যস্ আনন্দম্।'

(শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮০)

ধ্যানের ফলে জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। 'একদিন ঠাকুর নরেনদের বাড়ীতে গিছলেন—নরেনকে দেখতে। সঙ্গে ছিলাম। নরেন বললে—আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। আপনারা যখন টালার মোড়ে, তখন আপনাদের দেখতে পেলুম; তাই বেরুলুম না। এই কথা শুনে ঠাকুর বললেন—এ সব কাকেও বলিসনি　স্বামীজীর ধ্যান করতে করতে এই অবস্থা হয়েছিল—দূরে কে কি কচ্ছে সব দেখতে পেত।'

(সৎকথা, পৃঃ ১১৮)

'সহস্র সহস্র দেবতা তোমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, কারণ আমাদের জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমরা কেবল এই বাহিরটাই দেখিতে পারি।…ধ্যানের সময় কখন কখন তুমি যদি অন্য ভূমি স্পর্শ কর, তখন অন্য জগতের প্রাণী, অশরীরী আত্মা এবং আরও

কত কিছুর সংস্পর্শে আসিতে পার। ধ্যানের শক্তির দ্বারাই এই সব লোকে যাইতে পারো। এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করে।'

(বাণী ও রচনা, ৩।৪৫২-৫৪)

১০

ধ্যান ও জ্ঞান উভয়েই মানসী ক্রিয়া হলেও, প্রভেদ এই যে ধ্যান পুরুষতন্ত্র ও বিধিতন্ত্র; জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি তার নাম জ্ঞান; 'অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি করো'—এ রকম বিধান দিলে সেটা হাসির ব্যাপার হবে; সুতরাং অগ্নিজ্ঞান বিধিতন্ত্র অর্থাৎ বিধির অধীন নয়। আবার, অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি না করা, কোনও ব্যক্তির খেয়ালের ওপর নির্ভর করে না—বস্তুগুণেই তা' করতে হয়; সুতরাং এই অগ্নিজ্ঞান পুরুষতন্ত্র নয় অর্থাৎ পুরুষের অধীন নয়। সমস্ত জ্ঞান সম্বন্ধেই ঐ একই কথা—ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত।

ধ্যান পুরুষতন্ত্র ও বিধিতন্ত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার কথা আছে। 'পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিঃ' (৫।৭।১), 'যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ' (৫।৮।১)—পুরুষে অগ্নিবুদ্ধি করবে, স্ত্রীলোকে অগ্নিবুদ্ধি করবে, এই বিধান দেওয়া হচ্ছে—অর্থাৎ পুরুষকে অগ্নিরূপে ধ্যান করবে, স্ত্রীলোককে অগ্নিরূপে ধ্যান করবে। ধ্যানে এই রকম বিধান দেওয়া সম্ভব ও দেওয়া হয়ে থাকে, তাই ধ্যান বিধিতন্ত্র। তবে ঐ ধ্যান করা, না করা, বা অন্যভাবে করা, সেটি ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাধীন। তাই ধ্যান পুরুষতন্ত্র। আচার্য শঙ্কর বলছেন—'ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা বা কর্তুং শক্যং, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্। প্রমাণং চ যথাভূতবস্তুবিষয়ম্। অতো জ্ঞানং কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা বা কর্তুম্ অশক্যম্। কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব তৎ, ন চোদনা-তন্ত্রম্ নাপি পুরুষতন্ত্রম্। তস্মাৎ মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্ বৈলক্ষণ্যম্' (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৪ ভাষ্য)। ভাষ্যের ভাষা সরল এবং অর্থ আগেই বলা হয়েছে। তাই আক্ষরিক অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

আমরা অলৌকিক দর্শনাদির কথা অনেক শুনি, গ্রন্থাদিতেও পাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনাদি অতি প্রসিদ্ধ। বাবুরামকে দেখলেন, 'দেবীমূর্তি, গলায় হার'। সুরেন্দ্রকে দেখলেন 'দেবীপুত্র'। রাণী রাসমণিকে দেখলেন দুর্গার সখীরূপে। চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দলের মধ্যে দেখলেন বলরাম ও মাষ্টারকে; চৈতন্যদেবের জন্মস্থান দেখলেন গঙ্গাগর্ভে; শরৎ শশীকে দেখলেন যীশুখৃষ্টের দলের মধ্যে, ইত্যাদি।

স্বামীজী দেখলেন, সিন্ধু নদের তীরে বৈদিক যুগের আর্য ঋষিকে, শুনলেন তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত দেবী গায়ত্রীর সুমধুর আবাহন-মন্ত্র।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (তখন রাখালচন্দ্র) পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করতে করতে শুনলেন বেদে যে সব গান রয়েছে, গাছের পাখিগুলি পর্যন্ত সেই সব গান করছে। তিনি নিশ্চয়ই পাখিদের মুখে বৈদিক গানগুলি শোনবার জন্য ধ্যানে বসেননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন শব্দ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করছি'লেন। তাই ধ্যানস্থ মহারাজের অকস্মাৎ ঐ রকম দর্শন হ'ল।

ফলতঃ অতীতের কোন ঘটনাই বিনষ্ট হয়নি—হয়েছে তিরোহিত। সেই দৃশ্য দেখা যায়; সহসা তা' আবির্ভূত হয়—অযাচিত-ভাবে, বিনা প্রয়াসে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের কাছে—অবতার বা ঈশ্বরকোটি পুরুষদের কাছে

তো বটেই। ধ্যানে প্রয়াস, দর্শনে প্রয়াস-প্রযত্ন নেই।

যেমন অতীতের ঘটনা, তেমনি ভবিষ্যতের ঘটনা বা ঘটনাপরম্পরারও দর্শন হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জগন্মাতা চলচ্চিত্রের ছবির মত ভারতের আগামী চার শো বছরের ঘটনা-পরম্পরা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন। (স্বামী ওঙ্কারানন্দ কথিত। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান স্মরণিকা, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য)।

এই দর্শনগুলি কী? এগুলি ধ্যান নয়—কারণ, এগুলি পুরুষতন্ত্র বা বিধিতন্ত্র নয়। এগুলি নিশ্চয়ই জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—ধ্যান ক'রে এক রকম দেখে, আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর এক রকম। ধ্যান করতে হয় কল্পনাকে আশ্রয় করে। ভাগবতে আছে—

যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তৎ তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ (৩।৯।১১)

অর্থাৎ, হে বিশ্রুতকীর্তি! সাধকগণ বুদ্ধিসহায়ে তোমার যে বিগ্রহের ধ্যান করেন, তুমি অনুগ্রহ ক'রে তাঁদের জন্য সেই সেই বিগ্রহ ধারণ করো।

সাধক ইষ্টমূর্তি যেভাবে দর্শন করতে চান, শ্রীভগবানও অনুগ্রহ ক'রে সেই মূর্তিতেই তাঁকে দর্শন দেন। এক শ্রীকৃষ্ণের নানা ধ্যান—কোথাও দ্বিভুজমুরলীধারী, কোথাও পাঞ্চজন্য-সুদর্শন-চক্রধারী। এক শিব কখনও অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থী, কখনও 'বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্ত বারাণসীপুরপতি'। রুচিভেদে সেই একই ঈশ্বরকে নানা মূর্তিতে ধ্যান করা হচ্ছে। ভগবানও সেই সেই মূর্তি কল্পনা করছেন অর্থাৎ নির্মাণ করছেন—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। এখানে কল্পনার অর্থ সম্পাদন বা নির্মাণ।

পঞ্চদশীর 'ধ্যানদীপ'-অধ্যায়ে ধ্যান ও জ্ঞানের কথা এবং ধ্যানী ও জ্ঞানীর কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তার সার-সংক্ষেপ:

ধ্যানীর পক্ষে লৌকিক কর্ম বেশী করা সম্ভব হয় না, কারণ ধ্যানের সঙ্গে লৌকিক কর্মের বিরোধ ঘটে। জ্ঞানী কিন্তু যাবতীয় লৌকিক কর্ম করতে পারেন, কারণ জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের বিরোধ নেই। (এখানে উল্লেখ-যোগ্য এই যে, শঙ্করের ভাষ্যে আমরা বারংবার জ্ঞান ও কর্মের বিরোধের কথা পাই; তাই বুঝে নিতে হবে যে, শঙ্কর জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গে ঐ সব কথা বলেছেন এবং পঞ্চদশীকার এখানে পূর্ণ জ্ঞানীর কথা বলছেন)। জ্ঞানী সাম্রাজ্যই পরিচালনা করুন অথবা ধ্যান নিয়েই থাকুন, তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, ধ্যান তাঁর পক্ষে ঐচ্ছিক; কিন্তু ধ্যানীকে ধ্যান নিয়েই থাকতে হবে। 'জ্ঞানী যদি ধ্যান করতে গিয়ে লৌকিক কর্ম বিস্মৃত হ'ন?' 'বিস্মৃত হোন্ না, সে বিস্মৃতি ধ্যানহেতু, জ্ঞানহেতু নয়'। ধ্যানীর জন্ম হতে পারে, জ্ঞানীর মুক্তি অবধারিত। ধ্যানীর পক্ষে ধ্যান করণীয়, কারণ তাঁর বাসনা আছে। 'এক অসঙ্গ আত্মাই আছেন, আর সব ইন্দ্রজালবৎ মায়িক'—এই জ্ঞান যাঁর হয়েছে, তাঁর পক্ষে জপ, ধ্যান, সমাধি, নৈষ্কর্ম্য বা প্রচুর কর্ম—সবই নিষ্ফল। ধ্যানাদি-তপস্যার ফলে ধ্যানীর অভিসম্পাত বা অনুগ্রহ করার শক্তি থাকতে পারে। জ্ঞানীর সেই শক্তি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। জ্ঞানীর যদি সেই শক্তি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেটি ধ্যানাদি-তপস্যারই ফলে, জ্ঞানের ফলে নয়। যাঁদের চিত্ত নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত তাঁদের ধ্যানী হতে চেষ্টা করা উচিত, আর যাঁরা স্বভাবতই

অন্তর্মুখ, তাঁদের জ্ঞানী হবার জন্য তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

১১

চতুর্থ অনুচ্ছেদে আমরা বলেছি যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে ধ্যান সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে আমরা যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা' সিন্ধুতে বিন্দুর মতই। স্থানাভাবে অনেক পুস্তক থেকেই আমরা উদ্ধৃতি দিতে পারিনি। উদাহরণস্বরূপ 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য লাটু মহারাজ সারাজীবন ধ্যান-ধারণাতেই অতিবাহিত করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'আমরা ধ্যান-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটিমাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহার প্রতি অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।' (সৎকথা, পৃঃ ১৬-১৭)। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে ধ্যান ও সমাধি সম্বন্ধে অনেক গূঢ় তত্ত্বকথা পাওয়া যায় —বিশেষতঃ 'সাধক-জীবন'-শীর্ষক অধ্যায়ে অনুভূতি-লব্ধ প্রজ্ঞাসহায়ে উক্ত ব'লে তাঁর প্রত্যেকটি কথা অন্তরকে স্পর্শ করে।

এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য-গণের পত্রাবলী, 'শিবানন্দ-স্মৃতি-সংগ্রহ', 'সৎ-প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' আদি পুস্তক-গুলিতেও ধ্যান-সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। স্বামী বিরজানন্দ প্রণীত 'পরমার্থপ্রসঙ্গে'ও ধ্যানের প্রশস্ত কাল, ধ্যানের প্রণালী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসিদ্ধ উক্তি—'ধ্যান করবে কোণে, বনে ও মনে'—এর বিশদ ব্যাখ্যা, ধ্যানের গূঢ় রহস্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ সাধনসঙ্কেত পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি স্বল্পকায়; অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ অনায়াসে পাঠ করে দেখতে পারেন। ধ্যান-সম্বন্ধীয় সব কথাই অবশ্য এক জায়গায় নেই; কোথাও একত্রে কোথাও বা বিক্ষিপ্তভাবে আছে। ঐগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা'হলে সঙ্কলনটি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আকারে পরিণত হবে।

এই সব পুস্তকে সাধনভজনের সকল কথাই বলা হয়েছে। তাই ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে জপ, প্রার্থনা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম ইত্যাদি সব কথাই এসে গেছে। সাধকের জীবন তো শুধু ধ্যানেরই জীবন নয়। লাটু মহারাজের মতো মহান্ অধিকারীর কথা স্বতন্ত্র; তবুও তিনি যে জপ করতেন না, বা শাস্ত্রাদি পাঠ শুনতেন না, তা' নয়। জপ ধ্যান বা সমাধিরই একটি প্রণালী। প্রার্থনা, স্বাধ্যায়ও তাই। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে লৌকিক কর্মও তাই—যদিও এটি বহিরঙ্গ। সুতরাং এগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ সাধন মনে করা সমীচীন হবে না। যাঁরা সত্যই ধ্যানের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চা'ন তাঁদের নিজ নিজ অধিকার অনুসারে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম, ধর্ম-গ্রন্থপাঠ, নির্জনবাস, প্রার্থনা, জপ ও ধ্যানাভ্যাস এ সবই কম বেশী মাত্রায় সাধন করতে হবে। সুতরাং সাধনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকগুলি থেকে প্রামাণিক তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ ক'রে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। অনেকেই 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ', 'শিবানন্দ-বাণী' আদি পুস্তক স্বাধ্যায়স্বরূপ

নিত্য পাঠ করে থাকেন। এযুগের মানুষের জন্য যা দরকার, ধ্যানাদিসম্বন্ধীয় সকল কথাই এই সব পুস্তকে সহজে পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে কষ্ট করে যা আহরণ করতে হয়, তা' এখানে অনায়াসলভ্য। তা'ছাড়া প্রাচীন বহু উপাসনাই বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। বৈদিক কর্মসম্বন্ধ উপাসনাগুলির তো এযুগে পুনরুজ্জীবিত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

১২

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থাদি থেকে আমরা ধ্যান সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি এবং তার ফলে আমাদের বুদ্ধি মার্জিত হতে পারে বটে, কিন্তু বৌদ্ধিক স্তর অতিক্রম করে বোধির স্তরে উত্তীর্ণ হতে গেলে, গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে ধ্যানাভ্যাস করতে হবে। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—গুরু- ও সম্প্রদায়রহিত ব্যক্তির জ্ঞান হয় না; (গীতা, ১৮।৫০ ভাষ্য)। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—গুরুপরম্পরা ব্যতীত কিছুই হবার নয়। 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ'-গ্রন্থেও একাধিকস্থলে ঐ কথাই পাওয়া যায়: 'চুরি করতে পর্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়, আর এত বড় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই?' (পৃঃ ৩৩)। 'প্রশ্ন—গুরু ছাড়া হয় না? উত্তর—আমার বোধ হয়, না—কিছুতেই না।' (পৃঃ ৪৪) ইত্যাদি।

গুরু যেভাবে সাহায্য করেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

রাখালচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরে ধ্যান করতে বসেছেন। কিন্তু ধ্যান হচ্ছে না—মনটা খারাপ। ধ্যানাসন ছেড়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর বললেন—দ্যাখ, তুই যখন কালীঘর থেকে এলি, তখন দেখলুম, তোর মনটা যেন জালে ঢাকা রয়েছে। ঠাকুর রাখালচন্দ্রের জিভে কি একটা লিখে দিলেন, অমনি তিনি সব কষ্ট ভুলে গিয়ে এক অপূর্ব আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। ('ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ,' পৃ: ৩৫ দ্রষ্টব্য)।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতীতে প্রত্যহ ১৪।১৫ ঘণ্টা জপ ধ্যান করতে শুরু করেন। ৭।৮ মাস একটানা ঐ ভাবে প্রবল ধ্যানাভ্যাসের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি শরীর ও মনে বিষম ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং শেষে তাঁর মনে হ'ত, মস্তিষ্ক যেন একেবারে জড় হয়ে গেছে। জপধ্যানের মাত্রা কমিয়ে, ঔষধ-পথ্যাদি করেও কোনও ফল হ'ল না। শেষে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা সকল কথা শুনে তাঁকে সহস্রারে ধ্যান করতে নিষেধ করে নির্দেশ দেন যে, প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে হবে। শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ অনুযায়ী সাধনপ্রণালী পরিবর্তিত ক'রে বিরজানন্দজী কয়েকদিনের মধ্যেই অদ্ভুত উপকার বোধ করেন। শেষ জীবনে এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে তিনি গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন—'সিদ্ধগুরুর দরকার এই জন্যই। মায়ের এই উপদেশ যদি না পেতুম তা হলে হয়তো জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতো, চিররুগ্ন থাকতুম অথবা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতো' (অতীতের স্মৃতি, পৃঃ ১৪৬)। ধ্যান ও ধ্যানের প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জনৈক দীক্ষিত

শিষ্যকে পরিষ্কার জবাব দিয়েছিলেন—'ধ্যান-ট্যান তোর হবে না। জপ করিস্' (স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন, পৃঃ ৯৭)।

স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আমেরিকায় বেদান্তানুরাগীদের ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর ধ্যান-ক্লাসের ছাত্রদের কয়েকজনের উচ্চ সাত্ত্বিকভাব হয়, যার তীব্রতা তাদের পক্ষে সহজে ধারণ করা সাধ্যাতীত ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দের ন্যায় উচ্চশক্তিসম্পন্ন, মহান্ আচার্যকেও তখন এই সমস্যার সমাধানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে পত্র দিতে হয়। সেই পত্রের উত্তরে স্বামীজী লেখেন—'যদি নাদশ্রবণাদি দ্বারা কারও হানি হয় তো ধ্যান ত্যাগ করে দিন কতক মাছ-মাংস খেলেই ও পালিয়ে যাবে। শরীর যদি দুর্বল না হতে থাকে তো কোনও ভয়ের কারণ নেই। ধীরে ধীরে অভ্যাস' (বাণী ও রচনা, ৮।১৫৬-৫৭)।

এই সব ঘটনা থেকে ধ্যানাভ্যাসে গুরুকরণ যে কতদূর প্রয়োজনীয় তা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করতে পারা যায়। তবে, একথাও সত্য যে, গুরুলাভ হয়নি ব'লে, একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। স্বামীজী বলতেন—'যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে যথাসময়ে সদ্‌গুরু আপনিই লাভ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উপদেশেও আছে—'যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সে সাধন-ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তা' হলে নিশ্চয়ই তিনি তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন; গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা করবার দরকার নেই।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ, পৃঃ ৩৩-৩৪)।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলছেন—'দীক্ষিত হওয়া তেমন কিছু নয়,—এই ধ্যান ধারণাই করতে হবে, তাঁকে প্রাণের সহিত ডাকতে হবে। তাঁতে আরও বিশ্বাস ভালবাসা হবে—এইজন্য একজনকে মেনে নিয়ে কাজ করা। এখন খুব ধ্যান লাগাও' ('ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ,' পৃঃ ১৬২)। স্বামী সারদানন্দজী একটি পত্রে লিখছেন—'কেবল সদ্‌গুরুর অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া যথাসাধ্য ঈশ্বরচিন্তা, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থাদি-পাঠ করিবার চেষ্টা করিও। জমি প্রস্তুত হইলে বীজ বপন করিলে সুফল ফলে; এবং ইহা একটি প্রকৃতির রহস্য যে জমি প্রস্তুত হইলেই বীজ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। অভাব বোধ হইলেই তাহা পূরণ হয়। প্রকৃত অভাব বোধ হইলেই বস্তুলাভের উপায় হয়—ইহা সাধু ও শাস্ত্রসঙ্গত সত্য এবং ইহার যাথার্থ্য আমাদের নিজ জীবনে অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছি।' (পত্রমালা, পৃঃ ৯৩-৯৪)।

অতএব পুরুষকার সহায়ে নিজেকে প্রস্তুত করাই শ্রেয়। মহর্ষি পতঞ্জলির 'বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্' এবং 'যথাভিমতধ্যানাদ্ বা' সূত্র দুটি আমরা পঞ্চম অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিগ্রহবান্ ঈশ্বরের রূপ, গুণ ও চরিতাদির ধ্যান অথবা যে সব পবিত্র তীর্থ, দেববিগ্রহ বা মন্দিরাদি দর্শন করে আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করেছি, সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে ধ্যানাভ্যাস অনায়াসেই করা যেতে পারে। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর জীবনীতে পাওয়া যায় যে, তিনি গীতার এক একটি শ্লোক নিয়ে ক্রমান্বয়ে দু-তিন দিন পর্যন্ত ধ্যান করতেন। একটি পত্রে স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি লিখছেন—'কত যে যত্ন, কত যে ভালবাসা, কত গল্প, কত বেড়ানো—সব স্মৃতিপটে জল জল করছে।...তাঁহার স্মৃতি আমাদের জীবনসঙ্গী হইয়া রহিয়াছে। ইহাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান, ইহাই আমাদের জপ-তপ, আলাপন।' (স্বামী

তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১৯৪)। আর একটি পত্রে স্বামী প্রেমানন্দজীকে লিখছেন—"তোমাতে প্রভু ভিন্ন অন্য কিছুর ত আর স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের এক দিনের কথা। সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম তোমার 'যথা যথা যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরে' বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল; এমন বস্তুটি দেখিলে না যাহা হইতে প্রভুকে স্মরণ না করিলে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না। আমার কিন্তু উহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই নাম তাঁহাতে (ডাইলিউট) মগ্ন হইয়া যাওয়া। ঠাকুর ইহা কৃপা করিয়া দেখাইয়াছেন।" (ঐ পৃঃ ১৭৯) ('ডাইলিউট' এই ইংরাজী শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যবহার করিতেন। ধ্যান সম্পর্কে তৎকর্তৃক ইহার প্রয়োগ ২য় অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-উপদেশে দ্রষ্টব্য)। কথামৃতকারের ধ্যানের পটভূমি ছিল দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী, বিল্ববৃক্ষ, কলনাদিনী ভাগীরথী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কক্ষ, ইত্যাদি, যা আজও ভাগবতী লীলার সাক্ষ্য বহন করছে। ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই ছিল তাঁর ধ্যানের মুখ্য অবলম্বন

এই সব মহাজীবন থেকে আমরা ইঙ্গিত পাই, কিভাবে আমাদের ধ্যানপথে অগ্রসর হতে হবে। শুধু গুরুর অপেক্ষায় বসে না থেকে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে আমরা নিশ্চয়ই লাভবান হ'ব। আর এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষে ধ্যানের বিষয়বস্তুর তো অভাব নেই! রুচি অনুযায়ী ধ্যেয় বস্তু বেছে নিতে তো কোনই কষ্ট নেই! আজও নবদ্বীপ 'পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত' শচীনন্দন শ্রীহরির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজও রাজগীর, সারনাথ তথাগতের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে রয়েছে। আজও সরযূ সীতাপতি রামচন্দ্রকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। আজও কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তর ভগবদ্গীতাকে ধ্বনিত-প্রতি-ধ্বনিত করছে। আজও কালিন্দীর স্তিমিত সলিল ভক্তগায়কের সুকণ্ঠে অমিয় মূর্ছনা জাগাচ্ছে—

'সেই আলোর দুলাল শ্যামলের প্রেম ছবি
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে
কেবলি মনে।'

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

একজন ভক্তের চিঠির উত্তরে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ বলিতেছেন :

"লিখে দাও—'জপ' যতটা পারবে, যখন পারবে করবে ; ওর সময়-অসময়, স্থান-অস্থান নেই। 'ধ্যান' কি সহজে হয় ?

"মন তো চঞ্চল হবেই। জান তো গীতার কথা—'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ'। তার উত্তর হচ্ছে—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'। অভ্যাস চাই, তীব্র বৈরাগ্য চাই, নইলে কিছুই হয় না। মনের স্বভাবই হ'ল এদিক-ওদিক যাওয়া ; জানো না কঠোপনিষদে আছে—'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব বহির্মুখী, বাইরের অবলম্বন দিয়ে দিয়েই তাদের অন্তর্মুখী করতে হবে, ওই জন্যই তো পূজা, আরতি, ভোগরাগ, ধূপ-দীপ, ফুল-ফল—এত কাণ্ড, মনটাকে engaged (আটকে) রাখবার জন্য তাঁর কাজে, তাঁর কাছে।

"মানুষের মন ভোগ করতে চায়, সেইটাকে divine (দিব্য) ক'রে তুলতে হবে, ইষ্টের সঙ্গে ভোগ হ'লে আর অনিষ্ট হবে না, শুভ সংস্কার হতে থাকবে।

"ধ্যান করবে না কেন ? ধ্যান করবে—একটা বিষয় নিয়ে—যেন অনেকক্ষণ ধরে আরতি ক'রছ, দীপ দিয়ে হয়ে গেল, ধূপ কর্পূর দিয়ে কর, চামর দিয়ে কর. যেন শেষ হতে না চায়। অনেকক্ষণ পরে যদি আর তাতে ভাল না লাগে, মনে কর যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছ নানারকম ফুলের, নানা রঙের মালা পরাচ্ছ, নানারকম খাবার জিনিস নিবেদন ক'রছ—এই রকম অবিচ্ছিন্ন ভাবনার ধারা—এই তো ধ্যান।

"মনে তো ময়লা উড়ছেই, যেমন ঘরে ধুলো উড়ছে। ঝাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে, ঘর মুছে—সে ধুলো পরিষ্কার করতে হবে। কতক ভাব জোর করে, যেন ঝাঁট দিয়ে মন থেকে তাড়াতে হবে। কতক ভাব কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা ক'রে সরাতে হবে—যেমন জল ছিটিয়ে দিলে সব ধুলো নেবে যায়। কেঁদে কেঁদে বলতে হয়—প্রভু, কেন আমার মনে এভাব আসে—এভাব থাকলে তো তুমি আসবে না, আমার মন শুদ্ধ পবিত্র ক'রে দাও। তুমি এসো, তুমি দেখা দাও।' এমনি ক'রে কেঁদে কেঁদে বলবে। ঠাকুর আমাদের এইরকম শিখিয়েছিলেন।

"রাত্রে জপ করতে চায় ? ঘুম পায় ? তো ঘুমুবে। খুব বেশী ইচ্ছে হ'লে উঠে পড়বে, জোরে জোরে পায়চারি করবে, বসে বসে যদি ঘুম পায় তো চলতে চলতে জপ করবে।

"রাত্রে রুটি কম খেতে হয়। আর সর্বদা একটা প্রার্থনার ভাব, একটা উচ্চ চিন্তার স্রোত থাকা চাই। আর একটা ভাব থাকা চাই যে, আমাকে এই জীবনেই তাঁর দেখা পেতে হবে। তাঁকে ডেকে ডেকে ডাকার পালা শেষ করতে হবে—'মা গো, তোমায় কেমন ক'রে ডাকি ? আমায় এমন ক'রে ডাকতে শেখাও যেন এক ডাকেতে শেষ হয়ে যায় মা, চিরজীবনের ডাকাডাকি।'"

কি কথায় শিবের ভাঙ খাওয়ার কথা উঠিয়াছে। বাবা বলিতেছেন, "শিব গাঁজা

খান, ভাঙ খান—লোকে এই সব বলে। সত্যি কি আর তিনি ঐসব খান? না—না। আর যদিই বা খান তো হয়েছে কি? যিনি সমুদ্র-মন্থনের গরল খেতে পারেন, তাঁর কাছে এসব আর কি? অতি তুচ্ছ। কি জানো?—ঐ গরল খাওয়াটাকে symbolise (প্রতীক) করেছে ধুতুরা ভাঙ খাইয়ে।"

দীক্ষা সম্পর্কে বাবা বলিতেছেন: "দীক্ষা আর কি দিই? যে যাকে চায়, তাকে তার কাছে দিই। যে মাকে চায় তাকে মা দেখিয়ে দিই, যারা বাবাকে চায় তাদের বাবা দিই। বাবা ঠাকুর—আবার ঠাকুরই মা, এইতো দীক্ষা।"

তারপর রসিকতা করিয়া বলিতেছেন, "আরে তোমরাও দিলেই পারো! তুমিও তো তিনবার তিব্বত গেছ, আরও কত গেছ—কেদার কৈলাস।"

এইখানে কিছুদিনের ঘটনাবলী একসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইল খুব সংক্ষেপে:

পূজার সময় পত্নীবিয়োগকাতর জনৈক ভক্ত পুত্রকন্যাসহ আশ্রমে আসেন। বাবা তাঁহাদের লইয়া মহা আনন্দে প্রায় দুই মাস কাটান। কখনও-ঠাকুরের কথা, কখনও স্মৃতিকথা, কখনও রসিকতা, সর্বোপরি উৎসবের পর উৎসব, দুর্গাপূজার পর কালীপূজা, তারপর জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতিতে আশ্রমকে মনে হইত মর্ত্যলোকের বাহিরে—কোন দেবভূমি—বুঝি বা সাক্ষাৎ কৈলাস!!

দুর্গাপূজার কয়দিন বাবা ভাবে মাতোয়ারা ছিলেন—বিশেষতঃ দশমীর দিন। কালীপূজা সারারাত্রি ধরিয়া হইল; পরদিন সকালে বাবা জগদ্ধাত্রীপূজার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—তিন পূজার তিন রঙের কাপড় চাই। কুমারীপূজা করিবেন বাবা নিজে।

'কে এত খরচ দিবে?'—জিজ্ঞাসিত হইলে বাবা ইসারায় উক্ত ভক্তটিকে দেখাইয়া দিলেন। আয়োজন অতি সুন্দর হইয়াছিল। বাবাও ছেলেমানুষের মতো মাতৃপূজার হিল্লোলে মাতিয়া গেলেন। পূজার দিন বেলা ১০।১১টার সময় ঐ ভক্তেরই অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাটিকে কুমারীপূজা করিলেন ফল ফুল মিষ্টি দিয়া।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় বাবা বিকালের দিকে এক একদিন এক একরকম সাজিতেন—বড় বড় রুদ্রাক্ষ গলায়, দণ্ডকমণ্ডলুহাতে নেপালী বাবা; নীল আলখাল্লাপরা বদনাহাতে মুসলমান ফকীর; বর্মা হইতে প্রেরিত পোশাক ও ছাতাসহ বৌদ্ধ ফুঙ্গী। একদিন শাড়ী (ও বোধ হয় বালা)-পরিহিতা মা-যশোদা। সকলগুলিই (সকলের—বিশেষতঃ ভক্তটির মাতৃহারা সন্তানদের চিত্তবিনোদনের জন্য কিংবা) তাঁহার জীবনের কোন গূঢ়রহস্যজড়িত, তাহা তখন কেহ ভাবে নাই। সকলেই হাসিয়া লুটোপুটি খাইত। নেপালী বাবা গম্ভীরভাবে বলেন, 'হিমালয়সে আয়া', মাথায় রুদ্রাক্ষ ছোঁয়াইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন।

ভক্তটির ৭।৮টি ছেলেমেয়ে ও আশ্রমের ৭।৮টি অনাথ বালক সন্ধ্যাবেলা বাবাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। বাবা হঠাৎ রঙ্গ করিয়া ভক্তটিকে বলিলেন, "তোমারও ৮টি, আমারও ৮টি। কি বলো? একটি ছেলে আমাকে দাও।" ভক্তটি বাণবিদ্ধ হরিণের মতো শাবকগুলির দিকে চাহিতে লাগিলেন। মহারাজ তখনি বলিলেন, "থাক্, থাক্ বাবা, তোমারি থাক্।" তারপর ছেলেদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কিরে একজন সাধু হবি?" ভক্তটির বড় ছেলে অন্ধ-

কারে যাইতে ভয় পায়, তাই বাবা বলিতেছেন, "ঠাকুরের নাম শুনেছিস, আবার ভয় কিরে?" একদিন বাবা আশ্রমের ছেলেদের ও ভক্তটির ছেলেমেয়েদের লইয়া ফটো তুলেন—এই তাঁহার শেষ ছবি!

সুদীর্ঘ দেড় মাস এইভাবে কাটাইয়া শোকের সকল চিহ্ন মুছিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া ভক্তটি চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা বাবা সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আরতির পরই সকলে রোজ এখানে চলে আসবে। আমি অনেক সব কথা ব'লব"—বলিয়া বাবা বলিতে লাগিলেন:

"সাধুসঙ্গ খুব দরকার। আমরা কি কম সাধুসঙ্গ করেছি? যেখানে যখন সুবিধা পেয়েছি—করেছি। সাধুসঙ্গ না হ'লে কি কিছু হয়? 'তুলসী ইয়ে জগমে পাঁচো রতন হৈ সার। সাধুসঙ্গ হরিকথা দয়া দীন উপকার।' স্বামীজী বলতেন—'সাধুসঙ্গ থেকেই হরিকথা ভগবানের কথা, দয়া, দীনতা, উপকার, সব। সাধুসঙ্গ থেকেই সব।' সাধুসঙ্গ থেকেই প্রথম ধর্মভাব জাগে। সংসারে তো সব ভিজে রয়েছে—সুখভোগ-বাসনার রসে। জলবে কি ক'রে? একটু তাতিয়ে নিতে হয়। তবে যদি চকমকি পাথর হয়, তার কথা আলাদা। হাজার বছর জলে ডুবে থাকলেও যখনি উঠিয়ে নিয়ে ঘসবে, তখনই আগুন জলে উঠবে। সে রকম কই? কটা হয়?"

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আবার বলিতেছেন, "দেখ, ত্যাগের ওপরই সব বড় বড় কাজ নির্ভর করে। কখনও বহরমপুরে গিয়ে চার আনার জলখাবার খাইনি—বড়-জোর একটা ডাব, বরং গাড়োয়ানকে খাইয়েছি, —দের বাড়িতে দুপুরটা খেতুম। পাছে পাঁচ ব্যঞ্জন করে তাই বলে দিতুম—শুধু ভাতে-ভাত, এর বেশি করলে আর আসব না। নেহাত অনিচ্ছেয় ওরা তাই দিত, আর কত ব'লত এ ঠিক হচ্ছে না—একদিন আমাদের ইচ্ছেমত খেতে হবে।

"কখনও আশ্রমের পয়সায় নিজের জামা কাপড় কিনিনি। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পাঠিয়ে দিতেন। পরে অবশ্য অনেক অনেক হয়েছে। কখনও ভাল বিছানায় শুইনি, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকে গেলে বড় কষ্ট হ'ত, তাই একটা পাশের বালিশ না হলে নয়—তার আবার ওয়াড় থাকত না—একটা পুরানো কাপড় জড়ানো—গেঁরো বাঁধা, সকলকে খাইয়েছি, পরিয়েছি, যথাসাধ্য সুখে রাখবার চেষ্টা করেছি। এখনকার এই ঘর, খাট বিছানা বালিশ, জামা কাপড় দেখে কিছুই বোঝা যাবে না।

"এই দেখ, ম — বহরমপুরে চাল আদায় ক'রত, সকাল থেকে দুটি মুড়ি খেয়ে থাকত, বিকেলবেলা কাঠের ধোঁয়ায় চোখের জলে মুখের জলে ভিক্ষের চালের সঙ্গে একটি আলু সিদ্ধ করে খেত। তার কষ্ট দেখে কলেজের ছেলেরা বললে—আমরা চাল তুলে দেব, সব ব্যবস্থা ক'রে দেব—আপনি আমাদের হাঁড়ি দিয়ে যান। এই দেখ—ঐ ত্যাগটুকু দেখলে, তাই তো এগিয়ে এল।

"পুরীতে দেখলাম—নানারকম ভোগরাগ, মা-লক্ষ্মীর দর্শন, স্পর্শন। 'মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বললাম। তিনি বললেন, 'তোমার আর ভাবনা নেই। মা-লক্ষ্মীর কৃপায় আশ্রমের আর অভাব অনটন হবে না।' সত্যি, তারপর থেকে আর কখনও কিছুর অভাব হয়নি, যখনি যেটি দরকার জুটে গেছে।"

শ্রীঅরবিন্দের পদপ্রান্তে কিছুক্ষণ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মনের জগৎ, প্রাণের জগৎ এবং দেহের জগৎ—এই নিয়ে আমাদের বাসভূমি ত্রিভুবন। কিন্তু এই তিনের পৃথক পৃথক সত্তাকে খুব উগ্র ক'রে দেখা ঠিক নয়। জড়ের মধ্যে অনুস্যূত প্রাণই নিজেকে প্রকাশ করেছে চেতন মনের চিন্তার মধ্যে। কিন্তু মনে এসেই কি জড়ের এবং প্রাণের দৌড় ফুরিয়ে যায়? না। মনের (mind) মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে আছে অতিমানস (super-mind)। এই অতিমানস থেকে এসেছে মন (mind), প্রাণ (life), দেহ (body)। ত্রয়ীর নিয়ন্তাও এই অতিমানসই। অতিমানসের মধ্যে মন-প্রাণ-দেহ এ তিনের অভিব্যক্তি অনিবার্য। যার মধ্যে যা সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মধ্যে তার প্রকাশ স্বভাবের এবং স্বধর্মের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে হবেই হবে। মন যদি অতিমানসের আধার হয় তবে তাকে প্রকাশ না ক'রে মনের অব্যাহতি আছে? বটের বীজ বটগাছকে প্রসব করবেই। আজ, না হয় কাল। মনের কোন মৌলিক এবং স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মনের উপরে অতিমানসেরই চূড়ান্ত স্বাক্ষর। অতিমানসকে বাদ দিয়ে মন থাকতেই পারে না। অতিমানসকে আশ্রয় করেই যিনি সর্বব্যাপী সৎ তিনি তাঁর সৃষ্টির খেলা খেলছেন।

কিন্তু প্রাণের সংজ্ঞা কি? সচ্চিদানন্দের সঙ্গে প্রাণের (life) সম্পর্কই বা কি? কোন্ প্রয়োজনে প্রাণ এলো এই পৃথিবীতে? সচ্চিদানন্দের চিৎ-শক্তি থেকে অথবা হ্লাদিনী শক্তি থেকে? কোন্ যুগ-যুগান্তের ওপার থেকে ভেসে-আসা একটি আর্তনাদ পুরানো সুরে আজও আমাদের কানে বাজছে, জীবন দুঃখময় একটা মায়া, একটা প্রলাপ, একটা পাগলামি যার থেকে পালিয়ে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে যিনি নিত্য তাঁর প্রশান্তির মধ্যে। কিন্তু জীবনে কি সত্য-সত্যই অমঙ্গলের ছড়াছড়ি? তাই যদি হয় তবে জীবন কেন এমন দুঃখময় হোলো? যিনি শাশ্বত, অপরিণামী তিনি স্বেচ্ছায় নিজের উপরে এত দুঃখ চাপালেন কেন? অথবা তাঁর ভয়ঙ্করী দৈবী মায়ায় সৃষ্ট প্রাণিগণকে কেন এমন একটা অস্তিত্বে অভিশপ্ত করলেন যা উন্মাদের অসম্বদ্ধ প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়? যার মাথা-মুণ্ডু ব'লে কিছুই নেই? অথবা যে-জীবনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুঃখে এমন অভিশপ্ত—তার মধ্যে রয়েছে পরমানন্দঘন নিত্যসত্তার আনন্দরূপেরই কোন প্রকাশ? তাঁর নিজের মধ্যে যে একটি নিঃসীম আনন্দ রয়েছে তাকে তো ব্যক্ত করতে হবে। এই আনন্দের শক্তিই কি আত্মপ্রকাশের দুর্বার তাগিদে দেশের এবং কালের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত সংখ্যাহীন সৌরজগতের অগণিত প্রাণ-রূপে নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশ ক'রে চলেছে?

এই প্রাণের ভিত্তি জড়। জড়ের পর্যায় থেকে প্রাণ নিজেকে কেমন ক'রে পৃথিবীতে ব্যক্ত করছে—তার রহস্য তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে, প্রাণ এক এবং অখণ্ড বিশ্বশক্তিরই একটি রূপ। যে শক্তি অসংখ্য রূপকে গ'ড়ে তুলছে, তাদের সঞ্জীবিত ক'রে

রেখেছে জীবনের একটি নিরবচ্ছিন্ন চঞ্চলতায়, তাদের রক্ষা করছে একটি অন্তহীন প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এবং তাদের সত্তাকে নিত্য নূতনত্ব দান ক'রে—প্রাণ সেই শক্তিরই বিরামহীন খেলা ছাড়া আর কি? প্রাণের মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী শক্তিরই একটি গতিবেগের পরিচয় অরবিন্দ বলছেন, মৃত্যু ব'লে কিছু নেই। প্রাণের নাট্যলীলায় মৃত্যুর যে একটি ভূমিকা আছে—সে তো প্রাণেরই অপরিহার্য অঙ্গহিসাবে। Death has no reality except as a process of life. সত্তার নিয়ত পরিবর্তনই তাকে চিরনবীন ক'রে রাখছে। যেখানেই প্রাণের লীলা সেখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি 'অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে।' একটি নিরন্তর পরিবর্তনের প্রবাহ না থাকলে সৃষ্টির নদী কি হারিয়ে ফেলতো না তার তরঙ্গ-বেগ একটা ভয়ঙ্কর নিশ্চলতার মধ্যে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।' গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটসের সেই কথা: You cannot bathe twice in a river. এক নদীতে দুবার তুমি স্নান করতে পারো না। যে-নদীতে স্নান করেছিলে তার সেই জল এখন তো আর সেখানে নেই। কোন্ দুরান্তে বিলীন হয়ে গেছে। নতুন জল পুরাতনের স্থান অধিকার করেছে। নদীর ধারা মানেই জলবিন্দুগুলির নিয়ত এবং খুব দ্রুত পরিবর্তন। জ্যান্ত নদী মানে হচ্ছে যাতে প্রবাহ আছে, জলবিন্দুগুলি যেখানে নিশ্চল নয়, যেখানে পুরাতন প্রলয়ের মধ্যে নিজেকে নিমেষে নিমেষে নিঃশেষ ক'রে ফেলছে। প্রাণের প্রয়োজন আছে এই পরিবর্তনে। পরিবর্তনে প্রাণের এই যে একটি দুর্বার প্রয়োজন আছে—এই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য মৃত্যু একটা দ্রুত বিপর্যয় (rapid disintegration) ছাড়া আর কি? আর দেহের মৃত্যুতেই কি প্রাণের লয় হয়ে গেল? যে-উপাদানে জীবনের একটি বিশেষ রূপ তৈরী হয়েছিল সেই উপাদান ভেঙে গেল। ভেঙে-যাওয়া উপাদান প্রাণের নব নব রূপকে যে আবার গড়ে তুলবে না—তা কে বললো? প্রাণের শাশ্বত সত্তার নব নব রূপের মধ্যে এই যে আত্মপ্রকাশ—এ তত্ত্বটিই ছন্দোবদ্ধ সুন্দর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই পংক্তিগুলিতে:

"যতটুকু ধূলি
আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী রহে না, তুচ্ছ সে বিচার।
বিরাটের মাঝে
একরূপে নাই হ'য়ে অন্যরূপে তাহাই বিরাজে।
মুক্তাকাশে চেয়ে দেখো প্রলয়ের
আনন্দস্বরূপ…"

এই প্রাণের প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলছেন, "জড় আর প্রাণের মধ্যে একটা অনড় ভেদ-রেখা টানবো কোথায়? কোথায় জড়ের সুরু ও শেষ? কোথায় বা প্রাণের আরম্ভ? অরবিন্দের ভাষায়, প্রাণ প্রচ্ছন্নই হোক আর ব্যক্তই হোক, সুসম্বদ্ধ অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের হোক্—মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে তার সর্বজনীন অস্তিত্ব। যা-কিছু পার্থক্য—সে শুধু প্রাণের বিচিত্র রূপে এবং সংগঠনের মধ্যে।" মানুষের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ যতখানি তরুলতার মধ্যে ততখানি নয়। ধাতুর মধ্যে সে প্রকাশ আরও কম। তফাত শুধু প্রাণের প্রকাশের তারতম্যে। তার অস্তিত্ব সর্বব্যাপী।

এযুগে এমন একটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয় যে, পরমাণুর মধ্যেও এমন কিছু আছে যা আমাদের মধ্যে সংকল্পে

এবং ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির সর্বত্র ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এই ইচ্ছা এবং সংকল্পের সর্বব্যাপিত্ব অবশ্যই আমাদের কাছে এখনও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তা না উঠুক। ওদের মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে আছে অনুভূতি এবং চৈতন্য যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে সর্বত্র। জড়ের প্রতি পরমাণুতে যখন অনুভূতি রয়েছে, চৈতন্য রয়েছে, তখন সবকিছুই অনুভূতিসম্পন্ন এবং চৈতন্যময়; কারণ প্রতিবস্তুই তো পরমাণুর সমষ্টি। আর পরমাণুতে চেতনার অস্তিত্ব যে আমরা স্বীকার ক'রে নেবো তার কারণ, যে-পরমাশক্তি পরমাণু তৈরি করছেন এবং পরমাণুতে অনুস্যূত হ'য়ে আছেন, সেই শক্তিই যে মূলতঃ চিৎ-শক্তি। এই শক্তি চিন্ময়ী। গাছ-পালার মধ্যে যে একটি অস্ফুট অনুভূতি আছে তার মধ্যে এই চিৎ-শক্তিরই স্তিমিত প্রকাশ। জীব-জন্তুর ইচ্ছা-শক্তিতে এই চিৎ-শক্তিই প্রকটিত। আর মানুষে দেখতে পাই, এই চিৎ-শক্তিই দুর্জয় মানসিক সংকল্পের এবং প্রজ্ঞার মধ্যে ব্যক্ত হ'য়ে তাকে গৌরবে মুকুটিত করেছে।

মানুষ থেকে পরমাণু পর্যন্ত সর্বত্র তা হ'লে একই প্রাণের পরিব্যাপ্তি। পরমাণুতে চেতনা প্রচ্ছন্ন, জীব-জন্তুতে ক্রমবিকাশের পথে চৈতন্য অবারিত হয়েছে, গাছপালার আসন ক্রম-বিকাশের রাস্তায় জড় এবং প্রাণের মাঝামাঝি। জড়ে জীবন-চাঞ্চল্য সুপ্তির আবরণে ঢাকা; চেতনা কোন্ মগ্ন চৈতন্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন! ক্রম-বিকাশের উচ্চতর স্তরে প্রাণ বুদ্ধির মধ্যে, মননশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আসলে প্রাণ (life) চিৎ-শক্তিরই বিশ্বব্যাপিনী খেলার অঙ্গ, a universal operation of Conscious-Force. বস্তুজগতে এই চিৎ-শক্তির ক্রিয়ায় চৈতন্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অবচেতনার রাজ্যে। এই চিৎশক্তির খেলাই তো নাম-রূপের এই জগৎকে গড়ছে, রক্ষা করছে, ভাঙছে, ভেঙে আবার গড়ছে নব নব রূপে। শক্তির এই খেলার মধ্যান্তরে আমরা প্রাণের সঙ্গে মুখোমুখী হচ্ছি। প্রাণ জড়ের পর্যায়ে পড়ে না, মনের পর্যায়েও নয়। প্রাণ জড়ের এবং মনের মাঝামাঝি। প্রাণের মধ্যে মন অনুস্যূত হয়ে আছে, আর জড়ের উপাদান হচ্ছে প্রাণ। প্রাণ হচ্ছে সর্বব্যাপী এবং এই সর্বব্যাপী প্রাণেরই তরঙ্গলীলা বস্তু-জগতের সর্বত্র। ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু—সর্বত্র এই প্রাণশক্তির খেলা কেন? কারণ মূলতঃ বেদান্তের চিৎ-শক্তির প্রকাশই তো আপন অসংখ্য রূপের সৃষ্টিতে, স্থিতিতে, বিনাশে। এই চিৎশক্তির সর্বব্যাপিনী লীলাকেই তো আমরা প্রাণ বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভাষায় (Life force) বলে থাকি।

প্রাণ যে-রূপেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হোক না এবং যে-ভাবেই কাজ করুক না—প্রাণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শক্তি। বিশ্ব-ময় যে মহাশক্তি কাজ করে চলেছে, সব কিছুর মধ্যে সঞ্চারিত করছে একটি জীবন-চাঞ্চল্য, পুরানোকে ভেঙে চুরে সৃষ্টি করছে নব নব রূপ—প্রাণের মধ্যে এই বিশ্বশক্তিরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলা। যে-জড়জগতে বাস করি আমরা সেখানে মন রয়েছে প্রাণের মধ্যে নিহিত, যেমন বীজের মধ্যে গাছ। সেই মনের চেতনা অস্ফুট। মনের মধ্যে অতিমানস প্রচ্ছন্ন প্রাণের মধ্যে মনের মতোই রয়েছে। আর জড় সে। কবে থেকে নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছে প্রাণকে। জড় জগতের সুরু পরমাণু থেকে এবং এই পরমাণুর মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে

ইচ্ছা, সংকল্প, চৈতন্য—যে গুলিকে প্রস্ফুট বলা যায় না, সুসম্বদ্ধও বলা যায় না। পরমাণুর মধ্যে energy ঠাসা। এই জড় থেকে ব্যক্ত হয়েছে প্রাণ। প্রাণ নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ মনকে দিয়েছে মুক্তি জীবন্ত দেহের আশ্রয় নিয়ে। মনের মধ্যে যে অতিমানসের ক্রিয়া চলেছে গোপনে গোপনে—তাকে অবারিত না ক'রেই বা মনের নিস্তার কোথায়? প্রত্যেক সত্তারই একটি অন্তর্নিহিত সত্য আছে যা তার স্বভাব, স্বধর্ম। সেই সত্যটিকে তাকে প্রকাশ করতেই হবে। সুতরাং মনের মধ্যে অতিমানসের সত্য যদি নিহিত থাকে তবে সেই অতিমানসকে (super-mind) আজ হোক, কাল হোক অথবা শত শতাব্দী পরেই হোক, ব্যক্ত না ক'রে মনের গত্যন্তর আছে?

কিন্তু প্রাণের এই লীলায় মৃত্যু কেন? আবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসে পড়লো। অরবিন্দের মৃত্যুর ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। দেহকে আশ্রয় করে প্রাণ ব্যক্ত করেছে নিজেকে। এই প্রাণের একটি ধর্ম আছে, একটি লক্ষ্য আছে। প্রাণের এই ধর্মের এবং লক্ষ্যের মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে 'to seek infinite experience on a finite basis.' প্রাণের স্বভাব এবং স্বধর্মই হচ্ছে সীমিত আধারে অনন্তকে অন্বেষণ করা, নব নব অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে চলা। আর এই চলার নেশা প্রাণকে কোথাও থামতে দিচ্ছে না। আত্মা ক্ষণকালের জন্য দেহের সীমানায় বাঁধা পড়লেও তার অসীমকে সে ভুলবে কেমন ক'রে? সে জানতে চায় নিত্য নূতনকে, পেতে চায় গভীর থেকে গভীরতর আনন্দের নব নব আস্বাদন, আপন শক্তির নিঃসীম প্রাচুর্যকে অনুভব করতে চায় নব নব কীর্তির, নব নব সংগ্রামের, নব নব দুঃখবরণের মধ্যে। কিন্তু যে দেহের আশ্রয়ে আসা অনন্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, সে দেহ তো ক্ষণভঙ্গুর, 'অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব'। আত্মায় অনন্তের ক্ষুধা কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর আধারে অন্তহীন অভিজ্ঞতা কুড়ানো সম্ভব নয়। আত্মার পক্ষে অন্তহীন অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব শুধু একটি উপায়ে—পুরানো আধার ত্যাগ ক'রে নব নব আধার গ্রহণ। কত জন্ম-মৃত্যুর খেয়া বেয়ে, কত মরণের সিংহদ্বার অতিক্রম ক'রে আত্মা তাই চলেছে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে। অনন্তের দুর্বার আহ্বানে আত্মার এই জয়যাত্রায় আধারের পরিবর্তন অপরিহার্য আর দেহান্তরগ্রহণ মানেই তো পুরানো দেহের বিলয়। মৃত্যুর সার্থকতা ও প্রয়োজন এখানেই। মৃত্যু মানে প্রাণকে অস্বীকার করা নয়; প্রাণ নিজেকে চিরনূতন রাখবার জন্যই মৃত্যুর আশ্রয় নিচ্ছে। রূপের নিত্য পরিবর্তনই হচ্ছে একমাত্র অমৃতত্ব যার আশা করতে পারে আমাদের সীমিত এই প্রাণ-সত্তা। অভিজ্ঞতা থেকে নব নব অভিজ্ঞতায় পৌঁছানোর অনন্ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই শুধু আমাদের সীমিত মন অসীমের আস্বাদন পেতে পারে। আধারের পরিবর্তন মানে নিশ্চয়ই জন্মে জন্মে ঠিক এক ধরনেরই দৈহিক জীবনযাপন নয়। এ জন্মের দৈহিক জীবনের প্যাটার্নটি যদি পর জন্মেও অনুসৃত হয়, এ জন্মের মনের কাঠামো যদি জন্মান্তরে অপরিবর্তিত থেকে যায়, তবে অভিজ্ঞতার যে বৈচিত্র্য আমাদের প্রাণ এমন গভীর ক'রে চায় সে বৈচিত্র্য সম্ভব নয়। মৃত্যু তাই এসে পুরাতন আধার ভেঙে দেয় এবং দান করে তাকে নবতর রূপ। মৃত্যু আমাদের মনটাকেও দেশ-কাল-পরিবেশের নূতনত্বের মধ্যে একটা নূতনতর ছাঁচে নিক্ষেপ করে। নতুন দেহ, নতুন মন না হ'লে নতুন অভিজ্ঞতা কেমন

করে সম্ভব? তবু মৃত্যুকে আমরা এত যে ভয় করি, তার কারণ, মৃত্যুর সামনে আমাদের মনে হয়—কোন্ মহা অজানার রাহুগ্রাসের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, জীবনের কলরব-মুখর উৎসবক্ষেত্র থেকে কোন্ অ-চেনা ভয়ঙ্কর যেন আমাদিগকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করছে একটি অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু যে-মৃত্যু একটা 'necessary and salutary change' অর্থাৎ একটা প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণপ্রদ পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয় তাকে কি ভয় করবার সত্যিসত্যিই কোন কারণ আছে?

এইবার প্রাণের যে স্তরবিন্যাস করেছেন শ্রীঅরবিন্দ, তার সম্পর্কে কিছু না বললে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সংক্ষেপেই বলি, প্রাণের জয়যাত্রার সুরুতে, তার প্রাথমিক স্তরে দেখতে পাচ্ছি পরমাণবিক সত্তায় জীবনের চাঞ্চল্য নেই কোন। সেই অস্তিত্বের মধ্যে জড়ের একটা নিশ্চল শক্তিহীনতা। নিজেকে উপলব্ধি করবার, প্রতিষ্ঠিত করার, পূর্ণ ক'রে পাওয়ার কোন প্রয়াস নেই সেই আণবিক সত্তায়। সেই সত্তা ব্যক্তিসত্তায় একান্তভাবে সীমিত এবং তা' পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাণের দ্বিতীয় স্তরে দেখতে পাচ্ছি, সেই প্রাণ জিগীষার প্রবর্তনায় ছুটেছে পরিবেশকে জয় করতে; সেই জিগীষায় আত্মজয়ের সংকল্পও বিদ্যমান। নিজের অপূর্ণতা সম্পর্কে একটা চেতনা প্রাণের এই দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য। প্রাণের তৃতীয় স্তরে তার জয়যাত্রা পৌঁচেছে আত্মকেন্দ্রিক কামনা থেকে প্রেমে, পারস্পরিক সহযোগিতায়, বৃহত্তর সমষ্টি-জীবনের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার আনন্দিত সম্প্রসারণে, অন্যের কাছে নিজেকে দেওয়ার এবং অন্যকে নিজের কাছে পাওয়ার প্রবণতায়। নিজেকে অন্যের কাছে উৎসর্গ করেই শুধু নিজেকে ঐশ্বর্যশালী করতে পারি আমরা। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, প্রাণের জয়যাত্রায় প্রেমের এই তৃতীয় স্তরই চূড়ান্ত নয়। একটি চতুর্থ স্তরও আছে যেখানে আত্মার (Spirit) ঐক্যের এবং অবারিত মুক্তির মধ্যে বিচিত্রের ঐক্য একটি পরম-সার্থকতায় গিয়ে পৌঁচেছে। এই চতুর্থ স্তরে প্রাণের সর্ববিধ লীলার চেতন ভিত্তি দেহগত বিচ্ছিন্নতায় নয়, জৈব লালসায় এবং তৃষার্ত হৃদয়ের জান্তব প্রবৃত্তিতে নয়, মনের অসম্পূর্ণ সামঞ্জস্যগুলিতে এবং ঘটনাবিন্যাসে নয়, এ সমস্তের একত্রিত সমাবেশেও নয়। প্রাণের এই বহু-বাঞ্ছিত চতুর্থ স্তরে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একটি শাশ্বত ঐক্য আছে, সেই ঐক্য সত্য হয়ে উঠেছে মানুষের আত্মিক জীবনের বিকাশকে আশ্রয় ক'রে, পরমাত্মার সঙ্গে প্রাণের অখণ্ড যোগে এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রাণের অবারিত মুক্তিতে

রামমোহন ঃ দ্বিশতবার্ষিকীর আলোকে

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস করার আগে থেকেই রামমোহনের যে নিজস্ব ধর্মমত গড়ে উঠেছিল, তার নানা প্রমাণের মধ্যে তাঁর 'তুহ্‌ফাত্‌-উল-মুয়াহ্‌হিদীন' গ্রন্থটি যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি স্মরণীয় যে, রংপুরে থাকাকালেই রামমোহন তাঁর নিজস্ব মতামতের দ্বারা স্থানীয় জনসমাজে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। প্রতিমাপূজার বিপক্ষে তাঁর যুক্তি এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রতি তাঁর একান্ত বিশ্বাস—এ দুই-ই সেকালে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিকর মনে হয়েছিল। রংপুরের স্থানীয় জজ আদালতের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য রামমোহন-বিরোধীদের অগ্রণী হয়ে দাঁড়ালেন। সংস্কৃতে ও পারসীতে সুপণ্ডিত এই গৌরীকান্তের বিরুদ্ধতায় রামমোহন অবশ্য বিশেষ কিছু বিচলিত হননি।[1] কিন্তু পরবর্তীকালে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সমর্থনকারীদের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্কপ্রসঙ্গে একালে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে।

গৌরীকান্ত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের কথা মনে রেখেই বলা চলে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে যাঁদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়নি, শাস্ত্রই তাঁদের অবলম্বন। সাকার বা নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্বে "বিশ্বাস" এঁদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শ্রুতিগত ইতিহাস। সেকালে ধর্মবিষয়ক বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে প্রত্যক্ষ সাধনার দ্বারা যাঁরা সত্যলাভের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের সাক্ষ্যই ধর্মচেতনার দেশ ভারতবর্ষে অনেক বেশী মূল্যবান।

রংপুরের ধর্মচর্চা এসে কলকাতায় রীতিমতো আলোচনা-কেন্দ্রের আকার নিলো রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয়সভায়"।[2] এ সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন ছিল। রামমোহনের সৃজনশীল প্রতিভার উদাহরণস্বরূপ তাঁর বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির কিছু কিছু এই সময়েই রচিত। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড থেকেও তিনি পুত্র রাধাপ্রসাদকে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত (কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি) তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন।

বাংলা গানের ইতিহাসে ভক্তিমূলক সঙ্গীতরচনায় রামমোহন ও পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজের অনেক কবি ও গীতিকারের বিশিষ্ট দান অবশ্য স্বীকার্য। এঁদের মধ্যে রামমোহনের গান তাঁর তত্ত্বচিন্তা, নৈতিক আদর্শ নিরাকার সাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত অধ্যাত্মবিশ্বাসের সুন্দর উদাহরণ। সমকালীন বাংলা গানে ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালা, নিধুবাবুর টপ্পা, দাশরথি রায়ের পাঁচালি প্রভৃতির কথা মনে রাখলে গীত-রচনার আদর্শে রামমোহনের অন্তর্মুখী সংযম একটু স্বতন্ত্রই ঠেকে। এযুগে

---

১ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : ৩য় সংস্করণ : পৃঃ ২৫

২ রামমোহন রায় : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিকে যেমন আদিরসের জোয়ারে বাংলার গায়ক ও শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন, তেমনি ভক্তিরসের প্রবাহও তাঁদের হৃদয় মনের পরিতৃপ্তি সাধন করতো। এই দুই-জাতীয় উচ্ছ্বাস থেকে দূরে রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁর বেদান্তচিন্তার বাহনরূপেই এক নূতন বাণীভঙ্গী নিয়ে বাংলার সঙ্গীতজগতে আবির্ভূত। "আত্মীয়সভা"র এক অধিবেশনে (১৮১৬) রামমোহনের এই গানটি গাওয়া হয়েছিল—

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

উদ্ধৃত গানটিতে প্রতিমাপূজা বা অবতারবাদী চিন্তাধারা এ দুয়ের প্রতি কটাক্ষই লক্ষণীয়। এ-জাতীয় গানের আর একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন
বিসর্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বলে তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব এ বিশ্ব যাহার।

বলা বাহুল্য, কবিতা বা গানের আকারে উপস্থাপিত হলেও এ সব বক্তব্য বিতর্কেরই রকমফের। অসীম অনন্তকে মানুষ রূপের সীমায় যখন থেকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছে নানা দেশে নানা যুগে তার নানা আকার স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে। রূপের অবলম্বন যে অরূপের উদ্দেশে যাত্রার জন্য, একথা ভারতীয় দেবকল্পনার ক্রমাভিব্যক্তির কাহিনী থেকেই লক্ষণীয়। বৈদিক যুগে যেমন বরুণ বা অগ্নি শেষ অবধি এক পরমব্রহ্মের প্রকাশ, তন্ত্রমন্ত্রের যুগেও নানারূপে শিবশক্তি-উপাসনার মাধ্যমে পরম অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত হওয়াই এ দেশের অধ্যাত্মসাধনার চরম আদর্শ।

হরিহরানন্দের কাছে মহানির্বাণতন্ত্রের উদার অদ্বৈতভাবনার উত্তরাধিকার গ্রহণের সময় উক্ত তন্ত্রের তৃতীয়োল্লাসে বিধৃত 'ওঁ নমস্তে সতে তে সর্বলোকাশ্রয়ায়' বন্দনা দিয়ে শুরু বিখ্যাত ব্রহ্মস্তোত্রটির দ্বারা তিনি যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮) পুস্তিকায় স্তবমন্ত্রের আকারে সেটির সংকলন। 'ব্রহ্মকবচ' নামে মহানির্বাণে উল্লেখিত এই স্তবটি পাঠের অন্তে প্রণামমন্ত্রটিও নিশ্চয় রামমোহন অনুমোদন করতেন—

ওঁ নমস্তে পরমব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ॥
[তৃতীয়োল্লাস-৭৪]

তুমি পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার; তুমি গুণাতীত, সৎস্বরূপ—তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

আর এই তৃতীয়োল্লাসেই ব্রহ্মদীক্ষার যে বিবরণ রয়েছে, তাও যে রামমোহনের আদর্শ-অনুযায়ী স্বীকৃতি পাবে—সেকথাও মেনে নেওয়া যায়। অথচ 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র চতুর্থ উল্লাসে যে আদ্যাশক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মচেতনার আর এক

প্রকাশ রয়েছে, সে সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য কী, তা আজ জানার উপায় নেই। শিবের বন্দনায় দেবীর মহিমার প্রথম শ্লোকটি এই—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
[চতুর্থোল্লাস, ১০]

তুমিই পরমাত্মা, পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরমা প্রকৃতি। হে শিবে! তোমার থেকেই জগতের উৎপত্তি, তুমি জগতের জননী।

আর এই দেবীসাধনার উদ্দেশ্য তন্ত্রের ভাষায়ই 'ব্রহ্মসাযুজ্য'।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রামমোহন নিজে এই ব্রহ্মসাযুজ্যই চাইতেন কি না। দেবীপূজার অংশটি যে রামমোহন বিশদভাবে আলোচনা করতে পারেন না, সে কথা মেনে নিয়ে রামমোহনের বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে মনেই হতে পারে যে, তিনি বেদান্তসাধনার চরমতত্ত্বেই আগ্রহী। কিন্তু যদি আমরা মনে রাখি যে, রামমোহন উপাসনার ক্ষেত্রে উপাস্য ও উপাসকের পার্থক্য-টুকু একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি, তাহলে দেখবো প্রতিমাপূজায় বিশ্বাসী না হলেও নিরাকার ব্রহ্মের সর্বতোব্যাপী সত্তার প্রতি অনুরাগময় ভক্তিই তাঁর সাধনার অবলম্বন। এ ভক্তিতে জ্ঞানমিশ্রা-আদর্শেরই প্রাধান্য। কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্ম আন্দোলন যে চিনি হওয়ার চাইতে চিনি খাওয়ার পথেই অগ্রসর হলো তার মূলসূত্র রামমোহন-মানসেই সূক্ষ্মভাবে নিহিত। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যকে অনেকক্ষেত্রেই অনুসরণ করলেও রামমোহনের অধ্যাত্মসাধনা পরিপূর্ণভাবে অদ্বৈতপন্থাকে স্বীকার করেনি।

শঙ্করাচার্যের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসের আবশ্যিক সর্তস্থাপনে মহানির্বাণতন্ত্রের অষ্টমোল্লাসে বর্ণিত সন্ন্যাসগ্রহণের পদ্ধতিবর্ণনায় সংসার-ত্যাগের যে মহিমাকীর্তন রয়েছে, রামমোহনের রচনাবলীতে সে দিকটি উপেক্ষিত। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শে তাঁর শ্রদ্ধা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মসমাজে সন্ন্যাস-বিরোধী মনোভাবে পরিণত। দেবেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ অবধি ব্রাহ্ম চিন্তাধারায় শঙ্করের সমর্থিত বৈরাগ্যসাধনাকে যথাসম্ভব লঘু করে দেখবার চেষ্টাই দেখা যায়। অথচ রামমোহনের আধ্যাত্মিক আদর্শে সংসারের অনিত্যতাচিন্তন সাধনার একটি অঙ্গস্বরূপ। 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর', 'একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ', 'মানিলাম, হও তুমি পরম-সুন্দর', 'গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষণে' প্রভৃতি সঙ্গীতের মূল বক্তব্য কিন্তু রূপরস-গন্ধময় পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি-উদ্রেকের চেষ্টা। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে রামমোহনের হৃদয়গত অনন্তসত্যের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ বাংলা গানে ও সংস্কৃত স্তবে মিশে এমন রূপ পেয়েছে—

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে সমানভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ। বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

"আত্মীয়সভা" (১৮১৬) থেকে "ব্রাহ্মসমাজে" (১৮২৮) পরিণতির পথে রামমোহন-মানসের বিবর্তনে তাঁর নিজস্ব আদর্শে বেদান্তের সাধনাকে নবরূপদানের প্রচেষ্টাটুকু স্মরণীয়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

উদ্বোধনে

শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে যেই গিয়াছে সেই অনুভব করিয়াছে, সে জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস পাইয়াছে—অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। স্বতঃই মনে হয় অনন্তশক্তিময়ী মা যে করুণামূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করিবার, ভালোবাসিবার ও পূজা,প্রণাম করিবার সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে একমাত্র আশ্রয় এবং অভয়। শ্রীশ্রীমায়ের অতুলনীয় মহিমা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। যিনিই তাঁহার সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন অনাবিল শান্তি, অফুরন্ত ভালোবাসা, অসীম স্নেহ এবং সর্বোপরি বিশ্বমাতৃত্বের আভাস।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমি কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষ্যে কলিকাতা যাই এবং আমার মাসতুত ভাই শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করি; তিনি আলিপুরস্থ কোচবিহার মহারাজার উডল্যাণ্ড প্যালেসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের স্নেহধন্য ছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ বৎসর মাঘমাসে রামেশ্বরদর্শনে দাক্ষিণাত্যে যান, কাজেই শ্রীশ্রীমায়ের অভয়পদদর্শনের আকাঙ্ক্ষাপূরণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। নিজের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা এবং দাদার অনুরোধে প্রায় দুইমাস কলিকাতায় থাকিয়া মঠ, উদ্বোধন এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিতেছিলাম। যদি ভাগ্যক্রমে মা আসিয়া পড়েন ভাবিয়া চৈত্রমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। এমন সময়ে ২৯শে চৈত্র জানিতে পারিলাম শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্য হইতে উদ্বোধনের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেইদিন বৈকালে উদ্বোধনে যাইয়া জানিতে পারিলাম, ঐদিন কাহাকেও দেখা করিতে দেওয়া হইবে না—শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অসুস্থ। অগত্যা পূজনীয়া গৌরীমাতার চরণদর্শনে গোয়াবাগানে অবস্থিত তাঁহার বাসায় গেলাম। তথায় তিনি পূজনীয়া দুর্গাপুরী মা এবং অপর দুই-তিনটি মহিলাসহ তাঁহার পরিকল্পিত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, পরদিন প্রাতে তিনি মাতৃদর্শনে উদ্বোধনে যাইবেন এবং সেই সময় আমাকেও তথায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন, তিনি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণদর্শনের সুযোগ করিয়া দিবেন। সেই অনুযায়ী পরদিন, চৈত্রসংক্রান্তির প্রাতে কিছু ফুল, বিল্বপত্র, একখানা কাপড় ও কিছু ফল-মিষ্টিসহ বেলা প্রায় নটার সময় বাগবাজার পৌঁছাই। তথায় গঙ্গাস্নান-সমাপনান্তে শ্রীশ্রীমায়ের বাটী উপস্থিত হইলে পূজনীয়া গৌরীমা বিলম্বের জন্য আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া অতি শীঘ্র হাত-পা ধুইয়া উপরে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, শ্রীশ্রীমা পূজা সাঙ্গ করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি উহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া

উপরে পূজার ঘরে গেলে মা তাঁহার বামপাশে স্থাপিত একখানা আসন দেখাইয়া সেখানে বসিতে বলিলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিলে প্রথমতঃ আমার সঙ্গে কোন অর্থাদি থাকিলে তাহা বাহিরে রাখিতে বলিয়া কোষার জল দ্বারা অভিষেক করিবার পর দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করিলেন। তারপর অহেতুক কৃপাময়ী (যাহা ভাবিতে পারি নাই) মহামন্ত্র দান করিয়া আমায় চিরকৃতার্থ করিলেন। আমি আত্মহারা হইয়া পুষ্পপাত্রে রক্ষিত পুষ্প-বিল্বপত্র অভয়ার শ্রীপদে অঞ্জলি প্রদান করিতেও ভুলিয়া গেলাম। করুণাময়ী মা আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উহা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তারপর একখানা থালায় সাজানো কাপড়, ফল, মিষ্টি ও সামান্য কিছু দক্ষিণা তাঁহার শ্রীহস্তে প্রদান করিলে উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে অতি স্নেহভরে আশীর্বাদ করিলেন। অঞ্জলিপ্রদানের কোন মন্ত্র না জানায় সদ্যঃপ্রাপ্ত ইষ্টমন্ত্রে অঞ্জলি দেওয়ায় মা একটু যেন হাসিলেন। তারপর ঘরের বাহিরে আসিয়া পূজনীয়া গৌরীমাকে বলিলেন, "তোমার এই ছেলেটি বড় সরল।"...আমি গৌরীমার নিকট শ্রীশ্রীমায়ের কথা জানিতে পারি এবং তাঁহার সাহায্যেই আমার এই দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে আমি এবং আমার জনৈক গুরুভ্রাতা, নাম দ্বিজেশচন্দ্র রায় (তখন আমরা উভয়ে একটি গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম, পরে তিনি সাধু হন এবং স্বামী বিদেহানন্দ নাম ধারণ করিয়া কোয়ালালামপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ হইয়া ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবপ্রচার করেন এবং হঠাৎ তথায় দেহ রাখেন) পূজার অব্যবহিত পূর্বে মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কিছু পদ্মফুল সঙ্গে লইয়া যাই। ফুলগুলি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পাঠাইয়া পরদিবস মাতৃদর্শনে যাই। মা তখন পূজার ঘরে ছিলেন এবং আমরা প্রণাম করিতেই বলিলেন, "বাবা, তোমরাই ফুলগুলি এনেছ? দেখ, দেখ, ঠাকুর কেমন সেজেছেন! ভালো ফুল না হলে কি ঠাকুর-দেবতা মানায়? তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস হোক।" সামান্য ফুলগুলি পাইয়া মা কতো আনন্দিত হইয়াছেন! তাই মনে হইল পদ্মফুল মায়ের নিশ্চিতই বিশেষ প্রিয়। পরেও দেখিয়াছি, মূল্যবান দ্রব্য অপেক্ষা তিনি ফুলেই অধিক প্রীত হইতেন—বিশেষতঃ পদ্মফুলে।

পরবৎসর মহাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলাম বেলুড় মঠে।

জয়রামবাটীতে

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ কার্তিক মাস। আমি, আমার স্ত্রী ও আমার ভগ্নীপতি ৺সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক—তিনজন কলিকাতা হইতে রেলে জয়রামবাটী রওনা হই। উদ্দেশ্য—আমার স্ত্রীর দীক্ষা এবং দীপান্বিতার দিন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণদর্শন। তখন বর্তমান বাসের রাস্তা খোলে নাই। অতি কষ্টে বিষ্ণুপুর হইতে গরুর গাড়ীতে আসিতে হইত। শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে থাকিতেন, তখন ভক্তগণ এতো কষ্ট স্বীকার করিয়াও কলিকাতা অপেক্ষা ঐ দুর্গম রাস্তায় জয়রামবাটী যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করা বেশী পছন্দ করিতেন। কারণ কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন আর মন্দিরে দেবীবিগ্রহ-দর্শন সমতুল্য ছিল। জয়রামবাটী ঠিক তার বিপরীত,—সেখানে মায়ের দর্শন, পূজন, উপদেশ-শ্রবণ, মায়ের

কৃপা পাইয়া ধন্য হওয়া, তাঁহার অমায়িক যত্ন লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করা—এ সবই অবাধ সেখানে। যে সে-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছে সেই তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং জীবনে কখনো ভুলিতে পারে নাই।

আমারা হাওড়া স্টেশন হইতে ট্রেনে উঠিয়া রাত্রি প্রায় ২টার সময় বিষ্ণুপুর স্টেশনে নামি। তথা হইতে আমরা গরুর গাড়ীতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টায় কোয়ালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পৌঁছাইলাম। এই আশ্রমটি ছিল জয়রামবাটী-যাত্রীর একমাত্র বিশ্রামস্থল। স্নানাহার-সমাপনান্তে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে একটি কুলী লইয়া মাঠের রাস্তা দিয়া প্রায় চারমাইল হাঁটিয়া আমোদর নদের তীরে পৌঁছাইলাম। আমোদরে উপর কোন সেতু বা ফেরী নৌকা না থাকায় বাধ্য হইয়া বুক জল অতিক্রম করিয়া, নদ পার হইলাম, জয়রামবাটী পৌঁছাইলাম বেলা প্রায় আটটার সময়। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, মা বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়া মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্নেহকরুণাভরে আশীর্বাদ করিলেন। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার আদেশক্রমে বহির্বাটীতে বিশ্রাম করিতে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মা আমাদের প্রাতর্ভোজনের জন্য মুড়ি-গুড় পাঠাইলেন। একটু পরেই শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠা ভক্তিমতী সখী, ভক্তদের আনন্দদায়িনী আদরের ভানুপিসি আমাদের ঘরে উপস্থিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত রসিকা ছিলেন। হাতমুখ নাড়িয়া, নাচিয়া, গাহিয়া আমাদিগকে অফুরন্ত আনন্দ দান করিলেন এবং রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পান-প্রসাদ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহার পান খাওয়াইবার ইতিহাস শুনাইলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় শ্রীশ্রীমার চরণ-দর্শনের আহ্বান আসিলে আমরা শ্রীশ্রীমার পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দান করিয়া মা পূজার আসনেই বসিয়া আছেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া পুষ্পপাত্রে রক্ষিত ফুল-বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার অভয়চরণ পূজা করিতে পারিয়া ধন্য হইলাম। উঠানে দেখিলাম, কুল-পুরোহিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর পূজা করিতেছেন। আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমাদের দেশে শুধু লক্ষ্মীপূজা হয়, অলক্ষ্মীর পূজা করিতে দেখি নাই।" তদুত্তরে মা বলিলেন, "বাবা, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে অলক্ষ্মীর পূজাও করিতে হয়। অলক্ষ্মী সন্তুষ্টা না হইলে লক্ষ্মী থাকিবেন কেন?" মায়ের এই কথা শুনিয়া জীবনে এক মহাশিক্ষা হইল। মা গলবস্ত্রে পূজাস্থলে বসিয়া রহিলেন, আমরা বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

প্রায় সাড়ে বারোটার সময় প্রসাদ পাইবার জন্য ভিতরে গেলাম। আমরা চারজন রান্নাঘরের বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছি এবং শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে পরিবেশন করিতেছেন। বাতের জন্য একটু কষ্টে হাঁটিতেছেন, অতি যত্নের সঙ্গে সকলকে খাওয়াইতেছেন। আমি বলিলাম, "মা, এরা সব থাকতে আপনি এতো কষ্ট করে পরিবেশন করছেন কেন?" মা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, ছেলেকে নিজহাতে পরিবেশন করে না খাওয়ালে কি মায়ের প্রাণে শান্তি আসে?" প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম, ইহাকেই বলে "মা"।

বেলা প্রায় চারটার সময় আমরা বিশ্রামান্তে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা

করিতেছি. এমন সময় ঐ গ্রামের 'বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর' এক ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে শ্রীশ্রীমাও আসিয়াছেন। মা বলিলেন, "ওদের বাড়ী আজ রাতে দীপান্বিতা কালীপূজা হবে। তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছে। প্রসাদ পাওয়ার দরকার নেই—কারণ প্রসাদ পেতে শেষ রাত হয়ে যাবে। বরং সন্ধ্যার পর ওখানে গিয়ে প্রতিমা দেখে আসবে। রাত্রির প্রসাদ এখানেই পাবে।"

তদনুযায়ী আমরা প্রথম প্রহরে ঐ বাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রতিমা দর্শন করিলাম এবং আমার সঙ্গী সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক অনেকগুলি মাতৃসংগীত গাহিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি সুশিক্ষিত, সুবক্তা এবং সুগায়ক ছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার গান শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইতেন। পূজামণ্ডপ হইতে আমরা ভানুপিসির বাড়ী গেলাম। তথায় ভানুপিসির আদর-আপ্যায়ন, রসিকতা, ভজন ও ঠাকুর-মার বিষয়ে দিব্য কথা শুনিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহার 'পান-প্রসাদ' পাইয়া এবং ইহার ইতিহাস জানিয়া কত তৃপ্তি পাইয়াছিলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তারপর মায়ের বাড়ী ফিরিয়া প্রসাদ পাইয়া বহির্বাটীতে শয়ন করিলাম। রাত্রিতে তথাকার চৌকিদার আসিয়া আমাদের নাম-ধাম সব লিখিয়া লইয়া গেল।

পরদিন ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া আমি যখন পুকুরের ঘাটে অগ্রসর হইতেছি তখন রাস্তায় শ্রীশ্রীমাকে একটি বড় কলসীতে জল আনিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলাম। আমি অনুযোগের সুরে বলিলাম, "মা, লোক থাকতে আপনি কেন কষ্ট করে জল নিয়ে যাচ্ছেন? আমাকে দিন, আপনার যত জল লাগে, আমি নিয়ে যাচ্ছি।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "না, বাবা, আমার কোন কষ্ট হচ্চে না। আমাদের এসব অভ্যাস আছে।"

বাস্তবিক, তাঁহার জীবনের এক মহাশিক্ষা—তিনি কাহাকেও কোন কাজের জন্য আদেশ করা বা কষ্ট দেওয়া আদৌ পছন্দ করিতেন না। যদি কাহাকেও কোন কাজের জন্য আদেশ করিতেন, তাহা তাহার সাধপূরণ বা মঙ্গলের জন্যই করিতেন। এবং ঐরূপ আদেশ পাইয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে।

বেলা প্রায় আটটার সময় শ্রীশ্রীরঘুবীরের পূজার জন্য কিছু ফল ও তরকারীর দুইটি পোঁটলা লইয়া আমাদিগকে কামারপুকুর যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে আমরা দুইজন ঐসব দ্রব্য সহ আঁকাবাঁকা মাঠের আলপথ ধরিয়া পৌঁছাইলাম এবং তথাকার প্রসিদ্ধ দেব-বিগ্রহ বিশেষতঃ রঘুবীরশিলা দর্শন করিয়া প্রাণে অতুল আনন্দ লাভ করিলাম। কামার-পুকুরে তখন শিবরামদা ছিলেন।

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাস্থলগুলি সব ঘুরিয়া দেখিয়া প্রসিদ্ধ হালদারপুকুরে স্নান-সমাপনান্তে শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইয়া তৃপ্ত ও ধন্য হইলাম। বৈকাল চারটায় সময় আমরা জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা হইলাম। সঙ্গে শিবুদা ছিলেন—তাঁহার অকুণ্ঠ আদর আপ্যায়ন সরল ব্যবহার ও আত্মীয়ের মতো ভালোবাসা মনে গভীর রেখাপাত করিল।

মানিকরাজার আম্রকানন—শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যলীলাক্ষেত্র—যেখানে তিনি সঙ্গিগণসহ কত বিচিত্র অভিনয় ও মধুর সংগীত দ্বারা উহাকে চিরকালের জন্য এক পবিত্রতাময় স্মরণীয় স্থানে পরিণত করিয়াছেন—ইহা দর্শন, চিন্তন এবং ভ্রমণ করিয়া পথে শিবুদার সঙ্গে

মানিকরাজার আম্রকাননে অনেকক্ষণ কাটাইয়া যখন জয়রামবাটী পৌঁছাইলাম তখন বেশ একটু রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পথিপার্শ্বে বাঁড়ুয্যে পুকুরের ধারে একটু দূর হইতে দেখিতে পাইলাম কে যেন লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে পৌঁছাইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম—বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। আমাদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অনন্তকরুণাময়ী মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমাদের জন্য লণ্ঠন হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। বলিলাম, "মা, আপনি এখানে?" শ্রীশ্রীমা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহসিঞ্চিত উৎকণ্ঠার সুরে বলিলেন, "বাবা, তোমাদের জন্য আমি বড় ব্যস্ত হয়েছি। তোমরা বিদেশী, অন্ধকার রাত্রি—পথ ভুল হ'তে পারে।— কে লণ্ঠন নিয়ে একটু এগুতে বললাম, তা' সে গেল না—তাই আমি নিজেই তোমাদের অপেক্ষায় এখানে এসেছি।" আমরা স্তম্ভিত হইলাম—এ স্নেহের তুলনা কোথায়?

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় প্রসাদ পাওয়ার ডাক পড়িল। মাকে আমি যেই বলিয়াছি, "মা, আমার খিদে নেই, আমি খাব না।" সঙ্গে সঙ্গে মা বলিলেন, "সেকি বাবা, তা' কি হয়? ওবেলা বাঁড়ুয্যে বাড়ী থেকে মায়ের কিছু মাংস প্রসাদ দিয়েছিল। আমি নিজে রান্না করে রেখেছি। তোমাদের জন্য সে প্রসাদ রেখে দিয়েছি—খাও, কিছু হ'বে না।" অগত্যা মায়ের আদেশ মানিতেই হইল। খুব সন্তর্পণে খাইলাম। আশ্চর্য, পরে কোন-প্রকার অসুস্থতা বোধ করি নাই। বলা বাহুল্য, এমন অমৃতসদৃশ রান্না জীবনে কখনো খাই নাই।

পরদিন প্রাতে রওনা হইবার কথা বলায় মা বলিলেন, "এ বেলা থেকে বিকেলবেলায় যাবে'খন। তোমাদের দেশে কত দুধ মাছ পাওয়া যায়, এ পোড়া দেশে কিছুই পাওয়া যায় না!" আমি যেই বলিয়াছি, "মা, এ কি বলছেন? এখানে আমরা অমৃত খাচ্ছি।" নিকটে নলিনী দিদি ছিলেন, তাঁকে মা বলিলেন, "দেখ, আমার ছেলে বলছে অমৃত খেলাম। আর তোদের খাওয়াই, পরাই—কিন্তু তোদের মন আর পাই না।" একটা হাসির রোল উঠিল।

মধ্যাহ্নভোজের পর বৈকালে আমরা রওনা হইলাম। আমাদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মায়ের আশীর্বাদ লইয়া আমরা যখন মাঠে নামি, তখন দেখি মা অশ্রু-সিক্ত নয়নে আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন। এই দৃশ্য-দর্শনে আমরাও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। যতক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে না গেলাম, ততক্ষণ পিছনে ফিরিয়া দেখিতে পাইলাম—করুণাময়ী মা সেইভাবেই দাঁড়াইয়া আছেন। স্বতঃই মনে হইল—এ যে জন্মজন্মান্তরের মা—চিরকালের মা—সত্যই আপনার মা।

উদ্বোধনে

একবার, বোধ হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ, আশ্বিন-মাসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর কলিকাতায় যাই—উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীমায়ের অভয়পদ-দর্শন। অত্যধিক বৃষ্টির জন্য পূজার পূর্বে যাইতে না পারিয়া বিজয়াদশমীর পরে তথায় পৌঁছাই। অভিভাবক ও বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও উদ্বেলিত চিত্তে প্রাণের অবর্ণনীয় ব্যথা লইয়া যাইতে হইল। বৈকালে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে পৌঁছাই। মা চাদর মুড়ি দিয়া খাটের ওপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। আমার পূর্বে

আরও দুইজন ভক্ত—তন্মধ্যে একজন একখানা গিনি এবং অপরজন একখানা হাফ গিনি দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উহা দেখিয়া আমার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা চিন্তা করিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম—আমার সম্বল মাত্র দুইটি টাকা! উহাই শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপদপ্রান্তে অর্পণ করিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীশ্রীমা পূজনীয়া গোলাপ-মাকে বলিলেন, "গোলাপ, ছেলের টাকা দুটি রেখে দাও গিনি দুটির কোন উল্লেখ না করায় বিস্মিতচিত্তে বুঝিতে পারিলাম, ছেলেদের মনের ক্ষোভ-দুঃখের তরঙ্গ অনন্তকরুণাময়ী বিশ্বজননীর কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছায়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের কথা সেই আমার শ্রীশ্রীমাকে স্থূলদেহে শেষদর্শন। এমন মাকে পাইয়াও দুর্লভ মনুষ্যজন্ম কি ব্যর্থ হইল, ইহা চিন্তা করিয়া একেবারে হতাশা-সাগরে মগ্ন হইয়া অবর্ণনীয় অশান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তের সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মা উদ্বোধনের বাড়ীর দোতলায় একটি আসনে উপবিষ্টা। পুরুষ ভক্তগণ একে একে উপরে যাইয়া প্রণাম ও পূজান্তে মায়ের আশীর্বাদ পাইয়া হৃষ্টমনে নীচে নামিয়া আসিতেছেন। আমি সকলের শেষে গেলাম এবং উদ্বেলিত চিত্তে শ্রীপদে লুটাইয়া পড়িলাম। ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ, নয়ন অশ্রুসিক্ত। দেখিয়া মা বিশেষ বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা, আমাকে সব কথা খুলে বলো।" জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের দুটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—তাঁহার শ্রীমুখ হইতে হতাশাব্যঞ্জক কোন কথা কখনও বাহির হয় নাই এবং সন্তানের অশ্রুজল দেখিলে তিনি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

আমি আমার প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীমা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভয় কি বাবা, তোমরা এত ভাবনা-চিন্তা কর কেন? ভয়ের কি আছে? তোমরা সাধন-ভজন আর কি করবে! আমিই তো তোমাদের জন্য করছি। তোমরা যে যা খুশি কর না কেন, শেষকালে ঠাকুরকে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। দেখ, একটা কথা বলি—স্মরণ মনন রাখলেই হবে। সর্বদা মনে রাখবে তোমাদের পেছনে একজন আছেন, তিনিই সর্বদা রক্ষা করবেন।" মায়ের এই অভয়বাণীই আমাদের সম্বল—শান্তি এবং সান্ত্বনা। আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। আমার সমস্ত দুঃখের অবসান হইল, আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া গেল।

সংসার-সুখ

শিবদাস

সত্যকে কতখানি ভুলে থাকলে, পরিবেশকে কতখানি ভুলে দৃষ্টিকে আপাত-রমণীয়তার কত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখলে মানুষ সংসার-সুখকে পরম উপাদেয় জ্ঞান করতে পারে, মহাভারতে একটি ছোট গল্প আছে সে সম্বন্ধে।

গল্পটি বলেছেন বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে; বলেছেন এমন এক মুহূর্তে, যখন বাস্তবের নিদারুণ আঘাতে তাঁর জীবনের, তাঁর সংসারের সব সুখ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, যখন জীবনের বাকী কালটুকুর দিকে চাইলে কেবল অসহ দুঃখ-শোক-বেদনা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব চোখে পড়ে না।

শত পুত্র, সম্মান, প্রতিপত্তি, রাজ্য, ঐশ্বর্য —সংসারে সুখ দেবার মতো কি না ছিল তাঁর? প্রজ্ঞাবানও ছিলেন তিনি, সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু একটি বিষয়ে, পুত্রস্নেহে মোহগ্রস্ত ছিলেন তিনি চিরকাল— যার ফলে বারবার তিনি দুর্যোধনের অন্যায় কাজ সমর্থন করেছেন, এমন কি দুর্যোধনের সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে পাণ্ডবদের সর্বনাশ সাধনার্থ বহু অন্যায় চিন্তা তিনি নিজেও করেছেন।

সেই সব অন্যায় কার্যের ফলে পাণ্ডবদের লাঞ্ছনা এবং নিজ পুত্রদের সাংসারিক উন্নতিরূপ মধুচক্র থেকে বহুদিন পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা সুখের মধু তাঁর মুখে ঝরে পড়েছে, পরম পরিতৃপ্তিভরে তার মাধুর্য তিনি উপভোগ করেছেন। কিন্তু কী ভীষণ পরিবেশে, কী বিভীষিকাময় অনিবার্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যে যে তা উপভোগ করেছেন, তা জেনেও চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন সেদিক থেকে, দেখেও দেখেননি।

সেই সম্ভাবনা এখন বাস্তব হয়ে উঠেছে। অন্ধ হলেও সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হতে হ'ল তাঁকে আঠারো দিন ধরে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ব্যাসদেব সঞ্জয়কে বিশেষ শক্তি দিয়ে গেলেন— তিনি দিব্য চক্ষে রণাঙ্গনে যা কিছু ঘটবে দেখতে শুনতে পাবেন, জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সব শোনাবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারো দিনের পুরো ঘটনাই মহাভারতে এভাবে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—সঞ্জয় বলে যাচ্ছেন, ধৃতরাষ্ট্র শুনছেন।

অষ্টাদশ দিনে রাজা দুর্যোধনকে ভীম গদাঘাতে ধরাশায়ী করলেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে রইলেন তিনি। এর আগেই দুর্যোধনের নিরানব্বই জন ভাই সহ কৌরবপক্ষের সব বীর নিহত হয়েছেন, ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত; মাত্র তিন জন বীর তখনো জীবিত—ব্রাহ্মণ যোদ্ধা অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। তাঁরাও রণক্ষেত্রে নেই—দুর্যোধনের পতন দেখে প্রাণভয়ে বনে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করছেন। পাণ্ডবসেনা বিজয়-গৌরবে বিপুল উল্লাসে কৌরব-শিবির অধিকার করেছে।

কাজেই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষ এখানেই, সঞ্জয়ের দূরদর্শন ও -শ্রবণশক্তির এখানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু তা হ'ল না। এর পরও একটি কলঙ্কময় বিভীষিকার অধ্যায় বাকী ছিল, অশ্বত্থামার বিকৃত বুদ্ধি যাকে যুদ্ধের অঙ্গ

বলে ভাবতে ইতস্ততঃ করেনি। তার বিবরণও শুনিয়ে দুর্যোধনের মৃত্যু পর্যন্ত বর্ণনা করার পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার কুমন্ত্রণাই কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই এই বিরাট ধ্বংসের কারণ। দুর্যোধনের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার দিব্যদৃষ্টিও এখন চলে গেল।'

ধৃতরাষ্ট্রের সংসারসুখ নিশ্চিহ্ন হ'ল এখানেই, দুর্যোধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। রাজ্য, সম্পদ, প্রতিপত্তিও সব চলে গেল; (থাকলেও কি সুখ দিতে পারত তা?) এখন যতদিন বেঁচে থাকবেন, শতপুত্রের মৃত্যুজনিত দুঃসহ শোক হৃদয়ে ধারণ করেই বাঁচতে হবে, যাঁরা তাঁর পুত্রদের নিহত করেছেন তাঁদেরই কৃপা-প্রদত্ত অন্নে, তাদের সন্তুষ্ট রেখে! এই দুঃসহ মুহূর্তে এর ওপর আবার হৃদয়ে গ্রথিত একটি কাঁটাকে নেড়ে দিল সঞ্জয়ের কথা—'আপনার কুমন্ত্রণার ফলেই এটি হ'ল', 'নিজের কাপড়ে নিজেই আগুন লাগিয়েছেন, সেই আগুনে এখন পুড়ছেন, শোক করা বৃথা!'

কয়েক দিন আগেকার আর আজকের অবস্থার মধ্যে কি বিপুল পার্থক্য! কি নিদারুণ আঘাত! মানুষকে উন্মাদ করে দেবার মতো পরিস্থিতি! এই সময় বিদুর এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বহু সান্ত্বনা-বাক্য শুনিয়েছিলেন, জীবন-সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব বলেছিলেন। ব্যাসদেবও এসেছিলেন সান্ত্বনা দিতে। জীবন-সত্য সম্বন্ধে বহু কথা বলতে বলতে বিদুর এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন:

একজন ব্রাহ্মণ পথ চলতে চলতে ভুলে ঢুকে পড়েছেন এক গভীর অরণ্যে। দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল সে অরণ্য; বাঘ, হাতী, সিংহ, সাপ প্রভৃতি সবই আছে সেখানে, প্রতি পদে জীবননাশের আশঙ্কা। ব্রাহ্মণ যখন পরিস্থিতিটা বুঝতে পারলেন, তখন প্রাণপণে ছুটে চললেন শ্বাপদদের নাগালের বাইরে কোথাও যেতে। কিন্তু কোথায় যাবেন? নিবিড়, বিস্তৃত সে অরণ্য, সর্বত্রই সমান বিপদ। ছুটতে ছুটতে শেষে একটা কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। পড়ে গেলেন ঠিক নয়; কূপটির মুখ লতাগুল্মে ঢাকা ছিল, ব্রাহ্মণ কূপ বলে বুঝতে না পেরে তার ওপর পা দিয়েছিলেন, ভেতরে পড়ে যাবার সময় তাঁর পা লতায় আটকে গেল; তিনি পা ওপরের দিকে, মাথা নীচের দিকে এই অবস্থায় গাছে কাঁঠাল ঝোলার মতো ঝুলতে লাগলেন।

এভাবে থাকা খুবই কষ্টকর সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাবলেন, অন্ততঃ একটা লাভ এতে হয়েছে, প্রাণে বেঁচে গেছি—বাঘসিংহগুলো আর দেখতে পাবে না আমাকে! কিন্তু হায়, সভয়ে দেখলেন, কূপের নীচে একটা বিষধর সাপ রয়েছে। অবশ্য অনেক নীচে রয়েছে, তিনি এখন তার নাগালের বাইরে, তবু নাগালের ভেতর আসতে দেরিও নেই বেশী। কূপের পাশে একটা বড় গাছ—কতকগুলো সাদা আর কালো ইন্দুর সেটাকে দাঁত দিয়ে কাটছে; আর একটা হাতী তেড়ে আসছে গাছটাকে ভাঙতে। ইন্দুরগুলোর কাটার জন্য এবং হাতীর ধাক্কায় গাছটা এখনি ভেঙে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়বেন কূপের নীচে, সাপের মুখে। মৃত্যু অবধারিত।

এই কূপের পাশে যে গাছটা, তার ডালে মৌমাছিরা চাক করেছিল। একটা চাক ছিল কূপটার ঠিক ওপরেই। সেই চাক থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু ঝরে পড়ছিল। ব্রাহ্মণের ঠোঁটের ওপরও দুচার ফোঁটা পড়ল। এই অবস্থায়—মৃত্যু যেখানে অবধারিত, শুধু সামান্য একটু সময়ের অপেক্ষা, সে সময়টুকুও আবার মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে থাকতে হচ্ছে,

সেই অবস্থায়—ব্রাহ্মণ সব পরিবেশ ভুলে, কষ্ট ভুলে, মৃত্যুর ক্রম-অগ্রসর পদধ্বনি ভুলে পরম পরিতৃপ্তিভরে সেই মধুটুকু চেঁটে চেঁটে খেতে লাগলেন ; আরো খেতে চাইলেন।

গল্পশেষে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন: মহারাজ, এই হ'ল সংসার-সুখভোগ! ব্যাধি-রূপ হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল এই সংসারারণ্যে দেহরূপ কূপে আশালতায় বদ্ধ হয়ে আমরা থাকি কিছুকাল—ব্রাহ্মণের মতো ঐ ঝুলন্ত অবস্থায়—সর্পরূপ নিশ্চিত মৃত্যু সেখানে অপেক্ষা করছে। মূষিক ও -গজরূপী দিন-রাত্রি-বৎসর প্রতি মুহূর্তে আমাদের মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্তী করছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও আমরা সেদিকে চেয়েও চাই না, ভুলে থাকি, আর মহাদুঃখের মধ্যে এক আধ ফোঁটা মধুরূপ দেহসুখ যা পাই, পরম পরিতৃপ্তিভরে সেটা উপভোগ করি, আরো পাবার জন্য লালায়িত হই! সত্যের দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকি, জীবনে নির্বেদ আর আসে না! জীবনে দুঃখ অনিবার্য, সুখ তুচ্ছ, নির্বেদই পরম ধন।

মহাদুঃখের সময় সান্ত্বনার কথা, তত্ত্বকথা আমরা অনেক শুনতে পাই, কিন্তু তখন কিছু লাভ কি হয় তাতে? কিছুই হয় না, যদি না মন উন্নত থাকে, প্রজ্ঞাবান থাকে। দুঃখই প্রজ্ঞার, মনের উন্নত অবস্থার কষ্টিপাথর। সুখের সময়, সম্পদের সময় মন আমাদের প্রতারণা করার সুযোগ অনেক পায়, দুঃখ-বিপদের সময় যার কিছুই পায় না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হলেও মোহবশে পুত্রের সব অন্যায় কর্মে সমর্থন জানিয়ে এলেও প্রজ্ঞাবান যে ছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে। মহাভারতের বর্ণনা থেকে দেখা যায় এই সময় শোকে তিনি বহুবার প্রজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বটে, কিন্তু খুব বেশী বার নয়, খুব বেশীক্ষণও নয়। এসময় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কয়েকবার তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্বস্থও হয়ে উঠেছেন। সংসার-সুখে আসক্তি স্বাভাবিক; নির্বেদ কিন্তু দুর্লভ, হাজার আঘাতেও আসে না।

সমালোচনা

The Philosophy of Man-making: Santilal Mukherji [দি ফিলজফি অব ম্যান-মেকিং: শান্তিলাল মুখার্জি]: নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সি: ৮।১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯ ; পৃঃ ৪৬৮ ; মূল্য: কুড়ি টাকা।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রার সময় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিলেন গুরুভাই তুরীয়ানন্দজী এবং শিষ্যা নিবেদিতা। প্রথম দিন, বিকেলবেলা, জাহাজ তখনো গঙ্গার বুকে, স্বামীজী হঠাৎ এক দীপ্তপ্রেরণায় বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, যত আমার বয়স বাড়ছে ততই মনে হচ্ছে সব কিছুরই মূলে আছে মনুষ্যত্ব। এই আমার নূতন বাণী। অন্যায় করলেও মরদের মতো করো! শয়তান যদি হতে হয়, খুব বড়ো দরের শয়তান হও।" ('Yes! the older I grow, the more every thing seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale!')

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে স্বামীজী এই কথাটিই

তাঁর অননুকরণীয় চলতি ভাষায় লিখেছেন—"একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে?

মানুষ হও রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা আপনি গড়-গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।"

এককথায় স্বামীজীর জীবনদর্শনই মানুষ-গড়ার দর্শন। অধ্যাপক ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ-মূলক এই গবেষণা-গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'মানুষ-গড়ার দর্শন।' বাস্তবিক স্বামীজীর জীবন-সাধনার মর্মবাণীটি এ নামকরণে প্রকাশিত।

একদিকে প্রাচীন গ্রীসের উত্তরাধিকারী আধুনিক য়ুরোপ এবং আর একদিকে প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মসাধনার উত্তরসাধক বর্তমান ভারত—এ দুয়ের আদানপ্রদানের উপরেই যে ভবিষ্য পৃথিবীর পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল সেকথা পরিব্রাজক বিবেকানন্দের মতো এত প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এবং এতো স্থির ভবিষ্যদৃষ্টিতে আর কারু পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যয় যে আধুনিক পৃথিবীর সমাজনীতি ও রাজনীতির বিচারে যুক্তিসহ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এ যে কেবল দেশপ্রীতির ভাবাবেগ নয়, সমাজ-বিবর্তনের অভ্রান্ত স্বরূপনির্ধারণ—সে কথাটি বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ও আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তাধারার পটভূমিকায় ভারতবাসী ও সমগ্র মানবজাতির ঐতিহাসিক ধারাটি স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সশ্রদ্ধ সংগ্রহের এ প্রচেষ্টা আন্তরিক অভিনন্দনযোগ্য। বেদান্তের যে পূর্ণতার আদর্শকে বিবেকানন্দ-দর্শনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেই আমরা তাঁর চিন্তাধারাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি—সে সম্বন্ধে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে অবহিত। একে একে বারোটি অধ্যায়ে কর্মে পরিণত বেদান্তের এ আদর্শে কেমন করে অধ্যাত্মদর্শন বাস্তবজীবন-সমস্যার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-প্রতিভার বলে সুপ্রযুক্ত হয়েছে, তা তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক যুগের সমাজতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার মিল ও অমিল সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরনারায়ণ-ভাবনাই যে বিবেকানন্দ-হৃদয়ের প্রধান প্রেরণা-উৎস, এই মৌলসত্যটিও যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত। পরবর্তী সর্বভারতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে—বিশেষভাবে তিলক, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রভাবের স্বল্প হলেও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণটুকু লক্ষণীয়। মনে হয়, পরবর্তীকালে বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা ভাব চলে।

হেগেল, কোমত, স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের ইতিহাস-চেতনার দ্বারা স্বামীজী অল্পবিস্তর প্রভাবিত হলেও 'বর্তমান ভারতে' তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস-দর্শনে যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর

ভারতপ্রাণতা যেমন প্রমাণিত, তেমনি বিশ্ব-ইতিহাসের বিবর্তন-অনুধাবনে অসাধারণ কৃতিত্বও সুস্পষ্ট। সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে (Society and State, Socialism, Vivekananda's Ideal Society and Ideal State) সমাজ ও রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র এবং আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা আধুনিক রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করে লেখক এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছেন।

প্রসঙ্গতঃ দু-একটি তথ্যগত ও সিদ্ধান্তগত প্রশ্ন—

(১) রামকৃষ্ণদেব-প্রসঙ্গে 'who could hardly write his name'—(পৃঃ ৩২) অতিশয়োক্তি। তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরের নিদর্শন বেলুড় মঠেই আছে।

(২) 'He taught nothing new'—(পৃঃ ৩২) এ-ও বোধ হয় একটু দ্রুত মন্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রেরণায় এ যুগে বিবেকানন্দের মাধ্যমে সেবা ও সাধনা এক হয়ে গেছে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতের সোপান-পরম্পরায় পরম সত্যের প্রকাশকে সর্বসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট করে তোলা—এ-ও তাঁর মৌলিক দানই বলবো। এ-জাতীয় আরো অনেক কথাই ভাবা যায়, যেগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা ও বাণীর অভিনবত্বের প্রমাণ।

(৩) সমাজ-বিষয়ক আলোচনার উপসংহারে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের আলোচনায় তাঁর প্রথম জীবনে হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটির অনুবাদ "শিক্ষা" গ্রন্থের ও স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তায় স্পেন্সারের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু তথ্য বাঞ্ছনীয়।

(৪) আসন্ন "শূদ্র যুগ" সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে মার্ক্‌সের মিল ও অমিল দুই-ই আলোচনা করে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দিক থেকে স্বামীজীই বরং অভ্রান্ত। কারণ রাশিয়া বা চীনেই যে শূদ্রযুগের সূচনা হবে, এই নিশ্চিত ঘোষণা মার্কস্ কখনোই করতে পারতেন না, অথচ স্বামীজী এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু সেই শূদ্রযুগে সাধারণভাবে সংস্কৃতির মানদণ্ড যে অবনমিত হবে একথাও স্বামীজী বুঝেছিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে "ব্রাহ্মণত্ব"ই আমাদের সমাজব্যবস্থার শেষ লক্ষ্য। ভারতবর্ষের নবীন সমাজব্যবস্থায় সকলেই ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হবে, এমন ধারণা মেনে নিয়েই বলা যায়, সব সমাজেই জ্ঞান, বীর্য, অর্থ ও শ্রমের সাধারণ বিভাগ থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষ অধিকারভোগের ধারণার নিরসনই বেদান্তবাদীর লক্ষ্য।

বেলুড় মঠের ডায়েরীতে রক্ষিত প্রশ্নোত্তরে স্বামীজী এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, শূদ্রদের সব শ্রমের কাজ এর পরে যন্ত্রই করবে—জাতি হিসাবে শূদ্র বলে কিছু থাকবে না। The Shudra caste will exist no longer—their work being done by machinery. (Complete Works of S. Vivekananda : Vol. V : page 316) আধুনিক যন্ত্রযুগ অনেকটা এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। আলোচ্য গ্রন্থের ২১৪ পৃষ্ঠায় লেখক স্বামীজীর উক্তিটির উল্লেখ করেছেন। আমাদের মনে হয় সমান-অধিকারসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠগুণাবলীর সমন্বয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলাই স্বামীজীর অভীষ্ট। মানব-প্রকৃতির সহজাত বিভিন্নতা মেনে নিয়ে তাদের মিলিত করাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের

সমন্বয়াদর্শ। এ প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর পত্রটি স্মরণীয়।

সমগ্র গ্রন্থটিতে যে নিষ্ঠা, অনুসন্ধান, শ্রদ্ধা ও সমদর্শিতার প্রকাশ রয়েছে, তা যে-কোনো গবেষণা-গ্রন্থের পক্ষে গৌরবের। 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় এ গ্রন্থের সংক্ষেপিত অংশবিশেষ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালী পাঠকের জন্য একটি নতুন বাংলা সংস্করণে ভারত ও বিশ্বের সমাজ-চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দের দান সম্বন্ধে এই আলোচনা-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে আমাদের গভীরতর কৃতজ্ঞতা অর্জন করুক—লেখকের কাছে এই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কল্যাণ (শ্রীরামাঙ্ক): সম্পাদক—শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতাপ্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০+বিষয়সূচী ৮। মূল্য দশ টাকা।

ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র। তিনি ঈশ্বরের অবতাররূপে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত ভক্ত মানুষের অন্তরে শাশ্বত আসন লাভ করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের কাব্য সাহিত্য ও দর্শনের যে অভিব্যক্তি, তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক-রূপে বিভিন্ন ভাষায় আজও সজীব।

হিন্দী-সাহিত্যসেবী 'কল্যাণ' কর্তৃপক্ষ এই বৎসর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য জীবন অবলম্বনে একখানি অতিমনোজ্ঞ বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। শীর্ষস্থানীয় ভক্ত-সাহিত্যিকগণের গভীরচিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধাবলীতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব ও ধামতত্ত্ব রামায়ণের উদ্ধৃতিসহ বিবৃত। শ্রীরামচন্দ্রের লীলার সহিত যুক্ত স্থান, পর্বত, নদনদী, সরোবর প্রভৃতির রূপরেখা পাঠকচিত্তে রামমাহাত্ম্যের ছবি সুদৃঢ় করিবে। লীলা-অনুধ্যানের সহায়করূপে প্রবন্ধের মাঝে মাঝে বহু রঙের চিত্র সন্নিবেশিত। গ্রন্থাগারে সংরক্ষণযোগ্য গ্রন্থখানি হিন্দীসাহিত্যে মূল্যবান্ সংযোজন।

ঝরা বনফুল—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: খোলাকথা প্রকাশনী, ঠাকুরপল্লী, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য দুই টাকা।

বনের ফুল বনে ঝরিয়া পড়িয়া অজ্ঞাত অবস্থায় থাকিয়া যায়, তাহাতে যত সৌরভই থাকুক না কেন। 'ঝরা বনফুল' কাব্যনিকুঞ্জের কবিতাগুলি কিন্তু অখ্যাত ও অজ্ঞাত অবস্থায় থাকিতে না চাহিয়া তাহার সৌন্দর্য সৌরভের সম্ভার ছড়াইয়া দিবার জন্য আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে; এই আত্মপ্রকাশ অভিনন্দন-যোগ্য। সঙ্কলিত কবিতাগুলিতে কবির কাব্যসৃষ্টির আন্তরিকতার ভাব ভাষা ও ছন্দের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর উদ্দেশে রচিত 'যুগে যুগে এসেছ মা' কবিতাটি সুন্দর।

কি খুঁজিছ তুমি? লেখক ও প্রকাশক শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫০ অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১৬, মূল্য এক টাকা।

'কি খুঁজিছ তুমি?'—একখানি আধুনিক কবিতার বই। 'গলি', লোষ্ট্র', 'করণিক' 'ডাকঘর' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার সমাবেশ এই পুস্তকে। এই আধুনিক কবিতাগুলিতে কবিতারস-পিপাসুগণ নূতনত্বের আস্বাদ লাভ করিবেন। প্রারম্ভে একটি সূচীপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

আমি কে ?—শ্রীবগলাপ্রসন্ন চৌধুরী। 'আত্মালয় প্রকাশনী', পি-৫৫৬ সি, সি. আই. টি. স্কীম—৪৭, কলিকাতা ২৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১ ; মূল্য এক টাকা।

'ভেবে দেখুন', 'গুরু কাহাকে বলে', 'জানবার বিষয়'—এই লেখাগুলি পুস্তকের বিষয়বস্তু। রচনায় লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে ; তবে কিছু ভুল রহিয়াছে, যেমন একটি উদাহরণ : মণ্ডল মিশ্রের (পৃষ্ঠা ১০) স্থানে 'মণ্ডন মিশ্রের' হইবে।

যুগশঙ্খ (অষ্টাদশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৭১) —বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, মালদহ। পৃষ্ঠা ৬৮।

বিভিন্ন বিষয়ে ১৯টি প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা ও কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়াছে অষ্টাদশ বর্ষের এই যুবশঙ্খখানি। সবগুলিই বাংলায় রচিত। ছাত্রদের লেখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : স্বামী বিবেকানন্দ ও মার্কসের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র, সময়ের ক্ষুদ্রতম একক, ব্যবসা-বাণিজ্যে মালদহ ; ইলিশ মাছ সম্বন্ধে লেখাটি উপভোগ্য। পত্রিকাটির অলঙ্করণের জন্য অঙ্কিত ছবিগুলি ভবিষ্যৎ শিল্প-প্রতিভার সূচক। 'বিদ্যামন্দির সংবাদ পরিক্রমা'য় ছাত্রদের পড়াশুনা, খেলাধুলা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সমাজ-সেবা প্রভৃতি সংক্ষেপে অথচ মনোজ্ঞভাবে বিজ্ঞাপিত।

Bharatiya Sanskriti Sammilan Souvenir (1971)—Published by Prabhu Jagadbandhu Advent Centenary Committee, 59 Manicktala Main Road, Calcutta-54. pp. 202

আধ্যাত্মিকতাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রভু জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্মিলনী স্মরণিকাটিকে সব দিক দিয়া সুন্দর করিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমেই চোখে পড়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি ১১টি ধর্মের বিশেষ প্রার্থনা। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সুচিন্তিত ইংরেজী প্রবন্ধাবলীতে সমৃদ্ধ স্মরণিকাখানি। সাধুসন্তগণের অনেকগুলি প্রতিকৃতি পত্রিকার অলঙ্করণে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদত্ত হওয়ায় স্মরণিকাটি ভক্তগণের নিকট সংরক্ষণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জগদীশ বিদ্যাপীঠ স্মরণিকা (সুবর্ণ জয়ন্তী)—কলাগেছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠ, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ১৩২ ; মূল্য তিন টাকা।

উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই স্মরণিকাটি প্রকাশিত হইয়াছে। কথা কবিতা কাহিনী প্রবন্ধের মাধ্যমে স্মারক পুস্তিকাটিকে মনোজ্ঞ করিবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই বিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রের লেখাও সন্নিবেশিত হওয়ায় পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়াছে। 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী', 'জগদীশ স্মৃতিচারণ', 'জগদীশ বিদ্যাপীঠের আদিপর্ব' ও অন্যান্য স্মৃতিচারণে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক অবস্থা ও বর্তমান প্রগতির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত অনুরাগী শিক্ষা-ব্রতীদের অনলস প্রয়াসে সুন্দর বিদ্যায়তন গড়িয়া উঠিতে পারে, জগদীশ বিদ্যাপীঠ তাহারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বন্যাত্রাণ-সেবা : শিলচর আশ্রম কর্তৃক আসামের কাছাড় জেলায় বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চল-সমূহে সেবাকার্য শুরু করা হইয়াছে।

খরাত্রাণ-সেবা : গত জুন মাসে (১৯৭২) পুরুলিয়া নরেন্দ্রপুর, রাঁচি (মোরাবাদী) আশ্রম কর্তৃক যথাক্রমে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, রাঁচি জেলায় খরাত্রাণকার্য অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়া আশ্রম কর্তৃক ৩৭টি খরাক্লিষ্ট পল্লীতে সেবাকার্য চালানো হয়, ৭টি পুষ্করিণী ও ৬৭টি কূপ খনন করা হইয়াছে এবং ৩৭টি কূপের সংস্কার করিয়া ব্যবহারযোগ্য করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ রূপায়ণের জন্য বিরাট কর্মযজ্ঞ চলিতেছে। রাজভবন হইতে ১০ মাইল দূরে ১৫০ একর পরিমিত ভূমির উপর কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে অবস্থিত এই আশ্রম। এখানে আম্রকুঞ্জ, সরোবর, খেলার মঠ, ফল ও ফুলের বাগান প্রভৃতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সারা ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্রগণের যেন মিলনক্ষেত্র নরেন্দ্র-পুর আশ্রম। ১,৪০০ আবাসিক বিদ্যার্থী এখানে থাকে।

আশ্রম-পরিচালিত কয়েকটি কর্মবিভাগ :

(১) আবাসিক বহুমুখী বিদ্যালয়—সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও ললিতকলা—উচ্চতর মাধ্যমিকের এই ৫টি ধারা এখানে পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রসংখ্যা ৭৫০। ১০টি স্বতন্ত্র ছাত্রাবাসে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা। পরীক্ষা-ফল ৪ বৎসর যাবৎ ১০০% উত্তীর্ণ; ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন গ্রুপে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৯ম স্থানের অধিকারী।

(২) আবাসিক মহাবিদ্যালয়- ইংরেজী, অঙ্ক, অর্থনীতি, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, পরিসংখ্যানে অনার্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। ছাত্রসংখ্যা ৩০৩। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণীর ও ৬১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছে।

(৩) জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (স্থানীয় বালকগণের জন্য)—ছাত্রসংখ্যা ১২০। কাঠের কাজ, ফিটিং, টার্নিং, গ্যাস ওয়েল্ডিং প্রভৃতি শিখানো হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থায়।

(৪) অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়। এখানে জেনারেল এডুকেশন, সঙ্গীত, শিল্প, বই বাঁধানো, বেতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষার অঙ্গীভূত। দেশে অন্ধ ছাত্রদের জন্য যে-সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে নরেন্দ্রপুরের ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে! অন্ধছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হইয়াছে ও সঙ্গীতে ডিগ্রী লাভ করিয়াছে।

আশ্রমের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ৩৬,৩০৫; এখানে ৫৯টি পত্রপত্রিকা রাখা হয়।

এতদ্ব্যতীত হরিজন-হিতসাধন, গ্রামোন্নয়ন, সমাজসেবা, জনশিক্ষা, শিশুকল্যাণ ও আর্ত-সেবার ক্ষেত্রে নরেন্দ্রপুর আশ্রম-পরিচালিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক যে-সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা অসংখ্য দরিদ্র দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত ও সাহায্যপ্রার্থী জনসাধারণ উপকৃত হইতেছেন।

সমাজসেবা-কল্পে ও জনশিক্ষার জন্য ১৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে, ইহাদের মধ্যে একটি কলিকাতা রামবাগান বস্তীতে, অপর সবগুলিই গ্রামাঞ্চলে।

গ্রামসেবক শিক্ষণ কেন্দ্রে ১০০টি ছাত্রকে সেবা-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

শিশুকল্যাণবিভাগ-পরিচালিত ৭৫টি কেন্দ্রে দৈনিক ১৫,০০০ শিশুকে দুধ দেওয়া হয়।

বন্যাত্রাণ-কার্যে আশ্রমের কর্মী ছাত্র ও শিক্ষকগণ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; বন্যার্তদের এক দারুণ সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে দৈনিক ৭৫,০০০ দুঃস্থ ব্যক্তিকে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৭০-৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। কঠিনরোগগ্রস্ত আর্তনারায়ণের সেবাকল্পে এই যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। সুষ্ঠু পরিচালনায় ও বদান্য জনগণের সহায়তায় এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে। এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের আধুনিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুব্যবস্থা আছে। অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত।

রাঁচি স্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ২৭৯ একর ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত এই স্যানাটোরিয়াম। বর্তমানে এখানে ২৮০টি শয্যা আছে; এই শয্যাগুলির মধ্যে ২৫৫টি সাধারণ ওয়ার্ডে, ১৫টি কেবিনে ও ১০টি কুটিরে অবস্থিত।

আলোচ্য বর্ষে রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬৪৪, তন্মধ্যে ৩৮৩ জন রোগীকে এই বৎসর ভরতি করা হয়, ২৬১ জন পূর্বে ভরতি হইয়াছিলেন; ৩৮৩ জন হাসপাতাল হইতে ছাড়া পান এবং বর্ষশেষে ২৬১ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। ১২৪ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। এক্স-রে বিভাগে ৪,৯১৭টি এক্স-রে করা হয়। ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার সংখ্যা ১৮,২৯৯।

বহির্বিভাগে ৯৫১ জন টি. বি. রোগীকে ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ২,০২৭ জনকে চিকিৎসা-বিষয়েউপদেশ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামে ৮১ জন দরিদ্র রোগী সম্পূর্ণ বিনা খরচে এবং ৬ জন রোগী কম খরচে চিকিৎসিত হন। বহির্বিভাগে আগত অধিকাংশ রোগীই এবং ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের সমস্ত রোগীই বিনা-খরচে চিকিৎসিত।

আলোচ্য বর্ষে ৩৪ জন রোগী আরোগ্যলাভের পর আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছেন। স্যানাটোরিয়ামে ইহাদের অনেককে নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ৬ জন টেলারিং বিভাগে, ৬ জন অফিসে, ২ জন এক্স-রে বিভাগে, ৩ জন ল্যাবরেটরিতে ১ জন মেডিক্যাল স্টোরে, ২ জন বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ বিভাগে এবং ১ জন রোগীদের গ্রন্থাগারে কাজ করিতেছেন। অন্যান্য বিভাগেও অনেকে কর্মরত আছেন।

স্থানীয় জনসাধারণের জন্য ফ্রি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারীতে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৪,৪২০; তন্মধ্যে নূতন রোগী—৬,৬৪২।

পরলোকে স্বামী অজয়ানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৮ই জুলাই সকাল ৮টা ৩ মিনিটের সময় স্বামী অজয়ানন্দ ৭৫ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বার্ধক্যজনিত বহুবিধ ব্যাধিতে তিনি কয়েক বৎসর

যাবৎ ভুগিতেছিলেন।

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসী সেবাশ্রমে সঙ্ঘে যোগদান করিবার পর বেলুড় মঠের প্রধানকেন্দ্রের আফিস ও নবাগত ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং দেওঘর, কনখল, মাদ্রাজ (মঠ), বেলুড় সারদাপীঠ ও বোম্বাই কেন্দ্রে কর্মিরূপে শ্রীশ্রী-ঠাকুর-স্বামীজীর কাজে তিনি ব্রতী ছিলেন। অল্প কিছুকাল কনখল ও পাথুরিয়াঘাটা কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে এবং বেদান্তপ্রচারের জন্য আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া সেখানকার প্রভিডেন্স কেন্দ্রে সহকারী 'মিনিস্টার'-রূপেও সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতি অমায়িক; বিশেষ করিয়া তরুণ সাধুদের তিনি খুবই স্নেহ করিতেন। সঙ্ঘের কাজে তাঁহার আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল গভীর।

তাঁহার বিদেহী আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

গোয়ালিয়র রামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৬৮-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ—আত্মমুক্তি ও বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে কয়েকজন উদ্যমশীল ভক্ত কর্তৃক ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রমের স্থাপনা হয়। এখানে নিয়মিত ধ্যান ভজন কীর্তন প্রার্থনা ও স্বাধ্যায়ের সুব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই একটি পুস্তকালয় পরিচালিত হয়; বর্তমানে সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা, মারাঠী, তেলুগু, তামিল ভাষায় গ্রন্থ আছে; গ্রন্থসংখ্যা তিনসহস্রাধিক এবং নিয়মিত সদস্যসংখ্যা দুইশত। দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসার সাহায্যার্থে একটি অবৈতনিক ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে। বালকগণের স্বাস্থ্যচর্চার জন্য একটি ব্যায়ামশালা-নির্মাণ, বিদ্যালয়ভবনের সম্প্রসারণ প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্য আশ্রমের ভাবী কার্যক্রমের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (১লা 1305)

[পুনর্মুদ্রণ]

[পূর্বানুবৃত্তি : আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ]

[পূর্বপ্রকাশিত অংশের শেষে বাঙ্গালীর গুণের কথাও বলা হইয়াছে।]

গার্বিয়াঙের পূর্ব্বদিক দিয়া কালীনদী প্রবলবেগে বহিতেছে। পার্ব্বত্য নদীর কথা উপন্যাসে পড়িয়াছিলাম—চক্ষে দেখিলাম। পর্ব্বতের সমুদয় প্রদেশে প্রধানতঃ, গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। নদীর প্রবল গর্জ্জন—কর্ণ-ভেদী, অহোরাত্র-ব্যাপী গভীর গর্জ্জন এখনও যেন কর্ণ-কুহরে লাগিয়া রহিয়াছে। এস্থানে নদী কিছু দূরে ছিল—গর্জ্জনও তাদৃশ ছিল না। চারিদিকে পর্ব্বতমালা, মনে হয় নিকট, কিন্তু যতই যাই, ততই যেন দূরবর্ত্তী বোধ হয়। ভারতের ভূগোল যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই কালী-নদী নেপালের সীমা। এই কালীর অপর পারে নেপাল—স্বাধীন নেপাল বা গুরখালি রাজ্য।

পাঠক হয়ত কল্পনায় ভাবিবেন, এস্থানে আসিলে আর স্ত্রীপুত্রের মমতা, বন্ধুবান্ধবের অকৃত্রিম ভালবাসা—এমন কি, সংসারের সব সম্বন্ধই ত্যাগ হইয়া যায়, কেহ বা ভাবিবেন, বুঝি—এখানে জনমানব নাই।

কোনকালে হয়ত এরূপ ছিল। ব্রিটিশ-পতাকা যখন ভারতের সর্ব্বত্র উড্ডীন হয় নাই, তখন যে অনেক স্থান অতি দুর্গম—এমন কি, অগম্য ছিল, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান-সহায় ইংরাজের পথনির্ম্মাণের ও পত্রপ্রেরণের কৌশল এখানেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তবে এই পর্য্যন্ত, আর অধিক দূর নয়। এধারে এই শেষ পোষ্ট আফিস, তাহাও কেবল ছয় মাসের জন্য। অবশিষ্ট সময় এস্থান বরফে আবৃত।

ভ্রমণ করিলে বুঝা যায়, সভ্যতা ও অসভ্যতায় পার্থক্য কি—মানুষ পশু হইতে উন্নত কিসে। কবিতা-তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া, অনেকে বাহ্য সভ্যতার নিন্দা করেন বটে, কিন্তু বোধ হয়—উন্মত্ত ব্যতীত কেহ আর এখন গিরি-গুহা বা তরুতল আশ্রয় করিতে চাহে না, বা ঐরূপ করাকে পরম পুরুষার্থ বোধ করে না। আমাদের শাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব শিক্ষা কর্ম্ম,—এই কর্ম্ম করিয়া তবে নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে হয়। ইহা ভুলিয়াই ভারতের এই দুর্দ্দশা।

পার্ব্বত্য লোকদিগের দুঃখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে ভোগ, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যজগতে অনেক সময়ে যাহা দুষ্প্রাপ্য, এরূপ অনেক সদ্‌গুণ, যথা—আতিথেয়তা, হৃদয়বত্তা ইত্যাদি দেখিয়া সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়াছি।

চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব হৃদয়ে রাখিয়া কি বাহ্য সভ্যতা লাভ করা যায় না? অন্তরে ধর্ম্ম-বীর, বাহিরে কর্ম্ম-বীর, এরূপ কি হইবে না?—হে ভগবন্, এরূপ কি হইবে না? এই সকল চিন্তায়—হৃদয় সময়ে সময়ে উদ্বেল হইত।

এখানে একটী পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে আশ্রয় লইলাম। নাম লছ্‌মী দৎ—জাতিতে ব্রাহ্মণ। সে এখানে প্রায় ২০।২৫টী ভুটিয়া বালককে হিন্দী শিখায়। একটী বালিকাও তাহাদের সঙ্গে পড়ে। কুমায়ুনে গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত এইরূপ প্রায় ৪০০ স্কুল আছে, কোন স্থানে ২২টী ছাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্ট একটী পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া থাকেন, এই পণ্ডিতদিগের মাহিনা সচরাচর ৭৲ টাকা। এই সকল স্কুলে সচরাচর হিন্দী ভাষা, ও হিন্দী ভাষায় ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা হয়। যদি গ্রামের সকল বালক পড়ে, তাহা হইলে ছাত্র-সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু কুমায়ুনের ডেপুটি কমিশনর গ্রেসি সাহেব-

লিখিত স্কুলের রিপোর্টে দেখিলাম, 'Driving goats and carrying trade with Thibet are more in their line than reading and writing' অর্থাৎ 'বকৃরা চরান ও তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করা লেখাপড়া অপেক্ষা তাহাদের অধিক প্রিয়।' ছাত্রেরা বৃষ্টি না হইলে একটু ফাঁকা জায়গায় বসে। সকলে একটী একটী ছাল সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাহার উপর বসে, ও শ্লেটে একপ্রকার খড়ি গোলা মত সাদা কালি দিয়া লেখে। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হিন্দী শিক্ষা ১ম, ২য় ইত্যাদি ভাগ, ও হিন্দী ভাষার ১ম পাঠ, ২য় পাঠ, ভূগোল ইত্যাদি তাহাদের পাঠ্য পুস্তক। কতকটা আমাদের দেশের পাঠশালার ন্যায়। পণ্ডিত আমাদের গুরুমহাশয়ের মত, ছাত্রদিগের নিকট তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু লোকটী অতি সৎ। প্রাতঃকালে উঠিয়াই সমস্ত ঘর নিকাইয়া লয়; সে একলা, তাহার ত আর কোন ভৃত্য নাই, তাহার পরিবারাদিও এখানে নাই—আলমোড়া হইতে ৫০।৬০ মাইল দূরবর্ত্তী শোর নামক স্থানে তাহার পরিবারাদির নিবাস—তাহার এক ভাই ব্রহ্মদেশে সৈন্যদলে চাকরী করে। ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া খান কতক কাঠ লইয়া জ্বালাইয়া একটু অগ্নি প্রস্তুত করে, তৎপরে কোন কোন দিন চা প্রস্তুত করে—এই কাঠ প্রভৃতি তাহার ছাত্রেরা এক এক খান করিয়া দেয়, আর কেহ কেহ বা ময়দা ঘৃত আদি সিধা লইয়া আসিয়া দেয়। ছাত্রদিগকে আর কোন বেতন দিতে হয় না। আমরা আসিবার পর ছাত্রদিগকে আমাদের জন্য এক একখানি গাংসিং আনিতে বলিত—গাংসিং বলিতে এক একখানা মোটা কাঠ বুঝায়। এখানে এত শীত যে, রাত্রে অগ্নি না জ্বালিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়; শীতের কারণ, সর্ব্বদা একরূপ ঠাণ্ডা হাওয়া জোরে বহিতেছে। যাহা হউক, পণ্ডিত তৎপরে স্নান করে; এখানে স্নানের বড় কষ্ট, কারণ জল বড় দুষ্প্রাপ্য—যদিও নদী আছে, কিন্তু শীতের কারণ, নদীতে স্নান করা একরূপ অসম্ভব, আর, অনেক স্থলে, পার্ব্বত্য নদীতে স্নানে ম্যালেরিয়ার সম্ভাবনা। পণ্ডিতের গৃহের নিকট একটী ক্ষুদ্র ঝরণা আছে, তাহার ধারা এত সূক্ষ্ম যে, অতি বিলম্বে ঘড়া পূর্ণ হয়। লোকে এখানে পিতলের পরিবর্ত্তে তামার ঘড়া ব্যবহার করে, ঘড়ার উপর একটী একটী কড়া থাকে। এখানে বোধ হয়, ধোপা, নাপিত নাই, কারণ, পণ্ডিত এবং আর সকলেই অতি ময়লা কাপড় ব্যবহার করে—আর পরস্পর পরস্পরের চুল দাড়ি প্রভৃতি ছাঁটিয়া দিতেছে। স্নানের পর পণ্ডিত কতকগুলি স্তব-পাঠ, আচমন ইত্যাদি ও তৎসঙ্গে রন্ধনের আয়োজন করিতে থাকে। পণ্ডিত রন্ধন করিতে করিতে ক্রমাগত আচমন করিতেছে, আর কোন কারণে কোন স্থান বা ব্যক্তি অশুচি হইলে জল একটু ছিটাইয়া দেয়, তাহাতেই সব শুদ্ধ হইয়া যায়; বলা বাহুল্য, এ জল গঙ্গা-জল নহে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হইলেও গায়ত্রী কি, তাহা জানিত না, আমরা তাহাকে গায়ত্রী শিখাইয়া উহার অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। পণ্ডিত আমাদিগের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে চণ্ডী বুঝাইয়া লইত ও স্বয়ং তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করিত। তুলসীদাস-কৃত রামায়ণ যাহারাই হিন্দী জানে, তাহাদেরই নিকট সম্মানিত। পণ্ডিত আমাদের নিকট কখন কখন ইংরাজী শিখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিত। প্রাতে পণ্ডিত ভাত ও ডাল এবং সন্ধ্যাকালে রুটি প্রস্তুত করিত—রুটির সহিত কখন কখন ডাল ও কখন কখন মূলার ঝোল প্রস্তুত করিত। মূলা ব্যতীত এধারে বড় কিছু তরকারী পাওয়া যায় না, আর ডালের মধ্যে মসুর ও কড়াই

কড়াইকে উড়ৃংকা ভাল বলে; এস্থান সমুদ্র-সমতল হইতে অনেক উচ্চ বলিয়া হাওয়া অতি পাতলা, এই কারণে সহজে দ্রব্যাদি সিদ্ধ হয় না। ইহা যাঁহারা কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, তবে সাধারণের জন্য কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, জল একবার ফুটিতে আরম্ভ করিলে তাহার পর আর উত্তপ্ত হয় না। এক্ষণে, সাধারণের সংস্কার, জল গরম হওয়া ও ফুটিয়া ওঠা এক কথা; বাস্তবিক তাহা নহে। বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের ভিতর একটা জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া উহার ভিতর হইতে বায়ু বাহির করিয়া লইলে জল খুব শীতল অবস্থায়ও ফুটিতে থাকে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ফুটিয়া উঠা ও জল গরম হওয়া এক কথা নহে। বাস্তবিক, ফুটিবার কারণ, জলের ভিতরে শোষিত বায়ু ও পরে জলীয় বাষ্পের নির্গমন। বায়ুরাশির চাপ যত অল্প হয়, ঐ বায়ু ও বাষ্পও তত তেজে উঠিতে পারে। খুব উচ্চস্থানে বায়ুর চাপ অতি অল্প বলিয়া খুব অল্প তাপেই ফুটে, আর ফুটিবার পর জল আর গরম হয় না, এই কারণে সমতল অপেক্ষা পার্বত্য প্রদেশে জল ফুটিয়া উঠিলেও অল্প গরম হয়, কাজেই সিদ্ধ হইতে বড় দেরি লাগে। পণ্ডিত কখন কখন মাংসও খাইত। আহারের পর—সমুদয় পরিষ্কার করিয়া প্যাণ্টুলেন ও একটা কোট পরিয়া পড়াইতে যাইত।

এখানকার নিবাসী ভুটিয়া। ইহারা তিব্বতীয় ও পাহাড়ী জাতির মাঝামাঝি। পাহাড়ীরা ইহাদিগকে বড় ঘৃণা করে। ঘৃণা করিবার কারণও আছে—ইহারা বড় অপরিষ্কার থাকে। জল-শৌচ করে না এবং আচমন, কাপড় পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি বিষয়েও বড় উদাসীন। ইহাদের মধ্যে অনেক প্রকার নিষ্ঠুর প্রথা আছে, শুনিলাম। ইহাদের দেবতার মধ্যে কোন কোন স্থলে বৃক্ষের উপর নেকড়া টাঙ্গান ও কোন কোন স্থলে কাষ্ঠের একটী উর্দ্ধাধোভাবে রক্ষিত ফলকের উপরে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠ লম্বভাবে প্রদত্ত। আমাদের সতীত্বের যেরূপ ধারণা, ইহাদের সেরূপ নাই। বিবাহ হইলেও একজন ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অপরকে গ্রহণ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত শুনিলাম, প্রতি গ্রামে এক একটী গৃহ আছে; তাহাতে স্ত্রী পুরুষে একত্রে মিলিত হইয়া মদ্যপানাদি ও নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকে। ইহারা প্রাতে রুটি ও রাত্রে ভাত খাইয়া থাকে। এখানে ভাঙের গাছ উৎপন্ন হয়, স্ত্রীলোকেরা এবং অনেক ছেলে তাহা হইতে গাঁজা প্রস্তুত করিয়া থাকে। মদও ইহারা একরূপ প্রস্তুত করে। ইহারা যাদুতে বড় বিশ্বাস করে। যাদু করিব, বলিলে বড় ভয় পায়। ইহাদিগের বিশ্বাস, বাঙ্গালীরা ও তিব্বতীয়েরা যাদু জানে। ইহারা হিন্দী বুঝিতে পারে, হিন্দীতেও কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, কিন্তু নিজেদের ভিতরে অন্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা অনেকে বড় আতিথেয়। (ক্রমশঃ)।

রামকৃষ্ণ-মিশন।

বঙ্গদেশের কোন এক অপরিচিত গ্রামে এক অপূর্ব্ব বালকের জন্ম হয়। পূত-সলিলা ভাগীরথীর বিমল তটে, জগজ্জননীর মন্দিরে, পঞ্চবটীর যোগাসনে, সাধুভক্ত-যোগিমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার উন্মেষ ও শক্তি-সঞ্চয় হয়। এসব নীরবে হইতেছিল, ক্রমে কোন এক অনুকূল হৃদয়ে, এই শক্তি-তরঙ্গের এক ক্ষুদ্র প্রতিঘাত লাগে। তাহাতে অনেকে এই অমানুষী শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া দলে দলে আসিতে থাকে। ক্রমে এ তরঙ্গ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। নানাস্থানে ইহার ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত প্রভাব লক্ষিত হইলেও কয়েকটী বঙ্গীয় যুবক-মধ্যে ইহা সমবেত শক্তি-রূপে রক্ষিত হয়। এই যুবকদল পবিত্রতা ও ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করিয়া শক্তি-সঞ্চয় করিতে থাকে। ইহার মধ্যে একটী তরঙ্গ অতি প্রবল হইয়া সুদূর সমুদ্র-পারে গিয়া লাগিয়াছে—ইহার গভীর গর্জ্জন সমস্ত জগৎকে চমকিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে। ভারতেও এ তরঙ্গাঘাত কিছু কিছু অনুভব হইতেছে। এ মহাশক্তির নাম 'রামকৃষ্ণ'। ইহারই শক্তি আজি সমগ্র জগতে অনুভূত হইতেছে। আমরা এই মহাশক্তির প্রভাবের বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। এবার পাঠকবর্গকে আমরা ইহার আভাসমাত্র দিব। মধ্যে মধ্যে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বরাহনগরের ভগ্নগৃহে যে ১৮।১৯টী যুবক দৈববলে বিশ্বাসী হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। ১৩০৪ সালে পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের কিছু পূর্ব্বে, কলিকাতার সন্নিকট, হাওড়া জেলার অন্তর্গত, জাহ্নবীর পশ্চিম পারস্থ, বেলুড় নামক গ্রামে, গঙ্গাতীরে ২০।২৫ বিঘা জমি ভবিষ্যৎ মঠের জন্য গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আপাততঃ অবস্থানের জন্য একটী মঠ ও তৎসহ একটী দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ২৪শে অগ্রহায়ণ এই মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা হইয়াছে। এবারে এই স্থানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাৎসরিক জন্মোৎসব কার্য্য হইবে। এই মঠে নব-দীক্ষিত-গণকে ধ্যান, বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র, এবং শারীর-বিধান (Physiology) প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, লণ্ডনবাসিনী, শিক্ষাকার্য্যের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্টা, সিষ্টার নিবেদিতা (Sister Nivedita) জান্তব-শারীর বিধান (Animal Physiology), উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany), শিল্প ও চিত্রবিদ্যা শিখাইতেছেন। ইহার শিক্ষাদানের প্রণালী নূতন রকমের। এই শিক্ষাতে কেবল ছাত্রদিগের পর্য্যবেক্ষণ-স্পৃহা বলবতী করিয়া দেয়। ইহাকে (Kindergarten) কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী বলে। ইনি বাগবাজারে বোসপাড়ায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। সেখানেও এই প্রণালীতে শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যেই প্রায় ত্রিশটী বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ-মিশন' নামে এক সভা স্থাপন করেন। এতদিন ইতস্ততোবিক্ষিপ্তভাবে রামকৃষ্ণ-শিষ্যদিগের যে কার্য্য চলিতেছিল, তাহাকে প্রণালীবদ্ধভাবে পরিচালন করাই এই সভাস্থাপনের উদ্দেশ্য, কারণ—সম্মিলনই

শক্তি। (Organisation is power.) কলিকাতায় এই সভার প্রধান কার্য্য-ক্ষেত্র। আমরা এই 'রামকৃষ্ণ-মিশনের' উদ্দেশ্য প্রভৃতি উহার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

উদ্দেশ্য—মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্য্যে যাহা তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি-কল্পে যাহাতে সেইসকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই "মিশনের" উদ্দেশ্য।

ব্রত—জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র জ্ঞানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই "মিশনের" ব্রত।

কার্য্য-প্রণালী—মনুষ্যের সাংসারিক ও পারত্রিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বর্দ্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব, রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য্য—ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য-ব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রম-স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয়কার্য্য বিভাগ—ভারত-বহির্ভূত-প্রদেশসমূহে "ব্রতধারী" প্রেরণ এবং তত্তৎপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি-বর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

মান্দ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রায় দুই বৎসর হইতে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তিনি নিজের জীবন ও নিয়মিত বক্তৃতার দ্বারা মান্দ্রাজবাসিগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। সেখানেও একটি শাখা-মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে।

গত বৎসর মঠ হইতে স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সন্ন্যাসিগণ যাইয়া দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথে, দিনাজপুরের দুইটী স্থানে, মুরশিদাবাদ জেলার দুই স্থানে, দক্ষিণেশ্বরে ও কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার সংস্থাপিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের সময় তথা হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে বস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধাদির দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল। অনেককে সাহায্য করিতে আবার প্রতিমাসে অল্লাধিক পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করিতেও হইত। এক্ষণে স্বামী অখণ্ডানন্দের অদম্য অধ্যবসায় ও প্রাণপণ যত্নে মুরশিদাবাদে একটী অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি অনাথ বালক আশ্রয় পাইয়াছেন এবং তাঁহারা উক্ত স্বামীজির যত্নে নানা বিষয়ে শিক্ষিত হইতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে মান্দ্রাজ হইতে ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারত নামে দুইখানি ইংরাজী পত্র বাহির হইতেছিল। প্রথমোক্তটী পাক্ষিক ও দ্বিতীয়টী মাসিক। প্রথমটী বেদান্ত ও দার্শনিক আলোচনা-প্রধান এবং দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য পৌরাণিক ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক গল্পের দ্বারায় বেদান্তের উচ্চসত্যসকল সর্ব্বসাধারণে প্রচার। কিছুদিন হইল, 'প্রবুদ্ধ-ভারতের' সুযোগ্য সম্পাদক দেহত্যাগ করায় স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছাক্রমে

মঠস্থ স্বামী স্বরূপানন্দ হিমালয়স্থ আলমোড়া নগর হইতে উহা পরিচালন করিতেছেন। প্রথমোক্তটী এখনও দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন।

এলাহাবাদেও 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লব' নামে একটী সভা বাবু শরচ্চন্দ্র মিত্র ও বাবু মন্মথনাথ গাঙ্গুলী, এই উভয়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় এক বৎসর হইতে পরিচালিত হইতেছে। 'রামকৃষ্ণ-মিশনকে' সাধ্যমতে সহায়তা করা এই সভার উদ্দেশ্য।

স্বামী অভেদানন্দ প্রায় দুই বৎসর হইতে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যগণও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। স্বামী অভেদানন্দ লোকের মনে বেদান্তের ভাব উদ্দীপনায় এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, আগামী বর্ষের কার্য্যের জন্য নিউইয়র্কের বেদান্ত-সমাজ সহরের মধ্যভাগে একটি বৃহৎ হল লইয়াছেন। বিগত ২০শে নবেম্বর হইতে ৪র্থ এভিনিউর নিকট, ১০৯ নং ইষ্ট ২২ ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড চ্যারিটিজ বিল্ডিঙের এসেম্ব্লি হলে উক্ত স্বামীজি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছে, বেদান্ত-বিষয়ে লোকের যেসকল ভুল সংস্কার আছে, তাহা ঘুচাইবার জন্য ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন; বেদান্তের উদারভাব ক্রমশঃ আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভিতরে উহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নামে নানাপ্রকার সভা গঠিত হইতেছে। তাহাদের সকলে যদিও বেদান্ত স্বীকার করে না, কিন্তু তাহাদের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহারা স্বামীজিগণের বেদান্ত-প্রচারের ফল-স্বরূপ, কারণ, ঐ সকল সভার সভ্যগণ স্বামীজিগণের শিক্ষানুযায়ী প্রাণায়াম, ধ্যানাদি করিতেছে।

স্বামী অভেদানন্দ প্রতি সপ্তাহে দুইটী করিয়া বক্তৃতা দেন, একটী প্রতি বুধবার, সন্ধ্যা ৮টার সময় ও অপরটী প্রতি রবিবার বৈকাল বেলা ৩টার সময়, আর প্রতি শনিবার বেলা ১১টার সময় কিঞ্চিৎ উচ্চাধিকারী ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন।

ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের ইংলণ্ডীয় শিষ্যগণও বেদান্ত প্রচার করিতেছেন।

ম্যাক্সমুলারের লিখিত পরমহংসদেবের জীবনীসম্বন্ধে পাইওনিয়ার।

আমরা গতবারে ম্যাক্সমুলার লিখিত পরমহংসদেবের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। আমাদের বিশ্বাস, এই পুস্তক দ্বারা অনেকের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যগণের অনেক উপকার হইবে। গত ২৬শে জানুয়ারির পাইওনিয়ারে 'একটি ভারতীয় সাধু' (An Indian Saint) নামক প্রবন্ধ-পাঠে আমাদের এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। পাইওনিয়ার এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদের পত্র, সুতরাং, এতৎকৃত সমালোচনা বড় উপেক্ষার বিষয় নহে। পাইওনিয়ার বলেন,—ভারতবাসীর মনের অন্তস্তর যিনি সামান্য পরিমাণেও জানিতে চাহেন, তাঁহার এই গ্রন্থ-পাঠ আবশ্যক। কিছু দিন পূর্ব্বে ইংরাজেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বাহ্য ব্যাপার-

গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক অথবা সামাজিক জীবনও ইংরাজদিগের তত শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করে নাই। প্রাচ্যতত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতগণ উপনিষদাদির অনুবাদ করিলেও ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। পরে এডুইন আরণল্ডের (Edwin Arnold) লাইট অব এশিয়া (Light of A·ia) ও ভগবদ্গীতার সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ ইংরাজদিগকে শিখাইয়াছে যে, গ্রীক ভাস্কর্য্য-বিদ্যার সহিত আধুনিক শিল্পের যে সম্বন্ধ, ভারতীয় দর্শনের সহিত আধুনিক দার্শনিক চিন্তার সেই সম্বন্ধ।

পাওনিয়ার পরমহংসদেবের জীবনচরিত অতি সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। পাওনিয়ার বলেন, অনেকে হয়ত বলিবেন, তিনি ত জীবনে কিছুই করেন নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি লোকের উপর নিজ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন মাত্র, আর যে আদর্শে, সমুদয় বিষয়— যাহা সংসারে পরম আদরের বস্তু, যাহার জন্য জীবনধারণে কিছু লাভ আছে বলিয়া বোধ হয়,—তাহার প্রতি ঔদাসীন্য শিখায়, সে আদর্শে কি শিক্ষা হইবে—কিন্তু, ইহার বিপরীত উদাহরণ এত অধিক ও সুলভ যে, সাধুপুরুষের অন্ততঃ এইটুকু উপযোগিতা আছে যে, তাঁহাদের প্রভাবে লোকের ঐহিক বিষয়ে বিজাতীয় আগ্রহ ও চেষ্টা কিঞ্চিৎ পরিমাণে নরম হইবে। পরমহংসদেবের উক্তির মধ্যে অপর ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি-সূচক দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাইওনিয়ার পরমহংসদেবের উদার বিশ্বজনীন ভাবের প্রশংসা করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন, যে নামে ভগবানকে ডাক না কেন, ভগবান দেখা দিবেন, ইহা আজকালকার চিন্তার অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্প দিন পূর্ব্বে এ সত্য পাশ্চাত্য জগতে এত স্পষ্টভাবে প্রচারিত ছিল না। 'বিভূতি' সম্বন্ধে পরমহংসদেবের একটি উক্তি তুলিয়া বলিয়াছেন, অনেকের বিশ্বাস, যোগ-সাধকদিগের লক্ষ্য—সিদ্ধি, বাস্তবিক, তাহা নহে, নির্ব্বাণ তাঁহাদের লক্ষ্য। পূর্ব্বে পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্য বিষয়সমূহ এত কম বুঝিতেন যে, 'নির্ব্বাণ' শব্দে তাঁহারা নাশ স্থির করিতেন, বাস্তবিক উহা মনের অতি উচ্চাবস্থা।

'ধর্ম্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে কেন ?' ইহার উত্তর পরমহংসদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুধু প্রাচ্যদেশের পক্ষে খাটিবে, তাহা নহে। রামকৃষ্ণের ন্যায় একজন ধর্ম্মাচার্য্যের পবিত্র প্রভাব কেবল তাঁহার স্বজাতির মধ্যে আবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য নয়। তবে অবশ্য পাওনিয়ার আমাদিগকে কেবল পিতৃ-পুরুষদিগের গৌরব-স্মরণে কালাতিপাত করিতে নিষেধ করিতেছেন। ইঁহার মতে, তোমরা অগ্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা আপনাদিগকে ঐহিক বিষয়ে সতেজ কর, পরিশেষে তোমরা ইউরোপ হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ দর্শনের ভিত্তিস্থাপনে কৃতকার্য্য হইবে। ইউরোপের পক্ষেও প্রাচ্যজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকা অকর্ত্তব্য। ইউরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিতেছেন, রামকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষের জীবনে শিক্ষা করিবার অনেক জিনিষ আছে।

আমরা পাইওনিয়ারের মতে [মত] সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

প্রাপ্ত*

মান্যবর "উদ্বোধন" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, গত পৌষ মাসের হিতৈষীতে (৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ 'নিমকহারামের জাতি' যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নহে, 'উদ্বোধন' পত্রিকায় যাহা বাহির হইল, তাহাই ঠিক। আমরা তাহা সাধারণকে জানাইলাম ও বিচারার্থ প্রদান করিলাম।

(স্বাক্ষর) শ্রীজিতেন্দ্র কৃষ্ণ দেব
২।৭ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার রাজবাটী—

মানুষ নিমকহারাম

মনুষ্যগণ, আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সারভাব গ্রহণ কর।

মানুষ নিমকহারাম; যে মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন হয়, যে মাতাপিতা যত্নে, স্নেহে মানুষ করেন, শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে সেই মাতাপিতার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে পালন করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কষ্ট দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। মাতাপিতার অভাব মোচন ও আজ্ঞা পালনে বিরত বটে, কিন্তু নিজে নৃত্যগীতাদি অবিশুদ্ধ ভোগবিলাসকে সনাতনধর্ম্ম জানিয়া ইচ্ছামত অর্থ নষ্ট করে। মাতাপিতার জীবদ্দশায় তাঁহাদের প্রতি একবার চাহিয়াও দেখে না, মৃত্যুর পর তাঁহাদের শ্রাদ্ধ বাদ্য-বন্দুকাদি দিয়া ও বহু ব্যয় ও আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন করে। যে রাজার রাজ্যে বাস করে, যাহার আশ্রয়ে রক্ষিত হয়, প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসনের বশবর্ত্তী না থাকিয়া, তাঁহার নিন্দা ও অপমান করিতে ত্রুটি দেখা যায় না।

আরও দেখ, মনুষ্যের যতক্ষণ স্বার্থ, ততক্ষণ প্রীতি। মাতাপিতার নিকট ধন বা অন্য কোনরূপ লাভের প্রত্যাশা থাকিলেই পুত্র কন্যা শ্রদ্ধা ভক্তি করে। স্ত্রীর রূপ-যৌবন, অর্থ সম্পত্তি থাকিলেই স্বামীর নিকট আদর হয় এবং পুরুষের স্ত্রীর নিকট সম্মানের হেতুও ঐরূপ। অশ্ব, গো, মহিষাদি পশু যতক্ষণ কার্য্যক্ষম থাকে বা দুগ্ধ দেয়, ততক্ষণ যত্নে পালিত হয়। স্বার্থের সম্ভাবনা না থাকিলে মানুষ নিমকহারাম, কাহাকেও যত্ন করে না। ধন ও ক্ষমতাশালী লোকের সকলের নিকট মান ও প্রতিষ্ঠা হয়। "আসিতে আজ্ঞা হউক", "আপনি আমার প্রিয় বন্ধু" ইত্যাদিরূপে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে সম্মান দেখায়। কিন্তু সেই ব্যক্তিই ঈশ্বর-কৃপায় দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হইলে সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহার সহিত কেহ কথা পর্য্যন্ত কহে না। যদি বা অনুগ্রহপূর্ব্বক কথা কহে, তবে বলে, "তুমি কোথাকার কে?" পুনরায় ধন বা ক্ষমতা হইলে তাহাকে পুনরায় বলিবে, প্রিয় বন্ধু, কিন্তু নিমকহারাম মানুষের

* "প্রাপ্ত"—চিহ্নিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

এ জ্ঞান নাই যে, সম্পদে, বিপদে, সকল অবস্থাতেই একই আত্মা থাকেন। ধন এবং ক্ষমতা আজ আছে, কাল নাই, কিন্তু আত্মা সর্ব্বকালেই থাকেন। যাহারা বিপদে সম্পদে মাতা-পিতা প্রভৃতিকে মান্য না করে, তাহারা জগৎ-মাতাপিতা পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষকে কি মান্য করিবে?

নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকার পূর্ণ ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা, ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে বিরাজমান আছেন। ইঁহাকে মনুষ্য একবার চাহিয়াও দেখে না যে, এই আকাশের মধ্যে ইনি কে? ইঁহা ছাড়া যদি অপর কেহ থাকেন, তিনি কোথায় আছেন? নিমকহারাম ইঁহাকে শ্রদ্ধা সহকারে একবার নমস্কারও করে না, বরং ইঁহাকে সামান্য জানিয়া ঘৃণা ও উপহাস করে। এইরূপ নানা কারণে মনুষ্যগণ অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহারা বিচার করিয়া দেখে না যে, ইহা ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইঁহারই নানা নাম নানা শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষই পারমার্থিক ব্যবহারিক উভয় বিষয়ে, একমাত্র ফলদাতা এবং ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ, খোদা, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, দেব, দেবী, বিষ্ণু, ভগবান, শিব, কালী, প্রভৃতি ইঁহারই নানা নাম মিথ্যা রূপে কল্পিত হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভক্তি বা পূজা করিলে ইঁহারাই সমস্ত ফল দেন এবং কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ভোগ করান। কিন্তু যিনি সর্ব্বকালে আছেন, তাঁহাকে বিচারপূর্ব্বক চিনিয়া মান্য করে না এবং যিনি কোনকালে হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাঁহার মিথ্যা নাম কল্পনা ও তীর্থ, ব্রত এবং কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত প্রতিমা-প্রতিষ্ঠাদি করিয়া কতপ্রকারে যে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছে, তাহার সীমা নাই, এবং সেই পুরুষ হইতে বিমুখ হইয়া দেখিতে পাইতেছি যে, ফলপ্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং পরস্পর দ্বেষ-হিংসা-জনিত দুঃখভোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। সকলপ্রকারে তেজোহীন, জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহাও বিচার করিয়া দেখিতেছে না যে, এই যে সকল নাম বেদ, বাইবেল, কোরাণাদিতে কল্পিত আছে, ইহা কাহার নাম, তিনি কে, কোথায় আছেন, তিনি ছোট না বড়, নিরাকার না সাকার ইত্যাদি। যদি বল, ইঁহারই সকল নাম ধরিয়া উপাসনা, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ যে, যদি একই পুরুষের সমস্ত নাম কল্পিত হইয়াছে, তোমাদিগের এরূপ ধারণা থাকে, তবে নাম লইয়া এ দ্বেষ হিংসা কেন? তাহা হইলে যে আমার ইষ্টদেবতার বড় ও শ্রেষ্ঠ নাম, ও অপরের ইষ্টদেবতার ছোট ও নিকৃষ্ট নাম এরূপ বল কেন? যদি বল, যে নাম হউক না কেন, তাঁহারই নাম, আর যে নাম লই না কেন, তাঁহারই নাম, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, জলের অনেক নাম কল্পিত আছে। জলের যে নাম ধরিয়া পান কর না কেন, পিপাসা যাইবে। কিন্তু ওয়াটার বা জল প্রভৃতি নাম লইয়া, জল দেখ, বা "জল" এই শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর, কখনই পিপাসা নিবৃত্তি হইবে না। সকল নাম উপাধি পরিত্যাগ করিয়া জল যে পদার্থ, তাহা তুলিয়া পান কর, সহজে পিপাসা নিবৃত্তি হইবে ও শান্তি আসিবে। সেইরূপ নিরাকার, সাকার, পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম, উপাধি ত্যাগ করিয়া

শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক ইঁহার শরণাগত হও, সকল সমাজেই শান্তি-প্রাপ্তি হইবে।

প্রত্যক্ষ চেতন মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করাই প্রয়োজন। নিদ্রিত বা মৃত মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর আর না কর, তাহাতে তাঁহাদের লাভ বা ক্ষতি নাই। বরং জাগ্রত মাতা-পিতাকে উত্তমরূপে শ্রদ্ধাভক্তি করিলে দুই অবস্থাতেই মাতাপিতাকে শ্রদ্ধাভক্তি করা হইল। যে মাতাপিতা নিদ্রিত, নিষ্ক্রিয় থাকেন, সেই মাতাপিতাই জাগ্রত অবস্থায় সর্ব্ব-শক্তিরূপে সমস্ত কার্য্য করেন ও করান। ইহা নহে যে, নিদ্রিত মাতাপিতা এক, তাঁহাদিগকে মান্য করা উচিত ও জাগ্রত মাতাপিতা অপর, তাঁহাদিগকে মান্য করা অনুচিত; ইহা অজ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানী বুঝেন যে, নিদ্রিত অবস্থায় যে মাতাপিতা নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন, সেই মাতাপিতা জাগ্রত হইয়া পুত্রকে লালন পালন করেন। মাতাপিতা একই।

মাতা-পিতারূপী নিরাকার, সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের পুত্র-কন্যারূপী তোমরা জগতের স্ত্রী পুরুষ। নিদ্রিত অবস্থায় মাতাপিতা নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, গুণাতীত। জাগ্রত অবস্থায় মাতাপিতা নিরাকার হইতে সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা,পিতা, গুরু, আত্মা বলিয়া জানিবে। একই মাতা পিতা, নিরাকার, সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, এ নিমিত্ত, সাকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, জ্যোতিঃস্বরূপ, মাতাপিতা গুরুকে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই উত্তমরূপে শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করিবেন। তিনি তোমাদের সকল প্রকার বিপদ ও অজ্ঞানতা লোপ করিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। ইহা নিশ্চিত সত্য বলিয়া জানিবে।

সেই মঙ্গলময় জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। ইহা না জানিয়া তোমরা পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের ইষ্ট অভিলাষ কর। কিন্তু ইহা দেখ না যে, পরের ইষ্টেই আপনার ইষ্ট এবং পরের অনিষ্টে আপনারই অনিষ্ট; কেননা, একই পুরুষ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। অতএব, আড়ম্বর প্রপঞ্চ করিয়া জগৎকে কষ্ট দিও না।

যদি ইঁহার নানা কল্পিত নামের মধ্যে একটীকে কেহ বলেন অনাদি, শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর ও অপরটীকে বলেন, সাদি, নিকৃষ্ট ও অকল্যাণকর, তাহা হইলে বিচারপূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, সমুদায় নামই মিথ্যা কল্পিত। জল নাম যদি শ্রেষ্ঠ, কল্যাণদায়ক হয়, তাহা হইলে নীর বা পানি নামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণদায়ক হইবে। নীর বা পানি নাম অশ্রেষ্ঠ ও অকল্যাণদায়ক হইলে জল নামও তদ্রূপ হইবে। পরমাত্মার সমুদয় নাম সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়া লইবে। শিব বা ঈশ্বর নাম যদি শ্রেষ্ঠ বা কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে গড্, আল্লাহ প্রভৃতি নামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর হইবে। গড্, আল্লাহ প্রভৃতি নাম অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইলে, শিব ও ঈশ্বর নামও অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইবে।

এই সকল কল্পিত নাম সম্বন্ধে বুঝা উচিত যে, পিতা পুত্রের নাম রাখেন। কারণ, পিতা পুত্রের অগ্রবর্ত্তী। পুত্র পিতার নাম রাখিতে পারে না। কারণ, পুত্র পিতার পরবর্ত্তী; যাঁহার নাম ঈশ্বর, ব্রহ্ম, গড্, খোদা, প্রভৃতি, তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি বিরাজমান রহিয়াছেন।

তবে তিনি ছাড়া কে ছিল যে, তাঁহার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ্ প্রভৃতি নাম রাখিয়া কোন নামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কোন নামের নিকৃষ্টত্ব স্থাপনা করিয়াছে ?

তবে এ সকল নাম কে কল্পনা করিয়াছে? পরমাত্মার প্রিয় ভক্তগণ, যাঁহারা পুত্ররূপী জীবাত্মা, তাঁহারা জগতের কল্যাণার্থে নানা নাম কল্পনা করিয়া জগৎকে জানাইয়া গিয়াছেন যে, সেই নাম ধরিয়া শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক ডাকিলে, তিনি দয়াময়, দয়া করিয়া অন্তর হইতে জ্ঞান প্রকাশ করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন, এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করাইবেন। কিন্তু মানুষ এতদূর নিমকহারাম যে, এই জগৎপিতা, জগৎমাতা, জগৎগুরু, জগতের আত্মা, পরমাত্মা যিনি সর্ব্বকালে নিরাকার সাকার, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া সকলকে সুখ প্রদান করিতেছেন, যাহাতে মনুষ্য সর্ব্বকালে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক জানিতে বা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করে না। কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুগণ আপন মনিব ও মঙ্গলকারীকে চিনে ও প্রীতি করে। কিন্তু মানুষ নিমকহারাম জগতের মঙ্গলকারী মাতা-পিতা, ঈশ্বর বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং নিন্দা করে।

অতএব হে মনুষ্যগণ, তোমাদের ন্যায় নিমকহারাম আর কোথায় আছে ? তোমরা আপন আপন অভিমান ও সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সকল জীবকে সকল অবস্থায় দয়া কর এবং জগতের মাতাপিতা পরমাত্মার শরণাগত হও, তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী, মনোহরপুকুর, ঢাকুরিয়া পোঃ, কলিকাতা।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যার কভারে (তৃতীয় পৃষ্ঠায়) 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। উহাতে প্রথমেই রহিয়াছে: "বাংলা পাক্ষিক পত্র—ডিমাই আট পেজী, ৬৪ পৃষ্ঠা—মূল্য সডাক দুই টাকা বার্ষিক।"

পরে "লেখক", "সম্পাদক" ও "আলোচ্য বিষয়" এই তিনটি শিরোনামের নীচে তৎসংক্রান্ত বিবরণ। ইহার পর রহিয়াছে:

"উদ্দেশ্য

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ ভারতভূমি আবার উঠিতেছে। এ নব অভ্যুত্থানের শক্তিবিকাশে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইবে—ভারতের নূতন আলোকে পৃথিবী সমুদ্ভাসিত হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, বন্ধুভাবে বা শত্রুরূপে, নিঃস্বার্থভাবে বা নীচ স্বার্থের তাড়নায়, মহাশক্তির প্রেরণায় সকলেই এই মহাকার্য্যের সহায়। কত মহাবীর এই কর্ম্ম-সমুদ্রে মহাতরঙ্গরাজির সমুদ্বোধন করিতেছেন আর আমাদের এই ক্ষুদ্র 'উদ্বোধন' যদি শ্রীভগবানের এই বিশাল সেতুতে কাষ্ঠবিড়ালকার্য্যও করিতে সমর্থ হয়, জীবন সফল মনে করিব।"

শেষে, উদ্বোধন কার্য্যালয়ের ঠিকানার পর যন্ত্রস্থ 'রাজযোগ' গ্রন্থ এবং 'উদ্বোধন প্রেস'-এর বিজ্ঞাপন। —সম্পাদক

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই ফাল্গুন। [৪র্থ সংখ্যা।]

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ।

(রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত—রবিবার ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ)

এই সভাতে বেদাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইবে, তাহা কথাবার্তাচ্ছলে বলিব, কারণ, বক্তৃতার ভাষায় বলা হইলে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব অনুভব হইতে পারে। আমরা সকলে একসঙ্গে ধর্মশিক্ষা করিতে একত্রিত হইয়াছি, পরস্পরের সন্দেহ-সকল প্রশ্ন দ্বারা বিচারপূর্বক মীমাংসা করিয়া সত্যলাভ করিব, এই উদ্দেশ্য। কোন মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবন প্রত্যক্ষ দেখিলে, বেদোক্ত ধর্ম্মাদি সহজে উপলব্ধি হয়, সেই জন্য অন্যান্য মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে—যাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—এই সকল ধর্ম্ম কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিব। প্রথমে আমি বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে কিছু পাঠ করিতে চাই—

এক সময়ে মিথিলার রাজা জনকবিদেহ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই মিথিলা-রাজবংশের কোন রাজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাতে, তাঁহাদের বংশের উপাধি বিদেহ হইয়াছিল। এই যজ্ঞে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনক এক সহস্র গাভী দক্ষিণা দিবেন, মনস্থ করিয়া তাহাদের শিং স্বর্ণদ্বারা মুড়াইয়া দিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই গাভী গ্রহণ করুন। কেহই অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিলেন, তোমরা এই গাভীসকল গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, ইনি আমাদের অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ, তাহা বিচার করা যাউক। আমাদের অপেক্ষা যদি ইনি কিছু অধিক জানেন, তাহা হইলে ইঁহাকে গাভী দেওয়া যাইবে। এইরূপ স্থির হইলে গার্গী-নাম্নী একটি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নানা বিষয়ের উত্তর করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার করিলেন। অবশেষে গার্গী আবার বলিলেন, আমি আর দুইটি প্রশ্ন করিতে চাই, যদি যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে, বুঝিব, ইঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। ১ম, কাহার দ্বারা এই সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং ২য়, তিনি কে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলে গার্গী বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, কারণ, ইনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, অতএব, ইঁহার জানিবার আর কিছু আবশ্যক নাই। [ক্রমশঃ]



শ্রীশ্রীদুর্গা (বেলুড় মঠ)

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥



দিব্য বাণী

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাঽপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎস্তে নানাবিধাস্তনূঃ॥

—মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪।১৩-১৬

কালী, তারা, দুর্গা তুমি, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী,
তুমিই মা ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী।
বগলা, ভৈরবী তুমি, কমলা কমলাসীনা,
অন্নপূর্ণা, সরস্বতী শ্রীকর-বিধৃত-বীণা।
সর্ব দেবদেবী সদা তব দেহে বিরাজিত,
সর্ববিধ শক্তিরূপে তুমিই মা প্রকাশিত।
প্রকাশ বা অপ্রকাশ সত্তা যাহা কিছু আছে
স্থূল সূক্ষ্ম সবই তুমি চরাচর বিশ্বমাঝে।
নিরাকারা তুমি, তবু সাকারাও হও গো মা,
সাধ্য কার আছে বল স্বরূপে বুঝিবে তোমা!
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ তরে, বিনাশিতে অমরারি,
সাধিতে জগৎ-হিত হও নানা তনুধারী!
(লীলাময়ী মা তোমার অরূপসায়র'পর
রূপের লহরী ওঠে ইচ্ছামাত্র নিরন্তর!)

কথাপ্রসঙ্গে

পূজা

শ্রীশ্রীমা একদিন বলিতেছেন, জ্ঞান হলে 'ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়।…সব এক হয়ে দাঁড়ায়।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা।…জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা।'

ইহাই ঈশ্বরোপলব্ধির চরম কথা, সব সাধনারই চরম লক্ষ্য এই 'শেষ'-এ পৌঁছানো, যেখানে জীব জগৎ ও ঈশ্বর, পূজক পূজোপকরণ ও পূজিত দেবতা সবই 'উড়ে যায়', সবই নামরূপ হারাইয়া একীভূত হয় এক নিত্য আনন্দময় চেতন সত্তায়। এই সত্তাই তন্ত্রের নির্গুণা নিরাকারা 'মা', বেদান্তের 'ব্রহ্ম', যোগের 'পরমাত্মা'; গীতায় ইহাকেই 'শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম' বলা হইয়াছে।

তন্ত্র তাই উপাস্য ও উপাসকের এই অভেদত্বের ধ্যানকেই শ্রেষ্ঠ পূজা বলিতেছেন: 'জ্ঞানপথে যাহাকে নির্বিকল্প অবস্থা বলা হয়, যোগের পথে যাহাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বানুভূতি বলা হয়, পূজক ও ঈশ্বরের সেই অদ্বয়ানুভূতিকে দৃঢ় করিবার মতিই শ্রেষ্ঠ পূজা, পুষ্পাদি নিবেদনরূপ পূজা নহে', 'যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ', 'পূজা নাম ন পুষ্পাদ্যৈর্যা মতিঃ ক্রিয়তে দৃঢ়া। নির্বিকল্পে মহাব্যোম্নি সা পূজা হ্যাদরাল্লয়ঃ।'

কিন্তু এ পূজার অধিকারী কয়জন? আমরা কয়জনই বা নাম-রূপ-গুণ ছাড়া নিজের বা ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারি? নামরূপের রাজ্যে থাকিয়া মায়ের সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে তাঁহার একটি সগুণা সাকারা প্রকাশ আমাদের চাই-ই। তাই, তন্ত্র বলিতেছেন, আমরা যাহাতে মায়ের ও নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি তাহার জন্য সাধনার অবলম্বন-রূপে, 'সাধকানাং হিতার্থায়', অরূপা মা রূপ ধারণ করেন; সাধকের বিভিন্ন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, 'গুণ-ক্রিয়ানুসারেণ', বিভিন্ন মূর্তিতে সেই নিত্যা জননী আবির্ভূতা হন।

পূজক জগৎ ও জগজ্জননী বলিয়া তিনটি বিভিন্ন সত্তা নাই, নামরূপাতীত অদ্বয় সত্তা-মাত্রই রহিয়াছে—এই 'শেষ' কথাটি সাধনার প্রারম্ভে ধারণা করিতে না পারিলেও যে-বিশেষ মূর্তিতে মাকে আমরা চিন্তা করিতেছি তিনিই 'জগন্মূর্তি', তিনিই জগতের সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন—ইহা আমরা চিন্তা করিতে পারি; শ্রীশ্রীমা তাই 'সব উড়ে যায়' বলার পরই আমাদের ধারণাগম্য এই কথাটিই বলিয়াছিলেন, 'মা, মা—শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে। সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা।' মা আমার জগৎ জুড়ে, এই কথাই কারণসলিলে ভাসমান বটপত্রশায়ী শিশু বিষ্ণুকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন, 'যা কিছু দেখছ এসব আমিই হয়েছি, আমি ছাড়া নিত্য সত্তা আর কিছুই নেই', 'সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্'; বলিয়াছিলেন হিমালয়ে শুম্ভাসুরকে, 'এ জগতে একমাত্র আমিই আছি, আমি ছাড়া (ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি) দ্বিতীয় আর কে আছে?', 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাঽপরা'; বলিয়াছিলেন দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবদর্শনে ভীত মহেশ্বরকেও, 'ভয় পেয়ো না, এসব রূপ আমারই', 'যা এতা দশমূর্তয়ঃ। সর্বা মমৈব'

তন্ত্রের পূজা-বিধানের বৈশিষ্ট্য হইল অধিকারী ভেদে জগন্মাতার কোন মূর্তির বিভিন্ন প্রকার বাহ্যপূজার ব্যবস্থা এবং তাহা অবলম্বনেই মনকে সাধনপথের চরম লক্ষ্যের, 'শেষ'-এর পানে টানিয়া লইয়া যাওয়া। তন্ত্র পূজাপদ্ধতির ভিতর দিয়াই চিন্তা করিতে শিখায়, যে-মাকে একটি বিশেষ মূর্তিতে (বা ঘট-যন্ত্রাদি প্রতীকে) আমার সম্মুখে রাখিয়া আমা হইতে পৃথক ভাবিয়া পূজা করিতেছি, তিনি শুধু ওখানেই নাই, বিশ্বের সব কিছু জুড়িয়া আছেন, 'মা আমার জগৎ জুড়ে'; পূজোপকরণ তিনি, আমার সর্বাঙ্গ জুড়িয়া তিনি, আমার চিন্তা অনুভূতি প্রভৃতির আধার হৃদয়েও তিনি! এমন কি, আমি ও তিনি অভেদ - এই 'শেষ' কথাটিও শিখায়— ভাবিতে শিখায়, আমি ও জগন্মাতা একই অদ্বয় সত্তা, সেই অদ্বয়া জননীকেই পূজক ও পূজিতা মূর্তি এই দুই রূপ দিয়া, তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া প্রতিমায় বা যন্ত্রাদিতে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছি এবং পূজান্তে আবার তাঁহাকে তাঁহার 'স্বস্থানে', আমার হৃদয়ে ফিরাইয়া আনিতেছি। নিজের দিব্যস্বরূপে স্থিত হইয়া, 'দেবো ভূত্বা', পূজা করা, পূজাদ্রব্যাদিকেও দিব্যভাবাপন্ন বা শোধন করা, ন্যাস, আবাহন, বিসর্জন প্রভৃতি পূজাঙ্গের মূলগত ভাব ইহাই।

শুধু পূজাকালেই নয়, পূজার পূর্বদিন হইতেই আহারাদি সংযম, এবং মায়ের ধ্যান, চিন্তা প্রভৃতির মাধ্যমে পূজকের মনকে দিব্য-ভাবমুখী করিবার জন্য প্রয়াসের বিধান আছে। কেবল পূর্বদিন হইতেই নয়, পূজার কয়েক-দিন পূর্ব হইতেই মা-র ভাবে মনকে একমুখী রাখিতে পারিলেই ভাল। (প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করিবার জন্য একজন ব্রহ্মচারী পূজার কয়েকদিন পূর্ব হইতেই মঠে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই সময় একদিন বিকালে তিনি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজীর Chicago Addresses বইটি পড়িতেছিলেন। দেখিতে পাইয়া স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এবার পূজো কি ইংরেজীতে হবে?') কোন কোন বিধানে আছে, পূজককে পূজার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রাতঃকৃত্য করিবার সময়েই 'শেষ' কথাটির, পূজার চরম লক্ষ্যটির দিকে একবার তাকাতেই হইবে, পূজকের দৃষ্টি, ধারণাশক্তি সে পথে যতদূরই যাক না কেন— চিন্তা করিতে হইবে, 'যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনিই আমার আরাধ্যা জননী, আমি তিনিই, অন্য কিছু নই—আমি অশোক', 'অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।' এই চিন্তার পর মায়ের 'যন্ত্র'-রূপে বা মাতৃগতপ্রাণ সন্তানরূপে দেহাত্মবুদ্ধিতে ফিরিয়া আসিবার নির্দেশ- 'আমার হৃদয়স্থা জননীর দ্বারা, "পরদেব্যা হৃদিস্থেন", যেমন চালিত হইতেছি তেমনি করিতেছি', 'মা, তোমারই তৃপ্তির জন্য, "তব প্রিয়ার্থম্", প্রভাতে উঠিয়া সংসারযাত্রার অনুবর্তন করিব।'

তন্ত্র পূজককে 'আমি জগৎ ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা'- এই দ্বৈতবোধ হইতে 'মা আমার জগৎ জুড়ে' এই বিশিষ্টাদ্বৈতবোধে, এবং সেখান হইতে 'আমিই মা' এই অদ্বৈত-বোধে যাওয়া-আসা করায়। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক অবস্থায় ইহার উপলব্ধি তো দূরের কথা, পূজকের হয়তো ধারণাই হয় না, মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রই সার হয়। তথাপি বারংবার ইহার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের মনকে ক্রমশঃ উপযোগী করিয়া লইয়া ইহার ধ্যানে, যথার্থ মানসপূজায়, ও শেষে ইহার উপলব্ধিতে উন্নীত করিয়া আমাদের হয়তো

জীবনব্যাপী, হয়তো বা জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী পূজা শেষ করাইয়া তন্ত্র সর্ববিধ দ্বৈতভাবের পূর্ণাহুতি প্রদান করায় জ্ঞান-প্রদীপিত শেষ হোমাগ্নিতে, 'অগ্নৌ···জ্ঞানপ্রদীপিতে।'

তখন পূজক 'ব্রহ্মসদ্ভাব' বা 'সহজাবস্থা' লাভ করেন। তন্ত্র বলিতেছেন, তখন দেহধারণ করিয়া থাকিলেও স্থূল-সূক্ষ্ম কোন দেহেই পূজকের আর অহং-বোধ থাকে না, তিনি দেহাভিমানমুক্ত হন। তখন আর তাঁহার বাহ্যপূজা, মানসপূজা বা তন্ত্র যাহাকে শ্রেষ্ঠ পূজা বলিতেছেন, মায়ের সহিত নিজের অভেদত্বের ধ্যানরূপ সেই পূজারও আর প্রয়োজন থাকে না—তখন তাঁহার প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেষ্ঠপূজা, মায়ের সহিত অদ্বয়-ভাবলীনতা হইয়া উঠে: 'আত্মার সহিত অদ্বয়-ভাবনিষ্ঠ সাধকের চেষ্টামাত্রই পূজা, কথা-মাত্রই মন্ত্র, নিরীক্ষণমাত্রই ধ্যান। পরমাত্মাকে যিনি জানিয়াছেন, যাঁহার দেহাভিমান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার মন যেখানেই যায় সেখানেই সমাধি হয়', 'আত্মৈকভাবনিষ্ঠস্য যা যা চেষ্টা তদর্চনম্। যো যো জল্পঃ স্বমন্ত্রস্য তদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্॥ দেহাভিমানে গলিতে বিদিতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ (কুলার্ণব তন্ত্র)।

শ্রীঅরবিন্দ

ভারতের প্রাণবাণীর উদ্গাতাদের অন্যতম মহান পুরুষ শ্রীঅরবিন্দকে আমরা প্রথম দেখিতে পাই, আমাদের স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে যাহার দান অবিস্মরণীয় সেই সশস্ত্র-বিপ্লবযজ্ঞের প্রধান হোতা এবং কংগ্রেস-কর্মী রূপে।

ইহারই শেষের দিকে তাঁহার চিন্তাজগতে দেখা যায় বিরাট রূপান্তর, যাহা তাঁহার দেশ-সেবাব্রতকে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হইতে পরিণামে গভীরতর ক্ষেত্রে সরাইয়া লইয়া যায়। আলিপুর জেলে থাকাকালীন তিনি শ্রীভগবানকে সর্বভূতে দর্শন করেন, পর পর পনেরো দিন স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও উপদেশ লাভ করেন, এবং উপলব্ধি করেন, তাঁহার ভাষায় ভগবানের বাণী লাভ করেন, যে: "আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা," এই ধর্মের উন্নতিতেই জাতীয় উন্নতি, "যখনই এই সনাতন ধর্মের অবনতি হয়, তখনই জাতির অবনতি হয়।" আর, ভারতের জাগরণ শুধু নিজের জন্য নয়, সনাতনধর্মের সর্বজনীন ভাবরাশিকে, "যা যুগ-যুগান্ত আগে মানবজাতির মুক্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" তাকে "সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্যই।" এই জন্যই ভারত জাগিতেছে শ্রীভগবানের ইচ্ছায়, জাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় আন্দোলনগুলিও ঘটিতেছে তাঁহারই ইচ্ছায়- যাহাকে দিয়া যাহা করানো প্রয়োজন তিনিই তাহা করাইতেছেন—আমি না করিলে কাজ চলিবে না, এরূপ ভাবা অর্থহীন, নিজেকে তাঁহার যন্ত্র ভাবিয়া কাজ করাই যথার্থ ভাব। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তাঁহার কথা, রচনা ও কর্মে এই উপলব্ধিসঞ্জাত রূপান্তর সুস্পষ্ট হয় এবং ইহার বৎসরখানেক পর হইতেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি ব্রতী ছিলেন নিজে দিব্য-জীবন লাভ করিয়া অপরকেও দিব্যজীবনে উন্নীত করিবার সাধনায়

নিজ সাধনলব্ধ উপলব্ধিভাস্বর জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্পর্শের মাধ্যম ছাড়াও এই সহায়তার কাজ তিনি করিয়াছেন গ্রন্থরচনায়,

বিশেষ করিয়া 'দি লাইফ ডিভাইন' (দিব্য-জীবন)-গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে— যাহাতে তিনি দিব্যজীবন বলিতে কি বুঝায়, মানবজাতির (সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিরই) ক্রমবিকাশে উদ্‌বর্তনের বা সত্যের উচ্চতর প্রকাশের পথে ইহার অনস্বীকার্যতা, এবং ইহা লাভের উপায় সম্বন্ধে সারা পৃথিবীর উচ্চচিন্তাশীল মনীষীদের আধুনিক যুক্তিপ্রবণ বৌদ্ধিক ধারণার পথে বিপুল শুভ্র আলোকসম্পাত করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে শ্রীঅরবিন্দ সনাতনধর্মের অধ্যাত্ম-চিন্তাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন যথাসম্ভব পাশ্চাত্যদর্শনের ধারায়—যে ধারা বিশ্ব ও জীবনের চরম সত্যান্বেষণের প্রচেষ্টায় ভারতীয় দর্শনের মতো মনবুদ্ধির পারে যাইয়া ফিরিয়া আসা সত্যদ্রষ্টাগণের অতীন্দ্রিয় বা অতিমানসিক উপলব্ধির বিবৃতিকে প্রমাণ বলিয়া মানে না— যদি না সেগুলিও মনবুদ্ধি-সীমিত যুক্তির ছাঁকনির ভিতর দিয়া গলিয়া আসে। গ্রন্থটিতে তিনি কেবল সনাতনধর্মের সর্ববিধ অধ্যাত্ম-চিন্তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর আধুনিক ও প্রাচীন সব মূল চিন্তাগুলির সমাবেশ ও সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছেন ;—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার এই মিলনকে আধুনিক যুগে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি গ্রন্থটির প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন—প্রাচ্যের মতো জড়কে বাদ দিয়া কেবল অধ্যাত্মবাদ অথবা পাশ্চাত্যের মতো আত্মাকে বাদ দিয়া কেবল জড়বাদ নয়—উভয়ের সমন্বয়ই মানব-জাতির যথার্থ উন্নতির পথ ; বলিয়াছেন, জড়-প্রাণ-মন-সীমিত আমাদের অস্তিত্ববোধকে এসবের ঊর্ধ্বে তুলিয়া সত্যের অতিমানসিক প্রকাশের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া জড়-প্রাণ-মন সবকিছুর ভিতরই একই চরম সত্তা সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই দিব্যজীবন—জড়-জগৎকে ত্যাগ করিয়া এখান হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া নিজ দেবত্বের উপলব্ধিমাত্র নয়, সর্বানুস্যূত দিব্যভাবের বিকাশসাধন ও উপলব্ধি করিয়া এই জগতের সবকিছুকেই দিব্যভাবমণ্ডিত করিয়া তোলা। মানুষের, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিরই ক্রমোন্নতির পথে, সত্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর বিকাশে আরোহণের পথে লক্ষ্য ইহাই। অবশ্য ইহা কেবল নিজের চেষ্টাকৃত সাধনাতেই হইবার নয়—সাধনা দ্বারা আমাদের দিব্যভাবের প্রকাশক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে, প্রকাশ ঘটিবে তাঁহার ইচ্ছায়—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—দেবত্বের 'অবতরণ'-এর ফলে।

বলা যায়, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বিত পথেই ভগবদিচ্ছাচালিত হইয়া জীবনযাপন করিয়াছেন রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে এবং পণ্ডিচেরীতে বাসকালেও ;— প্রথমে যোগসাধনার সহিত রাজনৈতিক কর্মকে এবং পরে সাধনলব্ধ-উপলব্ধিভাস্বরতার সহিত অপরের জীবনগঠন-রূপ কর্মকে সমন্বিত করিয়া।

মনে হয় "Be God and help others to be God", 'নিজ দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি কর এবং অপরকেও সেরূপ করিতে সহায়তা কর', 'নিজের মুক্তি না চাহিয়া যে অপরের মুক্তির জন্য চেষ্টা করে, সে মহত্তর কাজ করে'—স্বামীজীর এই বাণীই যেন শ্রীঅরবিন্দ-রূপে মূর্ত হইয়াছিল। আজ তাঁহার জন্ম-শতবর্ষে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতার, ভারতের 'চিরসারথির' নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার সাধনা সফল হউক, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত দিব্যজীবনলাভের জন্য মানবজাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া একপৃথিবী গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করুক।

সত্যানুসন্ধানই ধর্ম

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আমরা মানুষকে প্রথম অবস্থায় যখন দেখি, যখন সে জঙ্গলে-গিরিগুহায় বাস করত, তখন সেই বর্বর অবস্থায় অন্যান্য পশুর সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। অন্যান্য পশুর মতোই তাঁর জীবন ইন্দ্রিয়জগতে সীমিত ছিল। তবে অন্যান্য পশুর সঙ্গে একটা পার্থক্য তার ছিল—ভগবান তাকে বিচারবুদ্ধি দিয়েছিলেন, যা অন্য পশুর ছিল না। সেজন্য অন্যান্য পশুরা পশুই রয়ে গেল, কিন্তু মানুষ এই বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ক্রমোন্নত হতে লাগল। এই ক্রমোন্নতির পথে সে মনের রাজ্যে (intellectual বা mental plane-এ) এসে পৌঁছল। তখন তার ভোগ আর সবটা ইন্দ্রিয়-সুখে রইল না, কিছুটা ভোগ সূক্ষ্মভাবে হতে লাগল—নাচ, গান, কবিতা- ও নাটক-লেখা, ছবি আঁকা, অভিনয়—এসব বিষয়ে সে আনন্দ আহরণ করতে শিখল। স্থূল ভোগ থেকে তার মন কিছুটা সূক্ষ্ম ভোগের দিকে গেল।

এখানেই তার ক্রমোন্নতির পথ শেষ হল না, আরো এগিয়ে গেল মানুষ। তার বিচারবুদ্ধিই তাকে আরো এগিয়ে যাবার প্রেরণা জোগাল। সে দেখল, জগৎ পরিবর্তনশীল, সর্বদা পরিবর্তন ঘটছে সেখানে। এই সদাপরিবর্তনশীল জগতের পিছনে এমন কোন সত্তা আছে কি না যা নিত্য—এটা জানার জন্য তার বিশেষ ঔৎসুক্য জাগল। সে তখন অনুসন্ধান করতে করতে শেষ পর্যন্ত আত্মায় গিয়ে পৌঁছল। তার আত্মজ্ঞান হল। যখন তার আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হল, 'তত্ত্বমসি' উপলব্ধ হল, তখন ক্রমবিকাশের পথে তার চলা শেষ হল। সে পশু থেকে মানুষ হল, মানুষ থেকে দেবতা হল। এভাবে মানুষের ক্রমবিকাশের পথ শেষ হল গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে।

এখন মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বলাভ তার ঘটল কিভাবে? কিভাবে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করল? প্রথমে বিচার দ্বারাই সে ঠিক করেছিল যে, এ জগতের পিছনে একটা নিত্য সত্তা আছে। আমাদের তিনটে অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা। সে বিচার করে দেখল, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে জগৎ দেখি, এই দৃশ্যমান জগৎ, ঘুমিয়ে পড়লে সেটা আর দেখা যায় না; এ জগৎ তখন কোথায় চলে যায়। তখন স্বপ্ন অবস্থায় দেখি কি? দেখি আমাদের সংস্কারের দ্বারা, মনের দ্বারা সৃষ্ট একটা স্বপ্নের জগৎ। তারপর ঘুম যখন গাঢ় হয়, সুষুপ্তি অবস্থা হয়, তখন এ স্বপ্নের জগৎটাও চলে যায়; কোথায় চলে যায় ঠিক নেই। তখন থাকে কি? থাকে শুধু একটা অজ্ঞানের আবরণ। আমরা যখন গভীর ঘুম থেকে উঠি তখন তো বলে থাকি, 'আমি খুব আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম', 'আমি কিছুই টের পাই নি।' এর ভেতর দুটো ভাগ আছে। একটা হল, 'আমি খুব আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম'—অর্থাৎ সেই অবস্থায়, সুষুপ্তি অবস্থায়, আত্মার যে আনন্দ তা আমি কিছুটা অনুভব করেছি। আর, 'আমি তখন কিছুই টের পাই নাই, কিছুই জানি নাই'—এর মানে আমি তখন অজ্ঞানকে দেখেছি, আমি তখন অজ্ঞানকে অনুভব করেছি। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা এই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকে বলে আমাদের তখন আত্মজ্ঞান হয় না, তার কিছুটা

আভাস মাত্র পাই। তাতেই আনন্দিত হই আবার সেই সঙ্গে অজ্ঞানকেও উপলব্ধি করি।

এই তিন অবস্থায় একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট যে, দৃশ্য জগৎটা পরিবর্তিত হচ্ছে বটে, কিন্তু যে দ্রষ্টা সে সব অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। যখন সমাধি হয় নির্বিকল্প অবস্থা হয়—তখন অজ্ঞানও চলে যায়। কিন্তু যে দ্রষ্টা সে তখনো থেকে যায়। দ্রষ্টারূপ এই যে সত্তা, পরিবর্তনশীল অনিত্য দৃশ্যগুলির মধ্যে যা সদা অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে, সেইটাই নিত্য। সেই হল আত্মা, সেই হল অখণ্ড, সে-ই অদ্বিতীয়। কোনকালে তার কোন রকম পরিবর্তন নেই, সে সর্বদাই দ্রষ্টা, কখনো দৃশ্য নয়।

মানুষ এভাবে বিচার করে দেখল। এখন এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে কি ভাবে? অজ্ঞানকে সরাতে হবে কিভাবে? সে বুঝল মন দিয়ে বিচার করে তার মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। সেজন্য মানুষ প্রথমে মনকে পরিষ্কার করতে, শুদ্ধ করতে সচেষ্ট হল। নানারকম সাধনা দ্বারা সে তা করতে চেষ্টা করল—বেদান্তে যার নাম 'সাধন-চতুষ্টয়', যার প্রথমটি হল ছয়প্রকার নৈতিক সাধনা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান।

শ্রদ্ধাই খুব বড় জিনিস। শাস্ত্রে যদি কারো শ্রদ্ধা না থাকে, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে, মহাপুরুষদের কথায় যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে তার কিছুই হতে পারে না। তারপর দরকার নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক—কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তা বুঝে অনিত্যকে ত্যাগ করে নিত্যকে ধরার চেষ্টা। তারপর সব বাসনা ত্যাগ করতে হবে—এ জগতেরই হোক বা স্বর্গেরই হোক, সমস্ত ভোগের বাসনা ত্যাগ করতে হবে।

এই ত্যাগের অভ্যাস কেবল সন্ন্যাসীদের জন্যই নয়। জীবনের সর্বস্তরেই সকলেরই ত্যাগ অভ্যাস করার প্রয়োজন রয়েছে। সংসারের মধ্যেও, যে কোন কাজেই হোক ত্যাগস্বীকারই উন্নতির মূল। গৃহস্থালির কাজ, আফিসের কাজ, সমাজসেবা, রাষ্ট্রপরিচালনা সর্বত্রই আমরা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ভুলে কেবল অপরের কথাই ভাবি, তাহলে সব কাজই খুব ভালভাবে চলে। আমাদের উন্নত হতে হলে, দেশকে উন্নত করতে গেলে ত্যাগ-স্বীকার তো চাই-ই, ভোগবাসনা ত্যাগ করবার পর তত্ত্ব লাভ করার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। এসব থাকলে তখন আমরা শাস্ত্রের মর্ম ভাল করে বুঝতে পারি। নইলে, মনের যা প্রাথমিক অবস্থা তা দিয়ে যদি আমরা শাস্ত্র বুঝতে চাই, আমরা তা ঠিক বুঝতে পারি না। এর একটা দৃষ্টান্ত আছে। ইন্দ্র আর বিরোচন গেলেন গুরুর কাছে। গুরুর কথা ইন্দ্র একরকম বুঝলেন, বিরোচন অন্য রকম। কেন? দুজনের মনের তফাত বলে। সেজন্য শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে গেলে মনকে শুদ্ধ করা চাই; তারপর শাস্ত্রের কথা শুনতে হবে, মনন করতে হবে। তারপর নিদিধ্যাসন বা ধ্যান অভ্যাস করতে হবে। শাস্ত্র বলছে, আমাদের স্বভাবত: বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলির বাইরে ছোটা বন্ধ করে সেগুলিকে অন্তর্মুখ করে মনকে আত্মার ধ্যানে লাগাতে হবে। ধ্যান ঠিক ঠিক হলে তখন সমাধি হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এভাবে চলে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিল।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, ধর্ম মানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি; তত্ত্বেরই হোক বা

ভগবানেরই হোক, অনুভূতিই হল ঠিক ঠিক ধর্ম। ধর্ম বলতে আর যা কিছু আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি—উপবাস করা, মন্দিরে যাওয়া, পূজাপার্বণ করা বা তীর্থভ্রমণ করা—এসব ঠিক ধর্ম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ সবকেই ধর্ম বলে ধরে নিই; অনেকের আবার এমন ধারণাও থাকে যে, এই সবই ধর্ম, এর বাইরে যা কিছু তা ধর্ম নয়, যারা এসব আচরণ করছে না তারা অধার্মিক। কিন্তু ভগবানের এমনি কৃপা, যখন মানুষের মনোভাব এরূপ সঙ্কীর্ণ হয়, তখন তিনি অবতীর্ণ হয়ে, মানুষ হয়ে এসে দেখিয়ে দেন ঠিক ঠিক ধর্ম কি, এবং তাঁর জীবন ও বাণীর দ্বারা মানুষকে সেপথে চালিত করেন।

গত শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই পথ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলেই আমরা ভগবানলাভ করতে পারব।*

* শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৮. ২. ৭১ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন হইতে সংকলিত। - সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

নমো নমো হে অমৃত
আলোর আধার!
শত মত শত পথ
শত নদী মিশে একাকার,
চেতনা-সমুদ্র তুমি
জ্যোতির্ময় তরঙ্গ তোমার
অদ্বৈত সত্তার।

লোকোত্তর নও শুধু
কালোত্তর পুরুষপ্রধান!
শুদ্ধ ভক্তি শুদ্ধ প্রেমে
অমল বিভূতি দীপ্যমান!
তোমায় অযুত নমস্কার।

দেবতীর্থ ভারতের
উজ্জীবনী মৃণালশিখরে
সূর্যপ্রভ শতপর্ণী
মহাপদ্ম বাঙ্ময় অক্ষরে
প্রমূর্ত প্রণব তুমি বরেণ্য ওঙ্কার!
নমো নমো হে অমৃত
আলোর আধার।

বৈদিক সাহিত্যে দুর্গা

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক, দ্বিতীয় অনুবাকে দুর্গাদেবীর উদ্দেশে গম্ভীরার্থ নিম্নোক্ত প্রার্থনা-মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়,—

তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥

যিনি অগ্নিবর্ণা, তপঃশক্তিতে জাজ্বল্যমানা ও স্বপ্রকাশা, ধর্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুবর্গরূপ ফললাভের নিমিত্ত যিনি সেবিতা হইয়া থাকেন, সেই দুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে পরিত্রাণকারিণি, সংসার-সাগর পার হইবার জন্য তোমাকে প্রণাম করি।

পৌরাণিক যুগের সপ্তশতীচণ্ডীতে অনুরূপ-ভাবের প্রেরণাতে দেবগণ ভগবতী দুর্গার স্তুতিতে উক্তি করিয়াছেন,—

দুর্গাসি দুর্গ-ভবসাগর-নৌরসঙ্গা।
(চণ্ডী, ৪।১১)

তুমি দুর্গা, দুর্গম ভবসাগরে অদ্বিতীয়া নৌকা-স্বরূপা। ভগবতী দুর্গা স্বয়ং কর্ণধার এবং নৌকা উভয়ই। সুতরাং জীবকে সংসার-সাগর পার করাইতে তাঁহাকে অদ্বিতীয়া বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত মন্ত্রটিকে উক্ত ভাবনার আদিম উৎস বলা যাইতে পারে,—

সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যাম্ অনেহসং
সুশর্মাণম্ অদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দেবীং নাবং স্বরিত্রাম্ অনাগসম্
অস্রবন্তীম্ আ রুহেমা স্বস্তয়ে॥
(ঋগ্বেদ, ১০।৬৩।১০)

আমরা মঙ্গলের জন্য দ্যুলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়া যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই। এই নৌকাতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইবার বিষয়ে কোন ভয়ই নাই, ইহা অতি বিস্তীর্ণ, ইহাতে আরোহণ করিলে সুখী হওয়া যায়, ইহার ক্ষয় নাই, ইহার গঠন অতি চমৎকার, ইহার চরিত্র সুন্দর, ইহা নিষ্পাপ ও অবিনাশী।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক, প্রথম অনুবাকে নিম্নোক্ত "দুর্গা-গায়ত্রী" মন্ত্র দৃষ্ট হয়,— (পুনা আনন্দাশ্রম সংস্করণ, পৃঃ ৭০০)

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।"

ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেন, 'দুর্গা' শব্দ স্থলেই এখানে 'দুর্গি' প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই মন্ত্র দ্বারা কাঞ্চনবর্ণাভা, ইন্দুখণ্ডভূষিতা, আগম-প্রসিদ্ধা দুর্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বেদের শাখাভেদে উক্ত 'দুর্গা-গায়ত্রী' মন্ত্রের পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। অথর্ববেদীয় মহা-নারায়ণ উপনিষদে 'দুর্গা-গায়ত্রী' যথা,—

কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমার্যৈ ধীমহি
তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ॥ (৩।১২)

এই গায়ত্রী মন্ত্রে দুর্গার কাত্যায়নী ও কন্যা-কুমারী নামান্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখা তৈত্তিরীয় শাখা হইতেও প্রাচীনতর বলিয়া পণ্ডিতগণ

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মৈত্রায়ণীশাখার সংহিতা Dr. L. Von. Schroeder নামক জার্মান পণ্ডিতের সম্পাদনে প্রকাশিত হয়। এই সংহিতার মধ্যম কাণ্ডে নবম প্রপাঠকে শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গায়ত্রীর মধ্যে কোন কোন মন্ত্রে সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতার যে মূর্তি আছে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে —ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৈদিক সম্প্রদায়ে মূর্তির আরাধনা বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

দেবীসূক্তে দুর্গাতত্ত্ব—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫-সংখ্যক সূক্তটি "দেবীসূক্ত" নামে অভিহিত হয়। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী দেবী ভগবতীর স্বরূপ ও মহিমা এই সূক্তের আটটি ঋকে কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত হইয়াছে, মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দেবীসূক্ত জপ করিয়া জগজ্জননীর দর্শনাভিলাষে তপস্যা করিয়াছিলেন—"স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।" (চণ্ডী ১৩।১০)

মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ দেবীসূক্তের ঋষি, এই কারণে ইহাকে 'বাক্‌সূক্ত'ও বলা হইয়া থাকে। সায়নাচার্য বলেন, মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বাক্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বগত পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া সমস্ত জগৎরূপে ও সকলের আশ্রয়রূপে আমিই সকল হইয়াছি, এই ভাবে স্বীয় আত্মাকেই স্তব করিয়াছেন—'স্বাত্মানম্ অস্তৌৎ'। অথবা অন্য ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি ভগবতী পরিশুদ্ধ আধার ব্রহ্মবিদুষী-বাক্‌কে যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাধ্যমে স্বয়ং আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই দেবীসূক্ত চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে সকল তত্ত্ব প্রপঞ্চিত হইয়াছে তাহা সমস্তই বীজাকারে দেবীসূক্তে নিহিত রহিয়াছে। এই কারণে দেবীসূক্তের এতটা গুরুত্ব। দেবীসূক্তে যিনি মন্ত্ররূপা, দেবীমাহাত্ম্যে তিনিই বিগ্রহরূপা। দেবীসূক্তের সমুজ্জ্বল বিগ্রহই আদ্যাশক্তি ভগবতী

ঋগ্বেদের এই দেবীসূক্তে আমরা ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী আদ্যাশক্তিকে বিশ্বপালিনী ও অসুরদলনীরূপে দেখিতে পাই। তিনি ব্রহ্মদ্বেষী অসুরসংহারে ব্রতী রুদ্রের সহায়স্বরূপিণী,—

'অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।' তিনি জনহিতার্থে অসুরদলনে উদ্যতা—'অহং জনায় সমদং কৃণোমি।' চণ্ডীতে বর্ণিত জগতের কল্যাণার্থ মহিষাসুরবধ এবং শুম্ভনিশুম্ভাদিদৈত্য-বধের জন্য ভগবতীর সমরে আত্মনিয়োগের বীজ শ্রুতির এই মন্ত্রেই পাইতেছি। সূক্তান্তর্গত অনুবাক্ কয়টির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক ঋষি সমস্ত প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক দেবীশক্তি নিহিত আছে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শক্তিই পরে নানা নামে শক্তিপূজায় প্রধান উপাস্য দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

দেবীসূক্তে দেখিতে পাই, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী দেবী স্বয়ং ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়া থাকেন,—

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥
(ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।৫)

দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত ব্রহ্মতত্ত্ব আমি

স্বয়ং উপদেশ করিয়া থাকি। আমি ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাহাকেও ব্রহ্মা করি, কাহাকেও ঋষি করি এবং কাহাকেও বা অতি প্রজ্ঞাশালী করিয়া থাকি।

উমা হৈমবতী—সামবেদীয় কেন-উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে হৈমবতী উমার আখ্যায়িকা রহিয়াছে। ইন্দ্র তাঁহার নিকট ব্রহ্মরহস্য অবগত হইয়া দেবগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্; স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। (কেন, ৪।৩)

ইন্দ্রই প্রথমে উমাবাক্য হইতে ব্রহ্মের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু ইন্দ্র ঐ সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু ইন্দ্রই প্রথমে উহার ব্রহ্মত্ব বুঝিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কেন-উপনিষদ্-বর্ণিত এই উমা হৈমবতী কে? শঙ্করাচার্য বলেন, ইনি স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা। 'হৈমবতী' অর্থ হেমাভরণসম্পন্না অথবা সর্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা হিমালয়-সুতা ভগবতী উমা। ইঁহার মহিমা অনুত্তর ও অপরিমেয়। দেবীসূক্তে বলা হইয়াছে:

পরো দিবঃ পর এনা পৃথিব্যৈ
তাবতী মহিনা সংবভূব।
(ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।৮)

ভূলোক ও দ্যুলোকের পরাৎপর তিনি—তাঁহার মহিমা অতিশয় মহীয়ান্। হৈমবতী উমা ইন্দ্রকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম হইতেছে,—প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তোমরা তাহাতে নিমিত্ত মাত্র। তাঁহার বিজয়েই তোমরা এবংবিধ মহিমা অনুভব করিতেছ। ফলতঃ, আমাদেরই এই বিজয়, আমাদেরই এই মহিমা, এইরূপ তোমাদের যে অভিমান, ইহা মিথ্যা, অজ্ঞানকৃত।

এই উমা-বাক্য হইতেই ইন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ 'যক্ষ'টি ব্রহ্ম কিন্তু স্ববুদ্ধি-বলে বুঝিতে পারেন নাই। 'যক্ষ' শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য করিয়াছেন, 'পূজনীয় মহৎ ভূত'। 'যক্ষ' শব্দের প্রাচীন অর্থ রহস্য। যা শক্তিমত্ততায় লভ্য নয়, কিন্তু প্রসাদ-লভ্য। এই তত্ত্বটিই নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। (কঠ, ১।২।২৩)। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন অর্থাৎ কৃপা করেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট আত্মা স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন।

কেনোপনিষদে আমরা যে বহুশোভমানা উমা হৈমবতীকে দেখিতে পাই আচার্য শঙ্করের মতে ইনি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতায় তিনি 'বাক্'। তিনি সকলের নিকট সুলভদর্শন নহেন। কাহারো নিকট তিনি উশতী সুবাসা জায়ার মত তনুখানি প্রকাশ করেন (ঋগ্বেদ ১০।৭১।৪)। ব্রহ্ম এবং বাক্ ঋক্-সংহিতায় একটি যুগনদ্ধ মিথুন (ঋগ্বেদ ১০।১১৪।৮) কেনোপনিষদের আখ্যায়িকাটি এই তত্ত্বেরই বিবৃতি এবং এইটি পরে পুরাণে পল্লবিত হইয়াছে। 'রুদ্র-হৃদয়' উপনিষদে এই তত্ত্বটি প্রকাশিত হইয়াছে,—

রুদ্রো ব্রহ্মা উমা বাণী, তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদিঃ, তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং, তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রোঽর্থোঽক্ষরঃ সোমা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥

শাক্ত উপনিষদে দুর্গা—দেবী উপনিষৎ, ত্রিপুরা উপনিষৎ, ত্রিপুরাতাপিনী, বহ্বৃচ প্রভৃতি শাক্ত উপনিষদে ভগবতী দুর্গাকে জগতের মূলীভূত চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মরূপিণী বলা হইয়াছে। দেবী উপনিষদে দেখিতে পাই, দেবতারা প্রশ্ন করিতেছেন,—'কাসি ত্বং মহাদেবি!' উত্তরে দেবী বলিতেছেন,—'অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ।' তাঁহা হইতে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু সৃষ্টি নয়, স্থিতি ও লয় তাঁহারই কৃত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই তাঁহাকে অক্ষরা, নিত্যা এবং 'সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি' বলা হইয়াছে। এক কথায় তিনি উপনিষদুক্ত "তজ্জলান্", ব্রহ্ম-সূত্রোক্ত "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। অর্থাৎ দেবী এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি- ও সংহার-কর্ত্রী।

দেবী উপনিষদে "দুর্গা" নামের নিরুক্তি এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্তিতা।
দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাৎ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে॥

যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, ইনি সেই দুর্গা বলিয়া কীর্তিতা হইয়া থাকেন। দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন বলিয়া দেবী 'দুর্গা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্।
মহাদুর্গপ্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিণীম্॥
তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচারবিঘাতিনীম্।
নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণবতারিণীম্॥

হে দেবি! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি মহাভয়ের বিনাশ ও ঘোর দুর্গতির উপশম করিয়া থাকেন, আপনি মহাকারুণ্য-রূপিণী। হে দেবি দুর্গে! আপনি দুর্গতি- ও দুরাচার-নাশিনী। আমি ভবভীত হইয়া সংসারসাগরতারিণী আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

দেবী উপনিষদে দেবীর এইরূপ ধ্যানমন্ত্র দৃষ্ট হয়,—

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্যসমপ্রভাম্।
পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাং।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে

হৃদয়মধ্যস্থিতা প্রাতঃসূর্যসম প্রভাবিশিষ্টা দেবী চতুর্ভুজে পাশ ও অঙ্কুশ, বর ও অভয় মুদ্রা ধারিণী। সৌম্যা ত্রিনয়না রক্তবস্ত্রপরিহিতা ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারিণী দেবীকে ভজনা করি।

দেবী উপনিষদের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

'য এবং বেদ স শোকং তরতি। য এবং বেদ স দেবীপদম্ আপ্নোতি।' যে সাধক এই প্রকারে দেবীতত্ত্ব জানেন তিনি সকল শোক উত্তীর্ণ হন, তিনি দেবীপদ প্রাপ্ত হন।

ওঁ নমস্তে অস্তু ভগবতি ভবতি মাতরস্মান্ পাতু সর্বতঃ।
তামহং প্রণৌমি নিত্যম্।
তাপাপহারিণীং দেবীং ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনীম্।
অনন্তাং বিজয়াং শুদ্ধাং শরণ্যাং শিবদাং শিবাম্॥

হে ভগবতি! আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে মাতঃ, আপনি আমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। সেই ত্রিতাপহারিণী, ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী, অনন্তা, বিজয়া, শুদ্ধা, শরণযোগ্যা, মঙ্গলদায়িনী মহাদেবী শিবাকে নিত্য প্রণাম করি।

মায়ের স্মৃতি

স্বামী প্রেমেশানন্দ

১৯০৫।৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তাঁদের পত্রিকায় ঠাকুরের কথা লিখতেন। এই সময় দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এই সময়কার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রথম ঠাকুরের খবর পাই। বাড়িতে গোবিন্দজী ছিলেন। তাঁর পূজা সেবা নিয়ে একেবারে মেতে গিয়েছিলাম। তারপর 'কথামৃত' পড়ে ঠাকুরের কথা আরও জানতে পারলাম। স্বয়ং ভগবান এসেছেন—এই খবর পেয়ে আমি তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লাম। ক্রমে চিঠিপত্রে মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। মাষ্টারমশাই আমার আদি গুরু। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আসি। এই সময় একদিন বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে সর্বপ্রথম মাকে দর্শন করি। প্রথম দর্শনের দিন মায়ের পা দু'খানি কেবল দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকা ছিল আর মাথায়ও লম্বা ঘোমটা দেওয়া ছিল। মাষ্টারমশাই চিঠি দিয়ে আমাকে মঠে মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছে পাঠান। মঠে এই সময় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের দর্শন পাই ও তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আর একবার কলকাতায় এসেছিলাম। এই সময় মঠে মহারাজদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কিন্তু মা কলকাতায় ছিলেন না বলে তাঁর দর্শন পাইনি।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মায়ের কাছে দীক্ষার জন্যে জয়রামবাটী যাত্রা করি। মেদিনীপুরের পথ দিয়ে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশনে সম্ভবতঃ একটি ইণ্টার ক্লাশের গাড়িতে উঠেছিলাম। ট্রেনের সেই কম্পার্টমেণ্টের (compartment) একজন যাত্রী ভদ্রলোক অযাচিতভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। সে সময় আবার পুলিশের খুব উপদ্রব ছিল। আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে এড়িয়ে কথার উত্তর দিচ্ছিলাম। ভদ্রলোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন, আপনার কি পরিচয়? ইত্যাদি।' আমি তো মহা বিরক্ত হ'লাম। বললাম—জয়রাম-বাটী যাব। তাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়রামবাটী কেন যাবেন?' উত্তর দিলাম—সেখানে আমার গুরু থাকেন। আবার প্রশ্ন হল, 'কে আপনার গুরু?' এইসব কথাবার্তা হয়েছিল, সব মনে নেই। ভদ্রলোকটি মহা খুশী হয়ে বললেন, 'আমিও তো ঐখানেই যাব।' তিনি ছিলেন জয়রামবাটীর পাশের গাঁয়ের (জিব্‌টে) জমিদার বাড়ির লোক। তিনি আদর করে আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। দুপুরে রোদে জয়রামবাটী যেতে না দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে আমার জন্যে আলাদা বামুন দিয়ে রান্না করিয়ে পরম সমাদরে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে মায়ের জন্যে কিছু ফল ছিল, লোক দিয়ে সেগুলি জয়রামবাটী

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সারগাছি আশ্রমে স্বামী প্রেমেশানন্দ এই স্মৃতিকথা বলিয়াছিলেন, স্বামী রমানন্দ (তখন জ্যোতির্ময়) কথাগুলি লিপি-বদ্ধ করেন। স্বামী প্রেমেশানন্দকে লেখাটি পড়িয়া শুনানও হইয়াছিল।—সঃ

পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বিকেলে রোদ পড়লে জয়রামবাটী পৌঁছলাম। ভদ্রলোক যখন আমাকে গুরুর মতো সমাদরে আসনে বসিয়ে যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছিলেন তখন আমি মনে করছিলাম—ওগুলো আমার প্রাপ্য। আমি যে একটা বিখ্যাত বংশের—সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে—সেটা বুঝতে পেরে এমন আদর যত্ন করছেন। তারপর বহুদিন পরে মায়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন ভক্তদের অভিজ্ঞতার কথা পড়ে শুনে বুঝলাম, তা নয়। মা কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই পথে ঐ ব্যবস্থা করেছিলেন।

মাকে বললাম, 'মা, দীক্ষার জন্যে এসেছি মা'। মা বললেন—'বাবা, তোমাদের তো গুরু গোঁসাই আছে, আর আমার শরীরও এখন খারাপ।' তখন দু'হাত জোড় করে আবেগের সঙ্গে বললাম, 'মা, তাতে তো শান্তি হচ্ছে না মা, তুমি যদি স্থান না দাও তবে কোথায় যাব মা?' মা বললেন,—'আচ্ছা বাবা, কাল হবে।' এখন ভাবি—তখন আমার এত ব্যাকুলতাও ছিল যে. অমন করে মায়ের কাছে বলতে পেরেছিলাম। পরের দিন মা দীক্ষা দিলেন। কুল-গুরু যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রই একটু অদল-বদল ক'রে দিলেন (দীক্ষার সময় মা কুল-গুরুর কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্র জিজ্ঞাসা করেননি, নিজেই ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন)।

দু'এক বার মাত্র মাকে দেখতে জয়রামবাটী গিয়েছি। মাকে দেখে 'মা' বলেই মনে হ'ত, আলাদা কোন বিশেষত্ব, কি কোন অলৌকিক কিছু তাঁর মধ্যে যে আছে বা থাকতে পারে, তা মনে হয়নি। আমরা মায়ের কাছে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির মার মতোই তিনি হয়তো তরকারী কুটছেন বা সংসারের কোন কাজ করছেন। দীক্ষার সময় মা যখন কর-গণনা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তখন মায়ের হাতের দিকে লক্ষ্য করে দেখি—এ যে বাড়ির মার হাতের মতোই কুটনো-কোটা হাত। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, 'মা, তোমার শরীর কেমন আছে' ইত্যাদি মামুলি কথা। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কিন্তু মাকে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না—তিনি কাঁপতে-কাঁপতে গিয়ে কোন রকমে প্রণাম করেই আবার কাঁপতে-কাঁপতে চলে আসতেন। মহারাজ বোধ হয় দেখতে পেতেন যে, মা all-inclusive, মায়ের উদরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাই বোধহয় তাঁর অমন হ'তো, আমরা তো এসব কিছুই বুঝতে পারতাম না।

মায়ের গায়ের রং ছিল অতসী ফুলের মতো, পরে অসুখে ভুগে রং কালো হয়ে গিয়েছিল।

আমি তো বাউল গোছের মানুষ ছিলাম। জয়রামবাটী গিয়ে আনন্দে পাগলের মতো নেচে নেচে বেড়াতাম। এই দেখে একদিন ভানু-পিসী মাকে আমার সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মা, তোমার একটি কেমন পাগল ছেলে দেখ। কেমন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে!'

আর একবার জয়রামবাটী গিয়েছি, সঙ্গে অব্যক্তানন্দ প্রভৃতি আছেন। এই সময় খোকা মহারাজও সেখানে ছিলেন। একদিন ইচ্ছা হ'ল—খোকা মহারাজের একটু সেবা করি। মহারাজের হাত-পা টেপবার চেষ্টা ক'রে দেখলাম আমার মতো দুর্বলশরীর লোকের পক্ষে তা সাধ্যাতীত। খোকা মহারাজের শরীর বেশ বলিষ্ঠ ও শক্ত ছিল। আমি তখন অব্যক্তানন্দকে বললাম, 'তুমি মহারাজের হাত-পা একটু টিপে দাও, আমি তাঁর জন্যে

তামাক-টামাক সাজি।' এই সময় মা শরৎ মহারাজের নির্মিত বাড়িতে থাকতেন। বাড়িতে কয়েকটি ফুলের গাছ ছিল। একদিন মা আমাদের বললেন সেই গাছগুলির গোড়ায় মাটি দিয়ে দিতে। আমরা তো খুব আনন্দিত হলাম। আমি কোদাল নিয়ে মাটি কুপিয়েছিলাম। সামান্য কয়েকটি মাত্র গাছ। পরে খবর পেয়েছিলাম, মা বলেছিলেন—'এই গাছগুলিকে দেখলে আমার ছেলেদের কথা মনে পড়ে।'

একবার মা রাধুর শরীর খারাপের কথা আমাদের বলছিলেন। সেই সময় কথায় কথায় আমি মাকে বলেছিলাম যে, সিলেটে আমাদের পরিচিত একজন গণৎকার আছে। সে গণনা ক'রে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারে। মা সেই কথা শুনে বার বার বলতে লাগলেন—'তবে বাবা সেই গণৎকারকে দিয়ে রাধুর কি হবে, একবার গণিয়ে দেখ।' আমি এ-সব বিশ্বাস করতাম না, কেবল কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম। মা কয়েকবার এই কথা বলাতে চিঠি লিখে সেই গণৎকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। গণৎকার ভবিষ্যৎ গণনা ক'রে বলে যে, রাধু শীঘ্রই মারা যাবে। তখন তো আমি খুব বিপদে পড়লাম। কি ক'রে এই খবর মাকে দিই। শেষে চিঠি লিখে এই কথা অন্যভাবে ঘুরিয়ে মাকে জানাই।

মা যখন মঠের লেগেট হাউসে ছিলেন, তখন একবার দুর্গাপূজার সময় তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। অনেক লোক মাকে প্রণাম করতে এসেছিল। লোকজনের সামনে মা ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। এ-দিনও তেমনি ঘোমটা দিয়েছিলেন। আমি প্রণাম ক'রে ঘোমটার তলা দিয়ে মায়ের মুখ এক ঝলক দেখে নিয়েছিলাম। সেই সময় তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল খুব প্রখর—যেন টর্চের মতো, মায়ের ভাবটাব তো একেবারে চাপা থাকতো; বোধহয় সেই সময় কোন ভাব হয়েছিল। উদ্বোধনে আরও কয়েকবার মায়ের দর্শন পাই, একদিন উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করতে গিয়েছি। প্রণাম ক'রে বললাম, 'মা, সিলেটে ঠাকুরের কত ভক্ত আছে, সকলে তো আসতে পারে না, তুমি আশীর্বাদ কর মা।' মা বললেন, 'বাবা, ঠাকুর আছেন।' আমি তিনবার এই একই কথা বলাতে মাও তিন বারই বললেন, 'বাবা, ঠাকুর আছেন।'

মায়ের স্মৃতি সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। Theoretically (তত্ত্বের দিক থেকে) বুঝতে পারতাম যে, মা অবতারদের সঙ্গিনী ইত্যাদি, আর কিছুই বুঝিনি। কিন্তু পরে সত্যিই বুঝলাম যে, মা সত্যিসত্যিই মা—জগজ্জননী—আদ্যাশক্তি। কুলগুরুর কাছে তো শৈশব কালেই যথারীতি দীক্ষা হয়েছিল—সেই দীক্ষা নিয়ে যে মন্ত্রের সাধন করেছিলাম—তারই সিদ্ধি হয়েছিল যেদিন প্রথম মায়ের দেখা পেলাম। একথা তখন বুঝতে পারিনি। মা বুঝতে পেরেছিলেন তাই আর দীক্ষা দিতে চাননি। এখন মনে হয়, মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে শুধু খেটে মরলাম। তখন কেবল মায়ের কাছে এই প্রার্থনাই করলে যথেষ্ট হ'ত যে, 'মা, তোমার আর ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তি-বিশ্বাস যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, আর কিছুই চাই না মা।'

একাকী গহন বনে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সুরথ রাজা 'মৃগয়ায় যাইতেছি' এই ছল দেখাইয়া একদিন বনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নিজের অশ্বটি তখনও অপহৃত হয় নাই, অতএব উহাতে চড়িয়াই পলায়ন। অন্য উপায় আর কি ছিল? কর্তব্যের কখনও ত্রুটি করেন নাই, অপত্য-দৃষ্টিতে প্রজাপালন করিয়াছেন, অন্যের ভূমি কখনও লড়াই করিয়া আত্মসাৎ করিতে চাহেন নাই—ধর্মনিষ্ঠ, মহাশূর নরপতি বলিয়া তাঁহার দিকে দিকে খ্যাতি—তবুও কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল। যবনের দল আসিয়া হামলা বাধাইল। সুরথ কাপুরুষ ছিলেন না। যে যুদ্ধ মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে রাজধর্ম অনুযায়ী উহার সম্মুখীন হইলেন। ভাবিয়াছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ শত্রু-গণকে অতি সহজেই পরাভূত করিবেন। কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ। কোলারাই জয়ী হইল। রাজা সুরথের বিশাল রাজ্যের অধিকাংশই তাহাদের অধিকারে গেল। লাঞ্ছিত রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া ভাবিলেন, যাক্ এতদিন তো বিপুল রাজগৌরব ভোগ করিয়াছি—এবার রাজনগরীর আশে পাশে সামান্য পরিধি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। রাজকোষ তো আছে, অমাত্য-পরিজনরা তো আছে, বিশ্বস্ত প্রজারাও তো কিছু কিছু রহিয়াছে, ভাবনা কি? কিন্তু শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন তাঁহার পক্ষে বিধিলিপি অন্যরূপ। যাহাদের বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহারা বিশ্বাস রাখিল না। বন্ধুরাই শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, ধনাগার তাঁহার নিজেরই অমাত্যবর্গ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল, রাজসৈন্যেরা রাজপতাকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পথ দেখিল। সুরথ রাজার অন্য উপায় আর কি ছিল? অতএব

"ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥"

(চণ্ডী ১।১।৭)

"অতঃপর হৃতসর্বস্ব সেই রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়াচ্ছলে একাকী অত্যন্ত দুঃখিত মনে গহন বনে চলিয়া গেলেন।"

মৃগয়া ছল মাত্র। মৃগয়া করিতে তিনি যান নাই; লাঞ্ছনা অপমান নির্যাতন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা যাহা হঠাৎ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই পলায়ন করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন বনে গেলে নিষ্কৃতি পাইবেন। বনে গিয়া প্রথমে তাহাই মনে হইয়াছিল। মেধস মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এমন শান্তি তো নগরে নাই, রাজপ্রাসাদে নাই। হিংস্র শ্বাপদকুলও হিংসা ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে বিচরণ করিতেছে। ঋষির শিষ্য ব্রহ্মচারিবর্গের চোখে মুখে কী নম্রতা, কী সংযম, কী পবিত্রতা বিকাশ পাইতেছে! আচার্য মেধসের সপ্রেম আতিথেয়তা রাজার অশান্ত মনে একটি অপার্থিব তৃপ্তি আনিয়া দিল। সুরথ ভাবিলেন ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই মিলিয়াছে।

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে॥

মুনির সরল অকৃত্রিম আতিথেয়তা উপভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দমনে বনপথে ঘুরিয়া সেই

তপোবনে কিছুকাল বেশ কাটিয়া গেল।

কিন্তু তাহার পরই নূতন বিপর্যয়। বাহিরের শত্রু হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন—কিন্তু ভিতরের শত্রু যে সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে তাহা তো আগে বুঝিতে পারেন নাই। বহুকাল-পোষিত বিষয়সংস্কার, ভোগবাসনা, আসক্তি যে মনের মধ্যেই লুকাইয়া আছে, সুযোগ পাইলেই আক্রমণ করিবে, তাহা তো তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তাই একদিন হঠাৎ মনে যখন তুফান উঠিল তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। রাজবাড়ীর সেই সুখসম্পদের বিবিধ ভোগব্যসনের, নানা গৌরবের স্মৃতি চিত্তকে অনবরত আলোড়িত করিতে লাগিল। যাহা আর ফিরিবে না তাহাই কাছে পাইতে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

এ কি? এ কি? রাজা নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মনের অপর প্রান্ত হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল—এ কি? এ কি? ঘটনাক্রমে একজন দোসর মিলিয়া গেল—তাঁহারই মতো একদা-সম্পন্ন কিন্তু ভাগ্য-বিপর্যয়ে স্বজন-পরিত্যক্ত, নিষ্ঠুর সংসারে শতধা বিড়ম্বিত সমাধি নামে বৈশ্য। ক্ষত্রিয় সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির মিলন, কথোপকথন, সত্য-জিজ্ঞাসা, একসঙ্গে শ্রেয়োলাভের সাধনা এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাভ—চণ্ডী মহাগ্রন্থের অতি নিপুণ এবং সার্থক বর্ণনা। এই বর্ণনার একটি সার্বজনীন আবেদন রহিয়াছে। সুরথ ও সমাধির কাহিনী যেন আমাদেরই জীবন-কথা।

দুঃখের দরজা দিয়াই অনেক সময়ে সত্য ও শান্তি আমাদের জীবনে প্রবেশ করে। একাকী গহন বনে নির্বাসিত হওয়া সত্যই দুঃখের কথা। উহা কল্পনা করিলে আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু সুরথ ও সমাধির ঐ দুঃখ তাঁহাদিগকে পরিশেষে শ্রেয়ের পথে লইয়া যায় নাই কি? রাজসিংহাসনে বসিয়া যে সুখ ও সম্মান ভোগ করিতেছিলেন রাজা সুরথ উহাই করিতে থাকিলে সংসারাতীতকে জানিবার সুযোগ তাঁহার আসিত কি? আড়তে বসিয়া টাকার থলি গুণিবার আনন্দেই যদি বরাবর মজিয়া থাকিতেন তাহা হইলে বৈশ্যবর সমাধির হৃদয়ে কবে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিত তাহা কে বলিতে পারে?

সাংখ্যকার বলিয়াছেন—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক—এই তিনপ্রকার দুঃখের আঘাতের ফলে মানুষের মনে তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। যে কখনও কাঁদে নাই, সংসারের লাঞ্ছনা দেখে নাই, সংসার-স্বপ্ন তাহার দূর হওয়া সুকঠিন। হৃদয়-ভরা দুঃখ লইয়াই তো সিদ্ধার্থ সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট কি কাঁদেন নাই? শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুখের কোলে বসিয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন? যে-সকল সাধক-সাধিকা আধ্যাত্মিক জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলকেই একাকী গহন বনে যাইতে হইয়াছিল—প্রাণে প্রাণে এই উপলব্ধির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল যে এই সংসারে তাঁহারা একান্তই একা, কাহারও মুখের দিকে তাকাইবার উপায় নাই, কেহ সঙ্গ দিবার নাই। গৃহ বল, চিত্ত বল, আত্মীয়-পরিজন বল, কিছুরই ভরসা নাই।

সংসারের অনিত্যত্ব এবং নিজের অসহায় অবস্থার ভাবনা হইতেই মন অন্তর্মুখ হয়, বাহিরের অবলম্বন হইতে অন্তরের অবলম্বন

খুঁজিতে আরম্ভ করে।

কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"প্রভু, দুঃখ দিও, তাহা হইলে তোমাকে সর্বদা মনে রাখিতে পারিব।" তুলসীদাসের একটি দোঁহা—

তুলসী উহঁা যাইয়ে জহঁা আদর না
করে কোই।
মান ঘাটে মন মরে রামকো স্মরণ হোই॥

"তুলসী, যেখানে কেহ তোমাকে সমাদর করিবে না, ওখানেই যাইও। মানের হানিতে মনের অহঙ্কার কমিবে এবং তখন রামের স্মরণ হইবে।"

অতএব দুঃখকে, অপমান-লাঞ্ছনাকে, সংসারের বিপদ-আপদকে আমরা যেন ভয় না পাই। উহারা আমাদের 'রামের স্মরণ'-কে সহায়তা করিবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, সংসার মানে সংই সার। যিনি জীবনের পরম শ্রেয়ের অভিলাষী, তাঁহাকে এইটি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে হইবে। জরা ব্যাধি মৃত্যু, আশাভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সংসারের মায়িক স্বরূপ বুঝিতে পারি। তখন নিজেকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহারই নাম কি সংসার? সংসারকে চিনিয়া সংসার করিলে সংসার আমাদের বাঁধিতে পারে না। সংসার যে আমাদের পরমলক্ষ্য নয়, আমাদের পরমলক্ষ্য শ্রীভগবান—এইটি জানিয়া সংসার করিতে হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেন। ইহারই নাম অনাসক্তি। ত্যাগ বা নির্লিপ্ততা অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার উপদেশ আমরা আমাদের সকল শাস্ত্রে দেখিতে পাই।

শ্রীভগবানের দিকে আমরা যত আগাইয়া যাইব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আমাদের ততই "সংসারে আলুনি-বোধ" আসিতে বাধ্য। সংসারের উপর মানুষের যে একটি উদগ্র মমতা থাকে ঐ মমতা আমাদের কমিয়া আসিবে। সংসারকে পান্থশালা বলিয়া মনে হইবে। সংসারের দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলি থাকিবে, কিন্তু উহাদের সহিত আমরা নিজদিগকে ভীষণভাবে আর জড়াইয়া ফেলিব না। দেহসুখ, আত্মীয়-স্বজনের সংস্পর্শ, ঐশ্বর্য, সম্পদ, মান-যশ—এগুলি আর তত বড় বলিয়া মনে হইবে না। এ সকলের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া বসিবেন শ্রীভগবান, যিনি হইলেন সত্যস্য সত্যম্—"সকল সত্যের চরম সত্য", যিনি হইলেন—রসো বৈ সঃ—"সকল আনন্দের মূল", তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—"তাঁহারই চৈতন্যালোকে সব কিছু প্রকাশ পাইতেছে।" আমাদের ক্ষুদ্র 'কাঁচা আমি' তখন শ্রীভগবানের দাস আমি বা 'পাকা আমি'তে রূপান্তরিত হইবে গীতার বাণী—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি
মানবঃ॥ (১৮।৪৬)

তখন আমাদের মর্মে মর্মে ধ্বনিয়া উঠিবে—"যাঁহা হইতে ভূতগণের সকল প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইতেছে, যিনি চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, নিজ নিজ কর্ম দ্বারা মানুষ তাঁহার উপাসনা করিয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।" শ্রীভগবানই প্রকৃত কর্তা, তিনিই সকল কর্মের উৎস—এই সত্য জানিয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম উপাসনা হইয়া দাঁড়ায়। সেই কর্মে তখন আর কোনও বন্ধন থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাব আমাদিগকে সাধিতে বলিয়াছেন—"আমি ঘর, তুমি ঘরনী; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।"

* * *

চলো বনে যাই—গহন বনে—একাকী

যাই—কাহারো মুখের দিকে না তাকাইয়া, কাহারও টান বুকে না গাঁথিয়া নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে পরমানন্দে যাই। সে বন বাহিরের বন নয়, অজস্র পরিবর্তনময় অজস্র দ্বন্দ্বময় মায়িক সংসারের শত সহস্র বিক্ষেপ হইতে সুদূর ভগবানকে লাভ করিবার আন্তরিক ব্যাকুলতা হইতে সঞ্জাত জ্ঞান-বৈরাগ্য-দীপ্ত হৃদয়ের একান্ত নিঃসঙ্গতারূপ বন। বাহিরের বনে গিয়া সংসারের ঘাত প্রতিঘাত দুঃখ হইতে সাময়িক মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্তরের অসঙ্গতারূপ বনে না গেলে সকল দুঃখের মূল বিষয়-বাসনা হইতে নিষ্কৃতি মিলিবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সংসারকে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সংসারের যাবতীয় বস্তু ও জ্ঞান যেন ঐ বৃক্ষের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব ফুল-ফল। বৃক্ষটি ঊর্ধ্বমূল, অর্থাৎ সংসারের সব কিছু বস্তুতঃ শ্রীভগবানে প্রতিষ্ঠিত। অসঙ্গরূপ শস্ত্র দ্বারা সংসাররূপ ঐ অশ্বত্থকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তবেই বৃক্ষের মূল পরমাত্মাকে স্পর্শ করা সম্ভবপর। (গীতা, ১৫.৩৪)

চলো একাকী সেই গহন বনে যাই—সংসারের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াই অন্তরের সেই নিভৃতে যাই—অন্ততঃ প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্য যাই। ইন্দ্রিয়লালসা, মনের উন্মত্ত নৃত্য, অভীপ্সা আবেগ সঙ্কল্প সব সেখানে শান্ত, প্রাণও যেন স্তব্ধ, দেহের জ্ঞানও স্তিমিত। সংসারের কোলাহল বাহিরে থাকুক। অন্তরের সেই নিঃসঙ্গতায় ঐ কোলাহল পৌঁছায় না। সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে
(মন) তুই দেখ্ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।

হৃদয়ের সেই নিসঙ্গতায় 'আর কেহ নাই। শুধু চৈতন্যময়ী মা—মানুষের অন্তরতম সত্য। আমরা গৃহী হই বা সন্ন্যাসী হই আমাদের যদি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে তো আমাদের প্রত্যেককেই এই অন্তরের একান্ততায় প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্য অবশ্যই যাইতে হইবে। খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রাচীন আলেক্জান্দ্রিয়ার মরমী সাধক প্লটাইনাস (Plotinus) এই বন-গমনকে বলিয়াছিলেন—একাকী একাকীর প্রতি উড়িয়া যাওয়া (Flight of the alone to the Alone)

চলো একাকী সেই গহন বনে যাই।

নারদীয় ভক্তি

ক্রীস্টোফার ইশারউড্

নারদ বলছেন, "ভক্তিপথই ভগবানলাভের সহজতম পথ।"

ভক্তিপথ বা ভক্তিযোগ হল ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানলাভের পথ। ভগবানকে ভালবাসার জন্য এবং তাঁর ভালবাসা উপলব্ধি করার জন্য ভক্ত সজাগ হয়ে নিরন্তর চেষ্টা করে; ভগবানের নামজপ এবং আনুষ্ঠানিক পূজাদি তার সাধনা। ঈশ্বরের কোন বিশেষ রূপকে বা অবতারগণের মধ্যে কোন একজনকে বিশেষ উপাস্যরূপে (ইষ্টরূপে) বরণ ক'রে সে তাঁতে মনোনিবেশ করে। নারদ জোর দিয়ে বলছেন, ভক্তি যত বৃদ্ধি পাবে ভক্ত তত বেশী করে অনুভব করবে যে, তার উপাস্য তার অন্তরেই রয়েছেন, তিনিই তার স্বরূপ; ভক্তির চরম অবস্থায় উপলব্ধ হবে, উপাসক ও উপাস্য অভেদ।

হিন্দুদর্শনমতে ভগবানের সঙ্গে নিজের এই একত্বানুভূতির পথ চারটি—ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। কর্মযোগ হল নিঃস্বার্থ কর্মের—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থেকে কৃত কর্মের পথ; মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করা এ পথের সাধনরূপে প্রায়শঃ গৃহীত হয়। জ্ঞানযোগ হল সদসদ্-বিচারের মাধ্যমে ভগবানলাভের পথ; চূড়ান্ত বিশ্লেষণের ফলে যখন জাগতিক সব কিছু অসৎ, অনিত্য বলে পরিত্যক্ত হয়, তখন (সহস্ত বলতে) থাকেন একমাত্র ভগবান; এবং এই 'নেতি-নেতি' করে বিচারের দ্বারাই তিনি উপলব্ধ হন। রাজযোগ হল গভীর ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানলাভের পথ।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ তিনটি পথে চলতে গেলে যে-সব গুণ ও যে শক্তির প্রয়োজন, সর্বসাধারণের, এমনকি অধিকাংশ লোকেরও তা নেই। কর্মের পথে দুর্দান্ত শক্তি এবং সেই সঙ্গে অত্যধিক নম্রতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন; জ্ঞানপথে চলতে গেলে চাই অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; রাজযোগে চাই অচঞ্চল একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম। দেখা যায়, এ সবের তুলনায় ভক্তিযোগের সাধনা অনেক সহজ, কম কঠোর এবং অধিকতর আকর্ষণীয়। তাছাড়া, অসাধারণ শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও একাগ্রচিত্ততার অধিকারী বলে গর্ব করতে না পারলেও আমাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরা ভালবাসতে পারি। কাজেই যোগ-গুলির মধ্যে ভক্তিযোগই সহজতম—একথা আমরা শোনামাত্রই মেনে নিই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মেনে নেওয়াটা একটু বেশী তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। কারণ, আমরা বেশীরভাগ লোকই কি ঠিকমতো বুঝি, কি বরণ করছি? ভগবৎ-প্রেম বলতে নারদ কি বোঝাতে চাচ্ছেন সে সম্বন্ধে আমাদের আদৌ কোন ধারণা আছে কি? আমরা যখন ভালবাসা বা প্রেম শব্দটি ব্যবহার বা অপব্যবহার করি তখন নিজেরাই কি বোঝাতে চাই, তা কখনো তলিয়ে ভেবেছি কি? বস্তুতঃ, আমরা কখনো কি কাউকে ঠিক ঠিক ভালবেসেছি?

"To be in love with love" (ভালবাসার প্রেমে পড়া)—এই বাক্যটি (ইংরেজী ভাষায়) এক সময় দৈনন্দিন কথাবার্তায় খুবই প্রচলিত

ছিল, সঙ্গীত-রচয়িতাদের খুবই প্রিয় ছিল। প্রাপ্তবয়স্কেরা তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হৃদয়াবেগ সম্বন্ধে আলোচনাকালে একটু মুরুব্বির হাসি ফুটিয়ে বলতেন, "ও ভালবাসার প্রেমে পড়েছে—ও কিছু নয়।" অর্থাৎ আলোচ্য অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েটি সত্যিই প্রেমে পড়েনি, আবেগময় আত্ম-প্রবঞ্চনাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছে মাত্র। কোন অভিজ্ঞ যোদ্ধা যখন কোন শিক্ষানবীস সৈনিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন তার কথার সুরে যেমন একটা ভয়ানক তৃপ্তির ইঙ্গিত থাকে, ঠিক সেই ইঙ্গিতই প্রাপ্তবয়স্কদের কথার সুরে থাকতো: যথার্থ ভালবাসা কি বস্তু, তা ওরা পরে বুঝবে—সে ভালবাসা হল পরিণত, গাম্ভীর্যময় এবং বাস্তবস্পর্শী।

পূর্বোক্ত বাক্যটি এখন আর প্রচলিত নয়, কিন্তু মনোভাবটি রয়ে গেছে; ভালবাসা প্রকৃত কি না, তা এখনো নির্ধারিত হয় সে-ভালবাসা কী পরিণাম ও দায়িত্ব আনল তা দেখে—সামাজিক স্বীকৃতি না অপমান, সম্পদ না ঋণ, সন্তানপালন না নিঃসন্তানতা, গার্হস্থ্য জীবনের দাসত্ব না তা থেকে মুক্ত থাকা? লোকে ভালবাসার কথা আলোচনা করছে বলে যখন মনে হয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আসলে তখন আলোচিত হয় ভালবাসার ফলাফলের কথা; সত্যি বলতে কি, কখনো কখনো এই ফলাফলগুলির জন্য ভালবাসাকে চিনে ওঠাই দায় হয়। সাধারণতঃ যা আলোচিত হয়, তা অবশ্য যৌন-সম্পর্ক। কিন্তু একথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, মা-বাপ ও সন্তানদের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে, সহকর্মীদের মধ্যে, এমনকি পালিত পশু ও তার প্রভুর মধ্যেও যে (ভালবাসার) সম্পর্ক, তা-ও সঙ্কটকালে সমভাবে তিক্ত হয়ে উঠতে পারে, অনুরূপ সামাজিক ও আর্থিক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, ঈর্ষা-জনিত এবং বিরুদ্ধ অহমিকার নির্দয় সংঘর্ষজনিত অনুরূপ যন্ত্রণার ঝড় তুলতে পারে?

এমন লোক নিশ্চয়ই অনেক আছেন যাঁরা তাঁদের অহমিকার বাঁধনকে যে-ভাবেই হোক প্রয়োজনমতো একটু আলগা করে দিতে পারেন, যাতে মোটামুটি নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরকে আজীবন ভালবাসতে পারা যায়। এমনকি, সর্বাধিক অসুখী সম্পর্কের মধ্যেও কিছুটা ভালবাসা বা যা-হোক একটু ভালবাসার স্মৃতি সবসময়ই থাকে। আর, নারদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, অহমিকার দ্বারা যত বিকৃত বা সীমিতই হোক না কেন, সব ভালবাসাই মূলতঃ ঈশ্বরীয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই ধরণের অসম্পূর্ণ মানবিক ভালবাসার ধারণা কি ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ধারণা করতে আমাদের কোন সহায়তা করতে পারবে?

নারদবর্ণিত যে ভালবাসা, তাতে কোন ঈর্ষা, কোন অহমিকার দ্বন্দ্ব, কোন পার্থিব সুবিধালাভ বা একচেটে অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না; এ ভালবাসায় নিরানন্দের কোন স্থান নেই। এমনকি, ভগবানের সহিত সাময়িক বিচ্ছেদজনিত যন্ত্রণাকেও নিরানন্দ বলা যায় না; যে ভক্ত সে-বিচ্ছেদ অনুভব করে, একে বিচ্ছেদ বলে বোঝে বলেই সে উপলব্ধি করে যে ভগবান আছেন এবং তাঁর সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রাণবন্ত ও বাস্তব।

কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষানবীস অবস্থায় আমরা এই দুঃখহীন প্রেমতত্ত্ব ধারণাই করতে পারি না, বলা চলে। আমরা মনে মনে ভাবি, একে ভালবাসাই বলা চলে না—এ ভালবাসা

তো নিরুত্তাপ, অস্বাভাবিক ও অমানবিক। কারণ, অকপট হলে আমাদের স্বীকার করতেই হয়, জাগতিক ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের এত সর্তাবদ্ধ করে ফেলেছে যে, ভালবাসতে হলে সত্যিসত্যিই আমাদের ঈর্ষাপরায়ণ হতে হবে, লালসা ও উদ্বেগের যন্ত্রণায় ভুগতে হবে, অসম্ভব একচেটে অধিকারের জন্য দাবী জানাতে হবে; কারণ এইসব পরিচিত যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তিকেই আমরা ভালবাসার সুখ বলি এসব যন্ত্রণা না থাকলে তা উপভোগই করতে পারি না।

কাজেই 'ভালবাসার সঙ্গে প্রেমে পড়া'—এই আপাত-অর্থহীন পুরনো বাক্যটির এখনো কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে; ভক্তি বলতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক আভাস দিতে বাক্যটি বোধ হয় সহায়ক হতে পারে। দুটি ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক সম্পর্করূপে ভালবাসার কথা চিন্তা করা বন্ধ রেখে, আসুন, আমাদের প্রত্যেকের ভেতর ভালবাসার শক্তি কতখানি আছে, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক। সে শক্তি হয়তো খুব কম হতে পারে, কিন্তু তা আমাদের নিজস্ব এবং তা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। আমরা সবাই একমত হতে পারি যে, আমাদের ভালবাসা এভাবে যখন বাইরের কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে বিবেচিত হয়, তখন সে-ভালবাসাই ভালবাসার যোগ্য এবং সম্পূর্ণরূপে কামনা- ও যন্ত্রণা-মুক্ত হয়ে ওঠে। প্রেমই ভগবান—এই ভাবটিকে এভাবে আমরা ধারণায় আনা শুরু করতে পারি।*

* স্বামী প্রভবানন্দ লিখিত 'Narada's Way of Divine Love' গ্রন্থের ভূমিকার অনুবাদ। সঃ

আমাকে নির্দ্বন্দ্ব করো

শ্রীশান্তশীল দাশ

ভালমন্দ, সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা—
কেন যে পারি না নিতে সমভাবে, মন
অভিভূত হয় কেন দুঃখ বেদনায়,
ঝরায় অশ্রুর ধারা দুঃখের নিশীথে;
আনন্দের আতিশয্যে আবার কখনো
ভুলে যায় দুঃখময় দিনের বেদনা।
এই দুঃখ, এই সুখ, আলো ও আঁধার
দু'য়ের মিলনে পূর্ণ এ জীবনখানি
সহজে নেবার মত কোন্ সে সাধনা,
জানি না তো; তাই এই হাসি ও কান্নার
দোলায় বিচল চিত্ত প্রতি দিন রাত—
শেষ নেই এ দু'য়ের হাত থেকে কোনো।
এ দ্বন্দ্বের শেষ তুমি করে দাও প্রভু,
আমাকে নির্দ্বন্দ্ব করো সর্ব দুঃখে সুখে।

প্রসন্নতা ও সরলতা

শ্রীকালিদাস রায়

মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচয়ে,
মূঢ় সেই জন রূঢ় তপ যেবা করে তার বিনিময়ে।
সরল হৃদয় আগাধ জ্ঞানেরই পরম চরম দান,
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা সন্ধান।

তপস্বীর উপদেশ

বনফুল

"ভিক্ষাপাত্র প্রসারিয়া দাঁড়াইয়া আছি দিবা-নিশি।
দাও রূপ, দাও বুদ্ধি, দাও অর্থ, দাও খ্যাতি মান,
দাও দাও—লোলুপ এ হৃদয়ের প্রার্থনায় মিশি'
আছে শুধু এক ভাষা—আরও দাও, ওগো ভগবান।
ভগবান দিয়াছেন বহু কিছু, তবু কেন ক্ষোভে
নিত্য উন্মথিত চিত্ত, তবু কেন সুখ-শান্তি নাই,
তবু কেন উত্তেজিত নিত্য নব ভোগ্য-পণ্য-লোভে
দিগ্বিদিকে ছুটে মরি ;—কহ মোরে কিসে শান্তি পাই।"

মৌন রহি ক্ষণকাল মৃদু হাসি' তপস্বী কহেন,
"দাতার নিকটে প্রার্থী চিরকাল ভিক্ষা চেয়ে থাকে,
তুমিও চেয়েছ,—তিনিই সবার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।
এবার সাহস করে' চাহ দেখি স্বয়ং দাতাকে,
বল দেখি, তোমাকেই চাই আমি"
"তাহা কি সম্ভব ?"
শুধালাম সবিস্ময়ে।
কহিলেন—"না—না— পাবে ঠিক,
অসম্ভব কেন ? প্রার্থীকে মহানন্দে দেন তিনি সব
প্রার্থীর প্রার্থনা যদি প্রাণপূর্ণ হয় আন্তরিক।
তাঁকে পেলে সব পাবে, চাহিবার থাকিবে না কিছু
ঘুরিতে হবে না আর মায়া-আলেয়ার পিছু পিছু।"

শারদীয়া দেবী দুর্গা

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

মেঘমেদুর শ্রাবণান্ত আকাশের ফাঁকে ফাঁকে শরতের হাস্যোজ্জ্বল নীলাকাশের হাতছানি আর সাদা এক কুচো মেঘের চকিত চাহনি বাঙালীর মনকে নাচিয়ে তুলবেই। সমাজ-বিজ্ঞানী দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দোহাই দিয়ে হয়তো এই ভাবালুতাকে ধিক্কার দেবেন। সে ধিক্কার আর বহুযুগের বহু কালাপাহাড়ী সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে তবু বাঙালীর মন নাচবেই। কারণ এ দেশের মাটি দেবতার জন্য মাটির অপেক্ষায় থাকতে শেখায়নি। এ দেশের মাটির মানুষ দেখিয়েছে মানুষ কি করে দেবতা হয়, পাষাণপ্রতিমাকে করেছে নিজের মা-টি। হেলায় দেবতাকে করেছে তার মনের মানুষ। পূজা তার মনে মনে। তবু সকলের মনকে এক করতে তার বাইরের প্রতিমা। সে জানে 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি।' সে জানে :

'ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাৎ ভাবো
হি কারণম্ ॥'

— কাঠে, পাথরে, মাটিতে দেবতা নেই, দেবতা ভাবে, তাই ভাবই কারণ। তাই আমাদের দেখতে হবে প্রতিমার ভাবটি কি, বা ভাবের প্রতিমাটি কেমন।

শুক্ল যজুর্বেদে প্রথম পাওয়া যায় 'অম্বিকা'-র সংবাদ। কেন উপনিষদের উমা-হৈমবতীর কথা বহুবিদিত। একখণ্ড তৃণকেও কোনভাবে কিছু না করতে পেরে দেবতারা উমা-হৈমবতীর কাছেই জানলেন, ব্রহ্মই সকল শক্তির মূল। তাই উমাই ব্রহ্মবিদ্যা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্পষ্ট দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় বেদোক্ত দুর্গা-গায়ত্রীতে। মহাভারতের দুর্গাস্তোত্রে রয়েছে :

ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনি ॥

দেবীপুরাণে কথিত আছে—স্মরণমাত্রেই দুর্গম শত্রুসঙ্কট থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণকে উদ্ধার করায় দেবীর নাম দুর্গা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী বলেছেন : দুর্গ নামক মহাসুরকে বিনাশ করে আমার দুর্গা দেবী নাম বিখ্যাত হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অতি গভীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : দুর্গ নামক দৈত্য মহাবিঘ্ন, সংসার-বন্ধন, কর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ এবং হন্তাকেও যে দেবী হনন করেন তিনিই দুর্গা নামে খ্যাত।

সতী দেহত্যাগ করেছেন, দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে। মহেশ্বর মহাযোগে বিলীন, কিন্তু বাহ্যত শক্তিহীন। দেবতারা চাইছেন সতী আবার জন্মগ্রহণ করে শিবের শক্তি হয়ে জগৎ-ব্যাপার রক্ষা করুন। এদিকে হিমালয়পত্নী মেনকা সাতাশ বছর মহামায়ার পূজা করছেন সন্তান-কামনায়। দুই কামনা সিদ্ধ করে মহামায়া মেনকার কোল আলো করে বসন্ত-কালে মৃগশিরানক্ষত্রে নবমীতিথির মধ্যরাত্রে জন্ম নিলেন। হিমালয় কন্যার নাম রাখলেন 'কালী'।

ক্রমে যৌবনসম্পন্না কালী ধ্যাননিরত মহাদেবের জন্যে কি তপস্যাই না করলেন পিতৃ-আদেশে। মদনভস্ম হয়ে গেল কিন্তু মহাদেবের ধ্যান টললো না। কালী পঞ্চতপা করে অতি ও মলিনা হলেন। মেনকা কন্যার হাল দেখে বলে উঠলেন : উ, মা! আর তপস্যা

করো না। তাই কালীকে বলা হোতো 'উমা'। কিন্তু কালীর উমা হওয়ার ফল ফললো অবশেষে। কালী কৈলাসে কালাতিপাত করতে থাকলেন কৈলাসপতির সঙ্গে। চিরাচরিত দম্পতী-কলহের কিন্তু বেশী বিলম্ব হল না। শুভ্র হিমালয়-পর্বতকন্যা 'পার্বতী' কিন্তু তপঃক্লিন্না কালীই ছিলেন। নামে আর গুণে কালী—এমন একদিন বলে ফেলে মহাদেব মহাবিপদে পড়লেন। পার্বতী কালী ক্ষোভে তপস্যায় চলে গেলেন, 'সোনার মত গৌর রং না হলে ঘর করবো না' ব'লে। এক শ বছর তপস্যা করে নারী-হৃদয়ের অভিমান দূর হোল। অন্তর-বাহির মহাদেবময় হয়ে গেল তপস্যার ফলে, আকাশগঙ্গায় স্নান করতেই কালী বিদ্যুৎবর্ণা 'গৌরী' হলেন।

এই মানবী দেবীই সেই বেদের অম্বিকা, উপনিষদের উমা-হৈমবতী, কালিকাপুরাণের দক্ষদুহিতা সতী, পর্বতকন্যা পার্বতী, তপঃক্লিষ্টা উমা, শিবজায়া শিবানী কালী, তথা মহাযোগিনী গৌরী আর তিনিই আমাদের সকল দুর্গতিহারিণী মা দুর্গা। তিনি মহামায়া, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা, তিনিই আদ্যাশক্তি, জগৎপ্রসবিনী, জগৎ-জননী মা। তবু মেনকার বৎসরান্তের উমা-বিরহ-বেদনার সকরুণ হৃদয়-রোদনধ্বনির অনুরণন আমাদের হৃদয়কে মথিত করে। মা মেনকার মনোব্যথা আর যেন একার নয়, বিশ্বময় সে যায় ছড়িয়ে। সহানুভূতিতে একাত্মতায় সকল স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে। বাঙালীর অনন্য আগমনীতে বেজে ওঠে গিরি-মেনকার মনোব্যথার করুণ রাগিণী :

'কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে ;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।'

*　*　*

'চল মা, চল মা গৌরি, গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হ'লে জানিতে উমা, মমতা পিতামাতার॥'

এরপর দেবী দুর্গার আর জগজ্জননী সেজে থাকা সাজে না। বাঙালীর ঘরে মেয়ে সেজে কচুর শাক, পান্তা আর ইলিশ মাছ খেতে যেতেই হয়। তাই বলছিলাম, দেবতা-মানুষের গলাগলিতে এ দেশের মাটি চিরমহোজ্জ্বল।

এই কিন্তু দেবী দুর্গার সব কথা নয়। বাঙালী কেবলই কোমলধী নয়। কঠিন সত্য ও কঠোর ব্রতধারণেরও সে যোগ্য।

রামচন্দ্র পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তম। সীতা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী রামাশ্রিতা প্রকৃতি। কিন্তু যখন মহিষাদি পশু বলশালী রাক্ষসে পরিণত হয়, দশ ইন্দ্রিয়ের লালসাধিক্যে দশানন রাবণ দেখা দেন, তখন ব্রহ্মবিদ্যা কিনা সীতা অপহৃত হন। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'! সীতা-বিযুক্ত রামব্রহ্ম সংসারাবর্তের মানুষের মত বিলাপ করতে থাকেন, দুঃখ-বিরহে কাতর হন। কিন্তু কাতর হয়ে বিলাপ করলেই তো সীতা-উদ্ধার হয় না। হৃতা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গেলে প্রয়োজন দশ-ইন্দ্রিয়াভিমানী দশানন রাবণকে দমন করা। পুরাকালে মহিষাসুর-নিধনের জন্য দেবগণ দ্বারা আরাধিতা হয়ে আমাদের মেনকা-কন্যা গৌরী উমার মূলীভূতা সত্তা মহামায়া সকল দেবতার তেজঃসমন্বয়ে মহা ঐশ্বর্যশালিনী ভগবতী মহাশক্তিরূপিণী দশভুজা দুর্গারূপে আবির্ভূতা হন। তাই দেবীভাগবত, মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে কথিত আছে রামচন্দ্র দশভুজা দুর্গার অকালবোধন করলেন শরৎকালে, দশানন রাবণ-দমনের জন্য।

বোধিতা দশভুজার দশপ্রহরণে আমাদের

পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরিন্দ্রিয়স্বরূপ দশানন রাবণকে দমন না করতে পারলে আমাদের হৃতা ব্রহ্মবিদ্যা সীতাকে ফিরে পাই নে। না পেয়ে আমাদের ব্রহ্মস্বরূপ রামসত্তা সীতাবিয়োগে মুহ্যমান অকর্মণ্য থাকে। কিন্তু দশেন্দ্রিয়ের ওপর দশপ্রহরণের প্রয়োগ বড় কঠিন ব্যাপার। একাদশ ইন্দ্রিয় মনের সহায়তা ছাড়া তা অসম্ভব। মন মহাশক্তিধর। সেই মনকে বাহন করে দশপ্রহরণের প্রয়োগ করতে হয়। সেই মহাশক্তিশালী মনেরই প্রতীক দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গার বাহন মহাসিংহ—মহাশক্তির চিরপদানত। আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনে মন পদানত এবং তার সাহায্যে রিপুদল বশীভূত হলেই আমাদের হৃতবিদ্যার পুনঃপ্রাপ্তি, প্রকৃত শক্তির বিকাশের সঙ্গে ঐশ্বর্য- ও সিদ্ধিলাভ। এগুলিরই প্রতীক সরস্বতী, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তি। সিংহবাহনা, রিপুদলবারিণী দুর্গতি-নাশিনী মা দুর্গার বোধনে তাই তাঁরই বিভূতির প্রকাশরূপ, সন্তানসদৃশ লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকেয়ের আগমন। অসুরবল মহিষ নিপাতিত হলেই দেববলের স্বরূপ কার্তিকেয়ের আবির্ভাব। কিন্তু জ্ঞান-বিবেক-বিচার সেই শক্তিকে শাসন করলেই মঙ্গল, তাই দক্ষিণে জ্ঞানগুরু গণেশের স্থান। বিদ্যাহীন ঐশ্বর্য পীড়নের কারণ বলেই বামের ঐশ্বর্যের শোধক বিদ্যার প্রতীক সরস্বতীর বিদ্যমানতা দক্ষিণে।

মানুষের পশুভাব রাক্ষসভাব রিপুপ্রবলতা প্রশমিত হয়ে কল্যাণশক্তি, শ্রী, বিদ্যা ও সিদ্ধি-লাভই প্রকৃত বিজয়। এই বিজয়ের উৎসবই বিজয়া। এ বড় কঠোর কল্যাণব্রত।

শরতের অকাল-বোধন ও বিজয়ার সঙ্গে মেনকা-কন্যা গৌরী উমার আগমনী-বিজয়ার যোগ বাঙলার শারদীয়া দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য। কারণ শুধুই মেনকার উমা-বিরহ ও গৃহাগতা কন্যার অচির মিলনের করুণ-বাৎসল্যরসের কোমল বিহ্বলতাই যদি দুর্গোৎসব হত তবে তা শরৎকালে হত না। উমার আবির্ভাব বসন্তেই, আমরা আগেই দেখেছি। শারদীয়ার তাৎপর্যই এখানে যে, তাতে কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার, মানবীত্বের সঙ্গে দেবীত্বের অঙ্গাঙ্গী মিলন। বিরহ থেকে মিলনে, মিলন থেকে বিরহেই আগমনী-বিজয়ার পরিসমাপ্তি নয়। সমস্ত সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহরণ করে আগমনীতে—কন্যা কি না দীপ্যমানা দেবীর মানবী-সম্বন্ধে আগমন। পরে পশুত্ব রাক্ষসত্ব রিপুদলনরূপ দেবীভাবের প্রকাশ। এই কোমলে-কঠোরে দ্বন্দ্বই শারদীয়ার তাৎপর্য!

এই তাৎপর্য না বুঝে দুর্গোৎসবে ব্রতী হওয়া নিষ্ফল; বৃথাই সে আগমনী গাওয়া, বৃথাই আবাহন, আরাধন, বৃথা পাতা মঙ্গল-কলস! আর যে এ ভাবের প্রতিমাকে না দেখে মাটির প্রতিমাকে উপহাস করে, সে নিতান্তই দুর্মেধা ও হতভাগ্য। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়েছিলেন:

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

—এই রকম যখনই দানবের উত্থানে বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে অসুর-বিনাশ করব।

আজ দশানন সহস্রানন হয়ে দেখা দিয়েছে। পশুত্ব ও ইন্দ্রিয়সেবারূপী মহারাক্ষসই আজ সমাজে বলবান। আজই তাই শারদীয়া দেবী দুর্গার আরাধনার উপযুক্ত কাল।

আসুন আজ আমরা সভক্তি শক্তির উপাসনায় সমবেত কণ্ঠে গাই:

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলা কমলদল-বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্॥

নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

নিবেদিতা রামকৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখেননি, তাঁকে তিনি দেখেছেন অন্যের দেখার আলোকে। কিন্তু নিবেদিতার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল, সেটি হল ভাষার মাধ্যমে বহু বর্ণময় রূপময় চিত্রকল্প সৃষ্টির। সাধারণতঃ শক্তিমান কবিদেরই এই ক্ষমতা থাকে, কিন্তু নিবেদিতার ক্ষমতা আরও বেশী, কারণ তিনি গদ্যের মাধ্যমেই অসাধারণ চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে পারতেন। সেজন্য তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে রামকৃষ্ণ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছেন, তাঁর অলোকসামান্য গুণগ্রাম একের পর এক রূপ পরিগ্রহ করেছে, এবং পরিশেষে রামকৃষ্ণের বিশ্বম্ভর মূর্তিটি যেন জ্যোতির্লেখায় জ্বল জ্বল করে উঠেছে। সেজন্যই রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনার অসামান্য মূল্য আছে। তাছাড়া এই রচনা-রাজির মধ্যে নিবেদিতাকেও আমরা দেখতে পাই মূর্তিমতী শ্রদ্ধা- ও প্রজ্ঞারূপে। তার মূল্যও কম নয়।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার আলোচনার পরিমাণ বেশী নয়। বিবেকানন্দের রচনাবলীর মুখবন্ধে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করা হয়েছে, 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, ১৮৯৯ সালের ১৮ই ফেব্রুআরি Statesman পত্রিকায় একটি অনামা প্রবন্ধে (সম্পাদকীয় স্তম্ভে) ম্যাক্সমূলার-রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী গ্রন্থের সমালোচনামূলক একটি আলোচনা আছে, আর 'Kali The Mother' গ্রন্থে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উক্তি এখানে ওখানে পাওয়া যায়।* কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা আবিষ্কার করেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর নিজস্ব প্রকাশগুণে সে আবিষ্কারগুলি অনন্য সম্পদ হয়ে উঠেছে।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু। এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার তাঁর 'নিবেদিতা' নামক গ্রন্থে। সেখানে তিনি লিখছেন—"মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র টাঙানো ছিল। তাহার অপরদিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংস-দেবের ছবির নীচে টাঙাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলেই থাকা উচিত'।"

এই বিবৃতি ছাড়া অন্য কোথায়ও নিবেদিতা রামকৃষ্ণকে 'অবতারপুরুষ' বা 'জগদ্‌গুরু' ব'লে সরাসরি ঘোষণা করেননি। কিন্তু এটি

---

* অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রায় সবকয়টি রচনার অনুবাদ দিয়েছেন একত্রে তাঁর অনন্য গ্রন্থ 'নিবেদিতা লোকমাতা'-য়। এজন্য সহযোগী এবং উত্তরসূরী গবেষকগণ কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমরা এই আলোচনায় তাঁর অনুবাদের অনুসরণ করেছি অনেক স্থলেই।

তার একটি রচনাকৌশল, সোজাসুজি বলেননি, কিন্তু আলোচনাক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর পরমপুরুষ রূপটি উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে Statesman-পত্রিকার লেখাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। অতিশয় সংযমের সঙ্গে লেখা এই প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের অবতারত্বের কথা কোথায়ও বলা হয়নি। কিন্তু রামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় অতিলৌকিক সংবাদগুলি নিয়ে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যে দ্বিধায় পড়েছেন (তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপে সেগুলি স্বীকার ক'রে নিতেও পারেননি, আবার বিবেকের চাপে সেগুলি অস্বীকার করতেও পারেননি)—তা উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন রামকৃষ্ণের অতিলৌকিক চরিত্রমহিমা। অধ্যাপকের রচনা হতেই তিনি এমন সব অংশ উদ্ধৃত করেছেন যে, রামকৃষ্ণচরিত্র যে এক পরমপুরুষের চরিত্র তাতে কারও সন্দেহ থাকে না।

অবশ্য তাঁর 'Kali The Mother' গ্রন্থের আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। এখানে তিনি রামকৃষ্ণকে "মানবসন্তানের জন্য বিশ্বমাতার ভালবাসার অবতার" ব'লে অভিহিত ক'রে, একান্ত শ্রদ্ধায় প্রণতি নিবেদন ক'রে আলোচনা আরম্ভ করেছেন, আর এই আলোচনার প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি অনুচ্ছেদে রামকৃষ্ণের এই মূর্তিটিকে ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের চরিত্রের ও শিক্ষার অসামান্য দিকগুলি একে একে ফুটে উঠেছে আশ্চর্যভাবে। এ কাজে একদিকে যেমন তিনি চিত্রকল্প-সৃষ্টির সহায়তা নিয়েছেন, তেমনি অপরদিকে সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিবিচারের। এ দুয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে: "তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এত বেশী স্বপ্রকাশ হয়েছিলেন যে, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালবাসতেন তাঁদেরই অনেকে আজও তাঁর কথা বলতে গিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলেন: 'প্রভু আমাদের'।" এ কথা মনে রাখতে হবে, নিবেদিতা যা-ই বলেছেন তা কল্পনাবিলাস নয়, তা প্রমাণসিদ্ধ ক'রে উপস্থাপিত করেছেন।

এখানে রামকৃষ্ণের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—দেহ ও মনের—তিনি অল্পকথায় সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন যাতে তাঁর অসাধারণত্ব সহজেই ফুটে ওঠে। যেমন বলছেন "তাঁর মধ্যে অহং-এর লেশমাত্র ছিল না।" আবার বলেছেন: "প্রথম জীবনে তাঁর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ ভাল ছিল, কারণ যে-আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড় তাঁর মধ্যে প্রবলবেগে বয়ে গিয়েছে পঞ্চাশ বৎসর ধরে, তার ধাক্কা তাঁকে সামলাতে হয়েছে।" তবে নিবেদিতার মতে সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁর মনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনন্যসাধারণত্ব উদ্ঘাটন ক'রে নিবেদিতা মন্তব্য করেছেন: "কিন্তু এর চেয়েও (দৈহিক শক্তির চেয়েও) আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, তাঁর চরিত্রের জটিলতা, বহুমুখিতা ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে তিনি প্রতি মানুষের মনের সমস্যার কথা বুঝতে পারতেন, যেন সেগুলি তাঁর নিজেরই সমস্যা। আধুনিককালে তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী।" 'এই বিশ্বমানবের পরমচেতনায় সব কিছু এক মহান ঐক্যে পরিণত হয়েছিল,' নিবেদিতা তাও এখানে লক্ষ্য করেছেন।

অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভাসম্পন্ন নিবেদিতার একথা জানা ছিল—একটি মানুষের পরিচয়

সবচেয়ে পরিস্ফুট তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, সেজন্য তার পরিচয় দিতে গেলে তার পরিবেশটি ফুটিয়ে তোলা দরকার। রামকৃষ্ণের পরিবেশটি অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টির সাহায্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে, বিশ্বমানব রামকৃষ্ণ বাস করেছেন যে কক্ষে সেখানে উপকরণবাহুল্য আদৌ ছিল না, নিঃস্বতার সাক্ষী তার সর্বত্র, "কিন্তু অকিঞ্চনের এত সৌন্দর্য আর দেখিনি"। শেষ কথা কয়টি স্বল্প, কিন্তু তা প্রকাশ করেছে অনেক কিছু। যে মহান ঐক্য রামকৃষ্ণের চেতনায় পরিস্ফুট হয়েছিল "তার প্রশান্তি আজও সেই ছোট্ট ঘরটিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, সে ঘরটিতে একদা তিনি বাস করতেন, এবং সেই বিরাট ধ্যানতরুর নীচে আজও তা বিরাজ করছে এক পরাক্রান্ত উপস্থিতির মত।" এ কথা কয়টি নিবেদিতা বলেছেন এমন ক'রে যে সেই "প্রশান্তি", সেই "পরাক্রান্ত উপস্থিতি" পাঠকের মনেও ক্ষণেকের জন্য ছায়াপাত করে।

অনুরূপ স্বল্পকথায় নিবেদিতা রামকৃষ্ণের লোকোত্তর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অলোকসামান্য মনীষা ফুটিয়ে তুলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতেও ভোলেননি। কথা কয়টি হল: "বড় বড় পণ্ডিত ও প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এখানে এসে গৌরবান্বিত বোধ করতেন, এবং 'প্রভুর কাছে তাদের মনে হোত যেন শিশু'—সেখানে উপস্থিত থাকতেন এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন।" রামকৃষ্ণের প্রভাব অমোঘ ছিল, যাকে স্পর্শ করতো তার মধ্যে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যেতো। প্রমাণস্বরূপ নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন কেশবচন্দ্রের রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে ঈশ্বরের মাতৃভাবের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবার কথা। শুধু কেশবচন্দ্রের কেন উত্তর-কালের ভারতের সমগ্র মনীষাই অনেকখানি রামকৃষ্ণের স্পর্শে উন্মোচিত, এই মনীষাই নূতনযুগে ভারতের অগ্রগতির পথনির্মাণ করেছে। ছোট্ট একটি মন্তব্যে নিবেদিতা এই বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে—"বর্তমান ভারতের অনেক শক্তিমান ব্যক্তিই তাঁর পদপ্রান্তে বসেছেন।"

রামকৃষ্ণের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আরও অনেকে হয়তো বলেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এমন একটি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত দিকে নিবেদিতা আলোকপাত করেছেন যা আমাদের বর্তমানকালে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। আমদের বিস্ময় জাগে নিবেদিতা কেমন ক'রে রামকৃষ্ণকে "কৃষিজীবী ব্রাহ্মণকুলে আগত" ব'লে বর্ণনা করলেন, যখন তাঁর সমসাময়িক কালে সকলেই রামকৃষ্ণের ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভাবের উপরেই কেবল জোর দিয়েছেন। কৃষিজীবীরাই ভারতের জনসংখ্যায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ। সুতরাং রামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাদের মধ্য হতে, তিনি জনগণের জীবনে নূতন অভ্যুদয়ের প্রতিভূ। বিবেকানন্দকে আধুনিক-কালের এক কবি অভিহিত করেছেন: "অগণিত নগণ্যের হৃৎপদ্মে উত্থিত সম্রাট্" এই নামে; সে অভিধা রামকৃষ্ণের জন্মসূত্রেই প্রাপ্য, তাঁর মানবপ্রেমের জন্য তো বটেই। নিবেদিতাই প্রথম এদিকে আমাদের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন।

রামকৃষ্ণ প্রায়-নিরক্ষর ছিলেন—এই কথাটি আজ বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে যার ফলে একজন আধুনিক পণ্ডিত তো মন্তব্যই ক'রে বসলেন, "প্রায়-নিরক্ষর এই ব্যক্তিটির পক্ষে বেদান্তের তত্ত্ব বোঝা সম্ভবই ছিল না।" অথচ বেদের একনাম শ্রুতি এজন্যই যে তা শ্রবণ করেই আয়ত্ত করা হোত। নিবেদিতা এদিকেও প্রভূত আলোকপাত করেছেন। যেন

আধুনিক পণ্ডিতম্মন্যদের ভ্রান্তিনিরসনের জন্যই তিনি বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে বলছেন, "প্রায়-নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিরাট পণ্ডিত। কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ শ্রুতিধর, যার ফলে অনুবাদসহ সংস্কৃত শব্দগুলিকে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারতেন এবং নানা সময়ে বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি ক'রে শোনানোর জন্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অসাধারণ বিরাট হয়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার সহ অনন্যসাধারণ মনীষী না হলে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁর পদতলে শিশুর মত উপবেশন করবেন কেন? এদিকটি উদ্ঘাটনের প্রয়োজনীয়তা নিবেদিতা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন।

কিন্তু রামকৃষ্ণের এই মনীষা দিব্যত্বে অসাধারণ; ঐশী বা অনুরূপ কোন শক্তিসম্পন্ন। এই দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন নিবেদিতা পরবর্তী মন্তব্যে—"তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেরা অনুভব করত এমন একটি শক্তি, যার কুলকিনারা তারা করতে পারতো না; এমন জ্ঞানরাশি তাঁর মধ্য হতে উৎসারিত হতো, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তাদের।" রামকৃষ্ণের ঐশী শক্তি আরও ভাস্বর অপরূপ আর একটি মন্তব্যে: "তিনি যেন একটি মহান সঙ্গীত, ঐ সঙ্গীত যার স্পর্শ বয়ে আনছে তাঁর সান্নিধ্য থেকেই তারই যেন আভাস পেত সমাগত মানুষেরা, তারপর যখন আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তারা ফিরে যেতো, তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও বলীয়ান হয়ে উঠেছে

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, রামকৃষ্ণ তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের একদিকে ছিলেন সদানন্দ পুরুষ, বালক ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ-তামাসায় নিযুক্ত। কিন্তু রঙ্গ তামাসা, হাসি আনন্দ খেলা সব এক লক্ষ্যে ধাবমান ছিল, অনায়াসে নদীস্রোতের মত সকলকে চেতনার ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যেতো, অবগাহন করাতো সত্য-সমুদ্রে। মনোরম একটি চিত্রকল্পের সাহায্যে নিবেদিতা রামকৃষ্ণের এদিকটি উদ্ভাসিত করে তুলেছেন—"জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে সেখানে বিরাজ করতো হাসি ও রঙ্গ। তাদের গুরু কখনও নিরানন্দ হয়ে থাকতেন না। তাঁর নিঃশ্বাস-বায়ুতে যেন বিরাজ করতো একটি প্রসন্ন প্রফুল্লতা। সেই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতো মুহুর্মুহুঃ আনন্দ-উদ্বেল সমাধিতে এবং সমাধিভঙ্গের পর ভাবের এক অপূর্ব উদ্দীপনে। 'সকল প্রাণীর কাছে যা রাত্রি, আত্মসংযমীর কাছে তা দিন; আর যখন সকল প্রাণী জাগ্রত, জ্ঞানী সেখানে সুপ্ত'—এই বক্তব্যের সংস্কৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি সকলকে গভীর রাত্রে জাগিয়ে দিতেন, তারপর বাইরে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে ধ্যানে বসতেন; তেমনি আবার কতদিন কেটে গেছে তাঁর স্বহস্তে লাগানো সুন্দর লতাগাছে দোলা খেয়ে, হাসি-তামাসার মধ্যে, এবং বাগানে চড়ুইভাতি করে। সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, যেন কোন পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যই তার নাই—অথচ সকলের অলক্ষিতে কয়েকটি যুগান্তকারী ভাবধারা সঞ্চারিত হচ্ছিল।…সর্বোপরি তারা সেই পরম সত্যের মহাসমুদ্রে অবগাহন করতে পেত।" সমস্ত বর্ণনাটি পড়লে আমাদের চোখের সামনে ছবিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—নানাবর্ণের পুষ্প-তরুলতা-শোভিত, পুষ্প-সুরভিত দক্ষিণেশ্বর, মুহুর্মুহুঃ সমাধিমান্ পরম আনন্দময় পরমপুরুষের সান্নিধ্যে কয়েকটি আনন্দমগ্ন তরুণ। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার শেষ ব্যঞ্জনাটি অপূর্ব, দক্ষিণেশ্বরের ঐ জীবনে

অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন একজনের অল্প কয়েকটি কথা উদ্ধৃত ক'রে নিবেদিতা সুকৌশলে সেই ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। কথা কয়টি "আসল কথা তাঁর সঙ্গে আমরা যে জীবনযাপন করেছিলাম। সে জিনিস কখনই বর্ণনা করা যাবে না।" কিন্তু অনেক বর্ণনার চেয়ে এই না-বলা বর্ণনা অনেক কিছু বুঝিয়েছে। নিবেদিতা যে অনন্য রচনাশিল্পী তা এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়।

উপরে উক্ত দীর্ঘ বর্ণনাটির মধ্য দিয়ে নিবেদিতা রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা রূপটিও উদ্ঘাটিত করেছেন। "সর্বোপরি তারা সেই পরমসত্যের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছিল, তাঁর মধ্য দিয়ে তারা সেখানে নিত্য প্রবেশাধিকার পেত"—উপরে উক্ত এই উক্তিটির সঙ্গে নিবেদিতা রামকৃষ্ণের অতুলনীয় শিক্ষাদান-পদ্ধতির উপর আলোকপাত ক'রে বলছেন—"এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে মূল সত্য জাগিয়ে বাকি কাজের ভারটুকু তার উপর ছেড়ে দেওয়াই কি সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নয়—যেভাবে বীজ থেকে চারাগাছ বড় হয়ে ওঠে?" নিবেদিতা নিজে শিক্ষাবিদ্ ছিলেন, সেজন্য এই ছোট্ট মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রামকৃষ্ণ আর তাঁর অতুলনীয় শিক্ষা-পদ্ধতিকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পেরেছেন।

রামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের বাণীরও এক অতুলনীয় ভাষ্যরচনা করেছেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত "ধর্ম-সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে কল্পনা করা সম্ভব, তিনি দিলেন তারই পূর্ণ সিদ্ধি।" ধর্ম-সমন্বয়ের কথা ভারতে এই নূতন নয়, স্মরণাতীত কালেই এখানে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" সেজন্য রামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ে নূতন কি আছে—এ প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জাগে। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন নিবেদিতা, বলেছেন: "তাঁর সেই দৃঢ় ধারণা—নিজের ধর্ম অনুসরণ করা প্রত্যেকের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহু ভাবকেন্দ্র থাকলে পৃথিবীর মঙ্গল; তাঁর সুগভীর প্রত্যয় 'ঈশ্বরকে যে নামে বা যে ভাবে জানতে চাও না কেন, সেই নামে বা আকারেই তুমি তাঁর দর্শন পাবে; তাঁর সেই আশ্বাস ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়; ...সর্বোপরি একান্ত প্রেমের সঙ্গে সর্বধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ঘোষণা 'অন্যেরা যেখানে নতজানু হয়ে ভক্তি নিবেদন করে, সেখানে তুমিও নত হও, নমস্কার কর, কারণ যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় সেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে'—পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না।" এতদিন অন্য ধর্মগুলি সম্বন্ধে বলা হোত সহন করাই বড় নীতি। কিন্তু রামকৃষ্ণ যা বললেন তার তাৎপর্য "সহন নয়, গ্রহণ"। একথা রামকৃষ্ণ শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হননি, নিজে অনুশীলন ক'রে দেখিয়েছেন। সে বিষয়টি উদ্ঘাটিত ক'রে নিবেদিতা বললেন—"এমন কোন পূজা ছিল না, তা যে প্রকারই হোক, যার প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজ জীবনে অনুভব করেননি। সব পূজাকেই তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন উপলব্ধির সিদ্ধিতে। জ্ঞানলাভের পথে প্রত্যেকটির প্রয়োজন আছে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন।" রামকৃষ্ণের সমন্বয় কেবল-মাত্র বৌদ্ধিক স্তরে সম্পাদিত হয়নি, হয়েছে উপলব্ধির ভূমিতে, সেজন্য তিনি শৈবের কাছে পরম শৈব, বৈষ্ণবের কাছে পরম বৈষ্ণব, অদ্বৈতবাদীর কাছে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক হয়ে বিরাজ ক'রে সকলকেই নিজ নিজ পথে

সত্যলাভের প্রেরণায় উদ্দীপিত করতে পারতেন। তাঁর ধর্মসমন্বয়ের এদিকটি সত্যই অতুলনীয়, নিবেদিতার প্রাঞ্জল আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"ধর্মীয় অনুভূতি সম্বন্ধে যার সামান্য জ্ঞানও হয়েছে, বুদ্ধিযোগে তার পক্ষে এটা বোঝা কঠিন নয় যে, সমকালীন বিভিন্ন ভাষা যেমন একই বক্তব্যকে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত করে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সেই এক চৈতন্যময় পুরুষকেই নানাভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বেশী কিছু দিলেন। তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার নিজের ভাষায় শিক্ষা দেবার এবং সিদ্ধিতে পৌঁছুবার পথ দেখাবার মহতী প্রেরণার পরম মূর্তি ছিলেন।" নিবেদিতা 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে লিখেছেন—বিবেকানন্দের মধ্যে অন্য জাতি, অন্য ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে অতি-উদার মনোভাব দেখে একদিন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দ তখন মুসলমান খালাসীদের সঙ্গে এরূপ উদার ব্যবহার করছিলেন। নিবেদিতার বিস্ময় দেখে তিনি বলেন, 'আমি মুসলমানদের ভালবাসি'। নিবেদিতা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করেন, এই উদার আচরণ তিনি কার কাছ থেকে শিক্ষা করেছেন, রামকৃষ্ণের কাছ থেকে কি? উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন—"রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের কাছ থেকে শিক্ষাকালে নিশ্চয়ই··· যে জাতির মানুষদের তিনি বুঝতে চাইতেন, তাদের মত করে খেতেন, পরতেন, তাদের ধর্মদীক্ষা নিতেন, তাদের ভাষায় কথা বলতেন; তিনি বলতেন 'অন্য মানুষদের একেবারে আত্মায় প্রবেশ করতে শিখতে হবে।' এটা তাঁরই নিজস্ব! তাঁর আগে ভারতে কেউ ক্রমান্বয়ে ক্রীশ্চান, মুসলমান ও বৈষ্ণব হয়নি।" এ কাহিনীটির মধ্যে রামকৃষ্ণের মহাসমন্বয়ের সকল তাৎপর্য অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। সকল ধর্ম যেন রামকৃষ্ণের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে—তিনি একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; বিশ্বধর্মের তিনি মিলনক্ষেত্র। রামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ধর্মে আছে প্রত্যেকের অসীম স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ, প্রতিটি মানুষকে এতে দেওয়া হয়েছে অপরিসীম মর্যাদা যার জন্য রোঁমা রোঁলা রামকৃষ্ণের ধর্মকে আখ্যা দিয়েছেন "মুক্ত ধর্ম"। নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও বলা কাহিনীর মধ্য দিয়ে এসকল সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

সকল ধর্মকে গ্রহণ ক'রে সকল মানুষকে রামকৃষ্ণ কাছে টেনে নিয়েছিলেন পরম প্রেমে। তাঁর এই মানব-প্রেমের অসাধারণত্ব উদ্‌ঘাটিত করেছেন নিবেদিতা—"এই মানুষটির ভালবাসায় কোথায়ও কোন সীমারেখা ছিল না। ···সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। যে বিশ্ব থেকে একটি প্রাণীও বাদ যাবে, যতই অকিঞ্চন সে হোক না কেন, সেই বিশ্ব তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ বলে বোধ হত।" রামকৃষ্ণের সকল সাধনার পূর্ণসিদ্ধি এই মানবতায় তারই জন্য যেন তাঁর দেহধারণ, তাঁর সকল সাধনা। নিবেদিতার লেখনী এ বিষয়ে সেজন্য কিছুটা উচ্ছ্বাসময় মনে হয়—"এই মহান ভালবাসার আবেগে তিনি ছিলেন আত্মহারা। অন্য কিছু ভাববার মতো অবসর তাঁর ছিল না। আত্মসংযমের সাধনায় অতিবাহিত সেই সুদীর্ঘ দিনগুলিতে তিনি কতবার দীনের কাছে নতজানু হয়ে পূজার্পণ করেছেন, জীবনের শেষদিনগুলিতে যখন ক্যান্সারে তিনি মহাপ্রয়াণের পথে চলেছেন, তখনও তিনি সমাগত উপদেশপ্রার্থীদের শিক্ষা দিতে ব্যস্ত।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনায় বিশ্বচেতনা ও

বিশ্বমানবপ্রেম কি অপরূপ রূপে স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হয়েছে তার কয়েকটি বহুবর্ণময় চিত্র এঁকেছেন নিবেদিতা। অপরূপ এই চিত্রকল্পগুলি রামকৃষ্ণকে যেভাবে উদ্ঘাটিত করেছে তার তুলনা নেই। তার একটি—"নিকটবর্তী মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি যখন ক্রমে অনুরণিত হতে হতে নির্বিশেষ স্পন্দনে মিলিয়ে যেত, তখন তাঁর মনে জাগতো ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই এবং দুয়েরই উর্ধ্বে।" অপর একটি চিত্রকল্প : "শাশ্বত মিলনের আনন্দলোক থেকে ধীরে ধীরে তিনি নেমে এলেন, দেখলেন বিশ্বের অণুপরমাণু পরমেরই অঙ্গ ;—তখনই তাঁর অনুভূতিতে মানবজীবনের বহু জিনিস ধরা পড়ল, যার পথ তিনি পরিক্রমণ করেননি।" বাহুল্যভয়ে আমরা এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি দিচ্ছি না।

এখানে নিবেদিতা বর্ণনা করতে ভোলেননি রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনপথ-পরিক্রমায় নারীজীবনের মুক্তির দ্বার কিভাবে উন্মোচিত করেন। নারীর মত জীবন যাপন ক'রে তিনি পরম সিদ্ধির দ্বারে পৌঁছে সিদ্ধান্ত দিলেন—"নারীত্বের সরল পথেও বিজয়-রহস্যে পৌঁছানো যায়।" নিবেদিতা নারী হয়ে এর তাৎপর্য উপেক্ষা করতে পারেননি, এ সম্পর্কে মন্তব্য রাখলেন "এর ফলে তাঁর জীবন ভারতীয় নারীর প্রকৃত মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" নারী-জীবনে কোন অসম্পূর্ণতা আছে, এ কথা রামকৃষ্ণ স্বীকার করেননি।

এইভাবে বিচিত্র সাধনা ও উপলব্ধির অন্তে রামকৃষ্ণের পরমতম মূর্তিটি প্রকাশ পেল, যাকে নিবেদিতা বললেন "তার জীবনের সার"; নিবেদিতার মনীষার দীপ্তিতে তা আমাদের সামনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষায়—"মায়ের ভালবাসা যেমন সকল সন্তানের প্রতি ব্যাপ্ত, অন্যরা তাদের প্রতি যত নির্দয় হোন বা অবিচার করুন না কেন, তেমনি বিশ্বমাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষটি সমগ্র জীবলোককে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিপূর্ণ ঐকতানের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন।" নিবেদিতাই আমাদের রামকৃষ্ণের মধ্যে এই বিশ্বমাতৃত্বের বিশ্ববিমোহন মূর্তিটি উদ্ঘাটন ক'রে দেখালেন। এ মূর্তিতে না দেখলে আমাদের রামকৃষ্ণকে দেখা অসম্পূর্ণ থাকতো।

রামকৃষ্ণের মহাজীবনের মহাবাণীটিও নিবেদিতার লেখনীগুণে ভাস্বর। নিবেদিতার এ বিষয়ে উক্তিটি স্মরণীয়—"এটি কি একটি সুমহান মতবাদ নয় যে, প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র গৃহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে আছে অনন্তের রাজপথের দিকে? এই আহ্বান কি অপরিসীম সান্ত্বনার কারণ হয় না যখন শোনা যায়—যে যেখানে আছো, সেখান থেকেই, যা তোমার আছে তাই নিয়েই, তোমার প্রভু, তোমার ঈশ্বরে, হৃদয় নিবিষ্ট করো, আর উন্মুক্ত রাখো দৃষ্টি সত্যের দিকে।" সকল পিছিয়ে পড়া মানুষ এর থেকে পাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহস, নিবেদিতা এখানে একথাই বলতে চেয়েছেন।

রামকৃষ্ণের কাছে এসে সত্যই সাধারণ মানুষ, তুচ্ছ মানুষ পেতো অমিত সাহস ও বল। তাঁর ধর্ম শক্তির ধর্ম। এ বিষয়ে আলোকপাত ক'রে নিবেদিতা বলেছেন—"তাঁর কাছে যিনিই এসেছেন, ফিরে যাবার সময় অনুভব করেছেন এক গভীর সাহস, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের শক্তির উৎসকে জাগিয়ে দিতেন, যার ফলে স্পর্শপ্রাপ্ত মানুষটি সীমাবদ্ধতাকে ছিন্ন করে পাখা মেলে দিত উর্ধ্বাকাশে।" রামকৃষ্ণের স্পর্শ মানুষকে জন্ম-কর্ম-জাতি-কুলের সকল খর্বতা, হীনতা,

অসম্পূর্ণতার উর্ধ্বে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতো। অথচ রামকৃষ্ণ ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন, তিনি প্রচলিত ঐতিহ্যকে আঘাত করেননি। এ বিষয়ে আলোকপাত ক'রে নিবেদিতা বলছেন, "সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ প্রচলিত ঐতিহ্যকে আঘাত করেননি, মানুষ যাতে বলীয়ান্ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তিনি সবকিছু বলেছেন।" 'গঠনের পথে অগ্রগতি' তাঁর বাণী। তাঁর বাণী গতির, শক্তির, নূতন জীবনের ; সকল মানুষের মনুষ্যত্বের অধিকারের ভিত্তিতে নূতন সমাজ-গঠনের এক মহতী প্রেরণা রামকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে পাওয়া যায় এসকল নিবেদিতার রচনায় উদ্ঘাটিত।

সেজন্য নিবেদিতা রামকৃষ্ণকে বলেছেন 'মানবতার প্রতিনিধি।' রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'Kali The Mother' গ্রন্থের অনুপম আলোচনার পরিসমাপ্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন, "প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথা বস্তু নয়, জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি সাক্ষ্যস্বরূপ। একথা অবশ্য সত্য, আর কোন দেশেই তাঁর জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথাও ঠিক নয় যে, তিনি প্রধানতঃ বা একমাত্র ভারতের আত্মাকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির অনুভূতি ও চিন্তা এসে মিলিত হয়েছিল এবং সেই কালীগতপ্রাণ রামকৃষ্ণ মানবতার প্রতিনিধি।" রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে তাই শুধু ভারতের নয়, জগতের সকল মানুষের অধিকার আছে, নিবেদিতা এই উক্তির মাধ্যমে সেই দাবি জানালেন।

'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা একস্থলে বলেছেন—রামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞামূর্তি, আর বিবেকানন্দের মধ্যে আধুনিক যুগ উত্তরিত হয়েছে নূতন মহান ভবিষ্যতের পথে। এই মন্তব্যের জন্য তাঁকে খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কঠোর সমালোচনা ক'রে বলেছেন—নিবেদিতা ভুলে গিয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অখণ্ডতত্ত্ব, ভুলে গিয়েছেন রামকৃষ্ণের বিশ্ব-চেতনায় সর্বকালের মানবরহস্য ধরা দিয়েছে, তাঁর মানবপ্রেম বিবেকানন্দরূপ নদীপ্রবাহে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক যুগকে উত্তরিত করেছে ভবিষ্যতের মহান সম্ভাবনাময় পথে। কিন্তু নিবেদিতা যে রামকৃষ্ণের বিশ্বচেতনা, মানব-প্রেম ও শক্তি ও গতির ধর্ম এবং নূতন ভবিষ্যতের রূপায়ণে তাঁর ভূমিকা সবই লক্ষ্য করেছেন তা স্পষ্ট 'Kali The Mother' গ্রন্থের আলোচনায়। আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে অখণ্ডতত্ত্ব—একথা তিনি যেমন ক'রে ব্যক্ত করেছেন তা আর কেউ করতে পারেননি। 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থেই তিনি বলেছেন, "প্রাচীনতর গুরুভাইদের একজন সম্প্রতি আমাকে বলেছেন 'বিবেকানন্দের নির্মাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারণ করেছিলেন।' কথাটি কি এইভাবে সত্য? না, বলা উচিত, জগন্মাতার হৃদয়োদ্ভূত অখণ্ড বিশাল ঐ উচ্চারণের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অংশ ভাগ করা সম্ভব নয়? এইসব জীবন-অনুধ্যানের সময় আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে একটিই আত্মা বিরাজমান, যার নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।" আশ্চর্য এই উক্তিটি মোহিতলালের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, নিবেদিতা শেষের দিকে সর্বদা একটি নাম ব্যবহার করতেন, সে নাম বিবেকানন্দের নিবেদিতা নয়, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।' এর মধ্য দিয়েও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে অখণ্ডতত্ত্ব তাই তো বোঝাতে

চেয়েছেন নিবেদিতা। বিচ্ছিন্ন উক্তি দিয়ে কারও সঠিক বিচার করা যায় না। আমাদের ধারণা মোহিতলাল নিবেদিতার প্রতি অবিচার ক'রে ফেলেছেন। নিবেদিতার রামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সমগ্র রচনারাজি একসঙ্গে বিচার করলে তাই মনে হয়। রামকৃষ্ণের যে বিশ্বম্ভর মূর্তি তিনি আঁকতে পেরেছেন, তাতে স্পষ্ট রামকৃষ্ণ, কালী ও বিবেকানন্দ এই তিন সত্তার মধ্যে যে অখণ্ড তত্ত্ব বিরাজমান, তিনি তার পায়েই নিবেদিত। মোটের উপর নিবেদিতার রামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে রচনারাজিতে যে রামকৃষ্ণ আবিষ্কৃত, তা আমাদের নিত্য অনুধ্যানের বস্তু হওয়া উচিত।

মুরলীমনোহর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভক্তবৎসল মুরলীমনোহর !
বৃন্দাবনচারী কিশোর নটবর !
আমি যে তৃষাতুর ! পিপাসা করো দূর !
এসো হে অফুরান্ সুধার নির্ঝর !

তোমার লাগি আজ আমি যে উন্মন !
বলতো তুমি ছাড়া এ তনু-প্রাণ-মন
কাহারে দিব প্রিয় ? অনির্বচনীয়
অমৃত তোমাতে যে ! দিবে না দরশন ?

বাহিরে হাহাকার মত্ত ঝটিকার !
আর্দ্র সমীরণে সুবাস যূথিকার !
শূন্য মন্দিরে ভাসি যে আঁখি নীরে !
এসো হে তীরে মম অশ্রু-যমুনার !

ঊর্ধ্বে একা তুমি অরূপ, নিশ্চল !
নিম্নে রূপে, রসে, গন্ধে উচ্ছল !
চাও যে ভালোবাসা, আমার কাঁদা-হাসা !
তাই তো ফোটালে এ ভুবন-শতদল !

কামনা-কর্দমে আমি যে ডুবে আছি !
করুণা করো যদি তবে তো আমি বাঁচি !
পঙ্কে নিমগন আমারে, দয়াঘন,
চরণ-কমলের কর গো মৌমাছি !

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

"...no longer at ease here, in the old dispensation, with an alien people clutching their gods.

I shall be glad of another death".

T. S. Elliot : **Journey of the Magi**

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ শ্রীঅরবিন্দকে নব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী আখ্যা দিয়েছেন।[১] বুদ্ধিজীবী বলতে যদি তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে—প্রজ্ঞা দিয়ে জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করেন তবে রোলাঁ-প্রদত্ত শ্রীঅরবিন্দের এই আখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বস্তুত, বুদ্ধি দিয়ে জগতের অবস্থা-ব্যবস্থা বোঝবার এবং তার গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করবার সাধনায় নবযুগে শ্রীঅরবিন্দ শুধু ভারতে নন, সমগ্র পৃথিবীতেই একরূপ তুলনাবিহীন।

শ্রীঅরবিন্দকে রোলাঁ আবার 'বিবেকানন্দের বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী' ('the real intellectual heir of Vivekananda'), 'নয়া বেদান্তের প্রকৃত ধারক ও বাহক', 'চিতা থেকে উত্থিত বিবেকানন্দের কণ্ঠ' ('voice of Vivekananda risen from the pyre') বলেও বর্ণনা করেছেন;[২] অতএব, রোলাঁর মতে, নব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী স্বামী বিবেকানন্দেরই উত্তরাধিকার বহন করেছেন। অবশ্য এই উত্তরাধিকারকে তিনি যে নিজস্ব অবদানের দ্বারা আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন, তাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তা না হলে তিনি শ্রীঅরবিন্দই হতেন না।

শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব স্বীকৃতি :

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তাঁর ঋণ শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন এবং স্বামীজীর জীবন ও দর্শনের যে মূল্যায়ন তিনি করেছেন তার ছত্রে ছত্রে মিশে আছে এই স্বীকৃতি। স্বামীজীকে তিনি 'নরপতি' ('king among men') বলে অভিহিত করেছেন[৩] এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংরক্ষণের ('preservation through reconstruction') উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং প্রধান প্রবক্তা বলে বর্ণনা করেছেন।[৪] এবং এই দর্শনই হ'ল বহুলাংশে শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব সমাজদর্শন। তিনি লিখেছেন: "রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিরস্মরণীয় নামের সঙ্গে জড়িত আন্দোলন অতীতের ধর্মভাব ও ধর্মসাধনার সার্থক সমন্বয়। ত্যাগ ও সন্ন্যাসধর্মের ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এতে নতুন উপাদানের অভাব নেই।"[৫] শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করেছিলেন যে, বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পরপর পনের দিন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং আর একবার বরোদায় হঠযোগ-সাধনাকালে অনুরূপ অনুভূতি লাভ করেছিলেন, তা মোটামুটি অনেকেরই জানা। সত্যাশ্রয়ী শ্রীঅরবিন্দ

১ Prophets of the New India

২ Ibid

৩ Interview with Dilipkumar Roy ; also Bhawani Mandir

৪ Renaissance in India.

৫ Ibid.

স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি যে, এই সকল ঘটনা ও স্বামীজীর শিক্ষা তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীঅরবিন্দের মতে, স্বামী বিবেকানন্দই সমাজের জাতীয় জীবনের স্রষ্টা ও প্রধান নায়ক। তাঁর আদর্শই আজ ভারতের জাতীয় আদর্শে পরিণত হয়েছে।[৬] ১৯১৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন : "বিবেকানন্দ ছিলেন অতি শক্তিশালী মহাত্মা, অন্যতম পুরুষসিংহ...তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব এখনও আমরা অনুভব করি। কিভাবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তা অবশ্য বলতে পারি না। হয়ত এমন কিছুর মধ্যে যা এখনও রূপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু যখনই দেখি কোন কিছু মহৎ আলোড়ন-কারী অনুভবযোগ্য শক্তি ভারতের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে ক্রিয়া শুরু করেছে তখনই বলি, ঐ দেখ মাতার এবং মাতার সন্তানদের আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও সঞ্চরমান"।[৭]

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে এ ধারণা করা অবশ্য ঠিক হবে না যে, শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটেই পৃথক ছিল না। এ প্রসঙ্গে ডক্টর কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলেছেন, "(স্বামী) বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর (শ্রীঅরবিন্দের) প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল আর (শ্রী) রামকৃষ্ণের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ়তম ভক্তি। তবে তিনি যে বিবেকানন্দের দর্শন বা দৃষ্টি-ভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।"[৮] মোটামুটিভাবে বলা যায়, রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক 'নয়া বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি' বলে অভিহিত শ্রীঅরবিন্দ ঈশ্বর ও সন্ন্যাসধর্মের ধারণায় স্বামী বিবেকানন্দ থেকে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। বিষয়টি অবশ্য আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কিত নয়।

আমাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নব ভারতের এই দু'জন স্রষ্টার প্রতিক্রিয়া। ১৮৯৩ সালে —যে বছর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেন--বিলেত থেকে ফিরেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বন্ধু কে. জি. দেশপাণ্ডে-সম্পাদিত এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'পুরাতনের পরিবর্তে নূতন আলো' ('New Lamps for Old')। শ্রীঅরবিন্দ রচনাটির সূচনা করেন সেই পুরোনো প্রশ্ন দিয়ে : একজন অন্ধ যদি আর একজন অন্ধের হাত ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে দু'জনেরই কি গর্তে পড়বার আশঙ্কা থাকে না? এবং ঘোষণা করেন যে, সূত্রটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।[৯] কংগ্রেস তখন সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব না করে একটা বিশেষ শ্রেণীরই স্বার্থসাধন করছে—এই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং তিনি উপসংহার করেন এই বলে যে, মাত্র সামগ্রিক সমাজ-

৬ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ,—'ধর্ম' পত্রিকা ৩০শে ফাল্গুন, ১৩১৬

৭ Bankim-Tilak-Dayananda

৮ Sri Aurobindo

৯ 7th August, 1893. শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষায়, "The title 'New Lamps for Old' intended to imply the offering of new lights to replace the old and reformist lights of the Congress"—"Sri Aurobindo on himself and on the Mother"

ভিত্তিক জনপ্রিয় আন্দোলনই মহান বলে পরিগণিত ও সফল হতে পারে—কোন সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ আন্দোলন নয়।

কয়েক বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দকে অনুরূপভাবেই কংগ্রেসের শ্রেণী-চরিত্রের (class-character) সমালোচনা করতে দেখা যায়।[১০] তিনি কংগ্রেসের উদ্ভবকে স্বাগত জানালেও ঐ সংগঠন যে জনজাগরণ সংঘটিত করে জাতীয় মুক্তির বাহন হবে, এরকম আশা মোটেই পোষণ করতে পারেননি।

জাতীয় মুক্তির জন্যে শ্রীঅরবিন্দ 'রক্ত ও অগ্নি শুদ্ধির' ('Purification by Blood and Fire)' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।[১১] এই শুদ্ধিমন্ত্রকে স্বামী বিবেকানন্দের 'ত্যাগ ও সেবার' ('renunciation and service') প্রকারভেদ, এমনকি ভিন্ন নামকরণ বলেও বর্ণনা করা চলে। সর্বহারার দলই যে দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তা, একথা শ্রীঅরবিন্দ বারবার বলে গেছেন। তাঁর এই ধারণার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাই 'পুরাতনের পরিবর্তে নূতন আলো' রচনায়, কিন্তু বোধহয় তাঁর এই ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয় দরিদ্রনারায়ণের মুক্তির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে। অন্তত শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকাটি পড়ে এই ধারণাই হয়।

ধারণাটির বিরোধিতা করা গেলেও জাতীয়তাবাদ ও আনুষঙ্গিক ভাবের (ideas) পরিস্ফুটনে শ্রীঅরবিন্দের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবকে অস্বীকার করা কঠিন।

মানবাত্মার মুক্তি :

জাতীয়তাবাদকে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিপ্রয়াসী মানবাত্মার বিরতিবিহীন সংগ্রামের অন্যতম দিক বলেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর যখন মানুষকে বিশুদ্ধ ও স্বাধীন রূপেই সৃষ্টি করেছেন, তখন মানুষ কি আর মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে পারে? সুতরাং জাতীয়তাবাদ (Nationalism) কোন ভাবাদর্শ বা আন্দোলন নয়; জাতীয়তাবাদ মানুষের ধর্ম। অতএব "তুমি যদি জাতীয়তাবাদী আখ্যা পেতে চাও, যদি জাতীয়তাবাদ-ধর্মকে অনুসরণ করতে চাও তবে তোমাকে ধর্মভাবের বিশুদ্ধতা নিয়েই অগ্রসর হতে হবে।"[১২] মাত্র ঐকান্তিকতাই (spirit) শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে; ফলে "মনের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ ও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির মাধ্যমেই আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত ও মহৎ বলে পরিগণিত হতে পারি।"[১৩] অতএব, শ্রীঅরবিন্দের সংজ্ঞায়, "স্বাধীনতা হলো আমাদের নিজস্ব সত্তার বিধিনিয়মকে মেনে চলার স্বাধীনতা, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা, আমাদের নিজস্ব পরিবেশের সঙ্গে বাধাবিহীনভাবে সামঞ্জস্যবিধানের রীতি-পদ্ধতি।"[১৪]

মানবাত্মার মুক্তির ওপর এই যে গুরুত্ব আরোপ (emphasis on the deliverance of human spirit), তা ধর্মচিন্তা ও রাজনীতির মধ্যে গভীর সম্পর্কভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বেরই পরিণতি। স্বামী বিবেকানন্দই যে এই

১০ C. W. VI 426-27

১১ 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত আর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের নাম।

১২ Speeches of Sri Aurobindo

১৩ The Ideal of the Karmayogin

১৪ The Ideal of Human Unity

দার্শনিক তত্ত্বের সূত্রপাত করেন, একথা লালা লাজপত রায় প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন না রেখেই স্বীকার করেছেন।[১৫]

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা :

মানবাত্মার মুক্তি বা আত্মিক মুক্তি মানুষের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ হবার জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতার সকল রূপকেই নির্দেশ করে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারণার ('Ideas of 1789'-- Barker) উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী শব্দ তিনটি আঠার শতকের আন্দোলন-তরঙ্গ-প্রসূত হয়ে আজও যে মানুষের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে চলেছে তার কারণ হ'ল শব্দগুলো সেই পরিণতিই নির্দেশ করে, যে পরিণতির উদ্দেশ্যে মানুষের বিবর্তন চিরকালই অগ্রসর হচ্ছে। এই যে স্বাধীনতা যার দিকে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হচ্ছি তা বন্ধনদশার মুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।..আমাদের দেশের দর্শনে সেই পরিণতিকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।" তাঁর মতে, এই মুক্তির দু'টো দিক আছে: আভ্যন্তর ও বাহ্যিক। আমরা ভারতীয়রা আভ্যন্তর মুক্তির পথে চলেছি; অপর দিকে আমাদের ইয়োরোপীয় ভাইরা চলেছেন বাহ্যিক মুক্তি-অভিমুখে। তবুও আমরা সমান্তরাল ভাবেই চলেছি। "তাঁরা আমাদের কাছে শিখেছেন আভ্যন্তর মুক্তিকে মর্যাদা দিতে, আর আমরা শিখেছি বাহ্যিক মুক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করতে।"[১৬]

অতএব, শ্রীঅরবিন্দের মতে, মাত্র পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাই--আভ্যন্তর ও বাহ্যিক মুক্তির সমবায়ে গঠিত পূর্ণ স্বাধীনতাই—মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারে, কারণ স্বাধীনতা হলো সম্প্রসারণের মূলমন্ত্র। 'স্বাধীনতা ও সম্প্রসারণ' (liberty and growth) সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের এই ধারণা স্বামী বিবেকানন্দকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্তত: দু'জনের চিন্তাধারা যে একই সূত্রে গাঁথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ঐক্যের মন্ত্র :

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আত্মিক প্রকৃতির বলে ঐক্য অভিমুখে প্রসারিত। অর্থাৎ, বিশ্বজনীনতা এই স্বাধীনতার মৌল প্রকৃতির অঙ্গীভূত। ডক্টর কে. আর. আয়েঙ্গারের ভাষায়, "প্রথম থেকেই শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ব্যক্তি-মুক্তির মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জগৎকে তার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে একক মুক্তির প্রচেষ্টা অপেক্ষা অকাম্য আর কিছু শ্রীঅরবিন্দের ছিল না।"[১৭] ফলে তিনি জাতীয়তাবাদের বিমূর্ত লক্ষ্য স্বরাজকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার পরিপূর্ণতা বলেই বর্ণনা করেছেন[৮] এমনকি রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণের বহুদিন পরে —১৯২১ সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "আমাদের যোগ-সাধনা আমাদের নিজেদের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। ব্যক্তি-মুক্তি এর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হ'ল সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।"[১৯] এই ঘোষণা কি স্বামী বিবেকানন্দের সেই সুবিখ্যাত

---

১৫ Lajpat Rai: Young India—Nationalist Movement; also Valentine Chirol: Indian Unrest

১৬ Speeches, above

১৭ Op. cit.

১৮ Dr. R. C. Majumdar: History of Freedom Movement, I

১৯ The Yoga and its Objects

উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় না : "তুমি বা আমি মুক্তি লাভ করি, না করি, তাতে কি যায় আসে? আমাদের পক্ষে সারা জগৎকে যে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে হবে।"[২০]

শ্রীঅরবিন্দের মতে, স্বাধীনতা আজ বিশেষ সঙ্কটে পতিত এবং এর কারণ হলো ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে, সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ঐক্যভাবের অভাব একমাত্র যে ঐক্যভাবই স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলতে পারে। "যদি প্রকৃত আত্মিক ও মানসিক ঐক্যভাব গড়ে তোলা যেত তবে স্বাধীনতার কোন সঙ্কটই থাকত না," কারণ মুক্ত ব্যক্তিসমুদয় ঐক্যের আকর্ষণে নিজেদের সম্প্রসারণের সঙ্গে অপরের সম্প্রসারণের সামঞ্জস্যবিধান করত।[২১]

স্বাধীনতা, ঐক্য এবং সম্প্রসারণের (growth) মধ্যে এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক-নির্দেশ—এ কি স্বামী বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তেরই বাণী নয়?

ভারতের জীবনবেদ :

শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্বে, জাতি হিসাবে ভগবৎ-ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে ভারতকে তাঁর পুনরুদ্ধার করতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আত্মিক ঐক্যের উপলব্ধিই আত্মার পুনরুদ্ধারের মন্ত্র। এই মন্ত্র আবার ভারতের মুক্তি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্প্রসারণের চাবিকাঠিও বটে। অন্যভাবে নিতে গেলে, ভারতের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের প্রকৃতি হবে সম্পূর্ণ আভ্যন্তর (growth from within)। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যক্তিধর্ম ও গোষ্ঠীধর্মের ('individual and group Dharmas') প্রতিবন্ধকহীন অভিযানের জন্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করবেন, তা সহজেই অনুমেয়।[২২]

স্বভাবতই শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী, যদিও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বিজয়কে স্বাগত জানাতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই।[২৩] তাঁর মতে, অনুকরণ-প্রবণতা সম্পূর্ণ অ-ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, এবং এই কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে যে অনুকরণের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ কৃত্রিম।[২৪] ঐ অনুকরণ গীতার উপদেশ যে স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয় তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ভারতে আর এক ইয়োরোপের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। "স্বধর্মে মৃত্যু আনে নূতন জীবনের সম্ভাবনা, আর পরধর্মাচরণে মৃত্যু ঘটলে তাকে আত্ম-হত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।"[২৫]

তবে শ্রীঅরবিন্দ মোটেই নৈরাশ্যবাদী নন, কারণ আশাবাদই যে নয়া বেদান্তের মর্মবাণী। সকল অন্ধকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি নূতন উষার আলোকই দেখেছেন, যে-উষা প্রভাতে রূপান্তরিত হলে ভারত জগৎকে দেখিয়ে দেবে যে "সনাতন ভারত মৃত নয়। শেষ কথাটি সে আজও বলেনি। ভারত দেখিয়ে দেবে যে, সে এখনও বেঁচে এবং শুধু তার নিজের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তার কিছু করণীয় আছে।"[২৬]

---

২০ Swami Nikhilananda : Vivekananda—A Biography

২১ The Ideal of Human Unity, Op. cit.

২২ D. M. Brown : White Umbrella

২৩ Rohand : Prophets of the New India, op. cit.

২৪ The Spirit and Form of Indian Polity

২৫ The Ideal of Karmayogin

২৬ The Spirit and Form, above

অতএব শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের জাতীয়তাবাদের পরিণতি ঘটবে বিশ্বের সেবায়। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় ভারতকে হতে হবে 'বিশ্বের সেবক' ('servant of humanity')

যেহেতু সম্প্রসারণই মানবাত্মার বৈশিষ্ট্য, সেইহেতু মুক্ত মানবাত্মা কোন বাধা না মেনে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আত্মিক ঐক্যসাধনে অগ্রসর হয়। এরই অপর নাম হ'ল আত্মাকে—মানুষের প্রকৃত সত্তাকে জাগ্রত করা ('waking up the Atman or the real Self of man')। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস যে, এ-ব্যাপারে চাবিকাঠিটি ভারতের হাতে রয়েছে। চাবিকাঠিটি অবশ্য অতীত থেকে সংগ্রহ করা, এবং মরিচা পড়ার দরুন তা খানিকটা অকেজো হয়ে পড়েছে। কিন্তু আবার একে পালিশ করে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। সুতরাং অতীতের মধ্যে আবার বেঁচে কিন্তু বর্তমান থেকে সকল প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে ভারত বিশ্বসেবার কর্তব্য পালন করতে সমর্থ হবে—এই হলো শ্রীঅরবিন্দ-দৃষ্ট ভারতের জীবনবেদ। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি করে যাব। "মানুষের মনৈশ্বর্যের ক্রমবিকাশে মহান অতীত নিশ্চয়ই অনুসৃত হবে মহত্তর ভবিষ্যতের দ্বারা।"[২৭] এর জন্যে ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে গুহা ও মন্দির থেকে বাইরে নিয়ে এসে নূতন জগতের নূতন নূতন শক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে," যাতে ঐ আধ্যাত্মিকতা সমগ্র জগতের দিকে হাত বাড়াতে পারে।[২৮]

অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে এই জেহাদ, ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর এই গুরুত্ব আরোপ, ভারতের বিশ্বসেবা সম্বন্ধে এই ধারণা—সবই বহুলাংশে স্বামীজীর প্রতিধ্বনি বা 'চিতা থেকে উত্থিত স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর' বলেই মনে হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও শ্রীঅরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনীয়। স্বামীজী বলেছিলেন, "আমাদের অতীত মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎকে মহত্তর— আরও মহত্তর হতে হবে।"[২৯]

উপসংহার :

অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ যে স্বামী বিবেকানন্দতেই ফুরিয়ে যাননি, সে কথা আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে। নয়া বেদান্তকে দার্শনিক পূর্ণাঙ্গতার দিকে আরও নিয়ে গিয়ে তিনি এক দিব্য জীবনের (Life Divine) ধারণা করেছেন - যে দিব্য জীবনের উপলব্ধি এই মাটির পৃথিবীতেই—সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই সম্ভব। এ-ব্যাপারেও কি শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজীকে স্মরণ করিয়ে দেন না ?

---

২৭ As quoted by Dr. Iyenger, op. cit.

২৮ Rolland : Prophets, above

২৯ C. W. IV. (Reply to Calcutta Address)

স্বামীজী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

অধ্যাপক রেজাউল করীম

স্বামীজীর যুগ আর আমাদের যুগ—এই দুই যুগের মধ্যে আছে শতাধিক বছরের ব্যবধান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের তথা জগতের অবস্থা কি ছিল? আর আজ এই ১৯৭২ সালে সেই ভারত তথা সেই বিশ্বজগৎ কোন্ অবস্থায় উপনীত হয়েছে? শতাধিক বছরের মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক বিষয়ে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মনে হবে যে, আজকের ভারত যেন একটা নূতন ভারত। এই নূতন ভারত গড়তে যাঁরা অক্লান্ত সাধনা করেছেন, নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের পুরোভাগে অবস্থান করবেন ও ইতিহাসে লাভ করবেন চিরস্থায়ী আসন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বুকে বিদেশী শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারই সঙ্গে এল পাশ্চাত্য-সভ্যতার মাদকতাময় প্রভাব। ভারতবর্ষ পশ্চিম দেশের জড়বাদী সভ্যতার মোহে ডুবে গেল। পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুকরণ, পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে আত্মনিমজ্জন ও পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার নিকট আত্মসমর্পণ—এই ভাবেই ভারতের শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ নিজেদের আত্ম-সত্তা হারিয়ে ফেললো। বিদেশী প্রভুদের সাহায্যে নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির কথাই তারা বেশী করে চিন্তা করতে লাগলো। সমাজের যখন এরূপ অবস্থা, তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ঘটে। যুগে যুগে ভারতের প্রয়োজনের সময়ই মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। অতীতে দেখা গেছে দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দুর্দশার দিনে ভারতে শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, দাদু প্রমুখ মহামানবের উদ্ভব হয়েছিল। তাঁরা মহৎ আদর্শ স্থাপন করে মানুষের উদ্ধার সাধন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতেও দেশের দুর্দিনে পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মহৎ উদার ও আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা নবযুগ প্রবর্তন করেন। পরমহংসদেব তাঁর অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণ করার ভার অর্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দের উপর। তাই দেখি বিবেকানন্দের কাজ হ'ল ঠাকুরের আদর্শ ও শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়া—শুধু ভারতেরই নয়, সারা বিশ্বে ভারতের মহৎ আদর্শ ও ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন স্বামীজী। বস্তুতঃ ঠাকুরের প্রেরণায় বিবেকানন্দ এমনভাবে নিজেকে তৈরি করলেন যে, কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকলো না। স্বামীজী পশ্চিমদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে তাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে পশ্চিমী সভ্যতা শতচেষ্টা করেও তার জড়বাদী জীবনদর্শন দিয়ে ভারতবর্ষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

বিবেকানন্দ ছিলেন ধনীর সন্তান। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলিকাতার নাম করা এটর্নি। প্রচুর রোজগার করতেন। মাতা ভুবনেশ্বরী ছিলেন একান্ত ধর্মনিষ্ঠ মহিলা। এই পরিবারের মহৎ পরিবেশের মধ্যে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তর্কশাস্ত্র বলে কোন ব্যক্তির নামের কোন connotation নাই। কিন্তু পিতা-মাতা অনেক সময় তাঁদের ছেলেমেয়েদের এমন নামকরণ করেন যার সার্থকতা তাঁরা নিজেদের কর্মগুণে প্রমাণ করেন। "নরেন্দ্রনাথ" এই

নামটিও বহু সার্থকতা-ও ব্যঞ্জনাময়। উত্তর-কালে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সত্যই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ, সত্যই তিনি সকল মানুষের হিতকারী বন্ধু। শুনা যায় যে, বাল্যকালে নরেন্দ্র অত্যন্ত দুষ্ট ও চঞ্চল ছিলেন, সমবয়স্ক ছেলেদের তিনি ছিলেন স্বাভাবিক নেতা। কিন্তু তাঁর ছিল অপার প্রতিভা। এবং প্রতিকাজে ও কথাবার্তায় তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। লেখাপড়ায় তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখালেন, তেমনি খেলাধুলা প্রভৃতিতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সমবয়স্ক ছেলেদের তিনি হয়ে পড়লেন স্বাভাবিক "নেতা"। তাঁর ছিল অসীম তেজ, বিপুল সাহস ও সকল কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন অশান্ত, দুর্দান্ত ও চঞ্চল। কিন্তু কখনও কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। যা কিছু পেতেন তাই দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করতেন। লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে অপরবিধ বহু কাজের মধ্যে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি একজন অদ্ভুত বালক। তাঁর সমবয়স্ক ছেলেরা নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকাদি পড়ত না। কিন্তু নরেন্দ্র তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন না। তাঁর পড়ার আগ্রহ ছিল প্রবল। তাই দেখি অল্পায়াসেই তিনি বহু পুস্তক পাঠ করলেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব—এসব বিষয় তিনি গভীর-ভাবে অধ্যয়ন করলেন। এবং বয়সের তুলনায় গভীর জ্ঞান অর্জন করলেন। তিনি যদি দেশ-প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে চলতেন তবে বৈষয়িক দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি করতে পারতেন। বাবার মতো মস্ত বড় ব্যবহারজীবী অথবা বড় অধ্যাপক অথবা বড় একটা চাকুরিয়া অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে একটা হোমরা-চোমরা হ'তে পারতেন। সাংসারিক জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে একটা দিক্‌পাল হ'তে পারতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, তিনি তাঁকে দিয়ে আরও বড় কাজ করাতে চাইলেন। ত্রিকালজ্ঞ বিধাতাপুরুষ যেন পূর্ব হ'তেই ঠিক করে রেখেছিলেন এক মহৎ কার্যসাধনের জন্য তাঁকে আত্মনিয়োগ করাবেন। তাই যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় তবে কে তাঁকে বাধা দিতে পারে? কোন পার্থিব সুখ-সুবিধা ও ঐশ্বর্যের মোহ তাঁকে সংসারের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে? মহত্তর কাজের আহ্বান এল, তিনি সুদূরের সেই দৈব আহ্বানে সাড়া দিলেন—পিতামাতার আদরের সন্তান নরেন্দ্রনাথ হয়ে পড়লেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

কলেজে অধ্যয়নের কালে তিনি নানা-বিষয়ক পুস্তকাদি পড়তেন। দর্শনশাস্ত্রের যে কোন বই হাতের কাছে পেতেন তাই গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তেন। সেকালে দার্শনিক "ডেকার্টের" দর্শনতত্ত্ব নিয়ে ছাত্রমহলে বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ডেকার্টের "সন্দেহবাদ" অনেক তরুণ যুবককে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। প্রথম জীবনে ডেকার্টের মনে যে জিজ্ঞাসা জেগেছিল, স্বামীজীর মনেও সেই ধরনের জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো। কিছুদিন সন্দেহ ও দ্বিধার মধ্যে তাঁর কেটে গেল। একদিন যেমন ডেকার্টের সন্দেহ কেটে গেল এবং তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে—Cogito ergo sum—I think, therefore, I am—আমি চিন্তা করি, অতএব আমারও একটা অস্তিত্ব আছে—ঠিক তেমনি বিবেকানন্দেরও সমস্ত সন্দেহ দ্বিধা সহসা কেটে গেল—তাঁর সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর

হল—একজন মহান মানুষের পদাশ্রয়ে আত্ম-সমর্পণ করে। তিনি এমন এক মানুষের সঙ্গ লাভ করলেন, যাঁর স্পর্শে তাঁর সমস্ত জিজ্ঞাসার সদুত্তর পেলেন। "ঈশ্বর আছেন কি? ঈশ্বরকে লাভ করা যায় কি? তাঁকে দেখা যায় কি?" এই সব প্রশ্ন তাঁর মনকে অহরহ ধাক্কা দিতে লাগল। এই আধ্যাত্মিক অস্থিরতা তাঁকে নিয়ে গেল নানাবিধ চিন্তার গোলকধাঁধার মধ্যে। তিনি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করলেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে সমাজে যে-সব ধারণা প্রচলিত আছে তার দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে না। অন্ততঃপক্ষে তাঁর মনে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সদুত্তর পাওয়া যাবে না। কবি ম্যাথু আর্নল্ড্ তাঁর স্বর্গগত পিতার উপর শোকগাথায় সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে বলেছেন—

"Most men eddy about
Here and there—eat and drink,
Chatter and love and hate,
Gather and squander, are raised
Aloft, are hurl'd in the dust,
Striving blindly, achieving
Nothing; and then they die—
Perish! and no one asks
Who or what they have been
More than he asks what waves,
In the moonlit solitudes mild
Of the midmost ocean, have swell'd,
Foam'd for a moment and gone."

তাঁর যুগে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনের অবস্থা ছিল কতকটা এইরূপ। কিন্তু বিবেকানন্দ তো এদের মত হ'তে পারেন না। অস্থির হয়ে উঠলেন মানুষের অবস্থা দেখে। কি করলে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ হয়—এই চিন্তা তাঁকে অধীর করে তুললো। তিনি বিচলিত হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন কোথায় গেলে শান্তি স্বস্তি পাওয়া যাবে। কে তাঁর সকল সন্দেহের অবসান ঘটাবে। বহু সন্ধানের পর অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলেন—"শেষে অবেলায় অপরাধী প্রায় তোমারি দুয়ারে এসেছি"—ঠিক "অবেলায়" বলব না। তিনি বরং যথাসময়েই ঠাকুরের পদপ্রান্তে এসে ঠাকুরের বচন-সুষমা পান করে ধন্য হলেন। তাঁর জিজ্ঞাসারও সদুত্তর লাভ করলেন। ঠাকুরকে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন—"ঠাকুর, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?" এই প্রশ্ন তিনি আরও অনেকের নিকট করেছিলেন। কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে পারেনি। ঠাকুর কিন্তু এতটুকু দ্বিধা না করে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন, "হাঁ। দেখেছি, তোমাকে যেমন করে দেখছি তেমনিভাবে দেখেছি। এবং তোমাকেও দেখাতে পারি।" ঠিক স্পষ্ট উত্তর শুনে তিনি তো স্তম্ভিত। এমন সুদৃঢ় স্পষ্ট কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর পূর্বে কেউ তাঁকে শুনাতে পারেনি। এ যেন একেবারে নূতন কথা। তারপর অভূতপূর্ব পরিবর্তন হ'ল, পরশমণির স্পর্শে নূতন মানুষ হলেন। কিংবদন্তীর ফিনিক্স পাখীর মত পূর্ব সত্তাকে ভস্মীভূত করে নবজন্ম লাভ করলেন।

পরমহংসদেব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন: কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর? বনে জঙ্গলে? পর্বত-গুহায়? মন্দিরে দেবালয়ে? পরম সত্তাকে বাহিরে কোথাও খুঁজে পাবে না। তাঁকে খুঁজতে হবে নিজের অন্তরের মধ্যে। অগণিত গণ-মানবের সেবাই তো হ'ল ঈশ্বরের পূজা। কতদিন কত লোকের কাছে তিনি ঘুরাঘুরি করেছেন—কিন্তু কেউ তো তাঁকে একথা বলেনি! কেউ তো এমন মোক্ষম শিক্ষা দেয়নি! সত্যই আজ তিনি উপলব্ধি করলেন

যে, এই মহান্ যুগমানবই তাঁকে প্রকৃত আদর্শ দিতে পারেন। ইনিই তাঁর প্রকৃত গুরু হ'তে পারেন। আজ তিনি সকল দুয়ার হ'তে ফিরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে আশ্রয় নিলেন। ঠাকুরের নিকট তিনি নূতন মন্ত্রে, মানবসেবার মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তিনি সকল প্রকার দার্শনিক তত্ত্বে আগ্রহহীন হয়ে পড়লেন। তিনি সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে আরম্ভ করলেন। তিনি এই বুঝলেন যে, দর্শনের তত্ত্ব বা শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে হবে মানব-সমাজের বাস্তব-সমস্যার ক্ষেত্রে। মানব-সমাজের মধ্যে অধিকতর ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি পরমহংস-দেবের প্রতিটি বাণীর যথার্থ তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করলেন। ঠাকুরও তাঁর হস্তে মূল কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন।

ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর স্বামীজী তাঁর অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এখন তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হ'ল ঠাকুরের আদর্শকে রূপায়িত করা; সে আদর্শ সংসারবিরাগী হয়ে বনগমন নয়, সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নয়, কেবল নিজের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বা মুক্তি নয়, সে আদর্শ হ'ল—"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র ব্রতকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।—মানব-জীবনের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে নূতন চিন্তা সঞ্চার করা। কূপমণ্ডূকের মতো ঘরের মধ্যে বসে থাকলে সে আদর্শ পালিত হবে না। তাই স্বামীজী প্রথমে সারা ভারত পরিভ্রমণ করে ভারতের সর্ব শ্রেণীর ও সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারা কিভাবে জীবন-যাপন করছে, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক কি? তাদের দারিদ্র্যের কারণ কি? সেই দারিদ্র্য দূর করার উপায় কি? এইসব তিনি জানতে চাইলেন। এবং জানলেনও অনেক কিছু। দরিদ্রের সঙ্গে মিশলেন, দীনের কুটিরে দীন-দরিদ্রের সঙ্গে বাস করলেন। স্বচক্ষে তাদের দুর্দশা দেখলেন। আবার ধনীদের প্রাসাদেও তাদের বিলাস আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনও দেখলেন। আবার সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিতও পরিচিত হ'লেন। এই ভাবে সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় লাভ করলেন। প্রথমে ভারতের সহিত, পরে বিশ্বের সহিত তাঁর মিশনের আসল সম্পর্কটা কি হ'তে পারে—এইসব কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। বহু লোকের সহিত এ বিষয়ে বহু আলাপ আলোচনা হ'ল। যে-কোন ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এল সেই উপলব্ধি করল যে, এই কপর্দকহীন গৈরিকবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসী নন। ঈশ্বরের প্রেম ও মানবপ্রেমে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। এ সন্ন্যাসী এমন একজন লোক যিনি চান আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমন্বয়সাধন করতে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে এক সর্ব-ধর্ম-সভার আয়োজন হয়েছিল। এই মহাসম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রতিনিধিগণ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ হতেও প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ধর্মসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হবার জন্য অধিকতর যোগ্যতা কার আছে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠেছিল। তখন অনেকের দৃষ্টি পড়ল স্বামীজীর উপর। তিনিই এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভারতের সত্যকার প্রতিনিধি হবার উপযুক্ত। তিনি এমন একজন লোক যিনি কোন ধর্মকে ঘৃণা করেন না,—সকল ধর্ম সম্বন্ধে যাঁর মত অত্যন্ত উদার। তিনি doctrine of

exclusive salvation-এ বিশ্বাস করেন না। তাঁর মনে ছিল সত্যকার ধর্মবোধ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁকে কোন স্বীকৃত ধর্ম-প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করল না। তিনি নিজেই যে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এত প্রচণ্ড যে, ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত হবা মাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেখানে তিনি কম্বুকণ্ঠে যে ভাষণ দিলেন তা অদ্ভুত, অচিন্তনীয় ও অদ্বিতীয়। তাঁর এই অপূর্ব ভাষণে ধর্ম-সভার শ্রোতৃবর্গ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই ভাষণে তিনি এই কথাই বললেন যে, পৃথিবীতে কোন মানুষ পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। মানুষের জন্য আছে অমরত্ব। তাই তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করলেন উদার বিশ্ব-ধর্ম গ্রহণ করার জন্য—তাতে জাতিভেদ নেই, ধর্মভেদ নেই, দেশ-ভেদ নেই। অমরতার অধিকার সকল মানুষের আছে। ভারতের ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি কোন ক্ষুদ্র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ আদর্শ সকল মানুষের একত্ব-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেহ পর নয়, সবাই আমার পরমাত্মীয়। এই উদার ভাব বহু ধর্ম থেকে চলে গেছে। আজ থেকে এ কথাই ঘোষণা করা হোক—বিভিন্নতা নয়, মানব-সমাজে ঐক্যপ্রতিষ্ঠাই হোক সকল ধর্মের সাধনা।

আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি আমেরিকাতে ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করলেন। এতদিন কেউই ভারতের মর্মকথা ভাল করে জানত না। তাদের ধারণা ছিল ভারতবর্ষ একটা অসভ্য দেশ। ইউরোপ এদেশকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু স্বামীজী যখন প্রাচীন ভারতের গৌরব-কথা নানা প্রমাণ দিয়ে বুঝালেন তখন তারা সত্যকার ভারতকে চিনতে পারল। হাজার হাজার বছর পূর্বে ইউরোপে যখন সভ্যতার লেশ মাত্র ছিল না, তখন ভারতের বুকে এক অনবদ্য সভ্যতার আলো প্রজ্বলিত হয়েছিল

স্বামীজী হয়ে পড়লেন ইউরোপ-আমেরিকার মধ্যে ভারতের বেসরকারী দূত—শান্তির দূত, আদর্শের দূত, মহিমার দূত। তাঁর মুখ থেকে পশ্চিমদেশের লোক যখন বেদান্তের বাণী শুনলো তখনই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইউরোপ জয় করে যখন তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করলেন তখন ঘোষণা করলেন যে, এবার তাঁর কর্মকেন্দ্র হবে ভারতবর্ষ। এই ভারতের মঙ্গলের জন্য তিনি কত তপস্যা ও সাধনাই না করেছেন! অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, প্রাচীনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন। ভারতের তথা বাংলাদেশের মধ্যে এমন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না যিনি স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হননি। দেশের তরুণদের উপর তাঁর অপার প্রভাব। পরবর্তী যুগে গোটা বাংলাদেশে সমাজ-উন্নয়নমূলক যে-সব আন্দোলন হয়েছে তাতে তাঁর দানের সীমা নেই। আনুষ্ঠানিক দিক ব্যতীত ধর্মের যে একটা নৈতিক ও বৈপ্লবিক দিক আছে সেটা স্বামীজী যেমন করে ব্যাখ্যা করেছেন—নিজের জীবনের বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে, তেমনটি আর কেউই পারেনি। পরমহংসদেবের সমুদয় আদর্শকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়েছেন। এই দুই মহামানবের একজনকে বাদ দিয়ে অপর-জনকে চিন্তা করতে পারি না। হে মহামানব! তোমরা দেশের জড়তা দূর করেছ, অন্ধকার ভেদ করে আলো এনেছ, কল্যাণ এনেছ, শুভবুদ্ধি এনেছ। আজ তোমাদের অন্তর দিয়ে প্রণাম করি। সার্থক হোক তোমাদের সাধনা, পূর্ণ হোক তোমাদের মহান ব্রত।

চেরাপুঞ্জীর মেঘ

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

আজ বিকেলে কলকাতার পশ্চিম আকাশে ঘন নীল হয়ে মেঘ জমেছিল। বাতাসে জলের ছোঁয়া প্রায় হাতের কাছে পৌঁছে গেল। তারপরেই খেয়ালী হাওয়ায় মেঘেরা ছত্রখান হয়ে দক্ষিণমুখে পাড়ি দিয়ে উধাও। পলাতকা বৃষ্টির সম্ভাবনাময় রূপ আমাকে চেরাপুঞ্জীর কথা মনে করিয়ে দিলে।

ছোট বেলায় ভূগোল পড়তে গিয়ে, আজকের দিনে যাঁরা মধ্যবয়সী, তাঁরা কে-না চেরাপুঞ্জীর নাম মুখস্থ করেছেন? শৈশব-স্মৃতিতে কালিদাসের মেঘদূতের চেয়ে অনেক বেশী করে যে নামটি বৃষ্টিমুখরতায় ধ্বনিত—সে ওই চেরাপুঞ্জী! আসাম কোথায় কোথায় সুদূর খাসিয়া পাহাড়—আর সেই খাসিয়া পাহাড়ের শিলং পেরিয়ে পাহাড়ী সড়কের দুর্গমতাকে নির্ভয়ে মেনে নিয়ে- একদিন এসে পৌঁছানো যাবে চেরাপুঞ্জীতে! ভাগ্যের এ বিস্ময়ও একদিন সম্ভব হলো! চারদিকের ঘন নীল অন্ধকারের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোক-বিন্দুতে উদ্ভাসিত শৈলভূমির রূপরেখা—পাশে বসে চেরাপুঞ্জী-আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ আমায় একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, "ওই দেখো—চেরাপুঞ্জী!"

আজকের দিনে সময় কিছু নয়! কে বলবে আজই সকালে বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে ভোরবেলায় কোনোমতে চা খেয়েই আমি আর রথীন দমদমে প্লেন ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম! অত ভোরে নির্জন পথের উপর ভোরের নীল ছায়া ক্রমে যখন রৌদ্রাভ হয়ে উঠছে, তখনো সন্ত-জাগা কলকাতায় ট্যাক্সিওয়ালাদের ঘুম ভাঙেনি। একের পর এক বাস ছুটে চলেছে। কিন্তু পাল্লা দিয়ে সময়ের সঙ্গে আমরা চাইছি ট্যাক্সিতে উত্তীর্ণ হ'তে।

ব্যস্ত সন্ত্রস্ত বিব্রত তিনটি মানুষকে নিয়ে অবশেষে ট্যাক্সি যখন দমদমে এসে পৌঁছুলো, তখন দেখা গেলো সময়ের যথেষ্ট আগেই এসে গেছি। অত ব্যস্ত না হলেও চলতো। কিন্তু আসল ব্যস্ততা তো মানুষের মনে। ওই মুহূর্তে কলকাতায় থাকলেও, আসলে আমাদের মন ছিলো চেরাপুঞ্জীতে।

প্রসারিত এরোপ্লেনের ডানার ফাঁকে একে একে কলকাতার মানচিত্র সরে গেল, পূর্ববঙ্গের নদীরূপমালাধৃত প্রান্তর উধাও হয়ে গেল। মাইলের পর মাইল সবুজের সমারোহ নিয়ে এলো আসামের পর্বতমালা। কখনো তারা সাদা মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন, কখনো সর্ব-দেহের তৃণরোমাঞ্চে ও পল্লবিত অরণ্যানীর ঊর্ধ্ববাহু প্রার্থনায় ছন্দিত, কখনো সবার অলক্ষ্যে ঝরে-পড়া কোনো নির্ঝরিণীর সমুদ্র-স্বপ্নের নীরব সাক্ষ্যে আনন্দিত।

তারপর একসময় আবার শহর—আবার ছবিতে-আঁকা নক্সার পরম্পরা—গৌহাটির বিমানক্ষেত্র··দূর থেকে আন্দোলিত দুটি হাতে প্রত্যাশিত অভিনন্দন—অনেক অচেনা মানুষের মধ্যে একটি দুটি চেনামুখ।

শিলঙে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে এলো। তারই মধ্যে যেটুকু চোখে পড়লো তার নয়ন-জুড়ানো নীলাঞ্জন কেউ লক্ষ্য না করে পারে না! তবু পাইনের বীথির মধ্য দিয়ে মোটর

গাড়ী যখন শিলঙের সীমানা পার হলো, তখনই যেন লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দে নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এলো।

শিলঙ পার হবার মুখে অস্তগোধূলির আলোয় ভীড় করে আসা মেঘের দল পথের উপরে আচম্‌কা বৃষ্টির সমারোহ নিয়ে জানিয়ে দিলে এখান থেকে তাদেরই রাজত্ব। আমরা মেঘলোকে প্রবেশ করলাম—কোনো সন্দেহ নেই, স্বয়ং কালিদাস এ অঞ্চলে এলে মেঘের অন্তর্লোকের রহস্য আমরা আরো বেশী জানতে পারতাম!

বলছিলাম, সময় এমন কিছু নয়! সকালে কলকাতা, সন্ধ্যায় শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জীর পথে! চেরাপুঞ্জীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এসে যখন পৌঁছুলাম, তখন প্রথম প্রহর প্রায় উত্তীর্ণ! তবু ছোট ছোট খাসিয়া ছাত্রেরা ভীড় করে আশ্রমপ্রাঙ্গণে অতিথিদের অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো। তাদের আনন্দময় মুখমণ্ডলে এমন কিছু ছিল, যা এতক্ষণের পথশ্রান্তি নিমেষে দূর করে মানবহৃদয়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে নবাগতকে বরণ করে নিতে পারে।

*

সমতলের অধিবাসী আমাদের যদি খাওয়াদাওয়ার পর কিছুটা চড়াই ভেঙে শোবার ঘরে পৌঁছুতে হয়, তাহলে অস্বস্তি হওয়া আশ্চর্য কি! না, তেমন কিছু নয়। তবু খাবার ঘর থেকে অতিথির ঘরের দিকে ঘাড় হেলিয়ে চাইতে হয়। আর রাতের নির্জনতায় যখন ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মনে করা যায় বিশাল একটি কাঠের বাড়ীর মধ্যে একান্ত একলা একটি প্রাণী আর বাইরে আকাশভরা অন্তহীন মেঘের আলোড়ন—তখন সবটাই সুখকর ও রোমাঞ্চকর ভাবতে পারলে ভালোই, না পারলেই যা মুস্কিল! অতো ক্লান্তির পরে স্বভাবতঃই নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু ঘুম আসতে না আসতেই এলো বৃষ্টি!

সে বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা কোনো বৃষ্টিরই মিল নেই। যেন সমস্ত আকাশ বৃষ্টি হয়ে একসঙ্গে শ্লেটপাথরের ছাদের উপর ভেঙে পড়ে সব কিছুকে উধাও করে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সুরে এক গতিতে সমানে ঝরে পড়তে লাগলো। চারদিক থেকে বিদ্যুতের ঝলক এসে সমস্ত জানালায়, দরজায়, শার্সিতে, কাঠের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে তীব্র কশাঘাত করে চললো। কোনো প্রস্তুতির অপেক্ষা না রেখেই পূর্ণ উদ্যমে নটরাজের তাণ্ডব আকাশ বাতাস অরণ্যের মিলিত আবর্তনে মুখর হয়ে উঠে এক সময় কখন আমাকে ঘুমের অতল গহ্বরে ফেলে দিয়ে চেরাপুঞ্জীর প্রথম রাত পার করে চলে গেলো।

*

সকালে চায়ের আসরে বসে শোনা গেল, আমার ভাগ্য ভালো, এ বছরে চেরাপুঞ্জীতে বৃষ্টি কম! তাই পথে আসতে তত কষ্ট হয়নি, আর রাতে যে বৃষ্টি আমি দেখিনি, শুনেছি, তেমন বৃষ্টি একটানা সাতদিন হওয়াও এখানে কিছুই আশ্চর্য নয়। তার চেয়ে ঢের কম সময়—মোটে তিন চার ঘণ্টা হয়ে সে বৃষ্টি একটি উপকার করেছে। এক্ষুণি আশ্রমের গাড়ীতে বেরিয়ে পড়লে অদূরে 'মস্‌মাই' জলপ্রপাত দেখতে পাওয়া যাবে। বৃষ্টি হলেই ঝর্ণার রূপ খোলে। সুতরাং আজকের প্রথম কাজ 'মস্‌মাই' দর্শন।

তার আগে ভোরবেলায় খাসিয়া ছেলেদের সমবেত কণ্ঠে বাংলা গানের সুরে খাসিয়া ভাষায় সুন্দর ভজন শুনেছি। স্বল্প পরিসরে

ঠাকুরঘরটির শান্ত সমাহিত ধ্যান-তন্ময় পরিবেশের স্পর্শ পেয়েছি। অদূরে ছোটদের কলকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত ধ্বনিতরঙ্গ ঝরে পড়ছে। যাঁরা এ অঞ্চলে কিছুদিনও থেকেছেন, তাঁরাই জানেন—এসব দেশ গন্ধর্ব-কিন্নরের দেশ। গান এখানে মানুষের কণ্ঠে সহজাত। আর তাদের এই সঙ্গীত-প্রতিভাকে তাদেরই ভাষায় ঝঙ্কৃত করেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সঙ্গীত-ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ।

আশ্রমের গাড়ীতে এসে 'মস্‌মাই'য়ের অদূরে পথের প্রান্তে নামলাম। সকালের আলো কখন মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। নিচে বহু নিচে পাহাড়ের অতল খাদ থেকে ধীরে ধীরে মেঘের কুয়াশা এসে সামনের বহুদূর ঢেকে দিয়ে বিসর্পিত ভঙ্গিমায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু অজস্র জল-পতনের শব্দে মনে হয় কাছেই কোথাও কিছু ঘটে চলেছে। কী হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, বুঝতে বুঝতে সামান্য একটু মেঘের পর্দা সরে গিয়ে একে একে জলের ধারাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সাত-আটটি ধারায় বিভক্ত এ জলধারা যেন স্বপ্নমগ্ন কয়েকটি অপ্সরী, স্বর্গ-ভূমিতে ফেলে-আসা অতীতের স্মরণে ব্যথাতুর হয়ে এক নিরুপায় বেদনায় ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের পরপারে। একটি ধারার সঙ্গে আর একটি ধারা কখনো বা মেঘের সংলগ্নতায় একাকার হয়ে বেণীবন্ধ রচনা করে চলেছে। আবার মুক্তবেণীর উচ্ছ্বসিত গতিবেগে ছুটে যেতে যেতে বাদল হাওয়ায় ফেনায় ফেনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শূন্যতার বুকে মুক্তার মরীচিকা জাগিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কখন কলতানের ঐক্যসঙ্গীত সপ্তকন্যার মিলিত নৃত্যের আভাসটুকু এনে দিয়েই মেঘের আড়ালে নিজেদের ঢেকে দিলে।

তবু আমি কৃতজ্ঞ, অনন্ত সুন্দরকে আজ এই মুহূর্তে আমার সামনে এনে তুলে ধরেছিল 'মস্‌মাই'—আমি জানি, বেঁচে থাকলে তাকে আবার আমি পাবো।

*

পথে যেতে যেতে চারদিকে কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দলের অসঙ্কোচ দৃষ্টির সামনে পড়ে আর এক অনুভূতি জাগছে মনে। চেরাপুঞ্জী শুধু যে বৃষ্টির দেশ, ঝর্ণার দেশ—তাতো নয়, এ নিরন্তর হাসির দেশ। কতো সহজে, কতো সামান্য খুশিতে মানুষ এখানে প্রাণভরে হাসতে জানে। হয়তো এদের চাওয়া সীমাবদ্ধ, হয়তো এদের পাওয়া সহজসাধ্য। তার চেয়েও বেশী, এখানকার জগৎ সংসারের মধ্যমণিরূপে নারীর নিজস্ব ভূমিকাটুকু সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ততা বর্জন করে পুরুষসমাজ নারীকে ঘরে-বাইরে আপন মহিমায় অভিব্যক্ত হতে দিয়েছে বলেই জীবন এতো সহজ স্বচ্ছন্দগতি! কিন্তু মাঝে মাঝে তো প্রলয়-বর্ষণ নামে—যেমন নেমেছিল কাল রাতে—মানবহৃদয়ের প্রচণ্ড প্রলয়ের চেয়ে তীব্রতর হতে পারে কি কোনো 'মস্‌মাই' অথবা 'নোকালিকাই' অথবা অন্য কোনো ঝর্ণা!

*

এখন সকালের ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে আশ্রম-সম্পাদকের প্রশস্ত ঘরটিতে বসে একটু দেরীতে-আসা খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। ততক্ষণে আশ্রমের ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে গেছে। এপাশের ঘরগুলিতে নৈঃশব্দ্য—আর ইস্কুলবাড়ীর ওপার থেকে ভেসে আসছে ছাত্রছাত্রীদের কলগুঞ্জন। সমস্ত খাসিয়াপাহাড়ে বিদ্যালয় অনেকগুলি।

কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রথম খোলার সাধনা ও গৌরব রামকৃষ্ণ মিশনের। কতো দিনের কতো জনের নীরব আত্মদানে এ বিদ্যালয় এবং আরো অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা গড়ে তুলেছেন, সে ইতিহাস ভারতের শিক্ষা-ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায়। চেরাপুঞ্জী আশ্রমের বার্ষিক বিবরণীর পাতাগুলি ওলটাতে ওলটাতে সে কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি জানালা দিয়ে কখন ছোট্ট একটি মেঘশিশু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে যেন ইশারায় তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে ডেকে চারদিক ভরিয়ে ফেললে। তাড়াতাড়ি দরজা জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি সারা আকাশ জুড়ে ঘন-বর্ষণের সমারোহময় আয়োজন! সব বন্ধ করে দিয়ে ঘরের আলো জেলে দিতেই রাতের বর্ষণের দৈনিক সংস্করণ অঝোরে ঝরে পড়তে লাগলো চারদিকে। আর একটু পরেই রান্না-ঘরের পাশের পাথর বাঁধানো সিঁড়ির উপর দিয়ে দুরন্ত বেগে জল নেমে যেতে লাগলো নিচের দিকে। পাহাড়ের কোনো ঝর্ণার চেয়ে তার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য কম নয়—যদিও জলনিষ্কাশনের প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি। আশ্রম-সম্পাদক হেসে বললেন, 'দেখছো কি, কেমন ঝর্ণা বানিয়েছি!'

হাজার ঝর্ণার দেশ খাসিয়া পাহাড়ে ইচ্ছে করলে সত্যি ঝর্ণা বানানো যায়! কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আশ্রমের সামনের পথে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি বিনা ছাতায় ধীর মন্থর গতিতে দুটি মানুষ তাদের নির্দিষ্ট কাজের জন্য চলেছে। যে দেশে বৃষ্টিই সারাবছরের স্বাভাবিক ও প্রধান ঋতু—সে দেশের মানুষের কাছে এ বৃষ্টি প্রতিদিনের সহনযোগ্য ঘটনামাত্র। একদা এ দেশের মানুষ মনে করতো, এমন বৃষ্টি সারা দুনিয়াতেই হয়! আজ তা মনে না করলেও বৃষ্টি এদের একান্ত সহচর—কোনো ক্রমেই বাধা নয়, বিরহের কারণ তো নয়ই।

*

আর একদিকে ভারতের বেশীর ভাগ মানুষ বর্ষণকাঙাল। বৃষ্টি শুধু আমাদের শীতল করে না, অন্ন সংস্থান করে না, বৃষ্টি আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের নিভৃত চরণধ্বনি। আমাদের সমস্ত পিপাসিত অন্তরের প্রার্থনার পরম উত্তর। তাই এমন নিয়তবর্ষণের দেশে এসে ঘুরে ফিরে বহু যুগের বহু কবির বহু সাধনার, বহু স্বপ্নের স্মৃতিচারণ ঘটতে থাকে।

দুপুরের বিছানায় খাসিয়া পাহাড়ের ইতিহাস-কাহিনীর পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক সময় কখন নিজের অলক্ষ্যে অন্তরের মেঘলোকে এসে পৌঁছেছি। সেখানে সব কথা থেমে আছে। সব চঞ্চলতা স্তব্ধ। কেবল মেঘে মেঘে আবির্ভাব-ঘোষণা চলেছে—কখন তাঁর সজল স্নেহকোমল পরিব্যাপ্ত স্নেহস্পর্শে সমস্ত পৃথিবী অন্তরের অন্তরতম পরিপূর্ণতাকে অনুভব করবে—শ্রান্তি-হীন ক্লান্তিহীন দিক দিগন্তে বাধাবন্ধহীন সেই নিয়ত আশীর্বাদের ধারাবর্ষণে সব গ্লানি, সব কলুষ ধুয়ে মুছে আর এক নতুন পৃথিবী দেখা দেবে—যা নিত্যনবীন, নিত্যস্নাত—যেমন এই মুহূর্তে মহাস্নানে মগ্ন চেরাপুঞ্জী!

ঐশ্বর্য-মাধুর্য

শ্রীদিলীপকুমার রায়

"যুগে যুগে তোমার তৃষাই জপি কেন গহন প্রাণে ?"—
শুধাই যখন—বলে হৃদয় : "এই তৃষারই বরদানে
দিশার আলো ধীরে ধীরে
ফুটে ওঠে নিশার তীরে,
অরুণ-আভা যেমন ফোটে আনন্দেরি অভিযানে :
বিকাশ লীলার লক্ষ ব'লেই দল মেলে প্রেমতৃষ্ণা প্রাণে।

নিশ্চল নয় কিছুই—কোটি সূর্য চন্দ্র নীহারিকা
চির-আবেগ-উধাও ব্যোমে বরি' গতির বিজয়টিকা।
তুমি চালাও, তাই না তা'রা
উল্লাসে ধায় আত্মহারা,
নিভে-যাওয়া ভস্মে আবার জ্ব'লে ওঠে দীপালিকা :
ঝঙ্কারিণী শিখায় জ্বালাও নীলনটিনী নীহারিকা।

নিখিলের নিয়ন্তা মহান্ ! ঐশ্বর্যের জানি তোমার
কতটুকু ? বিন্দু জানে কতটুকু সিন্ধুর অপার
কল্লোল-হিল্লোল-মহিমা ?
চিন্তা শুধু জানে সীমা,
তবু বিন্দু সিন্ধুরই তো কোলের শিশু, রূপপারাবার
ধ্যান ক'রে তাই পায় সে শিবনেত্রে দেখা প্রেমল, তোমার।

যুগে যুগে তাই তো তোমার নাম দিতে চাই—"প্রেমের ঠাকুর",
গাই ভয়ে বিশ্বরূপ দেখে : "মূর্তি ধরো মিলন মধুর,
যে-মহীয়ান্ অণীয়ানের
হাত ধ'রে প্রেমমন্ত্র দানের
মাধুর্যে দেয় ভ'রে তনুর প্রতি অণু বেদনবিধুর :
অনন্ত থাক্—শান্ত হ'য়ে দাও দেখা আজ, প্রেমের ঠাকুর !"

শ্রীশ্রীমায়ের একখানি অপ্রকাশিত পত্রের ফটো

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী বিমলানন্দকে লিখিত]

শ্রীগুরবে নম

জয়রামবাটী

১৩০৯ । ১৫ই ভাদ্র

নিরাপদেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদবিশেষ—

বাবাজী—১খান পত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই। আমাদের গুরু জিনি তিনিত অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিস্য তখন তোমরাও অদ্বৈত বাদী। আমি যোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী। মিসেস সেভিয়ারকে আমার ভালবাসার সহিত আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। কালীকৃষ্ণ তথায় যাইবেক জানিয়া মতিলালের ১খান পত্র পাইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মেয়ে মানুষের মঠ* —মঠে সাবধানে থাকিবে। আর স্বামীজির যোর নাই। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমাদের সংবাদ লিখিবে। ইতি

তোমাদের মা

আশীর্ব্বাদীকা

* 'মেয়ে মানুষের মঠ—'কথাটি পাশে লেখা ছিল (ফটো দ্রষ্টব্য), আমরা অনুমান করিয়া এখানে বসাইয়া দিলাম। মিসেস সেভিয়ার মায়াবতী আশ্রমে থাকিতেন, সম্ভবতঃ সেইজন্যই শ্রীশ্রীমা এরূপ লিখিয়াছেন।—সঃ

একটি ঐতিহাসিক পত্র

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রতিচ্ছবিসহ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর যে-পত্রটি প্রকাশিত হল, সেটি আমাদের বিবেচনায় একটি ঐতিহাসিক পত্র। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এটির স্থান আছে। এই আন্দোলন ভারত ও পৃথিবীর ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে যেহেতু উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে, তাই এর ইতিহাসে যদি কোনো রচনার বিশেষ মূল্য থাকে, তাহলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

পত্রলেখিকা কিন্তু লেখিকা হিসাবে কোনো-মতে বিখ্যাত নন। তিনি স্বহস্তে চিঠি লিখতেন না। ঠিকভাবে বলতে গেলে, তিনি লিখতেই পারতেন না। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নিরক্ষর' স্বামীকেও অতিক্রম করেছেন।[১] 'নিরক্ষর' শ্রীরামকৃষ্ণ লিখতে জানতেন, এবং অতি সুছাঁদ ছিল তাঁর হস্তাক্ষর।

পত্রটির মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি থেকে পাঠক

দেখবেন তাতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এবং ভাষাও সুগঠিত নয়। পত্রটির বক্তব্য শ্রীশ্রীমা বলে গিয়েছিলেন, এবং সেবক বা সঙ্গিনীদের কেউ তা লিখে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এর মধ্যে এমন কিছু বস্তু আছে যা বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

এই পত্র ইতিপূর্বে সম্পূর্ণতঃ কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যদিও এর প্রয়োজনীয় অংশ বহুদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। ১৯১৫ সালে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত' স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়—তার মধ্যেই সম্ভবতঃ পত্রটির প্রথম প্রকাশ্য উল্লেখ পাই। তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী থেকে উক্ত পত্রের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে স্বামীজীর ইংরাজি জীবনী থেকে উক্ত অংশ নিয়েছেন, এবং 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে তা নিয়েছেন 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে। স্বরূপানন্দের ডায়েরী আমি স্বামী অজজানন্দের কাছে দেখবার সুযোগ পেয়েছি—সেখান থেকে উক্ত অংশ 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। স্বামীজীর শিষ্য খগেন অর্থাৎ স্বামী বিমলানন্দ শ্রীশ্রীমাকে এক পত্র লেখেন—তার উত্তরে শ্রীশ্রীমার ঐ পত্র। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ তারিখে স্বরূপানন্দের ডায়েরীতে এ বিষয়ে লেখা আছে—"খগেন মাতাঠাকুরাণীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ অগস্ট ১৯০২;—লিখিয়াছেন—।"

পত্রটির পটভূমিকা স্বামীজীর জীবনী-পাঠকের জানা আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে দারুণ বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্য দিয়ে নিতান্ত অসুস্থ শরীরে স্বামীজী দুর্গম মায়াবতীতে গিয়েছিলেন শোকার্ত মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে এবং নিজের একটি প্রিয় স্বপ্নের কিছু সার্থকতার রূপকে স্বচক্ষে দর্শন করতে। স্বামীজীর স্বপ্ন-কল্পনা অনুযায়ী মায়াবতীতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেছিলেন—সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন, বিনা চিকিৎসায়—সে মৃত্যু স্বামীজীর ভিশন্‌-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বামীজীর নানাপ্রকার ভিশন্‌-এর প্রধান একটিকে—বিশুদ্ধ অদ্বৈতকে সাধনারূপে গ্রহণ

১ স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে শ্রীশ্রীমার লেখা-পড়ার কিছু বিবরণ আছে। বিয়ের আগে নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলেছেন—"ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ ('জ্ঞাতিভাই) ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখনও কখনও যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম।" বিয়ের পরে লেখা-পড়া সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত; সে এসে আবার আমায় পড়াত।"

শ্রীশ্রীমার কথায় আরও জানা গেছে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আরো একটু ভাল করে শিখতে পেরেছিলেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে স্নান করতে এসে তাঁকে পড়িয়ে যেত; শ্রীশ্রীমা তাকে মাইনে রূপে বা (গুরুদক্ষিণারূপে!) বাগানের শাক-পাতা দিতেন। "এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়িতে পারিতেন, কিন্তু লিখিতে বিশেষ পারিতেন না; এমনকি শেষ বয়সে নাম সহি পর্যন্ত করিতে পারিতেন না।"

এবং ধর্মরূপে প্রচারের ব্রতকে—গ্রহণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপনা সেই জন্যই। কোন্ বিরাট ও বিশুদ্ধ কল্পনায় স্বামীজী এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তা স্বামীজীর জীবনীপাঠক জানেন- তাঁরা জানেন, ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এই দুই বিদেশীকে এবং স্বরূপানন্দ নামক স্বদেশীয়কে একাজে সহায়ক পেয়ে স্বামীজী কতখানি উল্লসিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের পঞ্জরাস্থি দিয়ে মায়াবতীতে কোন্ অদ্বৈত-বজ্র নির্মিত হয়েছে, তাই দেখবার জন্য স্বামীজীর শেষ হিমালয়যাত্রা।

মায়াবতী স্বামীজীকে কতখানি আনন্দ দিয়েছিল, তা তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়—একটি ব্যাপার কতখানি আঘাত করেছিল, তাও পাই। অদ্বৈত আশ্রমের একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন—রামকৃষ্ণ সংঘের একটি কেন্দ্র অন্তত: থাক যেখানে বিশুদ্ধ নিরাকার অদ্বৈতের উপাসনা হবে; দূর হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম স্বামীজীর সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত কেন্দ্র—সেখানেও সাকার উপাসনা !! তদুপরি, আমার ধারণা ঘটনাটিকে "কথা মতো কাজ না করা" বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, তাঁরা অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা; প্রধান কর্মী স্বরূপানন্দও তাই—সেই আশ্রমে, যেহেতু সেটি রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত, তার জোরে, সংঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা যদি সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করে দেন, তাহলে আদর্শরক্ষা তো হয়ই না, নেতার প্রতিশ্রুতিরক্ষাও হয় না।

১৯১৫ সালে প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর তৃতীয় খণ্ড থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"কয়েকজন (অদ্বৈত) আশ্রমবাসীর একান্ত ইচ্ছায় একটি ঠাকুরঘর কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা হত। (মায়াবতীতে) উপস্থিত হবার পরে স্বামীজী একদিন সকালে সেই ঘরটি দেখতে পান—দেখেন যে, অদ্বৈত আশ্রমে রীতিমত ঠাকুরঘর চালু হয়ে গেছে, ধূপ-ধুনো, ফুল-ফল দিয়ে দিব্য ভোগ-পূজা চলছে। তখনি তিনি কোনো কথা বলেননি; কিন্তু সন্ধ্যায় সকলে যখন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছেন তখন তিনি অদ্বৈত আশ্রমের মতো জায়গায় ঠাকুরপূজা করার কঠোর সমালোচনা করলেন। বললেন, অত্যন্ত অনুচিত কাজ করা হয়েছে। অদ্বৈত আশ্রমে ধর্ম আচরিত হবে ব্যক্তিগত ভাবে; আশ্রমবাসীরা নিজস্ব ভাবে ধ্যানাদি করবেন, একক বা সমবেত ভাবে শাস্ত্র চর্চা করবেন, তাঁরা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করবেন ও তার শিক্ষা দেবেন—দ্বৈতবাদের দুর্বলতা বা নির্ভরতা থেকে একেবারে দূরে থাকবেন। অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রচারিত প্রস্পেকটাসে স্বামীজী স্বয়ং নির্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন—এখানে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ অদ্বৈততত্ত্ব, সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্বলকর সংস্রব থেকে যা মুক্ত—কেবল তাই অনুশীলিত ও প্রচারিত হবে। অদ্বৈত আশ্রম একমাত্র অদ্বৈতের জন্যই উৎসর্গীকৃত। সুতরাং, স্বামীজী বললেন, এক্ষেত্রে বিচ্যুতির সমালোচনা করার অধিকার তাঁর আছে। তাছাড়া তাঁর নিজ গুরুর শিক্ষা ও আশীর্বাদেই তিনি অদ্বৈতবাদী হয়েছেন; এবং তিনি এ বিষয়ে সচেতন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সর্বপ্রকার ধর্ম-ধারণা শিক্ষা দেবার ও

প্রচার করার দায় দিলেও তাঁর (স্বামীজীর) ক্ষেত্রে কিন্তু অদ্বৈতবাদের উপরই জোর দিয়ে গেছেন।

"অদ্বৈত আশ্রমে আনুষ্ঠানিক পূজা সম্বন্ধে স্বামীজী যদিও তাঁর কঠোর মনোভাব উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পূজা-ঘরটি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেননি—যাঁরা ওর জন্য দায়ী, তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করার মতো কোনো কাজ তখন করেননি। সেটা করলে কর্তৃত্বের জোর খাটানো হত। যাঁরা ওকাজ করেছেন, তাঁরাই যেন নিজেদের ভুল বুঝে তার থেকে সরে যান—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু স্বামীজীর আপসহীন মনোভাব—যার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তাঁর দুই অদ্বৈতবাদী শিষ্য, স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার—অপর আশ্রমবাসীদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল—এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য এবং তাকে বজায় রাখবার জন্যই যে স্বামীজী তাঁদের নিয়োগ করেছেন, সেটা গভীরভাবে অনুভব করে তাঁরা পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন—এবং ক্রমে ঠাকুরঘরও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২]

"আশ্রমবাসীদের একজনের মনে দ্বৈতবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। এক্ষেত্রে অদ্বৈত আশ্রমের সদস্য হওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তিনি সর্বোচ্চ বিচারকরূপে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মীমাংসা চেয়েছিলেন। মাতাঠাকুরাণী তাতে উত্তর দেন—"শ্রীগুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী; তিনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তোমরা তাহলে অদ্বৈতবাদ অনুসরণ করো না কেন? তাঁর সকল শিষ্যই অদ্বৈতবাদী।' বেলুড় মঠে ফেরার পরে মায়াবতীর ঠাকুরঘর সম্বন্ধে আক্ষেপ করে স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভেবেছিলুম, অন্ততঃ একটি কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে। হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো ওখানেও জেঁকে বসে আছে। ভালই।'"

স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে প্রকাশিত এই বিবরণের বিশেষ মূল্য এইখানে—জীবনীটি লেখা হয়েছিল স্বামী বিরজানন্দ এবং মিসেস সেভিয়ারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। অদ্বৈত আশ্রমের পূর্বোল্লিখিত ঘটনা যখন ঘটে, উভয়েই তখন সেখানে উপস্থিত। সুতরাং তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই লিখিয়েছেন। এবং আরও উল্লেখযোগ্য—উভয়ে ছিলেন ভাব-ধারার ক্ষেত্রে 'বিরোধী শিবিরের'—স্বামী বিরজানন্দ ঠাকুরঘর-প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম[৩] এবং মিসেস সেভিয়ার কট্টর অদ্বৈতবাদী।

ইংরাজি জীবনীর মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর চিঠির যে অংশ পাই, তা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এবং জনৈক আশ্রমবাসী (স্বামী বিমলানন্দ) ঠিক কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, তাও বোধহয় সবটা দেওয়া হয়নি। স্বামী বিমলানন্দ কি কেবল দ্বৈতবাদে ঝোঁক আছে সুতরাং অদ্বৈত আশ্রমে তাঁর থাকা উচিত কিনা—মাত্র এই বিষয়েই প্রশ্ন ক'রে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখে-

২ একটা প্রশ্ন ওঠে—স্বামীজীকে কি কেউ ঠাকুরঘরটির বিষয়ে সংবাদ দিয়েছিলেন? 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থের মতে, না, তা সত্য নয়; স্বামীজীই একদিন তা 'আবিষ্কার' করে ফেলেছিলেন। স্বামীজী অতঃপর মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দকে অদ্বৈত আশ্রমের রীতি-বিরুদ্ধ পূজাদি চলতে দেওয়ার জন্য 'খুব তিরস্কার' করেছিলেন।

৩ "স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন ঐ ঠাকুরঘরটির একজন প্রধান পাণ্ডা।"—'অতীতের স্মৃতি'

ছিলেন, না অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘর থাকার বিরুদ্ধে নিজ গুরুর মনোভাবের বিষয়ে প্রশ্নও করে পাঠিয়েছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল বলেই মনে হয়। এবং আমরা বুঝতে পারি—যাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ধর্মকে বরণ করেন, তাঁরা কী গভীর জিজ্ঞাসায় মথিত হতে পারেন যা স্বামীজীর মত গুরুর কাজের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও সংশয় জাগাতে পারে—এবং পুনশ্চ, বুঝতে পারি—সঙ্ঘের কাছে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কেবল গুরুপত্নী ছিলেন না, তিনি গুরুর প্রতিনিধি, সঙ্ঘজননী এবং সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ।[৪]

সারদাদেবীর আলোচ্য পত্রটির গুরুত্ব, আমরা যতদূর দেখেছি, এপর্যন্ত স্বামীজীর দিক দিয়েই বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ওটি কি সারদাদেবীর জীবনীর পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ? যদি আমরা একবার ভেবে দেখি—কী সহজে স্বচ্ছন্দে পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিত্য সত্যের ভূমিতে স্থাপন করতে পারতেন—তাহলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সারদাদেবী নারী এবং মাতা, দৈনন্দিন জীবনে স্বতঃই দ্বৈতবাদী—তাঁর পূজার দেবতা আবার নিজ স্বামী—যিনি গুরু এবং ঈশ্বর তাঁর কাছে, সারাদিন তাঁর পূজাতেই কাটে—সেই স্বামী-গুরু-ঈশ্বরের পূজার পট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গুরুর শিষ্যের ইচ্ছায়—তখন তাঁর কি মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত?—অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করিয়ে স্বামীজী ঠিক কাজই করেছেন!! আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে এ-বস্তু অলৌকিক। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর পক্ষেই এ-জিনিস করা সম্ভবপর; শ্রীরামকৃষ্ণ যে, অদ্বৈতসাধনার সময়ে জ্ঞানের অসিতে মাতৃমূর্তিকে পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন! সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও সারদা, সরস্বতী'—সে কথার আর কোন্ প্রমাণ প্রয়োজন?

পত্রটির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বোচ্চ ধর্মধারণা কি—সে বিষয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তাহলে এই পত্র তার মীমাংসা ক'রে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়াচার্য সত্য, কিন্তু নিজে তিনি অদ্বৈতবাদীও। তাঁর ধর্মমত নিয়ে অবশ্য তর্ক আছে। তিনি কি দ্বৈতবাদী, না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, না কি অদ্বৈতবাদী? কথামৃত পড়ে অনেকেই তাঁকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মনে করেন। এক বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক গ্রন্থ লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ জোর করে শ্রীরামকৃষ্ণকে অদ্বৈতবাদী খাড়া করেছেন, যা তিনি মোটেই ছিলেন না। এ ধরণের রচনা নিশ্চয় শেষ রচনা নয়। এক্ষেত্রে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চাই—সারদাদেবীর পত্রটি তেমন একটি অব্যর্থ প্রমাণ।

সবিনয়ে সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়াচার্য হওয়ার সঙ্গে অদ্বৈতবাদী হওয়ার বিরোধ তো নেই-ই, বরং উল্টোপক্ষে, অদ্বৈতবাদী না হলে তিনি সমন্বয়া-

৪ সোজা ভাষায় সঙ্ঘের 'হাইকোর্ট'। স্বামী শিবানন্দ ঐ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে পাই, একবার জনৈক ব্রহ্মচারী কি একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলে পাছে স্বামী শিবানন্দ তাঁকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেন সেই ভয়ে একেবারে সোজা পায়ে হেঁটে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে হাজির হন। শ্রীশ্রীমা উক্ত ব্রহ্মচারীকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে শিবানন্দ স্বামীকে চিঠি দেন। তারপর শ্রীশ্রীমা ছেলেটিকে মঠে পাঠিয়ে দেন। "ব্রহ্মচারী মঠে পৌঁছিলে শিবানন্দজী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?"

চার্য হতে পারতেন কি? সমন্বয়বাদীদের কথা—যে-কোনো পথ ধরে অগ্রসর হওয়া যাক না কেন, যদি যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে তাহলে চরম লক্ষে পৌঁছানো যাবে। মাত্র অদ্বৈতবাদীরাই একথা বলতে পারেন, কারণ তাঁরা চলার পথে কোনো সাকার ভগবানকে—কোন ঈশ্বরীয় রূপকেই পথের শেষ বলেন না। পরিণতিতে যাঁদের কাছে কোনো একটিমাত্র মূর্তি নেই, এক অদ্বয় সত্তাকেই সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপের মূল বলে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা কোনো একটিমাত্র পথকেও অবলম্বনীয় মনে না করতে পারেন। অপরদিকে দ্বৈতবাদীরা যেহেতু তাঁদের সম্প্রদায়গত সাকার ভগবানকেই শুধু মানেন, তাই সেই ভগবানের কাছে উপস্থিত হবার জন্য সম্প্রদায়গত পথটিকেও একমাত্র অবলম্বনীয় বলে স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বৈতবাদীরা খুব উদার হলে বড়জোর ভিন্ন মতাবলম্বীদের 'সহ্য' করেন—কিন্তু 'স্বীকার' করেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্ম যদি অগ্নি—শক্তি তার দাহিকাশক্তি। কিন্তু অগ্নিরই দাহিকাশক্তি—দাহিকাশক্তির অগ্নি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মের শক্তি সারদা, তাই তিনি সজোরে মূল সত্যরূপকে প্রকাশ করেছেন—

"আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত।"

"অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুর এই কালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, "উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা; ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।"

—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬। আজ আশ্রম-জীবনের মূল নিয়ম-নীতি (principle) সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দ অনেক কথা বলিলেন :

"সব খায় দেখেছি—থালার ধারে semi-circle ক'রে (অর্ধ-বৃত্তাকারে) বসে, মুড়ি ছড়ায়, নষ্ট করে। আগে আগে একটি মুড়ি নষ্ট করলে সেদিন তার খাবার চাল নিতুম না। ভিক্ষার জিনিস কখনও নষ্ট করতে আছে? কত কষ্ট ক'রে লোকেরা দেয়—সর্বদা সেটি মনে রাখবে। তাদের ত্যাগও কম নয়।

"বৈদান্তিক পরমহংস তো হওনি এখনও—যে, পেলাম খেলাম, না পেলাম না খেলাম—তা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ সব জিনিসের যত্ন নিতে হবে। যারা নিজের রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে একটা আশ্রম গড়ে, তাদের ধরনই আলাদা। গড়া বড় শক্ত। কত পুরুষকার চাই! এখন পয়সা হয়েছে তাও নিজেদের আনবার মুরদ নেই, দূর দূর দেশ থেকে 'ভক্তেরা' পাঠায়! তাই কয়লা কেন আর পোড়াও। কিন্তু আগে (আমি যখন একা) কি করেছি জানো? এ-মাঠে ও-মাঠে শুকনো কাঠ, বাঁশ, গোবর কুড়িয়ে জড় ক'রে রাখতাম। বিকেলবেলা সবাই গিয়ে নিয়ে আসতাম। তারপর দূর-গ্রামে হয়তো একটা গাছ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ১৲ টাকায় দিচ্ছে। টবলদার লাগিয়ে চেরালাম, শেষে গাড়ী ক'রে নিয়ে এলাম, টুকরো-টুকরোগুলি বস্তা ক'রে তুলে আনলাম। তাতে রান্না হ'ল—তবে বাবুরা খেলেন।

"আমি দু-বছর ছিলাম না—এসে দেখি বাবুরা গাড়ী গাড়ী কয়লা কিনে রেখেছেন, আর কোন কষ্ট নেই! আশ্রমে গরু আছে, তবু ঘুঁটে-গোবর কেনা হচ্ছে। আশ্রমের মাঠে যা গোবর পড়ে, তা হয় বাইরের লোকে নিয়ে যাচ্ছে, না হয় শুকিয়ে শুকিয়ে মাঠ নোংরা হচ্ছে, সে-সব দিকে কারও খেয়াল নেই। সব সাধু-ব্রহ্মচারী—এ-সব তুচ্ছ বিষয়ে কি ক'রে মন দেবে বলো?

"স্বামীজী বলতেন—কয়লার আলে খেলে অম্বল হয়; শীগ্রি ফুটে যায়, কিন্তু পক হয় না। কাঠের আলে খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে—দেখ না বুনোরা, সাঁওতালরা। ঘুঁটের আলেও সহজে হজম হয়, ধীরে ধীরে পরিপক হয়। দেখিস্‌নি পোরের রান্না। এই ছিল principle (নীতি) যে কয়লার আলে খাব না। Principle (নীতি) মেনে চলতে গেলে পুরুষকার চাই। হ'ল হ'ল, না হ'ল না হ'ল—এ করলে চলবে না। Principle (নীতি)-এর জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

"'স্বামীজী, স্বামীজী' কর—স্বামীজী তো একটি principle-এর প্রতিমূর্তি। কাল স্লাইডে (ম্যাজিক লণ্ঠনের চিত্রে) যে-সব কথা দেখলে, তিনি তারই প্রতিমূর্তি। তিনি রক্তমাংসে তৈরী ছিলেন না, তিনি ছিলেন idea (ভাব) দিয়ে গড়া। তিনি যেমন বলতেন, 'Radha was not of flesh and blood. She was a froth in ocean of love'.—(রাধা রক্তমাংসে গড়া ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রেম-সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ)। তেমনি স্বামীজীও রক্তমাংসের ছিলেন না—ছিলেন একটা ভাবের প্র[illegible]ত। Principle (নীতি) বড়

ভয়ানক জিনিস। তার জন্যে সব ত্যাগ করতে হয়। Principle (নীতি)-ই তো ideal (আদর্শ)।

"এই দেখ স্বরূপানন্দ, স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী principle (নিয়ম) করলে 'মায়াবতী'তে কোন রকম উৎসব পূজা আরতি হবে না, তার জন্য তাকে কত বাধা সহ্য করতে হয়েছে। এ বিষয়ে গুরুর চেয়ে চেলা দড়। সে চলে গেছে—তার principle, তার আদর্শ অনুযায়ী এখনও কাজ হচ্ছে।"

১৭ই ডিসেম্বর। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দের হৃদয়ে একটি কোমল এবং স্নেহপূর্ণ ভাব ছিল—সময় সময় আত্মপ্রকাশ করিত। গত জুলাই মাসে তাঁহার সহসা মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মহারাজ অতিমাত্রায় মর্মাহত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ চিঠি আসিয়া পৌঁছে—তাহাতেও লেখা ছিল: 'দেশে ফিরিয়া গিয়া একখানি শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী লিখিয়া জগৎকে উপহার দিব।' প্রতি সপ্তাহের মেলে—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের চিঠি আসিত—আঁকা বাঁকা বড় বড় বাংলা অক্ষরে লেখা—চিঠিতে 'ক্রমশঃ' লেখা থাকিত, দু-তিন বারে একটি চিঠি শেষ হইত। তাঁহার সব বই আশ্রম লাইব্রেরীতে পাঠাইয়াছিলেন।

আজ হঠাৎ তাঁহার কথা উঠিয়াছে—বাবা বলিতেছেন: "ধনগোপালের লেখাকে ওরা (আমেরিকানরা) বলে sparkling style (চমক লাগানো রচনাশৈলী)। ওদেশে ওর কথা লোকে শোনে, appreciate (তারিফ) করে। ওর বই সবাই পড়ে। এ কি কম? কি অবস্থায় গেছল, আর কি গণ্যমান্য হয়েছিল! খুব কষ্টের জীবন—struggle (সংগ্রাম) ক'রে ক'রে উঠেছিল। ঠাকুরের উপর কি বিশ্বাস! মায়ের কথায় কেবল লেখে—শরণাগত! শরণাগত! চিঠি-ভরতি শরণাগত!. আমি তো ওকে বাংলা লেখা ধরিয়েছি। দাদার (স্বামী শিবানন্দের) অসুখের সময় এসেছিল. বললে—এবার গিয়ে চিঠি দেব। আমি বলি—'বাংলায় লিখতে হবে কিন্তু।' একটা কাপড় চেয়েছিল—তা বলেছে রেশমের কাপড় চাই না, আপনার পরা খদ্দরের কাপড় চাই। চিনি প্রসাদ নিয়ে গেছে—একটু একটু খায়। এবার বলেছি স্যাকারিন পাঠাব।"

* * *

আবার principle-এর কথা আসিয়া পড়িল: "গরু রাখতে চায় তো সেবা করবে না। কুকুরটাকে সময়মতো একজন খেতে দেবে—তা তো কাউকে দেখলাম না। ওরা ক-জন পালা ক'রে দিত। একজন কেউ এগিয়ে এসে বললে না যে আমিই ক'রব। মনের সে জোর নেই।

"আমার কাছে ৮।১০ বছর থেকে একটু দূরে গেলেই—কি আমি এখানে কিছুদিন না থাকলেই সব আমার principle (নিয়ম-নীতি) ছেড়ে দেয়, আমার অবর্তমানে কি হবে বুঝতেই পারছ। সব জায়গায় এই ব্যাপার। Principle-কে ধরে রাখা কি সহজ কথা? অনেক ত্যাগ তপস্যা চাই।

"স্বামীজীকে বলে patriot-saint (দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী)। Patriot (দেশপ্রেমিক) কি সোজা কথা? দেশাত্মবোধ! আর তো কাউকে দেখলাম না—feel (অনুভব) করতে বা করাতে। আমরাই তো মিশনের মূলকর্মী—তাঁর হাতে গড়া। আমাদের কথাই বা কে শুনছে?

"একটা বড় idea (ভাব) হজম করা কি সবার কাজ? সেই idea (ভাব) নিয়ে যাঁরা

জন্মান, তাঁরাই ঘাবড়ে যান—নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা বড় ভয়ঙ্কর। আমরা সন্ন্যাসী—নাম-যশ তো আমাদের পক্ষে কাকবিষ্ঠা।

"কাজ করাই কি সহজ? একটা বড় দোষ করেছে—তা বলবে না, মানবে না। যদি কখনও অপরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—তবুও না। আমাদের কি রকম ছিল জানো? দোষ করলে, নিজে গিয়ে সর্বাগ্রে ব'লব—'এই দোষ করেছি।' স্বামীজী ফিরে আসছেন। একজন গুরুভাই চলেছেন সিলোন (সিংহল)-এ। স্বামীজীর সঙ্গে সর্বাগ্রে দেখা ক'রে নিজের দোষের কথা বলবেন—অপর কেউ বলবার আগেই।

"দার্জিলিং থেকে ফিরছি—স্টেশন থেকে একটি ছেলে গাড়ী ছাড়বার একটু আগে আমার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে প'ড়ল। ভাবলাম অনাথ, নিয়ে আসছিলাম। শিলি-গুড়িতে জানলাম তার বাপ আছে, তখখুনি পুলিসের কাছে সব কথা জানিয়ে তাকে রেখে এলাম। এদিকে famine relief (দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য)-এর পর গেজেটে সার্কুলার বেরিয়ে-ছিল—অনাথ ছেলে আমাদের কাছে আসতে পারে। কলকাতায় এসে শুনলাম স্বামীজীর কাছে ছেলের বাপের টেলিগ্রাম: 'তোমার লোকেরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।' আমি তো স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেছি মায়ের বাড়ীতে (বোসপাড়ার ভাড়াবাড়ীতে)। সেদিন তাঁর সেখানে আসবার কথা। দেখা হতেই স্বামীজীর মৃদুহাসি ও তিরস্কার—'অনাথ ছেলের জন্যে নাল গড়িয়ে পড়ছে?' আমি সব কথা খুলে বললাম। তখন তিনি খুব খুশী।

"ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হওয়া কি সহজ কথা? সন্ন্যাসী হওয়ার আগে আমরা কত সাধন তপস্যা করেছি! কত কঠোর- ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা, তারপর নিন্দা-স্তুতি তুল্যবোধ- এ কি সহজ? একলা চুপ ক'রে গভীর ভাবে ভাবছি, ধ্যান করছি—এক গালে চন্দন, এক গালে বিষ্ঠা! ভাবছি—এই যেন কেউ আমাকে ফুলের মালা পরিয়ে যত্ন ক'রে নিয়ে গেল, তারপরেই একজন এসে অপমান করছে, মারছে, গায়ে নোংরা জল দিচ্ছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি যেন সবতাতেই স্থির।

"এই যেন মরুভূমি দিয়ে চলেছি, তারপরই তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া! এইসব আমাদের ধ্যানের বিষয় ছিল। কারেই বা বলছি, আর কেই বা শুনছে! সবাই ফাঁকি দিয়ে সারতে চায়। যে যতদূর করবে, সে ততদূর পাবে। ফাঁকি দিয়ে যা পাবে—তাও ফাঁকা, ফক্কি!

"রোজ শোবার সময় এইটুকু ভেবে শোয়া উচিত—আজ কতটুকু কি করলুম? ভগবানকে ডেকেছি তো? কারুর মনে কোন কষ্ট দিইনি তো? গুরুজনদের মিষ্টিকথার উত্তরে পরুষ-বাক্য বলিনি তো?—এই সব। আর খুব প্রার্থনাপরায়ণ হতে হয়। জপ ও প্রার্থনা। ধ্যান অনেক দূরের কথা। যারা কাজের ভয়ে ধ্যানে বসে, তাদের লাঙ্গলে জুড়ে দিতে হয়—স্বামীজী বলতেন। আমি তো তবু কোদাল দিয়ে মাটি কুপুতে বলি।

"সর্বদা জপ ও প্রার্থনা-- ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, দেখা দাও। শুধু জপে কি হবে? 'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। মনে মনে জপো, তবে বলিহারি যাই॥'"

* * *

১৮ই ডিসেম্বর। আশ্রমের কোন ব্রহ্মচারী কর্মী বলে—তার বড় বেশী কাজ, অবসর কম, বাবার কাছে আসিয়া বসিতে পায় না; ঠাকুরঘরে কেহ সাহায্যকারী নাই ইত্যাদি।

বাবা তাহাকে বলিতেছেন : "কাজ কর, কাজ কর। কাজের জন্য কেউ আমার কাছে না আসতে পারে, কি না বসতে পারে—তাতে আমি খুশীই হই। যে খুব কাজ করে, কি কোন কাজের জন্য কষ্ট ক'রে দূরে গেছে, আমার মনটা তার কাছেই পড়ে থাকে। কাজ কর—এই তো তোমাদের কাজ করবার বয়স। আমার যখন বয়স ছিল, তখন কাজই করেছি। এখন তো পরবশ—তাও তো দেখছ।

"পূজো? শুধু পূজো আর কতটুকু কাজ? ও আর বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। নিগম পূজো ক'রত—একটি একটি কৃষ্ণকলি ফুল দিত পাঁচ মিনিট ধরে। দু-ঘণ্টা লেগে যেত ফুল দিতেই। এদিকে ঠাকুরের সামনে জলখাবার সাজানো—ঠাকুরের খাওয়া হচ্ছে না। সেদিকে খেয়াল নেই। পূজোর সব কাজটাই পূজো—ঘর ঝাঁট দেবে, ঘর মুছবে, বাসন মাজবে, ফুল তুলবে, ফুল সাজাবে, ফল কাটবে, ফল সাজাবে—সব কাজ করবে পূজোর ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করবে, আর ইষ্ট চিন্তা করবে।

"তারপর পূজো? অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল দেবে, বলবে 'এই নাও, প্রভু, ফুল নাও।' চন্দন পরিয়ে দেবে, মালা থাকলে মালা পরিয়ে দেবে, গুটি-দুচ্চার ফুল ছবির পাশে সাজিয়ে দেবে। আরও যতগুলি ছবি আছে—সবগুলিতে দুটি একটি ফুল দেবে। তারপর ঠাকুরকে জলখাবার দেবে—নিবেদন ক'রে বলবে, 'খাও, প্রভু, এই তোমার খাবার। আজ যা পেয়েছি, তাই দিয়েছি। খাও, ঠাকুর।' এই ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে এসে একটু জপ করবে, আর ভাববে—ঠাকুর যেন খাচ্ছেন। এই তো পূজো। শরৎ মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বাণলিঙ্গে সব ঠাকুর-দেবতার পূজো হয়, খুব সহজে হয়।"

কাণ্ডারী

শ্রীমতী বিভা সরকার

সুন্দর প্রভাত মোর কোথা গেল চলি
কল্পনার পসরা বিলায়
প্রখর মধ্যাহ্নতাপে আছাড়িয়া ঢেউ কাঁপে
জীবনের বালুকাবেলায়।
ভোরের সে পাখীগুলি গান কি গিয়েছে ভুলি
স্তব্ধ কেন চিত্তবনতল
পাণ্ডুবর্ণ কেন আজ চির সে শ্যামল সাজ
কেন শূন্য কুম্ভ সে উছল!
পথহারা পান্থ আমি শোন এ মিনতি
প্রাণপদ্মে ক্ষণেক দাঁড়াও
জীবনের দিনগুলি বৃথাই যে যায় চলি
পরশ মাণিক তব এ চিত্তে ছোঁয়াও!

হে ভৈরব নৃত্য কর মৃত্যুঞ্জয়ী গানে
গুরু গুরু বাজায়ে ডম্বরু
তমোনাশা প্রভাত-আলোয়
আরবার যাত্রা করি সুরু—
সন্ন্যাসী তোমার মত কে আছে তাপস
আত্মভোলা শিশু ভোলানাথ
তপস্বিনী পার্বতীর চির প্রিয়তম
দাও ফিরে জীবনের প্রথম প্রভাত।
শুনিবারে অনাদি সে পিণাকের সুর
বসে আছি জীবনকিনারে
শুনেছি করিছে পার অনাদি সে নেয়ে
খেয়াখানি এই পারাবারে॥

শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

ডক্টর রমা চৌধুরী

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫।৩৪)

"যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিতা।
তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম,
তাঁকেই প্রণাম, অনিন্দিতা।"

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে যে "শক্তি" কি? কি তার স্বরূপ, কিই বা তার কার্য? এই মূলীভূত প্রশ্নের উত্তরদানকালে, স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় শক্তিবাদ বিষয়ে। বস্তুতঃ "শক্তিবাদ" ভারতীয় দর্শনের একটি মূলীভূত তত্ত্ব। এই মতানুসারে, পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম, পরমেশ্বরকে চারটি বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহণ করা হয়—সৃষ্টির দিক; নীতির দিক, ধর্মের দিক, দর্শনের দিক। প্রথমতঃ সৃষ্টির দিক থেকে তাঁকে বলা হয় এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, জীবজগৎসংবলিত এই অনন্ত—অসীম সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে কেবল জাগতিক দিক থেকেই এই জগতের কারণ, তা'ই নয়; নৈতিক দিক থেকেও তিনি তার ভিত্তিস্বরূপ এবং পরিচালক, যেহেতু জগতে কেবল জড় বস্তুই আছে, তাই নয়; আছে সেই সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিবোধসংবলিত অসংখ্য জীব, যাদের ন্যায়ের পথে, নীতির পথে পরিচালিত করবার জন্যও একজন সর্বশ্রেষ্ঠ—ন্যায়-নীতি-বিশারদ প্রয়োজন; এবং তিনিই হলেন পরমন্যায়বান্ পরমনীতিশীল পরমেশ্বর। তৃতীয়তঃ, ধর্মের দিক থেকে, তিনি যে কেবল একজন কঠোর ন্যায়াধীশমাত্রই হবেন, তাও তো হতে পারে না, যেহেতু তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ প্রাণের সম্বন্ধ, মধুরতম প্রীতির সম্বন্ধ, মোহনতম সখ্যের সম্বন্ধ, নিকটতম আত্মীয়ের সম্বন্ধ, বিশ্বস্ততম সহায়ের সম্বন্ধ। এককথায়, তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় জনই কেবল নন, তিনি আমাদের নিকটতম, নিবিড়তম, নিজতম প্রিয় জন। চতুর্থতঃ, দর্শনের দিক থেকে, তিনি আমাদের প্রিয়জনও নন—তিনিই আমি—সেই দিক থেকে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, উপাস্য এবং উপাসক, প্রিয় এবং প্রিয়া—এক কথায়, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, পরমাত্মা এবং আত্মা, শিব এবং জীব এক ও অভিন্ন। —এরূপে, উপরে যে পরমেশ্বরের চারটি দিকের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম তিনটি দিক থেকে একেশ্বরবাদ, এবং শেষের চতুর্থ দিক থেকে একতত্ত্ববাদ গ্রহণীয়।

একেশ্বরবাদ মতে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিশ্চয়ই এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু সত্য বা তত্ত্ব এক নয়, তিন: ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, চিৎ বা জীব, অচিৎ বা জগৎ। এরূপে একেশ্বরবাদ (monotheism) একতত্ত্ববাদ (monism) নয়, ত্রিতত্ত্ববাদ। অপর পক্ষে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়; এবং সেই সঙ্গে সত্য বা তত্ত্বও এক, তিন নয়, যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনো ব্রহ্ম তো নেই-ই, উপরন্তু অপর কোনো সত্য বা তত্ত্বও নেই, যেহেতু জীব-জগৎ আপাতদৃষ্টিতে সত্যরূপে প্রতিভাত হলেও প্রকৃতকল্পে মিথ্যা। প্রথমটি রামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী, ভেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতবাদ; দ্বিতীয়টি শঙ্করপ্রমুখ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের

মতবাদ।

এস্থলে, শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে প্রভেদ নিঃসন্দেহে একটি মূলীভূত প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল, যথা: স্বরূপ ও গুণশক্তির মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? শঙ্করাদির মতে, পদার্থ বা বস্তুর একমাত্র স্বরূপই আছে, গুণ শক্তি নেই; এবং সেজন্য একমাত্র পদার্থ বা বস্তু ব্রহ্ম নির্বিশেষ—প্রথমতঃ, সজাতীয় ভেদ নেই; অর্থাৎ, তাঁর সমশ্রেণীভুক্ত আর কোনো ব্রহ্ম নেই যাঁর থেকে তাঁর প্রভেদ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বিজাতীয় ভেদও নেই; অর্থাৎ, তাঁর ভিন্নশ্রেণীভুক্ত আর কোনো দানবাদি নেই, যার থেকে তাঁর প্রভেদ করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ, তাঁর স্বগত ভেদও নেই, যেহেতু তাঁর গুণ-শক্তি নেই, যা তাঁর স্বগত ভেদরূপে পরিগণিত হতে পারে; তাঁর কেবল স্বরূপই আছে। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, স্বরূপ থাকলে গুণ-শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে আর লাভ কি? তাতে প্রয়োজন তো নেই-ই, সুবিধাও কোনো দিক থেকেই কোনো কিছু হবে না; বরং অসুবিধা প্রচুর। যেমন, এস্থলে প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠবে—স্বরূপ ও গুণশক্তির মধ্যে সম্বন্ধ কি? গুণশক্তি যদি স্বরূপের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন। পুনরায়, যদি গুণ-শক্তি স্বরূপ থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তারা স্বরূপের মধ্যে থাকবে কিরূপে, যেহেতু স্বরূপের মধ্যে, স্বরূপ ভিন্ন বা স্বরূপবিরুদ্ধ কোনো কিছু থাকতে পারেই না। এরূপে, স্বরূপ এবং গুণশক্তির মধ্যে কোনো ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধই তো সম্ভবপর নয় স্থির করা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও, অকারণে গুণশক্তি টেনে এনে ঝঞ্ঝাট বাড়াবার অর্থ কি?

কিন্তু রামানুজাদির মতে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ নন, সবিশেষ, যেহেতু তাঁর সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ না থাকলেও স্বগতভেদ, বা গুণশক্তি আছে। এই সকল গুণশক্তি নিষ্প্রয়োজন নয়, যেহেতু তারা স্বরূপের প্রকাশক। সেজন্য, স্বরূপ ও গুণশক্তির মধ্যে সম্বন্ধ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ স্বরূপ ও গুণশক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন কিন্তু গুণতঃ ভিন্ন। যথা, দুগ্ধ ও ধবলত্ব। ধবলত্ব দুগ্ধত্বরূপ স্বরূপের প্রকাশক ব'লে, স্বরূপতঃ দুগ্ধত্বের সঙ্গে অভিন্ন—অর্থাৎ, ধবলত্বও দুগ্ধস্বরূপ। তথাপি ধবলত্ব দুগ্ধত্ব থেকে গুণতঃ ভিন্ন, যেহেতু ধবলত্ব দুগ্ধত্বের একটী মাত্রই গুণ বা প্রকাশক; এবং দুগ্ধের ধবলত্ব ব্যতীত অন্যান্য বহুগুণও রয়েছে, যথা, তরলত্ব ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, স্বরূপ ও গুণশক্তি, বা ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন অথচ গুণতঃ ভিন্ন হলে, শেষ পর্যন্ত গুণশক্তিই কি স্বরূপ থেকে অধিকতর গ্রাহ্য, অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়ে, যেহেতু, এস্থলে স্বরূপ ব্রহ্ম, এবং গুণশক্তি জীবজগৎ শেষ পর্যন্ত ভিন্নই থেকে যান, স্বরূপতঃ অভিন্নতা সত্ত্বেও?

সেজন্য দুটী মতবাদ এস্থলে সম্ভবপর—(১) ব্রহ্মের কেবল স্বরূপই আছে, গুণশক্তি নেই; (২) ব্রহ্মের স্বরূপ এবং গুণশক্তি সবই আছে; কেবল ব্রহ্ম এবং গুণশক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ ভিন্ন।

এই দুটী মতবাদের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটী আছে, ন্যায়ানুমোদনের দিক থেকে—এই হল সাধারণ মত। কেবল স্বরূপবাদ অবশ্য একটী অতি অভিনব, অতি মহৎ-বৃহৎ-রোমাঞ্চকর তত্ত্ব। তা সত্ত্বেও সেই স্বরূপের প্রকাশের দিক থেকে গুণশক্তির অবশ্য-প্রয়োজনীয়তাও তো সমস্বীকার্য বলে অনেকেই মনে করেন।

এস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত শক্তিবাদ

সর্বদিক থেকেই একটি সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব। বস্তুতঃ তিনি উপরে উল্লিখিত তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধন করে, একটি মধ্যমমার্গ অবলম্বন করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন (১) ব্রহ্মের গুণশক্তি আছে (২) অথচ, সেই গুণশক্তি ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন, ভিন্নাভিন্ন নয়।

কি অপূর্বভাবেই না শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বারংবার বলেছেন :

"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়—আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার—সব মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছে বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ ভাগ)

"যাঁর লীলা, তাঁরই নিত্য। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা, লীলারূপ ভেঙ্গে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল—হেল্লে দুল্লেও জল। হেলা দোলা থেমে গেলেও সেই জল।" (ঐ)

"তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি—যখন করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ ; জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে দুল্লেও জল।" (ঐ)

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হবে। যেমন, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যরশ্মি ভাবা যায় না ; সূর্যের রশ্মি ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন ? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না ; আবার ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।"

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলাকে, লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না।"

"একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোনো কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বা শক্তি বলি।"

(কথামৃত—১ম ভাগ, পৃঃ ৪১, ৪২)

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি"। (ঐ, পৃঃ ১২৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদিগণের বিবর্তবাদের মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ হল এই যে, বিবর্তবাদে যে মুহূর্তে বলা হল যে ব্রহ্মের শক্তি ব'লে একেবারে কিছুই নেই, এবং সেজন্য তিনি একেবারেই নিষ্ক্রিয়—সেই মুহূর্তেই অনিবার্যভাবেই এসে পড়ল জগন্মিথ্যাত্ববাদ। এই মতবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল না একেবারেই। জগৎকে কেবলমাত্র জগদ্রূপেই ভেবো না ; অর্থাৎ, একপক্ষে আমাদের নিজেদের সাধারণ, সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ, জড়, স্বার্থপর, সকাম দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎ জড়-ময়, পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট, অপূর্ণ অপবিত্র বলে যেভাবে বোধ হয়, ঠিক সেইভাবেই জগৎকে দেখো না ; কিন্তু অপরপক্ষে, জগৎকে মিথ্যা-মায়ারূপেও মেনো না, যেহেতু প্রকৃতকল্পে জগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন এবং ব্রহ্মস্বরূপ। বস্তুতঃ, শঙ্করাদির অদ্বৈত-বেদান্তমতে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" এস্থলে, "জগন্মিথ্যা"—এই কথা দ্বারা জগতের নেগেটিভ্ দিক থেকে মিথ্যাত্ব সূচিত হয়। পুনরায় শ্রুতিবাক্য দ্বারা পসিটিভ্ দিক থেকে

জগতের ব্রহ্মরূপকত্ব প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, জগৎ জগদ্রূপে মিথ্যা ; ব্রহ্মরূপে সত্য। কিন্তু শঙ্করাদির অদ্বৈতবাদে, জগতের মিথ্যাত্বের কথাই যেন বিশেষভাবে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে ; জগতের ব্রহ্মস্বরূপত্ব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব সমন্বয়ে এই ত্রুটী দূর করে, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে জগতের ব্রহ্মস্বরূপত্বও বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। তাঁর অনুপম শক্তিবাদও এরই পরিপূরক।

সেজন্য, আসুন, আজ এই মহাশক্তির মহাপূজার প্রাক্‌কালে, আমরা শক্তিরূপা জগজ্জননীকে নির্ভয়ে প্রণতি নিবেদন করে নিজেদের অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তির উদ্বোধন করি। তাহলেই আমাদের এই প্রতীক্ষিত শ্রীশ্রীমাতৃপূজা সার্থকতম হবে, নতুবা নয়।

লক্ষ্মণ

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

মানুষের প্রাণের সাধ বড় হ'ব। এ জন্য তার চেষ্টারও শেষ নেই। কিন্তু শিখবে কাকে দেখে? আদর্শ চাই তো। ইতিহাসের পাতার দিকে তার অতন্দ্র দৃষ্টি। অনেক বীর, রাজা, মহারাজা, সম্রাট কতকি'র সন্ধান পায়। তবুও খানিকটা ওজনে কম। হৈ হৈ ঢক্কা-নিনাদ, "রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে ··" কিছুকাল চলল, তার পরে—"চলে গেছ তুমি আজ মহারাজ, রাজ্য তব-স্বপ্নসম গেছে টুটে···।" তাই এ-জাতীয় আদর্শের মাধ্যমে মনের চাহিদা তো মেটান দায়।

তাই তো সাহিত্য ও মহাকাব্যের প্রয়োজন। এ সবের মধ্যে ধর্মীয় ভাবের বিশেষ বিকাশ। এ'টি বাদ দিলে কোনও আদর্শই মানব-মনে গভীর রেখাপাত করে তাকে মহৎ কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। "Religion alone amongst us can exercise this compelling power on a large scale, and it is related to the fact, that only religion can give ideals themselves as motives."

তাছাড়া জাগতিক অভ্যুদয়ের সীমা ও শেষ আছে। যেখানে শেষ হ'য়ে গেল, তার পরে কি? চির অন্ধকার না আলো? এটির পাকাপাকি নির্ধারণ হওয়া চাই। আদর্শ বলে এগিয়ে যাও, অনন্ত জীবন, যেখানে "চিরশান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি" —খুঁজে পাবে।

মানুষ তাই তো যুগে যুগে চেষ্টা চালিয়ে যায়। তার অনন্ত আশা। এ রাজ্য যাচাই করবে, তার আর লয় নয় ক্ষয় নেই :
"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

এই ভগবদ্বাণীই তার পথের চির সম্বল।

সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাব্যে এই প্রকার আদর্শের সন্ধান আছে। তার মধ্যে ভারতীয় রামায়ণ ও মহাভারত এই জাতীয় আদর্শের প্রাচুর্যে ভরপুর। আদিকবি বাল্মীকি ও মহাকবি ব্যাস যে সব চরিত্র অমর ভাষায় অঙ্কিত করেছেন, আজও অসংখ্য নরনারী তা থেকে প্রেরণা পাচ্ছে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা, সাবিত্রী, ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রমুখ সবাই আজও আমাদের সকলের একান্ত নিজ

জন এবং নিজ মহিমায় ভাস্বর।

আমরা লক্ষ্মণের চরিত্র অনুধ্যান করার চেষ্টা করব। আমাদের ক্ষমতা সীমিত। তবুও পূর্বসূরীদের অনুগমন, তাতে সবারই অধিকার আছে। তাছাড়া পৌরুষের পরিপূর্ণ মূর্তি এই মহৎ চরিত্রের অনুশীলন পৌরুষ-লাভের একান্তই সহায়ক, একথা অতি সত্য।

রাম ও লক্ষ্মণ একে অন্যের পরিপূরক। রামকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মণকে, লক্ষ্মণকে বাদ দিয়ে রামকে ভাবা যায় না। আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বলেছেন—লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের 'প্রাণৈবাপরঃ' অপর প্রাণের ন্যায়। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ থেকে দুস্তর বনে বা লঙ্কার সমরাঙ্গনে, সর্বত্রই তিনি ছায়ার মতন রামের অনুগামী। রামের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের তুলনা নেই। আজও ভ্রাতৃপ্রেমের উদাহরণ বলতে রামলক্ষ্মণকেই বোঝায়।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষসবধ, রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ, সীতাদেবীর সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি সব হয়ে গেল। অযোধ্যার দিনগুলি আনন্দেই কাটছে। লোকোত্তরচরিতের জন্য রামচন্দ্র পৌর ও জানপদবর্গে'র অতীব প্রিয়। তাঁকে যৌবরাজ্যেও অভিষিক্ত করা হবে। অযোধ্যায় আনন্দের বান। লক্ষ্মণের মনেও আনন্দের সীমা নেই। তবুও তাতে কোন উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে না। রামচন্দ্র তাঁর এই প্রাণের ভাইটির অন্তর বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি লক্ষ্মণকে বললেন :

"সৌমিত্রে ভুঙ্‌ক্ষ ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্
রাজ্যফলানি চ।
জীবিতং চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে॥"

'সুমিত্রানন্দন। তুমি অভিলষিত ভোগ্যবস্তু-সমূহ ভোগ কর এবং রাজ্যপালনের ফল ধর্ম ও অর্থ প্রাপ্ত হও। আমি তোমারই জন্য জীবন ও রাজ্য প্রার্থনা করি।' কেননা রামচন্দ্র তাঁর বীর ভ্রাতাকে 'দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং' বলেই সর্বদা মনে করতেন।

কিন্তু বাদ সাধলেন কৈকেয়ী। তিনি প্রথমে এই অভিষেকের সংবাদে বিশেষ আনন্দিতা হয়ে বললেন :

"রামে বা ভরতে বাঽহং বিশেষং
নোপলক্ষয়ে।"
"যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।"
"রাজ্যং হি যদি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।"

হলে কি হবে। "দৈবমত্রাতিরিচ্যতে"। মন্থরা নাছোড়বান্দা। নানান যুক্তিতে কৈকেয়ীর মন বিষিয়ে দিল; তিনি মহারাজ দশরথের পূর্বপ্রতিশ্রুত দুটি বর চেয়ে বসলেন। এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে রামের চোদ্দবছরের জন্য বনবাস। সত্যবদ্ধ দশরথ না করতে পারলেন না। অম্লান বদনে রামচন্দ্রও রাজী। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণের রোষের সীমা নেই। রামের যেখানে যত শত্রু তাদের সকলকে বধ করবেনই। কেননা "তোমার কুশলে কুশল মানি"—রামের সঙ্গে তাঁর প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম এমনই। ভরত তখন মাতুলালয়ে। হয়তো সেখান থেকে কোন গূঢ় ষড়যন্ত্র করে থাকবেন, এই ভেবে তিনি ভরতকেও বধ করতে পরাঙ্মুখ নন।—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কঞ্চন।"

এমনকি স্বয়ং দশরথেরও রামচন্দ্রের প্রতি এই নির্মম অন্যায় আদেশ তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারেননি।

সুতরাং প্রয়োজন হ'লে তাঁকেও বধ করতেও পরাঙ্মুখ নন—

"হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।"

রাম যখন বনগমনে একান্তই দৃঢ়সঙ্কল্প, লক্ষ্মণকে

অযোধ্যায় থেকে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাদির সেবার জন্য বারবার বলতে লাগলেন, এই মূর্তিমান ক্ষাত্রবীর্য হঠাৎ তখন কান্নায় ভেঙ্গে রামচন্দ্রের পায়ে ধরে বললেন :

"ঐশ্বর্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।"

সুতরাং বনবাসে রামের অনুগমনের আদেশ মিলল। বনবাসের প্রারম্ভে রাজাজ্ঞায় সুমন্ত্র তাঁদের রথে করে খানিক দূর পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন, তখনও লক্ষ্মণ দশরথের অন্তরে পিতৃসুলভ বাৎসল্যের একান্ত অভাব দেখে সুমন্ত্রকে বলেছিলেন :

"অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা বন্ধুশ্চ ভর্তা চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥"

মাতুলালয়-প্রত্যাগত ভরত দেখলেন, অযোধ্যাপুরী শ্মশান। মহারাজ দশরথ পরলোকে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সহ বনবাসী। নিজজননী কৈকেয়ী তাঁকে সব কথা জানিয়ে বললেন, অযোধ্যার সাম্রাজ্য এখন ভরতেরই, এসংবাদে ভরত বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত। রাজ্য গ্রহণ না করে রামকে ফিরিয়ে আনতে চিত্রকূটে যাত্রা করলেন। সঙ্গে সমস্ত রাজপরিবার ও চতুরঙ্গিণী সেনা। চিত্রকূটের শান্ত বনানী কোলাহলে স্তব্ধ। লক্ষ্মণ ভাবলেন, বোধহয় রামকে বধ করে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভের জন্যই এই প্রয়াস। সুতরাং 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে অমর্ষপূরিত লক্ষ্মণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তিনি দেখলেন, দীন ভরতও জটাচীর ধারণ করে রামচন্দ্রের পাদ-যুগল অশ্রুতে সিক্ত করে তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যভার গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন। এমনকি রামের বদলে স্বয়ং চোদ্দ-বছর বনবাসী হবেন। এ দৃশ্য থেকে ভরতের চরিত্রের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করে লক্ষ্মণ স্থির হলেন। তাই তো দেখি শীতের শেষ রাতে তুষারপাতের মধ্যে নিজেদের দুঃখের কথা না ভেবে তিনি রাজর্ষি ভরতের কৃচ্ছ্রতার কথা স্মরণ করে শোকাকুল। আবার রামচন্দ্র যখন তাঁকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন, তিনি সানুনয়ে সেটি প্রত্যাখ্যান করে ভরতের যুবরাজপদে অভিষিক্ত হ'বার পথ পরিষ্কার করে দিলেন। এ মহত্ত্বের, মহিমার তুলনা ত্রিলোকে দুর্লভ।

বনবাসের শেষ বৎসর অনেক উৎপাত। শূর্পণখার নাক কান কাটা, খরদূষণ ও চোদ্দ-হাজার রাক্ষসবধ ও সর্বোপরি সীতাহরণ। সীতার বিরহে মুহ্যমান রামচন্দ্রকে নানাভাবে আশ্বস্ত করে সীতার অন্বেষণে চলছে। কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলছে না। রাম অব্যর্থ শরে সশৈল বন কানন পৃথিবী ও ত্রিলোক তপ্ত করতে উন্মুখ। তখনও লক্ষ্মণ তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করছেন :

"মহতা তপসা চাপি মহতা চাপি কর্মণা।
রাজ্ঞা দশরথেনাসি লব্ধোঽমৃতমিবামরৈঃ॥"

সুতরাং আপনি ত্রিলোক তপ্ত করার সঙ্কল্প ত্যাগ করে ধৈর্য-ও উৎসাহশীল হন। উৎসাহের তুল্য বল নেই। এই বলেই আমরা নিশ্চিতই সীতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হ'ব।

"উৎসাহো বলবানার্য, নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥
উৎসাহবন্তঃ পুরুষা নাবসীদন্তি কর্মসু।
উৎসাহমাত্রমাশ্রিত্য প্রতিলপ্স্যাম জানকীম্॥"

এই বলে সীতার বিরহে কাতর রামচন্দ্রকে বারবার আশ্বস্ত করছেন।

গভীর অরণ্যে পথহারা তিন পথিক। সীতা ও লক্ষ্মণের দুঃখে সমধিক দুঃখিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বারবার বলছেন, 'অযোধ্যায় ফিরে শোকসন্তপ্তা মাতাদের পালন কর, এ দুঃখ

আমার ও সীতারই হ'ক।' লক্ষ্মণ কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল, কিছুতেই রাম ও সীতাকে এবংবিধ দুর্দিনে ছেড়ে যাবেন না :

"নহি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা ॥"

রামের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। অপূর্ব স্বর্গীয় ভ্রাতৃপ্রেম, যার তুলনা নেই।

সীতাপহারী রাবণকে বাধা দিতে প্রচণ্ড যুদ্ধে জটায়ুর পতন, কবন্ধবধ ও তাদের কাছ থেকে কিছুটা সন্ধান পেয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে মিলন, বন্ধুত্ব ও বালীবধ সব শেষ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধায় অভিষিক্ত করে বর্ষার ক'মাস গিরিগুহায় অবস্থান হয়ে গেল। শরতের আগমনে দশদিক "প্রিয়ং দধানাং—" তবুও সুগ্রীব চুপ। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দূত পাঠালেন, উদ্দেশ্য সুগ্রীবকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া। ধনুর্বাণ হস্তে রুদ্রমূর্তি লক্ষ্মণকে দেখে কিষ্কিন্ধাপুরী ভয়ে কাঁপছে। কর্তব্যের ত্রুটি বা প্রতিজ্ঞার অপালন সত্যসন্ধ কাকুৎস্থ লক্ষ্মণের পক্ষে অসহ্য। ভয়চকিত সুগ্রীব তারাকে পাঠালেন, কিন্তু 'মদস্খলিতবসনা' এই নারীমূর্তি দেখে লক্ষ্মণ শির অবনত করলেন। ক্ষত্রবীর কখনও এমন মূর্তির দিকে ফিরে তাকান না।

'আঘাত সে যে পরশ তব সেই ত পুরস্কার'—সুগ্রীব সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সীতার অন্বেষণ আরম্ভ হল। দেশে দেশে পর্বতে কন্দরে কোথাও সন্ধান মিলছে না। অবশেষে সাগরবেষ্টিতা লঙ্কাপুরীর অশোকবনে বন্দিনী ইক্ষ্বাকুকুললক্ষ্মী ত্রিলোকজননী সীতার সন্ধান করে তাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞানস্বরূপ চূড়ামণি নিয়ে বীরভক্ত মহাবীর হনুমানের প্রত্যাবর্তন। চূড়ামণি দর্শনে রামের শোকাবেগ বর্ধিত হ'ল, তাঁর অশ্রু দেখে লক্ষ্মণও স্থির থাকতে পারলেন না। তিনিও কেঁদে আকুল। পরিপূর্ণ পৌরুষের সঙ্গে অপূর্ব কোমলতার সুদুর্লভ নিদর্শন।

তারপরে সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও সসৈন্য রামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণ। প্রচণ্ড যুদ্ধে একের পর এক রাক্ষস-সেনাপতি সসৈন্যে রণশায়ী—

"রণমুখে যেই বীর যায় যুঝিবারে।
যে যায় সে যায় আর নাহি আসে ফিরে।"

রাবণের বীর পুত্র ইন্দ্রজিতের সংগ্রামে রাম ও লক্ষ্মণ তথা বানর সৈন্যরা মোহগ্রস্ত। রথে এক মায়াসীতা বধ করে ইন্দ্রজিৎ রামকে বিমোহিত করলেন।

এই বিপদেও বীরবর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে তৎকালোচিত বাক্যে প্রবোধিত করলেন :

"উত্তিষ্ঠ নরশার্দুল দীর্ঘবাহো ধৃতব্রত।
কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে ॥"
অয়মনঘ তবোদিতঃ প্রিয়ার্থং
জনকসুতানিধনং নিরীক্ষ্য রুষ্টঃ।
সরথগজহয়াং স রাক্ষসেন্দ্রাং
ভৃশমিষুভির্বিনিপাতয়ামি লঙ্কাম্ ॥"

বীরবর লক্ষ্মণের যেই কথা সেই কাজ। রামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতি বীর ও সেনা সঙ্গে তিনি যুদ্ধে গেলেন। সে কি লোমহর্ষণ সংগ্রাম :

"তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ভূয়ো সর্বলোকভয়ঙ্করম্।"

মহারণে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত। উভয়েই বীর। উভয়েই মহাস্ত্রবেত্তা ও তপোবলসম্পন্ন। 'কি হ'য় কি হ'য় রণে জয় পরাজয়'—'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।' মিথ্যাশ্রয়ী রাক্ষসের কাল পূর্ণ হয়েছে। লক্ষ্মণও শরাসনে অব্যর্থ ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করে বললেন :

"ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥"

"রাম যদি ধর্মাত্মা, সত্যসন্ধ ও পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্ব হন, এই মহাস্ত্র দুরন্ত রাবণিকে সংহার করুক।" ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ ও কুণ্ডলালঙ্কৃত বীরমস্তক দেহচ্যুত হয়ে ধরাশায়ী হ'ল। বানরেরা সানন্দে লক্ষ্মণের জয়ধ্বনি করে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল।

রণক্লান্ত মহাবীর বিভীষণ ও হনুমানের কাঁধে ভর করে ধীরে ধীরে ফিরে রামকে প্রণাম করলেন। লঙ্কাজয় ও সীতার উদ্ধার আসন্ন। রামের আজ মহা আনন্দ। বিজয়ী বীর ভ্রাতাকে কোলে ক'রে মস্তকাঘ্রাণ করছেন, আর কত সমাদর! বিনয়ে নতশির লক্ষ্মণ এতে বিশেষ লজ্জিত বোধ করছেন। দেবেন্দ্র-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎহন্তার এমন বিনয়ের দৃষ্টান্ত কোথাও মেলে কি?

মহাশোকে ও ক্রোধে রাবণ উন্মত্ত। ভীষণ খড়্গ নিয়ে সীতাকে বধ করতে ছুটলেন। অমাত্য সুপার্শ্বের তৎকালোচিত বাক্যে নিবৃত্ত হয়ে সসৈন্যে যুদ্ধে চললেন। রামলক্ষ্মণ প্রমুখ সবাইকে আজ যমালয়ে পাঠাতে হবেই। ভীষণ যুদ্ধে শেলাহত লক্ষ্মণ ইন্দ্রধ্বজের মতন ভূপতিত। রাবণ তাঁকে মৃত জ্ঞান করে দুহাতে তুলে লঙ্কায় নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা করলেন। বানরেরা বুক থেকে মহাস্ত্র তুলতে চেষ্টা করেও পারল না। 'সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক'—রামচন্দ্র অনায়াসে শেলটি তুলে দুহাতে ভেঙে ফেললেন। তারপরে রাবণের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ। রামের বিক্রমে ও অস্ত্রাঘাতে বিহ্বল রক্ষোরাজ পলায়ন করলেন।

যে মহাশোক অসীম ধৈর্যসহকারে সংযত করে রেখেছিলেন এবার দুর্বার অশ্রুরূপে তা প্রকাশিত হ'ল; রামচন্দ্র কেঁদে কেঁদে বলছেন:

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥"

বাংলার অমর কবি কৃত্তিবাসের ভাষা এখানে আরও মর্মস্পর্শী:

"সোনার বাণিজ্যে আমি মণি দিনু ডালি
তোমা বধি রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥"

হনুমান ওষধি নিয়ে এলেন। তার আঘ্রাণে লক্ষ্মণ অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। সকলেরই মহা আনন্দ। রামচন্দ্রের তো কথাই নেই। তবে তিনি তখনও সম্পূর্ণ বিগতজ্বর হতে পারেননি। তাই বীর ভ্রাতাকে কোলে নিয়ে সাশ্রুনেত্রে বললেন:

"ন হি মে জীবিতেনার্থঃ সীতয়া চ জয়েন বা
কো হি মে জীবিতেনার্থস্ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে॥"

ত্রিভুবনে অতুলনীয় রামের এই কাতরোক্তি কিন্তু লক্ষ্মণের ভাল লাগল না। তিনি ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন:

"তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রমম্।
লঘু কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈব ত্বং বক্তুমর্হসি॥
অহং তু বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ।
যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্মা দিবাকরঃ॥"

লক্ষ্মণের কথায় রামচন্দ্রের সম্বিৎ ফিরে এল তিনি লোমহর্ষণ যুদ্ধে রাবণকে বধ করে প্রতিজ্ঞাপাশ থেকে মুক্ত হয়ে দানববিজয়ী দেবরাজের ন্যায় সুদীপ্ত হলেন।

সকল কলহের অবসান হ'ল। রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদিও যথাযথ ভাবেই শেষ। কিন্তু লক্ষ্মণের সামনে আর এক পরীক্ষা। রামচন্দ্র সীতাকে দেখেও তাঁকে গ্রহণ করতে রাজী ন'ন। কেননা দশমাস রাক্ষসের পুরীতে অবস্থানের ফলে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে। ইক্ষ্বাকুকুলের লক্ষ্মী, 'শশাঙ্ক-কান্তে-রধিদেবতাকৃতি' সর্বশ্রেয়স্করী মহাদেবী সীতা মহাদুঃখে লক্ষ্মণকে বললেন:

"চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে
ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥"

লক্ষ্মণ কখনও এমন আশা করেননি। তাই—'অমর্ষবশমাপন্নো রাঘবং সমুদৈক্ষত।' কিন্তু উপায় নেই। রাম ও সীতার 'চির অনুগামী দাস' চিতা প্রস্তুত করলেন, এবং মহাদেবী তাতে প্রবেশ করলেন। ইতোমধ্যে মূর্তিমান অগ্নি সীতাকে কোলে করে উত্থিত হয়ে বললেন:

"এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে॥
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌটীর্যং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা ॥"

রাম অবশ্য সবই জানতেন। তবুও একটা পরীক্ষা হল। নইলে লোকে তাঁকে নেহাৎ কামুক বলবে। "হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধি শ্যামিকাপি বা।"

রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে রাজপদে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সকলেই মহাসুখী। সবার অন্তর আনন্দে ভরপুর:

"দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগি ওঠে আনন্দ
পরাণ উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।"

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের জন্য রামচন্দ্রের জীবন নয়। 'রাজভালে মুকুটের সম, সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম' লইবার জন্যই তাঁর জীবন। এই জন্যই এ জীবন লোকাত্তর। পৌর ও জানপদবর্গ সীতার চরিত্রে সন্দেহ করছে। সুতরাং প্রজানুরঞ্জনের জন্য এবার তাঁর বিসর্জন। লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জন দিয়ে এসো। উপায় নেই। রামচন্দ্র তাঁর নিজ প্রাণের দিব্যি দিচ্ছেন:

"শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং
জীবিতেন চ।"

তবুও আদেশ পালন করতে হ'ল। সীতাকে বনবাসের সংবাদ জানিয়ে অতিকায় ও ইন্দ্রজিৎহন্তা বীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। 'রুদ্ধ অশ্রুজলে' সীতার চরণযুগল সিক্ত হয়ে গেল। 'কঠোর কর্তব্য ব্রত জীবন যাপন!' লীলা-নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু।

ইক্ষ্বাকুকুললক্ষ্মী বনবাসিনী হলেন। শূন্য প্রাণে লক্ষ্মণ ফিরে এলেন। সীতাদেবীকে বনে দিয়ে লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে রামচন্দ্রকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখলেন। হবারই কথা। তাঁকে সম্বুদ্ধ করবে কে? এখানেও লক্ষ্মণ। তিনি রামচন্দ্রকে নানা ভাষায় প্রবোধ দিয়ে পরিশেষে বললেন:

"নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি তদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব ॥"

পরম খুশী মনে তিনিও বীর ভ্রাতাকে বললেন—

"এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
পরিতোষশ্চ মে বীর মম কার্যানুশাসনে ॥"

অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞও সমাধা। এবারে লীলা সংবরণের পালা। সন্ন্যাসীর বেশে কালপুরুষ রামচন্দ্রকে সব জানালেন। একথা অতি গোপনে হ'ল, এবং সে সময়ে কেউ সেখানে এলে তার প্রাণদণ্ড হবে এই সর্তে রামও রাজী হলেন। এমনি সময়ে মূর্তিমান ধ্বংস-মূর্তির মতন দুর্বাসা এসে বললেন, এখনই রামের দর্শন চাই। নইলে বিপদ আছে। সমগ্র অযোধ্যা ভস্ম করে ফেলবেন। লক্ষ্মণ ক্ষণকাল চিন্তা করে স্থির করলেন:

"একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ববিনাশনম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥"

সন্ন্যাসিবেশী কালপুরুষ রামচন্দ্রকে লীলা সংবরণের কথা বললেন। রামও এবিষয়ে অঙ্গীকার করে বললেন:

"ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্যার্থং মম সম্ভবঃ।
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ॥"

কালপুরুষ বিদায় নিলেন। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম করে রুদ্রমূর্তি দুর্বাসার ক্রোধ প্রশমনের জন্য লক্ষ্মণ মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করে দুর্বাসার সংবাদ জানালেন। দুর্বাসার ইচ্ছা প্রচুর ভোজন। চতুর্বিধ অন্নাদি পেয়ে তিনিও খুশী মনে বিদায় নিলেন।

এইবার রামচন্দ্রের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা। প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। তাঁর অন্তরের সে ব্যথা তিনিই অনুভব করে কি যে করবেন স্থির করতে না পেরে বিমনা হলেন। এখানেও লক্ষ্মণের পৌরুষের সম্যক্ পরিচয় পাই। তিনি অকম্পিত বুকে বললেন :

"ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি।
পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী॥
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং
প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রয়ান্তি নরকং নরাঃ॥"

বশিষ্ঠাদি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও লক্ষ্মণের বাক্য সমর্থন করলেন। নিরুপায় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন :

"বিসর্জয়ে ত্বং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্যয়ঃ।
ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ
সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্॥"

এই আদেশ মাথায় করে লক্ষ্মণ আর দ্বিরুক্তি না করে সোজা সরযূ নদীতে গিয়ে ধ্যানে শরীর ছেড়ে দিব্য ধামে চলে গেলেন। কৃত্তিবাস বলেন :

"সরযূ নদীতে বহে খরতর নীর
তাহাতে ডুবিয়া তনু তাজে রঘুবীর।"

লক্ষ্মণকে বর্জনের আদেশ দিতে রামচন্দ্রের অন্তরের বেদনা যে কি গভীর হয়েছিল, তা খালি কল্পনায় অনুমান করা ভিন্ন গতি নেই। মহর্ষি বলেছেন : "বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমাহিতঃ" হয়েছিলেন। 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার'।

এর অল্প পরেই রামচন্দ্র, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রমুখ সবাই লীলাবসানে দিব্য লোকে চলে গেলেন।

লক্ষ্মণের এই অনুপম চরিত্র, যেখানে পৌরুষ, প্রেম, সত্য, ন্যায় ও ধর্মের অপূর্ব সমাবেশ, ভারতবাসীর অনন্তকালের জাতীয় সম্পদ। আজও ভ্রাতৃপ্রেমের উদাহরণ বললে লক্ষ্মণই—

"জগতের মাঝে যার ভাই বোন আছে,
শিখুক সে ভালবাসা লক্ষ্মণের কাছে।"

রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ প্রমুখের চরিত্রের ধ্যানে মনের ময়লা পরিষ্কার হয়ে সত্য ন্যায় ও ধর্ম সকলের অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে জাগ্রত হোক, এই প্রার্থনা।

"নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নিমরুদ্‌গণেভ্যঃ।"

পরিশেষে প্রণাম করি আদিকবি "ভারতের শিরশ্চূড়ামণি" ভগবান বাল্মীকিকে, যাঁর অমর লেখনীনিঃসৃত পীযূষধারায়, যুগ যুগ ধরে তৃষিত নরনারী শাশ্বত শান্তি লাভ করে ধন্য হচ্ছে :

"কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকি-
কোকিলম্॥"

মহিষমর্দিনী শ্রীশ্রীদুর্গা

স্বামী জীবানন্দ

দেবাসুরের সংগ্রাম উপনিষদে পুরাণে বহু স্থলে বিবৃত। ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দেবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগে আধ্যাত্মিকভাবে পরিবেশিত এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

দেবাসুরের একটি ভয়ঙ্কর সংগ্রামের কাহিনী মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে বিজড়িত। শ্রীশ্রীদুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী। শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রতিমায় দেখা যায়, মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করছেন। কে এই মহিষাসুর? কেনই বা দুর্গাদেবী তাকে নিধন করছেন?

অসুরদের রাজা মহিষাসুর অতি দুর্ধর্ষ। প্রথম মনুর অধিকার-কাল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীর দিব্য আবির্ভাব-তত্ত্ব ও মহিষাসুরবধের অত্যাশ্চর্য উপাখ্যান অনবদ্য ভাষায় অতি মনোজ্ঞভাবে সন্নিবেশিত।

প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবগণ পরাজিত ও উৎপীড়িত। কোন্ শক্তি-বলে মহিষাসুর দেবতাদের অধিকারসমূহ ছিনিয়ে নিয়েছে? ব্রহ্মার বরে অসুররাজ অমিতশক্তিশালী!

সুমেরু পর্বতে মহিষাসুরের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বললেন: বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার বাঞ্ছিত বর প্রদান ক'রব,

'বরং বরয়···দদামি তব বাঞ্ছিতম্।'

দেবীভাগবত, ৫।২।৭

মহিষাসুর প্রার্থনা ক'রল অমরত্ব: যাতে আমার মৃত্যুভয় না থাকে তাই করুন।

'যথা মৃত্যুভয়ং ন স্যাৎ তথা কুরু পিতামহ।'

ঐ, ৫।২।৮

পিতামহ ব্রহ্মা বললেন: জন্ম হলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী,

'উৎপন্নস্য ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।'

ঐ, ৫।২।৯

অতএব তুমি চিরজীবী হবার জন্য বর চেয়ো না, অন্য যে কোন বর তোমায় দিতে আমি প্রস্তুত।

মহিষাসুর প্রাণের আকূতি জানালো পিতামহ ব্রহ্মার কাছে: মৃত্যু যদি ধ্রুব তবে দেবতা দানব বা মনুষ্যজাতীয় কোন পুরুষ হ'তে যেন আমার মরণ না আসে। নারীকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, নারীকে গণনা করি না আমি।

ব্রহ্মা তখন বললেন: দেব দৈত্য যক্ষ রাক্ষস মানুষের মধ্যে কোন পুরুষ কখনো তোমাকে নিহত করতে পারবে না, এই বর তোমায় আমি দিচ্ছি। কোন এক সময়ে কিন্তু নারীর দ্বারাই তোমার মৃত্যু হবে, এটি জেনে রাখো।

'যদা কদাপি দৈত্যেন্দ্র নার্যাস্তে মরণং ধ্রুবম্।'

ঐ, ৫।২।১৪

শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, চরমদুর্দশাগ্রস্ত। মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকৃত। স্বর্গচ্যুত অধিকার-ভ্রষ্ট পরাভূত দেবতারা অসহায় সাধারণ মানুষের মতো পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। অত্যন্ত মনঃকষ্টে কাল কাটছে তাঁদের। প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী ক'রে তাঁরা শিব ও বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরাভব-কাহিনী ও মহিষাসুরের ভীষণ দৌরাত্ম্যের বিষয় এবং তাঁদের লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা সকাতরে জানিয়ে বললেন, এই

দুঃখের অবসান যাতে হয়, তাই তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে এসেছেন।

দেবতাদের মুখে অসুররাজ মহিষাসুরের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা শুনে মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধে তাঁদের আরক্তিম মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ ক'রল; মহাতেজ নিঃসৃত হ'ল তাঁদের উভয়ের ক্রোধ-দীপ্ত বদন থেকে। তারপর ইন্দ্রাদি অপর দেবগণের দেহ থেকে বিপুল তেজ নির্গত হয়ে একত্র মিলিত হ'ল। সম্মিলিত সেই তেজঃপুঞ্জ দিগন্তব্যাপী জ্বলন্ত পর্বতের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তখন সেই অনুপম তেজোরাশি একটি অপূর্ব দিব্য নারীমূর্তিতে পরিণত হ'ল। বিভিন্ন দেবতার তেজে দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—যথা শম্ভুর তেজে তাঁর মুখ, যমের তেজে কেশকলাপ, বিষ্ণুর তেজে তাঁর বাহু, ইন্দ্রতেজে শরীরের মধ্যভাগ, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্যতেজে পদাঙ্গুলি, অষ্টবসুর তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, বহ্নির তেজে চক্ষু, বায়ুর তেজে কর্ণ।

দেবগণ তাঁদের সকলের তেজোরাশি-সমুদ্ভূত অতুলনীয় সেই মাতৃমূর্তি দুর্গাদেবীকে দর্শন ক'রে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। নিজ নিজ অস্ত্র থেকে অনুরূপ অস্ত্র উৎপন্ন ক'রে দেবীকে সুসজ্জিত করলেন তাঁরা।

দেবগণ কর্তৃক অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা ও সম্পূজিতা হয়ে দেবী বারংবার অতি উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করলেন। অপরিমিত সেই ধ্বনিতে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ; ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠলো, চতুর্দশ ভুবন আকুলিত, সসাগরা ধরিত্রী বিচলিতা হ'ল।

হৃষ্টচিত্ত দেবগণ সালঙ্কারা ও সায়ুধা সিংহবাহিনী দুর্গাদেবীর জয়ধ্বনি করলেন ও তাঁর নাম দিলেন 'জয়া'।

অসুরেরা ত্রিলোকবাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে সৈন্যসমূহ সজ্জিত ও ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত ক'রে সমুত্থিত হ'ল। মহিষাসুর ক্রোধে 'আঃ একি!' ব'লে চীৎকার ক'রে অগণিত অসুরের সঙ্গে সেই শব্দের অভিমুখে ছুটে চ'লল।

মহিষাসুর দেখল সেই দুর্গাদেবীকে—যাঁর দিব্য অঙ্গের জ্যোতিতে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন আলোকিত, পদভরে পৃথিবী অবনত, মুকুট গগনস্পর্শী। পাতাল পর্যন্ত আলোড়িত হচ্ছে যাঁর ধনুকের টঙ্কারে। যিনি সহস্রহস্তে* সর্বদিক পরিব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমানা।

'স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২ ৩৭-৩৮

অনন্তর বিবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্রে সুসজ্জিত অসুরদের সঙ্গে দেবীর প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। মহিষাসুরের প্রবল সেনানায়কগণ ও তাদের রথারোহী গজারোহী অশ্বারোহী পদাতিক—কোটি কোটি চতুরঙ্গ সৈন্য নিহত হ'ল।

সমস্ত অসুরসৈন্য বিনষ্টপ্রায় দেখে ক্রুদ্ধ মহিষাসুর মহিষাকৃতি ধারণ ক'রে দেবীর বাহন সিংহকে বধ করতে উদ্যত হ'লে দেবী তাকে পাশবদ্ধ করলেন। তখন অসুর সিংহের

---

* দেবী সহস্রভুজা অর্থাৎ অনন্তভুজা হলেও অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা; 'অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।'—(বৈকৃতিক রহস্য) এখন দেবী দশবাহুসমন্বিতা দশপ্রহরণধারিণী-রূপে পূজিতা হন। দশভুজা দুর্গা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈশান নৈঋ'ত বায়ু অগ্নি উর্ধ্ব অধঃ—এই দশ দিক উদ্ভাসিত ক'রে বিরাজিতা।

রূপ ধ'রল, অম্বিকাদেবী তার মাথা কেটে ফেললে সে খড়্গধারী পুরুষরূপে দেখা দিল; দেবী তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ করলেন, সে হস্তীর আকার নিল, শুঁড় খণ্ডিত হ'লে আবার মহিষাকৃতি ধ'রে ত্রিভুবন ত্রস্ত ও আলোড়িত করতে লাগল। তখন দেবী—'রে মূঢ়! যতক্ষণ আমি মধু পান করি ততক্ষণ তুই গর্জন কর্। আমি তোকে বধ করলে দেবতারা শীঘ্রই এখানে আনন্দধ্বনি করবেন'—এই কথা ব'লে লাফ দিয়ে দুর্ধর্ষ মহিষাসুরের উপর চ'ড়ে তার ঘাড় পা দিয়ে চেপে ধ'রে তীক্ষ্ণ শূল বিঁধে দিলেন তার বুকে। তখন সে দেবীর চরণ দ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত! নিজের মুখ থেকে অন্য মহাসুররূপে অর্ধ'নিষ্ক্রান্ত হয়েই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল সে; সঙ্গে সঙ্গে দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হয়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ল। অবশিষ্ট অসুরসৈন্যসকল হাহাকার করতে করতে পালিয়ে গেল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ মহানন্দে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। দেবীকে দেবতাদের শক্তি-পুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি, সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি, পুণ্যবান্‌দিগের গৃহে লক্ষ্মী, পাপীদের গৃহে অলক্ষ্মী, শব্দব্রহ্মরূপা, পরমা ব্রহ্মবিদ্যা, চতুর্বর্গ-দাত্রী, দুর্গতিনাশিনী ইত্যাদি রূপে স্তুতি ক'রে দেবগণ বললেন:

'কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥'

ঐ, ৪.২২

—হে দেবি! অন্য আর কার সঙ্গে আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হ'তে পারে? আপনার সৌন্দর্যের তুল্য শত্রুভীতিজনক অথচ এত মনোরম সৌন্দর্যই বা কার আছে? হে বরদায়িনি! হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই দেখা যায়।

'সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥'

ঐ, ৪।২৬

—হে দেবি! ত্রিভুবনে আপনার যে-সকল সৃষ্টিস্থিতিকারিণী সৌম্যমূর্তি ও সংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি বিরাজিত, সেইসব দ্বারা আমাদের ও সমস্ত জগদ্বাসীকে রক্ষা করুন।

গান

[কানাড়া—একতাল]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

অঞ্জনহীন নিরঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রিয়ধন।
শ্রীরাম-অংশে দেহধারণ. বিবেকানন্দ-রঞ্জন॥
পুরুষসিংহ অমিতবিক্রম
মুনিমনোলোভা চন্দ্রবদন
শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণে অর্পণ
চিন্ময় তনু-প্রাণ-মন॥

অন্য প্রাণী হ'তে আসা মানুষের রোগ

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

শোনা যায়, আদিম যুগে মানুষ বন্য জীবন যাপন করত। তখন নিশ্চয় মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর মধ্যে সম্পর্ক ও সংস্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠ ছিল। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে মানুষ বন-জঙ্গলে হ'তে আরও দূরে সরে এসেছে বলে এখন জন্তুর সঙ্গে সম্পর্ক তত নিবিড় নয় সত্য, কিন্তু গৃহপালিত পশুকে বাদ দিলেও পৃথিবীতে বনজঙ্গল ও জন্তুর সংখ্যা এখনও খুব কম নয় এবং নানাভাবে তারা আমাদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। তা ছাড়া সভ্যতার মান অনুসারে এখনও বিভিন্ন দেশে বন্য জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যার তারতম্য আছে এবং এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আগামী বহুবৎসর পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বেশীই থাকবে।

সাধারণতঃ কোন কোন ব্যাধি মানুষের মধ্যে এবং কোন কোন ব্যাধি জন্তুজানোয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এক হ'তে অন্যতে যায় না। টাইফয়েড রোগের জীবাণু গরু ও কুকুরকে খাওয়ানো হ'লেও তাদের টাইফয়েড অসুখ হয় না। জন্তুজানোয়ারের নিজেদের মধ্যেও কোন কোন রোগ একরকম জন্তু হ'তে অন্যপ্রকার জন্তুতে বিস্তারলাভ করে না। আবার কতকগুলি অসুখ আছে যা সাধারণতঃ জন্তুজানোয়ারের হয়, কিন্তু সময় সময় তাদের দ্বারা মানুষও আক্রান্ত হয়। তাছাড়া আমাদের কয়েকটি রোগ আছে যা একজন হ'তে আর একজনে সংক্রামিত হ'তে গেলে, মাঝে কোন পশুপক্ষীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেইজন্য মানুষের অসুখ-বিসুখের কারণ ও বিষয় চিন্তা করতে হ'লে, কেবল মানুষের কথা চিন্তা করলেই চলবে না; পারিপার্শ্বিক পশু, পক্ষী, গৃহপালিত অথবা বন্য জন্তু, কীট, পতঙ্গ—সকলের কথাই মনে রাখতে হবে। কোন একটা রোগ দেশ হ'তে নির্মূল করতে হলে, কেবল তার লক্ষণ জানলেই চলবে না; রোগের কারণ, উৎপত্তি-স্থান, কোথায় কিভাবে সে লুক্কায়িত থাকে, কোন্ কোন্ অবস্থা তার অনুকূল ও প্রতিকূল —সবই জানতে হ'বে। এইসব জানতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক বৈজ্ঞানিকের বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের প্রয়োজন। বহু রোগের সম্বন্ধে নানা তথ্য অজানা আছে বলেই, তাদের প্রতিরোধ বা নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না।

অন্য প্রাণী হ'তে পাওয়া মানুষের অসুখের সংখ্যা অসংখ্য। তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটির বিষয় আলোচনা করব। এই রোগগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) জীবাণু-জনিত রোগ:

প্লেগ: সাধারণতঃ ইঁদুরের রোগ। ইঁদুরের গায়ে একরকম ফ্লী (flea) কীট থাকে, যারা ইঁদুরের রক্তপান করবার সময় অসুস্থ ইঁদুর হ'তে প্লেগের জীবাণুগুলি পায়। ইঁদুর মরে গেলে এই ফ্লীগুলি মৃত ঠাণ্ডা হওয়া ইঁদুরগুলির দেহ ত্যাগ করে, অন্য জীবন্ত ইঁদুর খোঁজে। সেই সময় কোন লোক কাছে পেলে তাকে কামড়ায়। এইভাবে মানুষের প্লেগ হয়।

অবশ্য মারাত্মক ধরণের প্লেগ আছে, তাতে ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হয় এবং তখন প্লেগের জীবাণু থুথুর মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অন্য লোকের শরীরে ঢোকে। সেক্ষেত্রে ফ্লী কীটের দংশন ব্যতিরেকেই প্লেগ হয়।

আজকাল অবশ্য প্লেগের ভয়াবহতা অনেক কমে গেছে, কারণ স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ও অন্যান্য এমন কয়েকটি ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যারা প্লেগের জীবাণুকে মেরে ফেলে।

কলকাতায় অবশ্য বহু বৎসর প্লেগ দেখা দেয় নাই। তবে দক্ষিণ ভারতের কোন কোন জায়গায় এই রোগ এখনও দেখা যায়। এই অসুখ নির্মূল করতে গেলে, ইঁদুর হ'তে এই রোগ দূর করতে হ'বে। মাঠে, জঙ্গলে অসংখ্য ইঁদুর গর্তে বাস করে। তাদের নির্বংশ করা কি সহজ কাজ? কলকাতায় বঙ্গ সরকারের একটি বিভাগ আছে, যেখানে সারা বৎসর ইঁদুর ধরে পরীক্ষা করা হয়। কারণ প্লেগ মড়করূপে আসবার আগে ইঁদুরের মধ্যে তার জীবাণু পাওয়া যাবে।

যক্ষ্মা : মানুষের যেমন যক্ষ্মা হয়, গবাদি পশুরও হয়। এই দুই প্রাণীর অসুখের যক্ষ্মা-জীবাণু ঠিক এক নয়। কিন্তু মানুষ গবাদি পশুর জীবাণু দ্বারাও অসুস্থ হ'তে পারে। সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করে লোকে রোগাক্রান্ত হয়। দুধ যদি ঠিকমত না ফুটানো হয়, তা হ'লে জীবাণুগুলি জীবন্ত অবস্থায় শরীরে ঢোকে এবং অসুখের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অবশ্য সমস্যাটি খুব বড় নয়,—তার একটি কারণ এই যে, এদেশে প্রায় সকলেই ফোটানো দুধ ব্যবহার করে। দুধের খাদ্যগুণ হয়তো একটু তাতে কমে, কিন্তু যক্ষ্মা-জীবাণু ধ্বংস হয়। পাশ্চাত্যদেশে গাভী হ'তে মানুষের যক্ষ্মা হ'বার সম্ভাবনা বেশী বলে সেখানে সমস্ত গাভীকে তার চামড়ায় একটি ইন্‌জেক্সন দিয়ে (Tuberculin test) পরীক্ষা করে তবে তাহার দুধ ব্যবহারের উপযোগী বলে গণ্য হয়।

স্যালমোনেলা (Salmonella) জীবাণু-জনিত জ্বর ও পেটের অসুখ :

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড অসুখের জীবাণুগুলিও একপ্রকার স্যালমোনেলা জীবাণু, কিন্তু তারা মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আরও বহুপ্রকারের স্যালমোনেলা জীবাণু আছে যারা গবাদি পশু, হাঁস মুরগি প্রভৃতি জন্তুর অন্ত্রে থাকে। তাদের মলের সঙ্গে নির্গত হয়ে এইসব জীবাণু নানাভাবে আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়কে দূষিত করে। এইসকল জন্তুর হয়তো তারা ক্ষতি করে না, কিন্তু মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ ক'রে তারা বংশবৃদ্ধি করে—রক্তকে দূষিত করে। ফলে জ্বর (যা অনেক সময় প্যারাটাইফয়েড বলে ভুল হয়), সাংঘাতিক রকমের পেটের অসুখ, বমি ইত্যাদি হয়। এই স্যালমোনেলা-সমস্যা সারা পৃথিবীব্যাপী। সদ্য-প্রসূত ডিম মুরগির মলে পড়লে, তার মধ্যে এই জীবাণু ঢুকে যেতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে আধা-রান্না মাংস টিনের কৌটায় প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এই জীবাণু যদি কোন রকমে তারমধ্যে থেকে যায়, তবে বদ্ধ কৌটায় তারা বংশবৃদ্ধি ক'রে হাজার হাজার লোককে অসুস্থ করতে পারে।

এ্যানথ্রাক্স (Anthrax) :

এ্যানথ্রাক্স জীবাণু মানুষের শরীরে একরকমের ঘা করে—যা হ'তে তার মৃত্যু হ'তে পারে। এই জীবাণুগুলি মূলতঃ পশুদের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু যারা পশুদের চামড়া নিয়ে কাজ বা ব্যবসা করে, তাদেরও এইরকম ঘা হ'তে পারে। ঘা হ'তে এই

জীবাণুগুলি খুব তাড়াতাড়ি রক্তে ঢুকে যায় বলেই এদের আমরা ভয় করি।

লেপ্টোস্পাইরা (Leptospira)-ঘটিত পাণ্ডুরোগ: সাধারণতঃ ইঁদুরের মধ্যে এই জীবাণুগুলি থাকে। তাদের প্রস্রাবের সঙ্গে বার হয়ে এরা ছোট জলাশয় বা কূপের জলকে দূষিত করে। মানুষ ঐ জল ব্যবহার ক'রে অসুস্থ হয়। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, কুকুরের দ্বারাও এই রোগের বিস্তার হয়।

(খ) ভাইরাস (Virus) বা জীবপরমাণুঘটিত রোগ :

কুকুর সমেত যে কোন উষ্ণরক্তবিশিষ্ট প্রাণী এই (Rabies) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে এবং সেই সকল প্রাণীর কামড়েই মানুষের জলাতঙ্ক রোগ হ'তে পারে। আমাদের দেশে কুকুরের কামড়েই সবচেয়ে বেশী লোকের এই রোগ হয়। তারপরেই আসে শৃগাল, বিড়াল ইত্যাদি। এই সকল জন্তুর লালায় এই ভাইরাস নির্গত হয় বলে শুধু যে কামড়ালেই এই অসুখ হয় তা নয়, তাদের নখে যদি লালা মিশে গিয়ে থাকে, তবে আঁচড়ের দ্বারাও এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ কুকুর যদি কামড়ানোর পরে দশদিন সুস্থ থাকে, তবে তার দংশনে জলাতঙ্ক হবে না, ঐটাই ধরে নিতে হবে। তবে কুকুর যদি সন্দেহজনক হয়, তার উপর দশ দিন লক্ষ্য রাখা যদি সম্ভব না হয়, অথবা শরীরের অনেক জায়গায় যদি কামড়ায় তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক ইন্জেকসন নেওয়া আরম্ভ করা উচিত।

জাপানীজ এনকেফালাইটিস (Japanese Encephalitis):

এই রোগে জ্বর হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়ে মারা যায়। জাপানে এই রোগ বেশী হয়, তবে দক্ষিণ ভারতে কয়েক জায়গায় এই রোগ ধরা পড়েছে। একরকমের কিউলেক্স (Culex) মশা এই রোগের ভাইরাসকে বহন করে। কয়েক রকমের পাখী, বাদুর (bat) প্রভৃতির দেহে এরা আশ্রয় করে থাকে এবং মশা এদের দেহ হ'তে ভাইরাস নিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়। শূকরের দেহও এই ভাইরাসের আশ্রয়স্থল (reservoir)—এইরূপ সন্দেহও করবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া গেছে।

কিয়াসানুর ফরেষ্ট (Kyasanur Forest) রোগ :

প্রায় কুড়ি বৎসর আগে মহীশূরের কিয়াসানুর জঙ্গলে দেখা গেল যে, অনেক বানর মারা যাচ্ছে। অনুসন্ধানে বার হল যে, একরকমের ভাইরাসই এর কারণ। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেদেরও ওই সময় জ্বর, রক্তক্ষরণ প্রভৃতি হচ্ছিল এবং কিছু কিছু লোক অজ্ঞান হয়ে মারা যাচ্ছিল। তাদের দেহেও পাওয়া গেল সেই একই ভাইরাস। গত কয়েক বৎসরে বহু বৈজ্ঞানিক ও কর্মীর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে জানা গেছে যে, এই ভাইরাস জঙ্গলের ছোট ছোট জন্তুর দেহে বাস করে এবং টিক (Tick) কীটের দংশনের দ্বারা ভাইরাস ওইসব জন্তু হ'তে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। গৃহপালিত গবাদি পশুও জঙ্গল হ'তে এই ভাইরাসকে গ্রামে নিয়ে আসে। এই ভাইরাস সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা :

সাধারণতঃ এই রোগ মানুষ হ'তে অন্য মানুষে সংক্রামিত হয়। এই প্রবন্ধে এই রোগের কথা আনছি অন্য কারণে। শূকরেরও

ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় এবং তার ভাইরাসও মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাসের সঙ্গে সমগোত্রীয়। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, কারও কারও ইনফ্লুয়েঞ্জা বৎসর বৎসর বা আরও কম সময়ের ব্যবধানে হয়। অর্থাৎ অন্য অসুখ হ'লে শরীরে যেমন প্রতিরোধক্ষমতা জন্মে, ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। এর কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস তার নিজের শারীরিক গঠন পরিবর্তন করতে পারে, অন্য অনেক ভাইরাস তা পারে না। অন্য রূপ নিয়ে আক্রমণ করলে আগের অসুখের ফলে পাওয়া প্রতিরোধক্ষমতা কার্যকরী হয় না। শূকরের ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস শূকরের মধ্যে নিজেকে আমূল পরিবর্তিত ক'রে যখন মানুষকে আক্রমণ করা শুরু করে তখন বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা-মড়ক শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের 'এসিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা', ১৯৬৮ সালের 'হংকং ইনফ্লুয়েঞ্জা' এর উদাহরণ।

বসন্ত : মানুষের ছাড়া গবাদি পশুরও বসন্ত হয়। সাধারণতঃ এদের স্তনের চারিপাশে বসন্তের স্ফোটক বার হয়। এর ভাইরাস মানুষের বসন্তের ভাইরাস হ'তে সামান্য পৃথক। যারা এই সব পশুর সেবা করে, তাদের কখনও কখনও এইসব জন্তুর ভাইরাস দুই-চারিটি স্ফোটক তৈরি করে। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি স্ফোটক সেই সকল লোকের আসল বসন্ত রোগকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এনে দেয়। ইংলণ্ডে দুগ্ধদোহনকারী গোপিনীর এইভাবে লব্ধ বসন্ত-প্রতিরোধক্ষমতা দেখেই জেনার (Jenner) সাহেবের মাথায় বসন্তের টীকা দেওয়ার পরিকল্পনা এসেছিল। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এত কার্যকর ভ্যাক্সিন (Vaccine) আর কোন রোগের বিরুদ্ধে আবিষ্কৃত হয় নাই।

বসন্ত রোগের ভাইরাস আর কোন প্রাণীর দেহে লুক্কায়িত থাকতে পারে কি না, এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অনেকদিন হ'তেই চলছে। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে অনেকের ধারণা যে, কই মাগুড় প্রভৃতি মাছের গায়ে বসন্ত রোগ হয়, এবং এদের হ'তে মানুষে এই রোগ ছড়ায়। কলকাতার স্কুল অফ্ ট্রপিকেল মেডিসিনে এই বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছিল, কিন্তু উপরি-উক্ত বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

বানরের বসন্ত হয়। এদের হ'তে মানুষে বসন্ত রোগ ছড়ায় কি না, এই বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) অনেক গবেষণা করেছে। আফ্রিকায় কয়েকজনের মধ্যে এইভাবে রোগের বিস্তার প্রমাণিত হয়েছে বটে, তবে সাধারণতঃ এরূপ হয় না। এই লোকগুলি জঙ্গলের পাশেই বাস করত এবং বানরের মাংস খাওয়া এদের অভ্যাস।

কিউ ফিভার (Q Fever) :

রিকেটসিয়া (Rickettsia) নামক এক-রকমের জীবাণু আছে যা টিক (Tick) কীট দ্বারা গরুতে সংক্রামিত হয়। সেই গরুর দুধ ভালভাবে না ফুটিয়ে পান করলে এই রোগ হয়। গোশালার ধূলির মাধ্যমে টিকের মলকণা নিঃশ্বাসে গিয়েও মানুষের অসুখ হ'তে পারে। এতে সামান্য জ্বর ও কাশি হয়।

সিটাকোসিস্ (Psittacosis)

সাধারণতঃ অসুস্থ পায়রা এবং কাকাতুয়া হ'তে এই রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে যায়। এই রোগে জ্বর ও কাশি হয়।

(গ) ফাঙ্গাস (Fungus) চর্মরোগ :

কতক প্রকারের ফাঙ্গাস-জীবাণু কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জন্তু হ'তে মানুষের শরীরে ঢুকে চর্মরোগ করে। সেজন্য বাড়ীতে পোষা

এইসব জন্তুর চর্মরোগ হ'লে সাবধান হওয়া উচিত।

(ঘ) কৃমিজনিত অসুখ :

টিনিয়া (Taenia) ক্রিমি :

এইগুলি লম্বা ফিতার মতো কৃমি। মানুষ আধারান্না গোমাংস বা শূকরমাংস খেয়ে এই অসুখে ভোগে। এই কৃমিদের জীবনালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা জীবনের খানিকটা অংশ কাটায় মানুষের অন্ত্রে কিন্তু বাকি অংশটার জন্য গবাদি পশুর শরীরে ঢোকে। এই কৃমি সারা পৃথিবীর সমস্যা। আমাদের দেশেও এইরূপ রোগীর সংখ্যা অল্প নয়।

হাইডাটিড সিষ্ট (Hydatid Cyst) :

এই জাতীয় কৃমি শরীরের নানা অংশে, এমন কি পেটের মধ্যেও টিউমারের মতো অসুখ সৃষ্টি করে। মানুষ সাধারণত: এই অসুখের কৃমির ডিম কুকুর হ'তে পায়। খাবারের মধ্য দিয়ে সেই ডিম আমাদের পেটে যায়। অসুস্থ ভেড়া বা অন্য জন্তুর মাংস খেয়ে কুকুর আক্রান্ত হয়। সরাসরি মানুষ হ'তে অন্য মানুষে এই রোগ সংক্রামিত হয় না। এই অসুখে শল্যচিকিৎসা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এই-জাতীয় আরও কয়েকটি অসুখের কথা বললাম না, কারণ সে সব অসুখ অন্য দেশে যথেষ্ট হ'লেও আমাদের দেশে দেখা যায় না।

অসুখ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে অনেক পুরাতন ধারণা বদলে যাচ্ছে। লোকালয়ে অথবা লোকালয়ের কাছে বাস করে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে নিরীহ এরূপ অনেক জন্তুকে এখন সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে, কারণ তাদের মধ্যে আমাদের অসুখের কারণ লুকানো থাকতে পারে। বেঁচে থাকার এবং বংশবৃদ্ধি করার চাহিদা বোধ হয় মানুষ হ'তে আরম্ভ করে জীবপরমাণু পর্যন্ত সকল প্রাণীর মধ্যেই আছে, এবং সেই জান্তব চাহিদা মেটাতে তারা তাদের অনুকূল আশ্রয় খোঁজে; আমাদের অসুখের সৃষ্টি হয় ঘটনাচক্রে। কোন এক প্রকার প্রাণীর দেহে যুগ যুগ ধরে বসবাস ক'রে হয়তো কোন জীবাণু বা কৃমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই প্রাণীর অভাব হ'লে তারা অন্য প্রাণীর দেহে নূতনভাবে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। অনেকে পারে না, এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যারা পারে তারা নিজেকে আবশ্যকমত পরিবর্তিত ক'রে হয়তো নূতন প্রকার জীবের সৃষ্টি করে।

মানুষের অসুখও যে অন্য প্রাণীতে সঞ্চারিত হ'তে পারে না, তা নয়; তবে তার সংখ্যা খুব কম।

জাগৃতি

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

ফুলের চিত্তে ফোটাও সুন্দরে
অভয় আশায় জাগাও অন্তরে।
নবীন চেতনা নীরব বেদনা
গভীর প্রাণের প্রকাশ প্রান্তরে
খুঁজে খুঁজে ফেরে সঞ্জীব মন্তরে

অনুভূতিময় আনন্দ সংগীতে
অজানা খুশির ভৈরবী ইংগিতে—
ঘুমন্ত জীব জাগ্রত শিব
প্রজ্ঞা বিভূতি জ্যোতির চত্বরে-
স্থির বিন্দুর সমাধি মুক্ত রে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব*

স্বামী সারদানন্দ

[পুনর্মুদ্রণ]

অতুল বাবুর (গিরিশ বাবুর চতুর্থ কনিষ্ঠ সহোদর) নিকট হতে প্রাপ্ত—(ওরফে নকর্ত্তা) "তা বুঝি জান না—আমি তো কিছুই বড় একটা নিয়ে যেতুম না। অপর সকলে তাঁর জন্য কত কি নিয়ে যেত। একদিন কাশীপুরে তাঁর নিকট বসে বসে মনে হ'ল—তা না হয়, যদি কিছু মুখ ফুটে নিজে চান, তো এনে দেওয়া যাবে। মনেও হওয়া, আর তিনি বলচেন—'আমার বার্লিটা ফুরিয়েচে; রাখাল, ত্থাখ, তো'। রাখাল কৌটা খুলিয়া দেখে—সত্যই নাই। ঠাকুর অতুলকে—'তুমি কালই ১ টিন বার্লি কিনে, আমায় পাঠিয়ে দেবে?' আমি ইতস্ততঃ করচি, কালই কেমন করে পাঠাই? অমনি তিনি বল্লেন—তুমি কাল সকালেই বার্লিটা কিনে বলরামের কাছে পাঠিয়ে বোলো যে, তাঁর আজ খাবার বার্লি নাই, আজই পাঠাতে হবে; তা হলেই সে পাঠিয়ে দেবে।

অতুলের প্রথম দর্শন—দীনু বোসের বাড়ী যখন ঠাকুর আসতেন আর মেজদাদা (G. C.) একদিন দেখতে যান, সেদিন মেজদাকে জিজ্ঞাসা করি 'কেমন দেখলে?' উনি উত্তরে বলেন—'একটা ভণ্ডকে ধরে এনেছে!' কাজেই উনিই, আমায় ভাঙ্গচি দিয়ে রেখেছিলেন। তারপর যখন ওঁরা তাঁর (ঠাকুরের) কাছে যাওয়া আসা করতে লাগলেন তখন দেবেন বাবুতে (মজুমদার) আর ওঁতে বসে ফুস্ ফুস্ ক'রে তাঁর কথা কন, আমায় সব লুকোন। একদিন (সম্ভবতঃ ১৮৮৫ মার্চ) দেবেন, হরিপদ ও উনি বসে ঐরূপ ফিস্ ফিস্ কচ্চেন, এমন সময় আমি গিয়ে সেখানে বসলুম —'কি কথা হচ্ছে—পরমহংসের? তোমাদের ও তো পরমহংস নয়, ও রাজহংস—লালপেড়ে কাপড়খানি, বার্নিস চটিটি, গায়ে জামাটি সব পরা আছে, খাটে গদিতে শোওয়া আছে,' ইত্যাদি। আমি ঐরূপ বলছি, এমন সময় তিনি (ঠাকুর) উপরে এসে পশ্চিম দরজায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে করতে (How deeply dramatic in a dramatist's place ! Ed.) বললেন, 'ভগবানের ইচ্ছায় এলুম, গিরীশ।' তিনি আমাদের সামনে দিয়ে অতটা এসেছেন, হেঁটে, তারপর বাড়ী ঢুকে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছেন, আমরা কেউ জানতে পারিনি—যতক্ষণ না তিনি ঐ কথা বললেন। চেয়ে দেখি—ঠাকুর—সঙ্গে নারাণ। মেজদাদা ও আর সকলে তো একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কল্লেন—লোকটা যাই হোন ব্রাহ্মণ—আর বাড়ীতে এসেছেন। তারপর প্রপিতামহের শিক্ষা ছিল 'ব্রাহ্মণ দেখলেই প্রণাম করবি, গুঁপো বামুনদেরও একটা করিস'—কাজেই আমিও হাত তুলে একটা প্রতিনমস্কার করলুম।

* লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার উপাদান সঙ্কিপ্তাকারে স্বামী সারদানন্দ যে দুইটি ডায়েরিতে লিখিয়া গিয়াছিলেন,—যাহার একখানিতে লেখা ছিল "References to be made in 6th part Lilaprasanga or কাশীপুরে ঠাকুর"—সেই দুইটি ডায়েরি হইতে লীলাপ্রসঙ্গে অপ্রকাশিত অংশগুলি এই গ্রন্থাকারে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে ১৩৫২ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রকাশিত হয়। এই অংশটি গ্রন্থের ১৬-১৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে।—সঃ

ঠাকুর ঘরের ভেতর এসে বসলেন। মেজদাদা তাঁর সামনে ও আমি মেজদাদার পাশে বসলুম—আর সব্বাই ঘিরে বসলো। বসেই মেজদাদা আমায় দেখিয়ে ঠাকুরকে—ইনি আমার ভাই, কিন্তু হলে কি হবে। ইনি আপনার নিন্দা করেন, এইমাত্র করছিলেন।—বলেই আমাকে বললেন, এখন যে চুপ ক'রে রয়েছ? Now, you are charmed by His Presence!—শুনে-ভাবলুম,—বটে? আমি তোমার পরমহংসকে থোড়াই ভয় করি।—ভেবেই ঠাকুরকে বললুম—মশাই, আপনি পরমহংস নন, রাজহংস, এই কথা বলছিলাম। ঠাকুর (শুনে মেজদাদাকে)—উনি তো নিন্দা করেনি, হংসের স্বভাব দুধে জলে মিশিয়ে দিলে, দুধটুকু চুষে খায়। আর কাশীতে যাও তো দেখবে, পরমহংসের ভিড়, গায়ে গায়ে পায়ে পায়ে ঠেকে—উনি আমাকে তাদের রাজা বলেছে, তা বেশ তো বলেছে।

আমি ভাবলুম, এ খুব তৈয়ের দেখছি, কোন কথাই গায়ে নিচ্চে না, সব ঝেড়ে ফেলচে—আচ্ছা', দেখছি কতখানি অভিমান আছে (প্রকাশ্যে)—'মশাই, আপনার নাম কি?' ঠাকুর (পূর্ব্বের ন্যায় আমার পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে)—আমাদের আবার নাম কিগো? "ওগো, হাঁগো" যা হয় একটা বলে ডাকলেই হবে—বুঝতে পারলেই হলো।—আমি ভাবলুম 'এ কি? এ যেন thought-reading দেখছি! কারণ আমিও তখন ঐ বিষয়ের একটু আধটু চর্চা করছিলাম, আর লোকের মনের কথা এক আধটা বলতেও পাচ্ছিলাম।'

ঠাকুর, ঝেড়ে দেওয়ার ভাবে, হাত বুলুতে বুলুতে আরও বলতে লাগলেন—"তোমাকে দেখে আমার ভয় হতো। সেদিন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি, নারাণের সঙ্গে। গিরীশ বাড়ী ছিল না। তুমি চৌমাথায় রকে বসে-ছিলে। নারাণ বললে—গিরীশ বাবুর ভাই বসে আছেন—জিজ্ঞাসা করবো?- গি-বাবু কোথায় গিয়েচেন? আমি বললুম—না। চল্ বলরামের বাড়ী যাই। তোমায় দেখে ভয় হোলো—তোমার দাড়ি দেখে—কেন বল দিকি? আজ তো ভয় কচ্চে না!"—আমি-তা মশাই, কেমন করে বলবো, কেন ভয় হলো, আর কেনই বা আজ হচ্চে না—আমি তো সেই মানুষই রয়েছি, আর দাড়িও তো সেই রকম রয়েছে (অ—বাবু উকিল—সঃ)!—এমন সময় শ্রীম—, পল্টু ছোট নরেন প্রভৃতি তিন চার জন এলো। ঠাকুর (ম—কে দেখেই নমস্কার ক'রে) "এস, এস, সাড়ে তিন খানা পাশ এস।" ম—প্রভৃতি হাসতে হাসতে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে, অপর বিছানাটিতে (তখন বৈঠকখানায় আমাদের মাঝে একটু ফাঁক রেখে দুটি বসবার জায়গা বিছানা হ'ত) বসলো। সাকার নিরাকার কথা উঠলো (লীলাপ্রসঙ্গ, পূর্ব্বার্দ্ধ ৯০)—তারপর কথা উঠলো—জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়? ঠা—দুটোই পথ, দুটো দিয়েই বস্তু (ভগবান) লাভ হয়। জ্ঞান দিয়ে যেখানে পৌছান যায়, ভক্তি দিয়েও সেইখানে পৌছান যায়। আর পৌছে দ্যাখে, শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান, দুই এক।—এইরূপ কথাবার্তার পর সকলে চলে গেলেন।

পরলোকে আলাউদ্দীন খাঁ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, প্রখ্যাত সরোদ-বাদক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ গত ৬ই সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের মাইহার-স্থিত নিজ ভবনে ১১০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে এক সন্ন্যাসীর সেতারবাদন শুনিয়া যন্ত্রসংগীতে তাঁহার মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়—যাহার ফলে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ী হইতে পলাইয়া কলিকাতা আসিয়া তিনি প্রথমে ধ্রুপদী নুলো গোপালের ও পরে আরো অনেকের কাছে বেহালাদি যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে আহম্মদ আলি খাঁ ও উজীর খাঁ-র কাছে যাইয়া সরোদ শিক্ষা করেন। শেষে মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজদরবারে স্থান পাইয়া সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' এবং বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধিভূষিত করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ করার সময় আলাউদ্দীন খাঁ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বেলুড় মঠে আসিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি কয়েকবার সরোদ বাজাইয়া শুনাইয়াছিলেন।

তাঁহার পরলোকগমনে ভারতের সঙ্গীত-জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

আমি যে মায়েরে পাই

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

আমি যে প্রতিটি দিন আমার সমস্ত অনুভবে
পাই চির স্নেহব্রতা জননীর শুভ্র প্রতিমাকে।
আশ্বিনে শিউলির মতো হাসি তাঁর কোন্ শান্তি আঁকে
আকাশে ও পৃথিবীতে, সে তো জানি চেতনার স্তবে!
মায়ের আনন্দ আছে বাৎসল্যের উজ্জ্বল প্রপাতে,
অবারিত হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহের উল্লাসে:
যেমন পদ্মের খুশি জ্বলে ওঠে রাত্রির প্রভাতে,—
আমার সমস্ত সত্তা জেগে ওঠে জননীর কাছে
সর্ব সমর্পিত হ'য়ে। স্নেহলিপ্সু বুকের সৌরভ
মায়ের আরতি করে,—মমতার নিবিড় উৎসব
তৃষিত নয়ন দুটি দেখতে চায় অক্লান্ত বিস্ময়ে:
আমি যে মায়েরে পাই প্রতিদিন হাসি অশ্রু লয়ে!

সাধু নাগ মহাশয়ের ভিটা

স্বামী শিবেশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের মত মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।" এত বড় মহাপুরুষের জন্মস্থান দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল বহুদিন থেকেই। কিন্তু দেশবিভাগের পর স্থানটি পাকিস্তানের অন্তর্ভু‘ক্ত ছিল বলে যাওয়া হয়ে উঠেনি, স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেবার পর যাওয়া হ'ল।

কলকাতা থেকে সকালে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পৌঁছে সেদিন বিকালেই আমরা কয়েকজন আশ্রমের গাড়ীতে রওনা হলাম নাগ মহাশয়ের লীলাভূমি দর্শন করতে। দশ-বারো মাইল অতিক্রম করার পর নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছি। সেখান থেকে দু-তিনটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হই। প্রায় দু' মাইল যাবার পর ছেলেরা এক বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিয়ে আমাদের নামতে বললে। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অতি সুন্দর পল্লীপরিবেশ। চারিদিক নিস্তব্ধ। ছেলেরা বললে—এই আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত নাগমহাশয়ের জন্ম-লীলা-ও সমাধিস্থান দেওভোগ গ্রাম। এখানেই এই ভিটেতেই নাগ মহাশয় জন্মেছিলেন এখন থেকে ১২৬ বছর আগে। তাঁর জীবনের কত গভীর আধ্যাত্মিক লীলা এখানে সাধিত হয়েছে! ১৩০৬ সালে এখানেই তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। এসব কথা স্মরণ হওয়ায় মনে হ'ল, ধন্য এই গ্রাম, ধন্য এর প্রতিটি ধূলিকণা, যে ধূলিকণা নাগ মহাশয়ের মত বিরাট আধ্যাত্মিকশক্তিধর মহামানবের বহু স্মৃতি শতাধিক বৎসর ধরে বহন করেছে।

পুরো নাম দুর্গাচরণ নাগ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গৃহে (সংসারে) থেকেই সাধন করতে বলেছিলেন। ঠাকুরের সেই বাক্য তিনি বহু বাধা সত্ত্বেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। গৃহে থেকেও তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছেন। লোকসমাজে তিনি সাধু নাগমহাশয় বলেই সুপরিচিত।

আমাদের দেখে পাশের একটি কুঁড়েঘর থেকে একজন আধাবয়সী লোক বেরিয়ে এলেন। নাম জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম তিনি জাতিতে মুসলমান। বহুকাল ওখানেই বাস করছেন। পাকবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের সময়ও কোনপ্রকারে প্রাণ বাঁচিয়ে তিনি ওখানেই ছিলেন। তাঁকে সাধু নাগ মহাশয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই অতীতের ইতিহাস অনর্গল বলে যেতে লাগলেন—সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। নাগ মহাশয়ের স্মৃতিবিজড়িত একটি বাড়ী দেখালেন। বাইরে থেকে দেখে দোতলা ব'লে মনে হ'ল। দরজা বন্ধ ছিল বলে বাড়ীটির ভিতর যেতে পারিনি। বাড়ীটির টিনের ছাউনি, নীচটা পাকা। দেখতে অনেকটা মন্দিরের মত। নাগ মহাশয়ের অনুরাগীরা নাকি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই বাড়ীটি তৈরি করে রেখেছেন।

এই বাড়ীটি এবং আশেপাশের নাগমহাশয়ের স্মৃতিবহনকারী স্থানগুলিও বেশ অক্ষত অবস্থাতেই রয়েছে দেখলাম। ঐ বাড়ীটির সংলগ্ন একটি চার-পাঁচ ফুট উঁচু বেদী (যার চারদিকটা বাঁধান) দেখিয়ে লোকটি বললেন, 'এখানে মা গঙ্গা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সেই অলৌকিক ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। সেবার অর্ধোদয় যোগ হয়েছিল। সেই যোগের তিন-

চারদিন আগে নাগ মহাশয় কলকাতা থেকে দেওভোগে ফিরেছেন। তাঁকে সে সময় গঙ্গাতীর ছেড়ে বাড়ী ফিরতে দেখে তাঁর বাবা দীনদয়াল নাগ অবাক হয়ে বললেন, 'এই গঙ্গাস্নানের যোগে কত লোক সর্বস্বান্ত হয়ে গঙ্গাতীরে যাচ্ছে, আর তুই গঙ্গাতীর ছেড়ে দেশে এলি! তোর ধর্মকর্মের মর্ম আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনও তিনচার দিন সময় আছে, আমাকেও নিয়ে গঙ্গাতীরে চল্।' নাগ মহাশয় বাবার কথায় একটু অবাক হলেন এবং গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'যদি সত্য সত্যই কারো অনুরাগ থাকে মা ভাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন, তাকে আর কোথাও যেতে হয় না।' তিন-চার দিন পর সেই স্নানের দিন এসে গেল আর যোগের সময় দেখা গেল সত্যি সত্যিই নাগ মহাশয়ের বাড়ীর পূব দিকের ঘরের অগ্নিকোণের মাটি ফুঁড়ে প্রবলবেগে জল উঠছে। ক্রমে সেই জল সমস্ত উঠানটি ভরিয়ে দিল এবং স্রোতের মতো প্রবাহিত হতে লাগল। নাগ মহাশয় তখন ঘরের ভিতরে ছিলেন। লোকের কলরব শুনে বাইরে এসে ব্যাপার দেখে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন। 'মা পতিতপাবনী! মা ভাগীরথী!' ব'লে জলের উৎসের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন আর গঙ্গাবারি নিজের মাথায় দিয়ে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন। পরে অনেকে উপস্থিত হয়ে সেই জলে গঙ্গাস্নান করতে আরম্ভ করলেন। সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 'জয় গঙ্গে! জয় গঙ্গে!' ব'লে চারিদিক থেকে দলে দলে লোক সেই জলে স্নান করতে লাগল। প্রায় একঘণ্টা জলের প্রবাহ চলার পর জলের উচ্ছ্বাস আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যায়। সত্যদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ এই অদ্ভুত ঘটনা শুনে বলেছিলেন, 'অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় এ কিছু অসম্ভব নহে। ইঁহাদের অমোঘ ইচ্ছাশক্তিতে জীব উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে।'

আমাদের মুসলমান ভাইটি গঙ্গাবারির উৎসের নিকটেই তিন-চার-ফুট উঁচু চারদিক বাঁধানো বেশ প্রশস্ত আর একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এইটিই নাগ মহাশয় এবং নাগ মহাশয়ের সহধর্মিণীর সমাধিস্থান।' গেলাম সেখানে, দেখলাম টিনের ছাউনি এবং টিনের বেড়া দিয়ে তৈরী পাশাপাশি ছোট্ট দুটি ঘর। বুঝলাম দুটি সমাধিস্থানের উপর এই দুটি ঘর নাগ মহাশয়ের ভক্তেরা তৈরি করে রেখেছেন। সমাধিস্থান স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন একটু দূরে একটি বড় পুকুরের ধারে। সেখানে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলতে লাগলেন। স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) নাগ মহাশয়ের জন্মস্থানে এসেছিলেন, এই পুকুরে মহানন্দে সাঁতার কেটেছিলেন ইত্যাদি কত কথা। এসবই তিনি শুনেছেন ছেলেবেলা থেকে এবং মনেও রেখেছেন, সশ্রদ্ধভাবে বলছেন আমাদের। নাগ মহাশয় ও স্বামীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দেখে বিস্মিত হলাম। এই হচ্ছে আমাদের দেশের নিজস্ব কৃষ্টি—যথার্থ ধর্মগুরুগণ, যে ধর্মেরই হোক, সবারই শ্রদ্ধা পান।

এ কথায় মনে পড়ল অতীতের আর একটি ঘটনা। স্বামীজী নাগ মহাশয়কে বলেছিলেন তাঁর দেশে যাবেন। স্বামীজীর ইচ্ছা শুনে নাগ মহাশয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন, 'এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে! কাশী হয়ে যাবে! সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?' নাগ মহাশয়ের জীবিত অবস্থায় স্বামীজীর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

নাগ মহাশয়ের দেহাবসানের পর স্বামীজী দেওভোগে পদার্পণ করেছিলেন। সেটা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকের ঘটনা। নাগ মহাশয়ের সহধর্মিণী তখন জীবিত ছিলেন। স্বামীজীর নিজের কথা : 'নাগ মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন! বাড়ীখানি কি মনোরম, যেন শান্তি আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নিয়েছিলুম। তারপর এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে, বেলা আড়াইটা! আমার জীবনে যে কয়দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে একদিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ মহাশয়ের স্ত্রী একখানি কাপড় দিয়েছিলেন। সেই খানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওয়ানা হলুম। নাগ মহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও যেমন হওয়া উচিত তেমন হয়নি।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী কত ভক্ত নাগ মহাশয়ের এই ভিটা দর্শন করেছেন। অতীতের কত স্মৃতি এই স্থানের সঙ্গে জড়িত। এখনও মনে হয়, সে ভাব যেন জমাটবাঁধা রয়েছে। স্বামীজীর ভাষায় সেই 'শান্তি আশ্রম'কে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে আমরা ঢাকা আশ্রমের দিকে রওয়ানা হলাম।

মা

শ্রীঅজয়কুমার গোস্বামী

স্থলে আর জলে পলে ও বিপলে
　করি অনুভব তোমারি করুণা
প্রতি পদে পদে ; হৃদি-কোকনদে
　ফোটালে কে মাগো ? তুমি কি অরুণা
মোর জীবনের উদয় গিরিতে ?
　আলোকে আলোকে আমারে ঘিরিতে

তোমার চরণযুগলে ফিরিতে
　টানিলে হেথায় ; যেথা হ'তে শুনা
যায় না জীবন-কলকোলাহল,
　যাহা সাধনার, সিদ্ধির স্থল
রয়েছে যেথায় বোধিদ্রুমদল
　সর্বতীর্থ গঙ্গা, যমুনা !

শরণাগত

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে রয়েছ মাথার উপরে, একথা তো ভুলে যাই
নইলে নিজেকে নিয়ে কেন এত অস্থির হয়ে পড়ি ?
ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় শিউরাই বার বার,
নিজেকে বাঁচাতে কত যে ফন্দি মনে মনে ভাঙি-গড়ি !
　তোমার চরণে শরণাগত যে, দুঃখ কিসের তার ?
　তোমাতে জীবন সঁপেছে যে জন, শঙ্কা তো তার নাই !

শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি

শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্তী

১৯১২ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাস। আমি ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু গুরুভ্রাতা দ্বিজেশচন্দ্র রায় (স্বামী বিদেহানন্দ) উভয়ে একসঙ্গে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ-দর্শন এবং মহাষ্টমীর দিন তাঁহাকে পূজা করার মানসে কলিকাতা যাই। সেবার পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) মঠে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীশ্রীমাকে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় আনয়ন করেন এবং মঠের উত্তর দিকের বাগান-বাড়ীতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করেন।

আমরা তিনজন—আমি, দ্বিজেশ ও দাদা—মহাষ্টমীর দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণপূজার অভিলাষে কাপড় ও পূজার অন্যান্য দ্রব্যসহ মঠে রওনা হই; তখন বেলা প্রায় দশটা। আহিরীটোলা ঘাট হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া মঠে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ বায়ু প্রতিকূল থাকায় মঠে পৌঁছাইতে প্রায় তিনটা বাজে। আমাদের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কত আশা লইয়া, কত ব্যাকুলতা বুকে ধরিয়া সুদূর পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামাঞ্চল হইতে দুই ভাই মাতৃ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি; মহাষ্টমীর দিন মহামায়ার শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়া জীবন সার্থক করিব, ভাগ্যদোষে তাহা আর হইল না। এ পরিতাপ রাখার স্থান কোথায়? যাহা হউক, নৌকা হইতে নামিয়া উত্তর দিকে পূজামণ্ডপের সন্নিকটে পূজোপকরণ হস্তে যখন উপস্থিত হইয়াছি, পূজনীয়া গোলাপ-মা দূর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার নিকটে যাইলে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "প্রাতে নয়টা হইতে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করিয়া করিয়া মা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আর কাহাকেও ঢুকিতে দেওয়া হইবে না—এইরূপ সিদ্ধান্তের পরও অতুলনীয়া সন্তানবৎসলা দয়াময়ী মা বাহিরে আরও কোন পূজার্থী আছে কি না দেখার জন্য এই লইয়া তিনবার হইল বাহিরে পাঠাইয়াছেন!" তাঁহার আদেশক্রমে আমরা যে ঘরে মা ভক্ত সন্তানদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি মা একখানি চেয়ারে হাস্যমুখে উপবিষ্টা। স্তূপীকৃত ফুল, বিল্বপত্র বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভারে ঘরটি পরিপূর্ণ। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) দেখাশোনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহিলা ভক্ত পূজোপকরণগুলি পূজান্তে যথাস্থানে রাখিয়া শ্রীশ্রীমার হস্তে এক একটি ফল-মিষ্টি-প্রসাদের ঠোঙা দিতেছেন। করুণাময়ী সর্বমঙ্গলা মা প্রত্যেকের হস্তে তাহার পূজান্তে ঐ প্রসাদের ঠোঙা অর্পণ করিয়া হাসিমুখে ও অতিশয় প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার মস্তকে অভয় হস্ত দ্বারা আশীর্বাদ করিতেছেন। তাহারা কৃতার্থ হইয়া বাহিরে যাইতেছে। আমরা তিনজনে পরপর মায়ের শ্রীপদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া অঞ্জলি এবং পূজাদ্রব্য অর্পণ করিবার পরই প্রসাদ ও আশীর্বাদ পাইয়া মহানন্দে বাহিরবাটীতে আসিলাম। বাহিরে আসিলে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ তোমাদের কেমন মা?" উত্তরে বলি, "জগতে যাঁর তুলনা মেলে না।"

দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব-কাহিনী

শিবদাস

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ভগবানকে পেতে হলে 'তাঁকে আপনার থেকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো হবে!' এই আপন করে নেওয়ার চরম পরিণতি হল তাঁর সঙ্গে চিরমিলন। সব সাধন-পথেরই চরমে তাই ঘটে বটে, তবে জ্ঞানপথে বা যোগের পথে আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে, যেন অনেক ঊর্ধ্বে উঠলে,—মনবুদ্ধিও ছাড়িয়ে গেলে তবে দেখা পাওয়া যায় সেই আপনজনের। ভক্তি কিন্তু সেই ঊর্ধ্বপ্রদেশ থেকে আমাদের নিত্য-উপলব্ধ জগতে, এমনকি আমাদের গৃহকোণেই ভগবানকে নামিয়ে এনে সংসারে যাদের আপনজন বলে ভাবি তাদেরই একজন করে নেয়।

ভগবানের সঙ্গে এমনি আপনজনের একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ভালবেসে তাঁকে আপন করে নিতে গিয়ে তাঁর সব ঐশ্বর্য ভুলে আমরা তাঁকে একেবারে ঘরের লোকই করে ফেলেছি। তাঁকে গোপাল কি রামলালা করেছি—যে মায়েরই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শিশুমাত্র, মা শাসন করলে যার চোখ দুটি সজলও হয়ে ওঠে। এটা আমাদেরই কল্পনামাত্র নয়, আপনবোধ গাঢ়তম হলে ভগবানও সত্যিই এরকম হন। কিছুদিন আগেও তো 'গোপালের মা'-র পাশে শুয়ে দামাল ছেলে গোপাল সারারাত 'খুঁত খুঁত' করেছে মাথায় দেবার বালিশ নেই ব'লে, সকালবেলা কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীর বাগানে মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জ্বালানির জন্য কাঠ কুড়িয়ে বেড়িয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে রামলালার দৌরাত্ম্য খুব বেড়ে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কখনো তাকে 'চড়টা চাপড়টা'ও বসিয়ে দিয়েছেন—তার 'পদ্মপলাশের মতো চোখ দুটি' জলে ভরে উঠেছে; কখনো বা কোল থেকে নেমে দৌড়াদৌড়ি, কাঁটাবনে গিয়ে ফুলতোলা বা গঙ্গার জলে ঝাঁপাই জুড়তে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলেছেন, 'ওরে, অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে,···ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর হবে,' তখন তার উত্তরে রামলালা 'ফিক ফিক করে' হেসে ভেংচি কেটেছে। আমরা আবার উমা করেছি তাঁকে—যে সর্ববিষয়ে আমাদের কন্যারই মতো। তাঁকে শিব-শক্তি করেছি—যাঁরা চরমসত্তার নির্গুণ ও সগুণ ভাবের মনবুদ্ধিগ্রাহ্য সাকার প্রতীকমাত্রই নন, আচরণে ঠিক আমাদের মা বাবারই মতো—পরস্পর পরস্পরকে শুধু গভীরভাবে ভালোই বাসেন না, মান-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটিও করেন; এমনকি মা কখনো কখনো রাগ ক'রে বাপের বাড়ী বা অন্যত্র চলেও যান, দরকার হলে মাঝে মাঝে বাবাকে একটু কড়া শিক্ষাও দিতে ছাড়েন না। ঐ রামলালা ও গোপালের মতোই আমাদের অতি-পরিচিত আপনজন তাঁরা।

দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব-কাহিনীগুলিও জগন্মাতাকে এরূপ আপন হতে আপন করে নেবার ভাবের ভিত্তিতেই রচিত। বিভিন্ন তন্ত্র-পুরাণাদিতে কাহিনীগুলি রয়েছে। অবশ্য, অতি নিপুণভাবে সাবলীলভাবে মানবিক ভাবের সহিত জগন্মাতার ঈশ্বরীত্বের ভাব, এমনকি শিবশক্তির অভিন্নতার ভাব, অদ্বৈত

ভাবও মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'মা স্বরূপে থাকতে চাইলেন', 'মা শিবকে গিলে ফেললেন,' 'মা প্রলয়কালে শিবকে পেটে পূরে সৃষ্টিকালে বমন ক'রে আবার বাইরে আনেন'—এসব ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তির অভিন্নতারই, অদ্বৈত ভাবেরই ইঙ্গিত।

আবির্ভাব-কাহিনীগুলি এইরূপ :[১]

দশমহাবিদ্যা: শিব ও সতী কৈলাসে থাকেন। সতী একদিন শুনলেন তাঁর বাপের বাড়ীতে, দক্ষালয়ে উৎসব হচ্ছে—বিরাট যজ্ঞ হবে। সতীর সেখানে যাবার ইচ্ছে হল। শিবকে জানালেন সেকথা। শিব কিন্তু এতে মত দিলেন না। বললেন, 'তুমি বা আমি—কাউকেই নিমন্ত্রণ করেনি; এক্ষেত্রে গেলে অপমানিত হতে হবে। তোমার গিয়ে কাজ নেই।' সতী তবু বারবার 'যাব, যাব' করতে থাকায় শেষে বিরক্ত হয়ে শিব বললেন, 'আমার কথা যখন শুনবেই না, তখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? যা ইচ্ছে হয় কর।' শুনে সতীও রেগে গিয়ে স্বরূপে থাকতে চাইলেন; 'শিব আমার স্বরূপ ভুলে গেছেন, তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন। ঠিক আছে, আমি যে কে, তা বুঝিয়ে দিচ্ছি!'—এই ভেবে সতী কালীরূপ ধারণ করলেন।

তন্ত্রমতে কালীরূপই হল চরম সত্তার, ভগবানের স্বরূপের আমাদের ধারণাগম্য শ্রেষ্ঠ প্রতীক; কালী ব্রহ্মবিদ্যা-প্রদায়িনীও। মনে হয় সেজন্যই মা শিবকে নিজস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত করবার জন্য প্রথমেই কালীরূপে আবির্ভূতা হলেন। সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে শিব ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? যেদিকেই যান, মা এক এক মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে সামনে দাঁড়ান। দশটি মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে মা দশদিক জুড়ে দাঁড়ালেন—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। শেষে, শিব ভীষণ ভয় পেয়েছেন দেখে মা কেবল কালী মূর্তিতে সামনে থেকে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, আমিই তোমার সতী। এই যে দশটি মূর্তি দেখলে এ সবই আমার রূপ।'

এই হল একসঙ্গে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব-কাহিনী। মহাভাগবত-পুরাণে এটি আছে।[২]

একসঙ্গে দশমহাবিদ্যার এই আবির্ভাব-কাহিনী ছাড়া কয়েকজনের পৃথক আবির্ভাব-কাহিনীও পাওয়া যায়:

কালী: নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে, দক্ষযজ্ঞের সময় দক্ষালয়ে গিয়ে শিবনিন্দা শুনতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন এবং হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কালী নামে খ্যাত হন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) আছে, শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক উৎপীড়িত দেবতারা যখন হিমালয়ে মহাশক্তির স্তব করছিলেন, তখন পার্বতী তাঁদের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেন,

১ শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাশ-রচিত 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা', এবং 'শ্রীশ্রীচণ্ডী', 'মহাভারত', 'দেবীভাগবত', 'বিশ্বকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংকলিত।—লেখক

২ বিভিন্ন গ্রন্থে নামের এবং সংখ্যারও বিভিন্নতা দেখা যায়। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ত্রয়োদশ মহাবিদ্যার এবং নিরুত্তরতন্ত্রে অষ্টাদশ মহাবিদ্যার কথা বলা হয়েছে—মহিষমর্দিনী দুর্গা, অন্নপূর্ণা, সরস্বতী প্রভৃতিও যার অন্তর্গত। নারদপঞ্চরাত্রে আছে, 'সপ্তকোটির্মহাবিদ্যা।' অবশ্য দশমহাবিদ্যাই প্রধান; তারও মধ্যে আবার কোন কোন মতে কেবল কালী ও তারাকেই মহাবিদ্যা বলা হয়েছে।

'তোমরা কার স্তব করছ?' দেবতারা কিছু বলার আগেই পার্বতীর দেহ-কোশ থেকে অম্বিকা (বা কৌশিকী) বের হয়ে এসে উত্তর দেন, 'দেবতারা আমার স্তব করছেন।' এভাবে অম্বিকার আবির্ভাবের পর পার্বতীর দেহ কালো হয়ে যায় এবং সেজন্য তিনি কালী নামে অভিহিতা হন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আরো আছে, শুম্ভাসুরের আদেশে তার চণ্ড মুণ্ড প্রভৃতি অনুচরেরা হিমালয়ে সিংহস্কন্ধাসীনা অম্বিকাকে ধরে আনতে গেলে ক্রোধে তাঁর মুখ কালো হয়ে যায় এবং তার ললাট থেকে কালী বের হয়ে এসে যুদ্ধে চণ্ড ও মুণ্ডকে বিনাশ ক'রে তাদের মুণ্ড দুটি এনে অম্বিকাকে উপহার দেন। তা দেখে অম্বিকা কালীকে বলেন, 'এখন থেকে তুমি চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হবে।'

কৌশিকী, চামুণ্ডা প্রভৃতির মতো ভদ্রকালীও কালীর একটি রূপ। মহাভারতে আছে, দক্ষযজ্ঞ বিনাশের জন্য শিবের ক্রোধ থেকে যেমন বীরভদ্রের, সতীর ক্রোধ থেকে তেমনি ভদ্রকালীর আবির্ভাব। দেবীভাগবতে আছে, এই সময় ভদ্রকালী কোটিযোগিনী-পরিবৃতারূপে আবির্ভূতা হয়ে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেছিলেন। যোগিনীতন্ত্রে আছে, কালী শিবকে মহিষাসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করে অসুর-ভাবাপন্ন হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন; বলেন, 'আমি ভদ্রকালীরূপে যুদ্ধে তোমায় বিনাশ করবো, তোমার বুকে (হৃদয়ে) আমার পাদপদ্মের বাম অঙ্গুষ্ঠ রাখবো,—"বামাঙ্গুষ্ঠপদাব্জস্য স্থাপয়িষ্যামি তে হৃদি"।'[৩]

তারা: তারার[৪] একটি নাম 'নীলা', 'নীল সরস্বতী।' মেরুর পশ্চিমকূলে লোচন-হ্রদের তীরে মা তিন যুগ ধরে জপ করেছিলেন; সেই সময় তাঁর 'মহা-ঊর্ধ্ব‌বক্ত্র' থেকে তেজ নির্গত হয়ে হ্রদের জলে পড়ে, যার ফলে মা নীলবর্ণা হয়ে যান।

ষোড়শী: কৈলাসে স্বর্গের অপ্সরারা এসেছেন শিবকে দর্শন করতে। তাদের সামনেই শিব কয়েকবার মাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকলেন। অপ্সরারা কত সুন্দরী, আর মায়ের রঙ কালো; তা না হয় হল, কিন্তু এদের সামনে বারবার 'কালী' বলে ডেকে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেওয়া কেন? মা খুব লজ্জা পেলেন। ঠিক করলেন, আর কালো থাকা চলবে না, গৌরবর্ণা হতে হবে। এই ভেবে কৈলাস ছেড়ে একেবারে সুমেরুতে চলে গেলেন।

এদিকে নারদ একদিন কৈলাসে এসে দেখেন, শিব একা। কি ব্যাপার? শিব বললেন, 'ব্যাপার আর কি, আমাকে ত্যাগ করে তিনি চলে গেছেন। কোথায় গেছেন জানি না।' তা আবার হয় নাকি—মা এক জায়গায় থাকবেন, শিব আর এক জায়গায়? নারদ মাকে ফিরিয়ে আনতে চললেন ধ্যানে

৩ জগতের সব ঘটনাই, কেবল আসুরিকভাবের বিনাশই নয়, তার উৎপত্তিও যে মায়েরই খেলা, তাঁর ইচ্ছাতেই হয়,—মায়ের এই অদ্ভুত শপথটি তারই ইঙ্গিত বহন করে।

ভদ্রকালীই যে দুর্গা, চামুণ্ডা প্রভৃতির মতো কালীরই একটি রূপ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দুর্গাপূজায় 'কালিকায়ৈ নমঃ', 'চামুণ্ডায়ৈ নমঃ' 'ভদ্রকাল্যৈ নমঃ' প্রভৃতি মহাস্নানের মন্ত্রে, 'দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ ··· যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ৈ ··· ভদ্রকাল্যৈ ··· দুর্গায়ৈ নমঃ' পূজার এই মূলমন্ত্রে, এবং সন্ধিপূজাকালে মাকে দুর্গারূপে নয় চামুণ্ডারূপে পূজার বিধানে। দুর্গার ধ্যানমন্ত্রেও পাওয়া যায়, তিনি 'বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি' রেখেছেন।

৪ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রমতে, কালী ও তারার মধ্যে 'ন ভিন্নতা'। উভয়ের ধ্যানমন্ত্রও অনেকাংশে একইরূপ।

জানলেন মা সুমেরুতে। সেখানে গিয়ে বললেন, 'মা, তুমি তো চলে এসেছো—ওদিকে শিব আবার বিয়ে করার উদ্যোগ করছেন যে!' নারদের কথায় কাজ হল—মা তখনি অতি অপরূপ রূপ ধারণ করে কৈলাসে ফিরে এলেন। এসে দেখেন শিবের হৃদয়ে এক অপরূপ সুন্দরীর ছায়া! দেখে ভাবলেন, 'নারদ তো তাহলে ঠিকই বলেছে, আমার অনুপস্থিতিতে আর একজন শিবের হৃদয় অধিকার করে বসেছে!' কাণ্ড দেখে মা শিবকে খুব বকতে লাগলেন। শিব হেসে বললেন, 'ভাল করে দেখ আগে, তারপর তো বকবে। আমার হৃদয়ে যে ছায়া দেখছো, ও তো তোমারই ছায়া—তোমারই তো ধ্যান করছি বসে বসে।' মা দেখেন, সত্যিই তাই; তখন শান্ত হলেন। মাকে ষোড়শবর্ষীয়া এবং ত্রিভুবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-মণ্ডিতা দেখে শিব তাঁর নাম রাখলেন 'ষোড়শী', 'পঞ্চমী', 'শ্রী' ও 'ত্রিপুরসুন্দরী।' নারদপঞ্চরাত্রে কাহিনীটি আছে।

ধূমাবতী: ধূমাবতীর আবির্ভাবের তিনটি কাহিনী পাওয়া যায়। স্বতন্ত্রতন্ত্রে আছে, দক্ষযজ্ঞের সময় ভীষণ রেগে গিয়ে মা সেই যজ্ঞাগ্নিতে দেহবিসর্জন করেন। তখন সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে ধোঁয়া উঠে চারিদিক ছেয়ে ফেলে। সেই ধূমরাশি থেকেই ধূমাবতীর আবির্ভাব হয়।

নারদপঞ্চরাত্রে আছে, কৈলাসে মা একদিন শিবকে বললেন, 'বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।' মা খেতে দেন বলেই শিবের অন্ন জোটে, তিনি খাবার পাবেন কোথায়? তাই বোধ হয় কি করা যায় তা ভাববার একটু সময় নেবার জন্য বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর।' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মা আবার বললেন, 'কই, খেতে দাও, খুব খিদে পেয়েছে যে!' শিব আবার বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর।' মা কিন্তু আর অপেক্ষা করলেন না, খিদের জ্বালায় শিবকেই মুখে পুরে গিলে ফেললেন। তা শিব তো অমর, চৈতন্যস্বরূপ, তাঁর দেহ থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে, আবার ইচ্ছামতো যে-কোন দেহ ধারণও করতে পারেন; খেয়ে ফেলে মা তাঁর আর করবেন কি? শিব অন্য একটি দেহ ধারণ করে বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখ, তুমি আমাকে—তোমার স্বামীকে যখন খেয়ে ফেলেছো, তখন তো বিধবা হয়েছ? কাজেই শাঁখা খুলে, সিঁদুর মুছে বিধবার বেশ ধারণ কর। এই বেশে তোমার নাম হবে "ধূমাবতী", এবং "বগলামুখী"ও।'*

কুব্জিকাতন্ত্রমতে মা ধূম্রাসুরকে বধ করে-ছিলেন বলে তাঁর নাম হল ধূমাবতী।

ছিন্নমস্তা: ধূমাবতীর কাহিনী তো হল মায়ের নিজের খিদের জ্বালায় স্বামীকে খেয়ে ফেলার কাহিনী। ছিন্নমস্তার আবির্ভাবকাহিনী আরো ভয়ঙ্কর, আবার মাতৃস্নেহের পরা-কাষ্ঠারও কাহিনী—মা সন্তানদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নিজেই নিজের মাথা কেটে তাদের নিজের রক্ত খাইয়েছিলেন, আবার নিজেও খেয়ে-ছিলেন।

নারদপঞ্চরাত্রে আছে, মা একদিন তাঁর দুজন সখী—ডাকিনী ও বর্ণিনীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দাকিনীতে নাইতে গেছেন। স্নানের পর সখী দু-জনের খুব খিদে পায়। তাঁরা বললো, 'মা, খুব খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' মা তো

* অন্যত্র কালী এবং ভৈরবীরও শিবকে গ্রাস করার কথা আছে।

আর খাবার সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে আসেন নি, খিদে পেয়েছে তা বাড়ী ফিরে গিয়ে খাবে-'খন; তাই বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর।' সখী দুজন তখন খিদেতে অস্থির হয়ে বললো, 'মা, খুব খিদে পেয়েছে, অপেক্ষা করতে পারছি না, এখনি কিছু খেতে দাও। তুমি তো জগতের সকলেরই মা—ছেলেরা খিদে পেলে মা ছাড়া আর কার কাছে খাবার চাইবে?' একথা শুনে স্নেহবিগলিত হয়ে মা বাম নখাগ্র দিয়ে নিজের মস্তক ছিন্ন করে বাঁ-হাত দিয়ে সেই ছিন্নমস্তকটি ধরে রইলেন, তাঁর কাঁধ থেকে তিনটি রক্তের ধারা বেরিয়ে এল; দুপাশের ধারা দুটির একটি ডাকিনীর মুখে এবং অপরটি বর্ণিনীর মুখে পড়ল, মাঝের ধারাটি পড়ল তাঁর বাঁ-হাতে ধরা নিজের মুখেই। সখীদের পেটভরে খাওয়া হবার পর মা তাদের নিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি ঘরে ফিরে গেলেন।

বগলা: বগলার আবির্ভাব-কাহিনী আছে স্বতন্ত্রতন্ত্রে। একবার দারুণ ঝড়ে চরাচর বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। জগৎপালক বিষ্ণু ঝড় থামাবার জন্য প্রচণ্ড তপস্যা করে মাকে প্রসন্ন করলে মা ঝড় থামিয়ে দেন, জগৎ রক্ষা পায়; মা তখন হরিদ্রা হ্রদে জলক্রীড়া করছিলেন—সেই হ্রদের তীরেই তিনি বগলা-মূর্তি ধারণ করেন।

মাতঙ্গী: স্বতন্ত্রতন্ত্রে আছে, মতঙ্গ নামে এক মুনি সব প্রাণীকে নিজবশে আনার জন্য কদম্বকাননে শতসহস্র বৎসর তপস্যা করেন। সেই তপস্যার ফলে দেবী সুন্দরীর (ষোড়শী) নেত্র হতে তেজ উৎপন্ন হয়ে প্রথমে কালিকা, পরে মাতঙ্গী রূপ ধারণ করে।

কমলা: স্বতন্ত্রতন্ত্রমতে, জগৎসৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মা কমলারূপে আবির্ভূতা হন। ইনিই মহালক্ষ্মী। দেবীভাগবতে আছে, কল্পারম্ভে মহাশক্তি মহালক্ষ্মী রূপ ধারণ করে কারণসলিলে ভাসমান বিষ্ণুর শক্তিরূপে আবির্ভূত হন। ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় ইনিই সাগর থেকে উঠেছিলেন।

ভৈরবী ও ভুবনেশ্বরীর পৃথক আবির্ভাব-কাহিনী কিছু আছে কিনা জানি না। তাঁদের নামের তাৎপর্য হল বিশ্বকে ভরণ, বিশ্ব নিয়ে রমণ অর্থাৎ লীলা, এবং প্রলয়কালে বিশ্বের সঙ্গে শিবকেও উদরস্থ ক'রে সৃষ্টিকালে বমন ক'রে আবার তাঁকে বাইরে আনেন বলেই তিনি '**ভৈরবী**'; ত্রিভুবনকে পালন করেন বলেই তিনি '**ভুবনেশ্বরী**'।

দশমহাবিদ্যার যে-কোন রূপের আরাধনা-তেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—যে যা চায় সবই পায়; বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বিশেষ মূর্তির আরাধনার বিধানও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, শক্তিরই অবতার। মহাশক্তিই লোককল্যাণার্থে মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হন (তন্ত্রের মহাশক্তিই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, আবার নির্গুণ ব্রহ্মও)। দশদশ-মহাবিদ্যাই যে দশাবতার, তন্ত্রসারে সে কথা আছে—'কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী' ইত্যাদি—কালিকা কৃষ্ণ, তারা রাম, বগলা কূর্ম, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভৈরবী বরাহ, সুন্দরী (ষোড়শী) পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী বামন, কমলা বুদ্ধ, এবং দুর্গা কল্কি। তন্ত্রসারমতে অবতার ত্রয়োদশজন, দুর্গা যাঁদের অন্যতম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা কেঁদে উঠেছিলেন এই বলে, 'মা কালী গো, কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!'

সমালোচনা

ঋষি অরবিন্দ : ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সবিতা প্রকাশন, ২৪৫এ, ব্লক জে, নিউ আলিপুর, কলিকাতা ৫৩। ডিমাই ১৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলার, তথা ভারতের, গর্বের বস্তু হলেও বাঙালীর খুব কাছের মানুষ নন। কারণ, ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে যেদিন তিনি পণ্ডিচেরি যাত্রা করেন সেদিনই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর থেকে দীর্ঘ ৪০ বৎসর—১৯৫০ সালের শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচেরিতেই তিনি করেন দিব্য জীবনের সাধনা। এই সাধনায় বাঙালী গর্ব বোধ করলেও, এর কাছাকাছি কখনও আসতে পারেনি। পণ্ডিচেরি যে বাংলা হতে অনেক দূরে! তা'ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের অধিকাংশ লেখাই ইংরেজীতে। এই ইংরেজী আবার ভিক্টোরীয় যুগের ঝংকারপূর্ণ 'রাজভাষা' (King's English)—যে ভাষার সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর খুব পরিচয় নেই। বাংলায় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকাকালীনও শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করেননি। এই সব কারণে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালীর এক শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের ভাবই আছে—যে বিস্ময়কে নির্বাক বিস্ময় বলে বর্ণনা করা চলে। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালী তাঁকে জানতে, বুঝতে উৎসুক, অথচ ঠিক জানতে বা বুঝতে পারে না। তিনি কাছে থেকেও দূরের মানুষ! এই কারণে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বর্তমান গ্রন্থ আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও এক বিশেষ অবদান। একটানা পড়ে শেষ করার মত বই, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী, সাধনার একরূপ পূর্ণ পরিচয়ই পাওয়া যায় এতে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনেতিহাসকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়: (ক) প্রস্তুতি-পর্ব, (খ) রাজনৈতিক জীবন এবং (গ) দিব্য জীবনের জন্য সাধনা ও সিদ্ধি পর্ব। নিপুণ শিল্পীর অনায়াস ভঙ্গিতে লেখক তিনটি পর্বেরই আলেখ্য রচনা করেছেন। ত্রিশ পাতার মত দীর্ঘ ভূমিকায় দিয়েছেন এর পূর্বাভাষ, যা পরবর্তী পরিস্ফুটনের পূর্ণাংগ ইংগিত বহন করে।

গ্রন্থখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো অবিকৃত সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। লেখকের নিজের ভাষায়, 'মহাপুরুষের জীবনী একটা জাতির ইতিহাস। অতিরঞ্জিত করা বা তাঁদের ছোট করার প্রচেষ্টা ইতিহাসের বিকৃতি।' বর্তমান গ্রন্থের কোন অংশে ডক্টর ঘোষকে সত্যবিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না।

গ্রন্থখানি শ্রীঅরবিন্দের জীবনালেখ্য, কিন্তু এই মহৎ দিব্য জীবনের মূল সুরটি লেখক খুঁজে বের করে সামগ্রিক আলোচনায় তাকে সার্থক-ভাবে বহন করেছেন। ব্যক্তিগত সিদ্ধি বা মোক্ষ নয়, দেবমানব-সৃষ্টিই—এই জীবনের লক্ষ্য ও বাণী, এটা লেখক সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই।

তবে এই প্রসংগে একটা কথা মনে ওঠে। ডক্টর ঘোষ লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের মূল সুর হলো ধর্মসমন্বয়। শুধু কি তাই? স্বামী বিবেকানন্দকে কি এতেই সীমাবদ্ধ করা যায়?

তবুও কিন্তু সব দিক দিয়ে গ্রন্থখানি এক উল্লেখযোগ্য রচনা, যাকে স্বাগত না জানালে

নিজেরই সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হয়। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। অবশ্য ভেতরের ছ'খানি আলেখ্যের একখানি প্রচ্ছদপট হিসাবে ব্যবহার করলে দেখতে সুন্দরতর হতো। বলা যায়, অকপট সত্যবিকাশ-সহ শ্রদ্ধাঞ্জলির এইরকম মনোজ্ঞ অথচ সংক্ষিপ্ত রচনা বাংলা ভাষায় বেশী নেই।

—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বন্যার্তসেবা: মালদহে গত জুলাই মাসে ১৩১টি কুটির নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে। চাষের জন্য ৬৭টি হালের গরু বিতরণ করা হইয়াছে।

আসামের কাছাড় জেলায় বন্যাগ্রস্ত ৪টি গ্রামে শিলচর আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ-কার্যে ৩০০টি পরিবারের ১,৪২৬ জন লোককে ১,৪২৬ কেজি চাল, ৬৮ খানি ধুতি ও ১০২ খানি শাড়ি বিতরণ করা হইয়াছে।

খরাত্রাণকার্য: রাঁচি (মোরাবাদী) আশ্রম কর্তৃক বিহারের রাঁচি জেলার ভিতরে ও বাহিরে ১০টি গ্রামে জলসেচনের উদ্দেশ্যে ৬টি নূতন কূপ খনন এবং ২৯টি পুরাতন কূপের সংস্কার করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে সেবাকার্য: রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাংলাদেশে সেবাকার্যের জন্য যে ৮টি সেবা-শিবির পরিচালিত হইতেছে তাহাতে দুঃস্থ জনগণের সেবায় এখন পর্যন্ত নগদ ১১,০৯,৩১৪ ৬৪ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

বাগেরহাটে কুমারখালি কেন্দ্র কর্তৃক ১৫১টি কুটির নির্মাণ এবং ১৮টি নলকূপ বসানো হইয়াছে; ইহা ছাড়া নূতন ভবন নির্মাণ করিয়া একটি প্রাইমারী স্কুল খোলা হইয়াছে। ১৫. ৮. ৭২ পর্যন্ত বিতরিত দ্রব্যাদি: কম্বল ৫০০, ধুতি ২,১৬৭, শাড়ি ৩,৬০০, সোয়েটার ১,৭০০, লণ্ঠন ২০০, মিল্ক পাউডার ১,১১২ কেজি, বেবি ফুড ৩৮৪ কেজি, জুতা ১০০ জোড়া, বাসন ১৬৩, পুরানো কাপড়চোপড় ৬০০। ১০টি স্কুলে ছাত্রদের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম দেওয়া হয়।

দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক গত জুলাই মাসে (১৯৭২) অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে বিতরিত হইয়াছে: কম্বল ৫৮৯, ধুতি ৮২৪, শাড়ি ৪৫,৫৬, সাবান ১০৭, পুরানো কাপড় ইত্যাদি ২,৯৫০, কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কোদাল ৮৮৬। গৃহহীনদের জন্য ১১টি ঘর তৈরী করা হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে বরিশাল কেন্দ্র কর্তৃক বিতরিত জিনিসপত্র: কম্বল ১৯১, ধুতি ১,৮২৩, শাড়ি ৭,৭৬১, সোয়েটার ৫৬৯, মশারি ৯৪, পুরানো কাপড় জামা ইত্যাদি ৪,৩০২, সাবান ৪৫১, গুঁড়া দুধ ১,১৩৬ কেজি।

গত ৯. ৮. ৭২ তারিখে বাগেরহাট সাব-ডিভিসনে বিষাই সেবা-শিবির কর্তৃক নবনির্মিত ১৫১টি কুটিরের ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সেবা ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মিঃ এ. এইচ. এম. কামরুজ্জমান।

গত ১০ই আগষ্ট বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ দশানি গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নির্মিত ১০০টি গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্থানীয় মহকুমা-প্রশাসক জনাব মুকুল ইসলাম; এই

উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন; স্বামী চিদাত্মানন্দ (প্রধান অতিথি), স্বামী লোকেশ্বরানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দেন।

বিশেষ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ চোখের চিকিৎসার জন্য বিমানযোগে গত ৪ঠা আগস্ট বোম্বাই এবং সেখান হইতে ৬ই আগস্ট বোস্টন রামকৃষ্ণ মিশন বেদান্ত সোসাইটিতে পৌঁছিয়াছেন। চিকাগো আশ্রমের ব্রহ্মচারী ধ্রুব তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। ৮ই আগষ্ট তিনি ম্যাচাচুসেটস্ হাসপাতালে ভরতি হন, ৯ তারিখেই বাম চক্ষুর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। ১৫ই আগস্ট হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া তিনি বোস্টন আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। চিকিৎসকগণের মতে অস্ত্রোপচার সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে, তবে দৃষ্টিশক্তি কতখানি ফিরিয়া আসিল পরেতাহা বুঝা যাইবে।

মাদ্রাজ মঠের প্ল্যাটিনাম জুবিলী

গত ৬. ৮. ৭২ হইতে ১৩. ৮. ৭২ পর্যন্ত মাদ্রাজ মঠের প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবিধ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে অনুষ্ঠিত এই উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ, মাদ্রাজ মঠের পুরাতন কর্মী প্রায় ৫০ জন সন্ন্যাসী বহু ভক্ত ও সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়। তামিল নাডুর রাজ্যপাল শ্রী কে. কে. শাহও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের নূতন ব্লকের উদ্বোধন

গত ১৫ই আগষ্ট প্রায় ৭০ জন সন্ন্যাসী ও বহু ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণাংশের নবনির্মিত সপ্ততল হাসপাতালভবনটির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ছিল। পরদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার উদ্বোধন ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা। সভায় বেলুড় মঠ শিক্ষার্থী শিবিরের ব্রহ্মচারিগণের বেদপাঠ, আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রেসিডেণ্ট জে. সি. দে-র স্বাগত ভাষণ এবং সেক্রেটারী স্বামী গহনানন্দের বিবৃতি-পাঠের পর মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, স্বামীজীর সত্য- সততা- ও স্বার্থত্যাগ-ভিত্তিক সেবার আদর্শই সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই আদর্শই দেশবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া সেবার হস্তকে সর্বত্র সঞ্চারিত করিলেই বর্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

বিবিধ

গত ১৪. ৮. ৭২. তারিখ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মমবালম (মাদ্রাজ) রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসের নবনির্মিত পাঠগৃহের এবং ১৬. ৮. ৭২ তারিখে নণ্ডরমপল্লী আশ্রমের নবনির্মিত 'শিবানন্দ হল'-এর উদ্বোধন করেন।

২৪. ৮. ৭২ তারিখ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ত্রিবান্দ্রমে হাসপাতালের সম্প্রসারিত অংশ ত্রিতলের উদ্বোধন করিয়াছেন।

১৭. ৮. ৭২ তারিখ চেরাপুঞ্জীতে উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপটেন উইলিয়ামসন এ. সাংগমা।

১৯. ৮. ৭২ তারিখ মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ

মিশন হাই স্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সাধারণ সভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

এই বৎসর কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের একটি ছাত্র রাজ্যের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রগণ কমার্স বিভাগে প্রথম চারটি স্থান এবং কৃষি-বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই পরীক্ষায় পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ টেকনিক্যাল গ্রুপে প্রথম দুইটি স্থান ও কৃষি-গ্রুপে চতুর্থ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

স্বামী শৈলজানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, স্বামী শৈলজানন্দ গত ১লা আগষ্ট '৭২ বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। ১৯২৩ খৃঃ তিরুভল্লা আশ্রমে যোগদান করিয়া সেখানেই দীর্ঘকাল ছিলেন ; কয়েক বৎসর হইতে ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিছুকাল তিনি মালয়লম মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ কেরলম্'-এর সম্পাদনা করিয়াছিলেন। সরল ও কঠোর জীবনযাপনের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন তিনি। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

কল্যাচক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ৭ই জানুআরি এবং ৩১শে মে স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মতিথি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা-পাঠ, ছাত্র-শিক্ষক-সম্মেলন, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন-সঙ্গীত ও বক্তৃতার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই সব অনুষ্ঠানে স্বামী সুতীর্থানন্দ, শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ এবং শ্রীকমলকুমার প্রামাণিক ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

দেলুয়া (পাবনা, বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১১ হইতে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, ৩২-প্রহর নামকীর্তন, শ্রীশ্রীকালীপূজা, দরিদ্রনারায়ণসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও সেবাদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব রকিব উদ্দীন আহ্‌মেদ (সভাপতি), স্বামী চেতসানন্দ (প্রধান অতিথি), শ্রীসুভাষ ভৌমিক, শ্রীযামিনীকান্ত সরকার, অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র পোদ্দার ও শ্রীক্ষিতীশানন্দ সান্ন্যাল। শেষদিন দুঃস্থদের কাপড়, গেঞ্জি, কম্বল প্রভৃতি বিতরণ করা হয়

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত ভাদ্র সংখ্যার ৪২৫ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম 'নলিনীকান্ত' স্থলে 'নীলকান্ত' হইবে।



দিব্য বাণী

পুংরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং স্ত্রীরূপাং বা বিচিন্তয়েৎ।
অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥

—কুলার্ণবতন্ত্রবচন

পুরুষ বা নারী রূপে, সচ্চিদ্‌-আনন্দ রূপে—
পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে—
যে ভাবেতে প্রাণ চায় সেভাবে ভাবিয়া মায়
হের চিদানন্দময়ী জননীরে আপন স্বরূপে।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্মশানালয়বাসিনী

কালীরূপ

তন্ত্র বলিতেছেন, চরমসত্য সগুণ আবার নির্গুণও, সাকার আবার নিরাকারও, মা 'নির্গুণা সগুণাপি চ', 'সাকারাঽপি নিরাকারা'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বারবার বলিয়াছেন একথা; বলিয়াছেন, 'নিরাকারে বিশ্বাস তাতো ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,—এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।'

কিন্তু এ সত্য প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিগম্য, বুদ্ধি দিয়া, যুক্তি দিয়া বোঝা যায় না। 'সাকারও নিরাকারও' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে কয়েকবার শুনিয়া মাষ্টার মহাশয়ের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, সেটি শুধু তাঁহার একার প্রশ্ন নয়, মনবুদ্ধির সীমায় আবদ্ধ সব মানুষেরই, মানববুদ্ধিরই প্রশ্ন: 'বিরুদ্ধ অবস্থা দুইটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিষ দুধ কি আবার কালো হইতে পারে?' দুধ সাদাও কালোও, ইহা যেমন বুদ্ধির অগম্য, তিনি সাকারও নিরাকারও, ইহাও তাহাই। ইহা 'বুঝা' যায় না। বুঝিতে গেলে, বা যুক্তি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া 'বুঝাইতে' গেলে হয় তাঁহার নির্গুণত্বের উপর

জোর দিতে হইবে, অথবা তাঁহার সগুণত্বের উপর। (আমরা যেন মনে রাখি, বিশ্বাস যুক্তি নয়।) মাস্টার মহাশয় (তখন নিরাকারে বিশ্বাসী) যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে সাকারোপাসনা-প্রসঙ্গে বলিলেন, 'যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করো;'—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের কলকাতার লোকদের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই।' কথাটি মাস্টার মহাশয়ের মনে ধরিয়াছিল, ইহা তো বুদ্ধির সীমানার কিছু নয় যে অপরকে বোঝানো যাইবে—'একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাইব?'

নির্গুণও সগুণও, সাকারও নিরাকারও—এ তো দূরের কথা, তিনি কেবল নিরাকার, নির্গুণ—ইহাই কি 'বুঝা' যায়? ঈশ্বরের বা আমার স্বরূপের কোন রূপ নাই, গুণ নাই, মন নাই বুদ্ধি নাই—আমাদের পরিচিত জগৎ বা অনুভূতির কিছুই নাই—একথা 'বুঝা' সম্ভব কিরূপে? কে বুঝিবে, কি দিয়া বুঝিবে?

অথচ, সেই ধারণাতীত, মনবুদ্ধির 'অগোচর', 'বাচাতীত' সত্যকে লাভ করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইলে যতক্ষণ না মনবুদ্ধির সীমা পার হইয়া গিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ততক্ষণ সে সত্য সম্বন্ধে মনবুদ্ধির ধারণাগম্য একটা 'রূপ' তো আমাদের অবলম্বনরূপে চাই-ই। রূপ বলিতে এখানে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ই নয়, বাক্যাদি সব চিত্তগ্রাহ্য বিষয়ই; দেবতাদের ধারণাগম্য হইবার জন্য যেমন ব্রহ্ম এবং বিষ্ণুর ধারণাগম্য হইবার জন্য যেমন মহাশক্তি দৈববাণী ও জ্যোতি রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই রূপাতীত সত্যকে আমাদের কাছে একটা রূপে বা তত্ত্বাকারে উপস্থাপিত করা, আমাদের 'বোঝানো' প্রয়োজন হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন।' তিনিই বোঝান। যখন প্রয়োজন হয়, আমাদের চলার পথে অবলম্বনের জন্য সত্যের মনবুদ্ধিগ্রাহ্য 'রূপ'-গুলি যুগে যুগে তিনিই দেন। ব্যষ্টিগতভাবে অন্তর্যামিরূপে তো বটেই, সমষ্টিগতভাবে মানুষ হইয়া আসিয়া, আবার যাঁহারা সে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের অতিশুদ্ধ মনবুদ্ধির আসনে বসিয়াও। একই চরম সত্যকে তিনি 'রুচি- ও অধিকারি-ভেদে' বিভিন্ন 'রূপে' উপস্থাপিত করেন। স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'সকল অবতারকল্প পুরুষ একই প্রকার শিক্ষা দিয়া যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়।'

তন্ত্র, তন্ত্রাচার্যগণ সাধকের পথ চলার অবলম্বন রূপে 'সাকারাঽপি নিরাকারা', 'নির্গুণা সগুণাপি চ', 'বাচ্যাতীতা পরাৎপরা' সত্যকে বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী বহু রূপ বা আকার দিয়াছেন। সেই 'রূপ'গুলির মধ্যে, তন্ত্র বলিতেছেন, কালীরূপই মনবুদ্ধির সীমায়, 'বোঝার' সীমায় সত্যের সর্বাধিক প্রকাশক—'ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মের পরতর "রূপ" আর নাই।' বেদান্ত যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তন্ত্র তাঁহাকেই 'মা' বলেন। তন্ত্রমতে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কমলা, সরস্বতী, ধূমাবতী প্রভৃতি সবই সেই মায়েরই রূপ। তবে এসব রূপের মাধ্যমে মায়ের, চরমসত্যের, নির্গুণভাবের বা সগুণভাবের কোন একটি বিশেষ দিকই প্রকাশিত। শ্মশানালয়বাসিনী কালীর মধ্যে

—শবরূপ শিবের বুকের উপর সংস্থিতা, সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড- ও অসি-ধরা, ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে ঝরিয়া পড়া রুধিরধারাসিক্তা, আবার অভয়া, বরদা, প্রসন্নবদনা মাতৃমূর্তির মধ্যে মায়ের নির্গুণ ও সগুণ ভাব সবই সমন্বিত। শবরূপ নিষ্ক্রিয় শিব 'সচ্চিদাত্মরূপা; ব্রহ্মরূপা' মায়ের নির্গুণ ভাবের প্রতীক; শিব হইতে পৃথক হইয়া নয়, তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকিয়াই তাঁহার বুকের উপর তাঁহারই শক্তি মাতৃমূর্তিতে প্রকাশিত; আর, সব মাতৃমূর্তিতেই স্বত-অনুস্যূত সন্তানপ্রসব ও -পালন—সৃষ্টি ও স্থিতি —এই ভাবদ্বয়ের সহিত সেখানে সংযুক্ত রহিয়াছে সংহারের ভাবও।

শ্মশানালয়বাসিনী

দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, সিদ্ধিকালী, রক্ষাকালী প্রভৃতি বহু রূপে মাকালীর আরাধনা-বিধি তন্ত্রে আছে। সাধারণতঃ কালীপূজায় দক্ষিণাকালীরই পূজা হয়। ইঁহারই অন্য নাম শ্যামাকালী বা আদ্যাকালী। বিভিন্ন তন্ত্রোক্ত দক্ষিণাকালীর ধ্যানমন্ত্রগুলি অর্থের দিক দিয়া প্রায় একই রূপ, ভাষায় অবশ্য পার্থক্য আছে। দুটি ধ্যানে দক্ষিণাকালীকে শ্মশানালয়বাসিনী,' এবং একটিতে 'শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থা' বলা হইয়াছে।

শ্মশানালয়বাসিনী শব্দটির বহু অর্থ করা হইয়াছে। অতি সাধারণ অর্থ হইল, যেখানে শবদাহ করা হয় সেই শ্মশানই মায়ের গৃহ, মা সেখানে থাকেন। সূক্ষ্মতম অর্থ হইল, যেখানে সব কিছুর বিনাশ ঘটে, সব কিছু লয় পায় সেই ব্রহ্ম বা শিবই মায়ের আবাসস্থল—ব্রহ্ম ও শক্তি, শিব ও শক্তি সদাসমন্বিত, লীলাতেও যেমন নিত্যেও তেমনি। এই অর্থে 'শ্মশানালয়বাসিনী' ও 'শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতা' সমার্থক।

শ্মশান বা লয়স্থানের বিভিন্ন অর্থ হইতেই 'শ্মশানালয়বাসিনী'র বিভিন্ন অর্থের উদ্ভব:

আমরা আমাদের স্থূলদেহকে শ্মশানে বিলুপ্ত হইতে দেখি। শ্মশান বলিতে অবশ্য শবের দাহস্থান ও সমাধিস্থান দুই-ই বুঝায়, পূর্বে দুটি প্রথাই ছিল।* এখানে অবশ্য দাহস্থানই বুঝাইতেছে, বিশেষ করিয়া 'শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থা'-র ক্ষেত্রে। মা স্থূলদেহ বিনাশ করিয়া সূক্ষ্মদেহে আমাদের স্বর্গাদি লোকে পাঠাইয়া দেন বলিয়া যখন ভাবি, তখন যেখানে স্থূলদেহটি লুপ্ত হইতে দেখি, সেই শবদাহস্থানকেই সংহারকারিণী মায়ের আলয় বলিয়া মনে করি।

এই অর্থে, 'শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থা' বলিতে যে চিতাগ্নিতে দেহ লুপ্ত হইতে দেখি, মা সেই স্থূল বহ্নির মধ্যে থাকেন। তন্ত্রে এই চিতাবহ্নিকে মাকালীর রূপও বলা হইয়াছে—চিতাবহ্নিই মাকালী, 'বহ্নিরূপা মহামায়া'।

এই বহ্নি যেমন চিতাবহ্নি, তেমনি জ্ঞানবহ্নিও। চিতাবহ্নি আমাদের স্থূলদেহকেই নাশ করিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ তো আর আগুনে পোড়ে না, 'নৈনং দহতি পাবকঃ'। সূক্ষ্মদেহের নাশ না হইলে মুক্তিও নাই—স্থূলদেহ যতজন্মে যতবারই চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হউক না কেন। সূক্ষ্মদেহকে বিনষ্ট করে জ্ঞানাগ্নি। বিনষ্ট করে মানে সূক্ষ্মদেহের,

* 'হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হইয়া আসিয়াছে সেই মৃতকে পিতৃলোকের নিকট প্রেরণ কর', 'হে পৃথিবী! মাতা যেরূপ আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আবৃত করে, তদ্রূপ তুমি এই মৃতকে আচ্ছাদন কর।'
—ঋগ্বেদ, ১০।১৬।৫, ১০।১৮।১১

মনবুদ্ধি প্রভৃতির সহিত যে বন্ধন, পাশ, অজ্ঞান আমাদের বাঁধিয়া, জড়াইয়া রাখিয়াছে, সূক্ষ্মদেহকেই 'আমি' বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে, সেই বন্ধনকে, পাশকে, অজ্ঞানকে, ভ্রমকে জ্ঞানাগ্নি ভস্মীভূত করিয়া আমাদের মনবুদ্ধির পারে লইয়া যায়। সাধকের হৃদয়েই এই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাই সাধকের হৃদয়ই শ্মশান, মা সেখানে থাকেন। সত্যান্বেষী সাধকের তাই প্রার্থনা, 'হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

কারণ-ব্রহ্মকেও শ্মশান বলা হইয়াছে—যেখানে কল্পান্তে সব জীবেরই সূক্ষ্মদেহ শববৎ হইয়া লীন হইয়া থাকে, 'মা যেখানে সৃষ্টির বীজ কুড়াইয়া রাখেন।'

আরো মূলে যাইয়া, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সব দেহই, সব জগৎ-ই মহাপ্রলয়ে যেখানে লীন হয় সেই মহাকারণকেই, পরব্রহ্মকেই, সদাশিবকেই শ্মশান বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম বা শিবই মায়ের আলয়, মা সেখানে থাকেন; ব্রহ্মের সহিত, শিবের সহিত তিনি সংযুক্তা। পূর্বেই বলিয়াছি, এই অর্থে 'শ্মশানালয়বাসিনী' ও 'শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা' বা 'মহাকালহৃদম্ভোজস্থিতা' সমার্থক। 'শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থা'র অর্থও তাই; জ্ঞানী সাধকের, 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্' এই সত্য প্রত্যক্ষকারীর হৃদয়ই 'শবরূপ মহাদেব,' পাশমুক্ত জীবই শিব।

আবার, সুষুম্নাপথকেও শ্মশান বলা হইয়াছে। কালীই কুণ্ডলিনী-শক্তি। তিনিই জাগ্রতা হইয়া মূলাধার ছাড়িয়া উঠিয়া সুষুম্নাপথের বিভিন্ন পদ্মে চরণপাত করেন এবং শেষে সহস্রারে উঠিয়া পরমশিবের সহিত মিলিত হন। কুণ্ডলিনীরূপা কালী যখন সুষুম্নাপথে উপরে উঠিতে থাকেন, তখন তাঁহার প্রতি 'চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।'—এক একটি পদ্ম ছাড়িয়া যাইবার সময় মা সাধকের অনুভূতি হইতে এক একটি জগৎবোধ বিনাশ করিয়া, লুপ্ত করিয়া দিয়া চলেন—সত্যের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর প্রকাশে সাধকের অনুভূতিকে উন্নীত করিয়া চলেন, সহস্রারে উঠিবার সময় সর্ববিধ জগৎবোধই লুপ্ত করিয়া দেন। সুষুম্নাপথই তাই শ্মশান, মা সেই শ্মশানবাসিনী।

দেখা গেল, মা শ্মশানালয়বাসিনী—একথার একটি অর্থ, মা বিনাশকারিণী, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—যে দেহেরই হোক; সূক্ষ্ম- ও কারণদেহের বিনাশকারিণী অর্থেই তিনি জ্ঞানদায়িনী, মুক্তিদায়িনী। অপর অর্থ, মা শিবের সহিত সদা সংযুক্তা- শিব ও শক্তি, ব্রহ্ম ও শক্তি সদা সংযুক্ত—মা সাকারাও নিরাকারও, সগুণাও নির্গুণাও; এই অর্থে তন্ত্রোক্ত চরম সত্যের সর্বাধিক প্রকাশক 'রূপ' তিনি—শ্মশানে, শবরূপমহাদেবের হৃদয়ের উপর সংস্থিতা, শ্মশানালয়বাসিনী কালী। বিনাশের ভাবই সৃষ্টি-স্থিতি প্রভৃতি ভাবাপেক্ষা কালীমূর্তিতে যে একটু বেশী প্রকট, তাহার কারণ বোধ হয় স্থূল-সূক্ষ্মাদি দেহাত্মবোধের বিনাশ ছাড়া মুক্তি বা জ্ঞানলাভ অসম্ভব; এবং বোধ হয় এই জন্যও যে, সাধারণতঃ আমরা সগুণা মায়ের, ঈশ্বরের, নগ্ন রূপ দেখিতে চাই না, মুখে তাঁহাকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের শক্তিভূতা বলিলেও তাঁহার সৃজন ও পালনের ভাবের প্রাধান্যের আবরণে তাঁহার বিনাশের ভাবকে ঢাকিয়া রাখিয়াই তাঁহাকে দেখিতে চাই; 'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী!' শ্মশানালয়বাসিনী কালী নগ্নসত্যের প্রতীক বলিয়াই বোধহয় দিগম্বরীও।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

২৭.১২.৩৬। সন্ধ্যারতির পর একে একে সকলে আসিতে লাগিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ কয়েকটি সুরদাসের ভজন আবৃত্তি করিয়া সেগুলি বুঝাইয়া দিলেন :

(১) কাঁহা জাইয়ে ঝটকারকো
নিবল জান তুঁহি মোয়,
হৃদয়সে ঝটকারকো তো
সবল মায় জানি তোয়।

(২) প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরশী হৈ নাম তুহারো

(৩) গুরুধ্যান গুরুজ্ঞান
গুরুবিনু নেহি বাট, কৌড়ি বিনু নেহি হাট

তারপর আজ বাবা বেদান্ত-বিচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন : "হিন্দীতে সুন্দরদাস, নিশ্চলদাস কি সুন্দর সব বিচার করেছেন, 'বৃত্তিপ্রভাকর' 'বিচারসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠা। 'বৃত্তি'তে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' —এই বিচার, পশ্চিমে এই সবের খুব চল। পাঞ্জাবী মেয়েরাও এসব পড়ে—সুন্দর বিচার করে। 'বিবেকচূড়ামণি'তে শঙ্কর বোঝাচ্ছেন; বোঝাতে বোঝাতে শিষ্যের অনুভব। বলছেন—ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ? এই যে দেখেছিলাম বিচিত্র জগৎ, কোথায় গেল-কে নিয়ে গেল? সৎ চিৎ আনন্দ—সব কিছুতে, তুমি আমি চেয়ার— এই সবার ভেতর অস্তি ভাতি প্রিয়। ভাবছ বিষ্ঠা আবার কার প্রিয়?—শূকরের প্রিয়, ক্রমির প্রিয়। Eternal existence—common to all. (অনন্ত সত্তা, সবার মধ্যেই সমান)।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥
(দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক)

"ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয়? ব্রহ্মবিচার এমনি হয় না, সাধন-চতুষ্টয় চাই। কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব। বিবেক : নিত্যানিত্যবস্তুবিচার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বৈরাগ্য : ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ —স্বর্গ মর্ত্য দুই-এরই ভোগবাসনাত্যাগ। ঠাকুরের কথায় সোনার চেন, লোহার শেকল দুই-ই বন্ধন। ষট্‌সম্পত্তি : শম কিনা মনের সংযম, দম কিনা শরীরের ইন্দ্রিয়াদির সংযম, তিতিক্ষা কিনা সহ্য করা—শ ষ স—শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, সব দ্বন্দ্বভাব, 'মাত্রাস্পর্শ'। উপরতি : এক এক ইন্দ্রিয়ের রতি এক এক দিকে, এক এক বিষয়ে—চোখের দৃষ্টিতে, কাণের শ্রবণে, জিহ্বার আস্বাদনে, নাসিকার ঘ্রাণে, ত্বকের স্পর্শে,—এসব থেকে উপরতি, ঠাকুরের কথায় মোড় ফিরানো। শ্রদ্ধা : গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। তারপর সমাধান—নিষ্পত্তি শান্তি। মুমুক্ষুত্ব : মুক্তির ইচ্ছা—তীব্র মুক্তির ইচ্ছা, তবে নিঃশ্রেয়স হবে। এসব কি সহজে হয়? তোমরা ঠাকুরের আশ্রয় পেয়েছ, তোমাদের এসব করতে হবে, তবে তো হবে।

"আমার (কথা বলতে) কষ্ট হচ্ছে, তবু বলছি—যদি কারুর কিছু হয়। নইলে কারেই বা বলি, আর কেই বা শোনে? তবে শঙ্কর এও বলেছেন যে, সাধনচতুষ্টয়হীন বা গৃহস্থরাও ব্রহ্মবিচার করতে পারে, তাতে ভালই হবে, একটা ভাল ভাব মনে জাগবে। যেমন ধর—সাধুকে ভিক্ষা দেওয়া, এতে

গৃহস্থেরই কল্যাণ; সাধু দেখলে বৈরাগ্যভাব জাগে, ক্ষণেকের জন্যেও ভগবানকে মনে পড়ে। সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে, লজ্জা করবে না। শিব অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা করেন—লজ্জা করেন কি? শিব সর্বত্যাগী, তাঁর আবার লজ্জা কি? সাধুকে দেখে ভাল ভাবের—ত্যাগ বৈরাগ্য ঈশ্বর-নির্ভরতার উদ্দীপন হয়। বাংলাদেশে কি ও-সব (বেদান্ত ও সন্ন্যাসধর্ম) ছিল? বরং একটা ঘৃণার ভাবই ছিল। আমরাই তো এনেছি এসব।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপনার মনেই গাহিতেছেন—গান:

(১) আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।

(২) বিশ্বপতি যিনি আমি পুত্র তাঁর।
পিতৃধনে মম পূর্ণ অধিকার॥

একটু পরে বলিতেছেন: "১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এটোয়ায় জন্মাষ্টমীর দিন—ঠাকুরের দেখা। উপবাসী থেকে ভাগবত পড়ছি, পড়তে পড়তে খানিক পড়ার পর বই-এ মাথা দিয়ে ভাবছি ঠাকুরের কথা। এমন সময় ঠিক মাথার গোড়ায় দেখি ঠাকুর দাঁড়িয়ে হাসচেন আর বলছেন—'হ্যাঁরে আমি যে এসেছিলাম তা কি লোকে জানতে পারবে?'"

"সন্ন্যাসীর রাগ থাকবে না। রাগ থাকলে আবার সাধু কি? আমরা ধ্যান করেছি—'একজন এ-হাতে বিষ্ঠা দিচ্ছে, আর একজন ও-হাতে চন্দন মাখাচ্ছে। আমি এর ওপর রাগ করছি না, আর ওর ওপরও আকৃষ্ট হচ্ছি না—চুপ ক'রে বসে আছি।'

"ঠাকুর বলতেন, 'কাম ক্রোধ লোভ যাবে কিরে? মোড় ফিরিয়ে দেনা, যেগুলি অন্তরায় সেগুলিই সহায় হয়ে যাবে। তাঁকে পাবার কামনা কর তাঁর উপর ক্রোধ কর—কেন দেখা দিচ্ছ না? রাগ অনুরাগ সব তাঁর উপর তাঁর নাম-রূপ-লীলায় লোভ। তাঁর রূপে মোহ—মুগ্ধ হয়ে যাও। মদ—অহঙ্কার, আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়েছি, তাঁকে ভালবেসেছি—এই অহঙ্কার। মাৎসর্য—ঈর্ষা হিংসা, ওর কেমন জপ ধ্যান ব্যাকুলতা হচ্ছে, অশ্রুপাত রোমাঞ্চ হচ্ছে! আমার হচ্ছে না কেন? ও তাঁকে লাভ ক'রল; আমি কেন পারছি না?

"কার ভবিষ্যতে কি আছে—তাই যদি না জানতে পারব তো এতদিন করলুম কি? ঠাকুরের আশ্রয় আশীর্বাদ কৃপা—যাকে যেমন দেখিয়ে দেন, সেইসব দেখে যাকে যা বলবার বলি।"

*

"এই বছর দশ বারো আগে। ঐ চালাঘরে, খুব ঝড় দিনরাত—রাত্রিতে খুব বাড়ল। ঠাকুরের ছবির কাছে প্রার্থনা করি—ঝড় থামে। একটু শুই, ঝড় বাড়ে—এইরকম উনিশ-বিশ বার। চালা পাছে উড়ে যায় তাই খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হ'ল। তারপর সব বেরিয়ে এলুম। একজন তখনও শুয়েছিল, তাকে ডেকে আনলাম। তারপর ঠিক যেখানে তার মাথাটি ছিল সেইখানে ইঁট পড়ল, ঠাকুরই ডেকে দিলেন।"

"তখন পাচক চলে গেছল, আমাকে দুবেলা রাঁধতে হ'ত। বাসনমাজা, খাওয়ানো সব সেরে সারারাত লিখতাম, তখন 'উদ্বোধনে' লেখা বেরুচ্ছে।

"লণ্ঠন জ্বলছে—রাত ৯টা থেকে ভোর। সকাল হয়ে যাচ্ছে, আলো জ্বলছে, আমি লিখছি—তিব্বতের পথে হিমালয়-ভ্রমণ। আর একটু না লিখলে ঐ ভাব চলে যাবে, আর ফিরে পাব না—ঠাকুর যেন রাশ ঠেলে

দিতেন।

"ভোরবেলা ঠাণ্ডা—গা শীর শীর করছে—লিখতে লিখতে স্থির হয়ে যেতুম। ভাব এত গাঢ় হয়ে যেত যেন মনে হ'ত ঐ সামনে হিমালয়, শুভ্র তুষারশৃঙ্গ, নির্জন নীরব—আমি যেন আবার সেখানে গেছি। এমন সময় চমক ভাঙল—ফর্সা হয়ে এল, লণ্ঠনের আলো লাল হয়ে গেল, কাক কোকিল ডেকে উঠল। লেখা বন্ধ ক'রে ছেলেদের সব ডেকে তুলে দিলাম। আবার দিনের কাজ শুরু হ'ল।

"এইরকম নিদ্রাহীন ন- দিন ন- রাত কেটেছিল। ন- দিনের দিন রাত্রে লিখতে বসেছি—বেশ ভাব নিয়ে লিখছি, কিন্তু লেখা জড়িয়ে গেল--হিজি-বিজি—আর লিখতে পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। ও: সেদিন কি ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম—তেমন আর জীবনে ঘুমুইনি!"

*

"মঠে গেলে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) সহজে আসতে দিতেন না, ফাঁকে ফিকিরে আটকে রাখতেন, বলতেন, 'কেন ভাই, ওখানে একলা একলা থাকবে? এইখানে কেমন আনন্দ!' আমিও কলকাতা আসার নাম ক'রে এপারে চলে আসতাম, তারপর জানিয়ে দিতাম, 'মহারাজ, এ-যাত্রা অনুমতি দিন।' একবার পাগড়ি মাথায় কোমরে হাত দিয়ে মহারাজের কাছে বিদায় নিতে গেছি। মহারাজ বলছেন, 'কি, কর্তার মতো ভঙ্গীখানা তো বাগিয়েছ ঠিক। যাওয়া হচ্ছে কোথা? কোন্ দিগ্বিজয়ে?'

"এখান থেকে একবার incegnito (ছদ্ম-বেশে) বেরিয়েছিলাম কাউকে কিছু না ব'লে। মন বড় খারাপ, চলেছি—ভেবে রেখেছি ঠাকুরের ভক্ত যদি না হয়, বা যদি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলে তো সেখানে খাবও না, থাকবও না।

"মুড়াগাছায় পথের ধারে শুনছি—ছোকরাদের কথাবার্তা: 'ঠাকুর এসেছিলেন, তাই ধর্ম, দেবদেবী—এসব অবিশ্বাস করতে পারি না।' বুড়োরা বলাবলি করছে: 'ও: ঠাকুর পতিতপাবন, জগৎপাবন।' ভাবলুম--বা: ঠাকুর, আগেই এসে বসে আছ এখানে! একজন আবার শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত ভক্ত—খেতে বললেন; তখন আবার বেরিয়ে পড়েছি, বললাম—পরে হবে, তাঁর ইচ্ছা হয়তো। মাঝে মাঝে চলতে চলতে আশ্রমের জন্য ভাবনা হ'ত। কিন্তু মিনিট পনের চুপ ক'রে বসে ঠাকুরকে ভেবে নিতাম। আর সব ঠিক হয়ে যেত।"

*

"মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) কথা বেরিয়েছে 'উদ্বোধনে'—'যোগীর ঘুম চার ঘণ্টা, আর ভোগীর ঘুম ছয় ঘণ্টা।' আর রোগীর ঘুম এরও বেশী। কি ক'রে ঘুমুবে? অন্তরে যার সেই আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, সে কি আর ঘুমুতে পারে? সে শুধু জেগে জেগে থেকে থেকে কাঁদে—দেখা দাও, দেখা দাও, আজও তো দেখা দিলে না।

"ঠাকুরের কাছে যখন গান গাইতাম আমরা—

'বৃথা বয়ে যায় রজনী, ওলো সজনি!
সেঁজ বিছায়নু·· পন্থ নেহারনু···
হাতো কি দরপন মাথো কি ফুল।'

শ্রীরাধার বিরহের গান এসব—যেন ফুল-শয্যা বিছানো—সব আছে কিন্তু সে কই? ঠাকুর বিছানায় হাত বুলুতে বুলুতে স্থির হয়ে যেতেন, তারপর ডুকরে ডুকরে কাঁদতেন। সারারাত ঘুম টুম সব কোথায় চলে যেত।

"প্রথম অবস্থায় গঙ্গার বালিতে মুখ

ঘগড়াতেন, রক্ত বেরিয়ে যেত। মাঝিরা সব অবাক হয়ে দেখত আর 'আহা আহা' ব'লত। সূর্য ডুবে গেল, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠল—ঠাকুর পঞ্চবটীর বনে গিয়ে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন: 'মা, ঐ আরো একটা দিন তো কেটে গেল। কই মা, দেখা তো দিলি না।'

"আহা, ঠাকুরের কাছে একদিনের জন্যে যে বসেছে, একক্ষণের জন্যে যে তাঁর পা দুটি কোলে তুলে নিয়েছে, সে ধন্য। ঠাকুরের বিছানায় বসে আছি মাটিতে পা ঝুলিয়ে; ঠাকুর পা-দুটি আমার কোলে বাড়িয়ে দিলেন, আর সব অনেকের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগলেন—দেখছেন আমার মনের ভাব। মহারাজকেও আগে একদিন ঐরকম বলেছিলেন।

"ঠাকুরের দুই পায়ের বুড়ো আঙুল নিয়ে আমি কপালে খুব ঘসতে লাগলাম। ঠাকুর বললেন, 'ও কি, ও কি করছিস রে?' আমি বললাম, 'কেন? তিলক দিচ্ছি—সাত্ত্বিক তিলক। আপনি তো বলেছেন, রাজসিক তিলক—চন্দনের ফোঁটার ছটা, আর সাত্ত্বিক তিলক—অনাড়ম্বর গঙ্গাজলের—যা দেখা যাবে না, এই তো গঙ্গাজলের তিলক দিচ্ছি!' ঠাকুর খুব হাসতে লাগলেন।

"ঠাকুর বলেছেন 'দেখ্ দেখ্'— আর আমরা দেখেছি, সত্যি বলছি। ঠাকুরের ভাব এদেশে আর কি হবে! ভাব ধারণ করতে হ'লে শক্তি চাই। সব স্বাধীন দেশে তাঁর ভাব বেশী ছড়াচ্ছে ও ছড়াবে।"

"তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম, নানা মত হয়েছে।" (৪।২০।৩)

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান—এই ব'লে নাক সিঁটকে ঘৃণা ক'রো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে; জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে,—যতদূর পার। আর ভালবাসবে।" (১।১২।৭)

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

নৃত্যময়ী অন্বয়া

আনন্দ

শান্ত সাগর-জল
নিঃসীম, অবিচল,
সহসা তাহার বুকে
জেগে উঠে নাচে মা,
চঞ্চল চরণের প্রতি ঘায়
আকাশ, বিজলী-রেণু
কাল, অণু-পরমাণু
সাগর হইতে উঠে
চারিদিকে ছুটে যায়।

চপল চরণপাতে নাচে মা,
নাচে অণুতে-অণুতে, পরমাণুতে,
নাচে তাপে বিদ্যুতে,
আলো-রামধনুতে।
অগণন বস্তুরে সে নাচের স্পন্দ
গড়ে নব নব রূপে, গড়ে কত ছন্দ।
তখনো তারা যে সবই
পুতুল খেলারই ছবি
ইচ্ছা-চেতনাহীন, প্রাণহীন, শান্ত,
মর্মে মর্মে তার নেই প্রতি রন্ধ্রে
বিদ্রোহী গতি দুর্দান্ত।

তার মর্মে চরণ ফেলি
প্রাণ-স্পন্দন তুলি
নাচে মা,
উল্লাস জাগে সারা জগতে --
খোলে অনুভূতি-দ্বার,
দেখিবারে চারিধার
উদ্দাম ইচ্ছার
খোলে দ্বার জড়েতে।

জাগে তরু, জাগে লতা,
শত প্রাণী হর্ষে
জড়-স্পন্দন সনে
জিনিতে মরণে রণে
চলে দুর্বার বেগে
কোটি কোটি বর্ষে।

ইচ্ছারও বুকে উঠে
দাঁড়াইয়া নাচে মা,
বেড়ে যায় ইচ্ছার স্পন্দন —
বিপুল সাহস-ভরে
মায়েরই চরণে ধ'রে
থামাতে সে চায় তাঁর নর্তন,—
জড় 'পরে, প্রাণ 'পরে,
আপনারও হৃদি 'পরে
স্থির করিবারে চায়
চঞ্চল সে চরণ।

হাসিয়া কখনো তায় থামে মা—
অণু পরমাণু যায় গলিয়া,
গ'লে যায় মন-প্রাণ,
ইচ্ছা ও অভিমান,
থাকে শান্ত জননী শুধু
স্নেহ-আঁখি মেলিয়া !—
ক্ষণ পরে যায় গ'লে
চেতনাসাগর-জলে
সাগরের সনে এক হইয়া।
শান্ত সাগর-জল
নিঃসীম, অবিচল
পায় না দ্বিতীয় কিছু কোন ঠাঁই খুঁজিয়া!

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "গীতার মত—যাকে অনেকে গণে মানে, তার ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি আছে।"[১] মহৎ চরিত্র, বিদ্বান পণ্ডিত, বৈরাগ্যবান সাধু, পরহিতকারী সমাজ-সেবক, এই সকলের মধ্যে বিভু ঈশ্বরের বিভূতির বিশেষ প্রকাশ; সেই কারণেই বোধ করি বিশিষ্ট গুণবান ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আগ্রহ ও অদম্য কৌতূহল দেখা যেত।[২]

সেই সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনে বঙ্গসমাজ বিশেষত: নব্যশিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় বিশেষভাবে আলোড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদের উপাসনা দেখবার জন্য ও ব্রাহ্ম ভজনসঙ্গীত শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হতেন। সম্ভবত: ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (১২৭১ বঙ্গাব্দ) একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত মথুরানাথকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত হন। সে সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্যরূপে বেদী অলঙ্কৃত করেছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মুখে শোনা যায়, সে সময়ে এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হয়েছিল, উপাসনা-বেদীতে উপবিষ্ট ব্রাহ্ম উপাসকগণের মধ্যে একজন যুবকের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পারেন যে, যুবকের মন ধ্যেয় বস্তুতে নিবদ্ধ। পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলেছিলেন, "বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছে, দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাত্‌না ডুবেছে, সেদিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যে তারা ঢাল তলওয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপুসকল ভিতরে কিলবিল করছে।"[৩] তখন কেশবচন্দ্রের বয়স ছাব্বিশ বছর।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৫।৩

২ "The Paramhamsa has a passion for great minds. His curiosity to see distinguished men is most ardent He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate."

[The New Dispensation, 3rd Sept. 1882]

৩ "ধর্মতত্ত্ব" ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শকাব্দ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কয়েকটি স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে তাঁর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব সেন বেদীতে বসে ধ্যান করছে, তখন ছোকরা বয়স। আমি সেজোবাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে, এই ছোকরার ফাতা (ফাত্‌না) ডুবেছে,— বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।" কথামৃত, ৩।১৪।৩

আদর্শগত বিরোধের জন্য কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খৃঃ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে যান,[৪] তাঁর সৌম্যমূর্তি ও ভগবৎ-বিশ্বাস-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু, এবং বিশুদ্ধ ইংরাজীতে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ইংলণ্ডবাসীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং কেশবচন্দ্রকে আপ্যায়ন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কেশবচন্দ্রের খ্যাতি দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৫]

সে সময়ে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। সেই কালে ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁর মত মেধাবী, প্রতিভাবান, প্রতিষ্ঠাশালী, নামজাদা ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বাসনা হয় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। "যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন।"[৬] "এই লোক (কেশব) দ্বারা মায়ের কাজ হইবে ইহা তিনি মায়ের মুখেও শুনিয়াছিলেন।"[৭] কেশবচন্দ্রকে দেখতে যাবার পূর্বে এক দিব্যদর্শনের মধ্যেও তিনি শ্রীজগন্মাতার নির্দেশ পান। তিনি নিজমুখে বলেছিলেন, "কেশবসেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাঁকে দেখলাম। সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশবসেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটি ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাখা অর্থাৎ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে— ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো।' মাকে বললাম, মা, এদের ইংরেজী মত,—এদের বলা কেন! তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল।"[৮]

তিনি নিজে যাওয়ার পূর্বে ভক্ত নারায়ণ

Shibnath Sastri: History of the Brahmo Samaj: p 193—কেশবচন্দ্র ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) আচার্যপদে বৃত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

৪ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন ১৮৭০ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ইংলণ্ড থেকে ভারতের পথে যাত্রা করেন ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

৫ ইংলণ্ডের একটি পত্রিকা লিখেছিল, "When Keshab speaks, the world listens." আবার কেশবের মৃত্যু উল্লেখ করে পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার লিখেছেন, "India has lost her greatest son, Keshabchandra Sen." Life and Letters of F. Maxmuller. Vol II. Quoted in 'Lectures in India by Keshabchandra Sen', Introduction, p. III.

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধক ভাব, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩২৮ (তৃতীয় সংস্করণ)

৭ চিরঞ্জীব শর্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত "কেশবচরিত" (তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ২৪৭।

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৪।৩

চিরঞ্জীব শর্মা, ঐ, পৃঃ ২৪৭ "ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তিলীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহিতেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য করিতেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।"

শাস্ত্রীকে কেশবচন্দ্রের নিকট অগ্রদূত পাঠান। নারায়ণ শাস্ত্রী দেখে এসে তাঁর অভিমত নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, "কেশবসেনকে দেখবার আগে নারাণ শাস্ত্রীকে বললুম, 'তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বললে, লোকটা জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জানতো—বললে, 'কেশবসেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালায়) কথা কইল।'"[৯]

১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন বা চৈত্রমাসে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের কলুটোলার বাসভবনে উপস্থিত হন। সেদিন ১৪ই মার্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।[১০] সেখানে জানতে পারলেন যে, কেশবচন্দ্র অনুপস্থিত। তিনি সহধর্মী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেলঘরিয়ার এক তপোবনে সাধনভজন করছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্তী বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটী। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত "ভারত আশ্রম" সে সময় ঐ উদ্যান-বাটীতে অবস্থিত ছিল। "ভারত আশ্রম একটি সুবৃহৎ সাধু-অনুষ্ঠান।···বেলঘরিয়ার উদ্যানে ইহার কার্য প্রথম আরম্ভ হয়। একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় পানভোজনের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। যথানির্দিষ্ট সময়ে একত্রে সকলে উপাসনা করিতেন। নিয়ম অনুসারে সমুদায় কার্য নির্বাহিত হইত।"[১১]

ধর্মতত্ত্ব, ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শক, "পরমহংসদেবের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আবদার করা এই অবস্থাটি পরমহংস হইতেই আচার্যদেব বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে।"

বেদব্যাস, মাঘ, ১২৯৪, "······শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তিগদগদভরে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে 'নববিধান' প্রসব হয়।"

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৫।৩, কেশবচন্দ্র সেনও শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্য 'প্রসন্ন' ও অপর দুই ব্রাহ্মভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠান। রাতদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে তারা কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দেন। এই ঘটনা অবশ্য প্রথম সাক্ষাতের পরে।

১০ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বিরচিত "আচার্য কেশবচন্দ্র"— পৃষ্ঠা ১০৪১ হতে গৃহীত। সেবক রামচন্দ্র প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' পৃঃ ৬০ উল্লিখিত সময় ইংরাজী ১৮৭২ খৃঃ অথবা ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শকে প্রকাশিত ধর্মতত্ত্বে উল্লিখিত ১৮৭২ সাল গ্রহণযোগ্য নয়।

১১ চিরঞ্জীব শর্মা, (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) রচিত "কেশবচরিত"।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ (পৃঃ ১৬৫): "ভারতাশ্রম কলিকাতার জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় (১২৭৭ সন ফাল্গুন মাসে)··· পরে সেখান হইতে আশ্রম কাঁকুড়গাছি উদ্যানে উঠিয়া যায়।"

P. C. Mazoomdar : The Life and Teachings of Keshabchandra Sen, pp. 254-56 "···Keshab established in February 1972 the institution known as Bharat Ashram. It was a kind of religious boarding house.···He meant it to be a modern apstolic organisation, where the inmates should have a

পরদিন অর্থাৎ '১৫ই মার্চ'[১১] সকালে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ীতে[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কেশবদর্শনে যাত্রা করেন। গাড়ীতে উঠবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্মাতাকে বলেন, 'মা, যাবি? কেশবকে দেখতে যাবি?' এরূপ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করে পরে নিজেই উত্তর দেন, 'যাব'। গাড়ীতে বসেও জগন্মাতার সঙ্গে কতই কথাবার্তা ভাবাবেগে বলতে থাকেন। বেলঘরিয়ার উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হন সকাল আটটা কি নয়টার[১৪] সময়। উদ্যানবাটীর ফটকে গাড়ী উপস্থিত হলে হৃদয়রাম উদ্যানের ভিতরে প্রবেশ করে কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দেন যে, তাঁর মাতুল হরিকথা শুনতে বড় ভালবাসেন, হরিনাম শুনে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতে এসেছেন। কৌতূহলাক্রান্ত কেশবচন্দ্র মাতুলকে নিয়ে আসার জন্য হৃদয়রামকে অনুরোধ করেন।

---

community of all things, and where every worldly relation should be merged in spiritual fellowship. ··Carefully framed rules and enlightened disciplines were laid down for the daily guidance of the men and women······The common meals, common studies, common devotions, common work the whole system of Bharat Ashram life was intended to make the brethren and sisters entirely one in mind and spirit." একটি পত্রিকায় ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে কুৎসা-রটনা সুরু হয়। প্রতিবাদে মামলা রুজু করা হয়। Bharat Ashram Libel Suit কলিকাতা হাইকোর্টে শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭২ খৃঃ। কেশবচন্দ্র ঐ বাগানবাড়ীতে তখন পর্যন্ত ছিলেন।

১২ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বিরচিত "কেশবচরিত" পৃঃ ১০৪১। এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করে ২৮শে মার্চ, ১৮৭৫ খৃঃ The Indian Mirror পত্রিকা: 'A Hindu Saint—We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful,······"

১৩ গুরুদাস বর্মন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত (১৪৮-৪৯)

১৪ স্বামী সারদানন্দজী, লীলাপ্রসঙ্গ, (সাধক ভাব), পৃঃ ৩২৮, লিখেছেন, "হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণ আন্দাজ দুই ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন।" হৃদয়রামের সূত্র ধরে গুরুদাস বর্মন শ্রীরামকৃষ্ণচরিতে (পৃঃ ১৫৮) লেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিকাল তিনটার সময় বেলঘরিয়ায় যান। অক্ষয় সেনের মত: "স্নানের সময় বেলা প্রহরেক প্রায়। হৃদুসঙ্গে প্রভুদেব গেলা বাগিচায়॥" পুঁথি, ২২৫

বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কেশববিরোধী ছিলেন এবং ইংরাজী-শিক্ষিত বিধর্মী কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের যাওয়া পছন্দ করতেন না। সে ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে কেশবের কাছে গিয়েছিলেন মনে করা সঙ্গত হবে কি? অপরপক্ষে ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার রিপোর্টার ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি নিজে উপস্থিত ছিলেন না) লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাড়া করা ছ্যাকড়া গাড়ীতে গিয়েছিলেন। তাছাড়া হৃদয়রাম-কথিত বিবরণ ছাড়া অপর সকলের বিবরণীতে জানা যায় তাঁরা সকাল ৮।৯টার সময় বেলঘরিয়ায় পৌঁছান। সমস্ত ঘটনা আলোচনা করলে এই সময়-নির্দেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম উদ্যানের ফটক দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে উদ্যানের মধ্যে বড় পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘাটে নেমে হাত পা ধৌত করেন। সে সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা-শেষে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ পুষ্করিণীর পূর্বদিকের বড় বাঁধান ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা স্নানের উদ্যোগ করছিলেন। তাঁরা দেখেন প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের ক্ষীণকায় এক ব্যক্তিকে নিয়ে দেখতে মোটাসোটা হৃদয়রাম তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। "তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল।"[১৫] তাঁহার পরনে একটি সাধারণ লালপেড়ে ধুতি। গায়ে কোন জামা ছিল না, ধুতির খুঁটখানি বাম কাঁধের উপর ঝুলানো। খুব সম্ভবতঃ পায়ে কোন জুতা ছিল না। স্বভাবতই ব্রাহ্ম প্রচারকগণের অধিকাংশ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু দেখতে পান নাই, তাঁরা মনে করেন ইনি একজন সামান্য ব্যক্তি।[১৬] শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র ও উপস্থিত ব্রাহ্ম ভক্তদের বিনম্র নমস্কার জানালেন। মনে হয় কেশবচন্দ্র বা উপস্থিত অপর কেহ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিনমস্কার[১৭] করেননি। অভ্যাগতদের বসবার জন্য আসন দেওয়া হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই বললেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরদর্শন করে থাক, সে দর্শন কিরূপ আমি জানতে চাই।" এইভাবে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হল। এই সৎপ্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ হল কেশবচন্দ্রের জীবনে নূতন এক অধ্যায়,[১৮] ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে এক বৈপ্লবিক

---

১৫ উপাধ্যায় গোবিন্দ রায়: "আচার্য কেশবচন্দ্র", ধর্মতত্ত্ব, ১৪ই মে, ১৮৭৫ লেখে, "(পরমহংসদেব) এখন এই বলিয়া খেদ করেন যে, ইচ্ছা হয় সর্বদা বিভুগুণ কীর্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে তাহার বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।"

ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই সেপটেম্বর, ১৮৮৬, ঐ সাক্ষাতের বিবরণীতে লেখে, (পরমহংসদেবের) "দেহ জীর্ণ ও দুর্বল।"

১৬ P. C. Mozoomdar : The Life and Teachings of Kashabchandra Sen : page 357 "His appearance was so unpretending and simple, and he spoke so little at his introduction, that we did not take much notice of him at first." শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনের মতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্র কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। "কি ছবি ধরিয়া অঙ্গে অগ্রে দেখ মন। কেশবের সন্নিকটে প্রভুর গমন॥ বাসনা-বর্জিত যেন হৃদয়ের থলি। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কাঙ্গালী॥ ব্যাকুলতা একাগ্রতা দীনতা সংহতি। হরিগত মন প্রাণ তাঁয় স্থিতি গতি॥ ভক্তি প্রীতি এক মতি মূর্তির গঠন। দেখিয়া শ্রীকেশবের না সরে বচন॥" (পৃঃ ২২৬)

১৭ মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান গ্রন্থে জানা যায় সেই সময়কার কলিকাতার সমাজে নমস্কারাদি করার বিশেষ চলন ছিল না। তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি থেকে জানতে পারি, "কলুটোলার বাড়ীতে দেখা হ'ল, হৃদে সঙ্গে ছিল, কেশব সেন যে ঘরে ছিল সেই ঘরে আমাদের বসালে।......তা আমাদের নমস্কার টমস্কার করা নাই।......তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলো।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৫।১৫।৪

১৮ P. C. Mozoomdar : ibid : pp. 357-59 :

"Sometime in the year 1876, in a suburban garden at Belgharia, a singular incident took place. There came one morning in a ricketty ticca gari, a

পরিবর্তন এবং রামকৃষ্ণভাবান্দোলনের প্রথম প্রকাশ্যভাবে প্রচার।[১৮ক,খ]

disorderly-looking youngman, insufficiently clad, and with manners less than insufficient. He was introduced as Ramkrishna, the Paramhansa (great devotee) of Dakshineswar.... · But soon he began to discourse in a sort of half delirious state becoming now and then quite unconscious. What he said, however, was so profound and beautiful that we soon percieovd he was no ordinary man. A good many of our readers have seen and heard him. The acquaintance of this devotee which soon matured into intimate friendship, had a powerful effect upon Keshub's catholic mind. The very first thing observable in the Paramhansa was the intense tenderness with which he cherished the conception of God as Mother.......The purity of his thoughts and relations towards women was most unique and instructive. It was the opposite of the Europern idea. It was an attitude essentially, traditionally, gloriously national."

১৮ক কেশবচন্দ্রের ভাবজগতে যে বিশাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে তার প্রমাণস্বরূপ বাগ্মী কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

Keshubchandra Sen's speech on "Hindu Theism" at the Union Chapel, Islington, Eng. on June 7, 1870. ".... and if He (God) is really merciful and anxious for the salvation of men, then certainly He must interpose to remove all the errors of idolatry and caste, and give the Hindu nation a better form of religious and national life.......We desire that Christian missionaries should help the Theistic missionaries of India in gathering up the elements and materials which exist for the development of a better Hindu life." [Keshubchandra Sen in England : Navavidhan Publication Comm. 273-74] শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরবর্তী বাৎসরিক ভাষণে কেশবচন্দ্র বলেন, "Verily, verily, this Brahmo Samaj is a ridiculous caricature of the church of God. Such an assertion may startle many here present, but it is nevertheless true. (pp. 260)... ..So there is condemnation within and without. (p. 263) .....Let us look upon Hindu and Christian brethren as our elders, and humbly sit at their feet to learn those things in which they excel us Brethren, check all desire of vain glory. Cast away proud antagonism and sectarian malice." (p. 268), "Lectures in India" by Keshub C. Sen. (fourth edn), Lecture on "Our Faith and our Experiences". Jany. 22nd, 1876. কেশবচন্দ্রের মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট শোনা ঘটনা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। "আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (সাধক ভাব), পৃঃ ৪০৪। Bipin Chandra Pal : 'Saint Bijoy Krishna Goswami', p. 3. "The meeting of Ramakrishna with Keshub was an important event in our modern religious and spiritual history".

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা চলতে থাকে।

কিছু সময় পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচ্য বিষয়োপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান ধরলেন, "কে জানে মন কালী কেমন, ষড় দর্শনে মিলে না দরশন" ইত্যাদি। অমৃতবর্ষী মধুকণ্ঠের সঙ্গীত বেলঘরিয়ার তপোবনে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করল। সঙ্গীতের রস সম্পূর্ণ আস্বাদন করবার সুযোগ মিলে না, ব্রাহ্ম প্রচারকগণ অবাক হয়ে দেখেন গায়ক বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। স্পন্দহীন দেহ, স্থির দৃষ্টি, প্রফুল্ল আনন, প্রেমাশ্রু-বিগলিত রক্তাভ নয়ন—শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রার্পিতের ন্যায় সমাধিস্থ মূর্তি দর্শন করে প্রচারকগণ বিস্মিত হন বটে, কিন্তু এর গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন না। উপরন্তু অনেকে মনে ভাবেন, এই অবস্থা একটা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত অথবা কোন ধরনের এক ভেল্কিবাজী। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত করার জন্য ভাগিনেয় হৃদয়রাম গম্ভীরস্বরে ওঁকারধ্বনি করতে থাকেন এবং উপস্থিত সকলকে ওঁকার উচ্চারণ করতে অনুরোধ করেন। তাঁরা ভাবেন, এ আবার কি ভেল্কি? ব্যাপার কি হয় দেখার জন্য হৃদয় যা বলেন তাই করেন। মিলিতকণ্ঠের ওঁকারধ্বনি তপোবনের পরিবেশ মাধুর্যময় করে তোলে। "পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল।"[১৯] তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এইরূপ অর্ধবাহ্যদশায় তিনি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল ছোটখাট দৃষ্টান্তের সাহায্যে সরল ভাষায় বলতে থাকেন; মিষ্ট সহজ সরল কথা উপস্থিত উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্ম-প্রচারকগণের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর বাণী শুনতে থাকেন। "তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন।"[২০]

এখন শ্রীরামকৃষ্ণই প্রবক্তা।[২১] কেশবচন্দ্র ও উপস্থিত সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠের বাণী শুনতে থাকেন। কিছুটা গ্রাম্য ভাষায়, প্রাত্যহিক জীবনে দৃষ্ট বিষয়সকল উদাহরণ দিয়ে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে থাকেন। আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্টতায়, ততোধিক প্রকাশভঙ্গিমার অভিনবত্বে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্থায় বলিতে লাগিলেন.[২২] "ঈশ্বরকে যে ভক্ত যেরূপ দেখে

১৮ খ চিরঞ্জীব শর্মাঃ ঐ:, পৃ: ১৪৬, "রামকৃষ্ণের প্রকৃত মহত্ত্ব যাহা কিছু, কেশব দ্বারা জগতে তাহা প্রথম প্রচারিত হয়।"

১৯ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় রচিত "আচার্য কেশবচন্দ্র". পৃ: ১০৪৩

২০ ধর্মতত্ত্ব. ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শক

২১ Sevak Priyanath Mallick : Prabuddha Bharat : 1936
"At such meetings Ramakrishna almost monopolized the conversation. Keshubchandra hardly said anything He only expressed his appreciations by smiles and nods.'

২২ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ব্যক্তিদের যথা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মপ্রচারকগণের লেখা, সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত ঘটনা এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও হৃদয়রামের নিকট হতে সংগৃহীত বিবরণী হতে সেদিনকার আলোচিত বিষয়গুলি জানা যায়। কাহিনীগুলি যথা-সম্ভব শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত "কথামৃত" প্রভৃতি অবলম্বনে সঙ্কলন করা হয়েছে।

সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা'হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। একটা গল্প শোন—

"একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে, গাছের উপর একটা জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আরেকজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ্ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ্।' আরেকজন বললে 'না না—আমি দেখেছি হলদে।' এইরূপে আরও কেউ বললে, 'না জরদা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, আমি এ গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য—সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ।"

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনিই সাকার, আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। যে গাছতলায় থাকে সেই জানে বহুরূপীর নানা রঙ্—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।"[২৩]

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্ম প্রচারকগণ একাগ্রমনে শুনেন, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা বা তাঁর মহিমা বর্ণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত, তিনি যদি কৃপা করে ধরা দেন তবেই মানুষ তাঁকে জানতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে থাকেন, "কেউ কেউ বলে ঈশ্বর সাকার, আবার কেউ বলে তিনি নিরাকার। এই বলে আবার ঝগড়া।"

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরকার। আরো তিনি কত কি আছেন মুখে বলা যায় না।

"দেখ, কতকগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে 'হাতী একটা থামের মত'। সে কানাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে 'হাতীটা একটা কুলোর মত'। সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

"এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়। আন্তরিক হলে সব ধর্মের

২৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৩।৫ হতে গৃহীত

ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।"[২৪]

"একটা ডেও পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গেছল। একটা দানা মুখে করে পালাল, আর সেইটে খেয়েই হেউ ঢেউ। আর শক্তি কোথা যে খাবে? সেইরকম ভগবানকে জেনে কে শেষ করতে পারে? আবার তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে জানবার যোটি নেই।"[২৫]

সময় গড়িয়ে চলে। ব্রাহ্ম প্রচারকগণ শ্রীরামকৃষ্ণের বচনামৃত পান করতে থাকেন। সকলেরই মনের ভাব, এমন সরল ভাষায় প্রাণস্পর্শী তত্ত্বকথা পূর্বে কেউ কখনও শোনেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি কেশবের উপর নিবদ্ধ হ'ল যেন। কেশবচন্দ্রের সাধন-জীবনের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, "সাধন-ভজনের প্রথম অবস্থায় হাঁকডাক, ক্রমে সব থেমে যায়। ঘিয়ে লুচী ছাড়লে প্রথমে টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে, জ্বাল হতে থাকলে আর শব্দ হয় না। তেমনি জ্ঞান পাকা হলে আর বাহ্য আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর।"[২৬]

"দুরকমের সাধক আছে;—একরকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর একরকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে চায়।

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যা করে, মা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না।—এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে, তিনি তার কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।"[২৭]

সৎপ্রসঙ্গের অফুরন্ত ধারা ব্রাহ্মভক্তদের স্নান আহার উপাসনা ভুলিয়ে দিল, সকলে অপার আনন্দে মগ্ন। তখন কেশবচন্দ্র কি করছিলেন? কি ভাবছিলেন? অনুমান করা যায়, কেশবের তৃষিত হৃদয় অমৃতবারিসিঞ্চনে অপার তৃপ্তিতে তখন মগ্ন। তিনি হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করে অমিয়ধারা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল; তিনি বিনীত ও কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে বসে থাকেন।[২৮] সৎপ্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মপ্রচারকদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রায়

২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।২।৫, হতে গৃহীত

২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত : গুরুদাস বর্মন : পৃঃ ১৫১

২৬ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ : ঐঃ, পৃঃ ১০৪৩ হতে গৃহীত।

২৭ কথামৃত, ৩।৭।১

২৮ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "পরম ধার্মিক, মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকট শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথাসকল শ্রবণ করিতেন, কোন দিন কোনরূপ তর্ক করিতেন না।

অজ্ঞাত কারণে সকলেই বোধ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আপন জন, যেন নিকট আত্মীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের আসরে তাঁর অভ্যর্থনার একটা সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত করেন একটি উপমার সাহায্যে। তিনি বলেন, "গরুর পালে অন্য জন্তু এলে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অন্য গরু এলে পর স্বজাতি বলে কত খাতির—তখন গা চাটাচাটি করে।" এই কথায় হাসির রোল উঠল।

সকলের অজ্ঞাতসারে সূর্যদেব তিন চার ঘণ্টার পথ অতিক্রম করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, বিদায়গ্রহণের সময় কেশবচন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "এঁরই ল্যাজ খসেছে।" কথার তাৎপর্য না বুঝে সভাশুদ্ধ লোক হেসে ওঠে। তখন কেশবচন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, "তোমরা হেসো না। এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি।"

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে বলতে থাকেন, "যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে ততদিন সংসারজলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে— জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে।"[২৯] "কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হয়েছে; তোমার মন সংসারেও থাকতে পারে আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।"[৩০] সামান্য কথার মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য তার ব্যাখ্যা শুনে উপস্থিত সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর গূঢ় অভিমত[৩১] জেনে ব্রাহ্মপ্রচারকদের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাঁরা বুঝতে পারেন, পরমহংসদেব শুধু একজন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষমাত্র নন, তিনি একজন অন্তর্বেত্তা।

সৎপ্রসঙ্গে তিন-চার ঘণ্টা অতিবাহিত হলে, আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গেরা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দরসে সম্পৃক্ত হয়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস একজন অসাধারণ ব্যক্তি। প্রথম দর্শনেই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, তাঁর পূত সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত হন।

"... ...সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয়, কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন।"

ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৬৮, "..... দেখিলাম ঠাকুরের প্রতি কেশববাবুর শ্রদ্ধা ভক্তি কত গভীর, তাঁহার সেবাকার্য কত নিখুঁত, আমরা তাঁহার শ্রদ্ধার এক অংশও পাই নাই।"

২৯ কথামৃত, ১।১০।৪

৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৪০০ পৃঃ, হতে গৃহীত।

৩১ অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেশববাবু কেমন লোক? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন ওগো, সে দৈবী মানুষ। (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট)

অপরপক্ষে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "দেখ! পরমহংস মশায় লাটের মাল নহেন, তিনি অমূল্য বস্তু, গ্লাসকেশে রাখিবার উপযুক্ত" (ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ৫৫)

এভাবে জগন্মাতার উপর সর্বদা নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে আবিষ্কার করে, তাঁর হৃদয়ে রুদ্ধ ভক্তির ফোয়ারা উন্মুক্ত করে' শুধু কেশবের জীবনে ও তাঁর ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন তাই নয়; দেখা যায় এই প্রথম[৩২] সাক্ষাতের ফলশ্রুতি-স্বরূপ গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা-প্রচারে প্রথম উদ্যোগী[৩৩] হয়েছেন। "এর মধ্যে যে ভাব আছে, যে শক্তি আছে তাহা এখন প্রচার করার প্রয়োজন নেই—একে বক্তৃতা বা খবরের কাগজ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে না,"[৩৪] কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে তিনি নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের নিকট পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন।

৩২ সত্যচরণ মিত্র: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৯৭ সালে প্রকাশিত), (পৃঃ ৮১-৮৪)। এই গ্রন্থকারের মত—ব্রাহ্ম অন্নদাচরণ মল্লিকের নিকট সংবাদ পেয়ে কেশবচন্দ্র একদিন অন্নদাচরণের সঙ্গে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন। পরে মহিমাচরণের সঙ্গে একটি গাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম কমলকুটীরে যান। সেখানেই 'তোমার ল্যাজ খসেছে' ইত্যাদি কথোপকথন হয়। এই ঘটনাবলী অপর কোন গ্রন্থকার সমর্থন করেননি।

৩৩ Bhudhar Chatterjee, Editor of the monthly Veda Vyasa (1888): "And afterwards it was Keshab Babu that became the chief helper in his (Ramkrishna's) preaching work and gradually extended the sphere of his activity." (Prabuddha Bharata, Feb, 1936, p 95)

৩৪ ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৬৯

ঐশ্বর্য

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

ছড়ায়ে রেখেছ তুমি ভুবন ভরিয়া
বিচিত্র ঐশ্বর্যরাশি! মন্ত্রমুগ্ধ হিয়া
ডুবে আছে অপরূপ সৌন্দর্য মাঝারে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি চারিধারে
সুউচ্চ পর্বতমালা গভীর সাগর,
বিশাল অরণ্যরাজি স্নিগ্ধ মনোহর।
বাহিরের শোভাতেই রব কি ভুলিয়া
সত্য কি ছলিয়া যাবে ধরা নাহি দিয়া?
ঐশ্বর্যের অন্তরালে হে ঐশ্বর্যবান
রেখেছ নিজেরে গুপ্ত! তোমার অম্লান
সৌন্দর্যরাশির মাঝে রহিব ডুবিয়া
অনাদি অনন্ত কাল! অতলে নাবিয়া
রত্নের সন্ধান আমি পাইব নিশ্চয়—
কাঁচ নিয়ে তৃপ্তি-লাভ আর নয় নয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী

তন্ত্রশাস্ত্র কত প্রাচীন এ বিষয়ে আলোচনা করতে হ'লে প্রথমে তন্ত্রের স্বরূপ জানতে হবে। শব্দাত্মক বেদ যেমন দিব্য এবং অপৌরুষেয় জ্ঞান, শব্দাত্মক তন্ত্রও তেমনি দিব্য এবং অপৌরুষেয় জ্ঞানবিশেষ। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত এবং নিত্য। একমাত্র ঋষিগণ এই অতীন্দ্রিয় নিত্য জ্ঞানকে সূক্ষ্মা বাক্‌রূপে সাক্ষাৎকার করেছেন। এই সূক্ষ্মা বাক্ পরা বাক্ নামে অভিহিত। এই বাক্ স্বরূপতঃ বোধাত্মক। এই বোধাত্মক জ্ঞান অভিব্যক্তিকালে বাগাত্মক হয়ে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই বাগাত্মক অভিব্যক্ত জ্ঞানই বেদ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র নামে অভিহিত। সৃষ্টির উন্মেষকালে সূক্ষ্মা অতীন্দ্রিয় পরাবাক্ ক্রমশঃ পশ্যন্তী এবং মধ্যমা নামক ভূমিদ্বয়ে অবতরণ করে এবং বৈখরী ভূমিতে এসে শব্দার্থরূপে প্রতীয়মান হয়ে শাস্ত্রের রূপ ধারণ করে। মধ্যমা ভূমিতে পরমেশ্বর অতিগুহ্য শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশের নিমিত্ত কল্পিত গুরুশিষ্যের ভাব গ্রহণ করেন। এই গুরু সদাশিব নামে অভিহিত। সদাশিবরূপী পরমেশ্বর আপন পাঁচটি শক্তি—চিৎ আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াকে পাঁচটি মুখরূপে প্রকাশিত করেন। এই পাঁচটি মুখের নাম—ঈশান তৎপুরুষ সদ্যোজাত বামদেব এবং অঘোর। সদাশিবের এই পঞ্চমুখে অনন্ত শাস্ত্র বিধৃত রয়েছে। অনন্ত শাস্ত্রের অতি অল্পই জগতে শব্দার্থরূপে প্রকটিত হয়েছে। প্রকটিত শাস্ত্রের মধ্যে আবার কালক্রমে কতক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকটিত, অপ্রকটিত এবং বিলুপ্ত সকল শাস্ত্রই কিন্তু পরাবাক্ রূপে নিত্য বর্তমান রয়েছে। ইন্দ্রিয়াতীত নিত্যবর্তমান বোধাত্মক পরাবাক্ যেভাবে তন্ত্রাদিশাস্ত্রের আকারে প্রকটিত হয়েছে তা মনে রাখলে তন্ত্রাদি শাস্ত্রকে কোন বিশেষ কালের ব্যাপার বলে নির্দেশ করা যায় না। বর্তমান প্রবন্ধে 'তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব' বলতে মনুষ্যসমাজে তর্কশাস্ত্রচর্চার অর্থাৎ তন্ত্রধর্মানুবর্তিতার প্রাচীনত্বকেই বোঝান হচ্ছে। বস্তুতঃ যে বিপুল তন্ত্রগ্রন্থরাজি পরাম্পরাক্রমে আমাদের হস্তগত হয়েছে, সেই গ্রন্থরাজির প্রাচীনত্ব আমাদের আলোচনার বিষয়। কাজেই, এ আলোচনায় ঐতিহাসিক কালক্রম আশ্রয় করা হচ্ছে।

তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রাচীনত্ব সুগভীর গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি। দু'চারজন পণ্ডিতব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের মতামত তুলে ধরা হচ্ছে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, তন্ত্রগ্রন্থগুলি পুরাণসমূহের পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে। এই মতবাদের যাঁরা বিরোধিতা করেছেন তাঁরা বলেন—পুরাণসমূহে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়-প্রকার উপাসনা-পদ্ধতির বিধান রয়েছে। অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্মে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়প্রকার ধর্মানুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাজেই পৌরাণিক ধর্মের উপর তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব স্বীকার করলে তন্ত্রের সৃষ্টি পুরাণের আগে হয়েছে একথা মানতেই হবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির পর তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতবাদের

বিরুদ্ধে কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে, বৌদ্ধদের প্রামাণ্য পুস্তক ললিতবিস্তরে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ তন্ত্রোক্ত বিষ্ণু কাত্যায়নী এবং গণপতির পূজার নিন্দা করেছেন। কাজেই বৌদ্ধযুগের পূর্বেই তন্ত্রের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়।

তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবান পণ্ডিতদের বিশ্বাস—বেদ-শাস্ত্রের উৎপত্তির অনেক পূর্বেই তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা বলেন যে নারায়ণীয় তন্ত্রে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, জামল থেকে বেদের উৎপত্তি হয়েছে। জামল এক শ্রেণীর তন্ত্রগ্রন্থ। নারায়ণীয় তন্ত্রানুসারে ব্রহ্মজামলে সামবেদের, রুদ্রজামলে ঋগ্‌বেদের, বিষ্ণুজামলে যজুর্বেদের এবং শক্তিজামলে অথর্ববেদের মূল নিহিত রয়েছে। এই মতবাদে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যদিও এই বিতর্কের মীমাংসা নিপুণ গবেষণার বিষয়, তবু আমরা এ সম্পর্কে দু'চারটি কথা আলোচনা করছি।

মহেন্‌জোদারো এবং হরপ্পায় যে সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, পণ্ডিতেরা তাকে বৈদিক আর্যসভ্যতার পূর্ববর্তী সভ্যতা বলে মনে করেন। পণ্ডিতগণ এ বিষয়েও স্থির নিশ্চয় করেছেন যে, ঐ দুই স্থানে তৎকালে শিব (লিঙ্গ) ও শক্তি (মাতৃ)-পূজা প্রচলিত ছিল। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, বৈদিক যুগের পূর্বেই তন্ত্রোক্ত শিব ও শক্তির আরাধনা প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ, তন্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য ধর্মানুষ্ঠান বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতপ্রবর চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর "তন্ত্রকথা" নামক পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম মন্ত্রাদির ব্যবহার এবং মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখা গিয়েছিল। অপরকে বশ করবার জন্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার আশ্রয় নিতেন অতি প্রাচীন কালের মানুষরাও। মোম-জাতীয় দ্রব্যের দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তির মূর্তি তৈরী করে ঐ মূর্তিকে অভিমন্ত্রিত করা বা অগ্নিতে দ্রবীভূত করার প্রথা প্রাচীন সোমেটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোক লইয়া উপাসনা প্রাচীন গ্রীস ও রোমদেশের 'পান'-পূজায় প্রচলিত ছিল। ধর্মোৎকর্ষলাভের জন্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহারও বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যেত।

তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক ধর্মানুষ্ঠানকে যাঁরা বেদশাস্ত্র এবং বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের চেয়ে প্রাচীন বলে মনে করেন, সেই তন্ত্রাভিলাষীদের মতে, আর্যদের আগমনের পূর্বে অনার্যদের মধ্যে তাঁদের ভাষাতেই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। তখন গ্রন্থ ছিল না। গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শাস্ত্র কণ্ঠে বিধৃত ছিল। আগমনের পর তাঁরা তন্ত্রধর্মের উদারতায় এবং সর্বজনীনতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পৈতৃক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ত্যাগ না করেও তাঁরা তন্ত্রের কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ, উপনয়নাদি বেদবিহিত সংস্কারলাভান্তে বিবাহ করে গৃহস্থ হবার পর এখনো যে আমরা কুলগুরুর কাছে কুলদীক্ষা নিয়ে থাকি, এ ব্যাপারটি বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সেই সহাবস্থানের পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইভাবে তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবার পর আর্যগণ তাঁদের নিজভাষা সংস্কৃতে তন্ত্রের পুঁথি রচনা করতে লাগলেন। ফলে, উদার তন্ত্র ধর্মের সর্বজনীন রূপ খর্ব হতে লাগল। তন্ত্রের উপর ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব পড়তে লাগল। জাতিভেদহীন তন্ত্রে চতুর্বর্ণের প্রসঙ্গ এসে

পড়ল। বাহ্যিক-শৌচাচারহীন তন্ত্রে বাহ্য-শৌচাচার দেখা গেল। ক্রিয়ামূলক তন্ত্র ক্রমশঃ জ্ঞানমূলক হতে লাগল। সাংখ্য-বেদান্তাদি দর্শনের তত্ত্ব তন্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হোলো। ফলে, সংস্কৃত ভাষায় আর্যদের দ্বারা রচিত তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে তন্ত্রধর্মের বিশুদ্ধ রূপটি যথাযথ রক্ষিত হয়নি। এসকল গ্রন্থে কৌলাচারের বৈদিকত্ব প্রতিপাদন করার চেষ্টা হয়েছে। কুলার্ণব তন্ত্রে কুলশাস্ত্রকে বেদাত্মক বলা হয়েছে এবং কুলাচারের সমর্থক শ্রুতি উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থে তন্ত্রধর্মের রূপটি তুলনামূলকভাবে অবিকৃত রয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে রচিত তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে ক্রিয়ামূলক তন্ত্রধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কথা না বলে তত্ত্বের দিকটির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে বলে তাতে শিবপ্রচারিত তন্ত্রধর্মের রূপ বিকৃত হয়েছে বেশী মাত্রায়। বস্তুতঃ অনেক তন্ত্রগ্রন্থে আধুনিকতার চিহ্ন অতি স্পষ্ট। যোগিনী তন্ত্রে কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণু সিংহের বিবরণ রয়েছে। বিশ্বসার তন্ত্রে বৈষ্ণবকুলতিলক নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। মেরুতন্ত্রে ইংরেজ জাতি ও লণ্ডনের উল্লেখ আছে। এ অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত না হলে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির আধুনিকতায় সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কিন্তু, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, স্পষ্টতঃ আধুনিক এই তন্ত্রগ্রন্থগুলির তথ্য ও ভাষার বিচার করে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তন্ত্রকে বেদ বৌদ্ধসাহিত্য এমনকি পুরাণসাহিত্যেরও পরবর্তী বলে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা সবিনয়ে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তন্ত্রগ্রন্থের কালকে তন্ত্রধর্মের কাল বলে নির্দেশ করা এক মারাত্মক ভ্রম। বস্তুতঃ কিছু কিছু তন্ত্রগ্রন্থ স্পষ্টতঃ আধুনিক হলেও সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে অথবা প্রত্যেক তন্ত্রগ্রন্থকে আধুনিক বলা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে তন্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি যে বৌদ্ধসাহিত্য ও পুরাণসাহিত্যের চেয়ে প্রাচীন, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

শিবপ্রোক্ত তন্ত্রধর্ম বৈদিক ধর্মের চেয়ে প্রাচীন - নিষ্ঠাশীল তান্ত্রিকদের এই অভিমত সত্য হলে বৈদিক ধর্মের উপর তন্ত্রধর্মের প্রভাব কিছু পরিমাণে বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করে পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন যে, তান্ত্রিক মন্ত্র ও চক্রের সদৃশ যন্ত্রের বর্ণনা অথর্ববেদে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে তান্ত্রিক মন্ত্রের সদৃশ একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। সায়ণাচার্যের মতে এই মন্ত্র অভিচার-ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়। ধর্ম-কার্যে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের নিদর্শনও বেদে দেখা যায়। শতপথব্রাহ্মণে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইহার আধ্যাত্মিক ভাব দেখানো হয়েছে। মদ্যের ব্যবহারও বেদে পাওয়া যায়। সৌত্রামণিযজ্ঞে ইন্দ্র সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়কে সুরা প্রদান করার বিধান রয়েছে। বাজপেয় যজ্ঞেও এই বিধান রয়েছে। সুরা প্রস্তুত করার প্রণালীও বেদে বর্ণিত আছে। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মতো বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার প্রথা ছিল। তান্ত্রিক ষট্‌কর্মের তুল্য কর্মের বিবরণ অথর্ববেদে অনেক পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৪৫ এবং ১৫৮ সূক্তে সপত্নীর বিনাশ এবং পতিকে বশ করার কথা আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২।৩।১০) থেকে জানা যায় যে, প্রজাপতিকন্যা সীতা সোমকে বশ করবার জন্যে আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বৈদিক এবং তান্ত্রিক আচারের মধ্যে এই সাদৃশ্যগুলি থেকে কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত

করেছেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের মূল বেদে নিহিত রয়েছে। তাঁদের মতে, অথর্ববেদের সৌভাগ্য-কাণ্ডে তন্ত্রের বীজ পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্ঠা-শীল তান্ত্রিকদের সিদ্ধান্ত যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে এই সাদৃশ্যগুলিকেই বৈদিক ধর্মের উপর তন্ত্রধর্মের প্রভাব বলে মনে করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমরা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে পৌর্বাপর্যবিচারের এই প্রচেষ্টা স্থূল ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকেই করা হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে, এইরূপ তুলনামূলক বিচার হাস্যকর। কেননা, বেদ এবং তন্ত্র দিব্য অপৌরুষেয় জ্ঞানেরই প্রকারভেদ। জ্ঞান নিত্য বর্তমান। জ্ঞান থেকেই নিখিল শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই বেদশাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে পৌর্বাপর্যবিচার তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ভ্রমাত্মক। এ দেশের মানুষ প্রথম কোন্ শাস্ত্রের অনুবর্তী হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে মাত্র।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

তুমিময় সব ঠাঁই ওগো অন্তর্যামী
লীলাছলে খেলা তব ঘুমে জাগরণে
নানারূপে, নানাভাবে, নানাপথগামী
শক্তিহীনে শক্তি দাও, আলো অন্ধজনে।

দুঃখ মাঝে দাও সাড়া প্রাণের গভীরে
আবার ফেলিয়া যাও মায়া-অন্ধকারে
কী খেলা খেলিছ নাথ অন্তরে বাহিরে
তুমি না জানালে কেবা জানিবে তোমারে।

শুদ্ধাভক্তি দাও প্রভু জ্ঞান বুদ্ধি পারে,
মুক্তি নহে, চাহি তব স্মরণের গতি
চূর্ণ কর গর্ব মোর ব্যর্থ অহংকারে
দিবা নিশি তব পদে থাকে যেন মতি।

রিক্ত হ'য়ে খোঁজা মোর হোক তবে শেষ
কৃপাসিন্ধু কৃপা কর অধম-অশেষ!

'পড়া' 'শোনা'-'লেখাপড়া'

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

আমরা পড়াশোনা কথাটা একসঙ্গে করেই শুনি আর বলিও। পড়াশোনা যত বেশী বলা হয় 'অমুকের পড়াশোনা আছে' 'পড়াশোনা করে' 'লেখাপড়া করে',—'লেখাপড়া আছে' বড় একটা কেউ বলে না।

যদিও পড়া চোখের ব্যাপার, শোনা কানের এলাকার বিষয় কিন্তু চিরকাল মানুষ এক করেই বলে এলো 'পড়াশোনা'।

কারণটা মনে হয়, যখন কাগজ ছিল না পুঁথিপত্রের যুগ তখন পড়ার সঙ্গে 'শোনা' বলে একটা বিশেষ বস্তু ছিল। কারণ হাতে হাতে বই ঘুরবে সে যুগে তা সম্ভব ছিল না। একজন বই লিখবেন, এবং সেই লেখা পড়ে শোনাবেন। অথবা একজন রসিক পাঠক সাহিত্যসভার মত একটি লোক-সংঘে বসে অন্যের লেখা বা পুরাণ-ধর্ম-ইতিহাস-কাহিনী-কাব্য-কথা যাইহোক পড়বেন, লোকে শুনবেন। যেমন আজকাল সাহিত্যসম্মিলনে বা সাহিত্যবাসরে সাহিত্যিক-সঙ্গমে এককথায় 'সাহিত্য'-তীর্থে জড় হয়ে আপন কথা বলি, পরের কথা শুনি। চিত্তকে অবগাহন করাই বহুজনসঙ্গে, শুচিস্নান করাই মনকে।

তারও মোটকথা 'লেখাপড়া' করা নয়। সেকালে যা ছিল এখনো অন্য আকারে তাই আছে 'পড়া' 'শোনা' করা বা পড়া-'শোনা'! তারপর এসে পড়েছে বিলিতী আমলের পর 'কাগজের' অবারিত দান। ভূর্জপাতা তাল-পাতার যুগ শেষ হয়ে গেছে। লেখকরা জড় হলেন ঘরে ঘরে। প্রেসে প্রেসে। পত্রিকায়, পত্রে, প্রকাশকের আসরে। সম্পাদকের আসরে। এবং 'শোনা' ও শোনানো থাকলেও এক পড়ার জগৎ—বই পড়া, বই কেনা, বই রাখার আলোয় আলোকিত যুগ এসে দাঁড়াল। সাহিত্যের প্রচার প্রাঙ্গণেও যেমন—ঘরোয়া পড়ার নেশার ক্ষেত্রেও তেমনি।

এবং বই পত্র পত্রিকা জমল ঘরে ঘরে। ঘরের বাইরে জনতায় বইয়ের আসরে লাইব্রেরীতে। লেখকও জমলেন হেথা-হোথায়। কিন্তু "পড়া" "শোনা" কথাটা রয়েই গেল। 'লেখাপড়া' করা একথা কেউ আর বলল না তাকে।

অর্থাৎ 'শোনা'টার প্রভাব প্রবল। যেমন গান শোনা। নিজে নিজে 'গান গাওয়া' থাকনা, 'শোনা'র আনন্দ আরেক রকম। আর শোনা মানেও তাই। জানি না বিক্রমাদিত্যের সভায় যখন কালিদাস তাঁর কাব্য শোনাতেন, আরো আটটি রত্নসঙ্গে মধ্যমণি শ্রোতা রসিক পৃষ্ঠপোষক সেই মহারাজা সঙ্গে থাকতেন কিনা—যে কোন সময়ে—কখনও রাত্রে কখনও সন্ধ্যায় বা প্রত্যূষে, দেশের রাজ্যের সবাই যখন ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে ঘরে ঘরে শুয়ে—রাজা তখন রাজসভায় বসে অথবা প্রমোদ উদ্যানে বসে 'কাব্য' শুনতেন। তখন কোন্ কাল—বর্ষা বা বসন্ত শরৎ বা হেমন্ত কাল তাও কোথাও লেখা নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার ব্যবস্থা কি ছিল তাও জানা নেই!—আর ক্লান্ত চোখে কারুর নিদ্রা নেবে আসত কিনা, ঢুলে পড়ত কিনা তাও লিখে রাখেননি কেউ।

এই হল একটা অমর পড়া 'শোনার' যুগ। তার আগেও কি ছিল না? ছিল বৈকি।

সেই নৈমিষারণ্যে মুনিঋষিরা সবাই নানাকর্মে যাগযজ্ঞ তপস্যায় রত ধ্যানে নিমগ্ন আর এমন সময়ে সৌতি এলেন। যিনি ব্রাহ্মণ নয়, পণ্ডিতও নয় সূতপুত্র। তাই সৌতি। এবং সেই মহাপর্যটক সূতপুত্রকে সবাই ঘিরে বসলেন কথা শুনতে।...এবং "নর নারায়ণ নরোত্তম ব্যাস ও দেবী সরস্বতীকে" প্রণাম করে জয় উচ্চারণ করে আরম্ভ হল সৌতির পুরাণপাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত? সে তো একটুখানি ব্যাপার নয়। নিরবচ্ছিন্ন কতদিন কতরাত্রি ধরে সে পড়া? সে শোনার সমবেত কাহিনীও তো কেউ লিখে রেখে যায়নি। তাঁদের তখনকার নিত্যকর্ম গৃহধর্ম জীবিকা "ভিক্ষা-সেবার" ব্যাপার —তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কি ছিল, কি করে সমাধা হ'ত তাই বা কে জানে।

আমরা মহাভারত খুলে চিরকাল দেখি কখনো বৈশম্পায়ন বলছেন, কখনো "অনন্তর সৌতি কহিলেন"...সেই নৈমিষারণ্য জটাজূট-ধারী গৃহী মুনিঋষির দল! যেখানে আশ্রমভরা নারী-বালক-বালিকাও ছিল। পশুপাখী গোধন শুক হরিণ ময়ূর পায়রা। যজ্ঞের আগুন। কুঁড়ে ঘর। দিকে দিকে তাঁদেরও তো কাজ ছিল। সেবা পরিচর্যা ছিল। কারা শুনত? শুধু মুনিঋষিরাই? না, ছেলেবুড়ো নরনারীও থাকতেন একালের নদীতীরে তীর্থে তীর্থে দেবালয়ে লোকের বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঘরে, কথা-কথকতা শোনার মত? মানস-চোখে দেখছি 'তপোবন।' তপোবন আছে বই কি? বনে না হোক 'মনে মনে'। ভারতের কবি সাহিত্যিক মনে আছে। এখানেও সেই নরনারায়ণ নরোত্তম ব্যাস সরস্বতীর জয় উচ্চারণ করে তবে 'কথা শোনা' ও 'পড়া'। আর সবের আগে নর-ঋষির নাম। তারপর "নরোত্তম নারায়ণ"ও বলতে হবে কত গভীর অর্থ মানুষের শোনায়। তার নামের কত দুর্বৃত্ত কত সাধু কত সাধারণ মানুষ নিয়ে এই 'নর নরোত্তমের জগৎ'।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের কালের 'পড়া' ও 'শোনার' কথা একটু মনে করলে খুব অবান্তর হবে না।

পড়ার বই সেকালে ছিল নগণ্য। তাতে আবার শিশু বা বালক-পাঠ্য সাহিত্য তো মোটেই ছিল না বলা যায়।

মেয়েদের তো বিদ্যারম্ভ-ব্যাপার তার আগের যুগে অর্থাৎ ১৫০।২০০ বছর আগে ছিলই না। আমাদের প্রপিতা-প্রমাতামহীরা প্রায় নিরক্ষরই ছিলেন। পিতামহী-মাতামহীরা সব বিয়ের আগে (৬।৭।৮ বছরে যে বিবাহ) একটু সাক্ষর হয়েছেন। অর্থাৎ শিশুবোধকের "অ আ ক খ" শিখেছেন। একটু রামায়ণ মহাভারত পুরাণ পড়ার আকাঙ্ক্ষায়। (রাসসুন্দরীর "আমার জীবন" স্মরণীয়)।

পরে আমাদের কালে বিয়ের বয়স ১০।১১ সীমানায় পৌঁচেচে। কাকা ভাইদের "হাতে খড়ির" পুণ্য দিনে একটা 'খড়ি'ও হাতে দেওয়া হয়েছিল হয়ত। মেয়েদের তো তার আগে 'হাতে খড়ি' হ'ত না। লেখা পড়া শিখলে 'বিধবা' হবে। সংস্কার ছিল। কিন্তু বাড়ীতে তখন বই জমতে সুরু হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের বাল্যের বই 'পড়া'র যুগ।

বইগুলির কিছু নাম অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বরং কৌতুক আর কৌতুহলের উপাদান হবে একালের পাঠকদের। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"। কেশবসেনের "ধর্মতত্ত্ব" "পরিচারিকা", "বালক বন্ধু" ছোটদের। 'তত্ত্ববোধিনী' 'ভারতী' 'সাধনা' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ঐ পরিবারের সম্পাদিত। 'বামাবোধিনী'

'জন্মভূমি' 'আর্যদর্পণ' 'প্রচার'। আরো স্বল্পজীবী দীর্ঘজীবী পত্র-পত্রিকা ছিল। সব নাম আর মনে নেই। সব তো বুঝতাম না। এবং সব বই পড়তে বিধিনিষেধও ছিল। আর ছিল বিছানার চাদরের আকারেরও সাপ্তাহিক পত্র। "বঙ্গবাসী" "হিতবাদী" পরে "বসুমতী" ও "প্রদীপ" নামে একটি মাসিক পত্র। এবং ছিল রহস্য গল্পমালার মত একটি প্রকাশ। মাসিক পত্র। যার নাম "দারোগার দপ্তর"। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। রাজ্যের দুষ্কার্য-কাহিনী। পুলিস কোর্টের অপরাধী-কাহিনী কথা। নানারকম চটকদার নাম বইগুলির 'ছেলেধরা' 'মেয়েচুরি' 'খুন জখম চুরি'র গল্প।

তার কতদিন পরে "উদ্বোধনের" আবির্ভাব হল। ১৩০৫ সালে। তার তিন বছর পরে 'প্রবাসী'র জন্ম হ'ল। ১৩০৮ সালে।

সেকালের পত্রিকাগুলির মধ্যে এই দুটি পত্রিকা এখনো তাদের মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে জীবিত আছে। একটির আদর্শ ধর্মনীতি লোকশ্রেয় লোকসেবা ও কর্ম ও জ্ঞানের প্রচার। উদ্বোধনের মূলনীতি ধর্ম কর্মময় সেবা, অন্য পত্রিকা 'প্রবাসীর' আদর্শও সাহিত্যের পথে লোকহিত সমাজ-কল্যাণ। দৃঢ়নীতি-বাদ শিক্ষাপ্রচার সাহিত্যের পথে, কল্যাণ ও লোকশ্রেয়ের সন্ধান। 'প্রবাসী'র মূলকথা সাহিত্য ও মানুষ।

সেকালের আর কোনো পত্রিকা এখন বেঁচে নেই। তাদের উত্তরাধিকারী এখন এঁরাই দুই পত্রিকা "উদ্বোধন" ও "প্রবাসী"। পড়ার কথাতে মনে আসে সেকালের বইয়ের কথা। আলমারীতে কখানাই বা বই তখন। রামায়ণ, মহাভারত, কাশীরাম কৃত্তিবাসী কালীসিংহের মহাভারত প্রায় আদিকথা গল্প "আলালের ঘরের দুলাল" (টেকচাঁদ ঠাকুর প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত)। অতঃপর বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' 'বেতালপঞ্চবিংশতি।'

তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাস প্রবন্ধাবলী।

রমেশচন্দ্র দত্ত। "জীবনপ্রভাত জীবন-সন্ধ্যা সংসার সমাজ ইত্যাদি"।

রবীন্দ্রনাথ। 'সন্ধ্যাসঙ্গী' 'প্রভাতসঙ্গীত' 'রাজর্ষি' 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। তখনো 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি' 'ছোটগল্প সংগ্রহ' সাহিত্যের আসরে বই আকারে আসেনি। অন্যত্র এছাড়া পদাবলী সাহিত্য ভারতচন্দ্র আর ছিল নানা ধরনের অনুবাদ অনুকরণ সাহিত্য। হরিদাসের গুপ্তকথা। কিছু বিলিতী লেখক ও বইয়ের কয়েকটি অনুবাদ বই।

এসব বই বোঝা বা পড়ার বয়স তখন আমাদের নয়। কিছু পড়া হত। কিছু নিষিদ্ধ ছিল।

এই সেকালের পড়ার কথা।

এর পাশাপাশি চলত একটা শোনার আসর। শোনার জগৎ। সন্ধ্যাবেলা ছোটদের উৎপাত দৌরাত্ম্য সামলানো, খাওয়ার আগে ঘুম জাগানিয়া গল্পের—পুরাণ ও রূপকথা শোনানোর একটি বড় আসর। কখনো খেতে খেতে কখনো ঢুলতে ঢুলতে জাগিয়ে রাখার আসর।

শোনানো হ'ত আরুণি উপমন্যু একলব্যের গল্প। নলদময়ন্তী শ্রীবৎস-চিন্তা বকরাক্ষস জতুগৃহ-দহনের কাহিনী। আর 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসে'র মত 'সাতকাণ্ড রামায়ণ' দিনের পর দিন সন্ধ্যাবেলায় শোনা। এবং আশ্চর্য, এই 'শোনা'টাই বেশী মনে আছে। পরের পড়াটা তারই যেন একটা চিরস্থায়ী উপসংহার!

পুরাণে, রূপকথায়, আরব্য উপন্যাসে, বিলিতী

গল্পের কথা জীব্ জলজীবের (লা-মিজারেবল্) সেও আর এক শোনার জগৎ। বিলিতী গল্প আরব্য উপন্যাস সেগুলি বাইরে পুরুষ গুরুজন শিক্ষক মাষ্টার অতিথি সজ্জনের কাছে শোনা। অন্য এক শোনা ঘরের মধ্যে রুটি ভাতের গ্রাস মুখে; একথালায় একত্রে খাওয়ার ব্যবস্থাই সেকালে। শোনা হয় রামায়, মহাভারতের গল্প আর রূপকথার রাজারাণী রাক্ষস-রাক্ষসী দেবদৈত্যের দানবের কাহিনী কথা। ছড়া শোনা। এ সবই নারী গুরুজন বৃদ্ধা পিতামহীদের কাছে শোনা।

এই শোনার জগৎ এখনো আছে। শুধু তাতে মানুষের স্পর্শ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের চোখ কান হাত মুখ দিয়ে শোনার ছোঁয়া নেই। এ হ'ল ঘণ্টা মিনিটের 'হিসেব নিকেশ' করা যান্ত্রিক শ্রবণ।

ঘরের ঘুম পাড়ানো ঘুম ভাঙানো মানুষ-জগতের শ্রবণ-জগৎ এটা নয়। নদীতীরে দেবালয়ে সাধুসঙ্গে কথকতা-শ্রবণের লোকময় আসরও এ নয়। রেডিও খুলে মিনিট হিসাবে কোনো অদৃশ্য বক্তার কথা শোনা। অদৃশ্য যান্ত্রিক কণ্ঠে গান শোনা। মিনিটের হিসাবে থামে। আর এক কণ্ঠে তারপর আবার গান। আবার ভাষণ। 'ভালো লাগা' শোনার জন্য কোনো বক্তার চোখ মুখ শ্রোতাদের দিকে চেয়ে নেই। কোনো আনন্দিত শ্রোতারও তার প্রশস্তি জানানোর উপায় নেই। শ্রোতাদলের ভয়বিস্ময়-আনন্দ-হাসির উৎসব উৎসাহের স্পর্শ নেই। ভালো না লাগায় বিমুখ নীরবতাও জানানো নেই। বক্তা যন্ত্রের মাঝে বকে চলেছেন। 'কথকতার' আসরের মত বা গল্পের আসরের মত তাঁর আকার, কৌতুকে-সরস সহাস্য মুখ, বিষাদে-বিষণ্ণ ভঙ্গীও দেখা যাবে না অর্থাৎ আমরা জীবহীন জীবনহীন জগতের শ্রোতা হয়ে পড়ছি ক্রমশঃ

ফিরে আসি শোনার প্রথম পরিচ্ছেদের কাহিনীতে। মনে আছে একটি 'সরল নিষাদ বালক একলব্যের কাহিনী'। তীর ধনুক ছোড়ার অব্যর্থ ও ঐকান্তিক সাধনা। আর গল্প শুনতে শুনতে সহসা ছোটরা 'কাঠ পাথরের' মত আড়ষ্ট কঠিন হয়ে গেল দুঃখে আতঙ্কে! অতি নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যের সেই ছেলেটিকে তার "বুড়ো আঙুল কেটে গুরু-দক্ষিণা" দেবার আদেশে। এই হিংস্র চাওয়ার কথায়। (প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে যায় একালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে অপসারণ। এও দেশগুরুকে দক্ষিণা।) সেদিন কিন্তু ছোট মনে কি প্রশ্ন এসেছিল জানি না। কিন্তু ঐ কঠিন নিষ্ঠুর অর্জুন (শিষ্য)-বৎসল আচার্যকে এক ভয়ানক ভীষণ আতঙ্কজনক মানুষ মনে হয়েছিল। সে কঠিন কুটিল সেই ক্রুর নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা আজো আমরা ভুলিনি। পুরাণকারও ভোলেননি। যতই দ্রোণ-অর্জুনের ভক্ত হোন।

তারপরে শুনি আরুণির উপাখ্যান। ক্ষেতের জল আলে আর বালক আরুণি বাঁধতে পারছে না। অবশেষে কচি বালক 'আলের' উপর শুয়ে পড়ে জলের গতি রোধ করে। নিয়ন্ত্রণ করে। এবং তখন গুরুর আহ্বান আসে, 'আরুণি' তুমি এত রাত অবধি কোথায় কি করছ' ?

ক্ষুদ্র বালকের কণ্ঠে উত্তর এলো "ক্ষেতের জল আলের মাটিতে বাঁধা যাচ্ছে না। জলের তোড়ে 'আল' ভেঙে যাচ্ছে গুরুদেব।"

উপমন্যুর কাহিনী। গরু চরানো। বালকের ক্ষুধা। গরুর দুধ খাওয়া। গুরুর আপত্তি। তখন বৎসমুখ থেকে দুধের ঝরে-

পড়া দুধের ফেনা খাওয়া। গুরুর নিষেধ তাতেও। তবে? ক্ষুধার জ্বালায় আকন্দ পাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে গেলেন উপমন্যু। অন্ধ বালক তারপর একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলেন।

এবারো অনেক রাত দেখে গুরুর আহ্বান শিষ্যকে—'ভো বৎস উপমন্যু, তুমি এত রাত অবধি কোথায় কি করছ?'

অন্ধ উপমন্যু উত্তর দেন কুয়োর মধ্যে থেকে। ক্ষুধার জ্বালায় অর্কপত্র খেয়ে বিপাকের কথা বলেন। তখন গুরুর দয়া হয়। অশ্বিনী-কুমার (স্বর্গবৈদ্য)-দের স্তব করলে দৃষ্টি ফিরে পাবে, বলেন।···আরো গল্প শোনা হয় একান্নবর্তী পরিবারের অনেক জননীর অনেক শিশুর সঙ্গে। কারো জননী কাজে কর্মে ব্যস্ত। কারুর মাতা আঁতুড়ে নবজাতক নিয়ে বিব্রত। কারুর জননী গুরুজনের কোনো সেবায় ব্যস্ত। কেউ বা রন্ধনশালায়।

কাজেই বর্ষীয়সী বা বৃদ্ধা গৃহিণীরা একটি থালায় অন্ন ব্যঞ্জন মেখে বালকদল ভোজন করাতে, নয়ত ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য তাদের গল্প শোনানোতে নিযুক্ত করেছেন নিজেদের।

এই হল সেকালের শোনা বা শ্রবণের আসর। যেখান থেকে রূপকথা পুরাণকথা রামায়ণ-মহাভারতের ইতিহাস শোনার সুরু। যা 'মহা শ্রবণের কথা' চিরকালের। মনে মনে ভাবছি এই পড়া শোনা লেখা পড়াকে যেন তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়।

যার প্রথম সুরু 'মহা আরম্ভ' গল্প শোনা। প্রথমে জীবজন্তু মানুষ গাছপালা নদী পাহাড় বন অরণ্যের কথা দিয়ে সুরু। সেখানে তারা সবাই কথা কয় মানুষের মত। জীবজন্তুরা পাহাড়-নদীরা বন-অরণ্যের গাছপালারাও ইঁট-কাঠরাও তাদের সঙ্গে কথা কয়। রাক্ষস ভূত প্রেত দৈত্যরাও মানুষেরই যেন অংশ। সকলের কথা ও ভাষা সব মানুষের মতই। এখানে মানুষ প্রকৃতি ও জগতের সঙ্গে এক হয়ে রূপকথা পুরাণকথা সৃজন করেছে। 'মীন' 'কূর্ম' 'বরাহ' 'নৃসিংহ' অবতার-কাহিনী ও সেই-সব রূপকথায় প্রথম ও আদি কথা। এটি হল গুরুজনের জগৎ। আমাদের শৈশবের শিশু-মন তখনও সে কাহিনীকে যেমন সত্য বলে গ্রহণ করেছে, পরে বুঝতে গিয়েও সে তাকে অসত্য বা অপ্রাকৃত বলতে পারেনি। তখনো সে এই অজ্ঞাত পৃথিবীর অজ্ঞাত প্রকৃতির জীবন-মৃত্যুর অজ্ঞাত রহস্যের মত জগতের আশ্চর্য লোকের কথার মতই মনের বুদ্ধি-বিচারের আরেক পাশে তাকে জায়গা-স্থান দিয়েছে। সেটা অনুভূতিময় কল্পনার জগৎ

তাই আজ পরিণত মনের কাছে ও বুদ্ধির কাছে এ সবের বিচার অচল। যেটা ছোটদের রূপকথা, বড়দের পুরাণের অলৌকিক কাহিনী সত্যাসত্যের ওপারের কথাই যেন। সেখানে বুদ্ধিমান মনকে থমকে দাঁড়াতেই হয়। বলতে হয় যেন 'জানি না'। 'আমিও তো সব জানি না'। কোনো জানার পারাপার খুঁজে পায় না মন।

এরপর আসে 'পড়া শোনা' বা 'লেখা পড়ার' কাল।

তখন বইয়ের নদ নদী সাগরে ভাসবার সাঁতার দেবার কোন জ্ঞানের অগাধ সমুদ্রে ডোববার হাবুডুবু খাবার কাল!

জ্ঞানের গভীর অরণ্য থেকে ফল ফুল লতাপাতা আহরণ করতে হবে গুরুর কাছে শিক্ষকের কাছে পুঁথি পুস্তক বই পত্রের সাহায্যে।

জ্ঞানের সাগরই তাকে বলা হোক অথবা

জ্ঞানের অরণ্যই তাকে বলা যাক, কিংবা জীবন-রাজ্যের পথের মহাপথ সীমাহীন পথই বলা হোক। এই হল মানুষের জীবনে 'পড়া' 'শোনা' জ্ঞানলোকের সুরু বা আরম্ভ।

এইখান থেকেই যেন আমরা এখন থেকে শোনা কথাগুলোই যেন সাজিয়ে গুছিয়ে ভাষা ব্যাকরণে অলঙ্কারে উপমায় কাব্য কাহিনী দর্শনে রূপে-অরূপে রূপময় রূপে পাই।

এবং পড়ার আর শেষ নেই। শোনার পরিসর সীমিত এখন। দেখে শুনে পড়ে পড়ে কেউ কেউ বা বিবেকানন্দ হয়ে আচার্যরূপে চিরভাস্বর মহিমায় প্রকাশিত হলেন।

কেউ বা আচার্য ব্রজেন্দ্রশীলের মত জ্ঞান-রসের সমুদ্রে অভিভূত হয়ে ডুবেই রইলেন। 'মহাপ্রকাশে'র পথে আর এসে দাঁড়ালেন না।

আবার কেউ বা না পড়েই কোন্ শোনা থেকে অন্তরের সমস্ত 'শ্রবণ' 'শোনা' 'দেখা' মিশিয়ে নিয়ে এক অপূর্ব জ্ঞানী নিরক্ষর বক্তা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হয়েছেন।

এবং আবার কেমন করে কেউ বা রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ হয়েছেন তাও প্রতিভার মহাবিস্ময়। দুশো বছর আগে এক স্মরণীয় পুরুষ রামমোহন রায়ও হয়েছেন। "ইতিহাসের বিস্ময়!" ("উদ্বোধন")

এই পড়া, না 'পড়া'-'শোনার' 'লেখা পড়ার' অতল অসীম রহস্য জনসাধারণের ভেদ করার ক্ষমতা নেই। এই জগৎটা এক আশ্চর্য জগৎ যেন। পুঁথি-পড়া বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান, শৈশবের শোনার জগৎ, আর চার পাশের দেখার জগতে একসঙ্গে মিলিয়ে কোথায়ও মহাপ্রতিভার সৃষ্টি করে; কোথাও ব্যর্থ-শিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষা সাধারণ মানুষকে সাধারণ করেই রেখে দেয়।

তবু এটাকেও 'লেখা পড়া' পর্যায়ে ফেলা যাবে না। আক্ষরিক ভাবে 'লেখা পড়া' বলতে বোঝা উচিত যিনি 'লেখার' চর্চাও রাখেন পড়ার সঙ্গেই। যদিও চলিত অর্থ লেখা-পড়াকে এভাবে বলা হয় না, সেটার মানে পড়াশোনা করে বিদ্বান হওয়া। কিন্তু তারপরও আবার পরম শ্রবণের পথে শোনা আরেক 'পরম শ্রবণ-লোক' আছে চিরকালের মতই। অথবা মহা শোনা বলতে পারি যাকে। মহাশ্রবণই বলা যাক।

এপথেও কমসংখ্যক মানুষ বিচরণ করেন না। যে পরম শোনার কথা বলছি, সেই গীতা ভাগবতের ভাষায় শাস্ত্র পুরাণ ধর্মগ্রন্থের ভাষায় সেখানে সেই মহাশ্রবণের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে জড় হন আর্ত অর্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানী ভক্তরা

সেখানে কি শোনেন তাঁরা? তার উত্তর নেই। নিজের মত করেই তাঁরা কথকতা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা পুরাণ ইতিহাসের নানা ভাষ্য শোনেন। নিজের মত করেই তাকে নিজের আধার মত করেই ব্যাখ্যা করে নেন আহরণ করে নিয়ে ঘরে আসেন।

আমরাও একদিন ঐ শোনার পথে শ্রবণের আনন্দের লোকে সহসা শুনেছিলাম দু'একটি আশ্চর্য বাণী।

সন্ধ্যাবেলা। বৃষ্টিভেজা অন্ধকার পথ কাদায় ভরা। কিন্তু দলে দলে শ্রবণার্থী নরনারী জড় হচ্ছেন সেই কথা শোনার প্রাঙ্গণে ঘরে দালানে। পৃথিবীর পথ অন্ধকার। কে জানে সে পৃথিবী কেমন। সেদিন ব্যাখ্যাটা গীতার সপ্তম অধ্যায়ের। কানে এলো হঠাৎ "পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাম্"। "আমি পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধস্বরূপ" ভগবান বলছেন। যে পৃথিবী অপূর্ব রূপ রস গন্ধ স্পর্শে পুণ্যময়ী। আর কানে যেন কথাটা বিঁধে গেল। কানের ভেতর দিয়ে মর্ম স্পর্শ করা কি একেই বলে? সে আর ভোলা গেল না

এই শোনার কথা আগে একবার বলা হয়েছে। কাজেই সেকথা থাক।

যার কিন্তু আসল কথা হল তা শ্রবণের মহিমা।

শোনার আশ্চর্য লীলার কথা।

বাড়ী ফিরে গীতা খোঁজা।

গীতা ছিল বৈকি বাড়ীতে। একটা দুটা নয় বেশ কয়েকখানা। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য অন্বয় টীকা সমেত অনুবাদ সহ গীতা ৺পিতার পিতামহের পূজার ঘরে ভাষ্য টীকাহীন নবীন সেনের অনুবাদ পদ্য গীতা,—অ্যানি বেসান্তের অনুবাদ গীতা—দুই-ই সংস্কৃত সহ। আবার পিসিমা পিতামহীর আহ্নিক পূজার আসনের পাশে সুধাকরকৃত বাংলা পদ্যানুবাদ গীতা।

কতদিন পরে আবার দেখলাম ৺বিহারীলাল গোস্বামীকৃত গীতা চমৎকার পদ্যানুবাদ সংস্কৃত সহ। পাশাপাশি পাতায়।

এবারে সেই ফুলের নির্মাল্যের দাগলাগা চন্দনমাখা গীতা বাড়ী এসে খুলি।

পড়তে কৌতূহল হয়। কিন্তু সে কালের বাল্যকালে কোনোক্রমে বাংলা শেখা বিদ্যাসাগরী পাঠ্যে। সামান্য বাংলাই। সংস্কৃত অজানা বিদ্যাশিক্ষার জগৎ।

তবু সে সংস্কৃত ভাষ্য করা টীকাময় অন্বয় করে ভাঙা ভাষার কল্যাণে আর তত অবোধ্য বা শক্তপাঠ্য নয়।

চোখে পড়ে বিজ্ঞানযোগ। বিভূতিযোগ।

চোখে পড়ল "পৌরুষং নৃষু"।

গীতা বলছেন তিনি কিসে কিভাবে বিশেষ হয়ে আছেন।

'পৌরুষং নৃষু'। "নরে তিনি পৌরুষ"। কিন্তু কৌতুক এই, নারীতে কিন্তু অনেকগুলো তাঁর বিশেষণ। অনেক গুণসমষ্টি।

যার সবগুলোর সন্ধান নারীতে পাওয়া যায় না। পাওয়া শক্ত। "কীর্তি শ্রী বাক্ স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা।" "সপ্ত দেবতারূপা।" কীর্তি? সবচেয়ে হাসির কথা। নারীর কোন্ কীর্তি পৃথিবীতে কোথায় আছে? অবাক হয়ে মনে মনে হাসি পায়। শুধু 'বাক্'টাই কিছু সত্য হয়ত।

কিন্তু 'পৌরুষং নৃষু' সপ্তম অধ্যায়ে যেন এক কথায় পুরুষ সংজ্ঞা ও গুণের—পুরুষের একটি মহারূপের অভিব্যক্তি। সেখানে আর একটিও বিশেষণ বর্ণনা সংজ্ঞা গীতাকার না দিয়েই তাঁর কথা সবটাই বলে দিয়েছেন। সমস্ত পুরুষ-জগৎকে রূপে আকারে মহিমান্বিত করে ভাস্বর করে দিয়েছেন একটুকরা আধখানি শ্লোকে। জগতের সামনে। আমি পেলাম তাকে শ্রবণ মহিমার পথে।

সৌরকলঙ্ক ও মেরুজ্যোতি

শ্রীবাসুদেব সিংহ

প্রভাতে জবাকুসুমসংকাশ সূর্যদেব পূর্বদিকে উদিত হন। তখন আকাশে অল্প অল্প মেঘ থাকলে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে মেঘে মেঘে রঙতরঙ্গের সৃজন করে। তারপর সূর্যরশ্মি প্রখর হ'তে প্রখরতর হতে থাকলে আমাদের পৃথিবীর রঙভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়। আকাশের নীলিমা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মহিমা, পলাতক মেঘের ক্ষণচঞ্চল রূপ, অরণ্য ও প্রান্তরের বিচিত্র বর্ণ-সুষমা, রাতের আকাশে জ্যোতিষ্কের সমারোহ—এ সবই আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকৃতি দেবী বর্ণ ও আলোকের যে অন্তহীন চিত্রপটের অবতারণা করেছেন তার অঙ্গ।

পৃথিবীতে আলোকের উৎস সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। তার মধ্যে সূর্য আমাদের সবচেয়ে পরিচিত ও নিকটতম। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক দার্শনিকগণ সত্যদ্রষ্টাগণ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ধারায় সৌর বিদ্যার চর্চা সুরু হয় জ্যোতিষ্কলোকের অনুসন্ধানে।

সূর্য আমাদের পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩৩২০০০ গুণ ভারী। এই কারণেই সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টানও অনেক বেশী এবং এরই সাহায্যে সূর্য সব গ্রহকে এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। সূর্য একটা নিখুঁত জ্যোতিষ্ক এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেন বিশ্বের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তিনি প্রথম সূর্যের গায়ে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কালো দাগের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই কালো দাগগুলি সূর্যের বুকে গড়ে-ওঠা প্রকাণ্ড গ্যাস-আবর্ত এবং এগুলির উষ্ণতা সূর্যপৃষ্ঠের উষ্ণতার তুলনায় কম। তাই তুলনামূলকভাবে এগুলিকে কালো দেখায়। এরা পরিচিত সৌর কলঙ্ক নামে। সূর্যের গায়ে সৌর কলঙ্কের অবস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি অক্ষয় অবদান। সৌর কলঙ্ক চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পন্ন। এদের স্থায়িত্বকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত। দীর্ঘায়ু কলঙ্কগুলি সূর্যের একপ্রান্তে অদৃশ্য হয়ে পক্ষকাল পরে অপরপ্রান্তে দেখা দেয়। প্রথমে সূর্যপৃষ্ঠের পূর্বদিকে—তারপর পশ্চিমপ্রান্তে বিলীয়মান হয়। এই ঘটনা ধরা পড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর দূরবীণে। গ্যালিলিও এর থেকে স্থির করলেন সূর্যের আবর্তনকাল ২৬ দিন। কোপারনিকাসের স্মৃতিতর্পণ করলেন তাঁর উত্তর বিজ্ঞানী। আজকের পদার্থবিজ্ঞান যে সব বিজ্ঞানী গড়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ গিলবার্ট অন্যতম।

১৬০০ সালের কথা। কলচেষ্টারের এই বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করলেন আমাদের পৃথিবীটা মহাকাশে ঝুলন্ত একটা চুম্বক। একটা লোহার দণ্ডকে অনেকদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখলেন তিনি। ওই দণ্ডটি পেল চুম্বকত্ব। পৃথিবীর সুমেরুর দিকে ও-দণ্ডটির যে প্রান্ত সেটি উত্তর সন্ধানী মেরু, সংক্ষেপে নাম দিলেন উত্তরমেরু আর দণ্ডটির অন্যপ্রান্ত দক্ষিণমেরু। এই দর্শন উত্তর সাধকদের চিন্তাধারার কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগেই বলেছি, সৌরকলঙ্কের কথা। সূর্যের বিষুব-

রেখার ওপর দিয়ে যখন কোন বড় কলঙ্ক দেখা গেছে, তখনই চুম্বক পৃথিবীর অদৃশ্য চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘটে বেশ বিশৃঙ্খলা। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের এই বিপর্যয়কে বলে চৌম্বক ঝড়।

চৌম্বক ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মেরু-অঞ্চলে একটা ঘটনা লক্ষণীয়। নাম তার মেরুজ্যোতি। সৌর বিস্ফোরণের সময় শক্তিময় কণিকাস্রোত বেগে নির্গত হয় -- এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মন্দগতিবেগসম্পন্ন কণিকা সরাসরি এসে পৌঁছয় পৃথিবীর দিকে। এদের নাম মহাজাগতিক রশ্মি। কণিকা-স্রোতের অনেক কণিকা ভূচুম্বকক্ষেত্রে থাকায় বিকর্ষিত হয় পৃথিবীতে পৌঁছবার আগে। তবে ঝড়ের বেশ কয়েক দণ্ড পরে মন্দগতি কণিকা-দল পৃথিবীর চৌম্বক প্রভাবে মেরুপ্রদেশের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেখানকার বায়ুমণ্ডলকে উত্তেজিত করে তাদের শক্তিতে। ফলে ওই অঞ্চলের আকাশে দেখা যায় নানা রঙের খেলা। এই আলোর বন্যা নামে শীতকালে, যে ছমাস সূর্যের মুখ দেখে না মেরুর মানুষ— সেই সময়ে মেরুজ্যোতিই তাদের আলোর পিপাসা মেটায়। এই বিচিত্র আলোর নীচে এস্কিমোজাইদের বরফের বাড়ি ইগ্‌লুদেরা গ্রাম যেন শ্বেত-পাথরের তৈরী ঘুমন্ত মায়াপুরী। মেরুজ্যোতির আলোর ছোঁয়া লেগে সব যেন জেগে ওঠে : প্রথমে আকাশে দেখা দেয় একটা হলুদরঙা রামধনু তারপর একটি একটি করে লাল সবুজ বেগনি রঙের পাড় বসতে থাকে। বিচিত্র রঙের রোশনাই আকাশপথে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষণে ক্ষণে তাতে রঙ বদলায়। হঠাৎ আলোর খেলা থামে, অন্ধকারে চোখে পড়ে একটা আলোর রেখা, আবার তেমনি হঠাৎ সারা আকাশ ভরে ওঠে এক অপরূপ দীপ্তিতে।

সুমেরুতে মেরুজ্যোতি দেখতে ভোরের আলোর মত বলে বুঝি নাম তার অরোরা বোরিয়ালিস্ আর দক্ষিণে এর নাম অরোরা অস্ট্রেলিস্। মেরুজ্যোতি উভয় মেরুতেই দেখা যায়, তবে সুমেরুর কথাই আমরা বেশী জানি ; তার কারণ—ওই মেরু-অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত সহজতর, ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্যবেক্ষণ বেশী হয়েছে।

মেরুজ্যোতি সব সময় দেখা যায় কি? এই সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-কণিকাদল ভূচৌম্বক ক্ষেত্রে ধরা পড়ে। তাদের তড়িৎ-প্রকৃতির (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) উপর নির্ভর ক'রে কণিকাদল দুই মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়, মেরু-অঞ্চলের বায়ুকণাকে উত্তেজিত করে। ফলে দেখা যায় নানা বর্ণের আলোক-বিচ্ছুরণ।

আগেই বলেছি, সৌরকলঙ্কের সঙ্গে মেরু-জ্যোতির সম্বন্ধ। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বাড়লে, ঘন ঘন মেরুজ্যোতি দেখা যায়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বল বিষুব অঞ্চলের দিকে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ। কাজেই উত্তেজিত কণিকা-স্রোত বিষুবসীমায় আসতে পারে না। তাই এই মেরুজ্যোতি দেখবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর নাইট্রোজেনের আয়নিত পরমাণু, ক্যালসিয়াম সোডিয়াম ইত্যাদির বিশিষ্ট উজ্জ্বল রেখাও পরে মেরুজ্যোতির বর্ণালীতে দেখতে পাওয়া গেছে। ভূ-চুম্বকীয় অবস্থা এই জ্যোতির আবির্ভাব ও ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

১৮৮৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মেরু-অভিযান থেকে এই আলোর তথ্য জানা গেল। মেরু অঞ্চলের প্রায় ৫০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার ব্যাপ্ত আকাশে জলে এই

আলো। মেরু থেকে সরে ভূ-চুম্বক কেন্দ্রগুলির চারধারে ১০০০ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত বৃত্তপথের মধ্যে এই মেরুজ্যোতি দেখা যায়।

সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে মেরু-জ্যোতির যোগাযোগ—তাই ১৯৫৭-৫৮ সালে যখন সৌরকলঙ্কের বিশেষভাবে প্রাদুর্ভাব ঘটল—তারপরেই লক্ষ্য করা গেল, মেরু অঞ্চলের অরোরার আলোর সমারোহ। প্রায় প্রতি এগার বছর পর পর এই আলোর দ্যুতি দেখা যায়। তাই পৃথিবীর বুকে এই বিচিত্র আলোর আবির্ভাব হয় ১৯৬৮-৬৯ সালে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সময় সূর্যের বুক থেকে ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসা অসংখ্য বাষ্পকণাগুলিতে রয়েছে পরমাণুপুঞ্জ। পরমাণুর ভাঙনে বেরোয় প্রোটন ও ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন হ'ল ঋণাত্মক তড়িৎ আহিত কণা, আর প্রোটন হ'ল ধনাত্মক। সূর্যরশ্মির উত্তাপে ঘটে পরমাণুর ভাঙন আর সেকেণ্ডে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার বেগে ইলেকট্রন-স্রোত বয়ে আসে পৃথিবীর আকাশ-সীমায়। আকাশের বায়ুস্তরে কণাগুলির সংঘর্ষে হাল্কা বায়ুর পরমাণু হয়ে ওঠে তড়িৎ আহিত উত্তেজিত। তখন আসে অরোরা। নিওন বাতির আলো, যা দিয়ে রঙিন আলোর বিজ্ঞাপন লেখা হয়, তা হল অনেকটা এই রকম ক্রিয়ার ফলে।

মেরুজ্যোতি নাম তার। তবে এ আলোর সমারোহ দেখা যায় মেরু-অঞ্চল থেকে দূরেও—নরওয়ে, সুইডেন, স্কটল্যাণ্ড এমনকি এডেন বোম্বাই থেকে মাঝে মাঝে এই আলোর নাচন দেখা গেছে কৃষ্ণা তিথির রাতের আকাশে। একবার সিঙ্গাপুরেও নাকি দেখা গিয়েছিল এই জ্যোতি। এর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই আলোর খেলা আনন্দের থেকে ভয়েরই সঞ্চার করে আলেয়ার মত। তবে স্কটল্যাণ্ড থেকে বছরে পঁচিশ ত্রিশ বার যে দ্যুতি দেখা যায় সে দ্যুতি কোন গ্রহ-তারকার নয়—নাম তার বায়ুপ্রভা। পৃথিবীর চুম্বক ধর্ম এর একটা বিশেষ কারণ। স্থান-কাল আর সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে এর নিবিড় যোগাযোগ। আলোক-মানযন্ত্র সাহায্যে এই প্রভার পরীক্ষা সম্ভব।

সৌর কলঙ্কের চুম্বক ধর্মের সঙ্গে পৃথিবীর আরো অনেক ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, বেতারবার্তা শোনবার কালে অনেক সময় বেতারযন্ত্রটি নিঃশব্দ হয়ে যায়। সমুদ্রপথে নাবিকরা সচরাচর লক্ষ্য করেন, সময় সময় কম্পাসের কাঁটা যথা বিচলিত হয়। পৃথিবীর চুম্বক-ধর্মের সহসা পরিবর্তনে এইসব ঘটনা ঘটে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে সৌরদেহের প্রায় সব কথাই এক একটি সমস্যা। প্রকৃতির এই বিরাট কর্মশালার কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে তাঁরা ভেতরের বিপুল প্রাণ-স্পন্দনের সামান্য আভাস সময় সময় পান। এই কর্মশালার গোপন রহস্য একদিন প্রকৃতি-প্রেমিকদের কাছে উদ্ঘাটিত হবে, এই তাঁদের আশা।

মহামায়ার অষ্টশক্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভূমিকা

মহর্ষি মেধা মহামায়া-তত্ত্বের বিশিষ্ট প্রবক্তা। তাঁর মতে—মহামায়া নিত্যা সনাতনী; সর্বক্ষণ ও সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজিতা। তিনি বিশ্বরূপা জগন্মূর্তি; এই চরাচর অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই বিভূতি ও বিচিত্র রূপ। তিনি সর্বস্বরূপা, সর্বেশা ও সর্বশক্তিসমন্বিতা।

মহামায়ার বিভূতি, ঐশ্বর্য ও শক্তির অন্ত নেই। তথাপি, তাঁর নিত্য লীলাবিলাসে, কতিপয় বিশিষ্টা মাতৃকা-শক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ কীর্তিত। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা—এঁরা তাঁর 'অষ্টশক্তি' রূপে প্রসিদ্ধা।

'ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী নারাসিংহ্যৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥'
—ডামর তন্ত্র

উল্লিখিত অষ্টমাতৃকা মহামায়ার অভিন্না ও অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে চিহ্নিতা ও পরিপূজিতা। অগ্নি প্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁর মধ্যে এই সকল মাতৃকা শক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রে, তাঁকে সেই সমস্ত রূপেও বহু স্তব-স্তুতি করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দুর্গোৎসবে মহামায়ার অষ্টমী-বিহিত মহাপূজায় তাঁর এই অষ্টশক্তির বিশেষ আহ্বান এবং পূজা-বন্দনাদি একান্তই বিধেয়। সন্ধিপূজাকালে মহাদেবীকে চামুণ্ডারূপে আরাধনার বিধি আছে।

সপ্তশতী চণ্ডীর উত্তর চরিত্রে এই অষ্টশক্তির আবির্ভাব-বৃত্তান্ত, রূপ-মহিমা ও লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণিত দেখা যায়। এঁরা ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয়, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ ও ইন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট দেবগণের মহাবীর্য ও মহাবল—অতিরেকিনী দেব-শক্তি। এঁরা তাঁদেরই শরীর হ'তে বিনিঃসৃতা হন এবং তাঁদেরই অনুরূপ মূর্তি, বসন-ভূষণ ও আয়ুধ-বাহনাদি গ্রহণ করেন। অতঃপর এঁরা ঐ মহাসুরগণের বধের নিমিত্ত রণাঙ্গণে চণ্ডিকা-সকাশে উপস্থিত হন।

ঐ দুর্ধর্ষ অসুর-বাহিনীর সঙ্গে এই মাতৃকাগণ প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে তাদের নিহত করেন।

ঐ যুদ্ধের পূর্বে মহামায়া চণ্ডিকা দেবী দৈত্যপতি শুম্ভকে জানিয়েছিলেন—যিনি তাঁকে সংগ্রামে জয় ক'রবেন, যিনি তাঁর দর্প চূর্ণ ক'রবেন, অন্ততঃ যিনি তাঁর তুল্য বলশালী, তাঁকেই তিনি পতিরূপে বরণ ক'রবেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, তিনি এই মাতৃকা-শক্তিগণের সাহায্যে শুম্ভের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত, এমনকি তার প্রাণসম প্রিয় ভ্রাতা নিশুম্ভকেও বধ করেন। তখন দৈত্যপতি অত্যন্ত ক্রোধভরে তাঁকে বলে—'হে বল-গর্বে উদ্ধতা দুর্গা, তুমি অযথা গর্ব ক'রো না। তুমি বরাবরই মাতৃকাগণের সাহায্যে যুদ্ধ ক'রেছ।'

চণ্ডিকা দেবী এর উত্তরে তাঁকে বলেন—'ওরে মূর্খ, এ-জগতে আমি একাকিনী বিরাজিতা, আমি ছাড়া আমার দ্বিতীয়া আর কে আছে? ব্রহ্মাণীপ্রমুখ এই মাতৃকাগণ আমারই অভিন্না শক্তিবিভূতি। এই দেখ, এঁরা আমাতেই লয় হ'য়ে যাচ্ছেন

উক্ত মাতৃকাগণ সকলেই তখন চণ্ডিকার দেহে বিলীনা হ'য়ে যান এবং চণ্ডিকা শুম্ভাসুরকে নিজেই বধ করেন।

অষ্টশক্তি-কথা

ব্রাহ্মী: ইনি প্রজাপতি ব্রহ্মার শক্তি। ইনি 'ব্রহ্মাণী' নামেও অভিহিতা।

ইনি হস্তে রুদ্রাক্ষমালা ও পবিত্রজলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্বক মনোহর হংসযুক্ত-বিমানে আরূঢ়া হ'য়ে ঐ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ঐ রণাঙ্গনের যে-যে অংশে ইনি বিচরণ করেন, সে-সে অংশের অসুর শত্রুদের উপর নিজ কমণ্ডলু-স্থিত মন্ত্রপূত বারি কুশ দ্বারা সিঞ্চন করেন। তার ফলে. ঐ অসুরেরা নিতান্তই নির্বীর্য ও হতোদ্যম হ'য়ে পড়ে। এইভাবে ইনি অগণিত অসুর-সৈন্যকে নিধন করেন।

'হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

মাহেশ্বরী: ইনি দেবাদিদেব মহেশ্বর শিবের শক্তি। এঁর ললাটদেশে মনোহর চন্দ্রকলা পরিশোভিত, হস্তে শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল বিধৃত এবং বাহুতে অনন্ত তক্ষক নামক মহানাগ-দ্বয় বলয়রূপে বিভূষিত।

ইনি বৃষারূঢ়া হ'য়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, এবং স্বীয় ত্রিশূলদ্বারা তাদের শোচনীয়ভাবে বিমর্দিত করেন। এঁর ত্রিশূলাঘাতে রক্তবীজাসুরের সুবিশাল দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়।

'ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী।
মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

কৌমারী: ইনি কুমার অর্থাৎ দেবসেনাপতি কার্তিকের শক্তি। ইনি শ্রেষ্ঠ ময়ূরে আরূঢ়া হ'য়ে শক্তি নামক দিব্যাস্ত্র ধারণ ক'রে রণস্থলে আবির্ভূ'তা হন

ইনি ঐ শক্তি-অস্ত্র দ্বারা রক্তবীজাদি মহাসুরদের দেহে প্রচণ্ড আঘাত করেন। এঁর ঐ অস্ত্রাঘাতে অগণিত অসুর প্রাণ হারায়। রক্তবীজাসুরের রক্ত হ'তে সমুৎপন্ন দুর্ধর্ষ রক্তবীজদেরও অগণিতকে ইনি ঐ অমোঘ অস্ত্রের সাহায্যে নিধন করেন।

'ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

বৈষ্ণবী: ইনি জগৎপতি বিষ্ণুর শক্তি। ইনি ষড়্ভুজা এবং অশেষরূপশালিনী। এঁর কর-সমূহে শঙ্খ, চক্র. গদা, শার্ঙ্গ (ধনু), বাণ ও খড়্গ পরিশোভিত।

'বাহুভির্গরুড়ারূঢ়া শঙ্খ-চক্র-গদাসিনী।
শার্ঙ্গ-বাণধরায়াতা বৈষ্ণবীরূপশালিনী॥'
—বামন পুরাণ

ইনি গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন। ইনি স্বীয় চক্রের আঘাতে ও গদার প্রহারে রক্তবীজাসুরের দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও বিমর্দিত করেন। ইনি অন্যান্য আরও বহু অসুরসৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট করেন।

'শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

বারাহী: ইনি ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয়াবতার বরাহদেবের শক্তি। ইনি যজ্ঞ-বরাহের ন্যায় অনুপম শৌকর-রূপ ধারণ ক'রে ঐ যুদ্ধস্থলে আবির্ভূ'তা হন। ইনি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা ও অসিচক্রধারিণী।

ইনি স্বীয় তুণ্ডপ্রহারে দুর্ধর্ষ অসুরদের বিধ্বস্ত করেন এবং সুতীক্ষ্ণ দন্তাগ্রের আঘাতে তাদের বক্ষঃস্থল ক্ষত-বিক্ষত করেন। এঁর চক্রাঘাতে তাদের দেহ বিদীর্ণ হয় ও তাদের বিনাশ ঘটে। রক্তবীজাসুরকে ইনি খড়্গ দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করেন। এর ফলে, ঐ মহাসুরের পর্বত-প্রমাণ দেহ বিদীর্ণ ও রক্তাপ্লুত হয়।

'গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

নারসিংহী: ইনি বিষ্ণুর চতুর্থাবতার নৃসিংহদেবের শক্তি। ইনি স্বীয় ঘন কেশররাশি প্রকম্পিত ক'রে প্রচণ্ড নিনাদ ক'রতে ক'রতে ঐ রণভূমিতে উপস্থিত হন। এঁর কেশর-কম্পনে নক্ষত্রপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত হয় এবং এঁর প্রচণ্ড নিনাদে রণক্ষেত্র ও নভোমণ্ডল প্রকম্পিত হয়।

ইনি তীক্ষ্ণ নখরসমূহের আঘাতে মহাসুর-দের দেহ বিদীর্ণ করেন এবং তাদের আক্রমণ ও ভক্ষণ ক'রতে ক'রতে যুদ্ধপ্রাঙ্গণে ধাবিতা হন। এইভাবে ইনি বহু অসুর-সৈন্যকে বিনাশ করেন। এঁর ঘোর নিনাদে সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণিত ও বিত্রাসিত হয়।

'নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

ঐন্দ্রী: ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি। ইনি কিরীটধারিণী, সহস্রনয়না, বজ্রহস্তা এবং গজারূঢ়া। ইনি ঐরাবতে আরোহণ ক'রে রণক্ষেত্রে আগমন করেন।

এঁর প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে শত শত দৈত্য ও দানব বিদীর্ণ হয়। তার ফলে, তাদের দেহ হ'তে অজস্র রক্তস্রোত প্লাবিত হয় ও তারা ভূতলে নিপাতিত হয়ে প্রাণ হারায়। তখন দুর্ধর্ষ রক্তবীজাসুর এঁর সঙ্গে গদাহস্তে যুদ্ধ শুরু করে। ইনি স্বীয় বজ্রের আঘাতে তাকে বিষম আহত ও ক্ষত-বিক্ষত করেন।

'কিরীটিনী মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

চামুণ্ডা: ইনি স্বয়ং মহামায়ার অন্তরঙ্গা শক্তি ও বিভূতি। ইনি কোনও দেবতার শরীর হ'তে উৎপন্না হননি, মহামায়া চণ্ডিকা দেবীরই ভ্রূকুটী-কুটিল ললাট-ফলক হ'তে সমুদ্ভূতা হন। উল্লিখিত মাতৃকা-শক্তিগণের মধ্যে রণক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এঁরই আবির্ভাব ঘটে এবং ইনি 'কালী' নামে পরিচিতা হন।

ইনি চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, দীর্ঘদংষ্ট্রা ও আরক্তনয়না। এঁর করচতুষ্টয়ে অসি, পাশ, খট্বাঙ্গ ও ঢাল পরিশোভিত। এঁর দেহ অতি দীর্ঘ, অস্থিচর্মসার ও অত্যন্ত শুষ্ক। ইনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, নৃমুণ্ডমালিনী ও অতিশয় ভয়ঙ্করী। এঁর চক্ষু কোটরগত ও উদর অত্যন্ত কৃশ। এঁর বিকট শব্দ ও অট্টাট্ট হাস্যে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত ও বিত্রাসিত।

ইনি অসুর-সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডের চতুরঙ্গ বাহিনীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করেন এবং মহা অসি দ্বারা চণ্ড ও মুণ্ডের শিরশ্ছেদ করেন। ইনি চণ্ডিকাকে চণ্ডমুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড দু'টি প্রীতিভরে উপহার দেন। এতে তিনি পরিতুষ্টা হয়ে এঁকে "চামুণ্ডা" নামে অভিহিতা করেন।

রক্তবীজাসুরের দেহ হ'তে রক্তস্রোত প্রবাহিত হ'য়ে ভূমিতে পতিত হ'লে, তা থেকে তারই তুল্য-আকার-বিশিষ্ট ও বল-বিক্রমশালী লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ উৎপন্ন হয় এবং তারা অচিরে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলে। তখন চণ্ডিকা দেবী এঁকে বলেন—'চামুণ্ডে, তুমি শীঘ্র তোমার বিশাল বদন বিস্তার ক'রে রক্তবীজা-সুরের সমস্ত রক্ত পান কর এবং রক্ত-সঞ্জাত যাবতীয় রক্তবীজকে সত্বর ভক্ষণ কর।'

চণ্ডিকার কথামতো ইনি রক্তবীজাসুরের সমস্ত রক্ত পান করেন, এক বিন্দুও ভূতলে পড়তে দেন না। তার ফলে, সেই দুর্ধর্ষ মহাসুর রক্তশূন্য হ'য়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইনি তার রক্তজাত সেই লক্ষ লক্ষ মহাসুরকেও অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করেন।

'দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

উপসংহার

চামুণ্ডা ভিন্ন অন্যান্য মাতৃকা-শক্তিগণ ব্রহ্মাদি দেবগণের শরীর হ'তে আবির্ভূ'তা হ'লেও তাঁরা মহামায়া, কারণ মহামায়ার দেহে ব্রহ্মাদি দেবগণ অভিন্নরূপে বিরাজমান। বস্তুতঃ ঐ দেবগণেরই মহাতেজোরাশি হ'তে তিনি সমুৎপন্না এবং তাঁদেরই তেজে তাঁর দেহের বিভিন্ন অবয়ব গঠিত। তাঁরা তাঁকে নিজ নিজ শক্তি, ভূষণ, এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদিও সমর্পণ করেন। এজন্য তিনি সর্বদেবময়ীরূপে বন্দিতা।

"সর্বদেবময়ীদেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥"

মনের দেবতা

শ্রীমতী শেফালি ভট্টাচার্য

তোমার চরম আঘাতে যে প্রভু
তোমাকেই শুধু জেনেছি।
সুখ, দুখ সব ভুলে গিয়ে তাই
তোমাকেই বুঝি চেয়েছি।
আমার মনের সরল-গরল ভাবনা জড়ায়ে প্রভু
বুকের মাঝারে তোমারে বসায়ে
তোমার সাথেই খেলেছি।
ছল করি কভু সরিয়া দাঁড়ালে
কত যে তোমায় খুঁজেছি!
মনের মতন ভাঙিয়া তোমারে গড়েছি আপন মনে,
আড়াল করিয়া রাখিতে যে চাই—নিভৃত, নির্জনে।
তোমার ভাবেই রাঙায়ে আমারে
তোমারে পূজিতে চেয়েছি,
তোমারই বুকের ভাষা কেড়ে নিয়ে—
পূজার মন্ত্র পেয়েছি।
আমি, তোমারেই শুধু চেয়েছি॥

সমালোচনা

শ্রীশ্রীগুরুগীতা (বঙ্গানুবাদসহ)। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—স্বামী রঘুবরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী-১। সাইজ ১/৮ ডিমাই। পৃষ্ঠা ৬৮+১২। মূল্য—সশ্রদ্ধ পাঠ। (প্রকাশকের নিকট ডাকব্যয় ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে পাঠানো হয়।)

এই পুস্তিকায় গুরুগীতার মূল ১১৩টি শ্লোকের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদের সহিত কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত গুরুস্তোত্র, কঙ্কালমালিনীতন্ত্রোক্ত গুরুকবচ এবং শ্রীগুরুগীতার মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত আছে। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ-লিখিত এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গুরু'শীর্ষক প্রবন্ধটি এবং শ্রীগুরুতত্ত্বসম্পর্কিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ২৯টি উক্তি এই গ্রন্থের মূল্য এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

গুরুকরণ এবং গুরূপদিষ্ট মার্গে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভের আধ্যাত্মিক রহস্যটি ভারতীয় সকল সাধন-পদ্ধতিতেই স্বীকৃত। এমনকি গুরুকেই ইষ্টজ্ঞানে ধ্যান এবং পূজা করিলেও সিদ্ধিলাভ হয়—এইরূপ নির্দেশ বহু লৌকিক সাধনমার্গেও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীগুরুগীতায় গুরুকে 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর' ও 'পরমব্রহ্ম' প্রভৃতি রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার মানবরূপী গুরুর সেবাদি কর্মের দ্বারাও ইষ্টলাভ হয়, ইহাও বলা হইয়াছে।

সমগ্র গুরুগীতাখানিই এইরূপ অমৃতময় শ্লোকের ভাণ্ডার। এইরূপ একখানা সাধারণের দুষ্প্রাপ্য অথচ অমূল্য গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া স্বামী রঘুবরানন্দ সাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন

Thus Spake Sri Rama—Compiled by Swami Suddhasattwananda, Published by the President, Sri Ramakrishna Math, 11 Ramakrishna Math Road, Madras 4. pp 76+xviii, Price: 50 Paise.

'Thus Spake' পর্যায়ের নবতম অর্ঘ্য Thus Spake Sri Rama'. ভারতের প্রাণ-পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান বাণীগুলি চয়ন করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে এই পুস্তকে। বাণীগুলি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সজ্জিত: পরমাত্মা, আত্মা, ভক্তি, মায়া, মন ও শরীর, যৌবন, জীবন ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, জগৎ ও ঐশ্বর্য, কাল, লক্ষ্মণের প্রতি উপদেশ, বিবিধ। বাণী-সঙ্কলনে নিপুণতা পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গ্রন্থের প্রথমে প্রদত্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বহুমুখী বিরাট জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটিও কৃতিত্বের দাবি রাখে নিত্যসঙ্গী করিবার উপযোগী পকেট-সাইজ এই ক্ষুদ্র ইংরেজী পুস্তকখানি ভক্তসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

অর্ঘ্য (১ম ও ২য় খণ্ড) -শ্রীঅজয়কুমার গোস্বামী। প্রকাশিকা—শ্রীমতী রমা গোস্বামী, ৯।১।এ, সদানন্দ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা ১৫০; মূল্য ১·৫০ টাকা।

'অর্ঘ্য'—গীতিকাব্য। মাতৃভক্ত কবির শ্যামামায়ের উদ্দেশ্যে সজ্জিত ১৩১টি গীতি-পুষ্পের অর্ঘ্য। গানগুলিতে যে-ভাব অভিব্যক্ত, তাহা মাতৃমাহাত্ম্য-উপলব্ধির সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। মনে হয়, সুর-তান-লয় সহকারে গীত হইলে সঙ্গীতগুলি আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। প্রারম্ভে প্রদত্ত 'মহেশবন্দনা'টিতে দেবাদিদেব মহাদেবের সর্বাবয়ব মূর্তিকে ভাব-ভাষা ও ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিশেষ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ চক্ষুর চিকিৎসার জন্য আমেরিকার বোষ্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটিতে রহিয়াছেন; স্থানীয় হাসপাতালে গত ৯ই আগষ্ট তাঁহার বামচক্ষুর অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, ১৫ই আগষ্ট হাসপাতাল হইতে আশ্রমে (বোষ্টন) ফেরেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা তাঁহার পত্র হইতে জানা যায়, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অনেকখানি ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তিনি বড় হরফের লেখা পড়িতে পারিতেছেন, ছোট হরফের অক্ষর অবশ্য এখনো স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। ১২ই সেপ্টেম্বর পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিয়াছেন যে, চোখে জল আসার জন্য এরূপ হইতেছে, উহা বাহির করিয়া দিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে; ইহার জন্য ১৭ই সেপ্টেম্বর পুনরায় হাসপাতালে ভরতি হওয়া স্থির হইয়াছে। হাসপাতালে সপ্তাহখানেক থাকিতে হইবে।

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া)—এই শিক্ষায়তনের ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষায়তনগুলির অন্যতম সারদাপীঠ।

সারদাপীঠের আটটি বিভাগ :

(১) বিদ্যামন্দির—সম্পূর্ণ আবাসিক ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজ. আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ২৭৩ ও ৩৬৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল সন্তোষজনক। অনেকগুলি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। কলেজের ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর ইউনিট অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ দ্বারা পরিচালিত। ছাত্রদের জন্য ধর্মালোচনা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যামন্দির গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ১১,০৮৯।

(২) শিক্ষণমন্দির—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ খৃঃ যথাক্রমে ১২৬ ও ১২৫ জন শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের বি.এড্. পরীক্ষায় ১২৬ জনের মধ্যে ৯ জন ফার্স্ট ক্লাস ও ১১৫ জন সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছেন। শিক্ষণমন্দিরের লাইব্রেরীটিও সুন্দর। এক্সটেনসান সার্ভিস্, সেমিনার পরিচালনা প্রভৃতি শিক্ষণমন্দিরের উল্লেখযোগ্য কার্য।

(৩) শিল্পমন্দির—গভর্নমেণ্ট-স্পন্সারড্ পলিটেকনিক। এখানে তিন বর্ষের ডিপ্লোমা কোর্সে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ৪০৫। বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। শিল্পমন্দিরের একটি ছাত্রাবাস আছে, আলোচ্য সময়ে ৫৮ জন ছাত্র ছিল। শিল্পমন্দির লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৪,৯৬০; অধিকাংশ গ্রন্থই বিজ্ঞান- ও শিল্প-বিষয়ক।

(৪) শিল্পায়তন—১৪ হইতে ১৮ বৎসরের বালকগণের জন্য গভর্ণমেণ্ট-স্পন্সারড জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, এখানে তিন বৎসরের কোর্সে সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়; ওয়ার্কশপে প্র্যাকটিক্যাল

ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ১১৯; ৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শিল্পায়তনে একটি ভাল লাইব্রেরী আছে।

(৫) শিল্পবিদ্যালয়—সারদাপীঠের সর্বাপেক্ষা পুরাতন এই প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র ও শিক্ষালাভের যোগ্য বালকদিগকে ১ হইতে ৩ বৎসরে বিনা-বেতনে ইলেকট্রিক, অটো-মেকানিকস্, টার্নিং, ফিটিং, কাঠের কাজ, তাঁত-শিল্প প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ৩০ জন ছাত্র ছিল। উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ছাত্রগণকে সারদাপীঠ হইতেই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এখানেও একটি গ্রন্থাগার আছে।

(৬) জনশিক্ষামন্দির—১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ৯টি নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৯১ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে লিখনপঠনক্ষম করা হইয়াছে। উপযুক্ত-সরঞ্জাম-সমন্বিত একটি অডিওভিস্যুয়্যাল ইউনিট পরিচালিত হইতেছে, ইহার শ্রুতি-চাক্ষুষী শিক্ষা-ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের বিশেষ সহায়ক। ৯০টি শিক্ষামূলক ফিল্ম দেখানো হয়; ৭০,৯৫০ জন যোগদান করেন। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৬,২৮৯। চারটি ইউনিটে বিভিন্ন পদ্ধতি ও স্কোয়াডে ২০,৮১৩খানি বই জনসাধারণকে পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল। দৈনিক ২০০টি গরীব ছেলে-মেয়েকে পুষ্টিকর জলখাবার সরবরাহ করা হয়। বালকবালিকাগণের স্বাস্থ্যচর্চা ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে।

জনশিক্ষামন্দিরের অন্যান্য কার্যধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—স্টাডি সারকেল পরিচালনা, খেলাধুলা ও ব্যায়ামচর্চা দেখাশোনা, বৃত্তি-মূলক শিক্ষা দান।

দৈনিক ৮,০০০ শিশু ও অপুষ্ট মাতাদের ৪৩টি দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

(৭) তত্ত্বমন্দির—এখানে ভক্ত জন-সাধারণের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় রামনামসঙ্কীর্তন হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বিশেষ বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়। তত্ত্বমন্দিরগ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত প্রধানতঃ দার্শনিক ও সংস্কৃতগ্রন্থের সংখ্যা ১,২০০।

(৮) উৎপাদন ও প্রকাশন বিভাগ—এখানে ফটোফ্রেম, লকেট প্রভৃতি তৈরি করা হয়। ফটোগ্রাফিক ডিপার্টমেন্টটি সুপরিচালিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৭০ খৃষ্টাব্দে হাওড়া ও হুগলী জেলার বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সারদাপীঠ কর্তৃক বন্যার্ত-সেবা পরিচালিত হইয়াছিল। এই সেবায় বিদ্যামন্দির ও শিক্ষণমন্দিরের কিছু ছাত্রও অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা সারদাপীঠের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। এই পূজায় দরিদ্র-নারায়ণসেবাও হইয়াছিল।

সারদাপীঠের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং শিল্পসংক্রান্ত বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মাপূজা উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

সারগাছি (পোঃ সারগাছি-আশ্রম, মুর্শিদাবাদ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী (১৯৬৮-এপ্রিল—১৯৭১-মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলা-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ কর্তৃক

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রথম শাখাকেন্দ্র।

পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী সারগাছি পল্লীতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবাকল্পে কেন্দ্র স্থাপন করেন, এবং রিলিফের কার্য সমাপ্ত হইলে কতকগুলি সম্পূর্ণ অসহায় অনাথ বালক লইয়া আশ্রম গড়িয়া তোলেন। এই আশ্রমে তাঁহার সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর (১৮৯৭-১৯৩৭) পুণ্য অবস্থান ও জাতিধর্মনির্বিশেষে দরিদ্র গ্রামবাসীদের শিবজ্ঞানে অনলস সেবা পল্লীকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে।

আশ্রমের বর্তমান কর্মধারা প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে পরিচালিত হয়: (১) ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, (২) শিক্ষা ও কৃষ্টি, (৩) চিকিৎসা ও সেবা।

নিয়মিত পূজা-উপাসনা-ভজন ও ধর্মালোচনা ব্যতীত সাময়িক উৎসবাদি, আশ্রম-প্রতিষ্ঠা-স্মৃতিদিবস, একাদশীতে রামনামসংকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী ও নারায়ণসেবা সহায়ে মনোজ্ঞভাবে উদ্‌যাপন, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি প্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। প্রতি শনিবার বহরমপুর শাখায় স্থানীয় ভক্তগণের জন্য ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্তমানে আশ্রম কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়:

(১) একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়—সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি এই তিনটি ধারায় পড়িবার ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞানভবন, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপযুক্ত। ১৯৭১-মার্চে ছাত্রসংখ্যা ৪২০। কতকগুলি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে বৃত্তি দেওয়া হয়। নূতন বৎসরের প্রথমে গরীব ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষার ফল ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ৮৫% ও ৮৩%। হাইস্কুলে ১০০ ক্যাডেট-বিশিষ্ট এন. সি. সি. ইউনিট আছে। বিদ্যালয়ের ফুটবল খেলোয়াররা জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও যোগদান করে।

(২) জুনিয়র বেসিক স্কুল (৬টি ইউনিট)—৬ হইতে ১১ বৎসরের বালক-বালিকারা এখানে পড়ে। মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫০৮। রাজ্য সরকারের 'মিড-ডে মিল স্কীম'-এ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে টিফিন দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাদের দুপুরের খাওয়া হয়। সুতা কাটা, মাটির জিনিস তৈরি, ছবি আঁকা, সেলাই-এর কাজ, বোনা, বাগানের কাজ প্রভৃতি শিখানো হয় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রতি বর্ষে বেসিক স্কুলের পরীক্ষাফল সন্তোষজনক, ১৯৭০-৭১তে ৯৮% উত্তীর্ণ।

(৩) জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল—সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যালয়, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর ১০০ জন শিক্ষক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। আশ্রম-পরিচালিত জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে এখানকার শিক্ষক-ছাত্রগণ প্রচুর পরিমাণে হাতে-কলমে শিক্ষা ও উপযুক্ত ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ পান। ট্রেনিং স্কুলের উদ্যোগে বুনিয়াদি শিক্ষা-সপ্তাহ সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

(৪) স্কুল কাম-কম্যুনিটি সেণ্টার—যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ইহা কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালিত হইতেছে এই বিভাগটি। স্বাস্থ্যরক্ষা, জীবন-

যাপনের মান উন্নয়ন এবং বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা-দূরীকরণ প্রভৃতি প্রচেষ্টা এই কেন্দ্রের।

বিদ্যালয়গুলিতে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ, নেতাজী জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ গ্রন্থাগারে ১২ হাজারের উপর গ্রন্থ আছে। চারটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী পরিচালিত হয়, ইহাদের মধ্যে একটি রাজ্য সরকারের রুর‍্যাল লাইব্রেরী স্কীমের। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ৪৮।

ছাত্রাবাসে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা থাকে; ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ৪৬ জন বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসে ছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,৬৪৫ (নূতন রোগীর সংখ্যা ৬,১৩৮)। এই আউটডোর অ্যালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীটি একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই আশ্রম অতি নিষ্ঠার সহিত বৃন্দাবন মহাতীর্থে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত রহিয়াছে। সেবাশ্রমের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে এখানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, এক্স-রে, রেডিওলজি, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি চিকিৎসা বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্তৃক অসংখ্য রোগী চিকিৎসিত হইয়া থাকেন।

ইনডোর হাসপাতাল: অন্তর্বিভাগে ১০০টি শয্যা আছে। আলোচ্য বর্ষে ৩,৩৪১ জন রোগী ভরতি হইয়াছিল। চক্ষু-অস্ত্রোপচার সহ মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,৫৮৩।

ইনডোরের চক্ষুবিভাগটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই বিভাগটিতে সহস্র সহস্র চক্ষুরোগী সুচিকিৎসা লাভ করিতেছেন।

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের চক্ষুচিকিৎসা লাভের সুবিধার জন্য বৃন্দাবন হইতে ২৫ মাইল দূরে কোশী নামক ছোট শহরটিতে একটি পাক্ষিক বহির্বিভাগীয় ক্লিনিক করা হইয়াছে, এখানে গড়ে ১০০ জন চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসিত হইতেছেন। ১৯৭২-র মার্চে একটি আই-ক্যাম্প করা হইয়াছিল। সেই ক্যাম্পে ৪২ জন চক্ষুরোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়।

আউটডোর ডিস্পেন্সারী: সেবাশ্রমের এই বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১ ৯৮,৪৫০ (নূতন ৩৭,৮১১)। এখানে চক্ষু-অস্ত্রোপচার-সহ মোট অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল ১,৪১৯টি। দৈনিক গড়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৪২।

আলোচ্যবর্ষে এক্স-রে বিভাগে ৩,৮৮২টি এক্স-রে ফটো তোলা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১৬,০৬৯টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯২০।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৪২৯ ও ১৭,০৫০।

রোগীদের জন্য সেবাশ্রম কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী আছে এবং পত্র-পত্রিকাও লওয়া হয়। সেবাশ্রমের স্বতন্ত্র মেডিক্যাল লাইব্রেরীও আছে। রোগীদের আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডগুলিতে রেডিও শোনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অডিও-ভিস্যুয়াল প্রোগ্রামগুলি রোগীদিগকে বিশেষ-

ভাবে শোনানো হইয়া থাকে।

রিলিফ ইত্যাদি : সেবাশ্রম কর্তৃক ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে আর্তসেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যে ২,৩১৪'৩৭ টাকা ব্যয় করা হয়।

লখ্‌নৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৬—মার্চ ১৯৭১) প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামীজীর সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন উদ্যমশীল যুবকের প্রচেষ্টায় লখ্‌নৌ-এ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে এবং পরে আমিনাবাদে নিজস্ব ভবনে সেবাশ্রমের কাজ চলিতে থাকে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সেবাশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। আমিনাবাদে সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্তনারায়ণের সেবারত থাকার পর আশ্রম ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরিত হইয়াছে সেবাশ্রমের নূতন ঠিকানা : বিবেকানন্দ পুরী, লখ্‌নৌ-৭। এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে বিরাট ভূখণ্ডের উপর বিবেকানন্দ পলিক্লিনিক—আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবিধ আয়োজন-সমন্বিত সুবৃহৎ মেডিক্যাল সেণ্টার। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুআরি মাসে নবনির্মিত বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয়। সেবাশ্রমের গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার ইতিহাস।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩,৩১,২০৩; এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হইয়া ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৮,৩৪,৬৯৫ অর্থাৎ ১৫২% বৃদ্ধি। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের প্যাথলজি পরীক্ষা ৩৬,৪৯৫, এক্স-রে ৮,৪১৭ এবং সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা ২৮,৬৫৩টি। পলিক্লিনিক চালু হইবার পর সব বিভাগেই রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

সেবাশ্রম-গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ছিল ৪,৮৫১; এই সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৭০-৭১-তে হইয়াছে ৮,৬১৯। ৯টি দৈনিক ও ৫৯টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয় পাঠাগারে। গড়ে দৈনিক পাঠকসংখ্যা ২৫০।

দৈনন্দিন পূজাভজনাদি, রবিবারে গীতা-আলোচনা, একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন, সাময়িক ধর্মালোচনা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মোৎসবের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি আশ্রমের কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত।

মাদ্রাজ : ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের (মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪) ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি ইহার স্থাপনাকাল ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই অকুণ্ঠভাবে আর্তনারায়ণের সেবারত।

১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে ডিস্পেন্সারীতে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৫৬,৫০৪। অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ১,৫৬,১৭৩ ও ৩৩১।

এখানকার চক্ষুবিভাগ স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের নিকট আশীর্বাদস্বরূপ। চক্ষু-বিভাগে পনের হাজারের বেশী রোগী চিকিৎসিত হন।

কর্ণ-নাসিকা-গলরোগের বিভাগে দশ-সহস্রাধিক রোগী চিকিৎসা লাভ করেন। দন্তবিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৭,৪৮৬। এক্স-রে বিভাগে ৩৭৭টি এক্স-রে ফটো তোলা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ৫৯১টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা হয়।

শিশুবিভাগের কার্যও প্রশংসনীয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিভিন্ন বিভাগ অভিজ্ঞ চিকিৎ-

সকগণের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

নিউদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত আলোচ্য বর্ষের কর্মধারা :

মন্দিরে দৈনন্দিন পূজা প্রার্থনাদি, একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন, রবিবাসরীয় ধর্মসভা, সাপ্তাহিক রামচরিতমানসের হিন্দী ব্যাখ্যান, মহাপুরুষগণের জন্মতিথি-উদ্‌যাপন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচার, বার্ষিক জন্মোৎসব, বেদান্ত-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর ১১০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি-ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১,০৬০জনের মধ্যে কৃতকার্য প্রতিযোগীদের ১০০টি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

শিশুবিভাগের পুস্তকসমেত গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২৫,৩৩৬, আলোচ্য বর্ষে ১,৭৯৩ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হয়। পঠিত পুস্তকসংখ্যা ১৭,৯৫৪ ; পাঠাগারে ১৬টি সংবাদপত্র ও ১২০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ৩১০।

গ্রন্থাগারের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রবিভাগের পুস্তকসংখ্যা ৩,৫০৮, গড়ে দৈনিক ১২০ জন বিদ্যার্থী এখানে পড়াশুনা করেন।

আর্যসমাজ রোডে অবস্থিত যক্ষ্মা-ক্লিনিকে আলোচ্য বর্ষে আউটডোরে চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,৪৯৩ (১,১৪,২৫৭ পুনরাবৃত্ত), তন্মধ্যে নূতন রোগী ১,৬৭২। ইনডোরে পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে ২২৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

আউটডোর হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীতে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৭৭,১৪৯ (নূতন ৬,৯৬২)।

সারদা মহিলা সমিতির উদ্যোগে ও সক্রিয় সহযোগিতায় 'সারদা মন্দিরে' আলোচ্য বর্ষে প্রতি রবিবারে গড়ে ৪০ জন বালক-বালিকাকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সমিতিতে ভক্তিসূত্র ও গীতা-উপনিষদাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (মধ্য মার্গ, সেকটর ১৫ বি, চণ্ডীগড়-১১ কার্যবিবরণী (এপ্রিল ১৯৭১- মার্চ ১৯৭২) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হয় নিজস্ব ভবনে। চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও পঞ্জাবের বিস্তৃত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের ইহাই একমাত্র শাখা। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই আশ্রমটি নানাভাবে চণ্ডীগড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জাতিধর্মনির্বিশেষে জনগণের সেবায় নিরত রহিয়াছে।

নিয়মিত পূজা-উপাসনাদি, পাক্ষিক রামনাম-সঙ্কীর্তন, মহাপুরুষগণের জন্মতিথি উদযাপন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজীর বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি আশ্রমের কার্যধারার অঙ্গীভূত। এই সকল কার্য আলোচ্য বর্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশিষ্ট গায়ক কর্তৃক 'তুলসী রামায়ণ' পরিবেশিত হয়। আশ্রমসম্পাদক দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারা প্রচার করিয়াছেন। আশ্রম-গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১,৫৭২। দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪,৮০২, (নূতন রোগী—২,৫২৭)। বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসটি কলেজের ছাত্রদের জন্য ; ১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে ৪১ জন বিদ্যার্থী এখানে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। ছাত্রগণের শরীর-মনের সুষম উন্নতিবিধানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

বিবিধ সংবাদ

ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জ্বালানি—প্রতি-বস্তু

সাধারণতঃ আমরা শক্তি আহরণ করি কাঠ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি পুড়াইয়া। এভাবে পাওয়া শক্তিকে হয় সোজাসুজিভাবে আর না হয় বিদ্যুৎ, গতি প্রভৃতি শক্তিতে রূপায়িত করিয়া আমরা কাজে লাগাই। পুড়াইবার সময় কাঠ, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানি বস্তুর যে পরিবর্তন হয়, তাহা রাসায়নিক পরিবর্তন। ইহাতে, বস্তুগুলি যে সব পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, সে পরমাণুগুলির কোন পরিবর্তন ঘটে না।

বর্তমান যুগে শুধু বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়াই নয়, পারমাণবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াও—পরমাণুকে ভাঙিয়া দিয়া বা দুটি পরমাণু জুড়িয়া নূতন পরমাণু গড়িয়াও—শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। অ্যাটম বোমা ফাটিবার সময় বা পারমাণবিক চুল্লীতে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খুব ভারী বস্তুর পরমাণু ভাঙিয়া পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন বোমা ফাটিলে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাহা দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়িয়া একটি হিলিয়াম-পরমাণু গড়িবার ফলে উৎপন্ন (সূর্য যে বিপুল শক্তি বিকিরণ করে, তাহা উৎপন্ন হয় এইভাবেই)। এসব রাসায়নিক পরিবর্তন না হইলেও শক্তি-উৎপাদন-ক্রিয়া বলিয়া ইহাতে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম, হাইড্রোজেন প্রভৃতিকেও জ্বালানি বলা হয়।

জ্বালানির এই বিশেষ অর্থেই এখানে প্রতি-বস্তুকে (অ্যানটি-ম্যাটার) জ্বালানি বলা হইতেছে—শক্তি-উৎপাদনের কাজে ভবিষ্যতে ইহা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করিতেছেন।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্তি-উৎপাদনের কাজে যতখানি জ্বালানি ব্যবহার করিয়া যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, পারমাণবিক পরিবর্তন ঘটাইয়া তাহার তুলনায় অবিশ্বাস্য রকমের কম জ্বালানিতে সমপরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। প্রতিবস্তুকে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হইলে একই পরিমাণ শক্তি-উৎপাদনের জন্য জ্বালানি লাগিবে আরো অনেক কম। কত কম, তাহার মোটামুটি একটা ধারণা আমরা করিতে পরি: একশো কোটি কিলো কয়লা পোড়াইলে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, ততখানি শক্তিই উৎপন্ন হইবে মাত্র আধ গ্রাম বস্তু ও আধ গ্রাম প্রতি-বস্তুর মিলন ঘটাইতে পারিলেই। তাই, ইহা সম্ভব হইলে, পৃথিবীতে জ্বালানির অভাব বলিয়া আর কিছু থাকিবে না।

আমরা জানি, হাইড্রোজেন, কার্বন, লোহা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলিকে এবং ইহাদের দুই বা ততোধিকের মিশ্রণোদ্ভূত জল, কার্বণ-ডাই-অক্সাইড, কাঠ, মাটি প্রভৃতি যৌগিক পদার্থগুলিকে চূর্ণ করিলে সবই কতকগুলি (বর্তমানে ১০৫ টি) বিভিন্নগুণবিশিষ্ট পরমাণুতে রূপায়িত হয়। এই পরমাণুগুলির কেন্দ্রে এক বা একাধিক প্রোটন বা প্রোটন ও নিউট্রণকণা দানা বাঁধিয়া থাকে, এবং তাহার চারিদিকে অনেকখানি দূরত্ব রাখিয়া কেন্দ্রস্থ প্রোটনকণার সমসংখ্যক ইলেকট্রণকণা প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে থাকে।

যে শক্তি কেন্দ্রস্থ কণাগুলিকে দানা পাকাইয়া রাখে, তাহা অতি প্রচণ্ড। সে

তুলনায়, যে শক্তি ইলেকট্রণগুলিকে পরমাণুর কেন্দ্রের চারিদিকের ঘোরার পথে ধরিয়া রাখে, তাহার পরিমাণ খুবই কম। পারমাণবিক পরিবর্তন হইল পরমাণুর কেন্দ্রে পরিবর্তন ঘটানো—পরমাণুর কেন্দ্রস্থ দানাবাঁধা প্রোটন-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করা বা উহাতে নূতন প্রোটন যোগ করা ; সে জন্য ইহার ফলে বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণও হয় প্রচণ্ড। এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রস্থ বস্তুর কিছুটা অংশই শক্তিতে রূপায়িত হইয়া যায়। রাসায়নিক পরিবর্তন হইল পরমাণুর বাহিরে, ইলেকট্রণকণার কক্ষপথে পরিবর্তন ঘটানো—দুই বা ততোধিক পরমাণুকে তাহাদের ইলেকট্রণের কক্ষপথের সীমায় জুড়িয়া দেওয়া বা সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন করা—পরমাণুর কেন্দ্রকে তাহা স্পর্শ করে না। সেজন্য, সমপরিমাণ বস্তু উভয়ক্ষেত্রে জ্বালানি-রূপে ব্যবহৃত হইলেও পারমাণবিক পরিবর্তনের তুলনায় রাসায়ণিক পরিবর্তনে শক্তি উৎপন্ন হয় অনেক কম।

প্রতিবস্তুকে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করিয়া শক্তি-উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি একটু অন্য ধরণের। ইহা রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার মতো পরমাণুর বাহিরটিকে একটু নাড়া-চাড়া দেওয়া কিম্বা পারমাণবিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মতো পরমাণুর কেন্দ্রকে ভাঙা-জোড়া মাত্র, কেন্দ্রস্থ বস্তুকণার অংশমাত্রের বিলুপ্তিসাধন মাত্র নয়, সেগুলির বস্তু-রূপেরই পূর্ণ বিলুপ্তিসাধন। একটি প্রতিবস্তু সমজাতীয় বস্তুর সহিত মিলিত হওয়া মাত্র উভয়েরই 'বস্তু'-ত্ব লোপ পাইবে, উভয়েই সামগ্রিকভাবে শক্তিতে রূপায়িত হইবে। কাজেই ইহা হইতে উৎপন্ন শক্তি পারমাণবিক পরিবর্তন উদ্ভূত শক্তি অপেক্ষাও বহুগুণ অধিক।

প্রতিবস্তু বলিতে সহজ কথায় বলা চলে বস্তুর বিপরীত ধর্মী বস্তু। বস্তু বলিতে আমরা তো দেখিলাম, প্রধানতঃ ইলেকট্রণ আর প্রোটন কণাই বোঝায়, যেগুলি বিভিন্ন সংখ্যায় ও বিভিন্ন বিন্যাসে সাজিয়া আমাদের পরিচিত যাবতীয় বস্তুর রূপ ধারণ করে। (ইহা ছাড়া আরো অনেক প্রকার কণা পরমাণুর কেন্দ্রে আছে। কিন্তু বিভিন্ন গুণ-ও ভরবিশিষ্ট বস্তুর পরমাণুগঠনে প্রধান অংশ ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্রণের ; নিউট্রণ একটি ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটনের সংযুক্ত রূপ ; তাই এ প্রসঙ্গে কেবল ইলেকট্রণ ও প্রোটনকেই ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা ধরা চলে।)

এই বস্তুকণা ইলেকট্রণ ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-ধর্মী, এবং প্রোটন ধনাত্মক-বিদ্যুৎ-ধর্মী। বস্তুকণার এই ধর্ম বিপরীত হইলেই—ইলেকট্রণ ধনাত্মক-এবং প্রোটন ঋণাত্মক-বিদ্যুৎ-ধর্মী হইলেই উহারা প্রতিবস্তু হইল ; কাজেই এই প্রতি-ইলেকট্রণ বা পজিট্রণ, এবং প্রতি-প্রোটন দিয়া গঠিত পরমাণুও হইবে প্রতি-পরমাণু, এবং তাহা দিয়া গড়া প্রতি-অণু, প্রতি- হাইড্রোজেন, প্রতি-ডিউটেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন), প্রতি-হিলিয়াম, প্রতি-অক্সিজেন, প্রতি-জল প্রভৃতি সবই প্রতিবস্তু।

প্রতিবস্তুর অস্তিত্ব প্রথম জানা যায় ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ; আমেরিকার অ্যাটমিক এনারজি কমিশনের পরীক্ষাগারে প্রতি-প্রোটনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। পরে প্রতি-ইলেকট্রণ বা পজিট্রণ এবং আরো কয়েকটি প্রতিবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে ; অবশ্য এ সবই পরমাণু-চূর্ণ কণারই প্রতিবস্তু। সম্প্রতি, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রতি-পরমাণুই—প্রতি-হিলিয়াম ও প্রতি-ডিউটেরিয়াম (প্রতি-ভারী-হাইড্রোজেন) আবিষ্কার করিয়াছেন।

অনুষ্ঠান-সূচী

[বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ; পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৯]

তিথিকৃত্য

শ্রীযীশুখৃষ্ট	—	৯ই পৌষ	রবিবার	২৪শে ডিসেম্বর
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১১ই পৌষ	মঙ্গলবার	২৬শে ডিসেম্বর
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৬ই পৌষ	রবিবার	৩১শে ডিসেম্বর
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৬শে পৌষ	বুধবার	১০ই জানুয়ারী
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৩রা মাঘ	বুধবার	১৭ই জানুয়ারী
	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১১ই মাঘ	বৃহস্পতিবার	২৫শে জানুয়ারী
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২২শে মাঘ	সোমবার	৫ই ফেব্রুয়ারী
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৪শে মাঘ	বুধবার	৭ই ফেব্রুয়ারী
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	৫ই ফাল্গুন	শনিবার	১৭ই ফেব্রুয়ারী
শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২২শে ফাল্গুন	মঙ্গলবার	৬ই মার্চ
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২৭শে ফাল্গুন	রবিবার	১১ই মার্চ
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	৯ই চৈত্র	শুক্রবার	২৩শে মার্চ

পূজাকৃত্য

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৫শে মাঘ	বৃহস্পতিবার	৮ই ফেব্রুয়ারী
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৯শে ফাল্গুন	শনিবার	৩রা মার্চ

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ সংখ্যা উদ্বোধনে ৩৪২ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ৮ম লাইনে 'ধায়তীব' স্থলে 'ধ্যায়ন্তীব', ৩৪২।২।৯ 'উপমোপদানাং' স্থলে 'উপমোপাদানাৎ', ৩৭০।১।১ 'যায়েত' স্থলে 'জায়েত', ৩৭৪।১।১৯ 'পথে' স্থলে 'পথে চলে', এবং ভাদ্র সংখ্যায় ৪০২ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ২৩ লাইনে '৩।৩।৪৪' স্থলে '৩।৩।৪৩', ৪১১।২।৩২ '১৪৬' স্থলে '১৪১' পড়িবেন। আশ্বিন সংখ্যায় ৫৪৭ পৃঃ ২য় কলমে ২৮ শ লাইনে 'অবতার' স্থলে 'মহাবিদ্যা' পড়িবেন।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫)

(পুনর্মুদ্রণ)

পূর্বানুবৃত্তি : সারদানন্দস্বামীর বক্তৃতার সারাংশ

[গত ভাদ্র সংখ্যায় শেষ লাইন : গার্গী বলিলেন,... ইনি (যাজ্ঞবল্ক্য) ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, অতএব, ইঁহার জানিবার আর কিছু আবশ্যক নাই।]

এখন আমাদের বক্তব্য, বেদ কাহাকে বলে? বেদ অর্থে জ্ঞান. যে জ্ঞান লাভ হইলে, আর সমস্ত জানিতে পারা যায়; যেমন, মৃত্তিকা কি, জানিলে মৃত্তিকার বিকার, সরা, খুরি ইত্যাদি সমস্তই জানিতে পারা যায়, সেইরূপ যে বস্তুকে জানিতে পারিলে এই সৃষ্টির সমস্তই জানিতে পারা যায়, আর কিছু জানিবার বাকি থাকে না. বেদ সেই জ্ঞান। এই জ্ঞান-লাভের অধিকারী কে? বেদের অধিকারী কে? শাস্ত্রে কেবল দ্বিজমাত্রকেই অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন; গীতা ও মহাভারতে এই দ্বিজত্ব গুণ-গত এবং জাতিগত এই উভয় প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ, পিতার গুণ সহজে পুত্রে ক্রমিত হয়, এইজন্য গুণ জাতিগত হইয়া পড়ে. কিন্তু আরও প্রাচীনকালে ইহা কেবল গুণগত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সত্যকাম জাবালির উপাখ্যান ইহার প্রমাণ। সত্যকাম বেদপাঠের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, তাঁহার গুরু তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন, সত্যকাম পিতার নাম বলিতে পারিলেন না। তিনি মাতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, মাতা বলিলেন, তিনি অনেকবার অনেকের দাসী ছিলেন, তিনি কাহার ঔরসজাত. তাহা জানেন না। সত্যকাম গুরুকে আসিয়া তাহাই বলিলেন। গুরু বলিলেন, তোমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখিতেছি. তোমাকে আমি বেদপাঠ করাইব। ইহা বলিয়া তাঁহার উপবীত প্রদান করিয়া বেদাভ্যাস করাইলেন। এই সত্যকাম পরে একজন প্রবীণ আচার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। গুণ থাক, আর নাই থাক, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইবে, কিন্তু বৈদিক সময়ে গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বের নির্দ্দেশ হইত। এই শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আমরা বেদের অধিকারী ব্রাহ্মণত্ব-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থির করিব। যাঁহাতে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, তিনিই বেদপাঠে অধিকারী। আরও বেদমধ্যে দেখা যায় যে, সকলকে উপদেশ দিতে ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রমতে এই বেদ অনাদি, ইহা জ্ঞানরূপে ব্রহ্মের সহিত অনাদি-কালস্থিত, যখন এই জ্ঞান, বেদোক্ত, বিশেষতঃ উপনিষদোক্ত জ্ঞান কাহার অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার আবিষ্কারক ঋষিমাত্র বলিয়া বর্ণিত হন। সকল বেদ-মন্ত্রের ঋষি, দেবতা আছেন। যে বিষয়ের জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাহাকে দেবতা বলা হয় এবং যাহাতে ইহা আবির্ভূত হন, তাঁহাকে ঋষি বলে।

বেদ দুইভাগে বিভক্ত, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। দর্শনকার জৈমিনি, এই কর্ম্মকাণ্ড-মীমাংসায় বলিয়াছেন, 'অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ইহার পর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কাহার পর? নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি করিয়া তাহার পর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতেও পরোপকার, সত্যবাদিতা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইহাতে সত্যের জন্য সত্যকথন না হইয়া স্বর্গাদি বা অন্য কোন বাসনায় কৃত হইয়া থাকে। ইহার সকল কার্য্যই সকাম। বর্ত্তমান-শিক্ষানুযায়ী কর্ম্ম-কথাটি, যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম্ম (anything done)—এইরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। ২য়, বেদের বিভাগ, জ্ঞানকাণ্ড—পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞানের বাহিরে এক অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, জ্ঞাতের বাহিরে এক অজ্ঞাত আছে, কিন্তু ইহা আমাদের বুঝিবার বা জানিবার জো নাই। বেদান্তও বলেন, এই জ্ঞান আমাদের বাক্য-মনের অগোচর, কিন্তু ইহা অপরিজ্ঞেয়

হইলেও আমরা ইহা লাভ করিতে পারি, ইহার সহিত একীভূত হইতে পারি। ব্যাস-সূত্র, যাহাতে জ্ঞান-কাণ্ডের বা উপনিষদের শ্লোকসকলের তাৎপর্য্য সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে এবং উপনিষদের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব নাই, সমগ্র উপনিষদ একই ভাব প্রকাশ করিতেছে, ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন, জৈমিনি-দর্শনের ন্যায় 'অথাতো' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। এই 'অথ' দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক মঙ্গলবাচক শব্দ বলিয়া কিম্বা অনন্তর অর্থে। কাহার অনন্তর? কর্ম্মকাণ্ডের অনন্তর হইতে পারে না, কারণ, কর্ম্ম হইতে কখন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, কর্ম্ম কর্ম্মেরই উৎপাদক। আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ—সাধন-চতুষ্টয়ের অনন্তর ব্যাখ্যা করেন।

এই সাধন-চতুষ্টয় কি? ১ম, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক ; জ্ঞান-বিচার দ্বারা কি নিত্য, কি অনিত্য স্থির করিতে হইবে। অনেকে জ্ঞানকে অতি হেয় করিয়া থাকেন। সত্য বটে, জ্ঞান-বিচার সেই নিত্যবস্তুকে দিতে পারে না, তাহা বলিয়া ইহার যে কোন কার্য্যকারিতা নাই, তাহা বলা মহাভ্রম। এই জ্ঞান-বিচার দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জানিয়াছেন, এক অজ্ঞেয় বস্তু (Unknown) আছেন। যখন তিনি আছেন, ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ২য়,—ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—অর্থ, ইহলোকের সুখ, কি পরলোকের স্বর্গাদি-সুখ উভয়েতে বৈরাগ্য আবশ্যক। ৩য়,—শমদমাদি-ষট্‌সম্পত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয় পদার্থ। (১) শম —অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন। মনে কতরূপ কামনার উদয় হইতেছে, কতরূপ চাঞ্চল্য হইতেছে, এই সমস্ত দমন করা। ব্রহ্মচর্য্য প্রধান সাধন, যাহার ইহা নাই, তাঁহার সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়া যায়। মন অনন্ত শক্তির আধার, সংযমের দ্বারা এই শক্তি ক্রমে বিকাশিত হইতে থাকে। আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, এই শক্তি বিকাশিত করিলে আমরা সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারি। অবতারাদি ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন যে আমরাও ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে সেই পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন হইতে পারি। যদি তাহা না পারিব, তবে অবতারের আসিবার প্রয়োজন কি? অবতারাদি আমাদের কি করিতে হইবে এবং কিরূপে করিতে হইবে, ইহাই নিজ নিজ জীবনে দেখাইয়া যান। তাঁহারা এক আদর্শ দেখাইয়া যান, যাহাতে আমরা সকলে সেই আদর্শের অনুরূপ হইতে পারি। অনেকে মনে করেন, বিবাহাদি হইলে, গৃহস্থ হইলে, ইন্দ্রিয়-সংযম করা অসম্ভব। ইহা অত্যন্ত ভুল। ইচ্ছা থাকিলে গৃহস্থও ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মন মুখ এক করিলে সব হয়। মন মুখ এক কর দেখি, ইহা নিশ্চয়ই হইবে। আমার একজন বন্ধু, তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পূর্ব্বে কোনরূপ নূতন উদ্ভাবনা করিতে পারিতেন না। যাহা পড়িয়াছেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন। তিনি ৪ বৎসর স্ত্রীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সম্প্রতি একজন বিখ্যাত যন্ত্রাবিষ্কারক হইয়াছেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন যে, এখন কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে গেলে, সেই বিষয়ের একখানি ছবি যেন তাঁহার মনের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, তিনি তাহাতে সমস্তই দেখিতে পান। ব্রহ্মচর্য্য না থাকার জন্য আমাদের এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। (২) দম, বহিরিন্দ্রিয়ের দমন,

হস্তাদি ও চক্ষু প্রভৃতিকে মনের বশে আনয়ন করিতে হইবে (৩) তিতিক্ষা, অর্থ—সহ্য করা। সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, কতক পরিমাণে সহ্য করা। (৪) উপরতি অর্থাৎ রূপরসাদি-বিশিষ্ট বাহিরের বস্তু হইতে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে ভিতরে আনয়ন করা। (৫) শ্রদ্ধা অর্থ,—বেদশাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। (৬) সমাধান, ঈশ্বর-বিষয়ে মনের একাগ্রতা। ৪র্থ—মুমুক্ষুতা।—এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইলে জ্ঞান-কাণ্ডে অধিকার জন্মে। আমরা বলিয়াছি, কর্ম্ম-কাণ্ডেও পরোপকার সত্য-কথন প্রভৃতির অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, বেদের কর্ম্মকাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। ১ম, মন্ত্রভাগ—ইহাতে দেবতা সম্বন্ধে স্তবাদি পাঠ আছে এবং ২য়, ব্রাহ্মণ-ভাগে যাগযজ্ঞাদি করিবার নিয়মাদি কথিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজ-চরিত।

(স্বামী-রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত)

প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা।

অস্মদ্দেশে ভগবান্ শ্রীরামানুজ-সম্বন্ধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। তাহার কারণ, উক্ত মহাত্মার মতাবলম্বিগণ এদেশে অতি বিরল। যাঁহারা শ্রীরামানুজের পদানুবর্ত্তী তাঁহারা শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যে উহাঁদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। শ্রীরামানুজ কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কি ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে উক্ত মতের প্রচার ছিল কিনা, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথাবলম্বিগণকে শ্রীসম্প্রদায়ী বলা হয় কেন, ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য আছে কিনা, এ সমুদয় তত্ত্ব এদেশে অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর জড়-বাদ, দেহাত্মবাদ, বা নাস্তিক-বাদ ভেদ করিয়া, স্বভাবতঃ মৎস্য-মাংস-প্রিয়, জীবহিংসা-নিরত দেহের পুষ্টি ও তুষ্টি সাধনে নিরন্তর যত্নশীল, অতএব শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মেশ্বর প্রভৃতির উপাসক হইলেও, প্রকৃতপক্ষে, চার্ব্বাকমতাবলম্বিসমূহের দ্বারা সম্যক্ পরিবেষ্টিত হইলেও, যাঁহার পদানুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দ অদ্যাবধি জীবহিংসাকে মহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানেন, প্রাণ-প্রিয় প্রাণিবর্গের প্রাণ-নাশ করিয়া নিজ প্রাণের পালন ও পোষণ করাকে যাঁহার ভক্তেরা রাক্ষসী-বৃত্তি বলিয়া, তদনুষ্ঠানকারীর সংসর্গকেও সভয়ে পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মহান, সর্ব্ব-প্রাণি-হিত-চিকীর্ষু হৃদয়ের পবিত্র প্রতিবিম্ব স্বার্থপর, অন্ধতমসাচ্ছন্ন, দেহৈকপরায়ণ মানবমণ্ডলীর মধ্যে ও স্বভক্ত-বৃন্দের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া,

"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥"

এই আর্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের অদ্যাবধি জীবন্ত প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার সুগভীর ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-জাল, অপরিমিতধীশক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অকাট্য যুক্তি-পূর্ণ অদ্বৈত মতেরও ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছে, যাঁহার প্রেমপূর্ণ-হৃদয় আব্রহ্ম-স্তম্ব-

পর্য্যন্ত সকল প্রাণিবর্গেরই আশ্রয়-স্বরূপ, যাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞেরা রাঘবানুজ, ভক্তবীর লক্ষ্মণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করেন, সেই মহানুভবের জীবনলীলা, ও অনর্ঘসিদ্ধান্তমঞ্জরী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা কি অতি অদূর-দৃষ্টির কথা নহে? যদি তাহা হয়, তাহা কি হেয় ও পরিত্যাজ্য নহে?

মহানুভবগণের জীবন সর্ব্বদাই পরার্থে উৎসর্গীকৃত হয়। তাঁহারা স্বীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন না। তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই দীন, দরিদ্র, অসহায় জীবমণ্ডলীর দুঃখনাশ-চিন্তায় পরিপূর্ণ। এইজন্যই ইহাঁদের জীবনেতিহাসের সম্যক্ আলোচনা নিরতিশয় লাভ-জনক। সমগ্র জীবমণ্ডলীর শুভ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, তাঁহারা শুভপ্রাপ্তির যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা জানা থাকিলে, ও তদনুবর্ত্তী হইলে, ইহ জগতে পরম সুখে জীবনযাপন করিতে পারা যায়, এবং পর জগতের পথও নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হইয়া গিয়া পরিশেষে অতুল স্বর্গসুখ বা মোক্ষসুখ প্রসব করে। সুতরাং এই ঐহিক ও পারলৌকিক শুভপ্রদ মহানুভবগণের চরিতামৃত পান করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই যে নিরতিশয় কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। মহামহিম, বিশাল-হৃদয় রামানুজ মহানুভবগণের মধ্যে একজন অগ্রণী। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ সত্ত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রজঃ ও তমঃ-প্রধান মার্গ-সমূহের ন্যায় অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী নয় বলিয়া তাহা শাশ্বত ফল প্রসব করে। যদি কেহ নিত্য পরমানন্দের ভাগী হইতে চাও, ভগবান শ্রীরামানুজের ন্যায় মহানুভবগণের পদানুসরণ কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অস্মদ্দেশে শ্রীরামানুজ-চরিত্র সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অনভিজ্ঞ। এরূপ অনভিজ্ঞতা যে সাতিশয় ক্ষতিজনক, তাহাও ইতিপূর্ব্বে দেখাইলাম। অতএব উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা পাঠকবর্গকে এই অমূল্য নিধি উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি। উক্ত মহাত্মা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ ধনী, নির্ধনী, পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ, নীচ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই সুগম ও পরম লাভজনক।

আর একটী কথা। দুরূহ ও দুরধিগম্য উপদেশ-রাশি কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মহাপুরুষ-গণের জীবন-পাঠে অধিক লাভ আছে। তাহার কারণ এই যে, নিরবয়ব সুতরাং দুগ্রাহ্য উপদেশগুলি সাধুজীবনে সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায়, সাতিশয় সহজ-গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং সাধারণ মানবমণ্ডলীর পক্ষে সুখানুকরণীয় হওয়ায় তাঁহারা অজ্ঞাতসারে তত্তাবতের অনুসরণ করিয়া সাধুতার পথে অগ্রসর হয়েন এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, সত্যকথা কহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই সত্যের অপলাপ দেখিয়া পরিশেষে এরূপ ধারণা হয় যে, সত্যবাক্য প্রয়োগের কর্ত্তব্যতা, কেবল অনুশাসন-গ্রন্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; কার্য্যকালে শুদ্ধ সত্য বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অসম্ভব। যদি ইহ-জগতে সত্যমূর্ত্তি মহানুভবগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ে উক্ত ধারণা "অচল-অটল-সুমেরুবৎ" বদ্ধমূল হইয়া থাকিত। কিন্তু সর্ব্বজন-পিতা সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বীয় সন্তানবর্গের উপর অসীম স্নেহ সংস্থাপন করিয়া, মধ্যে মধ্যে

তাহাদের ধর্ম্মগ্লানি নাশ করিবার জন্য সাধু-বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন; তাহাতেই মানবগণ সাধুতার পথে অগ্রসর হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক শুভফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং, এরূপ সাধুজীবনের অনুশীলন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা আর পাঠকবর্গকে অধিক বুঝাইয়া দিতে হইবে না। (ক্রমশঃ)

মনস্তত্ত্ব

মনের বহির্ম্মুখী বৃত্তি স্বতঃই নিরতিশয় প্রবলা। মানব প্রথমেই বহির্জগতের বৈচিত্র্য ও কার্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মনের এ অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া প্রথমেই কাব্য যুগের অভ্যুদয় করিয়া দেয়। বহির্জগতের অন্বেষণ শেষ হইলে মন ক্রমে অন্তর্ম্মুখী হইতে থাকে। এ অবস্থাতেই অন্তর্জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। তখনই মন কি, বুদ্ধি কি, ঈশ্বর কি ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় জীবের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়। মনের এই অন্তর্ম্মুখী বৃত্তির উপক্রম হইতেই দর্শন-যুগের আরম্ভ হয়। মনোবিজ্ঞান (Psychology), দর্শন (Philosophy) ও ধর্ম্ম (Theology) এই দর্শন-যুগের প্রধান বিদ্যা। ইংরাজি মতে মনের বহির্দৃষ্টি অব্‌জেক্‌টিভ্‌ (Objective) ও অন্তর্দৃষ্টি সব্‌জেক্‌টিভ্‌ (Subjective).

মন যখন বহির্জগৎ উপেক্ষা করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করে, তখন প্রথমতঃই "মন কি ?" এবিষয়ের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা এ প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে এ প্রশ্নের মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান যুগের প্রথম পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্ট (Descartes) বলেন, "Mind is a self-knowing principle". যে নিজকে নিজে জানে, তাহার নাম মন। এরূপ সংজ্ঞা দ্বারা কিছুই বোধগম্য হইতে পারে না। মন যদি নিজেকে নিজে জানেন, তবে তিনিই দ্রষ্টা ও তিনিই দৃশ্য হইয়া পড়িতেছেন। এক পদার্থ দ্রষ্টা (Subject) ও দৃশ্য (Object) কিরূপে হইতে পারে ? যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই করণই মন বলিয়া, সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন বলিতেছেন, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়ায় মনই প্রধান সহকারী কারণ। (The mind itself is the universal and principal concurrent cause in every act of knowledge.) মনস্তত্ত্ববিদ্ হ্যামিলটনের সংজ্ঞা সম্যক্ পরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা কল্পিত হয়। নতুবা অন্যরূপে 'মন কি', তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা হইতে পারে। (Mind can be defined only from its manifestations.) হ্যামিলটন আরও বলেন, জাগ্রত অবস্থাই মন ; জড়ের সহিত বিস্তৃতি গুণের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত জাগ্রত অবস্থার সেই সম্বন্ধ। (Consciousness is, in fact, to the mind, what extension is to matter or body.) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বলেন, মন দেহাদির গুণ বা ধর্ম, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ; শুক্র শোণিতের রাসায়নিক ক্রিয়োৎপন্ন ; ইঁহারা প্রায় ভারতীয় চার্ব্বাক-মতবাদিগণের ন্যায়। এরিষ্টটল্ (Aristotle) যাহাকে র‍্যাসন্যাল (Rational) বা এনিম্যাল সোল

(Animal soul) বলিতেন, তদ্দ্বারা মনকেই উপলক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দর্শন-মতে, অনেকস্থলে, Soul-কে (আত্মাকে) Mind (মন) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে · আবার মনকেও পক্ষান্তরে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত আবার মন ও দেহ এ উভয়ের একে অস্বীকার করিয়া একত্ববাদী হইয়াছেন। কেহ মনোবাদী হইয়া আইডিয়ালিষ্ট (Idealist) নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কেহ জড়বাদী হইয়া রিয়ালিষ্ট (Realist) নাম ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা মন ও দেহকে দুই স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও আবার চারি সম্প্রদায়ে প্রবিভক্ত। ডেকার্ট, ডিলাফোর্জ ও মেলব্রন্স প্রভৃতি দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মন ও জড়শরীরের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। উহারা উভয়েই নিষ্ক্রিয়। এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব অকেজনাল কজেস (Doctrine of Occasional Causes) বলে। লেবনিজ ও উল্‌ফ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন ও শরীরের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা অন্যোন্যাশ্রয়ী নহে। কিন্তু দুইটী সমান ঘড়ির মত উভয়ের একরূপ ক্রিয়া হইতেছে। শরীর ও মনের এই অন্যোন্য-কার্যকারিতা সৃষ্টিকাল হইতে ঈশ্বরই বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব প্রি-এষ্টাব্লিষ্‌ড হারমনি (Doctrine of Pre-established Harmony) কহে। কাডওয়ার্থ, লেকলার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কোন একপ্রকারের সূক্ষ্মপদার্থ মন ও শরীরের সংযোগ করিয়া দিয়াছে। এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব প্লাষ্টিক মিডিয়ম (Doctrine of Plastic Medium) কহে। ইউলার ও স্কুলমেন-মতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাহ্যপদার্থ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে মনের কার্য্য হয়। মন যেন ঠিক মাকড়শার মত দেহজালের মধ্যদেশে অবস্থান করিতেছেন। এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব্‌ ফিজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স (Doctrine of Physical Influence) বলে।

জার্মেন দার্শনিক ক্যাণ্ট মনের কার্য্যকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—জ্ঞান (knowledge), অনুভব (feeling) ও ইচ্ছা বা ক্রিয়া (willing)। ইনি বলেন, এই তিনের সমষ্টিই মন। জ্ঞান, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি সকলেই অন্যোন্যাশ্রয়ী। বস্তুতঃ, ক্যাণ্ট-উক্ত এই ত্রিবিধ শক্তির সম্যক আলোচনা, উপরিউক্ত শক্তিত্রয়-সংমিশ্রণে নানা জাতীয় মনোভাবের ক্রমবিকাশ-প্রতিপাদন এবং অবশেষে এই শক্তিত্রয়ের কারণতা অনুসন্ধান করিয়া শরীরবিদ্যায় পর্য্যাপ্তি করাই অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণ বলেন, এই শক্তিত্রয় বিকাশের ক্রমভেদ আছে। ক্রমবিকাশ-বাদী পণ্ডিতগণ (Evolutionists) এমতের সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, মানবজীবনের প্রথমেই অনুভবশক্তির (feeling) প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। হাস্য, ক্রন্দন, প্রফুল্লতা, তৃপ্তি, সহানুভূতি, সরলতা ও নির্ভীকতা শৈশব জীবনের নিত্য সহায়। সে সময় জ্ঞানের বিকাশ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়। যদিও যুক্তি-বিচারে আমরা অনুমান করি যে, অনুভবের মূলেও অত্যল্প জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, তথাপি সেই জ্ঞান এত স্বল্প যে, তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ বলেন, মস্তিষ্কই মনের আধার বা মস্তিষ্কই মন। মনের কার্য্য বেশী হইলে প্রস্রাবের সহিত মস্তিষ্কের অংশ বিগলিত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বয়সের সঙ্গে যখন মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হয়, তখনই মনের সমধিক ক্রিয়া হয়। তখন ক্রমেই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সমধিক স্ফুরণ হইয়া থাকে। পৌনঃপুনিক অনুভবই জ্ঞানের অনন্য কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তবে দেশ, কাল, পাত্র, শিক্ষা এবং পৈত্রিক সংস্কারাদিও মনের গঠনে বিস্তর সাহায্য করে। ইঁহারা বলেন, বহির্জগৎ ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সংস্পর্শ মাত্র ধমন্যাদির পরিস্পন্দন দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তৎপরে বস্তু-জ্ঞান জন্মে। মস্তিষ্কই দেহরাজ্যের রাজধানী এবং মস্তিষ্ক-ক্ষয়ে জ্ঞান-ক্ষয়। কিন্তু, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ হইয়া জ্ঞান, অনুভব ও ক্রিয়া কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? শৈশব ও অসভ্য-জীবন একরূপ। এজন্য, শৈশব ও অসভ্য সমাজে ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের মতে অনুভব-শক্তি প্রধান। বেদুইনেরা এই ঘোর সাহসী, এই আবার কাপুরুষ। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণ আধ পয়সার জন্য এখনি একজনকে হত্যা করিয়া পর মুহূর্ত্তেই অন্যজনকে দশটাকা দান করিবে। মনের অনুভব-শক্তি ইন্দ্রিয়াদিপথে পরিচালিত, এজন্য অসভ্য ও শিশুর অনুভবশক্তি প্রবল। নেটালের অধিবাসিগণের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, কুক্কুরের ন্যায় তাহারা মৃগানুসরণ করিতে পারে। যুগমান জাতি দূরদর্শনে দূরবীক্ষণ-স্বরূপ। সুতরাং পাশ্চাত্য মতে আমরা দেখিতে পাইলাম, অনুভব-শক্তিই মনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা জ্ঞান ও তৃতীয়াবস্থা কর্ম্ম।

বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য মত যে ভ্রম, তাহা বলিবার উপায় নাই। 'মন কি', যদিও তাঁহারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, যদিও বস্তু-জ্ঞানের ক্রমপদ্ধতি-প্রকাশে তাঁহারা সাংখ্যের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদের পরীক্ষার ফল (Result) যে একান্ত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভবের পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পর কর্ম্ম, একথা উচ্চ-দর্শনানুমোদিত।

কণাদোক্ত নয় দ্রব্যের মধ্যে মন নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। ইঁহারা আত্মাকে মন হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চক্ষুরাদি যেমন বহিষ্করণ বা বাহ্য-কার্য্য-সহায়, মন তেমনি অন্তঃকার্য্য-সম্পাদক যন্ত্র-বিশেষ, এইজন্য মনকে অন্তঃকরণ কহে। ইহাই সুখদুঃখাদি সাক্ষাৎকারের হেতু। কণাদ বলেন, মনের ৮টী গুণ আছে, যথা—সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ। মন নিত্য নহে, তবে প্রলয় বা মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী বলিয়া মন প্রায় নিত্যের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। বৈশেষিক-মতে মন জড়, কিন্তু আত্মার যোগে সে বুদ্ধি-নামক চৈতন্য পদার্থ উৎপন্ন করে। এই আত্মা ও মনের সংযোগ ধ্বংস হইলেই চৈতন্যের লোপ বা মোক্ষ হয়। গৌতমও মনকে জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনিও মন ও আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়-মতে আত্মা অনাদি-নিধন, কিন্তু মন উৎপন্ন, প্রধ্বংসী। গৌতম মানস জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম জ্ঞানকে জড় মনের গুণ বলিয়া আত্মাকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, কণাদ ও গৌতম উভয়েই মন সম্বন্ধে একমতবাদী।

সাংখ্য দর্শনই এ জগতে মনস্তত্ত্বের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কপিল বলেন, পুরুষ-সান্নিধ্য-বশতঃ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশই মহত্তত্ত্ব। "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" কপিল এই সমষ্টি মহৎকে মন আখ্যাও দিয়াছেন। সুষুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থা যেরূপ, প্রকৃতি ক্ষোভের পর মহত্তত্ত্বও সেইরূপ। হ্যামিলটনোক্ত কন্‌শাস্‌নেশের (consciousness) সমষ্টি ও মহত্তত্ত্ব এইজন্য একরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাংখ্যমতে ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বই মন বা অন্তঃকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধি নামে উক্ত হয়। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারে পরিণত হইলে প্রচুর-সত্ত্ব অহঙ্কার হইতে মন, প্রচুর-রজঃ অহঙ্কার হইতে দশেন্দ্রিয় ও প্রচুর-তমঃ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ উৎপন্ন হয়। বাহ্যজগৎ ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিবামাত্র স্নায়ুর পরিস্পন্দন উপস্থিত হয়, পরে মস্তিষ্কের কোমলাংশে যে ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র আছে, তাহাতে ঐ আঘাত পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয় মনের নিকট তাহা অর্পণ করিলে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অর্পণ করে, বুদ্ধি আত্মার নিকট উপস্থিত করিলে আত্মা তথা হইতে বুদ্ধিপথে আদেশ প্রেরণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত পথে প্রতিক্রিয়ারূপ আদেশ প্রচলিত হইয়া বস্তু-জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং, মন একটী অন্তর্যন্ত্র, যদ্দ্বারা বস্তু-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্য-মতেও মন জড়, কিন্তু আত্মার সন্নিকটস্থ ও প্রচুর সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া চৈতন্যাত্মক বলিয়া অনুমিত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার চক্ষুরাদিতে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্থান মস্তিষ্কে; মনের স্থান সর্ব্বত্র। তবে হৃৎ-পুণ্ডরীক ও দ্বিদলই মনের প্রধান স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পতঞ্জলিও সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছেন। জৈমিনি মনকে ভৌতিক বলিয়াও ইহার অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। বেদান্ত-মতে মনের স্বরূপ প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ। তবে একটু প্রভেদ এই যে, বৈদান্তিকগণ মনকে আধ্যাসিক বলেন। মায়া-শক্তি যেমন পরমাত্মাতে জগদিন্দ্রজাল কল্পনা করে, ব্যষ্টি-পক্ষে মনরূপ অবিদ্যাও তেমনি জীবাত্মাদি কল্পনা করিয়া বদ্ধ হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, 'নহ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা', মন ভিন্ন অবিদ্যা কিছুই নাই। কেবল জাগ্রত অবস্থা (consciousness)-কেই ইঁহারা মন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। জাগ্রত (conscious), স্বপ্ন (semiconscious) ও সুষুপ্তি (unconscious) অবস্থাও মনের বিষয়। কেবল তুরীয় অবস্থা (super-conscious) মনের বিষয় নয়। সে অবস্থায় মন লুপ্ত হইয়া যায়; তখনই পরমাত্মানুভূতি হয়। বেদান্ত বলেন, মনের প্রথম স্পন্দনাবস্থায় বাসনা জন্মে, তাহা হইতে সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হয়। এই বাসনার লোপ হইলেই মনের স্পন্দন হ্রাস হইয়া আত্মতত্ত্বে মিশিয়া যায়। বহুজন্মেও মনের এই স্পন্দনাবস্থা লুপ্ত হয় না বলিয়া বাসনা-পূরণে জীব পুনঃ পুনঃ নানা যোনি ভ্রমণ করে। অবশেষে বাসনার নিবৃত্তি হইলে মনরূপ উপাধির লোপ হয়; কাজেই জ্ঞান বা পরমাত্মা প্রকাশিত হন। সমষ্টি-মায়োপহিত চৈতন্যের যেমন ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইয়া থাকে; ব্যষ্টি অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের তেমনি মন-সংজ্ঞা হয়। এই মনের লোপই মোক্ষ বা তুরীয়াবস্থা। বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কিছুই হয় নাই, হইবে না, কেবল— 'মনরূপ মায়া উপাধি লইয়া, ভাঙ্গি, গড়ি, ধরা আমরা সবে।' শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্ম ও গুরুসেবা দ্বারা মনের নিঃশেষ লয় করিলে পরমাত্মা আপনি প্রকাশিত হন। ইহাই মনস্তত্ত্বের এক প্রকার অস্ফুট ইতিহাস।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী



দিব্য বাণী

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—১

ব্রহ্মবাদিগণ
প্রশ্ন করিলেন পরস্পর—
'কারণ কি এ বিশ্বের—
কোন্ মূল উপাদান হতে,
কার দ্বারা সৃষ্ট আর
চালিত এ বিশ্ব-চরাচর?
ব্রহ্মই কি সে কারণ?
কি হইতে সৃষ্টি আমাদের?
কে রেখেছে বাঁচাইয়া? মরণের পরে
কোথায় বা যাব সবে—
(কোন্ পরিণতি
লভিবে এ দেহ-মন-চেতনা মোদের?)
কার ব্যবস্থায়
সুখ-দুঃখ-ভোগে লিপ্ত হয় এ জীবন?'

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাঽপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥ ২

(যুক্তি-বিচারের পথে
যতদূরে যতভাবে চলা যায়,
আরোহণ করি বুদ্ধিরথে
এইসব জিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধানে
সে সকলি তাঁরা সবে করিলা ভ্রমণ:)
'কালই কি সে কারণ?—
কালবশে সবই আসে রয়
কালই সব করে সংহরণ।

অথবা কি পদার্থেরই ধর্মগুণে—
স্বভাবের, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে
এ বিশ্বের সব কিছু হয় লয় যায় ?
কর্মফল কিংবা সে কি ?—(যাহা জীবনের
সব বাহ্য ঘটনা ঘটায় ?)
অথবা যদৃচ্ছাবশে—
আকস্মিক ঘটনায় কোনো
শুরু হইয়াছে আর চলিতেছে এ বিশ্বের
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ?
অথবা কি পঞ্চভূত—(কঠিন, জলীয়, বায়বীয়,
শক্তি ও আকাশরূপে অনুভূত উপাদানচয়)
করিতেছে নিজে নিজে
বিশ্ব-সৃষ্টি, -বিনাশ, -ধারণ ?
কিংবা যিনি জীবদেহে চেতনা-ভাস্বর
দেহী, যিনি জীব-আত্মা,
তিনিই কি জগৎ-কারণ ?

অথবা এ সকলের সংহতিই—
সবাকার মিলিত প্রভাব—
তাতে গড়ে জগৎ, জীবন ?'
অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তাঁরা সবে
দেখিলেন পরিশেষে, জগৎ-কারণ
এগুলির কোন একটিও
হতে নাহি পারে কদাচন,
পারে নাকো সংহত হয়েও সবে
চালাইতে সবাকারে নিয়ম-মতন
সুপরিকল্পিত পথে,— এসবের সংহতিরই তরে
চাই কোন চালক চেতন !
জীবাত্মা চেতন বটে,
জগৎ-কারণ সে-ই হইতে পারিত,
কিন্তু তাহা হইবে কেমনে—
সে-ও কর্মফল-আদি
নিয়মের বশে হয় নিজেই চালিত !

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩

(এভাবে বিচার করি বুঝিলেন সবে
যুক্তি দিয়া বুদ্ধি দিয়া
কোনদিনই মিলিবে না উত্তর ইহার।
তাই সবে বসিলেন ধ্যানে
একাগ্র করিয়া চিত চলিলেন মন-বুদ্ধি-পার,
প্রত্যক্ষ করিয়া সেথা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে
জগৎ-কারণে,
মন-বুদ্ধি-রাজ্যে ফিরে এলেন আবার।)
ধ্যানযোগে পেলেন উত্তর, বুঝিলেন,
অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ চরম সত্যের,
ব্রহ্মের সহিত একীভূতা,

(চিদানন্দময়ী, নিত্যা,) ত্রিগুণ-আত্মিকা
শক্তিই এ জগৎ-কারণ—
তাঁহারি প্রভাবে
নিয়ন্ত্রিত এ বিশ্বজগৎ—
কারণ বলিয়া আলোচিত
কাল, জীব, পঞ্চভূত, স্বভাবাদি সব
তাঁহারি প্রভাবে
নিয়ম মানিয়া চলে যথাযথভাবে।
(মনবুদ্ধিপারে স্থিত জগৎ-কারণে
বিচার করিয়া নয়,
জানা যায় একমাত্র অবিচল ধ্যানে।)

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী প্রভৃতি সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

মানিব কেন?

আজকাল কোন কিছু না মানার একটা হাওয়া আসিয়াছে—কোন সামাজিক প্রথা মানিব না, শাস্ত্র মানিব না, ধর্ম বা ভগবান বা মানুষের দেহাতীত অস্তিত্ব মানিব না, সংস্কার মানিব না, এমনকি মা-বাপের উপদেশও মানিব না, স্কুল-কলেজের নিয়ম মানিব না—যেন কোন কিছু মানাটাই খারাপ, অথবা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যাহা মানিতেছি না, তাহাই খারাপ বা অসত্য।

কেমন করিয়া সেগুলিকে খারাপ বা অসত্য বলিয়া জানা গেল? কেমন করিয়াই বা জানা গেল সে-সব না মানাটাই ভাল?

এইখানে একটা বিরাট ফাঁকি রহিয়াছে—এসব না মানাটাই যে ভাল, সেটা কিন্তু আমরা 'বিশ্বাস' করিয়া লইয়াছি কাহারো না কাহারো কথা মানিয়াই। যদি নিজে যাচাই করিয়া লইয়া, কোনকিছুর সত্যাসত্য নিজে পরীক্ষা করিয়া, উহা খারাপ বা অসত্য বুঝিয়া না মানিতে চাহিতাম, কিংবা ততখানি করিবার শক্তি না থাকিলেও আলোচ্য বিষয়গুলির পক্ষে এবং বিপক্ষে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সব পড়িয়া শুনিয়া দেখিয়া নিজের বুদ্ধিতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কিছু মানিতে বা না মানিতে চাহিতাম, তাহারও একটা মূল্য থাকিত। কিন্তু এ তো তাহার কোনটাই নয়—এ যেন একটাকে মানিয়া লওয়া কুসংস্কার—এই দোহাই দিয়া অপর একটা কুসংস্কারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছি, একজনের কথা শোনাকে কুসংস্কার বলিতেছি অপর একজনের কথা শুনিয়াই। এই ফাঁকিটির সুযোগ লইয়া মাঝখান হইতে স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া লইতেছে একদল বুদ্ধিমান লোক, বহুজনের কল্যাণ-সম্ভাবনাকেই বিধ্বস্ত করিয়া।

যদি কেবল কথায় আস্থা না থাকে, তবে কাহারো কথাতেই আস্থা রাখিও না—কেহ কিছু বলিলেই তাহা শুনিও না, মানিয়া লইও না, তুমি তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া উহার সত্যতা নিজে যাচাই করিয়া লইয়া তবে মানো। যেমন বিজ্ঞানীরা করেন। কেহ কিছু বলিলেই, তিনি যত বড় বিজ্ঞানীই হউন, অপর বিজ্ঞানীরা 'উনি বলিতেছেন' বলিয়াই তাহা মানিয়া লন না। কেনই বা মানিবেন? যাহা সত্য, তাহা তো শুধু কাহারো কথার উপর নির্ভর করে না, বা কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকটেই প্রকাশিত হয় না—উহা সর্বকালীন, সর্বজনীন, যে পরিবেশে উহা প্রকাশিত হয়, ঠিক সেই পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে সর্বজনের নিকটই সর্বকালে উহা প্রকাশিত হইবেই। কে সে পরিবেশ সৃষ্টি করিল, সত্যের প্রকাশ তাহার উপর নির্ভর করে না। কোন বিজ্ঞানী কোন সত্য আবিষ্কার করিবার পর তিনি কিভাবে উহা আবিষ্কার করিলেন, সে পদ্ধতি ঘোষণা করেন। সেই পদ্ধতি অনুসারে

চলিয়া যে-কেহ—অবশ্য শক্তি থাকিলে—উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লইতে পারে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সেভাবে উহার সত্যতা নিজে যাচাই করিয়া লইবার পর তবে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

আমরা সকলেই যে-কোন সত্য সম্বন্ধে তাহাই করিতে পারি—উহার সত্যতায় সন্দিহান হইলে উহা যাচাই করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ধরিয়া চলিয়া উহা সত্য কি না তাহা নিজেই দেখিয়া লইতে পারি। যখন কোন কিছুকে, যেমন ধরা যাক ঈশ্বরকে, মানুষের দেহাতীত সত্তা বা আত্মাকে একদল লোক সত্য বলিতেছেন, সে সত্য যাচাই করিবার পদ্ধতিও বলিতেছেন, এমনকি নিখুঁত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি লইয়াই বলিতেছেন, 'আমি বলিতেছি বলিয়াই বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি নিজে যাচাই করিয়া তবে ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর'; আর একদিকে আর একদল লোক নিজেরা উহা যাচাই করিবার কোন পদ্ধতি ধরিয়া না চলিয়াই, পরীক্ষা না করিয়াই বলিতেছেন, 'ওসব বাজে কথা লোক-ঠকানো কথা, ওসব মিথ্যা—ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, মানুষের দেহাতীত কোন সত্তা নাই—শরীর নষ্ট হইলেই মানুষ বলিতে যা কিছু সবই ফুরাইয়া যায়; ওদের কথা মানিও না'; তখন, নিরপেক্ষ মন লইয়া বিচার করিলে বলিতেই হয়, কাহারো কথা মানা যদি বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে যে 'সব মিথ্যা' বলিতেছে, তাহার কথাই বা মানিয়া লইব কেন, তাহার কথা মানাও তো সমভাবেই বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ, এবং যে বুদ্ধিমান, তাহার পক্ষে সত্যনির্ধারণের প্রশস্ত পথ হইল নিজে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া—পদ্ধতি যখন রহিয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ নিজেদের যুক্তিবাদী বলিয়া মনে করিলেও অধিকাংশ লোকই কোন কিছুতে 'বিশ্বাসী'—কাহারো না কাহারো কথায় বিশ্বাস করিয়া জীবনপথে চলি। যথার্থ যুক্তিবাদী, 'খাপখোলা তলোয়ার' একজনের কথা আমরা জানি, যিনি ঈশ্বরীয় রূপ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ, তিনি তখন তাঁহার বুদ্ধিতে, যুক্তিতে ইহার সমর্থন পাইতেন না, আর, (ঈশ্বরের নাস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে যুক্তি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি,) তাঁহাকে দেখিতেও পাইতেন না। কিন্তু যেদিন তাঁহাকে মহাশক্তিরূপে প্রথম প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই দিন তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরীয় রূপের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তাঁহার এতদিনের সযত্নলালিত এত আদরের যুক্তিগুলিকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। সেইদিনই ভাবিলেন—যাহা যথার্থ যুক্তিবাদীর, যথার্থ বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ভাবিবার কথা, তাহাই ভাবিলেন—'শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে-সব কথা লেখা আছে, বা কোন সত্যদ্রষ্টা, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, নিজে যাহা দেখিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন, সেগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন মতামত-প্রকাশের অধিকারই কোন মানুষের আসে না, যতক্ষণ না যে-পদ্ধতি অবলম্বনে উহা প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া বলা হইতেছে সেই পদ্ধতি ধরিয়া উহা সত্য না অসত্য নিজে তাহা পরীক্ষা করিয়া সে দেখিতেছে।' এই নরেন্দ্রনাথের জীবন অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে, আধুনিক যুগের সমস্ত সন্দেহের মূর্ত প্রতীকরূপেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

'কারো কথা শুনিয়া বা এমনিতেই আমার বিশ্বাস যে ভগবান নাই'—একথা কেহ বলিলে বোঝা যায়। কিন্তু যাঁহারা যুক্তির

দোহাই দেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দোহাই দেন এবং তাহারই ভিত্তিতে এসব কিছু মানিব না বলেন, তাঁহাদের এই কথাটিকে একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। পূর্বোক্ত সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে তাহা আমাদের জানা নাই। কোন বিজ্ঞানী যখন কোন সত্যকে নিজের পরীক্ষিত সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তাহা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতিও ঘোষণা করেন (বিজ্ঞানীরা সর্বক্ষেত্রেই তা করেন), তখন সে পদ্ধতি অবলম্বনে উহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা আমাদের না থাকিলে আমরা উহা লইয়া মাথা না ঘামাইতে পারি, কিন্তু উহাকে মিথ্যা বলিবার অধিকার আমাদের কি করিয়া আসে ?

নরেন্দ্রনাথের প্রথম অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হয় শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিপ্রভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে এভাবে উহাতে 'বিশ্বাস' করিতে বলেন নাই ; বলিলেও তাহা শুনিবার ধাতই তাঁহার ছিল না তখন। নরেন্দ্রনাথকে নিজ সাধনাসহায়ে নিজে যাচাই করিয়া লইবার জন্যই উৎসাহিত করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তিনি পরে তাহা করিয়াছিলেনও—নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পূর্বে কোন কিছুর সত্যাসত্য সম্বন্ধে মতামত-প্রকাশের অধিকার কাহারো নাই—এই সিদ্ধান্তে আসার পর। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে সত্য যাচাই করিবার পথে উৎসাহিত করিবার জন্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রাথমিক আস্বাদ তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ শক্তিসহায়ে দিলেও, নবযুগের সংশয়ের প্রতীক এই মহাশক্তিধর, প্রচণ্ডযুক্তিপরায়ণ, বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন নবযুগের ভবিষ্য নায়ককে তিনি বিজ্ঞানসম্মত পথেই সত্যান্বেষণে নিযুক্ত করিয়া সত্যলাভ করাইয়াছিলেন। একথা বলিবার কোন ছিদ্রই রাখেন নাই—কাহারো কথা মানিয়া লইয়া নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও আত্মাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বেলাও প্রায়-নিরক্ষর হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া একথা বলিবার কোন ছিদ্র রাখেন নাই যে, কোন বিশেষ রূপের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি হ্যালুসিনেশন দেখিয়াছিলেন ; তাঁহার ঈশ্বরীয় রূপদর্শন সম্বন্ধে আধুনিক যুগের ঈশ্বরে অবিশ্বাসের এ যুক্তিও নরেন্দ্রনাথের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল এককালে—'ওসব মাথার খেয়াল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে, কোন কিছু ভাবতে ভাবতে ওরকম ভুল দেখে মানুষ।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'কথা কয় যে রে !' তাহাতেও নরেন্দ্রনাথ তখন বলিয়াছেন, 'ওরকম হয়।' অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি তিনি দর্শন করিয়াছিলেন ভাবাবস্থায়, সাধারণ অবস্থাতেও খালি-চোখেই, শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে তাঁহাদের রূপ হুবহু মিলিয়া যায়। কিন্তু সেসব রূপ চিন্তা করিতে করিতে ভুল দেখিয়াছেন—শাস্ত্রাদি পড়িয়া ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি মাথার খেয়ালে ঐসব দেখিয়াছেন—একথা বলিবার কোন সুযোগই রাখিয়া যান নাই। তাঁহার পড়াশুনা পাঠশালার সীমা ছাড়ায় নাই। এমনকি, মা-কালীর পূজা করিয়াছেন বহুদিন—মা-কালীকে অন্ততঃ তাঁহার রূপের ধ্যান করিয়া এরকম ভুল দেখিতে পারেন, একথা বলিবার সুযোগও রাখেন নাই, তাঁহার 'মায়ের প্রথম দর্শনের' যে বর্ণনা নিজে

দিয়াছেন, তাহা নিরাকার জ্যোতিঃসমুদ্রের সঙ্গে নিজের আমিত্ব মিশিয়া যাওয়ারই বর্ণনা, যাহার কথা তিনি পূর্বে চিন্তাই করেন নাই।

তবে যে-কোন সত্যপরীক্ষায় নামিতে হইলে তাহার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি মানিয়া লইতে হয়; যে বিজ্ঞানের দোহাই * আমরা কথায় কথায় দিই, সেই বিজ্ঞানের সত্য-পরীক্ষাতেও তাহা মানিয়া লইতে হয়। আজ-কালকার 'না মানার' ভেতর এই পদ্ধতিকেও না মানার প্রবণতাকেই আমাদের সব চেয়ে বেশী অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক'বলিয়া মনে হয়। একথা অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে ঈশ্বরদর্শন করাইয়া দিয়াছিলেন, সেই রকম কেহ আমাদের করাইয়া দিক না, আমরাও তখন বিশ্বাস করিব।'

কথাটি শুনিয়া একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। ঘটনাটি পূর্বে একসময় উল্লেখ করিয়াছি, পুনরায় করিতেছি। ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র তখন আমরা। আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষের সঙ্গে ডঃ মেঘনাদ সাহার বন্ধুত্ব ছিল খুব, তাঁহারা সতীর্থও ছিলেন। একদিন ডঃ সাহা এবং আশ্রমাধ্যক্ষের সত্যেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ আরো কয়েকজন খ্যাতনামা সতীর্থ ও বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আশ্রমে আসিয়াছেন। খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে সকলে গল্প করিতেছেন, আমরা সেখানে সমবেত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছি,—এতগুলি বড় বড় পণ্ডিতকে তো একসঙ্গে পাওয়া যায় না সহজে এবং এমন ঘরোয়া পরিবেশে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ-ক্রমে ডঃ সাহা আশ্রমাধ্যক্ষকে বলিলেন, 'কিন্তু স্বামীজী, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কথা যদি কেউ না মানে, আমরা তাহলে তাকে লেবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে হাতে-নাতে তার সত্যতা দেখিয়ে দিই। তোমরা কিন্তু তা পার না।' আশ্রমাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বাইরের মাঠে হাল-চাষরত একজন চাষীকে দেখাইয়া বলিলেন, 'একে আজ লেবরেটারীতে নিয়ে গিয়ে তোমার এস্ট্রো-ফিজিক্সের লেটেষ্ট থিওরীটা বুঝিয়ে দিতে পার?' একটু চিন্তা করিয়া ডক্টর সাহা বলিলেন, 'না, প্রস্তুতি দরকার।' শুনিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ বলিলেন,

* প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, 'বিশ্ব যন্ত্রবৎ', একদা কোন কোন বিজ্ঞানীর এই চিন্তা-অবলম্বিত 'বিজ্ঞানই বিশ্বের সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে, সব সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম'—জড়বাদ ও ঈশ্বরনাস্তিত্বের এই অন্যতম প্রধান ভিত্তিটিকে বিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে; অনেক বিজ্ঞানীরই উক্তি: "ডাইএলেকটিক্যাল বা অন্য কোন ধরণের জড়বাদ হল এক ধরণের মতবাদ, পক্ষানুরাগ ও বিশ্বাসের ওপর যা স্থাপিত; এক ধরণের লোকের মনে এর আবেদন রয়েছে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা আবিষ্কর্তাদের পক্ষ থেকে এর কোন সমর্থন নেই।" "Materialism, dialectical or otherwise, is a form of faith, founded on predilection and belief, which has an appeal for certain minds, but it certainly has no support from the findings or founders of modern science."—E. N. da C. Andrade, 'An Approach to Modern Physics', 3rd Ed., page 251

'একক্ষেত্রেও তাই।' ডঃ সাহা মানিয়া লইলেন কথাটি।

আমরা কিন্তু, যাহারা বিজ্ঞানের মন্দিরে কোনদিন প্রবেশই করি নাই তাহারাও, এদিকটির কথা ভাবিই না। না ভাবার কোন সমর্থন কি আছে যুক্তির দিক দিয়া? স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বক্তৃতাকালে একদিন বলিয়াছিলেন যে, জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একজন বড় ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার, কি বড় অফিসার হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। তাই বলিয়া, আগে এত পরিশ্রম করিয়াছে বলিয়াও রেহাই নাই—আজীবন পরিশ্রম করিয়াই যাইতে হইবে; হয়তো পুত্রশোক হইয়াছে, বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিষয়কর্ম ছাড়িবে না, কর্মক্ষেত্রে যাইতেই হইবে। বিনিময়ে কি পাওয়া যায়?—অপরের অপেক্ষা একটু ভাল থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কিছুই বলি না আমরা। অথচ দাবী করি, ভগবান-লাভের মতো এত বড় জিনিস বিনা পরিশ্রমেই বা অল্প পরিশ্রমেই—প্রয়োজনীয় যোগতা অর্জন না করিয়াই—কেন পাইব না!

ছোট ছেলে, সবে বর্ণপরিচয় হইয়াছে, সে যদি দাবী করে ল-অব-রিলেটিভিটি আমাকে বুঝাইয়া দাও, যদি দিতে না পার তো বলিব ওসব বাজে কথা,—বিনা প্রস্তুতিতেই যদি আমরা দাবী করি, ভগবান দেখাইয়া দাও, তবে মানিব, সে-দাবীও ঐ বালকের দাবীর মতই যুক্তিহীন, অর্থহীন নয় কি?

ঈশ্বরবিষয়ক ও অধ্যাত্মজগতের সত্য এক-জন দুইজন নয়, যুগে যুগে বহুজন প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, নিজেদের প্রত্যক্ষের কথা বলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যক্ষ করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সে পথে যাহারা চলিতে চায় তাহারা একদিন পথের শেষে পৌঁছাইবেই; যাহাকে জাগতিক অর্থে আমরা 'লাভ করা' বলি সেই চরম লাভই হইবে তাহার, আনন্দ ও অমৃতত্ব লাভ। আসলে থাকা-খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা, নামযশ বা অন্য কোন ভোগ্যবস্তু-লাভ, জ্ঞানলাভ প্রভৃতির মূল উদ্দেশ্যই তো আমাদের আনন্দলাভ আর মৃত্যুকে জয় করা। প্রাথমিক প্রচেষ্টাতেই তো প্রস্তুতি সঙ্গে সঙ্গে আসে না, কিন্তু যতটুকু প্রস্তুত হইতে পারি আমরা তাহার ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়। কাজটি হইল আমাদের অনুভূতির, ধারণার যন্ত্র মনবুদ্ধিকে পরিষ্কার করা; সংযম ও একাগ্রতা তাহা করিবার প্রধান উপায়। কত কাজে কত সময় তো আমরা অপব্যয় করি। এটা ভুল, ওটা মানিব না, ওতে কি হয়—ইত্যাদি না করিয়া কয়েকটা দিন কিছুটা করিয়া সময় এই প্রস্তুতির কাজে খরচ করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি, তাতে কিছু হয় কি হয় না? অল্পকিছুদিন মাত্র কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার ও মন একাগ্র করার চেষ্টা করিলেই তাহার ফল পাওয়া যাইবেই যাইবে—মনের প্রশান্তি বাড়িবে, আত্মবিশ্বাস বাড়িবে, অন্তরে অকারণ-আনন্দের বিভাও বিকীর্ণ হইতে শুরু করিবে।

তবে মনে রাখি যেন, কাজ নিখুঁত হওয়া চাই। বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন যন্ত্রটি নিখুঁত থাকা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিয়াছেন, পাঁচ মাইল টেলিগ্রাফের তার খাটাইলাম, যাহা যাহা করিবার সবই করিলাম, কিন্তু তারে একজায়গায় সামান্য ফাঁক থাকিলে আর সংবাদ পৌঁছিবে না।

মন এই যন্ত্র। নিয়ম না মানা নয়, নিয়ম-পালনই মনকে অধিকতর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী করে, আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া দেয়, সে-নিয়মের

নিজস্ব কোন মূল্য থাক আর না থাক। তবে, ভারতে সমাজ ও সভ্যতার নিয়ামকগণ জীবন-গঠন সম্বন্ধে, জীবনযাপন সম্বন্ধে যেসব নিয়ম প্রবর্তন বরিয়া গিয়াছেন, সেগুলি যুগ যুগ ধরিয়া জীবনের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত, সত্য-ভিত্তিক। কে সে নিয়ম প্রবর্তন করিলেন, সে নিয়ম মানিলে কেন ভাল হইবে তাহা না জানিয়াও, না বুঝিতে পারিয়াও তাহা পালন করিলে তাহার ফল পাওয়া যাইবেই। কোন্ বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গের আবিষ্কর্তা, তাহার স্বরূপ কি, রেডিও যন্ত্রের ভিতর কিভাবে তাহা শব্দে রূপায়িত হয়, কেন হয়—এসব না জানিয়াও, সেসব তত্ত্ব শুনিয়াও বুঝিবার শক্তি না থাকিলেও, প্রযুক্তি-বিজ্ঞানীরা যেভাবে নির্দেশ দেন, সেভাবে যন্ত্রটি প্রস্তুত করিতে পারিলেই দূর দূরান্ত হইতে প্রেরিত কথা শোনা যাইবেই। ঋষিরা, সত্যদ্রষ্টারা যাহা করিতে বলেন, তাহা কেন করিব না বুঝিয়াও বা বুঝিবার মতো শক্তি না থাকিলেও তাহা মানিয়া চলিলে তাহার ফল পাওয়া যাইবেই।

তাই, কেন সেগুলি মানিব, তাহা লইয়া বুদ্ধির লড়াই না করিয়া বিজ্ঞানীর মতো একবার নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখার চেষ্টা করাই ভাল। চরম সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে শুরু করিলেই যেটুকু ফল পাওয়া যাইবে, 'কেন মানিব' এ প্রশ্নের উত্তর তাহাতেই নিজের হৃদয় হইতেই পাওয়া যাইবে, বুদ্ধিকে তাহা লইয়া আর যুক্তির হেঁয়ালি ভেদ করিতে যাইতে হইবে না।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramkrishna Mission
Belur P. O., Howrah Dist.
Dated 15. 12. 1925

শ্রীমান সুবোধ,

তোমার চিঠি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি তোমার [মায়ের] এই অবস্থায় সেবা করিতে যাইয়া খুবই ভাল করিয়াছ, এবং খুব করিয়া তাঁর সেবা করিও। তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য তুমি তাঁর মালা জপ করিও এবং তাঁর মন্ত্রও জপ করিতে পার। তাঁকে শুধু স্মরণ মনন করিতে বলিও, তা হলেই হবে। তিনি মনে মনে যা জপ করিতে পারেন তাই করিতে বলিও। চিকিৎসা পথ্য ও সেবা-শুশ্রূষার যাতে ত্রুটি না হয়, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের যা ইচ্ছা, তাই হবে। তুমি সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাঁকে যতটা আনন্দ দিতে পার, তাই করিও। তাঁকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ দিও। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণা, কোন ভয় নাই। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

স্বামীজী ও তরুণ-সমাজ

শ্রীসলীল বিশ্বাস

যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, স্বামীজীকে অনুশীলন কর—রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছিলেন। বৈদিক যুগের উপান্ত থেকে ভারত-আত্মার যে মর্মরূপ আমাদের পরম অনুভূতির কেন্দ্রভূমি আন্দোলিত করেছে—উনিশ শতকের সূর্যসনাথ দ্রষ্টা স্বামীজীর জীবনবেদে সেই অনুভূত সত্যের পরম প্রমূর্তি আমরা দেখতে পেলাম। স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র-ধ্বনির গভীর নাদস্পন্দনে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর'—অনুরণিত হ'লো। পশ্চিম শুধু দ্বার খুলে দিল না, ভারত-আত্মার প্রবুদ্ধ জাগরণের নির্মল নিকেতনে তার মিলন-নৈবেদ্য সাজালো। পূর্ণ হ'লো 'মঙ্গলঘট'। 'বিবেক' ও 'আনন্দে'র বোধনে ধূলিময় 'পৃথিবীর বাণী' সত্য হ'লো।

স্বামীজী—শত শতাব্দীর দুর্জ্ঞে'য় জড়তার অবরুদ্ধ জলধারায় প্রাণ-সঞ্চারী কুলপ্লাবী খরস্রোত বেগ। মরণজয়ী চলার ছন্দে তাঁর 'চরৈবেতি'র সুর। তারুণ্যধর্মের অগ্নিদীপ্ত সাকার বাণী-মূর্তি বিবেকানন্দের অনিবার স্পন্দনশীল নামের আগুন-ছোঁয়ায় তাই বিশ্বনিখিল চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন সৃজনশীল চলনধর্মী মহাজীবন সূর্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যেন নব-বোধনের মন্ত্র শোনায়। বিবেকানন্দের নামে তাই তরুণচিত্তে সাগরের দোলা জাগে। তরুণজীবন যে চিরকালের দুর্জ্ঞে'য় অভিযাত্রী! চলার ও সৃষ্টির সংহত মেলবন্ধনে তারাই তো নতুনের যজ্ঞের পুরোহিত। তরুণ-মানসে স্বামীজী তাই সূর্য-প্রতীক।

শক্তির সাধনা, জীবন-বোধন, স্বার্থত্যাগের অপরাজেয় দীক্ষা, আত্মত্যাগের নিঃসীম আকূতি ও সেবাধর্মের অনির্বাণ ব্রতপালনের আবেদনে তরুণ-মানসে স্বামীজী সত্য-সুন্দর। তরুণ-মনে স্বামীজী তাই মাত্র শ্রদ্ধার আসনে মাননীয় নন, ভালোবাসার ঐকান্তিক নিবেদনে মর্মস্পর্শী। স্বামীজীর তরুণ-সমাজের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস আর অপরাজেয় আশাবাদে ভালোবাসার এই প্রাণঢালা আকূতি আরও সত্য হ'লো।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, দেশমাতা এবং আদর্শবাদের আবেদনে অপরিসীম শক্তির অনির্বাণ আগুনে এদের মতো আর কেউ জ্বলে উঠতে পারে না। তাই স্বামীজী বার বার তাঁর শক্তিমন্ত্রে তারুণ্য-শক্তিকে সংহত জাগরণে প্রবুদ্ধ করেছেন। তিনি আরও মনে করতেন, মূর্তকল্যাণ-জীবনসাধনাই যথার্থ সাধনা;—এই সাধনার বোধন-ভূমি যৌবন। তিনি অনুভব করেছিলেন, যৌবনেই যদি তরুণ-সমাজ বোধনসিদ্ধ না হ'য়ে উঠতে পারে, তা'হলে উত্তর-কালের জীবন-সাধনা ব্যর্থ হবে। তাই মাতৃ-হৃদয়ের দরদ আর ভালোবাসা নিয়ে তিনি তরুণ-সমাজকে দেখেছিলেন। তাঁর জীবনে 'মানুষ গড়ার' আদর্শ-ই সত্য হ'য়ে উঠেছিল। স্বামীজীর সমকালের তরুণ-সমাজ তাই তাঁকে 'আদর্শের সত্য-রূপ' বলেই মেনে নিয়েছিল এবং বিবেকানন্দের উপদিষ্ট পথে জীবন-রচনায় ব্রতী হয়েছিল। স্বামীজীর জীবন-

বোধনের অগ্নি-মন্ত্রে উদ্বেলিত তরুণ-সমাজ আত্ম-নিবেদিত শক্তি-বোধিত চিত্তে জাতির ভার মোচন করতে ছুটে এলো। সংকীর্ণতার অর্গলবদ্ধ রুদ্ধ দুয়ার ভেঙে ফেলে তারা আকাশ-লুণ্ঠিত আলোকে আমন্ত্রণ জানাল।

তরুণ-মানসে স্বামীজীর আবেদন সমকালীনতার সীমা পেরিয়েও সত্য। আমাদের বিশ্বাস, শতরেখ জটিল সাম্প্রতিক কালেও সে আবেদন কণামাত্র কম নয়। সাম্প্রতিক জীবনজিজ্ঞাসা জটিলতার অমিত ভারে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠছে। উত্তরকালের জীবন-সাধনা বিড়ম্বনায় ক্লান্ত, মন্থর। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমাদের কালের তরুণ উদ্‌ভ্রান্ত, চকিত, শিহরিত। এই ভারসাম্যহীনতার কারণনির্ণয়ে দার্শনিক বিতর্কের অবতারণার কারণ আছে বলে মনে করিনে; জীবনের প্রতি বিশ্বাসহীনতা আর সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার অভাবই এই জীবন-অনটনের কারণ বলে মনে হয়। তারুণ্য-শক্তির সাবলীলতাকে আমরা কি সর্বাংশে স্বীকার করি? আজ আত্মসমীক্ষিত সত্যের প্রয়োজন, জীবন-বোধনের সাগ্নিক আবেদনে স্বামীজীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হ'বে। সত্যোদ্দীপ্ত জীবন-সাধনার সাবলীল প্রয়াস যে কেমন অপরাজেয় বীর্যসুন্দর হ'তে পারবে—নেতাজীর জীবন তার দ্যুতিময় আলেখ্য। স্বামীজীর অভীঃমন্ত্র-অনুসরণে এ জীবন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আত্মনিবেদনের বলিষ্ঠ শপথে এই অগ্নি-দীক্ষা আবার আমাদের নিতে হবে। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের কুটিল কালো পথে আবার আলোর জোয়ার আনতে হবে। অনাগত ভবিষ্যৎ গভীরপ্রতীক্ষারত। তরুণ-শক্তিকেই আগামীর দর্শন রচনা করতে হবে। বিবেকানন্দ-বীক্ষণ তাই আজ অনিবার্য।

শক্তি-সাধনা, জীবন-বোধন, অপরাজেয় স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগের বিপুলতা এবং সেবা-ধর্মের অনির্বাণতাই তরুণ-ধর্মে আচরণীয় বলে স্বামীজী নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক তরুণ-জীবনেই এই পাঁচটি সত্যকে অবশ্যপালনীয় করে তুলতে হবে। এ ছাড়া তাদের জীবন-সাধনা অনিবার্য ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত হবে। কিন্তু এই সাধক-জীবনের জন্যে স্বামীজী সাতটি অনুজ্ঞাও নির্দেশ করেছেন। অবশ্য-পালনীয় এই সাতটি অনুজ্ঞা হ'লো: শক্তি, আদর্শনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য, চরিত্র, শ্রদ্ধা এবং ত্যাগ ও সেবা। এই সপ্ত-অনুজ্ঞা-আচরণ ভিন্ন তরুণ-জীবন অসম্পূর্ণ এবং অসার্থক। বিশ্ব-কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বহুভাবে একথা বলেছেন।

শারীরিক দৌর্বল্য অন্যান্য দুর্বলতাও আনে, দুর্বল জাতির সৃষ্টি করে। দুর্বল জাতি কখনও বৈদেশিক শক্তিশালী জাতি বা আক্রমণকারীর কাছে মর্যাদা পায় না। ভারতের বার বার পতনের কারণও তাই,—এই কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা বিদেশী শক্তির দ্বারা শোষিত এবং বঞ্চিত হয়েছি। জাতীয় দুর্বলতাই দাসত্বের সোপান রচনা করে। বলিষ্ঠ-দেহমনবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দাসত্ব থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করে। বিবেকানন্দ ইতিহাসের প্রামাণ্য সত্যের উদাহরণ তুলে বলেছেন যে, এই দৈন্য ভারতবর্ষে চিরকাল ছিল না। ভারতবর্ষের তপোবনে প্রথমে 'সামরব'-ই মাত্র ধ্বনিত হয়নি, জাগতিক উন্নতিসাধক বিদ্যায়ও অনেক কিছু সে দিয়েছে। স্বামীজী বলেছেন,—যদি সেই গৌরবময় দিন আমাদের ফিরিয়ে আনতে

হয়,—তা' হ'লে বীর্যধর্মী জাতি গঠন করতে হবে। তরুণ-সমাজ-ই আগামী দিনের জাতীয় প্রতিশ্রুতি। তাই তরুণদেরই প্রথমে শারীরিক শক্তিতে সবল হ'তে হ'বে। 'লৌহদৃঢ় পেশী আর ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ু' তৈরী করতে হ'বে। তরুণ-সমাজকে শরীরচর্চা, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, মল্ল-ক্রীড়া প্রভৃতিতে পারদর্শী হ'তে হ'বে। তরুণ-বয়সে স্বামীজী-ও এ সব বিষয়ে পারদর্শী হ'য়ে উঠেছিলেন। বহুবিধ ব্যায়াম, সাঁতার এবং ক্রীড়াদিতে স্বামীজী নিপুণ ছিলেন। শরীর দুর্বল হলে অধ্যাত্মতাব ধারণা হয় না, স্বামীজী তাই বলেছিলেন—দেহ সবল হলে গীতার মর্ম আরও ভালভাবে বোঝা যায়-গীতার মর্ম বুঝতে হলে আগে সবল হও।

তরুণ-সমাজের অনুসরণযোগ্য আদর্শ জলন্ত হওয়া চাই। স্বামীজী সেই আদর্শের সূর্য-ভাস্বর প্রতীকরূপে কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের পার্থ-সারথিকেই তরুণ-সমাজকে গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন,—যমুনাতীরের শ্রীকৃষ্ণ নন। 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে'র পার্থসারথির মতো এমন বিদ্যুৎ-বীর্যের কশা হানতে আর কে পারে? পাপে আসক্ত শত্রুনিধনে শপথ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ শ্রীপার্থ যখন বিপক্ষে আত্মীয় এবং পূজনীয়গণকে দেখে ক্লৈব্য-আচ্ছাদিত হয়ে গাণ্ডীব ত্যাগ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-ই তখন তাঁকে মোহমুক্ত ক'রে বীরের ধর্ম আপসহীন ন্যায়-সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আর্য! ভীরুতায় জরাক্রান্ত হইও না; ওঠ, জাগো, অস্ত্র তুলিয়া লও।" স্বামীজী বলছেন—আমরা ভারতীয়রা সেই বীর্যভ আর্যরক্ত বহন করি, আজ আমাদের প্রয়োজন গীতার সেই সিংহনাদী শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করা, শস্ত্রপাণি রাম এবং মহাশক্তি কালীকে বরণ করা। তাঁদের ভাবে আজ তরুণ-সমাজকে বীর্যধর্মে রাজসিক হ'তে হ'বে, সংগ্রামী ও শক্তি বোধক হ'তে হ'বে।

ব্রহ্মচর্য এবং সন্ন্যাস সম্পর্কে আধুনিক মনে, বিশেষকরে তরুণ মনে প্রশ্ন আছে। অন্ধভাবে কোন কিছু অনুসরণ করা সংস্কার নিশ্চয়ই, কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষার অহঙ্কারে ভারতের সব কিছুকেই পরিত্যাজ্য বলা—এ-ও এক প্রকার সংস্কার-অন্ধ মনের বিকার। শুভসংস্কার ত্যাগ করব কেন? পাশ্চাত্যশিক্ষায়ও প্রবুদ্ধ স্বামীজী ব্রহ্মচর্যপালনের অতি শুভ ফল অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তরুণ-সমাজকে ব্রহ্মচর্যপালনের আহ্বান জানান। ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যা দিয়ে স্বামীজী বলছেন,—'দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির সংহতির জন্য ব্রহ্মচর্য অবশ্য-পালনীয়।' স্বামীজী আদর্শনিমগ্নতা-ই চেয়েছেন। অধ্যাত্মবাদীদের জীবনে এ সত্য উপলব্ধ যে, ব্রহ্মচর্য-পালনের ভেতর দিয়েই তাঁরা অমিত মানসিক ও চারিত্রিক শক্তির অধিকারী হন। যৌন-সংযম অবিশ্বাস্য রকমের মানসিক শক্তির সৃষ্টি করে, মানুষকে ওজঃ শক্তিতে বলীয়ান করে। স্বামীজীর নিজের জীবন-ই ব্রহ্মচর্য-ফলশ্রুতির সত্য-সুন্দর উদাহরণ। স্বামীজীকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকখণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে ফেলতে এবং প্রশ্নের উত্তরে ঐ গ্রন্থ-গুলিরই ভাষায় উদ্ধৃতি তুলে উত্তর দিতে দেখে জনৈক শিষ্য বিস্মিত হন। ঐ ব্যক্তিকে স্বামীজী বলেছিলেন যে, ব্রহ্মচর্য-ই এই অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তির উৎস, এবং এই ব্রহ্মচর্যের অভাবে আমাদের দেশের যা কিছু মহান তা আজ যেতে বসেছে।

মানুষের জীবনের আদি এবং অকৃত্রিম সম্পদ—চরিত্র। স্বামীজী এই চরিত্রগঠনের দিকে তরুণ-সমাজকে দৃষ্টি দিতে বলছেন। তারুণ্যই চরিত্রগড়ার দৈহিক ও মানসিক শক্তি সংহত করার উষাকাল। স্বামীজী কেবলমাত্র লৌহদৃঢ় পেশী আর ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ু গঠনের কথাই বলেননি—তিনি অপরাজেয় ইচ্ছা-শক্তিও গঠন করতে বলেছেন, যা বিশ্বের চরম প্রতিকূলতাকে প্রতিহত ক'রে জীবনের উদ্দেশ্যকে পরম সফলতায় পূর্ণ ক'রে তুলবে, আদর্শকে আজীবন ধরে থাকার শক্তি দেবে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরণ-জয়ের হাসি হাসবে। মানুষের অবচেতন মনের অতল হ'তে 'করা'র আবেদন চিন্তা এবং ইচ্ছা চেতন মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষ তারই অনুবর্তী হয়ে কর্তব্য পালন করতে প্রাণিত হয়। এর-ই মিশ্রিত রূপ চরিত্র। যদি মানুষের এই চিন্তা এবং সৎ হয়,—চরিত্রও সুন্দর হবে। অন্যথা ক্লেদ উৎক্ষিপ্ত হ'বে। স্বামীজী বলছেন, চরিত্র হলো—একগুচ্ছ স্বভাব। স্বামীজী স্বভাবকে দ্বিতীয় চরিত্র বলে স্বীকার করেন না; বলছেন—স্বভাব প্রথম চরিত্র-ই। কেননা, মানুষের সামগ্রিক চরিত্র-ই হচ্ছে স্বভাবের প্রতিফলন! সুতরাং, স্বাস্থ্যপ্রদ চিন্তা ও কাজ, সুচারু ইচ্ছা এবং সুন্দর পরিবেশ-সৃষ্টির প্রয়াস-ই মানুষকে উন্নতচরিত্র করে তোলে। তিনি তরুণ-সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন,—অর্থ, যশ, খ্যাতি এবং শিক্ষা মানুষকে কিছুই দিতে পারে না—যদি চরিত্র অবনমিত হয়। উন্নত চরিত্র এবং প্রেম মানুষকে অভেদ্য প্রতিকূলতা পেরিয়ে নিয়ে যায়। যদি আমাদের শক্তিশালী জাতি হিসেবে স্বজাতির সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়—তা হ'লে প্রথমেই আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠন করতে হ'বে।

বিশ্ব-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, কোন জাতির ইতিহাসের অন্তর্নিহিত অর্থ-ই হচ্ছে সেই জাতির জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস। যে জাতি নিজস্ব দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, সে জাতি কখন-ই স্বাতন্ত্র্য-তীক্ষ্ণ পরিচয় নিয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সম্প্রতি আমাদের দেশে কিছু ভিন্নতর মানসিক হাওয়া বইছে, ঘূর্ণীও তুলছে এবং ভারতীয় জীবন-বোধের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার দুর্যোগের অশনি-সংকেত দিচ্ছে। আমাদের তরুণ-সমাজকে আজ এই অশুভ সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ক'রে স্বাজাত্য-শ্রদ্ধায় উন্নীত হ'তে হ'বে। অন্ধ মানসিকতায় স্বাজাত্য-শ্রদ্ধাহীনতায় একদা পতিত আজকের পূর্বাঞ্চল ইয়োরোপ আমাদের কথিত সত্যের স্বাক্ষর বহন করছে। আত্ম-শ্রদ্ধাশীল জাতি-গঠনের প্রাথমিক সোপান আত্মশ্রদ্ধাময় ব্যক্তিত্বগঠন। শৈশব থেকেই এই শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্বগঠনে প্রয়াসী হ'তে হবে; শিশুকে বলতে হবে—"তুমি কঠোর সংযমী, হও।" স্বামীজী বলছেন,—শিশুর কানে কানে রূপকথার কাহিনী নয়, বলতে হবে বীর্যধর্মের কাহিনী। ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়ে শিশুকে দোলায় শোয়ালে চলবে না, রানী মদালসার মতো তাকে আত্মার মাহাত্ম্য শোনাতে হবে—নিষ্পাপ মহান্ হবার গান শোনাতে হবে, —যে গানের সুরে সুরে শিশু মাতৃ-মুখের দিকে তাকিয়ে সূর্য-ভাষার অগ্নি-বাণী পাঠ করবে। মানুষের জীবন তার ইচ্ছা-অনুশীলনেরই পরিণতি। মানুষ যদি অনিবার্যভাবে মহান্ হতে চায়, মহত্তে পরিণতি তার অনিবার্য। শ্রীবুদ্ধ বলেন,—মানুষ তার অনুশীলিত কর্মের

মধ্য দিয়েই দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। এই সত্য আজ তরুণ-সমাজকে অনুধাবন করতে হবে। বিশ্বে এমন কিছু নেই, যা তারা করতে পারে না। জীবন সম্পর্কে অমিত শ্রদ্ধা-ই সব কিছু করার পাথেয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসের শক্তিমন্ত্রে নতুন সৃষ্টির সূর্য-তোরণ খুলে দিয়েছেন। স্বামীজী বলছেন,—আমাদের জাতীয় জীবনে যদি কোন পতনচিহ্ন থাকে, তা' এই শ্রদ্ধায় বিশ্বাস-হীনতা। আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথমে চাই এই আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস না হলে জাতীয় জীবনে সংহতি আসবে না,—জাতীয় কল্যাণে আত্মত্যাগ পূর্ণ হবে না। উত্তরকালে ঝড়-দুর্যোগের কেশর ধরে নেতাজী বলছেন,—চাই বিশ্বাস, একতা এবং আত্ম-বলিদান। স্বামীজীর জীবনে এই শ্রদ্ধার সাধনা ছিল অনির্বাণ। তিনি তরুণ-সমাজকে তাই নচিকেতার আদর্শ অনুসরণ করতে বলছেন, যার জীবন-বিশ্বাসের কাছে মৃত্যু পরাজিত হলো। স্বামীজী বলছেন,—হে তরুণ, সাহস অবলম্বন কর, ওঠো, জাগো, ভীরুতার ভার বর্জন কর, তোমরা বীর্যময় হও, স্বর্গের বজ্রপাণি দেবতার কাছেও তোমরা পরাজয় স্বীকার করবে না। এমন মরণজয়ী আহ্বানেও কি আমরা উদ্বোধিত হবো না ?

স্বামীজীর দ্যুতিময় জীবন কেন আমরা অনুসরণ করব ?—তাঁর জীবন ভালোবাসা, ত্যাগ ও সেবার অগ্নিমূর্তি। তাঁর বিশ্বপ্রেম, আত্মত্যাগ আর অনির্বাণ সেবাধর্ম তরুণ-সমাজকেই তো আকর্ষণ করবে। স্বামীজীর সমুদ্রহৃদয়, যেখানে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণ, তাঁর অপূর্ব আত্মত্যাগ—যা' কল্যাণের মূলমন্ত্র তা' তরুণ-সমাজ হৃদয়ভরে নেবে না ? বিবেকানন্দ দারিদ্র্য-পীড়িত, অভাব-শোষিত ভারতের জনগণকে যেমন ক'রে কাছে টেনেছিলেন—তার কি তুলনা হয় ? আজ যখন অবাক চোখে সর্বহারার শাপমুক্তির মেহনতী সংগ্রামকে গদীর লড়ায়ে পরিণত হ'তে দেখি, তখন বার বার সেই কম্বুকণ্ঠধ্বনি শুনতে চাই—হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত শতজীর্ণ গৃহ-প্রাঙ্গণচারী যে হৃদয় তাদের দুঃখ দূর করার উপায় খুঁজতে কান্নায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিল, যে নির্ভীক কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল : তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া বল —মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের মৃত্তিকা···আমার বার্ধক্যের বারাণসী। কবি যাদের "আধ মরাদের" ঘা মেরে বাঁচাবার মন্ত্র নিতে বলছেন,—সেই দুরন্ত কাঁচা তরুণ-সমাজ স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না ? স্বামীজী যেমন করে—"ওই সব নিঃসহায় মানুষদের দুঃখ, বেদনা এবং যন্ত্রণাকে"—আপন করে নিয়েছিলেন, আজকের তরুণকে ঠিক তেমনি করেই জনসেবার ব্রত নিতে হবে। সেবা-ব্রত হবে ক্ষণিকের 'পুলক' নয়—আত্ম-নিবেদিত 'সাধনা'। এই সেবাব্রতের দুর্নিবার আহ্বানে স্বামীজী আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ করে ভারতীয় জন-জীবনের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ব্যথাকরুণ রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হৃতসম্পদ অসহায় জীবনের অন্তর্জ্বালার দুঃসহ কাতর ক্রন্দন তাঁকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছিল। দেশবন্ধু যাদের 'নারায়ণ' বলে অন্তরের অর্ঘ্য দিয়েছেন, স্বামীজীই ভারতের প্রান্তে প্রান্তে তাদের দেখেছিলেন। 'ওই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে' ভাষা আর 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশা ফুটিয়ে তোলার ভার তাঁকে দিয়েছিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। এ ভার স্কন্ধে নিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি অতুল ঐশ্বর্যের মিনারে যারা বসে আছে, তাদের দ্বারে দ্বারে আবেদন জানালেন—সাহায্যের আবেদন, ত্যাগের আবেদন, সেবার আবেদন;—কিন্তু রুদ্ধ দরজার পাষাণ-ফলকে সেই কাতর আবেদন অধিকাংশ স্থলেই প্রতিহত হলো,—পাত্র পূর্ণ হ'লো না। প্রাচ্য-অসহযোগিত সন্ন্যাসী নীল সাগরের ঢেউ পেরিয়ে পশ্চিম জগতে পাড়ি দিলেন। পশ্চিম শুধু দ্বার খুলেই দিল না—শ্রদ্ধানত নিবেদনে সন্ন্যাসীর অঞ্জলি পূর্ণ করে দিল। পশ্চিম-বিজয়ী সন্ন্যাসী মানুষের সেবার তীব্র আবেদন নিয়ে দিকে দিকে সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন—বললেন, ভগবানের সেবার আগে তাঁর সন্তানদের সেবা কর। তাঁর সন্তানদের সেবাই তাঁর সেবা। বললেন,—Give them bread first, then religion. গুরুর কথা ভোলেননি তিনি—"খালি পেটে ধর্ম হয় না।" সাহায্যের আবেদন নিয়ে স্বামীজী যখন আমেরিকা ঘুরছেন, তখন তিনি তাঁর সেবা, সহানুভূতি এবং সংগ্রামের স্বরূপ নির্ণয় করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজী বলছেন, "গীতার আদর্শ অনুসরণ কর, ফলে আশা না রেখে কাজ করে যাও।" স্বামীজী ত্যাগ ও সেবার আদর্শে নিজেকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন, সমগ্র জীবন ধরে তিনি নিষ্করুণ নির্মম প্রতিকূলতা সয়েছেন, অনাহারক্লিষ্ট জনজীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে নির্মম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন; আর এই প্রতিকূলতা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথকে তীক্ষ্ণ করেছেন। স্বামীজী রক্তের অক্ষরে লিখছেন:

"গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন আস্থা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকি দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া এবং মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত ধনী ও বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর আমার স্বদেশের লোকরাই যখন আমায় জুয়াচোর ভাবে, তখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিলে কত কীই না ভাবিবে! কিন্তু ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।"—স্বামীজী আর কাউকে আহ্বান জানালেন না, যাদের উপর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস—সেই তরুণ-সমাজকেই আহ্বান জানিয়ে বলছেন, "যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের

আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া, এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর ; বলি—জীবনবলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।” একি শুধু পথনির্দেশ ? না আত্মনিবেদিত সেবাধর্মের সাধনার মন্ত্র ? তরুণ-রক্তে এই মন্ত্রেই তো কূলভাঙা দোলা লাগে। স্বামীজী আরও বলছেন,—Calm and silent and steady work and no newspaper humbug, no name-making, you must always remember.

স্বামীজী ভারতবর্ষকে কেবল যৌবনের উপবন আর বার্ধক্যের বারাণসী বলেছেন তাই নয়,—তিনি ভারত-আত্মার মর্মরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বামীজী শুধু জাতীয় জীবনের পথিকৃৎ ছিলেন না, তিনি জাতীয় সত্তার অতলগভীরে প্রবেশ করে জাতীয় সত্তা-স্বরূপ অন্বীক্ষণ করেছিলেন। ধমনীর শোণিতস্রোতে জাতীয় শোণিত-ধারার স্পন্দন শুনেছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন সুমেরীয়, আবেশিনীয়, ইরান ও মিশরীয় জাতির মতো আমাদের জাতি মরেনি, সভ্যতা বিনষ্ট হয়নি, জাতি নিজস্ব শাশ্বত সম্পদ নিয়ে তন্দ্রিত। জাতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা আর প্রেম নিয়ে সিংহগর্জনে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে বিদ্যুৎ-কষান্বিত আহ্বান জানালেন,—ওঠো, জাগো, এগিয়ে চলো, লক্ষ্যলাভের আগে থেমো না। চরৈবেতি চরৈবেতি।—সাধনা, ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতিতে নব প্রাণবন্যার জোয়ার এলো। শুধু কি জাগরণ মাত্র ?—না ! বিন্ধ্যাচলের পূর্ব-আকাশে যেদিন প্রথম নতুন সূর্যের অভ্যুদয়—সেদিন থেকে ভারতবর্ষ বিশ্বকে সম্পদ বিতরণ করেছে, বিশ্বসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে ; জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞা-মননে, সাহিত্যে দর্শনে, শিল্পে-স্থাপত্যে, ধর্মে-ব্রতে ভারত চিরন্তন, সত্য ও প্রমূর্ত। তাই অকস্মাৎ জেগে উঠে আমরা সেই বজ্র-ঘোষণা শুনলাম, India has a mission to the world, India has a mission to fulfil. এই 'mission' এবং তা 'fulfil' করার দায়িত্ব কে নেবে ?—স্বামীজী বলছেন—নেবে মরণজয়ী চারণদল—তরুণেরা।

সাম্প্রতিক ভারতের জাতীয় জীবন সমস্যাও জটিলতায় পথহারা। তথাকথিত নেতৃদল লক্ষ্যহীন,—জনতা উদ্‌ভ্রান্ত। এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বলছেন,—দুর্দিনে ডুবতে বসেছি আমরা, এই দুর্দিন থেকে উদ্ধার করতে চাই লক্ষ জোয়ান ছেলে। সাধনার শীর্ষ-শৈল-মার্গে কে তাদের নিয়ে যাবে ? নেবেন—স্বামীজী। স্বামীজীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে অপরাজেয় শক্তি, অনির্বাণ আদর্শ, ইস্পাতদৃঢ় চরিত্রবল, শ্রদ্ধা, নিঃসীম আত্মত্যাগ, এবং অতন্দ্র সেবাব্রত নিয়ে তরুণদেরই নতুন ভারত-রচনায় অগ্রগামী হ'তে হ'বে। নৈতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রবুদ্ধতার সঙ্গে আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানাদি সমন্বিত করতে হবে। আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, এবং বাণিজ্যের হৃত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে ; অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আমরা নতুন ভারতের সৌধ নির্মাণ করব। নেতাজী বলছেন,—We shall build a new

nation of India on the basis of the glorious past. সেই নবভারতের গৌরবময় সৌধনির্মাণশিল্পী হবে তরুণ-সমাজ। সেই ভারতরচনার স্বপ্ন নিয়ে স্বামীজী তরুণদের আহ্বান জানাচ্ছেন: My brethren, this is no time for sleep. On our work depends the coming of the India of the future. She is there ready waiting. She is only sleeping. Arise and awake, and see her seated here on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was—this motherland of ours. এখনও সেই মাতৃ-অভিষেক অসম্পূর্ণ, সেই অভিষেকের জন্য হে তরুণ চারণ-দল, "ওঠো, জাগো, লক্ষ্যলাভের আগে থেমো না।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[গান: দরবারী-কানাড়া, একতালা]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মল্লক্রীড়াতে ধরি দুই হাতে প্রসন্ন হরি কৃপা করে।
কে তুমি হে যতি! ত্যাগের মূরতি হরিপ্রসন্ন নাম ধরে॥
পুরুষোত্তম ভকতি-ভূষণ
ত্যজিলে হেলায় কাম-কাঞ্চন,
নেহারি তোমার ত্যাগ অতুলন
শৌর্য বীর্য প্রাণ ভরে॥
রামকৃষ্ণ-মন্দির-নির্মাণে
বিশ্বকর্মা এলে কি ভুবনে?
স্থাপিয়া প্রভুকে কমল-আসনে
তনু তেয়াগিলে লীলাভরে।
সতত মগন রামের ধেয়ানে
যাপিলে জীবন রামগুণগানে
বিজ্ঞানানন্দ! প্রণমি চরণে
প্রণমি প্রণমি বারে বারে॥

শ্রীকৃষ্ণকথা

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
ভূমৌ ভারতমুত্তমং মধুপুরী তত্রাপি তত্রাপ্যলং
বৃন্দারণ্যমিহাপি হন্ত পুলিনং তত্রাপি রাসস্থলী
রাধাকান্তপদদ্বয়ীপরিচয়প্রাচুর্যপর্যাপিতা
যস্যাং সন্তি মহামুনেরপি মনোরাজ্যার্পিতা
রেণবঃ॥

অর্থাৎ—পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, ভারতের মধ্যে মথুরাপুরীই উত্তম স্থান, মধুপুরী হইতে বৃন্দাবনধাম উত্তম, বৃন্দাবনের মধ্যে যমুনাপুলিন অতি উত্তম সাধনের স্থান, এবং যমুনাপুলিন হইতে রাসমণ্ডল সর্বোত্তম; অর্থাৎ যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছেন, সেই স্থানের মহিমার তুলনা হয় না, কারণ যে রাসস্থলীর ধূলিসকল মহামুনি শুক শৌনক জনক যাজ্ঞবল্ক্যাদির মনোরাজ্যের দ্বারা পূজিত হইয়া অদ্যাবধি বিরাজিত।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ববৃত্তান্ত

শ্রীভগবান স্বরূপে স্বরূপবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিরূপে, স্বরূপশক্তিবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপে, স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাসরূপে নিত্য বিরাজিত। স্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। স্বরূপবিলাস শ্রীবলরাম ও শ্রীনারায়ণ। স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা। স্বরূপশক্তিবিলাস শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীলক্ষ্মী, স্বরূপশক্তিবৃত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব, স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাস বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ। বিশুদ্ধ সত্ত্বের ৪টি আকার—সন্ধিনীবৃত্তিপ্রধান, সম্বিদ্‌বৃত্তিপ্রধান, হ্লাদিনীবৃত্তিপ্রধান, ও যুগপৎ বৃত্তিত্রয়প্রধান। সন্ধিনীবৃত্তিপ্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ শ্রীগোলকধামাদি, সম্বিদ্‌বৃত্তিপ্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ জ্ঞান, হ্লাদিনীবৃত্তিপ্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ ভক্তি। শ্রীরামাদি অবতারসকল স্বরূপবিলাসের অংশ। শ্রীভগবানের স্বরূপ মধ্যম অর্থাৎ নরাকার হইয়াও সর্বগ, অনন্ত ও বিভু। শ্রীভগবানের স্বরূপাদি সমস্তই চিদানন্দময়। তিনি চিদানন্দময় ধামে চিদানন্দময়ী মূর্তিতে চিদানন্দময় বসনভূষণাদি ধারণপূর্বক চিদানন্দময় পরিকরবর্গের সহিত চিদানন্দময়ী লীলাসকল সম্পাদন করিতেছেন। তদীয় ধামের ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, সরিৎসরোবরসকল অমৃততোয়োময়। কথাসকল সঙ্গীতময়, গতিবিধি নাট্যময়, উক্ত ধামাদির প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুইটি অবস্থা শোনা যায়।

শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশ হইলে উহাকে প্রকট লীলা বলা হয় এবং প্রকাশ না হইলে অপ্রকট লীলা বলা হয়। যখন যখন ধর্মের গ্লানির সহিত অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। ধর্মসংস্থাপনই উক্ত প্রকাশের উদ্দেশ্য। ধর্ম ত্রিবিধ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক ধর্ম ভূতভাব বা উপাধিভাব, আধিদৈবিক ধর্ম দেবভাব, এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম আত্মভাব। উপাধিভাব স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্বভেদে দ্বিবিধ। আত্মভাব জ্ঞানিত্ব ও প্রেমিকত্বভেদে দ্বিবিধ। ঐ সকল ধর্মের স্থাপনার্থ স্বয়ং ভগবান অংশতঃ বা পূর্ণতঃ প্রপঞ্চমধ্যে প্রকটিত হন। তন্মধ্যে স্থাবরত্ব ও জ্ঞানিত্ব পর্যন্ত ধর্মসকলের

সংস্থাপনার্থ শ্রীভগবানের অংশতঃ প্রকাশ এবং কেবল প্রেমিকত্ব-ধর্মের সংস্থাপনার্থ তাঁহার পূর্ণতঃ প্রকাশ স্বীকৃত হয়।

যখন যখন সংসারে প্রেমবিতরণের প্রয়োজন হয় তখনই শ্রীভগবান পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। প্রেম চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তির বৃত্তি। অতএব প্রেমবিতরণকালে শ্রীভগবান চিদানন্দময় পরিকরবর্গের সহিত আবির্ভূত হন। শ্রীভগবান সপরিকর আবির্ভূত হইলেই স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপ প্রেম জীবশক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। প্রেমলাভে জীবশক্তির স্বরূপ-শক্তির সহিত সমভূমিকতার প্রয়োজন। সপরিকর শ্রীভগবানের আবির্ভাবে সিদ্ধ ও সাধকের পরস্পর সম্মিলনেই উক্ত সমভূমিকতা হয়। অন্যথায় উহা সম্ভব নয়। দাতা ও গ্রহীতার সমভূমিকতা ব্যতিরেকে দান ও গ্রহণ সুসিদ্ধ হইতে পারে না। আবার যাহা যাঁহার দান করিবার অধিকার আছে তিনিই তাহা দান করিতে পারেন। এবং যাঁহার যাহা গ্রহণ করিবার অধিকার আছে তিনিই তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। স্বরূপশক্তির স্থান সিদ্ধভূমি, জীবশক্তির স্থান সাধকভূমি, সিদ্ধ ও সাধক-ভূমির একত্র সমাবেশ ভিন্ন সমভূমিকতা ঘটিতে পারে না। আবার স্বরূপশক্তির নিজ সম্পত্তি যে প্রেম, তাহা স্বরূপশক্তি ভিন্ন অপর কেহ দান করিতে পারে না। এবং অসিদ্ধদেহসম্পন্ন জীব সিদ্ধ দেহের লাভ ব্যতিরেকে ঐ প্রেম গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয় না। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ জড়দেহ পরিত্যাগপূর্বক তুরীয় চিদানন্দময় সিদ্ধ দেহের প্রাপ্তি ব্যতিরেকে হ্লাদিনী সম্বিৎ সারভূতা প্রেম-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায় না। গুরুদত্ত বা ভগবদ্দত্ত সিদ্ধদেহ বা শ্রুত্যুক্ত হিরণ্ময়কোষ সাধক জীব শ্রীভগবানের পূর্ণাবতারকালে তদীয় স্বরূপশক্তির গর্ভ হইতেই লাভ করিয়া থাকেন। যেমন অদৃশ্যকায়সম্পন্ন পিতৃগণ অদৃশ্য কারণ-দেহসকল প্রসব করেন, যেমন মনোময়দেহসম্পন্ন দেবগণ মনোময় সূক্ষ্ম দেহসকল প্রসব করেন, যেমন উদ্ভিজ্জাদি জরায়ুজাত দেহসম্পন্ন প্রাণী উদ্ভিজ্জাদি জরায়ুজাত স্থূল দেহসকল প্রসব করে, তদ্রূপ চিদানন্দময় সিদ্ধদেহসম্পন্ন শ্রীভগবৎপরিকরসকল চিদানন্দময় সিদ্ধ দেহ-সকল প্রসব করিয়া থাকেন। সাধক শ্রীগুরুর অনুগত হইয়া সাধন করিতে করিতে তদীয় কৃপায় সিদ্ধ ভাবাভিমুখে আকৃষ্ট ও সিদ্ধ-দেহোপযোগী প্রেম লাভ করিবার অধিকারী হইলেই তৎকালে যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবান্ পূর্ণতঃ সপরিকর আবির্ভূত হইয়া লীলা করিতে থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডে গমন এবং যথাযোগ্য সিদ্ধ দেহ ও তদুপযোগী প্রেম লাভ করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে দেশকালাদিজনিত কোন বিঘ্নই বাধা প্রদান করিতে পারে না। এই প্রকারেই শ্রীভগবানের ধর্মসংস্থাপনকার্য সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

অতীত দ্বাপরযুগের শেষভাগে শ্রীভগবান পূর্ণতঃ সপরিকর এই ব্রহ্মাণ্ডে এই ধরাধামে এই ভারতবর্ষমধ্যে মথুরামণ্ডলে আবির্ভূত হন, ঐ সময়ে যে প্রেমরূপ আধ্যাত্মিক ধর্ম-স্থাপনের প্রয়োজন হয় তাহা বলা বাহুল্য। আর শ্রীভগবান স্বয়ং পূর্ণতঃ আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপ আধ্যাত্মিক ধর্মের সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই নিজ আবির্ভাবান্তর দ্বারা অসাধুগণের সংহার ও সাধুগণের পরিত্রাণপূর্বক ভূভারহরণও সাধন করেন। ইহা তদানীন্তন ইতিহাসপাঠেও বিদিত হওয়া যায়। ঐ সময়ের কিছু পূর্বের যে ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

অতীত দ্বাপরযুগের শেষভাগে অনেকানেক

অসুর এই ধরাধামে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। প্রধান প্রধান অসুরসকল ক্ষত্রিয়কুলে রাজবংশে উৎপন্ন হন। উঁহাদিগের অনুবর্তী অন্যান্য অসুরও এই পৃথিবীতে বিবিধ মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রায়ই যজ্ঞ-বিঘ্নকারী ও দেবদ্বিজবিদ্বেষী হন। এবং অধর্মই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন হয়। কেহ কেহ আবার ধর্মের নাম দিয়া অধর্মের রাজ্যও বিস্তার করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের ভারে আক্রান্ত হইয়া ধরিত্রীদেবী গোরূপ ধারণপূর্বক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, পিতামহ অপরাপর দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভূভারবৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে ক্ষীরোদসমুদ্র-তীরে গমন করেন।

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত॥
ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥
গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥
পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥
বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥
ঋষয়োঽপি তদাদেশাৎ কল্প্যন্তাং পশুরূপিণঃ।
পয়োদানমুখেনাপি বিষ্ণুং তর্পয়িতুং সুরাঃ।

—তৎপরে ব্রহ্মা ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া সমাধিস্থ হইয়া দেবাদিদেব কামবর্ষী জগৎ-পিতা পুরুষোত্তম ভগবানকে পুরুষসূক্ত দ্বারা উপাসনা করিলে সমাধিলব্ধ ভগবানের আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাসকলকে বলিয়াছিলেন: হে দেববৃন্দ, আমি যাহা ভগবদ্বাক্য সমাধিতে উপলব্ধি করিয়াছি আপনারা তাহা শ্রবণ করিয়া সেইরূপ আচরণ বা অনুষ্ঠান শীঘ্র করুন অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন, আমি আপনাদের জানাই-বার পূর্বে পৃথিবীর দুঃখ জানিয়াছি, আপনারা সম্প্রতি ইন্দ্রাদি দেবতাসকল নিজ নিজ অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করুন। যতদিন পর্যন্ত সেই পরমেশ্বর নিজ কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার নাশ করিয়া ভূলোকে অবস্থান করেন এবং সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন পর্যন্ত আপনারা আপনাদের ভগবৎপ্রীতির জন্য সপরিবার যদুবংশে আবির্ভূত হউন। এবং ঋষিসকলও ভগবানের আদেশে গোরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দুগ্ধাদিদানে সন্তুষ্ট করাইবার জন্য পশুকুলেও কোন কোন দেবতা জন্মগ্রহণ করুন। এইরূপে দেবতাদিগের ধরাতলে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভগবানও সপরিকর আবির্ভূত হন।

ভগবানের আবির্ভাবের স্থান মথুরামণ্ডল। উহা যাদবদিগের রাজ্য। ঐ রাজ্যের রাজ-ধানীর নাম মথুরা। মথুরা হইতে কিয়দ্দূরে নন্দীশ্বর নামে গিরি। এই গিরি এখনও বর্তমান আছে। উক্ত গিরির অধিত্যকা প্রদেশে পর্জন্য নামে সর্বসদ্গুণসম্পন্ন এক গোপ বাস করিতেন। ইনি যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের পুত্র, নিরতিশয় ধার্মিক ছিলেন। যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াও বৈশ্যাগর্ভে জন্মবশতঃ ইনি

বৈশ্যজাতিমধ্যেই পরিগণিত হন ইনি বৃন্দাবনবাসী গোপকুলের প্রধান হন।

শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া ইঁহার ৫টি পুত্র লাভ হয় এবং কেশীনামক দৈত্যের উৎপীড়নে নন্দীশ্বরের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নিজপত্নী বরীয়সীর সহিত মহাবনান্তর্গত গোকুলে আসিয়া বাস করেন। পিতা পর্জন্য পরলোকগমন করিলে মধ্যম পুত্র নন্দ গোকুলে গোপরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। পর্জন্যগোপের শূর নামে একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শূর ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত বলিয়া ক্ষত্রিয় ছিলেন। শূরের বসুদেব নামে একটি পুত্র হয়। বসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। বসুদেবের সহিত গোপরাজ নন্দের ভ্রাতৃসম্পর্ক এবং পরস্পরের মধ্যে অতিশয় সৌহার্দ্য ছিল। বসুদেব মথুরাধিপতি উগ্রসেনের ভ্রাতৃকন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করেন। উগ্রসেনের কংস নামে একটি ক্ষেত্রজ পুত্র ছিল। রাজা সৌভপতির ঔরসে উগ্রসেন-পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে কংসের জন্ম হয়। বসুদেব যৎকালে দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন ঐ কংস ভগিনী ও ভগিনীপতির রথের সারথি হইয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে থাকেন। পথিমধ্যে অকস্মাৎ একটি দৈববাণী হয়: "রে অজ্ঞ, তুমি যাঁহার সারথ্য করিতেছ তাঁহারই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার বিনাশ-কর্তা হইবেন।" উক্ত দৈববাণী শ্রবণ করিবা-মাত্র কংস দেবকীর বধসাধনে উদ্যত হন।

কংস জন্মান্তরে হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমি নামক অসুর ছিলেন, ঐ জন্মে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়া পুনশ্চ কংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াও নিজের জন্মান্তরীণ আসুরিক স্বভাব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি অসুরস্বভাববশতই উদ্বাহপর্বে ভগিনী-বধে প্রবৃত্ত হন। আকাশবাণী শুনিবামাত্র বামহস্তে ভগিনীর কেশাকর্ষণ ও দক্ষিণহস্তে তরবারি উত্তোলন করিয়া দেবকীর মস্তক-ছেদনে উদ্যত হইলে বসুদেব কংসকে নিবৃত্ত করাইবার জন্য প্রথমতঃ বলিলেন: ভাই কংস, তুমি ভোজবংশের প্রধান নরপতি হইয়া বিবাহের দিনে ভগিনীকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ, ইহাতে তোমার যশোহানি হইবে অর্থাৎ সকলের নিকটেই তুমি নিন্দনীয় হইবে, যদি বল ইহার অষ্টমগর্ভের সন্তান আমাকে বধ করিবে, অতএব মারিয়া ফেলাই ভাল; দেখ ভাই, জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, যে সময় তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ তখনই তোমার মৃত্যুর কাল অবধারিত হইয়াছে, আজই হোক বা শতবর্ষের পরে হোক, মৃত্যু নিশ্চয় হইবে। অতএব এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া মৃত্যু প্রার্থনীয় নহে। এই ভাবে বহুতর সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত হইলেও কংস কিছুতেই ভগিনীর বধকার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিলেন না।

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ। ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ॥ তং জুগুপ্সিতকর্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্। বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্॥ শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ। স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বণি॥ মৃত্যু-র্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দ-শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥ এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ। ন ন্যবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ॥ নির্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ। মনসা দূয়মানেন প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বাগাহাশরীরিণী। পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা

যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥ যমূর্ধধান্নিবৃত্তে কংস-স্তদ্বাক্যসারবিৎ। বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্গৃহং ॥

বসুদেব কংসকে নিবৃত্ত করিবার বহুতর উপদেশে বিফলমনোরথ হইয়া মনের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বাহিরে সহাস্যবদনে বলিলেন: ভাই কংস, দৈববাণী যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও তুমি নির্ভয়ে কাল কাটাইতে পারিবে অর্থাৎ মৃত্যুমুখ হইতে কোনরূপ ভয় থাকিবে না বা তোমাকে ইহার গর্ভজাত পুত্র বধ করিতে পারিবে না আমি এরূপ উপায় বলিতেছি শোন: এই দেবকীর যতগুলি পুত্র হইবে, প্রথমটি হইতে ৮৷১০টি যতগুলি পুত্র হইবে, আমি সবগুলি প্রসবের পরই তোমাকে দিব, তুমি ইচ্ছামত সব ছেলেগুলি মারিয়া ফেলিবে; অতএব ভয় কি? উপস্থিত ইহাকে ছাড়িয়া দাও। এইরূপে দেবকীর গর্ভজাত সন্তানসকলের অর্পণের প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাতেই কংস ঐ দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হন। কংস বসুদেবের পুত্রার্পণ-প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত হইয়া দেবকীকে পরিত্যাগপূর্বক নিজগৃহে প্রত্যাগমন করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবস্থান মথুরা।

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥
রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্বযাদবভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥

—পুরাকালে শূরসেন নামে এক রাজা যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মথুরাপুরীতে বাস করতঃ মাথুর ও সুরসেন বহু দেশ শাসন করিতেন। সেই সময় হইতে মথুরা যদুবংশীয় নৃপতি-বৃন্দের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই মথুরাতে ভগবান হরি সর্বদা সন্নিহিত আছেন। অথর্ববেদের অন্তর্গত গোপাল-তাপনী নামক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথা,

মথ্যতে চ জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥

যে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জগৎকে মন্থন করিয়া তাহার সারভূত যে স্থান বিদ্যমান আছে তাহাই মথুরা নামে কথিত হয়।

এবং এই মথুরাধামের নিত্যত্ব পদ্মপুরাণে নির্বাণ খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, যথা,

অহো ন জানন্তি নরা দুরাশয়া
পুরীং মদীয়াং পরমাং সনাতনীং।
সুরেন্দ্রনাগেন্দ্রমুনীন্দ্রসংস্তুতাং
মনোরমাং তাং মথুরাং পরাকৃতিং ॥

অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অশুদ্ধান্তঃকরণ মনুষ্যসকল আমার চিন্ময় নিত্যধাম যে মথুরাপুরী তাহা জানে না। এবং সেই পুরী দেবরাজ ইন্দ্র, নাগরাজ বাসুকি, শুকশৌনকাদি মুক্ত পুরুষগণের দ্বারা সংস্তুত পরমা প্রকৃতির আধারস্বরূপ।

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্ ॥
কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥
কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥
দৃষ্টা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥
প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্।
অষ্টমাদ্ যুবয়ো পুত্রান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥
তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥

—অনন্তর যথাকালে গর্ভধারণ করতঃ সর্ব-দেবতাস্বরূপা দেবকী প্রতিবৎসর এক একটি করিয়া ৮টি পুত্র ও ১টি কন্যা প্রসব করিয়া-

ছিলেন। বসুদেব মিথ্যাকে অতিশয় ভয় করিতেন। এই সময়ে পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া প্রথম পুত্র কীর্তিমানকে অতিকষ্টে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কারণ সাধুদিগের দুঃসহ কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা কোন বস্তুরই অপেক্ষা করেন না। কদর্য মনুষ্যদিগের অকার্যও কিছুই নাই। আর যাঁহারা ভগবান শ্রীহরিতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারে সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে রাজন্, কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠতা ও সাধুতা দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া সহাস্যবদনে এই কথা বলিলেন: তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু-ভয় নির্ধারিত হইয়াছে, এই বালক হইতে আমার ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব এই ছেলেটিকে লইয়া তুমি গৃহে যাও। বসুদেব তদনুসারে পুত্রটিকে লইয়া গৃহে যাইলেন বটে কিন্তু অব্যবস্থিতচেতা দুর্মতি কংসের বাক্যে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা না হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ কংসকে গোপনীয় বার্তা জানাইয়া প্রস্থান করিলে কংস যদুবংশীয় সকলকে দেবতা ও স্বয়ং বিষ্ণুই কংসের বধসাধনার্থে দেবকীর অষ্টম গর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কংস বসুদেব ও দেবকীকে নিগড়বদ্ধ করতঃ কারাগারে রাখিল। এবং তাঁহাদিগের পুত্র জন্মিবামাত্র বিষ্ণু-আশঙ্কায় বধ করিতে লাগিল। এইরূপে ৬টি পুত্রকে বধ করিলে সপ্তম গর্ভে ভগবানের বিলাসমূর্তি শ্রীশ্রীবলরাম আবির্ভূত হইলে ৭ম মাসে দেবকীর উক্ত গর্ভটি যোগমায়া সঙ্কর্ষণ করিয়া অর্থাৎ দেবকীর গর্ভ হইতে বাহির করিয়া গোকুলে অবস্থিতা বসুদেবের অন্য একটি পত্নী রোহিণী দেবীর গর্ভে সঞ্চারিত করিলেন। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে "সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোহংশ সৌম্যো মমাগ্রজঃ। সঃ সংক্রাময়িত-ব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণীম্" ॥ এইরূপ ঘটনা না জানিয়া মথুরাপুরবাসী সকলে বলিয়াছিলেন, দুষ্ট কংস উদরদেশে পদাঘাত করিয়া গর্ভস্রাব করাইয়াছে। ইত্যবসরে শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র দেবকীদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইহাই শ্রীভগবানের আবির্ভাবের পূর্ববৃত্তান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদ

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

দৃশ্য : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রকাল।

একদিকে পাণ্ডব আর একদিকে কৌরব। দুই প্রচণ্ড শক্তির সম্মেলন।

একদিকে ভীষ্ম দ্রোণ-কর্ণ প্রভৃতি মহা-পরাক্রমশালী যোদ্ধারা—কৌরব-পক্ষের প্রতি-নিধি।

আর একদিকে পাণ্ডবগণ। তৃতীয় পাণ্ডব মহাধনুর্ধর অর্জুন আর শ্রীভগবান মধুসূদন তাঁর সারথি।

তুমুল রবে যুদ্ধের নিনাদ ধ্বনিত হ'ল।

কিন্তু অর্জুন—মহাধনুর্ধর অর্জুন মহা-বিষাদসাগরে নিমজ্জিত হ'লেন। না, যুদ্ধ তিনি ক'রবেন না, আত্মীয়বধের মতো মহাপাতক তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন। তিনি জানতেন এমন হবে। তাই বললেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।'

অর্জুন তবু নারাজ।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শোনালেন—আত্মার অমৃতত্ব। বললেন, আত্মা অমর, শাশ্বত। দেহবোধের উর্ধ্বে দেহাতীত আত্মা। সুখ-দুঃখের অতীত। এই আত্মার স্বরূপ জানতে পারলে জীব আর মোহগ্রস্ত হয় না, যুদ্ধের হতাহতের মাঝে বিভীষিকা দেখে না।

অর্জুন বুঝলেন অন্যরকম—তবে আর যুদ্ধের প্রয়োজন কী? এই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা—আত্মস্বরূপে আপন আনন্দে আনন্দময় হয়ে যাওয়াই তো হ'ল জীবের লক্ষ্য।

শ্রীভগবান এবার কর্মযোগের মহিমা ঘোষণা করেন। তিনি তো অর্জুনকে সমত্ব-বুদ্ধি আশ্রয় করতে বলেছেন। কর্ম করতে তো নিষেধ করেননি।

কর্ম করতেই হবে। দেহধারণ করলে কর্ম না ক'রে থাকার উপায় নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, 'নিষ্কাম কর্ম করো, ফলাকাঙ্ক্ষা না ক'রে নিয়ত কর্ম ক'রে যাও।'

এই কর্মের দ্বারাই সৃষ্টির কাজ চলেছে। কর্মের বন্ধন এড়াবার জো নেই কারো। জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ সবই কর্মাধীন। এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান ধরাধামে আসেন লোকহিতের জন্য কর্ম করতে। তবে তিনি একান্ত নিষ্কাম নিস্পৃহ।

আবার এই কর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধন কাটে। যথার্থ জ্ঞানীর পক্ষে এই কর্ম-আশ্রয় মোটেই ভয়াবহ নয়, কারণ জ্ঞানী কর্মের স্বরূপ জানেন। তিনি জানেন, ইন্দ্রিয়াদিই কর্ম করে। আত্মাতে কর্মের কোন বন্ধন নাই। আত্মস্বরূপে জ্ঞানী সবকিছুর উর্ধ্বে।

তবে জ্ঞানীর দৃষ্টি খুব উদার। তাই তিনি বিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই দেখতে পান এই কর্ম-যজ্ঞ। যাজ্ঞিকের যে যজ্ঞ, কর্মীর যে কর্ম, তপস্বীর যে তপস্যা, ধ্যানীর যে ধ্যান, জ্ঞানীর যে জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, শ্রদ্ধাবানের শাস্ত্রাদিতে যে শ্রদ্ধা--সব কিছুর দ্বারাই যেন এক বিরাট যজ্ঞাহুতি চলছে।

জ্ঞানী কিন্তু আত্মস্বরূপ উপলব্ধি ক'রে এই কর্মযজ্ঞের পারে চলে যান।

তবে? অর্জুন আবার প্রশ্ন করেন—তবে তো জ্ঞানমার্গ অবলম্বন ক'রে সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্মের বন্ধন ছিন্ন করাই ভাল। ত্যাগেই তো জ্ঞানীর চরমাবস্থালাভ।

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন—অধিকারিভেদে জ্ঞান ও কর্ম দুই-ই শ্রেষ্ঠ পথ, মুক্তির পথ। আর যে কামনা-মুক্ত সেই তো সন্ন্যাসী। কিন্তু যার কর্মের ইচ্ছা আছে, অথচ কর্ম ত্যাগ করেছে তাঁর পক্ষে মুক্তিলাভ অসম্ভব।

বিষয়-ভোগেই তো কর্মের বন্ধন। কাজেই মন যদি নির্বিষয় হয় তবে আর কর্মের ধর্মাধর্ম-জনিত ফলাফল তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে যোগী কর্ম করেও কিছু করেন না।

এইরূপ যোগারূঢ় ব্যক্তি দেখেন, জগৎ পরমেশ্বররূপেই সত্য। এই আপাত-বৈচিত্র্যময় পাঞ্চভৌতিক জগতে এই এক সনাতন পুরুষকে দেখে তিনি অবিচলিত থাকেন। "কি ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ করবে? তিনি ছাড়া কিছুই নাই। তিনি 'ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ'-রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)

শ্রীভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দেন, 'এইরকম যোগারূঢ় ব্যক্তি শ্রীভগবানের সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্বোপলব্ধি করতে সমর্থ। তবে সহস্র সহস্র যোগীর মধ্যে এইরকম সিদ্ধিলাভে দু'একজনই মাত্র সক্ষম হন।

যোগী শ্রীগভবানের পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা নিঃশেষে জানতে পারেন। সব কিছুর মাঝে তিনি চৈতন্যকেই উপলব্ধি করেন। যোগী তাঁকে সগুণভাবে বিভিন্ন মূর্তিতে নানা দেবতায় রূপায়িত দেখেন আবার নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আপন আত্মায় উদ্ভাসিত দেখেন।

একথায় অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগে—তা হ'লে এই ব্রহ্ম কিরূপ? জীবের মাঝে তিনি কিভাবে থাকেন? জীবের দেহ-মনের স্বরূপ কি? শ্রীভগবান উত্তর দিলেন,—যিনি পরব্রহ্ম তিনি 'অক্ষর'। যে পরব্রহ্মের চৈতন্যে জীব চেতনায়িত, এই চৈতন্যস্বরূপই 'অধ্যাত্ম' নামে অভিহিত। জীবের দেহ-মন যাবতীয় কিছুই বিনাশশীল, তাই এসব অধিভূত। এবং জীবের যাবতীয় কর্মের ভোক্তা 'অধিযজ্ঞ'রূপে ঈশ্বর প্রতিদেহে অবস্থিত।

দেহ-ত্যাগের সময় জীব যে ভাব আশ্রয় করে, সেই অনুসারে তার পুনর্জন্ম হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থেকে উত্তরায়ণের সময় দেহ রাখেন এবং (কল্পশেষে) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। আর সকাম কর্মী দক্ষিণায়ণের সময় দেহ রাখেন এবং কর্ম-ফলানুযায়ী পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।

তবে, শ্রীভগবান অর্জুনকে সান্ত্বনা দেন যে, তাঁকে জানলে কারও ভয় নেই। তাঁকেই একমাত্র জীবনের ধ্রুবগতি করলে জীব অতি সহজেই সংসার-পারে চলে যায়। এই আত্মমন্ত্রে অতি দুরাচার পাপীও অনতিবিলম্বে ধর্মাত্মায় রূপান্তরিত হয়। কাজেই শ্রীভগবানের অভয়প্রদান—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

মানবমনে শ্রীভগবানের মহিমার ধারণা সহজে হয় না। ইহলোকে এর চেয়ে সুকঠিন বিষয় আর নেই। তবে পরমকারুণিক ভগবান স্বয়ং যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তদ্গতচিত্ত ভক্তের নিকট কৃপাপরবশ হ'য়ে নিজের মহিমা প্রকটিত করেন, তবেই ভক্তের পক্ষে এই অতিমানবীয় লীলা বোঝা সম্ভবপর হয়।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত। আবার শুদ্ধচিত্ত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরমাদরের সখা। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ উপযুক্ত আধার অর্জুনকে নিজের মহিমা প্রকটিত ক'রে 'বিভূতিযোগ' বলেছিলেন।

এই বিশ্ব-চরাচর তো ভগবানেরই প্রকাশ। মানুষ দেবতা মহর্ষি—সকল অভিব্যক্তির মূলে তিনিই। যেখানে যা-কিছু শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ সেখানে তো শ্রীভগবানেরই প্রকাশ। তাঁর বিভূতির তো অন্ত নেই।

আনন্দিত, পুলকিত অর্জুন। তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে থাকে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যখন তাঁর বিভূতির কথা বলেছেন, তখন আর সন্দেহের কিছু থাকে না।

অভিভূত অর্জুনের যদিও শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কাছে ভক্তের অনুরোধেরও শেষ নেই। তাই তিনি এবার চাইলেন এইসব বিভূতি নিজের চোখে দেখতে। এবারও ভক্তাধীন ভগবান তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করলেন।

অর্জুনের দিব্যচক্ষু হ'ল। অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত সবকিছু তিনি দেখতে লাগলেন।

অর্জুন দেখলেন, শ্রীভগবান মহাকাল। সমস্ত বিশ্ব তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের তিনিই নিশ্চিত ফলদাতা। শ্রীভগবানের এই 'বিশ্বরূপ' দেখে অর্জুন কখনো আনন্দিত, কখনো অভিভূত, কখনো ভয়ান্বিত হ'তে থাকেন। কখনো স্তব করেন—হে জগন্নাথ, তুমি সংবরণ কর তোমার রুদ্রমূর্তি !! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার সখা, তুমিই আমার একমাত্র প্রিয়জন।

প্রসন্নচিত্ত ভগবান তাঁর বিশ্বরূপমূর্তি সংবরণ করলেন। বললেন, একমাত্র অর্জুনের আত্যন্তিক ভক্তিতেই তাঁর পক্ষে এই 'বিশ্বরূপ-দর্শন' সম্ভব হ'ল।

এতক্ষণে অর্জুন বুঝলেন—তিনি যুদ্ধ করুন বা নাই করুন কৌরবকুল বিনষ্ট হবেই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহাকালবেশে কৌরবকুল ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন। এজন্য অর্জুনের শোক করা বৃথা। বরঞ্চ তিনি যদি যুদ্ধ না করেন তবেই লোকসমাজে নিন্দিত ও হেয় হবেন।

পরমকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে প্রিয় শিষ্যের সমস্ত সন্দেহ-সংশয় নিরসন ক'রে তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন। অর্জুনের শোক ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে। নৈরাশ্যের পরপারে তিনি আশার জ্যোতি দেখতে পান। এই জ্যোতি-স্বরূপই তো শ্রীভগবান—জীবের আশ্রয়।

উপনিষদের শ্লোক—অন্যান্য শাস্ত্রে

শ্রীশিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হিন্দুধর্মের আদি ও চরম প্রামাণিক শাস্ত্র বেদ। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই দুটি ভাগ। উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড বিধৃত। আত্মজ্ঞানলাভই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য। আত্মজ্ঞান ও তাহা লাভ করিবার উপায়ের কথাই উপনিষদে রহিয়াছে।

উত্তরকালে হিন্দুদের যে-সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহা সবই বেদ-ভিত্তিক। এইজন্য উপনিষদের বহু শ্লোক অন্যান্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—কোথাও অপরিবর্তিত আকারেই, কোথাও বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে; কোথাও আবার শ্লোকের ভাবে ও বিন্যাসে উপনিষদের শ্লোকের সহিত নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়।

এই ধরনের কতকগুলি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল। কেবল অপরিবর্তিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত শ্লোকগুলি এখানে দেওয়া হইল। শ্লোকগুলি প্রধানতঃ স্বামী ভূমানন্দ পরমহংস প্রণীত "অধ্যাত্ম-মুক্তাবলী" হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

অপরিবর্তিত :

(শ্লোকের নীচে উপনিষদের নাম ও শ্লোক-সংখ্যা, এবং তাহার নীচে বন্ধনীর মধ্যে অন্য যে শাস্ত্র বা শাস্ত্রগুলিতে সেগুলি আছে, তাহা দেওয়া হইল) :

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ
যন্মনস্ত্রিজগৎসৃষ্টিস্থিতিব্যসনকর্মকৃৎ
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষৎ। ২০

[উত্তরগীতা—১।৪০ ; ঘেরণ্ডসংহিতা ৩০।৮০-৮১]

স্বানুভূতেশ্চ শাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সততং চাবলোক্যতে ॥

মহা উপনিষৎ ৪।৫

[যোগবাশিষ্ঠ ২।১৩ ১১]

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ॥

বরাহ উপনিষৎ ২।৪১

[পঞ্চদশী ৬।১৬]

জ্ঞেয়বস্তুপরিত্যাগাদ্বিলয়ং যাতি মানসম্।
মানসে বিলয়ং যাতে কৈবল্যমবশিষ্যতে ॥

শাণ্ডিল্য উপনিষৎ ২৩

[হঠযোগদীপিকা ৪।৬২]

ওঁকারস্বরূপমাহ অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চ
অকণ্ঠতাল্বোষ্ঠনাসিকাঞ্চ।
অরেখবর্জিতমুভয়োষ্ঠবর্জিতং যদক্ষরং
ন ক্ষরতে কদাচিৎ ॥

অমৃতনাদ উপনিষৎ ৫।২৪

[উত্তর গীতা ১ ৫০]

আস্থামাত্রমনন্তানাং দুঃখানামাকরং বিদুঃ।
অনাস্থামাত্রমভিতঃ সুখানামালয়ং বিদুঃ ॥

মহা উপনিষৎ ৫,৮৫

[যোগবাশিষ্ঠ ৪।২৭।২৫]

বিষয়াশীবিষাসঙ্গপরিজর্জরচেতসাম্।
অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্ ॥

মহা উপনিষৎ ৩।১০

[যোগবাশিষ্ঠ ১।১৪।২]

ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে।
মনসোঽভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ ॥

মহা উপনিষৎ ৫,৯৭

[যোগবাশিষ্ঠ ৪,৩৫,১৪]

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ॥

মহা উপনিষৎ ৪।৭৩

[পঞ্চদশী ৬।১৩]

সন্ত্যজ্য হৃদ্‌গুহেশানং দেবমন্যং প্রযান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তুভাঃ॥

মহা উপনিষৎ ৬।২০

[যোগবাশিষ্ঠ ৫।৮।১৪]

ওঁকারোচ্চারণপ্রান্তশব্দতত্ত্বানুভাবনাৎ।
সুষুপ্তে সংবিদো জাতে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

শাণ্ডিল্য উপনিষৎ ৮।১

[যোগবাশিষ্ঠ ৫।৭৮।২১]

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ ৬৭

[পঞ্চদশী ৭।৪৭]

যাবৎ দৃষ্টির্ভ্রুবোর্মধ্যে তাবৎ কালভয়ং কুতঃ।

যোগচূড়ামণি উপনিষৎ ৯১

[হঠযোগদীপিকা ২।৪০]

সম্যক্‌ আলোচনাৎ সত্যাদ্বাসনা প্রবিলীয়তে।
বাসনাবিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ॥

মুক্তিক উপনিষৎ ২।১৮

[যোগবাশিষ্ঠ ৪।৩৪।২৮]

বাসনাবশতঃ প্রাণস্পন্দস্তেন চ বাসনা।
ক্রিয়তে চিত্তবীজস্য তেন বীজাঙ্কুরক্রমঃ॥

মুক্তিক উপনিষৎ ২।২৬

[যোগবাশিষ্ঠ ৫।৯১।৫৩]

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ
ত্যজেদজ্ঞাননির্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ॥

মৈত্রেয়ী উপনিষৎ ২।১

[শঙ্করাচার্য, আত্মপূজা ৮]

[গীতাসার ৬৩]

সঙ্গত্যাগং বিদুর্মোক্ষং সঙ্গত্যাগাদজন্মতা।
সঙ্গং ত্যজ ত্বং ভাবানাং জীবন্মুক্তো ভবানঘ॥

অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ৫।৪

[যোগবাশিষ্ঠ ৫।৯৩।৮২]

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থভাবনা ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা॥

বরাহ উপনিষৎ ৪।১-২

[যোগবাশিষ্ঠ ৩।১১৮।৫৬]

ভারো বিবেকিনঃ শাস্ত্রং ভারো জ্ঞানঞ্চ রাগিনঃ।
অশান্তস্য মনো ভারো ভারোঽনাত্মবিদো বপুঃ॥

মহা উপনিষৎ ৩।১৫

[যোগবাশিষ্ঠ ১।১৪।১৩]

যাবদ্বিলীনং ন মনো ন তাবদ্‌ বাসনাক্ষয়ঃ
ন ক্ষীণা বাসনা যাবচ্চিত্তং তাবন্ন শাম্যতি।
যাবন্ন তত্ত্ববিজ্ঞানং তাবচ্চিত্তশমঃ কুতঃ।
যাবন্ন চিত্তোপশমো ন তাবত্তত্ত্ববেদনম্‌॥

অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ৮।৮১

[যোগবাশিষ্ঠ ৫।৯২।১১-১২]

বাগ্‌দণ্ডঃ কর্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ॥

নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ ৬।৫

[মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪১।২২]

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥

মহা উপনিষৎ ৪।২

[যোগবাশিষ্ঠ ২।১১।৫৯]

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতঞ্চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্‌।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্‌॥

মুক্তিক উপনিষৎ ২।৩

[যোগবাশিষ্ঠ ২।৫।৪]

দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্‌।
দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা॥

মহা উপনিষৎ ৪।৭৭

[হঠযোগদীপিকা ৪।৯]

ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ।
মারুতস্য লয়োনাথস্তন্নাথো নাদমাশ্রয়ঃ॥
বরাহ উপনিষৎ ২।৮০
[হঠযোগদীপিকা ৪।২৯]

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ কিমিব শোভনম্॥
যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষৎ ৫
[যোগবাশিষ্ঠ ১।২১।১]

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিঃস্ত্রীকস্য কঃ ভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥
যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষৎ ১৪
[যোগবাশিষ্ঠ ১।২১।৩৫]

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।১৬-১৭
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩।১৪-১৫]

বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্॥ কৈবল্য ২২
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫।১৫]

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি॥
কৈবল্য উপনিষৎ ১০
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।২৯]

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি। অক্ষি উপনিষৎ ৩
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৪৮]

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥
শরভ উপনিষৎ ২৬
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।২৪]

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিংস্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।
যোগশিখা উপনিষৎ ৩।১৩
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।২২]

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।
অবধূত উপনিষৎ ৭
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৭০]

আংশিক বা ঈষৎ পরিবর্তিত :

[মূল]	[পরিবর্তিত]
ন হি চঞ্চলতাহীনং মনঃ কচন দৃশ্যতে। চঞ্চলত্বং মনোধর্মো বহ্নের্ধর্মো যথোষ্ণতা॥ মহা উপনিষৎ ৪।৭৯	নেহ চঞ্চলতাহীনং মনঃ কচন দৃশ্যতে। চঞ্চলত্বং মনোধর্মো বহ্নের্ধর্মো যথোষ্ণতা॥ যোগবাশিষ্ঠ ৩।১১২।৫
দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥ মুক্তিক উপনিষৎ ২।২৭	দ্বে বীজে রাম চিত্তস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥ যোগবাশিষ্ঠ ৫।৯১।৪৮
প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন। প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ বিদ্যায়াং ব্রহ্মবাদিনঃ॥ অধ্যাত্ম উপনিষৎ ১৪	প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন। প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ শঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি ৩২১
চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ শ্রীরামপূর্বতাপনীয় উপনিষৎ ১।৭	চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ হরিভক্তিবিলাস

দীর্ঘস্বপ্নমিদং যত্তদ্দীর্ঘং বা চিত্তবিভ্রমম্
দীর্ঘং বাপি মনোরাজ্যং সংসারং দুঃখসাগরম্ ॥
বরাহ উপনিষৎ ২।৬৪

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।
কঠ উপনিষৎ ১।২।১৫

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥　কঠ ১।২।১৮

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
কঠ উপনিষৎ ১।২।১৯

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
কঠ উপনিষৎ ১।৩।১০

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
কঠ উপনিষৎ ২।৩।১

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥
ঈশ উপনিষৎ ৬

ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়াত্মানৃতাঃ কর্মবশানুগাঃ ॥
মৈত্রী উপনিষৎ ৩৪

কবিং পুরাণং পুরুষং সনাতনম্।
মহা উপনিষৎ ৪।৭১

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যশক্তিং।
নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ ৯।১৭

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ ॥
অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ৪,৬৩

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যামি সুন্দরম্ ॥
অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ৫।৫৮

দীর্ঘস্বপ্নমিদং বিদ্ধি দীর্ঘং বা চিত্তবিভ্রমম্
দীর্ঘং বাপি মনোরাজ্যং সংসারং রঘুনন্দন ॥
যোগবাশিষ্ঠ ৬।১।২৮।২৮

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ॥
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যঞ্চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮।১১

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥　গীতা ২।২০

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।১৯

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।৪২

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।৪২

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।২৯

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।৬

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮।৯

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপং।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮।৯

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫।৮

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৬।১৩

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির*

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

মা কালীর এক নাম সিদ্ধেশ্বরী। চিৎপুর রোডের ওপর জোড়-বাংলা মন্দিরের পূর্বে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ-র বাড়ির দক্ষিণে সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দির। মা সিদ্ধেশ্বরীকে রঘু ডাকাতের কালী বলেন অনেকে। (অনেককে বলতে শোনা যায় তিনি চিতু ডাকাতের কালী—যার নামে চিৎপুর, তবে যতদূর জানা আছে এ ধারণা ভ্রান্ত।)

এখানে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুরূপ বহু ঘটনার মতো তমসাবৃত। লোকপরম্পরা- এবং সেবকদের পুরুষানুক্রমাগত কাহিনীকে ভিত্তি করেই এ কাহিনীটি রচিত হলো। আনুপূর্বিক ঘটনাসমূহের উপস্থাপনার প্রয়াসে সিদ্ধেশ্বরী মাতার স্বর্গীয় সেবায়েত আদ্যানাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী সেগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। নিম্নোক্ত কাহিনীটি তাঁর কাছ থেকেই সংগৃহীত।

পীঠস্থান কালীঘাটের সন্ধানে এসে একজন সাধক ভুলক্রমে এই স্থানটিকেই কালীঘাট মনে করে মায়ের আরাধনা শুরু করেন,—এইটাই আদি কথা।

পীঠস্থানের উৎপত্তিকাহিনী আমাদের অবিদিত নয়। পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়, দক্ষ তাঁর স্বীয় আবাসে আয়োজন করলেন এক মহাযজ্ঞের। এতে আহূত ও আমন্ত্রিত হলেন যাবতীয় দেবগণ, শুধু একজন ছাড়া—দক্ষ আমন্ত্রণ করলেন না স্বীয় জামাতা শিবকে। এ বিষয়ে সকলের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করলেন তিনি।

এদিকে দক্ষদুহিতা দেবী সতী নারদমুনির মুখে শ্রবণ করলেন এই বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা; দেবাদিদেবের কাছে বিনা আমন্ত্রণে যজ্ঞস্থলে যাবার অনুমতিপ্রার্থী হলেন। মহাদেব যেতে নিষেধ করলেন। নিরুপায় দেবী তখন দশমহাবিদ্যা রূপ প্রকট করে অনুমতি পেয়ে নন্দীভৃঙ্গী-সমভিব্যাহারে যাত্রা করলেন দক্ষ-নিবাসের দিকে। কিন্তু হায়, দক্ষগৃহে পতিনিন্দা শুনে ক্ষোভে, অভিমানে সাধ্বী তনুত্যাগ করলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় রয়েছে এই ঘটনারই অনুপম ব্যঞ্জনা—

দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলেনি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে?
সেই কৈলাসের পথে ফিরিল না আর
ও রাঙা চরণ।

শ্রীকৈলাসে দেবাদিদেব উপবিষ্ট। ইত্যবসরে দুঃসংবাদ তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো। তাঁর জটা থেকে বীরভদ্র উৎপন্ন হয়ে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলেন। পরে দেবগণের অনুরোধে মহাদেব যজ্ঞস্থলে গেলেন। তুলে নিলেন সতীদেহ নিজ স্কন্ধে, ঘুরে বেরাতে লাগলেন সেই অবস্থায়। দেখে দেবতাগণ তখন বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা জানালেন। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের দ্বারা

---

* কাহিনীটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই, প্রচলিত কাহিনীরূপেই এটি প্রকাশ করা হইল।—সঃ

দক্ষতনয়ার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে শিবস্কন্ধের ভার লাঘব করলেন। নিক্ষিপ্ত হলো সতীদেহ আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে। এমনিভাবেই উদ্ভব হলো ভারতবর্ষে এক একটি মহাপীঠের—সতীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যেসব স্থলে নিপতিত হয়েছিল, ভবিষ্যতে সেগুলি পীঠস্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়।

শোনা যায়, পীঠস্থান কালীঘাট আবিষ্কার করেছিলেন কালীবর তপস্বী। শ্রীশ্রী৺মহামায়া স্বেচ্ছায় কৃপাপরবশ হয়েছিলেন তাঁর প্রতি। বর্তমান কাল থেকে আনুমানিক ছয়শত বৎসর পূর্বে তিনি ছিলেন হিমবতের নিভৃত কন্দরবাসী ধ্যানমগ্ন যোগী। তাঁর প্রতি দৈবাদেশ হলো—'তুই আমার পরম ভক্ত ; বঙ্গদেশের দক্ষিণে আমার মহাপীঠ অপ্রকট রয়েছে, তুই তা প্রকাশ কর।' সাধককুলচূড়ামণি জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আমি কোথায় তোমার মহাপীঠের সন্ধান করবো?" কালীবর তপস্বী প্রত্যাদিষ্ট হলেন দৈববাণীর দ্বারা—"গঙ্গাতীর অনুসরণ করে ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হ, দেখতে পাবি এক নিবিড় জঙ্গল ও বেত্রবন ; এমনি জায়গায় আমার সন্ধান করিস।" ইদানীংকালের মুখ্যত: কুম্ভকারসমাজ-অধ্যুষিত কুমারটুলীতে ভাগ্যবান তপস্বিপ্রবর এইভাবে উপস্থিত হলেন। তাঁর মনে হলো দৈবাদেশে হয়ত এই স্থানেরই আভাস দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতীতির বশে তিনি আসন পরিগ্রহ করলেন এবং কঠোর তপে নিরত হলেন। জগন্মাতা তুষ্ট হলেন, আত্মপ্রকাশ করলেন শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা রূপে।

মাতা মহামায়া সুস্পষ্টভাবে ভক্তবর কালীবর তপস্বীকে জানালেন, "তুই এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিস, সেকারণ আজ থেকে এটা সিদ্ধপীঠ এবং আমি ৺সিদ্ধেশ্বরী নামে পরিচিত রইলাম, তবে এখনও মহাপীঠে পৌঁছাতে পারিসনি। এখানে আমার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হ।" মা অন্তর্হিতা হলেন। জগন্মাতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন কালীবর—নিত্যপূজার ভার ন্যস্ত করলেন এক সন্ন্যাসী শিষ্যের উপরে।

এইভাবে দিন যায়, বৎসর যায়, যুগযুগান্তর অতিবাহিত হলো। শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা তখনও অরণ্যের গহনে। এমনি সময়ে, শোনা যায়, এক অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। কুমারটুলীর মিত্র বংশ বর্ধিষ্ণু ও কৃষ্টিসম্পন্ন ; ঐ পরিবারের একটি দুগ্ধবতী গাভী নিয়মিতরূপে দুধ না দেওয়ায় পরিবারবর্গ কৌতূহলপরবশ হলেন। অনুসন্ধানে জানা গেলো যে, ধেনুটি বনের গহনে প্রবেশ ক'রে মাতৃমূর্তির সম্মুখে দুগ্ধ নিঃসরণ করে! এই অলৌকিক ঘটনায় মুগ্ধ হলেন মিত্রবংশীয়গণ, তাঁরা প্রবর্তন করলেন মাতার নিত্যপূজার।

কালে সন্ন্যাসি-পরম্পরায় তন্ত্রবিহিত আসনে ঘট স্থাপিত হলো, আচ্ছাদন পড়লো গোলপাতার। এইভাবে মাতৃপূজা সম্পন্ন হতে থাকলো। ইদানীংকালের চিৎপুর সেই সুদূর অতীতে ছিল নদীগর্ভে। শোনা যায় সাধকশিরোমণি রামপ্রসাদ নৌকাবিহারে যাওয়ার সময়ে তাঁর মুখনিঃসৃত মাতৃনাম শ্রবণের পর থেকে মা হয়েছেন পশ্চিমাস্য।

স্মরণ করুন সেই সুদূর কয়েক শতাব্দী অতীতের কথা—দস্যুদলসমাকীর্ণ কুমারটুলী। তাদেরই সহযোগিতায় মাতার অর্চনা সুসম্পন্ন হতো ; সেই হিসেবে মায়ের "ডাকাতে কালী" নাম। পরিশেষে শেষ সন্ন্যাসী সেবক কালক্রমে বৃদ্ধ হলেন। তখন আর সেবা চালাবার জন্য সন্ন্যাসী পাওয়া গেলো না।

অতঃপর সেই সন্ন্যাসী সেবকনিয়োগার্থে এক ব্রাহ্মণসন্তান-সংগ্রহের নির্দেশ দেন। এমন সময়ে মহামায়ার ইচ্ছায় সম্মুখবর্তী নদীর ওপর ভেসে যাচ্ছিলো একটি খড়ের চালা। দস্যুদল মনে করলো কিছু প্রাপ্তিযোগ এসেছে—সুতরাং চালাটি তারা তীরে উঠালো। কিন্তু এ কি? এই চালাঘরের আশ্রয়ে উপনয়ন সংস্কৃত দুটি ব্রাহ্মণকুমার! সন্ন্যাসী কুমারদ্বয়কে দীক্ষিত করলেন এবং পূজার্চনার কাজে ব্রতী করলেন। ঘটনাটির কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী দেহরক্ষা করেন। পরে কুমারযুগল সংসারী হন। তদবধি মা সিদ্ধেশ্বরী গৃহীর ঘরে পূজা নিচ্ছেন।

*

মা ভাগীরথী সরে চললেন, এক কালের নদীগর্ভের উপর পথ নির্মিত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ। জোড়াসাঁকোর পরম বৈষ্ণব শ্যামলাল মল্লিক ও বিনোদবিহারী মল্লিক গাড়িতে চড়ে মদনমোহন-দর্শনে প্রত্যহ আসতেন। তবে মাকালীর কাছে যেতেন না। একদা শ্রীশ্রী৺মদনমোহন জীউ এবং শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরীমাতা স্বপ্নে এই দুই ভক্ত-সমক্ষে উপস্থিত হয়ে ভেদজ্ঞান পরিহার করতে বলেন। তখন থেকে তাঁরা মায়ের ভক্ত--বর্তমান মন্দির তাঁদেরই কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে।

আত্মরক্ষা

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

ওহে বিশ্বপিতা! মাটির তিলক এঁকে
ভালে মোর, যেন ছিন্ন করে ভূমা থেকে,
যখন আমাকে জন্ম দিলে এ জগতে,
সাজালে আমাকে তেজে সেই ক্ষণ হ'তে
নিজেকে রক্ষার জন্যে ; যে মুহূর্তে তাই
আমার অস্তিত্বটিকে ক্রোধান্ধ অন্যায়
এসেছে সদর্পে কাছে চূর্ণ ক'রে দিতে,
তখনি জেগেছি আমি তড়িৎ গতিতে,
দিয়েছি প্রবল বাধা ; করেছি ঘোষণা
'যতক্ষণ আছে শ্বাস আমি মরব না।'
অক্লান্ত সংগ্রাম ক'রে তোমার সাক্ষাতে
ফিরিয়ে দিয়েছি তাকে অন্তিম আঘাতে!
প্রাণ দিলে তার সাথে দিলে অধিকার
মৃত্যুপণে সে পবিত্র দায়িত্বরক্ষার॥

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

৩০।১২।৩৬। পূর্বদিন রাত্রে স্বামী অখণ্ডানন্দ কিছু খান নাই, পরদিন সকালে একটু দুর্বল—বলিতেছেন, "দেখ, খেয়ে দুর্বল—সে বড় খারাপ; আর এ না খেয়ে দুর্বল—এ ভাল, এতে আত্মশক্তি বাড়ে।" একটু চুপ করিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "দেখাও, প্রভু, দেখাও—এই বুড়ো হাড়ে তোমার খেলা, দেখাও তোমার কত শক্তি!"

* * *

সকাল ন-টার ট্রেনে রানাঘাট হইতে একটি ভক্ত ও একটি মহিলা আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাঁহারা দীক্ষার্থী। সঙ্গে আসিয়াছেন স—,বাবার একটি প্রিয় সন্তান। মহিলাটি স-এরই দিদি, বহুদিন যাবৎ তাহার মুখে বাবার কথা শুনিয়াছেন, এখন স্বামী-স্ত্রী দীক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন।

বাবা চেয়ারে বেশ জাঁকিয়া বসিয়া মঠে তাঁহার প্রথম দীক্ষাদানের কথা শুরু করিলেন:

"মঠে দক্ষিণদেশ থেকে একটি ছোকরা এসেছে দীক্ষার জন্য, রেলে কাজ করে, অনেক খরচপত্র ক'রে তো এসেছে। বিবাহিত। দাদার (মহাপুরুষ মহারাজের) তখন অসুখ। মঠে ওরা ধরে ব'সল—'মহারাজ, আপনাকেই দিতে হবে।' আমি বললাম, 'যা কখনো ক'রব না ভেবেছি, তাই করতে হবে?' স্বামীজী অবশ্য অনেক আগেই বলে দিয়েছিলেন—ভ্রমণের সময়ে মাঝে মাঝে শিখিয়ে দিতেন—'এই এই মন্ত্র, এই এই ইষ্ট।' বুঝতাম না কেন এসব বলছেন আমাকে। তারপর চিঠিতেও লিখতেন—'মাথা মুড়াও, চেলা বানাও।' তখন একটু একটু বুঝলাম। কিন্তু বিবাহিত লোককে দীক্ষা দেবো না—এ একেবারে বরাবর ঠিক ছিল।

"তাই মঠে ঐ নিয়ে মনটা খুব খারাপ। বিকেলবেলা খাটের ওপর বসে আছি একলা,—শেষে কেশব সেনের বাড়িতে ঠাকুরের কথা ঠাকুরই মনে তুলে দিলেন। যেন স্পষ্ট দেখছি—একঘর লোকের মধ্যে ঠাকুর বলছেন, 'কেশব,··· এবার দুটিতে ভাই-বোনের মতো বাস কর।'···আমিও ঠিক করলুম—যত বাছাধন আসবেন, এই এক কথা ব'লব। প্রথম প্রথম প্রতিজ্ঞা লিখিয়ে নিতুম—'ভাই-বোনের মতো বাস ক'রব।' আরে কাজলের ঘরে থাকতে গেলে একটু কাজল লাগবেই, যতই বাঁচাতে চেষ্টা কর।"

এই কথার পর বাবা একটু চারিদিকে চাহিলেন। ঠিক চেয়ারের পিছনে ভক্তকে ডেস্কে চিঠিপত্র ও 'স্মৃতিকথা' লিখনরত দেখিয়া বলিলেন, "ও, তুই বুঝি এখানে বসে বসে গল্প শুনছিলি? এত গল্পের মধ্যে কি লেখা হয়? এখন একটু ঐ ঘরে গিয়ে লেখ্।"

ভক্ত উঠিয়া গেলে পর বাবা রানাঘাটের ভক্তদের আরও কাছে ডাকিয়া প্রশ্নাদি করিলেন এবং কিছু বলিলেন। তারপর তাঁহারা স্নান করিয়া দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন।

রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় বাবা নতুন পেরাম্বু-

লেটয়ে করিয়া আশ্রমের মাঠে বেড়াইতেছেন। খানিক পরে পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয় লক্ষ্য করিয়া চাঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আপন মনে গাহিতেছেন—'চন্দ্র বিতরে জ্যোতি তোমারি।' তারপর অস্ফুটস্বরে আরো কয়েক লাইন গাহিলেন। ঠাণ্ডা পড়িতেছে দেখিয়া সেবকরা গাড়ি বিনোদ-কুটিরে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

ম্যাজিক লণ্ঠন (lantern show) ঠিক করা হয় এবং স্লাইড দেখানো হয়। কতকগুলিতে স্বামীজীর বাণী ছিল সেগুলি একজন জোরে জোরে পড়িয়া শোনায়। শুনিয়া বাবা বলিলেন, "স্বামীজীর কথা—ঐসব sincerely feel (আন্তরিকভাবে অনুভব) করিস? 'আমার কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর কর। মা, আমায় মানুষ কর।'—এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা স্বামীজী শিখিয়েছেন।"

ঠাকুর কিভাবে কতভাবে দীক্ষা দিতেন—সেইসব প্রসঙ্গ হইল। তখনি সারাংশ লিপিবদ্ধ করাইয়া 'স্মৃতিকথা'র অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বলিলেন।* একদিন রাণী শরৎসুন্দরীর অনেক কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "সাধুদের যে ত্যাগ তপস্যা, তার চেয়ে কম নয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা, জমিদারের বধূ, অল্প বয়সে বিধবা হন। স্বহস্তে জমিদারি চালাতেন এবং জনসেবা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিল বার-ব্রত, তপস্যা, পূজা, পাঠ।"

* * *

৫।৬ জনের দীক্ষা হইল। সারাদিন বাবার শরীর খুব খারাপ। সন্ধ্যাবেলা বলিতেছেন, "চিঠি আসলেই বুঝতে পারি, কি আসছে

আজ অনেক সাধুসঙ্গের কথা বলিলেন: কামরাজ তান্ত্রিক, মায়ারাম অবধূত, গম্ভীরনাথ, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতির কথা। পরে গঙ্গোত্রীর পথে ভ্রমণকাহিনী ও এক গুহায় এক ব্রহ্মচারীর তপস্যার কথা বলিয়া শেষে বলিলেন: গঙ্গোত্রীর জল পাঠিয়েছিলুম—স্নানযাত্রার আগেই বরানগর মঠে পৌঁছায়।

"কামরাজ তান্ত্রিক জিজ্ঞেস করেন, 'কি চাও?' আমি বলি, 'ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—এই অবস্থা চাই।' তিনি করুণভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার অম্বাকে চাও না? আত্মজ্ঞান চাও?'

"মায়ারাম অবধূত চারবার চার ধাম করেছেন। তিনি খুব ত্যাগী, বিখ্যাত মহাপুরুষ। গ্রামের বাইরে আসন করতেন, একজন একটা কম্বল দিতে এসেছে। তিনি নিজের পুরানো কম্বলটা দেখিয়ে বললেন, 'কম্বল? এই তো।'

"ভাস্করানন্দ কাশীতে খুব স্নেহ করতেন, একদিন নিজহাতে খাওয়ান।

"ত্রৈলঙ্গ স্বামী সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিশ্বনাথের অংশ আছে।' তিনি রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকতেন। তাঁকে এক সময় ম্যাজিস্ট্রেট Gobin (গবিন) সাহেবের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ও বিচার হয়। সাহেব তাঁর নির্বিকার ভাব দেখে তাঁকে ছেড়ে দেন এবং হুকুম জারী করেন, 'ওঁকে কেউ কিছু বলবে না।' উঁচু ঘাটের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিত, কুম্ভক ক'রে ভাসতেন। গরমে তপ্ত ফুটপাথে, মাঘ মাসে শীতের রাতে একগলা গঙ্গাজলে থাকতেন। খুব যোগী—শীত-গ্রীষ্ম, মান-অপমান, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছু বোধ

*স্মৃতিকথা—পৃঃ-৪৭

নেই। ও-একটা হয়ে গিছল—খুব হঠযোগ করেছিলেন প্রথমটা। এক গরীব বুড়ী ওঁকে এক হাঁড়ি দই দেয় গঙ্গার ঘাটে। তিনি যে আসে তাকে একটি ক'রে ফোঁটা দেন আর সে টাকা-পয়সা দেয়। এমনি ক'রে অনেক টাকা হ'ল, সব টাকা পেল সেই বুড়ী। আর একদিন একটা দুষ্টু লোক সহজে অনেক টাকা পাবার লোভে তাঁর কাছে ঐরকম একহাঁড়ি দই দেয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও প্রথম যে লোকটি এল তাকেই এক পয়সায় হাঁড়িশুদ্ধ দিয়ে দিলেন।"

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। বহরমপুর টোল হইতে এক অন্ধ পণ্ডিত আলাপ-পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষায় স্বামী অখণ্ডানন্দকে পত্র দিয়াছেন। দিন স্থির করিয়া তাঁহাকে উত্তর দেওয়া হইল। যথাদিনে যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম বিধিনাথ মুখোপাধ্যায়—জন্মান্ধ, অপরের পড়া শুনিয়া শুনিয়া ইনি প্রায় ষড়্‌দর্শন অধিগত করিয়াছেন, পরীক্ষায় উপাধিও পাইয়াছেন। অপরে ইঁহার হইয়া লিখিয়া দেয়। তিনি প্রণাম করিয়া উঠিয়াই মহারাজের প্রেরিত চিঠিখানি আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলিলেন। বাবা খুব খুশী হইলেন এবং স্মৃতিশক্তি-বিষয়ক দু-একটি গল্প বলিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে বিধিনাথ পণ্ডিত কি কথা বলিয়াছেন, বাবা তদুত্তরে বলিলেন, "আরে তুমি তো প্রজ্ঞাচক্ষু।" একটু পরে বিধিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি ন্যায় পড়েছেন? ন্যায় না পড়লে বেদান্ত বোঝাই যাবে না।' বাবা বলিলেন, "কই বাপু, ন্যায় সে-রকম পড়িনি, বেদান্ত একটু-আধটু পড়তে হয়েছে। যতটুকু যা বোঝবার, যেমন বুঝিয়েছেন বুঝেছি। আর, সব দর্শন শাস্ত্রব্যাখ্যা তো শ্লোকের বাহাদুরী বাক্যচাতুরী—বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী পণ্ডিতানাং ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে—এতো শঙ্করই বলেছেন।"

একটু পরে শিবপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। বিধিনাথ পণ্ডিত শিবদুর্গার মিলন-কলহাত্মক ৪।৫টি শ্লোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। বাবা খুব আনন্দে শুনিতে লাগিলেন এবং দু-একটি লিখিয়া লইতে বলিলেন। শেষে বিধিনাথ বলিয়া গেলেন, 'আবার আসব, ভুলবেন না, একলা আসতে পারি না তাই।'

কয়েকদিন পরে গঙ্গাতীরের অগ্নিহোত্রী বেদশাস্ত্রী এক ব্রাহ্মণ আসেন ও বেদগান করেন এবং কথা হয়—তিনি আশ্রমে আসিয়া বেদ অধ্যাপনা করিবেন। তিনি বলেন—শুধু ব্রাহ্মণকে পড়াইবেন, তবে অপরেরা শুনিতে পারে। শেষ পর্যন্ত আসেন নাই, বোধ হয় অ-ব্রাহ্মণরা শোনে—ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, আর্যগণ সুদূর অতীতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গোমল উপত্যকায় ও পঞ্জাবে বসবাস করতেন। পঞ্চনদী প্রবাহিত বলে স্থানের নাম হয়েছিল পঞ্চনদ বা পঞ্জাব। শাস্ত্রে যে সপ্ত সিন্ধবঃ' উল্লিখিত আছে তারই অংশ হ'ল পঞ্জাব। ঐতিহাসিকগণের মতে আর্য ঋষিগণ যে যুগে বেদ লিপিবদ্ধ করেন সেই বৈদিক যুগেই তাঁরা প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েন এবং সেই ভূখণ্ডকে বলা হ'ত আর্যাবর্ত। তবে শাস্ত্র বলে না যে, আর্যগণ বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন।

অতি আদিম যুগে পঞ্জাবের নদ নদী পাহাড় ও সমতল ক্ষেত্র আর্য ঋষিগণের বেদ-গানে, যজ্ঞ ও পূজার মন্ত্র-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত। ঋষিগণ নির্জন গিরি-গুহায় বনে-উপবনে ভগবানের আরাধনা করতেন। এ কারণে প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই সমগ্র পঞ্জাবই এক মহান তীর্থ। কালে পঞ্জাবের সিন্ধু (Indus) নদ হতেই ভারতবাসীদের নাম হয়েছিল হিন্দু আর ভারতবর্ষের নাম হয়েছিল হিন্দুস্থান।

বৈদিক যুগের পরে এল পৌরাণিক যুগ। আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে যদিও পঞ্জাব অঞ্চলের বিশেষ কোন বিবরণ লক্ষিত হয় না, তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সে সময়েও পঞ্জাবের বনে-উপবনে পাহাড়ে ঋষিদের আশ্রম ছিল, রাজগণ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং যাগ-যজ্ঞ হোম ইত্যাদি হ'ত। মহাভারতে এবং অন্যান্য পুরাণে এতদঞ্চলের অনেক তীর্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু এমন অনেক তীর্থের কথা আছে যা ঠিক কোন্ স্থানে তা এখন বলা যায় না।

ভগবান বুদ্ধ (৬২৩-৫৪৪ খৃষ্টপূর্ব) যখন উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, তখন ও তৎপরবর্তী কিয়ৎকাল পর্যন্ত পঞ্জাবে হিন্দু-ধর্মই প্রবল ছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীর যখন উত্তর ভারতে জৈন ধর্ম প্রচার করলেন তারও বিশেষ কোন প্রভাব পঞ্জাবের উপরে পড়েনি।

বর্তমান ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হতেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ বার বার বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয় এবং শুরু হয় হিন্দুধর্মের তথা ভারতবর্ষের দুঃখময় ইতিহাস। ৫১৮ খৃষ্টপূর্বে পারস্যের রাজা ডেরিয়াস্ (Darius) পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ ক'রে হিন্দু রাজাদের পরাজিত করেন। পঞ্জাব প্রায় একশত বৎসর পারস্যের অধীন থাকে। তারপর ৩২৭ খৃষ্টপূর্বে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজান্দার (Alexander) হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং পঞ্জাব অধিকার করেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য পঞ্জাবের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনেন।

সম্রাট অশোকের সময়ে (২৭৩-২৩২ খৃষ্ট-পূর্ব) পঞ্জাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হ'ল আর নানা স্থানে নির্মিত হয় বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ও মঠ। তার ধ্বংসাবশেষ এখনও পঞ্জাবের আশে পাশে দেখা যায়। ঐ সময় হতে হিন্দু-

ধর্ম হয়ে পড়ল অনাদৃত, আর হিন্দু তীর্থগুলি হতে লাগল জনশূন্য। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরে পঞ্জাবে গ্রীকগণ আবার ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করল। তারপর প্রথমে শকেরা, তারপর কুশানেরা পঞ্জাব অধিকার করে। তাদের রাজধানী ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পুরুষপুরে, যার বর্তমান নাম পেশোয়ার। কয়েক শত বৎসর পরে মগধের গুপ্ত রাজবংশের সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৩৮০ খৃষ্টাব্দ) পঞ্জাব অধিকার করলেন, কিন্তু তার শত বৎসর পরেই হূনেরা পঞ্জাব অধিকার করে। তারা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পঞ্জাবে রাজত্ব করে; তারপরে সম্রাট হর্ষবর্ধন পঞ্জাব অধিকার করেন। হর্ষের রাজধানী ছিল পঞ্জাবের থানেশ্বরে আর উত্তর প্রদেশের কনৌজে। যদিও তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি তাঁর সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, এবং তিনি বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন সকল ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মহৎ আচরণে সকল তীর্থ আবার জাগ্রত হয়ে উঠে। মঠ-মন্দিরের নির্মাণ ও সংস্কার হয়। দেশে আবার ধর্মের প্রবাহ বইতে থাকে। হর্ষবর্ধনের সময় চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে আগমন করেন। তিনি তাঁর রোজ-নামচায় এদেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে গেছেন। তখন ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম খুব প্রবল ছিল। কিন্তু সে সময়ে বৌদ্ধ মন্দিরের মতো এদেশে অনেক হিন্দু মন্দিরও ছিল। দুঃখের বিষয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। আর সে-সব রাজ্যে রাজত্ব করতে লাগলেন রাজপুত আখ্যাধারী ছোট ছোট রাজা।

খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মহান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবে আবার সমগ্র ভারতে হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাকা উত্তোলিত হ'ল। তিনি তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে আসমুদ্র-হিমাচল ভ্রমণ ক'রে অন্যান্য ধর্মমত খণ্ডন ক'রে, নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ক'রে বেদান্তের অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি অনেক লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় অনেক জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার ও নূতন মন্দির নির্মিত হ'ল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম হতেই শুরু হ'ল পাঠান ও মোগলদের বারে বারে ভারত-আক্রমণ। তারা মঠ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস ক'রত আর ক'রত অগণিত নরহত্যা। তারা আসত উত্তর-পশ্চিম দিক হতে, তাই পঞ্জাবের উপরেই পড়ত প্রথম ও প্রবল আক্রমণ আর হ'ত ধ্বংসলীলা। প্রথমে পাঠানগণ তারপর মোগলগণ পঞ্জাবে প্রায় আটশত বৎসর আধিপত্য করে। এই সময়ের মধ্যে পঞ্জাবের প্রায় সব প্রাচীন মন্দিরই ধ্বংস হয়। তাই পঞ্জাবে এবং এমন কি সমগ্র উত্তর ভারতে আজ আর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া সুদূর অতীতের কোন মন্দির নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে গুরু নানক পঞ্জাবে শিখ-ধর্ম প্রচার করেন। শিখগণ নিরাকার ভগবানের উপাসক। বেদেও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার বিধি আছে। শিখদের অপর ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই। ভক্ত কবি জয়দেবের গানও শিখদের গ্রন্থসাহেবে লিপিবদ্ধ আছে। কালে শিখগণ পঞ্জাবে অনেক মন্দির নির্মাণ করেন। শিখ মন্দিরকে গুরুদ্বারা বলা হয়। মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে মহারাজা রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবে শিখ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা রণজিৎ সিংহ শিখ গুরুদ্বারা ও হিন্দু মন্দির

উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের সংস্কার ও ব্যয়ভার-নির্বাহের জন্য অনেক অর্থ প্রদান করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর, ইংরেজরা পঞ্জাব অধিকার করে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে পাকিস্তানের অন্তর্গত হ'ল. আর পূর্বাংশ রইল ভারতের (Indian Union) মধ্যে। বর্তমান প্রবন্ধে এই পূর্ব পঞ্জাবের তীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল, যদিও এই পঞ্জাব এখন তিনটি প্রদেশে বিভক্ত, তার পশ্চিমাঞ্চলের নাম পঞ্জাব, পূর্বাঞ্চলের নাম হরিয়ানা আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাম হিমাচল প্রদেশ।

আদি বদরি

তত্র পুণ্যতমং তীর্থং প্লক্ষাবতরণং শিবম্।
যত্র সারস্বতৈরিষ্ট্বা গচ্ছন্ত্যবভৃথং দ্বিজাঃ॥

(মহাভারত, বনপর্ব, ৮৭।৩)

[ধৌম্য ঋষি মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "সেখানে পুণ্যতম ও মঙ্গলময় প্লক্ষাবতরণ তীর্থ আছে, যেখানে সারস্বত নামক যজ্ঞ উদ্‌যাপনকারী ব্রাহ্মণগণ স্নান করেন।]

আদি বদরি কাঠগড়ের প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। কাঠগড় বিলাসপুর শহরের কুড়ি কিলোমিটার উত্তরে। বিলাসপুর জগধ্রি শহরের প্রায় ষোল কিলোমিটার উত্তরে।

আদি বদরিতে শ্রীনারায়ণের প্রাচীন মন্দির বিখ্যাত। শিবলিক পর্বতমালার উপরে যেখানে পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী সরস্বতীর উৎস: সেখানে এই মন্দির অবস্থিত অনতিদূরে পুণ্যতোয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। যে ঝরণা হতে সরস্বতী উত্থিত হয়েছে, পুরাকালে সেটি একটি অশ্বত্থ (প্লক্ষ) বৃক্ষের নীচে ছিল; তাই তীর্থের নাম ছিল প্লক্ষাবতরণ তীর্থ বা প্লক্ষ তীর্থ। স্রোতস্বিনীর নাম ছিল প্লক্ষ-প্রস্রবণ।

কথিত আছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে নারায়ণ ব্রহ্মার শতবর্ষ জীবন পর্যন্ত এই তীর্থে অবস্থান করতে রাজী হন।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে পুরাকালে প্লক্ষাবতরণ তীর্থে মহারাজা যযাতি যজ্ঞ ক'রে দেবরাজ ইন্দ্রকে তুষ্ট করেন। এ সম্বন্ধে মহাভারতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি দ্রষ্টব্য :

অত্রৈব নহুষো রাজা রাজন্ ক্রতুভিরিষ্টবান্।
যযাতি বহুরত্নৌঘৈর্যত্রেন্দ্রো মুদমভ্যগাত্॥
এতত্ প্লক্ষাবতরণ-যমুনাতীর্থমুত্তমম্।
এতত্ বৈ নাকপৃষ্ঠস্য দ্বারমাহুর্মনীষিণঃ :

(মহাভারত, বনপর্ব, ১২৯।১ -১৩)

[হে রাজন্, এই স্থানেই নহুষ রাজা যজ্ঞ দ্বারা ইষ্টলাভ করিয়াছিলেন। এখানে যযাতি বহু রত্ন ও ভোজ্যবস্তু দ্বারা ইন্দ্রকে পূজা করিয়া তুষ্ট করেন। ইহাই প্লক্ষাবতরণ ও উত্তম যমুনাতীর্থ। জ্ঞানিগণ বলেন ইহাই স্বর্গের দ্বারস্বরূপ।]

হরিবংশেও প্লক্ষতীর্থের উল্লেখ আছে।

আদি বদরিতে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে। আদি বদরি হতে প্রায় ছয় কিলোমিটার উত্তরে পাহাড়ের উপরে একটি দেবীমন্দির আছে

চমকৌর

আদেস তিসৈ আদেস

আদি অনীল অনাদি অনাহত।
যুগ যুগ একো বেশ॥ (জপজী সাহেব)

[প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম। যিনি আদি, নিরঞ্জন, অনাদি, স্বয়ম্ভু এবং যুগে যুগে

অপরিবর্তিত তাঁহাকে নমস্কার।]

রুপর শহরের প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে চমকৌর অবস্থিত। রুপর রেলপথে অম্বালা হ'তে চুরানব্বই কিলোমিটার দূরে।

চমকৌর শিখতীর্থ, এখানে শিখদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

আওরঙ্গজেবের মোগল সৈন্য যখন আনন্দপুর অবরোধ করে, তখন দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুর পরিত্যাগ ক'রে চমকৌরে কিছুকালের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চমকৌরে দম্‌দমা সাহেব নামে গুরুদ্বারা নির্মিত হয়।

চমকৌরে যখন অসংখ্য শত্রুসৈন্য গুরুজীর আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলেছিল, তখন তিনি তাঁর দুই পুত্রকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠান। তাঁর সেই দুই পুত্র আর তাঁদের সঙ্গে সাইত্রিশ জন শিখ বীর যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। তাঁদের স্মৃতিমন্দিররূপে নির্মিত হ'ল শহিদগড় বা কোতলগড় গুরুদ্বারা।

গুরুগোবিন্দ সিংহ যখন মোগল সৈন্যের অজ্ঞাতে চমকৌর পরিত্যাগ করলেন, তখন জীবন সিংহ সেখানকার শিখ সৈন্যের অধিনায়ক হয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যেও চমকৌরে একটি গুরুদ্বারা আছে।

চমকৌর পরিত্যাগের সময় গুরুগোবিন্দ সিংহ তাঁর প্রিয় শিষ্য সন্ত সিংহকে নিজ হস্তে তিলকে ভূষিত করেছিলেন। তিলকস্থান নামক গুরুদ্বারাটি সেই স্মৃতি বহন করছে।

রুপরের কাছে কোট্‌লা নিহাং গ্রামেও একটি গুরুদ্বারা আছে। গুরুগোবিন্দ সিংহ তাঁর আনন্দপুরের দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাওয়ার পথে কোট্‌লা নিহাং-এ কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলেন, তারই স্মৃতির নিদর্শন এই মন্দির।

হুসৈনী

ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা চ ত্বং বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ।
ত্বং শিবঃ শিবঃ শিবদোঽনন্তঃ সর্বসংহারকারকঃ॥
(হিমালয়কৃত শিবস্তোত্র)

[হে শিব, আপনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, আপনি পালনকর্তা বিষ্ণু, আপনি অপার মঙ্গলদায়ক, আপনি অনন্ত সর্বসংহারকারী।]

পঞ্জাবের অম্বালা শহরের প্রায় সাইত্রিশ কিলোমিটার পূর্বদিকে হুসৈনী গ্রাম অবস্থিত।

হুসৈনীতে একটি পুণ্যতোয়া দীঘি আছে। দীঘির পারে দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। তার একটি শিবের অপরটি রামচন্দ্রের।

কিংবদন্তী—স্বর্গারোহণের পথে পঞ্চ পাণ্ডব ও তাঁদের পত্নী দ্রৌপদী এই পুণ্যস্থানে কিছু কালের জন্য অবস্থান করেছিলেন।

কালকা

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-
বিভূষিতাম্॥

[ভীষণা, করালবদনা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দিব্যমুণ্ডমালা-শোভিতা দক্ষিণা কালীকে আমি প্রণাম করি।]

রেলপথে অম্বালা ছাউনি (cantonment) ষ্টেশন হ'তে কালকা শহর একশত পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কালকা শহরে প্রাচীন কালী দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। দেবীর নামে শহরের নাম হয়েছিল কালিকা, যার অপভ্রংশ কালকা।

কালকা রেলস্টেশনের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে কোশলিয়া ও ঝাঝরা নদীদ্বয়ের পুণ্য সঙ্গমস্থলে পিঞ্জোর গ্রামে একটি পুণ্যতোয়া দীঘি আছে, নাম ধারামণ্ডল। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার সময়, বিষ্ণুর ষষ্ঠ

অবতার পরশুরামের জন্মদিবস উপলক্ষে দীঘির পারে স্নানযাত্রার মেলা হয়।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি ক্ষিতিতলতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥
(জয়দেব—দশাবতারস্তোত্র)

[হে কেশব, তুমি ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয়গণের রক্তধারা পৃথিবীকে স্নান করাইয়া তাহার পাপ দূর করিয়াছিলে এবং ভূভার লাঘব করিয়াছিলে। হে জগদীশ্বর, হে হরি. তোমার জয় হউক।]

চণ্ডীমন্দির

মহিষান্তকারী যেন পূজিতা স জগৎপ্রভুঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ ॥

[মহিষাসুর-নিধনকারিণী চণ্ডীদেবীকে যিনি পূজা করেন, তিনি জগতের প্রভু হন। অতএব ভক্তবৎসলা জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার পূজা করিবে।]

চণ্ডীগড় শহর হ'তে চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে, কালকা যাওয়ার রেলপথে, চণ্ডীমন্দির রেলস্টেশন ও গ্রাম।

চণ্ডীমন্দিরে চণ্ডিকা দেবীর প্রাচীন মন্দির এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

চণ্ডীগড় রেলস্টেশনের প্রায় এগার কিলোমিটার দূরে খরর গ্রামে অজ সরোবর নামে একটি পুণ্যতোয়া দীঘি আছে। কিংবদন্তী—রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথের পিতা অজ রাজা এই দীঘি নির্মাণ করেছিলেন।

গ্রহণের সময় ও কার্ত্তিক পূর্ণিমায় অজ সরোবরের তীরে প্রতি বৎসর পুণ্য স্নানের মেলা হয়।

মণি মাজরা

মণি মাজরা শহর চণ্ডীগড় হ'তে রূপর যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। শহরটি অম্বালার প্রায় সাইত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে।

মণি মাজরাতে একটি প্রাচীন মনসামন্দির আছে। এ অঞ্চলে মনসা শ্রীশ্রীচণ্ডী।

দেবীর মন্দির অতি বিরল। নবরাত্রির সময়ে প্রতি বৎসর মন্দিরের সামনে মেলা হয়।

মণি মাজরাতে একটি শিখদের মন্দিরও আছে। শিখগুরুবর্গের পরিবারভুক্ত শ্রীরাম রায়ের পত্নী এই মন্দির নির্মাণ করেন।

অমিন

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রমভিষ্টুতম্।
পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্বজন্তবঃ ॥
(মহাভারত, অরণ্যপর্ব, ৮৩।১১)

[হে রাজেন্দ্র, তারপর বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রে যাও। সেই তীর্থ দর্শন করলে জীবগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।]

অমিন কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত।

কার্নাল শহরের প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে অমিন গ্রাম। অমিন রেলস্টেশন কুরুক্ষেত্র রেলস্টেশন হতে মাত্র কিলোমিটার দূরে। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর নামে গ্রামের নাম অমিন।

কিংবদন্তী—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যেখানে সপ্তরথী মিলে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে নিহত করেছিল, এই সেই স্থান। সপ্তরথীদের মধ্যে দুর্যোধনের ভগ্নিপতি জয়দ্রথের বাণে অভিমন্যু প্রাণ হারায়। কৌরবেরা সেদিন চক্রব্যূহ ক'রে যুদ্ধ করেছিল। বালক অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করার কৌশল জানত কিন্তু নির্গমনের উপায় জানত না। স্থানটি একটি ছোট পাহাড়ের উপরে। একটি শিবের মন্দির আছে। কশ্যপপত্নী অদিতির নামে একটি পুণ্য জলাশয় আছে, নাম অদিতি কুণ্ড। অদিতি দেবগণের জননী ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

বাস্তবের পটভূমিতে রবীন্দ্রসাহিত্য : ইন্দ্রনাথ রায় : দি নিউ বুক স্টল, কলিকাতা-৯ : ১৮০ পৃষ্ঠা : মূল্য ৫.০০ টাকা।

নাম উপরি-উক্তরূপ হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থখানি দু'খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছেন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তিনজন আধুনিক বিদেশী লেখক : জ্যাক লণ্ডন, মার্ক টোয়েন এবং হাওয়ার্ড ফাস্ট। প্রত্যেকের বিচার করা হয়েছে বাস্তবের থেকে—অর্থাৎ দ্বন্দ্বশীল বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। বিদেশী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে না হলেও, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ বোধহয় সর্বপ্রথম। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় : রবীন্দ্র-সাহিত্যে দ্বন্দ্বশীল বিবর্তনবাদ ফল্গুধারার মত বিরতিবিহীনভাবে প্রবহমান, সকলে মেনে না নিলেও নূতন বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানাবেন—সন্দেহ নেই। লোকোত্তর প্রতিভাকে যতদিক দিয়ে দেখা যায়, জাতীয় সংস্কৃতি ততই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।—শ্রী

A. B. C. of Satya Dharma and its Philosophy—Surendranath Sen Gupta ; Published by Shri Nanigopal Sen Gupta ; 18/2 Selimpur Lane, Dhakuria, Calcutta-31 pp. 454 ; price 13/—

ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। উপনিষদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে সত্যের মহিমা কীর্তিত। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে হইলে সত্যপরায়ণতা চাই-ই চাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সত্যধর্ম বলিতে কি বোঝায় এবং তাহা লাভের উপায় সহজ-বোধ্য ইংরেজীতে মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত।

প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মোপাসনা, গুণসাধনা, গুরুতত্ত্ব ; দ্বিতীয় খণ্ডে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ, সত্যধর্মের দার্শনিক দিক ; তৃতীয় খণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব ; চতুর্থ খণ্ডে বেদান্তদর্শন প্রভৃতি সত্যধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত কয়েকটি প্রবন্ধে এক সার্বভৌম ধর্মের সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নিবন্ধটিতে গভীর চিন্তাশীলতার ছাপ রহিয়াছে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ ও বিদ্বৎ-সমাজের অনেকেই পুস্তকটির প্রশংসা করিয়াছেন।

সত্যধর্ম সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা করিতে হইলে দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়াও একটি জিনিস প্রয়োজন, তাহা হইল যাঁহার মধ্যে সত্যের পূর্ণত্ব বিদ্যমান তাঁহার জীবনকে লক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ, সত্যের বিগ্রহ-স্বরূপ ; এইরূপ জীবন যদি সম্মুখে রাখিতে পারা যায়, তবে সত্যধর্মের প্রকৃত মহিমা সহজবোধ্য হয় নিঃসন্দেহ।

সুধীজনের সমাদৃত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সন্দীপন (১৯৭২) : প্রকাশক—সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা-১২৬।

'সন্দীপন' শিক্ষণমন্দিরের বার্ষিক পত্রিকা। যাঁহারা শিক্ষাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাদানকার্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিবেন বলিয়া পারদর্শিতা অর্জন করিতেছেন, তাঁহাদের

সুসম্পাদিত এই বার্ষিকীতে সমবেত আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বিদ্যমান। সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা উচ্চমানের, নিঃসন্দেহ।

'ছাত্রাণাং প্রত্যক্ষ-রাজনীতৌ অংশগ্রহণং যুক্তিযুক্তং ন বা'—বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেবভাষায় লিখিত প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক। স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সুসাহিত্যিক 'বনফুল'-এর ভাষণটি পত্রিকার অলঙ্কারস্বরূপ। 'শ্রুতি-দর্শন-সহায়ক' নিবন্ধটিতে বর্তমান শিক্ষাদানপ্রণালী অনেকাংশে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন—ইহাই যথাযথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। Swami Vivekananda & Western Educators : A Comparative Study—সুলিখিত প্রবন্ধ।

গীতার গান : শ্রীবঙ্কচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য কাব্যবিনোদ। প্রকাশক : 'গীতা সঙ্ঘে'র পক্ষে শ্রীতারকচন্দ্র নাথ, কালিকাপুর, বারাসত, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য এক টাকা।

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতার সার সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার প্রচেষ্টা দেখা যায় পুস্তকে প্রকাশিত কবিতাগুলির মাধ্যমে। বালক-বালিকাগণ কবিতাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মক্ষেত্রে লাভবান হইবে। 'গীতার গান' যেভাবে পরিবেশিত, সেইভাবে গীতাতত্ত্বপ্রচার সহজতর, সন্দেহ নাই।

সারদা : রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা, (পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৭১)—প্রকাশক : সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, কামারপুকুর, হুগলী। পৃষ্ঠা-৯০।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলাক্ষেত্র কামারপুকুর ; এখানে রামকৃষ্ণমিশন-পরিচালিত বহুমুখী বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রায় ৯ শত বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করিতেছে।

এবারের 'সারদা' বার্ষিক পত্রিকাখানি বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী বিভাগে সর্বসমেত ৮৫টি রচনার সমাবেশ। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্ণামৃতম্' গীতিকাব্য হইতে সুনির্বাচিত অংশ ও কাব্যানুবাদ, আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রাপ্ত দুইটি ভাষণ, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌দের সুচিন্তিত রচনাবলী দ্বারা পত্রিকাটি অলঙ্কৃত। তৃতীয় শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য রচনা : 'লেসার-তত্ত্ব', 'বৈদিক গণিত—সহজ সমাধান,' 'রোগ হয় কেন ?', 'আইসো-টোপ', 'Swami Vivekananda and Modern Man's Spiritual Quest.'

চ্যাঙের বিশ্বরূপ দর্শন : শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীরুচি চক্রবর্তী, ৯৫ বি, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা-৮৩, মূল্য ২.৫০ টাকা।

'চ্যাঙের বিশ্বরূপ দর্শন'—অদ্ভুত এই নামটির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে আরও অদ্ভুত ব্যঙ্গরসাত্মক ভাব। 'চ্যাঙ' যেন আধুনিক 'সভ্য' মানুষেরই প্রতিনিধি। একটি অকিঞ্চিৎ-কর জীবকে মানুষের প্রতিনিধি-রূপে উপস্থাপনের কৃতিত্ব লেখকের রচনায় পরিস্ফুট। 'চ্যাঙের স্বপ্নদর্শন', 'চ্যাঙের নিদ্রা-ভঙ্গ', 'চিল-চ্যাঙ-কথা' প্রভৃতি উপভোগ্য কবিতাগুলিতে চিন্তার মৌলিকতা পাঠককে আকৃষ্ট করিবে। লোকের ধর্মহীনতা, ধর্ম-ধ্বজিতা, স্বার্থপরতা, পরানুকরণ প্রভৃতি চ্যাঙের দৃষ্টি এড়ায় নাই, তাই তার বিশ্বরূপদর্শনে বর্তমান সমাজকে শ্লেষের কশাঘাত। বাংলা সাহিত্যে 'স্যাটায়ার' বেশি নাই, ছোট-বড় সব পাঠকেরই উপভোগ্য পুস্তকখানি এই দিক দিয়া একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দুর্গোৎসব

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহাসমারোহে শান্ত আনন্দময় পরিবেশে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবারে পূজার কয়দিনই আবহাওয়া ভাল থাকায় প্রত্যহ বহু লোক পূজাদর্শনে আসিয়াছিলেন। পূজার কয়দিন প্রত্যহই সকলকে হাতে হাতে অন্ন-প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল, মহাষ্টমীর দিন পঁচিশ হাজারেরও অধিক ব্যক্তিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলিতেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইয়াছিল : আসানসোল, কাঁথি, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, জয়রামবাটী, জামসেদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বালিয়াটি, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, লক্ষ্ণৌ, শিলং, শিলচর, শেলা (খাসি পাহাড়) ও শ্রীহট্ট।

বিশেষ সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ চক্ষুচিকিৎসার জন্য এখনো আমেরিকায় আছেন। পর পর দুইবার অস্ত্রচিকিৎসার পর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এখন অনেকখানি ফিরিয়া আসিয়াছে, তবে এখনো ভালভাবে লিখিতে পড়িতে পারেন না, চক্ষু দিয়া জল ঝরা কমিয়া আসিলেও এখনো সামান্য ঝরিতেছে, উহাতেই দৃষ্টি কিছুটা ব্যাহত হইতেছে। ডাক্তারদের সম্মতিক্রমে তিনি আমেরিকার কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করিতেছেন। গত ৫ই অক্টোবর ব্রহ্মচারী ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া বোস্টন হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের চিকাগো, সেণ্ট লুই, সান ফ্রানসিস্‌কো, বার্কলি ও স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ২৭শে অক্টোবর তিনি হলিউডে পৌঁছিয়াছেন। প্রতি কেন্দ্রেই সমাগত বহু ভক্ত সমক্ষে ভাষণও দিয়াছেন। তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে।

হলিউড হইতে তাঁহার বোস্টন ফিরিবার কথা। সেখানে আসিলে চিকিৎসকগণ চক্ষুর অবস্থা আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তারপর তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। ফিরিবার পথে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, জেনেভা ও গ্রেজ-স্থিত মঠের কেন্দ্রগুলি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে।

বিবিধ

বেলুড় শিল্পমন্দিরের ছাত্রগণ এবারের লাইসেনসিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ১ম ও ২য় স্থান এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ১ম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কাপুনর আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছেন ভারতের উপ-অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা রোহাতগী, গত ১লা অক্টোবর। এই উপলক্ষে হিন্দীতে চিত্রসংবলিত একখানি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্যাঞ্জেস টাউন আশ্রমে (চিকাগো কেন্দ্রের শাখা) নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ, গত ১১ই অক্টোবর।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে গত ২৯শে অক্টোবর বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দ গত বৎসরের অধিবেশনের বিবৃতি পাঠ করার পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দ মিশনের গভর্নিং বডি কর্তৃক প্রদত্ত মিশনের (১৯৭১-৭২-খৃষ্টাব্দের) কার্যবিবরণী পাঠ করেন। পরে আলোচ্য বর্ষের হিসাব প্রভৃতির উপস্থাপনাদি আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হইলে অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও সভাপতি মহারাজ ভাষণ দেন। সমাপ্তি-সঙ্গীত ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার কার্য শেষ হয়।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, 'আমরা এমন একটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে আন্দোলনকে বহু মনীষী আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মান্দোলন বলে মনে করেন। এর পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি রয়েছে, আগামী দেড়হাজার বছর যে শক্তি সক্রিয় থেকে জগতের কল্যাণসাধন করবে বলে স্বামীজী বলে গেছেন ; তার অতি অল্পই, মাত্র পঁচাত্তর বছরের পথ আমরা অতিক্রম করেছি। এর ভেতর বহু বাধা বিঘ্ন দুর্যোগ এসেছে, আমাদের অন্তরকে সংশয়াকুলও করেছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তা উত্তীর্ণও হওয়া গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতেই এ আন্দোলন চলছে—এই স্থির বিশ্বাসই ভবিষ্যতে চলার পথে আমাদের পরম পাথেয়।

'আধুনিক যুগে ধর্মের বিরুদ্ধে দুটি শক্তি ক্রিয়াশীল—বিজ্ঞানের যুক্তি, আর মানুষের ক্ষুধাজনিত জড়বাদ। যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ জ্ঞান করি, যিনি কালোত্তীর্ণ হয়েও লোকশিক্ষার জন্য কালের গণ্ডীতে নিজেকে নামিয়ে এনেছিলেন, সেই স্বামীজী ধর্মের বিরুদ্ধে আধুনিক যুগের এই দ্বিমুখী আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে প্রচার করে গেছেন বেদান্তের চিন্তারাশি, অদ্বৈততত্ত্ব, যা উভয়েরই সম্মুখীন হতে সক্ষম—বিভিন্ন স্তরের সত্তাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে এবং যথার্থ সাম্যপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে।'

তিনি বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত নয় এমন বহু ব্যক্তি ও সংস্থা তাঁরই ভাবপ্রচার বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে করে চলেছে।'

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন, 'স্বামীজী বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য জগৎ উন্মুখ হয়ে ভারতের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার পথ চেয়ে আছে, রাজসিকতার চরমে উঠে এখন তারা উচ্চতর কিছু চাইছে। তাই তিনি পাশ্চাত্ত্যে ভারতীয় ভাবধারা প্রচার করে গেছেন। জার্মেনি, হল্যাণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু স্থানে এখনো এই চাহিদা তীব্র- ভারতীয় ভাবধারা তারা পেতে চায়। আমাদের স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি প্রচারকেন্দ্র ছাড়াও নিজেদের চেষ্টাতেই এর জন্য কয়েক স্থানে তারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের গ্রন্থাগার করেছে, বেদান্ত সোসাইটি খুলেছে, এমনকি ঠাকুরঘরও করেছে। বেদান্তের ভাব চায় তারা, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব চায়, ভারতীয় ভাবধারার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে চায়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আজ জড়বাদে শ্রান্ত, তাই তাদের দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতার দিকে প্রসারিত হচ্ছে। বহু স্থান থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের চাচ্ছে নূতন কেন্দ্র খোলার জন্য, লোকাভাবে আমরা তা দিতে পারছি না।' ভারতের যুবশক্তিকে স্বামীজীর ভাবে, বেদান্তের ভাবে

উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান তিনি।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ তাঁহার ভাষণে প্রথমে চক্ষুচিকিৎসা করাইতে আমেরিকা যাওয়ার জন্য স্বামী গম্ভীরানন্দের সভায় অনুপস্থিতির উল্লেখ ও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার শীঘ্র আরোগ্যলাভের কামনা করিয়া বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়বিধ সভ্যেরই স্কন্ধে মিশনের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচার, সেবা প্রভৃতি কাজের সুপরিচালনায় উভয়েরই সমানভাবে সজাগ ও সক্রিয় থাকা প্রয়োজন; আমাদের উৎসাহ যেন কখনো কোন অবস্থায় না কমে। মানবজাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিকতার মান অধোমুখী হয়, বর্তমান সময়ে যা দেখা যাচ্ছে; বহু সমস্যা রয়েছে, যার সমাধান এখনো হয়নি। এই রকম সময়েই মানুষকে আবার আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ভগবান মানবদেহে অবতীর্ণ হন, তার জীবনসমস্যার সমাধানের পথ দেখান। তিনি যখনই অবতীর্ণ হন, প্রতিবারই একই চিরন্তন সত্যকে নতুন আকারে যুগোপযোগী করে তুলে ধরেন আমাদের সামনে। এবারে ঠাকুর-স্বামীজী এসে তাই করে গেছেন। সারা পৃথিবীতে তাঁদের ভাব, তাঁদের শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে বর্তমান যুগের মানুষকে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করে তার সব সমস্যার সমাধানের পথ দেখাবে। আমরা চেষ্টা করি বা না করি, তাঁর ইচ্ছায় এটি ঘটবেই, ঘটছেও। আজকের ঈশ্বরে-অবিশ্বাসী, জড়বাদী, ভোগসর্বস্ব মানুষের মনে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাই সে শূন্যতা পূর্ণ করবে।'

যুগাবতারের কাজে সহায়তার জন্য তিনি গৃহস্থ ভক্তদের নিজ সন্তানগণকে ছেলেবেলা থেকেই ত্যাগের শিক্ষা দিতে বলেন, যদি কোন সন্তানের মনে সহজাত ত্যাগের ভাব থাকে তাহাতে বাধা না দিয়া তাহাকে উহাতে উৎসাহিতই করিতে বলেন। বলেন, মানবকল্যাণার্থে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের জন্য বহু ত্যাগী যুবকের প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া তিনি তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

[কার্য-বিবরণী পরবর্তী সংখ্যায়।]

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য:—বাংলাদেশে যে আটটি কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফের কাজ করিতেছেন, তাহাতে দানরূপে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ ছাড়া গত অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ১১,৭২,৬৪৯.৭০ টাকা খরচ হইয়াছে।

সেপ্‌টেম্বর, ১৯৭২-এর কাজ:

দিনাজপুর কেন্দ্র হইতে ৩টি বাসগৃহনির্মাণ ও ১টি টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে এবং ২৩ কেজি শিশুখাদ্য, ৫ খানি বর্ষাতি, ৪০০ খানি কম্বল, ৪৪৯ খানি ধুতি, ৪৮৬ খানি শাড়ী, ১৬টি সোয়েটার, ৮৫৭ খানি পুরাতন পোষাক, ১৬ জোড়া জুতা প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছে।

ঢাকা কেন্দ্র হইতে ৫৬.৫কেজি ও ৩৮ বাক্স শিশু খাদ্য, ২৭৫ কেজি গুঁড়া দুধ, ৮ খানি কম্বল, ১৬ খানি ধুতি, ১,০৩৫ খানি শাড়ী, ২০৭ খানি লুঙি, ৫টি সোয়েটার ও সাবান প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছে।

বাগেরহাট কেন্দ্র হইতে ৯টি নলকূপ বসানো হইয়াছে এবং নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি বিতরিত হইয়াছে—শিশুখাদ্য ২৫ কেজি, বিস্কুট ২৯ কেজি, জামার কাপড় ২৯৭ গজ, কম্বল ৩,৬৬৮ খানি, ধুতি ১,১২৪ খানি, শাড়ী ২,০৭৩ খানি, লুঙি ৬৪টি, অন্যান্য পোশাক ২৫৪ খানি, পুরাতন বস্ত্র ২,০৮৬ খানি, কোট ৩৩৯ খানি।

বন্যাত্রাণ: ১৯৭২-এর সেপ্‌টেম্বর পর্যন্ত শিলচর আশ্রম হইতে ১,৪২৬ কেজি চাউল, ৫৯৮ খানি ধুতি ও ১৩২ খানি শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্য-বিবরণী (১.৪.৭০—৩১.৩.৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। গুজরাত প্রদেশে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাজকোট আশ্রমই এখনও পর্যন্ত একমাত্র কেন্দ্র। পরিব্রাজক অবস্থায় যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের অনেকে গুজরাতের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, ঐ স্থান তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতিধন্য।

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা পাঠ আরতি প্রার্থনা, সাময়িক বিশেষ পূজা হোমাদি, নিয়মিত ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের বাহিরে ও দূর গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের আধ্যাত্মিকতা-বৃদ্ধির সহায়তায় ধর্মভাব প্রচার করা হইয়া থাকে।

গত ১৬ই আগস্ট ১৯৭১ প্রস্তাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

আশ্রমের একটি পুস্তক-প্রকাশন-বিভাগ আছে, এখান হইতে গুজরাতী ভাষায় ছোট-বড় ৭৫ খানি বই প্রকাশ করা হইয়াছে; এগুলি গুজরাত প্রদেশের জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীর প্রতি লোকের আকর্ষণ সমধিক।

আশ্রমের অন্যতম প্রধান কর্মধারা—আর্তনারায়ণের সেবাকল্পে ফ্রি আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী পরিচালনা। এই চিকিৎসালয়ের দ্বারা দরিদ্র রোগীদের অকুণ্ঠ সেবা হইতেছে; মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬৫,০০০।

গুরুকুল-প্রণালীতে পরিচালিত আশ্রমের বিদ্যার্থিমন্দিরে ৮০ জন ছাত্র থাকিবার সুযোগ লাভ করে। অধিকাংশ বিদ্যার্থীই গ্রামাঞ্চলের। ছাত্রদের শারীরিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কিছু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র বিনা-খরচে বা আংশিক খরচে থাকিতে পায়। ছাত্রদের জন্য প্রতিমায় শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা অতি মনোজ্ঞ-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

আশ্রম পরিচালিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের শিশুবিভাগটির প্রতি স্থানীয় বালক-বালিকাদের অত্যন্ত আকর্ষণ। ফ্রি লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ১৮,০৫০; দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয় ১২৭টি। ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীর সভ্যসংখ্যা—৮৫০।

গ্রন্থাগারের একটি মূল্যবান রেফারেন্স সেকশন আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা সারা রাজ্যব্যাপী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল। বক্তৃতা- ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সফলকাম প্রতিযোগীদের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

যখনই সম্ভব হয়, রাজকোট আশ্রম রিলিফ-কার্যে আত্মনিয়োগ করে। আসাম বন্যার্তসেবা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলায় খরাত্রাণকার্যে সহায়তা ছাড়া বোম্বাই আশ্রমের সহযোগে রাজকোট আশ্রম সুরাটে আর্তত্রাণকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে সুন্দর কলোনী-নির্মাণ, সমাজমন্দির-স্থাপন প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য। সুরাট, ভুজ কচ্ছ, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর, লিমডি প্রভৃতি অঞ্চলে বহু গ্রামে সেবাকার্যের স্বাক্ষর বিদ্যমান। বাংলা-দেশের গৃহহারা জনগণের জন্য সাহায্য-প্রদান উল্লেখনীয়

পরলোকে

গভীর দুঃখের সহিত স্বামী বিশোকানন্দ ও স্বামী বীতশোকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ জানাইতে হইতেছে :

স্বামী বিশোকানন্দ

স্বামী বিশোকানন্দ (প্রীতি মহারাজ) গত ১৯শে অক্টোবর রাত্রি ১১-১৫ মিনিটের সময় পেটের (কোলনের) ক্যানসার রোগে ভুগিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সংঘে যোগদান করিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। আজীবন তিনি কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোমের কর্মী ছিলেন—সুদীর্ঘকাল উহার কোষাধ্যক্ষ এবং শেষে কিছুকাল উহার প্রেসিডেন্টরূপে। আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘে যোগ দিবার পূর্বেই, ছাত্রজীবন হইতেই তিনি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দকে আশ্রমের সূচনা হইতে সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার পূর্বনাম সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, জন্ম হুগলী জেলায়, শিক্ষাদীক্ষা কলিকাতায়। তাঁহার সদাপ্রসন্ন ভাবের জন্য স্বামী শিবানন্দ দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'সন্তোষ, সন্তোষ তো?', মাস্টার মহাশয় (শ্রী-ম) তাঁহাকে 'আনন্দময় পুরুষ' বলিতেন। তাঁহার হৃদয়বত্তা এবং সস্নেহ মধুর ব্যবহারের জন্য যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারেন নাই—সকলেরই প্রিয় ছিলেন তিনি। তাঁহার অভাবে বিদ্যার্থী আশ্রমে দুষ্পূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হইল।

স্বামী বীতশোকানন্দ

স্বামী বীতশোকানন্দ (সাতু মহারাজ) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-১০ মিনিটের সময় ৬১ বৎসর বয়সে কামারপুকুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুকাল হইতে তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগিতে-ছিলেন।

তিনি স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সংঘে যোগদান করেন, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কলিকাতা স্টুডেন্টস হোমে যোগদান করিয়া পরে বেলুড় বিদ্যামন্দির ও ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ কর্মিরূপে, এবং তার পর সিঙ্গাপুর, পাটনা, বাগবাজার (শ্রীশ্রীমায়ের বাটী, কলিকাতা), সারদাপীঠ (বেলুড়) এবং কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে সংঘের সেবা করেন। বিভিন্ন সময়ে রিলিফের কাজেও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন; 'গ্রেট উইমেন অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ-প্রকাশ-সংক্রান্ত কাজে তাঁহার অবদান যথেষ্ট। তিনি সুকণ্ঠ, সংগীতানুরাগী ছিলেন, আনন্দময় মধুর প্রকৃতির জন্য সর্বজনপ্রিয় ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহাদের আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

গভীর দুঃখের সহিত আমরা নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের পরলোকগমন-সংবাদ জানাইতেছি :

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু গত ১৫ই অক্টোবর ক্যান্সার রোগে ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতা পার্ক ভিউ নার্সিং হোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এম. এস-সি পাশ করিবার পর কিছুদিন তিনি আলিগড় ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পরে উহা ছাড়িয়া দিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া মহাত্মাজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। পরে আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব নিরীক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর, অনুন্নত ও উপজাতীয় বিভাগের কমিশনার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংযুক্ত ছিলেন তিনি।

উমেশচন্দ্র সেন

উমেশচন্দ্র সেন গত ৭ই অক্টোবর সকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি।

এম. এস-সি পাশ করিবার পর তিনি কিছুদিন বোস ইন্‌স্টিটিউটে কাজ করেন। পরে, চিরকুমার থাকিয়া ঢাকা বিক্রমপুরের কলমা গ্রামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কর্মিরূপেই জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তান হওয়ার কিছু পরে কোন্নগরে আসিয়া তিনি বাস করিতেছিলেন।

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ গত ১৩ই অক্টোবর মধ্যরাত্রে ৭৭ বৎসর বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতাস্থ নিজ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি; শ্রীশ্রীমা, এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহারাজগণের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। যশোহর জেলার নড়াইল তাঁহার জন্মস্থান। কৈশোরে স্বদেশী আন্দোলনের সহিতও তিনি সংযুক্ত ছিলেন।

রেণুকা সেন

হুগলীর বিশিষ্ট ভক্ত ৺নফরচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, স্বামী বিরজানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা রেণুকা সেন গত ১৭ই অক্টোবর দ্বিপ্রহরে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীভগবচ্চরণে ইঁহাদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

(পুনর্মুদ্রণ)

[কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শেষ প্রবন্ধ : শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-রচিত 'রসতত্ত্ব'।]

ঝালোয়ার দুহিতা।[১]

(ঐতিহাসিক ধর্ম্ম-উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝালোয়ার সুসজ্জিত, উজ্জ্বল আলোকমালায় দশদিক আলোকিত, বিবিধ বর্ণের পতাকা উড়িতেছে ফুলহারে পুরী বেষ্টিত, নৃত্যগীতবাদ্যধ্বনি, আমোদিনী নগরী, আমোদিনী কুমারীর বিবাহ উৎসবে আমোদিনী হইয়াছে; মন্দার-রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহের সহিত রাজকুমারী কিশোরীর বিবাহ, ইতিপূর্ব্বে দেবমন্দিরে পরস্পরের শুভদৃষ্টি হইয়াছিল, পরস্পরের মনোভাব নয়নে প্রকাশ হইয়াছিল, পরস্পরের প্রাণ বিনিময় হইয়াছিল। দূতী, প্রেমলিপি, প্রেম-উপহার প্রভৃতি প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়াছে। আজি প্রেমব্রতে উভয়েই ব্রতী হইবেন, আজীবন প্রেমাস্বাদ ব্রতের সঙ্কল্প, প্রাণাহুতিদানে ব্রত সাঙ্গ হইবে। সখী-পরিবেষ্টিতা কুমারী কিশোরী বিষাদ-মিশ্রিত আমোদে নীরব, অধীরা, হৃদয় নাচিতেছে, আশা পলকে প্রলয় করিতেছে, কদাচিৎ দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। দূরে কোলাহল উঠিল, সুবাসিত পতাকার সৌরভ পবন বহিতে লাগিল, গগনের গভীর নিক্কনে বাদ্যধ্বনি উঠিল, আতসবাজি যেন পূর্ণচন্দ্র ধরিবার মানসে পুনঃপুনঃ উত্থিত হইতে লাগিল, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ ফুল ছড়াইতেছে, পরিমলে মত্ত করিতেছে, সেনা-বেষ্টিত রাজকুমার অশ্ব-পৃষ্ঠে নগরে প্রবেশ করিল। সুন্দর মুখকান্তি, গম্ভীর-ভাবাপন্ন, বীরপদে সৈন্যশ্রেণী চলিতেছে, দর্শন-লালায়িত রমণীচক্ষু চতুর্দ্দিকে পদ্মফুলের ন্যায় বিকশিত হইল, জন-কোলাহল বৃদ্ধি পাইল, রাজপুরে রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা আসিয়া কহিল, "সর্দ্দার ঠাকুর ডাকিতেছে", বৃদ্ধা আগে আগে চলিল, কুমারী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই, কুমারী কহিলেন, কোথায়, পিতা কোথায়? পরিচারিকাও নাই—কেহই উত্তর দিল না, ধীরপদে কুমারী ফিরিতেছেন। অকস্মাৎ পীন বাহুদ্বয় তাঁহাকে বেষ্টন করিল, বীরপুরুষ বক্ষে তুলিয়া লইল। কুমারী চমকিতা, অভিভূতা, কথা সরিল না, বীরপুরুষ অশ্ব-পৃষ্ঠে তাঁহাকে লইয়া লম্ফ দিয়া উঠিল, বায়ুবেগে অশ্ব চলিতেছে, দূরে অস্ত্র-ঝনাৎকার কুমারীর কর্ণে পশিল, বীরকণ্ঠে সৈন্য-সঞ্চালন, তড়বড়ি অশ্বপদধ্বনি, পুনঃপুনঃ সিংহনাদ ও আর্ত্তনাদ দূরে হইতেছে, বেগবান বাজী কুমারীকে লইয়া বায়ুবেগে চলিল।

ক্রমে ক্রমে আর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না, আর জনসমাগম নাই, ক্রমে অতি নিভৃতস্থানে ঘোটক আসিয়া পৌঁছিল; অতি সমাদরে বীরপুরুষ রাজকুমারীকে বক্ষে ধরিয়া

১ ঝালোয়ার-দুহিতার ছয় পরিচ্ছেদ প্রথমে মৎসম্পাদিত সৌরভ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া সৌরভ বন্ধ হইয়া যায়। আবশ্যক-বোধে ঝালোয়ার-দুহিতা এক্ষণে অনেকস্থলে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে নূতন পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সংযোজিত করিতে হইয়াছে। সুতরাং, সৌরভের পাঠকবর্গ প্রথম পরিচ্ছেদের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন।—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমারী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন, মনোহর কুঞ্জবন, মনোহর পুষ্প-বিনির্ম্মিত আসনে তিনি আসীনা। করযোড়ে জানু পাতিয়া বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "সুন্দরি, দেখ, কুম্ভরাণা তোমার পদতলে, মার্জ্জনা কর, আমি মদন-তাড়নে উন্মাদ হইয়াছি, উন্মাদকে ক্ষমা কর, দাসকে ক্ষমা কর, করুণা-কটাক্ষে কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টি কর," কুমারী নীরব, কুম্ভরাণা আবার সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "কথা কও, তিরস্কার কর, দোষ করিয়াছি, তাহার শাস্তি দাও!" কোনও উত্তর নাই, অস্ত্রধারী প্রহরী-রক্ষিত, সুসজ্জিত শিবিকা আসিল, রাণা কুমারীকে শিবিকায় বসাইলেন, অশ্ব পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এদিকে ঝালোয়ারে হুলস্থুল হইতেছে, মন্দার ও ঝালোয়ার-সৈন্য রাণাসৈন্য আক্রমণে পরাজিত, মন্দার-রাজকুমার আহত, রুধিরধারা বহিতেছে, তথাপি রণভঙ্গ নাই, দূরে তূর্য্য ধ্বনি হইল, দেখিতে দেখিতে রাণাসৈন্য কোথায় চলিয়া গেল, আর যুদ্ধ নাই। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মন্দার-রাজকুমার ঝালোয়ার সর্দ্দারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, রাণা-সৈন্যের সহিত সমর অবসান হইল, আসুন, আমরা উভয়ে যুদ্ধ করি। আপনার কলঙ্ক মোচন বা আমার হৃদয়-অগ্নি এই স্থানে নির্ব্বাণ হোক্। ঝালোয়ার কহিলেন, আমায় দোষারোপ করিতেছেন কেন? মন্দার-রাজকুমার উত্তর করিলেন, কিরূপে কুম্ভরাণা রাজপুরে প্রবেশ করিলেন, কিরূপে কুমারীকে অপহরণ করিলেন, তাহা আর কেহ বলিতে পারে না। অস্ত্রমুখে প্রকাশ পাইত, আপনি যুদ্ধ করিবেন না, আমারও প্রাণের লালসা হইতেছে, প্রতিহিংসা-আশায় প্রাণ রাখিলাম। বুঝিতেছি, হৃদয়-অগ্নি শতগুণে জ্বলিবে। দাবানলের ন্যায় জ্বলিবে, অহর্নিশি জ্বলিবে, চিতানলে নির্ব্বাণ হয় কি না, জানি না, কিন্তু প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা-আশায় দারুণ জ্বালা সহ্য করিব। ঝালোয়ার ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটিতে লাগিল, মন্দারসৈন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, স্বর্গচ্যুত তারার ন্যায় অকস্মাৎ রাজকুমার পড়িয়া গেলেন, যত্নে সেনাগণ রাজকুমারকে লইয়া মন্দার অভিমুখে চলিল, মন্দার পৌঁছিবামাত্র সুযোগ্য চিকিৎসক চিকিৎসায় নিযুক্ত হইল, পীড়ার কোনও উপশম হইল না, রাজকুমার ছয়মাস কাল অচেতন অবস্থায় রহিলেন, অতি সতর্ক হইয়া কর্ণপাত করিলে, অতি জড়তাপূর্ণ ক্ষীণস্বরে কিশোরীর নাম উচ্চারণ শোনা যাইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধন্নু-নামে চারণ-বংশীয় এক ব্যক্তি রুগ্ন অবস্থায় বীরেন্দ্র সিংহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে, ইতিপূর্ব্বে একজন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলেন যে, "কোনও চারণ-হস্তে কুম্ভরাণার মৃত্যু," সেই গণনা অনুসারে রাণা চারণদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, চোহানেরা প্রতিশোধ-আশায় মন্দারে আশ্রয় লয়, চারণেরা রাণার দ্বেষী হইল, তৎকালে রাণা প্রবল প্রতাপশালী, সহসা কোন রাজা তাঁহার বিরোধী হইতে সাহস করিতে পারিত না, ঈর্ষ্যা-বশতঃ মন্দার-রাজপুত্র রাণা-বিরোধী হইবে, এই নিমিত্ত চারণেরা মন্দার-রাজকুমারকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। ধন্নুর নিকট রাজকুমার শুনিলেন যে, কিশোরীর পিতার

রাণাকুম্ভে কন্যা-সম্প্রদান চির বাসনা ছিল। রাণাও মীরাপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া নূতন কোন কীর্তির অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমন সময়ে কিশোরীর কথা শ্রুত হইলেন। ঝালোয়ারে লোক পাঠাইলেন। উত্তর পাইলেন যে, মন্দার-রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, রাণা অর্থ দিলেন, ঝালোয়ার সর্দারের রাণাকে কন্যা-সম্প্রদান অভিপ্রেত, কিন্তু সাহস করিয়া লোকপাঠাইতে পারেন নাই, রাণার পদ তাহা অপেক্ষা অতি উচ্চ, মান্দারে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, এখন অন্যমত করিলে বড় লোকাপবাদ হইবে, তবে যদি রাণা বলপূর্ব্বক কুমারীকে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিক বজায় থাকে, যড়যন্ত্রমত কুম্ভরাণা ঝালোয়ার-গৃহে প্রবেশ করেন, ঝালোয়ার-দুর্গেই তাঁহার সৈন্য থাকে, সহজেই কিশোরী অপহৃতা হন।

প্রকাশ্য আক্রমণে রাণাকে পরাজয় করা অসম্ভব, কি উপায়ে প্রতিশোধ দিবেন, দিবারাত্র মন্দার-রাজপুত্র চিন্তা করেন, ধন্নু বলিল, উপায় আছে - মীরা-বাঈ নামে কুম্ভরাণার এক অলৌকিক রূপগুণসম্পন্না বনিতা আছেন, কুম্ভরাণার সহিত মীরার বিবাহ হইয়াছিল, এইমাত্র, কিন্তু তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ জানেন, আর সকলেই প্রকৃতি, তিনি বিবাহের পর রাণাকে বলেন যে, তাঁহার একটি ব্রত আছে, ব্রত সাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষ-ভাবে রাণার সহিত আলাপ করিবেন না, রাণাও প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, ব্রত-ভঙ্গ করিবেন না, অঙ্গীকার-কালীন রাণা বুঝেন নাই যে, হরিনাম-ব্রত দেহ থাকিতে সাঙ্গ হইবে না, এখন বুঝিয়াও প্রতিজ্ঞার অনুরোধে প্রেমাভিলাষে মীরার গৃহে যাইতেন না। মীরা বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, বৈষ্ণব লইয়া হরি-বাসর করেন, গোবিন্‌জীর উদ্দেশে কবিতা লেখেন, লোকে সাধারণ কবিতা বোঝে। মীরার নামে কলঙ্ক রটিল, বৈষ্ণবী ভ্রূক্ষেপ করেন না, হরিনাম-বিতরণে সঙ্কোচ নাই, দিনরাত্রি জ্ঞান নাই, স্থান অস্থান বিবেচনা নাই,- সাধু দস্যু প্রভেদ নাই, সকলের সঙ্গে হরিগুণগান করিয়া বেড়ান। ধন্নুর মুখে এই সংবাদ বীরেন্দ্রসিংহ পাইলেন, ভাবিলেন, মীরাকে অপহরণ করিবেন, ছদ্মবেশে সৈন্য লইয়া নগরের আশে পাশে রহিলেন। ধন্নু সংবাদ দিল, "মীরা বাহির হইয়াছেন।" সসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটীরে ডুগ্‌ডুগি বাজিতেছে, তালরসপান-উন্মত্ত অক্কা-বক্কা দস্যুদ্বয় সহচর-বেষ্টিত নাচিতেছে। রাণাপুত্র উদা তথায় উপস্থিত, রাজপুত্রকে দেখিয়া দস্যুদ্বয় আরও নৃত্য করিতে লাগিল, ডুগ্‌ডুগি আরও ঝঙ্কার করিতে লাগিল, কর্কশ গীতধ্বনি দিক পূর্ণ করিল, নীরব যামিনী ত্রাসিত, উদা বলিতে লাগিল,—রাখ, এখন গান রাখ, কথা শোন, রাজদণ্ড হইতে তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে কে? অক্কা-বক্কা বজ্রনাদে উত্তর করিল, উদা! উদা! উদা! আমাদের রক্ষা করিয়াছেন!!!

উদা।—রাজাকে মান কি কাহাকে মান? দস্যুদ্বয় আবার বলিল, মানিয়াছি বাপকে, মানিয়াছি মাকে, আর মানি উদাকে; আর কাহাকেও মানি না।

উদা পুনর্ব্বার বলিল, "উদা যা বলে, তাহা করিতে পারিবে কি?"

'প্রাণ দিয়া করিব, প্রাণ দিয়া করিব'।

উদা।—রাজমন্ত্রী হইতে চাও কি?

দস্যু। না, না, খাজনা লুটিতে চাই।

উদা।—ভাল রাজমন্ত্রী হইতে না চাও, অর্থ চাও কি ?

দস্যু।—চাই, তাড়ি খাইতে চাই, টুম্নাকে দিতে চাই, নাচিতে চাই, গাহিতে চাই আর খাজনা লুটিতে চাই।

উদা।—তোমাদের মনস্কামনা এখনি সিদ্ধ হইতে পারে, প্রতিবন্ধক কে জান ? কুম্ভরাণা—

অন্ধা, বন্ধা কহিল, সে যে তোমার বাপ।

উদা :—হাঁ, আমার নবীন যুবা বাপ। দিন দিন যৌবন ফিরিতেছে, আজ সতীর সতীত্ব হরণ, কাল কুমারী অপহরণ, পরশু আবার নূতন কুমারী, নূতন সতীর অন্বেষণ, রাজ্যে শীঘ্র হলস্থুল বাধিবে ; মন্দার-রাজ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খেপিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা রাজকুমারী অপহরণ প্রতিশোধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুরী আক্রমণ করিবে। রাণার কামতৃপ্তি হেতু যে কতই শোণিত ব্যয় হইয়াছে, তাহা ঘরে ঘরে অনাথা ও শোকপূর্ণা বিধবা দেখিলে বুঝা যায়। চিত্রগুপ্তের পাঁজি পুঁথি ইঁদুরে কাটিয়াছে, রাণার মৃত্যু নাই।

দস্যুদল কম্পিত হৃদয়ে উত্তর করিল, কি বল ? রাণা যে তোমার বাপ !

উদা। হাঁ, আমার নবীন যুবা বাপ ; এদিকে সংসার যেমন প্রেমের তরঙ্গ, বৈষ্ণব বৈরাগী কেহ বঞ্চিত হন না, এঁর তেমনি নিত্য নূতন চাই।

অন্ধা, বন্ধা, রোষ-কষায়িত লোচনে উত্তর করিল, রাজকুমার ! তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এই নিমিত্ত সহিলাম, মীরাবাইয়ের নিন্দা করিও না, মীরাবাই আমাদের মা, তোমরা রাজা-রাজড়া, মা-বাপের নিন্দা করিতে পার, আমরা ছোটলোক, মা-বাপকে মানি, যাও, রাজকুমার, এখন চলিয়া যাও। এখনকার কথা নয়, এখন রক্ত গরম হইয়াছে। উদা থাকিতে সাহস করিল না, ক্ষুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় পশ্চাৎ চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। দূরে বামাকণ্ঠের হৃদয়ভেদী হরিগুণগান উঠিল। অন্ধা বন্ধা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। সঙ্গীত-ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ; মুগ্ধ হইয়া শাখী পাখী শুনিতেছে, সকলে শুনিতেছে, পাষণ-হৃদয় দস্যুদল মুগ্ধ, সঙ্গীত কুটীরদ্বারে, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত সুন্দরী হরিগুণগান গাহিতেছে, সুন্দরীর রূপ ধরে না, মুখজ্যোতি দেবভাব প্রকাশ করিতেছে, দেবীকণ্ঠে হরিধ্বনি অতি সুমধুর ; অন্ধা, বন্ধা আসিয়া প্রণাম করিল। সুন্দরী বলিল, বাবা, হরিবল। অন্ধা বন্ধা সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিধ্বনি করিয়া অন্ধা, বন্ধা নৃত্য করিতেছে, মদোন্মত্ত দস্যু-দল হরিধ্বনি করিতেছে, অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত নাম, অদ্ভুত রমণী, দেবকায অতি অদ্ভুত ! গভীর গর্জ্জনে হরিধ্বনি গগন ভেদিয়া উঠিতেছে, অকস্মাৎ "জয় মন্দার" শব্দে সিংহনাদ হইল, দেখিতে দেখিতে অস্ত্রধারী অশ্বরোহিগণ দস্যুদলকে বেষ্টন করিল, কিন্তু রমণীর ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মাদিনী দস্যুদললইয়া হরিগুণগান করিতেলাগিল, হরিনামতরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেলাগিল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ অজস্রচ্ছল নাম-তরঙ্গ, প্রেম-তরঙ্গ বহিতে লাগিল। অস্ত্রধারিগণ নীরব, দস্যু-বেষ্টিতা পূর্ণ-যৌবনা কামিনী, আলুলায়িত বেণী, প্রেম-উন্মাদিনী, প্রেমে হরিনাম করিতেছে, অশ্ব হইতে সর্দ্দার অবতীর্ণ হইল ; ধন্নুর উত্তেজনায় রাজকুমার হরিভক্তিপ্রদায়িনী মীরাকে অপহরণ করিয়া

কুম্ভরাণাকে প্রতিশোধ দিবেন, এই আশায় আসিলেন, কিন্তু হরিনাম-সঙ্কীর্তন শ্রবণে তাঁহার ভাবান্তর হইল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুনর্ব্বার অশ্বারোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন, "ফিরিয়া চল." সৈন্য শ্রেণী ফিরিয়া চলিল। অকস্মাৎ সর্দ্দার কহিল, "পলাইবার পথ নাই, কুম্ভরাণা সসৈন্যে বেষ্টন করিয়াছে"। ছদ্মবেশে রাণার নগর পরিভ্রমণ করা অভ্যাস ছিল, জনমুখে সংবাদ লইতেন, অধ্যক্ষেরা কিরূপ রাজ্যশাসন করে, যখন মন্দার-সৈন্য লুক্কায়িত ভাবে রাজধানীতে প্রবেশ করে, রাণা তাহা দেখিয়াছিলেন, সত্বর সুসজ্জিত হইয়া আক্রমণে আসিলেন। দূর হইতে বজ্রনাদে শব্দ আসিল ; 'অস্ত্র ত্যাগ কর ;' মন্দার সর্দ্দার উত্তর করিল, "অস্ত্রধারীরা অস্ত্র লইয়া মরে, তোমাদের রাণাকে বল, দূর হইতে দেখুন, কিরূপে ক্ষত্রিয় প্রাণত্যাগ করে," সুশিক্ষিত সেনার পশ্চাৎ থাকিয়া মন্দার-রাজকুমার বীরত্ব প্রকাশ করে না। রাণাশ্রেণী হইতে দ্রুতবেগে একটি অশ্বারোহী আসিয়া সর্দ্দারের সম্মুখীন হইল। আগত অশ্বারোহী কহিল, "রাণা সৈন্যের পশ্চাতে থাকে না, রাণা তোমার সম্মুখে ! বিক্রম প্রকাশ কর"। বেগে মন্দার-রাজকুমার অসি নিষ্কাসিত করিয়া রাণার প্রতি সঞ্চালন করিলেন ; ঝনাৎকার উঠিল ! অগ্নি উঠিল। অশ্বদ্বয় পতিত হইল, বীরদ্বয় ভূমিতলে ! কাহাকেও আর লক্ষ্য হয় না। চতুর্দ্দিকে চন্দ্রালোকে তরবারি ঝকিতেছে ! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতেছে। রব নাই ! নীরবে কেবল অস্ত্র-ঝনাৎকার, উভয় সৈন্য দেখিতেছে ! দেখিতে দেখিতে উল্কার ন্যায় একটা তরবারি উত্থিত হইল। মন্দার-রাজকুমার নিরস্ত্র, কুম্ভরাণা বলিলেন, "স্বদেশে ফিরিয়া যাও," মন্দার-রাজকুমার ক্রোধে অবসন্ন ; মৃত্যু-কামনায় নিরস্ত্র আক্রমণ করিলেন, রাণা তাহাকে হস্ত-সঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দার-রাজকুমার ভূমে পতিত হইলেন। মন্দার-সৈন্যদিগকে রাণা আদেশ করিলেন, "যাও, তোমাদের রাজকুমারকে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাও ; পুনর্ব্বার যখন আসিবে, ভালরূপ প্রস্তুত হইয়া আসিও !" [ক্রমশঃ]

পরমহংসদেবের উপদেশ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)।

(১) যেমন আঁব, পেয়ারা ইত্যাদি আস্ত ফল ঠাকুরের সেবায় ও সকল কাজে লাগ্‌তে পারে, কিন্তু একবার কাকে ঠুক্‌রে দাগি করলে, আর দেব-সেবায় সে ফল দেওয়া যায় না, ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে না, আপনি খাওয়া উচিত নয়, সেইরূপ পবিত্র-হৃদয় বালক ও যুবাদের ধর্ম্মপথে লয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কেন না, তাদের ভিতর বিষয়-বুদ্ধি একেবারে প্রবেশ করে নাই। একবার বিষয়-বুদ্ধি ঢুকলে পরমার্থ-পথে লয়ে যাওয়া ভার।

(২) দুই রকম আমি আছে ; একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি ; আর পাকা আমি হোচ্চে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ।

(৩) একদিন স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞান লাভ হয় না কেন? পরমহংসদেব উত্তরে বলেন, যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে? তাহাদের মন সর্ব্বদা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত থাকবার দরুন জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

(৪) প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে মন স্থির করতে হয়। তা না হলে অনেক দেখে শুনে মন চঞ্চল হয়। যেমন দুধে জলে একসঙ্গে রাখলে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মন্থন করে মাখন কত্তে পারলে, জলের সঙ্গে মেশে না, সে জলের উপর ভাসে, তেমনি যাদের মন স্থির হয়েছে, তাহারা যেখানে সেখানে বসে সর্ব্বদা ভগবানকে চিন্তা করতে পারে।

(৫) লুকোচুরী খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেইরকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ী ছুঁয়েছে, তাকে আর চোর করবার যো নেই। সংসারে সেইরকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁহাকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করিতে পারে না।

আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এখানে ১৯।২০ দিন থাকিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ এইবার বলিব। তিব্বতে প্রবেশ বিষয়ে অনেক রাজকীয় বিঘ্ন আছে। তাহারা ইউরোপীয়দিগকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, কেহ কখন গোপনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে। আর দেশীয়, যাহারা ইংরাজ রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে, তাহাদিগকেও বড় সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা ভাবে, এ ব্যক্তি ইংরাজের চর, এ আমাদিগের দেশের নক্সা লইয়া ইংরাজদিগকে দিবে। সন্ন্যাসীর উপরও তাহাদের, বিশেষ সন্দেহ। তবে জটাজুটধারী হইলে আর তত আপত্তি করে না। যদি কোন প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনপরিচিত লোক তিব্বতীয় রাজার নিকট জামিন হয়, তবে রাজার রাজ্যের ভিতর প্রবেশের অনুমতি হয়। আমরা আলমোড়া হইতে আসিবার সময় কাহাকেও স্পষ্ট বলিয়া আসি নাই, কোথা যাইতেছি, কারণ, বলিলে কেহ বাধা দিতে পারেন। খানিক দূর আসিয়া আমরা আলমোড়াস্থ সর্ব্বজন-পরিচিত লালা বদরীশাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, আপনি পেস্কার খড়ক সিংহকে আমাদের জন্য একখানি পত্র লিখিবেন, এই বদরীশা আলমোড়াস্থ একজন প্রসিদ্ধ বণিক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপর তাঁহার অচলা ভক্তি, তাঁহার সকল ভক্তগণকেও তজ্জন্য অতিশয় যত্ন করিয়া থাকেন। সরল সদানন্দ ভাব, অমায়িকতা, সাধুভক্তি ও পুরুষোচিত তেজ এই বদরীশাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ইঁহার ন্যায় সাধু গৃহস্থ কলিযুগে সচরাচর পাওয়া যায় না। আলমোড়া হইতে ৬৯ মাইল দূরে এসকোট নামে এক ক্ষুদ্ররাজ্য আছে, তথাকার রাজার নাম পুষ্কর পাল। পুষ্কর পালের খ্যাতি এই পাহাড়ের চতুর্দিকে

শুনিতে পাওয়া যায়। খড়ক সিং ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহাকে সচরাচর লোকে পেস্কারজী বলিয়া থাকে। তিব্বতীয় সীমা-সংক্রান্ত সমুদায় কার্যো ইঁহাকে কুমায়ুনের বর্ত্তমান ডিপুটি কমিশনর গ্রেসির (Graoy) সহায়তা করিতে হয়। আমাদের গার্ব্বিয়াঙের দিকে আসিবার পথে সকলেই আমাদের মানস-সরোবর যাত্রার সংকল্প অবগত হইয়া বলিত, খড়ক সিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই জানিও, তোমাদের মানস সরোবর দর্শন হইয়াছে। কেহ কেহ বলিত, খড়ক সিং বড় হুঁসিয়ার আদমি, অর্থাৎ বিচক্ষণ লোক। আমরা যখন এসকোটে পঁহুছিলাম, শুনিলাম খড়ক সিং Graoy-র সহিত গার্ব্বিয়াঙের দিকে গিয়াছেন, গার্ব্বিয়াঙে সাক্ষাৎ হইবে ভাবিলাম। কিন্তু সেইখানে পঁহুছিয়াই শুনিলাম, কুমার Gracy সাহেবের সহিত কালাপানির দিকে গিয়াছেন। সকলে বলিল, এখানে কিছুদিন অপেক্ষা করুন, কুমার শীঘ্রই ফিরিবেন। ফিরিয়া আপনাদের সমুদয় বন্দোবস্ত করিবেন; তাঁহার নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই, তবে এখানে গোবরিয়া পণ্ডিত নামে এক ভুটিয়া বণিক থাকেন, তিনি খড়ক সিং-এর অনেক কথা শুনেন। গোবরিয়া পণ্ডিতের সহিত ইংরাজ, ভুটিয়া ও তিব্বতীয় সকলের সহিতই সদ্ভাব আছে, তিনি বাণিজ্য উপলক্ষ্যে তিব্বতে গমনকালে আপনাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনিও এক্ষণে সাহেবের সহিত উপরে গিয়াছেন। সুতরাং আমরা এখানে থাকিয়া গেলাম।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমরা ত কালাপানি যাইয়া খড়ক সিং ও গোবরিয়া পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম তাহা করিলাম না কেন? ইহার কারণ, গার্ব্বিয়াঙের অগ্রবর্ত্তী পথ অতি দুর্গম, অনেক স্থানে থাকিবার কোন আশ্রয় নাই; আর কিছু দূর গিয়াই জ্বালানি কাষ্ঠ অপ্রাপ্য, কারণ বৃক্ষের অভাব। লোকই অনেক স্থানে নাই, ভিক্ষা কি করিয়া মিলিবে, যদি কিছু মেলে তাহা কেবল ছাতু। আরও অন্যান্য অসুবিধা ছিল। গোবরিয়া ত তখন বাণিজ্য যাত্রা করিতে যায় নাই। সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। তাহার মেষপাল, লোকজন সব এখানে।

পাঠক, এখানকার বাণিজ্য-যাত্রা দেখিতে বড় চমৎকার। ৪০০।৫০০ মেষ চলিতেছে, প্রত্যেকের উপর মাল বোঝাই, দুটী করিয়া থলি রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একজন মেষরক্ষক যষ্টিহস্তে মেষ-পাল তাড়াইয়া লইয়া চলিতেছে, পালের সঙ্গে সঙ্গে একটী বৃহৎ কুকুর রহিয়াছে। ভুটিয়ারা উপরে তিব্বতের সহিত প্রধানতঃ চাল, ডাল, গুড়, নানাবিধ বিলাতী কাপড় প্রভৃতি ও নীচে প্রধানতঃ পশম, নুন, সোহাগা প্রভৃতি লইয়া গিয়া কানপুর, রামনগর, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিয়া থাকে।

আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। লোকজন অনেক কালাপানির দিক হইতে আসিতেছে, সংবাদ দিতেছে, আজ সাহেব এখানে, কাল ওখানে, কিন্তু কেহই ঠিক বলিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ বা বলিতেছে, সাহেব এপথ দিয়া ফিরিবেন না। আমরা নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া এক পত্রবাহকের হস্তে খড়ক সিং-এর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলাম। এ ব্যক্তি সাহেবের চিঠিপত্র গার্ব্বিয়াঙ পোষ্ট আফিস হইতে সাহেবের নিকট লইয়া যাইত। এই পত্রে লিখিলাম, আমরা দুইজন বাঙালী সাধু, মানস-

সরোবর দর্শনে ইচ্ছা, আপনি বোধ হয়, আলমোড়াস্থ লালা বদরীশার পত্র পাইয়া থাকিবেন, অতএব, অনুগ্রহ করিয়া গোবরিয়া পণ্ডিতকে বলিয়া আমাদের মানস-সরোবরে যাত্রায় সুবিধা করিয়া দিলে ভাল হয়। পত্রের উত্তর শীঘ্রই আসিল। কুমার অতি বিনয়ের সহিত লিখিলেন, আমি বদরীশার পত্র এক্ষণেও পাই নাই, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। সাধুসেবাই আমার জীবনের ব্রত। সাধুর কিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। আমি গোবরিয়া পণ্ডিতকে আপনাদের কথা বলিব ; কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। সীমা লইয়া ইংরাজ ও তিব্বতীয়ের মধ্যে বড় গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার লোকেরা ইংরাজ তিব্বত ও নেপাল তিন রাজাকেই কর দিয়া থাকে। ইংরাজ এক্ষণে বলিতেছেন, তোমাদের তিব্বতীয়দিগকে কর দিবার প্রয়োজন কি ? তোমরা আমাদের প্রজা। ইহা শুনিয়া তিব্বতীয় রাজার গবর্ণর (ঝঙ পঙ--যিনি অনতিদূরে বাস করেন) বলেন, আচ্ছা বেশ, কিন্তু আমি ইংরাজ-রাজ্যস্থ কোন ভুটিয়া ব্যবসায়ীকেই আমার রাজ্যে ব্যবসা করিতে দিব না। সুতরাং, এ সময়ে ইংরাজ রাজ্য হইতে কোন ব্যবসায়ী যাইবে না। সুতরাং, আপনাদের যাওয়ার অসুবিধা ; আরও অসুবিধা, এক্ষণে তিব্বতীয়েরা যেরূপ চটিয়াছে, তাহাতে আপনাদের আদৌ প্রবেশ করিতে দেয় কিনা সন্দেহ। সুতরাং সাহেব এখান হইতে নীচে চলিয়া গেলে তবে আপনাদের যাওয়া কর্ত্তব্য। আর, যদি সাহেবের গার্বিয়াঙের পথ দিয়া যাওয়া হয়, তবে আমিও আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিব। আমাদিগকে অগত্যা কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইল।

ইতিমধ্যে আর একটী অনুকূল ঘটনা ঘটিল। পথে আমাদের সহিত দুইটী হিন্দুস্থানী সাধুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের সহিত খানিক দূর আসিয়াছিলাম। একদিন তাহারা আমাদিগকে অগ্রে যাইতে বলিয়া পশ্চাৎ আসিবে বলিল, কিন্তু আসিল না, পথিমধ্যে অপরের মুখে শুনিলাম, একজনের কিঞ্চিৎ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দেরী হইতেছে। আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব হইল, তবে আমরা পথিকের দ্বারা তাহাদিগকে আমাদের সংবাদ পাঠাইলাম ও তাহাদের সংবাদ লইতে লাগিলাম। একদিন হঠাৎ তাহারা গার্বিয়াঙে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল। এই মহাদুর্গম পথে সঙ্গী মিলিল দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম।

মানুষ যাহা সদা সর্ব্বদা দেখে, তাহার প্রতি তাহার বড় আকর্ষণ থাকে না। বাঙালীর দেশে একজন বাঙালী অপর বাঙালীকে চাহিয়া দেখে না, কিন্তু পশ্চিমে গমন কর, তথায় একজন বাঙ্গালী দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত বন্ধুত্ব হইয়া যায়। আমরা যে পথে চলিয়াছি, তথায় একটীও বাঙ্গালী নাই, সকলেই পাহাড়ী। সুতরাং দেশী লোকের সহিত সাক্ষাৎ বড় আনন্দের বিষয়। পাহাড়ী লোকেরা "দেশ" শব্দে সমতল প্রদেশ বুঝিয়া থাকে। আবার হয়ত যেখানে কোন মনুষ্য দর্শনের সম্ভাবনা নাই, সেখানে যে কোন জাতীয় মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেই মানুষ তৃপ্ত হয়। মানুষের সঙ্গ-স্পৃহা যাইয়াও যায় না—সঙ্গস্পৃহা তাহাকে কোনমতে ছাড়িতে চাহে না।

পণ্ডিত আমাদিগকে বলিল, উপরে যাইবার জন্য গুড়পাপড়ি প্রস্তুত করিয়া লউন।



দিব্য বাণী

যস্যা নিরুপাধিজ্যোতীরূপায়াঃ শিবসংজ্ঞয়া।
ব্যপদেশঃ পরাং তাং ত্বামম্বাং নিত্যমুপাস্মহে ॥ —শিবদৃষ্টি

নিরুপাধি জ্যোতিরূপা পরমা শকতি!
তোমাকেই ডাকে শিব ব'লে—
(অভেদ তুমি ও শিব,) চরণ-কমলে
নিত্য তব করি মা প্রণতি।

শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্ ॥
শক্তিরূপং জগৎ সর্বম্ …। —বৃহৎতন্ত্রসার

শক্তি শিব, শিবই শক্তি; শক্তি ব্রহ্মা, শক্তি জনার্দন,
শক্তি ইন্দ্র, শক্তি রবি, শক্তি চন্দ্র গ্রহ অগণন;
(শক্তি ছাড়া নাই কিছু,) শক্তিময় এ বিশ্বভুবন।

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ।
তত্রৈকভাগঃ সম্প্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ ॥
মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ।
সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী ॥
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা।—দেবীভাগবত, ১১।৮।৬১-৬৬

সচ্চিদ্-আনন্দ আর মায়া নামে খ্যাত
দুইটি সত্তায় আমি হ'য়ে প্রতিভাত
সৃষ্টিকালে, সমুদয় বিশ্ব সৃষ্টি করি।
মায়া শক্তি; শক্তিমতী আমিই ঈশ্বরী।
চন্দ্র ও চন্দ্রিমা যথা অভিন্ন সত্তাই
আমি আর শক্তি মোর অভিন্ন সদাই।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমা নিজেই বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি অভেদ, 'যেই ঠাকুর, সেই আমি'। আবার বলিয়াছেন, তিনি মাকালী। শিবুদা দুইবার সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে একথা শুনিয়াছেন। তিনিই যে লক্ষ্মী, শ্রীরাধা, একথাও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, তিনি মহামায়া। বলিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই তাঁহার সন্তান।

অর্থাৎ, যাঁহাকে শক্তি বলা হয়, জগজ্জননী বা ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি তাই। আবার নির্গুণ সত্তারূপেও তিনি—একথারও ইঙ্গিত দিয়াছেন, তিনি বিশ্বরূপা তাহাও বলিয়াছেন—'মা, মা, শেষে দেখে মা আমার জগৎজুড়ে। সব এক হয়ে দাঁড়ায়।'

কাজেই তাঁহাকে ও শ্রীরামকৃষ্ণকে এদিক দিয়া অভেদ ভাবিতে কোন অসুবিধা হয় না, বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বহুভাবে উক্ত 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী'—এই সত্যের আলোকে দেখিলে। স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকেই 'মা' বলিতেন; আবার বলিয়াছেন, 'বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই রামকৃষ্ণ।' অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, এই ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্ব-বোধ আসে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পর।

অপর দিক দিয়া দেখিলেও, অবতার বলিয়া যাঁহাদের ভাবি, তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের বা শক্তিরই অবতার বলিয়া সকলেই অভেদ, স্ত্রী বা পুরুষ যে-দেহ ধারণ করিয়াই অবতীর্ণ হোন না কেন। ভগবানকে কেবল নির্গুণ, নিরাকার সত্তারূপে ভাবিলে তাঁহার অবতারত্ব ভাবা যায় না—তাঁহাকে শক্তিসমন্বিত রূপে ভাবিলে তবেই তাঁহার অবতার। তন্ত্রে এই সত্যটি আরো প্রকট করা হইয়াছে—শক্তিই অবতাররূপে আসেন বলিয়া বলা হইয়াছে—দশমহাবিদ্যাই দশ অবতার : কালিকা কৃষ্ণ, তারা রাম, বগলা কূর্ম, ধূমাবতী মৎস্য, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভৈরবী বরাহ, ষোড়শী পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী বামন, কমলা বুদ্ধ ও দুর্গা কল্কি। (কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী। বগলা কূর্মমূর্তিঃ স্যাৎ মীনো ধূমাবতী ভবেৎ॥ ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাদ্ বরাহশ্চৈব ভৈরবী। সুন্দরী যামদগ্ন্যঃ স্যাদ্ বামনো ভুবনেশ্বরী॥ কমলা বৌদ্ধরূপা স্যাৎ দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী॥ মুণ্ডমালাতন্ত্র।) তন্ত্রে অবশ্য শক্তিকে সগুণা নির্গুণা দুই-ই বলা হইয়াছে। ঈশ্বর বা শক্তিরই অবতার, তাই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথকে শেষবার যখন বলিয়াছিলেন, 'এখনো অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এই শরীরে রামকৃষ্ণ', তখন ইহার শেষে যোগ করিয়াছিলেন, 'তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।' আর এইজন্যই বোধ হয় শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।'

যাঁহাকে কালী বলি, তিনিই সারদাদেবী রূপে এবং শ্রীরামকৃষ্ণরূপেও অবতীর্ণ—ইহা বুঝিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর মধ্যে বাহ্যতঃ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের অভেদ ভাবিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বাহ্য পার্থক্য শুধু নামরূপগত নয়, আচরণগতও

ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, মা করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মীয়গণের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ও তাঁহাদের সাহচর্য ত্যাগ না করিলেও তাঁহাদের 'সংসারে'র সঙ্গে কখনো জড়িত ছিলেন না ; মা কিন্তু রাধু প্রভৃতিকে লইয়া তাঁহার ভাইদের সংসারে বাহ্যতঃ নিবিড়ভাবে জড়িত। ঠাকুরের অসীম স্নেহের সঙ্গে সন্তানদের অধ্যাত্মজীবনগঠনের জন্য তীব্র সাধনায় নিযুক্ত রাখার দিকে কঠোর দৃষ্টিও ছিল। মা-র কিন্তু, দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এ বিষয়ে 'শাসন' কিছুই ছিল না—ছেলেরা আর কি করিবে, ছেলেদের হইয়া যাহা করার তিনিই করিবেন, তিনি যে মা! ব্যতিক্রম বহু থাকিলেও মায়ের মধ্যে এই ভাবেরই প্রকাশ প্রায় সব সময়ই। ছেলেদের 'অপরাধও' তাই দেখিতে পাইতেন না। 'একে রুটি বেশী খেতে দিলে কেন ?', 'ওকে সরবত খেতে দিলে কেন ? ওদের যে সন্ন্যাসী হতে হবে', অথবা 'ওর সঙ্গে অতক্ষণ কথা বললে কেন—ওর স্বভাব কি জান না ?', 'এর হাতে আর কখনো আমার খাবার পাঠিও না'—ইত্যাদি-জাতীয় শ্রীরামকৃষ্ণের বহু কথা মা কাটাইয়া দিয়াছেন, মাতৃস্নেহের প্রাবল্যে। অপরাধের কথায় যাহা বলিয়াছেন, বিশ্বজননী ছাড়া আর কারো পক্ষে তাহা বলা সম্ভবই নয় ; আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, আমরা সর্বদা অপরাধ করিলেও মা পুত্রবুদ্ধিতে সে সবই ক্ষমা করেন ; আর শ্রীশ্রীমা নিজে বলিতেছেন, 'মায়ের কাছে ছেলের কোন অপরাধই হয় না!' স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার, এইজন্যই বোধ হয়, জনৈকা শিষ্যা আশু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা জানাইলে বলিয়াছিলেন, 'মাকে ডাকবে, তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু, একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল।' আবার অন্যদিকে, শ্রীরামকৃষ্ণ ধাতুদ্রব্য স্পর্শও করিতে পারিতেন না, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া গঙ্গাগর্ভে টাকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মা বাক্সে রাখার আগে এবং বাক্স হইতে বাহির করিবার সময় টাকা-পয়সা একবার মাথায় ছোঁয়াইতেন, গহনা পরিতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরও হাতে বালা ও গলায় একগাছি হার রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছিলেন ; কাশীপুর তাঁহার দেহত্যাগের পর মা যখন সব গহনা খুলিয়া ফেলিতেছেন, হাতের বালা খোলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা দিয়া তাঁহাকে উহা খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মাকে একথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছে—ঠাকুরের সঙ্গে বাহ্যতঃ তাঁহার এই পার্থক্য কেন ? উত্তরে মা অবশ্য তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরল ভাষায় বলিয়াছেন, 'আমি যে মেয়েমানুষ।' একথায় হর-পার্বতীর কথাই মনে জাগে, 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' হইলেও হর হইতেছেন ভস্মবিলেপিতাঙ্গ, সর্বত্যাগী, আর পার্বতী সর্বালঙ্কারভূষিতা অন্নপূর্ণা।

বাহ্যতঃ এই প্রকার বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপেই এবং সারদাদেবী-রূপেই আমরা তাঁহাদের অভেদ ভাবিতে পারি—মাকালীরই দুটি বিভিন্ন ভাবের মূর্তি বলিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একাধারে উভয় ভাবই ছিল সত্য, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিবার যোগ্য অধিকারী ছিল কয়জন ? —'তিনি বেছে বেছে সব ভাল ছেলেগুলিকে নিয়েছেন', মা বলিয়াছিলেন, 'আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন পিঁপড়ের সার!' এই পিঁপড়ের সারই তো আমরা প্রায় সকলেই, আমাদের দেখার শক্তি যতটুকু আছে, তাহা দিয়াই মায়ের মতো

স্নেহের বিকাশ দেখিতে না পাইলে আমরা দাঁড়াইব কোথায়? চরম অপরাধ করিয়াও আশ্রয় লাভের আশায় ছুটিয়া যাইব কাহার কাছে? গিরিশ বাবুর মতো লোক অবশ্য অসঙ্কোচে ছুটিয়া যাইতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, বলিতে পারেন—অতি হীন অপরাধ করিয়া আসিলেও 'তব দ্বার মুক্ত তার পতিত-পাবন!' কিন্তু মায়ের স্নেহের মুক্ত দ্বারে আমরা ছোট বড় সবাই সর্বাবস্থায় অসঙ্কোচে প্রবেশ করিতে পারি। মাকে অতি আপনার বলিয়া বোধ আমাদের সহজাত। আমাদের অধিকাংশের নিকটই তাই শ্রীভগবানের এই অসীম ভালবাসার মাতৃমূর্তিতে প্রকাশ পরম আশ্রয়। যুগে যুগে তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন স্ত্রী পুরুষ উভয় দেহ ধারণ করিয়াই, তাঁহারই দুই ভাবের বিশেষ প্রকাশের জন্য, বা বলা যায় অধিকারী বিশেষের মনকে তাহার উপযোগী ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য। বিষ্ণুপুরাণে আছে, নারায়ণ যখনই অবতীর্ণ হন, দেবদেহেই হউক বা নরদেহেই হউক, তখনই তাঁহার শক্তিও দেবী বা মানবী-মূর্তি লইয়া তাঁহার সঙ্গিনীরূপে অবতীর্ণ হন।

উভয়েই যখন অভেদ, উভয়ের মধ্যেই উভয় ভাবই সদা বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য, তাহার প্রকাশ অনুভব করিবার অধিকারী বিরল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা স্বামী শিবানন্দের মতো কয়জন শ্রীরাম-কৃষ্ণকে প্রকৃতই 'মা' বলিয়া দেখিতে পারেন? আর ভানু-পিসি যোগীন-মা প্রভৃতির মতো কয়জনই বা শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন?

মাকালীরই, ঈশ্বরেরই বাহ্যতঃ দুটি বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে অবশ্য আমাদের খুব বেশী অসুবিধা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে মাকালীরূপেই, 'যে মা মন্দিরে আছেন' সেইরূপেই দেখিতেন, নিজেই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতেন মাকালীরূপে—তাঁহার দেহত্যাগের পর কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, 'মা কালী গো, কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো,' বলিয়া। মা-কালী কাশীপুরে একবার তাঁহাকে দেখাইয়াই দিয়াছিলেন, তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদ। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—ষষ্ঠ ভাগ,'-এর জন্য স্বামী সারদানন্দলিখিত তাঁহার ডায়েরীর 'নোট' হইতে সংকলিত 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব' পুস্তিকায় আছে: 'কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের খুব যখন অসুখ বেড়েছে,—শ্রীমা কাতর হয়ে আছেন, এমন সময় দেখেন—সেই কালো মেয়ে*, এত বড় চুল, এসে কাছে বসলেন। মা বললেন, "ওমা, তুমি এলে!" মা কালী—"হাঁ, এই দক্ষিণেশ্বর থেকে এলুম।" আরো সব কি কথার পর শ্রীশ্রীমা দেখলেন ঐ কালো মেয়েটি ঘাড়টি বেঁকিয়ে আছেন; দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঘাড় মাথা অমন বেঁকিয়ে রয়েচ কেন?" মা কালী বললেন—"গলার ঘায়ের জন্য।" শ্রীমা—"ওমা! ওঁর গলায় ঘা হয়েছে, তোমারও হয়েছে?" মা কালী—"হাঁ।" এইরূপে ঠাকুর ও তিনি যে এক, ইহা মাকে বুঝিয়ে দেন।'

'অভেদঃ পরমাত্মনি'—বেদান্তের দিক থেকে, জ্ঞানের দিক থেকে—সে তো আমরা সকলেই। ঈশ্বররূপেও, ঈশ্বরের অবতাররূপেও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা অভেদ। যেরূপেই চিন্তা করি না আমরা, যে রূপেই চিন্তা করিতে

* 'জয়রামবাটী হইতে প্রথম দক্ষিণেশ্বর আসার (১৮৭২) পথে' জ্বর অবস্থায় যে মেয়েটিকে, মাকালীকে দেখিয়াছিলেন।—সঃ

ভাল লাগুক না, একজনকে ভাবিলেই অপরকেও ভাবা হয়, একজনের কৃপা অপর জনেরও কৃপা। তবু যেন, মন আমাদের মায়ের দিকেই সহজে ছুটিয়া যায়। ইহার কারণ বোধ হয়, জগতে আসিয়া যে অনাবিল প্রত্যাশাহীন 'স্নেহচন্দ্রাতপের' নীচে আমরা প্রথম আশ্রয় পাই, যে ভালবাসার কথা আমরা ভুলিয়া গেলেও, শত অন্যায় শত অপরাধ করিলেও কখনো কোন অবস্থায় আমাদের স্নিগ্ধ স্পর্শ দিতে বিরত হয় না, সেই গর্ভধারিণী মায়ের ভালবাসা—কীট-পতঙ্গের মা হইতে শুরু করিয়া দেবজননী পর্যন্ত সব মায়েরই ভালবাসা জগজ্জননীর অসীম স্নেহপারাবারেরই কণামাত্র, আর সেই স্নেহপারাবারই আসিয়াছিলেন আমাদের মা সারদামণিরূপে। জগদীশ্বরী তিনি, জ্ঞানস্বরূপিণী তিনি, সর্ববিদ্যা-সর্বশক্তি-স্বরূপিণী। কিন্তু সেসবই অবলীলাক্রমে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন মাতৃস্নেহের আবরণ দিয়া। তিনি জ্ঞান বিতরণ করিতেন আচার্যের আসনে বসিয়া বা আচার্যের ভাষায় নয়, মা ছেলের সঙ্গে যেমন সহজভাবে সহজ ভাষায় কথা বলে সেই ভাবে, সেই ভাষায়। তাঁহার কথামাত্রই অমোঘ নিয়মে বাস্তবের রূপ লইবেই—কিন্তু ছেলে মায়ের কাছে কিছু চাহিলে যে সহজ সুরে মা তাহার কথার উত্তর দেন, সেই ভাবেই বলিতেন, 'হাঁ বাবা!' এমন কি, যখন বলিতেছেন, 'এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন, তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কারো সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করেন',—তখনও তাহা বলিতেছেন সহজ সুরেই—এ যেন একটা কথার কথা মাত্র! সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী 'সরস্বতী' হইয়াও তিনি লিখিতে পারিতেন না। কেবল মা নয়, লেখাপড়া না জানা, লজ্জাশীলা দরিদ্র পল্লীবাসিনী মা হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন সব ঐশ্বর্য স্নেহের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া, যাহাতে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী-নির্ধন, পুণ্যাত্মা-মহাপাপী সকলেই নিঃসঙ্কোচে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার স্নেহ-চন্দ্রাতপের নীচে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী অভেদ হইলেও, একই সচ্চিদানন্দের আমাদের মনবুদ্ধিগ্রাহ্য দুটি রূপ হইলেও আমাদের—'পিঁপড়ের সার'-এর—মা ছাড়া চলে কই?

প্রশ্ন: "মা, আপনি যে ভগবতী, তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?"

শ্রীশ্রীমা: "সকলেই কি আর চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরে পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে ক'রে তাতে পা ঘ'সে স্নান ক'রে উঠে যেতো। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে, সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।"

শ্রীশ্রীমায়ের একখানি পত্র

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়)-কে লিখিত]*

শ্রীশ্রীহরি

পরম শুভাশির্ব্বাদ

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সকল সমাচার অবগত হইলাম। বাবাজীবন, তুমি যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়াছ, তোমার ভয় কি? জগৎ কেবল কামিনী কাঞ্চনের খেলা—ইহারি ভিতর থেকে যেন মুখ গলিয়ে ঘাস খাইতে হয়। খরচপত্রের বিশয় (বিষয়)—আত্মা রেখে ধর্ম। তুমি একটি প্রাণি নয়, একটি প্রাণির ভিতর সাতটি প্রাণি। তোমার যেমন সাধ্য হইবে সেইরূপই করিবে, ব্যাথা (বৃথা) চিন্তায় মন খারাপ করিও না। সংসারের এইরূপ গতিক। তবে নেজা মুড়ো বাদ দিয়ে চলিতে হয়। শ্রীযুত প্রসন্নর জ্বর হইয়াছে। কেমন থাকে ও পোথ্য হইল কিনা জানিয়া পত্র লিখিব। বইমাকে (বৌমাকে) আমার আশির্ব্বাদ দিইবে। সকলে ভাল আছে। কালী শীঘ্রই যাইবে। এখানকার মঙ্গল। তথাকার মঙ্গল লিখিবে। আমি কামারপুখুরে আছি। অত্র পত্রে লক্ষীর শিবুর আশির্ব্বাদ যানিবে। আমি ভাল আছি।

ইতি—চৌঠা মাঘ

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

মাতাঠাকুরাণী

---

* 'মাসিক বসুমতী', ভাদ্র, ১৩৫৯ (৩১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা) হইতে গৃহীত ও বর্তমান সম্পাদিকার অনুমত্যানুসারে পুনর্মুদ্রিত (বসুমতীতে পত্রটির ফটোস্টাট আছে)। পত্রটি কোন ছোট মেয়েকে দিয়া লেখানো মনে হয়। 'পরম শুভাশির্ব্বাদ' হইতে 'মাতাঠাকুরাণী' পর্যন্ত সবটাই একটানা লেখা, কোনও ছেদ-চিহ্ন কোথাও ছিল না। আমরা লাইন ভাঙিয়া ও কমা দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্ন বসাইয়া দিয়াছি। ভুল বানাম বন্ধনীর মধ্যকার শব্দ কয়টি আমাদের বসানো।—সঃ

কাশীপুরে শ্রীশ্রীমা

স্বামী সারদানন্দ

'দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীশ্রীমা অবস্থান করিতেন তখন ঠাকুর মাঝে মাঝে মাকে অনেক বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। মা বলিতেন—"এখনি উত্তর দিতে পারব নি। পরে—বুঝে বলব।" ঠাকুর—"এখনি বল না, তুমি আর কার সঙ্গে বুঝতে যাবে, যে, 'পরে—বুঝে—বলবে?' শ্রীমা তবুও বলতেন পরে—বুঝে বলব। তারপর নহবতে গিয়ে মা কালীর নিকট খুব কাতর হয়ে প্রার্থনা করে বলতেন—"মা, তুমি আমায় যা বলবার, বলে দাও।" ঐরূপ করিলেই তাঁর মনে ঐ বিষয়ের একটি মীমাংসা উদয় হত ও ঠাকুরকে গিয়ে বলতেন। (মা অজ্ঞাতসারে ঠাকুরেরই সাধনকালের পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন—"আমি বলতুম—মা, এ বলছে এই. এই; ও বলছে আর একরকম। কোন্‌টা সত্য, তুই আমায় ব'লে দে!"—কথামৃত ২য়, ২৩৭—সম্পাদক) ... ...

ঠাকুর কাশীপুরে যখন—শ্রীমা একদিন তাঁকে খাওয়াতে উপরে গেছেন—কথায় কথায় ঠাকুর বললেন—'অষ্টা-কষ্টে' খেলেছ? (পল্লীর একপ্রকার কড়িখেলা—সঃ) মা—না। ঠাকুর—'তাতে যুগ বাঁধলে আর সে গুটিদের কাটা যায় না। সেইরূপ ইষ্টের সঙ্গে যুগ বাঁধতে হয়, তাহলে আর ভয় থাকে না। নইলে পাকাগুটি হয় আর ক্যাঁচ্‌ করে কেটে দেয়। ইষ্টের সঙ্গে যুগ বেঁধে সংসারে চললে আর কাটা যাবার ভয় থাকে না।'*

---

* 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থ হইতে পুনমু'দ্রিত। স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৬ষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য ডায়েরীতে যে নোট লিখিয়াছিলেন, গ্রন্থটি তাহারই সংকলন।—সঃ

শ্রীমা সারদামণি

(রামপ্রসাদী)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

টেনে নিতে তুমি কাছে
দিনে দিনে কত জনে—তার কি মাগো হিসাব আছে?
মাটির ঘরে আমরা খেলি মিথ্যে মাটির পুতুল নিয়ে :
তোমার ছোঁওয়ায় সেই পুতুলেই উঠত মা, প্রাণ ঝিলিক দিয়ে।
সেই প্রাণ-আলোয় উছল হ'ত কৃপা তোমার কতই রাগে—
অশ্রুহাসির ছন্দে তানে গন্ধে গানে রূপসোহাগে!

দেবদেবীদের গল্প শুনে প্রাজ্ঞ বলেন বিজ্ঞ হেসে :
"রং-বুদ্বুদ ফুলিয়ে ওড়ায় পাগল ঋষি স্বপ্নাবেশে।"
পাল্‌টে হেসে বলেন ঋষি : "হায় অন্ধ দিশাহারা!
পাগল তোরাই—চিরন্তনীর কথায় হেসে উঠিস যারা।
'ঐ তারা ঐ।'—ব'লে যারা ছোটে আলেয়ার পিছনে,—
নরে তারা দেখতে কি পায় ছদ্মবেশী নারায়ণে?"

বেশি কাছে এসে যখন চাও মা নিতে কোলে তুলে,
মা-র মূর্তি দেখে দেবীর স্বরূপ তোমার যাই যে ভুলে!
মুক্তা মা-কে ছেড়ে ঝিনুক-মায়ার ডাকেই উঠি দুলে—
দেখে, কৃপায় কারুর কারুর চোখের ঠুলি দেয় মা খুলে।
তারাই শুধু "জয় মা দেবী, জয়!" ব'লে লুটায় রাঙা পায়,
যদিও তুমি বলতে হেসে : "মা ব'লে ডাক শুধু আমায়।"

তোমার প্রেমে যেত গ'লে পাপী তাপীর শোকবেদনা,
পায়ের ধুলার বরে তোমার জাগত মা, অলোকচেতনা।
তাই তো মাগো দেখা হ'ল তোমার প্রেমনাথের সাথে—
করুণা যাঁর ঝরত অঝোর তোমার স্নেহের আশীর্বাদে।
গেয়েছিলে শেষ নিশাসে : "নয় কেউই পর এই ভুবনে :
আপন ব'লে করলে বরণ হবে আপন জনে জনে।"*

* প্রথম ও শেষ স্তবকটি উদ্বোধনের ৬৭তম বর্ষে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কা হি সা দেবী'

ব্রহ্মচারিণী সুমিত্রা

ভগবানের লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যাসদেব ভাগবতে বলেছেন—'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'—অর্থাৎ ভগবানের লীলা আগাগোড়াই মাধুর্যময়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যখন লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন, তখন মানবদেহরূপ 'চোরকুটুরীর' ভেতর আত্মগোপন করে, অবিকল মানুষের মতই অভিনয় করেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলতে শুনি 'সে যে কোটার ভিতর চোরকুটুরী ভোর হলে সে লুকাবে রে'। ত্রেতাযুগে সীতাকে হারিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বনে বনে রোদন করেছিলেন—'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'। তবু মানবভাবের সঙ্গে দেবতার ঐশ্বর্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে আমাদের চমৎকৃত করে। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মানবতার অপেক্ষা তাঁদের অসীম শক্তি এবং অলৌকিক কার্যাবলীই আমাদের সচেতন করে দেয় যে, এঁরা মর্তলোকের নন। যমুনা- ও সরযূতীরে ভগবানের অপূর্ব লীলাবিলাস মাধুর্যময় হলেও ঐশ্বর্যের ছটায় ভাস্বর।

এবার উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণেশ্বরে সুরধুনীর কূলে ভগবানের যে জগৎ-আলোড়নকারী প্রকাশ, তাতে ঐশ্বর্যের লেশ মাত্র নেই। এবার 'গুপ্তভাবে আপ্তলীলা'। তিনি নিজমুখে তাই বললেন—'দেখলাম এবার পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য'। শ্রীশ্রীমা এক কথায় প্রকাশ করলেন, 'বাবা এবার তিনি ত্যাগ শেখাতে এসেছিলেন'। 'ত্যাগীশ্বর হে নরবর' বলে বন্দনা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আশ্চর্যের কথা তিনি বাইরে সন্ন্যাসের বেশ গ্রহণ করলেন না, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকেও ত্যাগ করলেন না, অথচ নিরভিমান ত্যাগই তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'হে জীব সর্বস্ব ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হও'- এটিই ছিল তাঁর জীবনের মূল সুর। ভারতীয় দৃষ্টিতে মাতৃভাবের মধ্যেই ত্যাগের ও নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা। তাই এবার নিজে লীলা সংবরণ করে জগতের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন মাতৃরূপিণী দেবীকে।

অন্যান্য অবতারে শক্তির ভূমিকা নেপথ্যে। যুগে যুগে অবতারের সঙ্গে তাঁর শক্তি আবির্ভূ'তা হন। নিঃশব্দচারিণী দেবী অন্তরালে জীবন অতিবাহিত করে চলে যান। মুষ্টিমেয় কয়েক জন তাঁর মাতৃহৃদয়ের করুণায় সিক্ত ও ধন্য হয়। ত্রেতাযুগে মা জানকী নিঃশব্দে রামের অনুগমন করেছেন। যাঁকে নিয়ে সাতকাণ্ড-রামায়ণ রচিত হল, সেই বৈদেহী শেষে অশ্রু মার্জনা করে বাল্মীকির আশ্রমে কঠোর তপশ্চর্যায় রতা। রামায়ণে এই মহিমান্বিত চরিত্রের তুলনা নেই, তবু রামচরিত্রের পাশে তাঁর উপস্থিতি খুবই নীরব, সক্রিয় শক্তির ভূমিকা নেপথ্যে। অন্যদিকে নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া; অবতার লোকশিক্ষার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে গমন করলেন, তপঃকৃশা দেবী অলক্ষ্যে অন্তঃপুরে দিনান্তে একমুষ্টি তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করে অতিবাহিত করলেন জীবন। কোন্ অপরাজেয় প্রেম বুকে নিয়ে এ নীরব দাহন, এ আত্মাহুতি? এই নিভৃতচারিণী দেবীশক্তির আবির্ভাব কেন? কি তাঁদের স্বরূপ? অগ্নি ও দাহিকাশক্তির মতোই যদি তাঁরা স্বরূপতঃ

অভেদ তবে সে দাহিকা শক্তি কি কেবল নীরব দাহনের জন্যই? দেবীমাহাত্ম্যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর সেই সুন্দর প্রশ্নটি মনে পড়ে, সেই স্বরূপ জিজ্ঞাসা—

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥

এখানেই প্রশ্নের শেষ নয়—

যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥

সেই মহামায়ার কি স্বভাব? কি স্বরূপ? দেবীর বিচিত্র লীলাকাহিনী সম্বন্ধে কত না প্রশ্ন! লীলাময়ী আদ্যাশক্তি বার বার ধরার ধূলায় নেমে নিঃশব্দে রঙ্গ করে চলে যান, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সকলের অগোচরেই থাকেন। এবার কিন্তু সেই সন্তানবৎসলা বাইরে লজ্জাপটাবৃতা হয়েও নিজেকে গোপন করতে পারেন নি। বহু বৎসর ধরে মানবহৃদয় অন্তরে অন্তরে গুমরে উঠেছে—'জননী অবগুণ্ঠন খোল, দেখি তব মুখ।' এ যুগের করুণাময়ী শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা নিখিলমাতৃহৃদয়-সাগরমন্থনসুধা মাতৃমূর্তি সন্তানের আকুতিতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ চিঠিতে লিখছেন—'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারাণী—এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এদের চেয়েও কত উঁচুতে বসে আছেন; ঐশ্বর্যের লেশ নেই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; * * * কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি!" ত্যাগীশ্বর ঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী মা বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত করে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এবার বৈশিষ্ট্য হল মাতৃভাব। এই মাতৃভাব প্রচারের জন্যই স্ত্রীগুরু গ্রহণ, স্ত্রীভাবসাধন এবং অবশেষে জগৎকল্যাণে নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা। ম'তৃরূপে সংঘজননী-রূপে, সন্ন্যাসিনীরূপে এবার মাতৃশক্তির এক সক্রিয় ভূমিকা জগতের ইতিহাসে প্রথম।

দক্ষিণেশ্বরের নিভৃত রুদ্ধ কক্ষে ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ লোককল্যাণের জন্য এই দেবীর বোধন করে তাঁর চরণে নিজের সমস্ত তপস্যার ফল সমর্পণ করলেন। মাতৃরূপিণী ঈশ্বরী জগতে সন্তানকল্যাণে প্রবৃত্তা হয়ে অতিযত্নে নিজের স্বরূপ আবরণ করে রাখতেন। তবু 'রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনী সেজে' যখন 'ঘর নিকোচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন এমনকি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন'—তখন তাঁর এই অপরিসীম করুণা, অসীম ধৈর্য, সম্পূর্ণ অভি-মানরাহিত্য ও দেবদুর্লভ স্নেহ দেখে কার মনে না সন্দেহ জাগে?

সংসারের মধ্যে পাগলী মামী, রাধু এবং বিষয়াসক্ত ভাই, সর্বোপরি অবিরত ভক্ত-সমাগম—এরই মাঝে স্বার্থগন্ধহীন নীরব ভক্তবৎসলা জননীর জীবন আপন ছন্দে একাকিত্বে যেন অনুপম। তবুও মানবলীলার মাঝে মাঝে হঠাৎ আমরা এই দেবীর স্বরূপের আভাস পেয়ে চমৎকৃত হই। তাঁর স্বরূপের আভাস দিতে গিয়ে জীবনীকার লিখছেন—'শ্রীশ্রীমায়ের মানবলীলার মধ্যে চকিতে দেবীভাবের স্ফূর্তি অনেক ভক্তকেই চমৎকৃত করিয়াছে। উহা বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় এতই দ্রুত আসিত এবং শ্রীমা এতই শীঘ্র আত্ম-সংবরণ করিতেন যে ভক্তগণ ধরিয়াও ধরিতে পারিতেন না। তবু তাঁহাদের চিত্তে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া যাইত যে দেবীত্বই মৌলিক ভাব। গগন মহারাজ বহুবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে যখনই দেবীভাবের প্রাধান্য

ঘটিত তখনই তাহার গলার স্বর ও ব্যবহার একটা অতিপ্রাকৃতিক আবহাওয়া সৃজন করিয়া ভক্তের মন ক্ষণিকের জন্য অন্যরাজ্যে লইয়া যাইত।'

পূজ্যপাদ বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যাবার আগে সোজা জয়রামবাটীর সামান্যা পল্লীবালার কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। আবার পাশ্চাত্য ভ্রমণের পরে যখন মার কাছে যাচ্ছেন, নৌকায় সারাপথ গঙ্গাবারি পান করতে করতে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীনমার কাছে যাঁকে 'গঙ্গার চেয়েও পবিত্র' বলে উল্লেখ করেছিলেন—এ সেই মা। এ যুগে অবতারের শক্তির যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সেটি স্বামীজীই সর্বপ্রথম অনুধাবন করে গুরুভাইদের কাছে চিঠি দিচ্ছেন—'মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।...মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন।' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবিগ্রহরূপিণী এই দেবী-মানবীর স্বরূপের অভিব্যক্তি খুবই অল্প। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তাঁর যথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎ করে যেসব উক্তি করেছেন—এক্ষেত্রে তাই আমাদের সম্বল। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ লিখছেন, "কি ধৈর্য, কি ক্ষমা, কতই সহিষ্ণুতা নিয়ে তিনি ঘর করেন—এইখানেই দেখবে; অমনটি জগতে আর কখনও হয় নাই ইতিপূর্বে।" বাস্তবিক মানবীর রূপ ধরে এই দেবী আজীবন নিরলস কর্মের মধ্য দিয়ে এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে জগতে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেইসঙ্গে জ্ঞানে ভক্তিতে অনাসক্তিতে তাঁর মহিমময় প্রকাশ অত্যাশ্চর্যই বলা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন 'ও সারদা সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে।' শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীকে বলছেন—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'। অনুরূপ ঘটনার ছায়া মায়ের জীবনেও দেখি। একবার কাশীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গেছেন; যাবার সময় মা গোলাপমার মুখ দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন 'জিজ্ঞেস কর, রাখাল আমায় এত মানে কেন?' শুনে ভাবে বিভোর মহারাজ বললেন—'মার হাতে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি-কাঠি'। এই কথা বলে বিহ্বল শিশুর মতন আনন্দ করতে করতে তিনি চলে গেলেন। মা সেই দৃশ্য দেখে প্রসন্নমুখে হাসছেন। দৈনন্দিন ভক্তসমাগমের মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ মার এই দেবীভাবের চকিতপ্রকাশ ঘটতো। মায়ের কথোপকথনে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। একবার জিজ্ঞাসিত হয়ে একটি ভক্তকে বলছেন—'ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখবে', বলছেন—'দেখ, লোকে আমার কাছে আসে, বলে জীবনে অশান্তি, ইষ্টদর্শন পেলুম না। কিসে শান্তি হবে মা! আমি তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই,—ভাবি এরা এমন সব কথা বলে কেন? আমার কি তাহলে সবই অলৌকিক! আমি অশান্তি বলে ত কখনও কিছু দেখলুম না? আর ইষ্টদর্শন, সে ত হাতের মুঠোর ভিতর—একবার বসলেই দেখতে পাই'। আবার অন্যপ্রসঙ্গে বলছেন 'লোকে আমায় ভগবতী বলে, আমিও ভাবি সত্যিই বা তাই হব। নইলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে'। মহাশক্তির স্তবে আছে—

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥

তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি হ্রী, তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তুমি লজ্জা পুষ্টি ও

তুমি শান্তি ও কান্তি। শ্রীশ্রীমার স্বরূপের এক মনোহর চিত্র এটি। মা পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করে নিজেই বলছেন—'জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছি'। রামেশ্বর তীর্থে গিয়েও যুগান্তরের লীলাস্মৃতি তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল তাই শিবপূজার পরে তাঁর অসতর্ক উক্তি 'যেমনটি রেখে এসেছিলুম ঠিক তেমনটিই আছেন'। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসঙ্গিনীরূপে তিনি আবির্ভূতা হন—একি তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত? জয়রামবাটীতে এক ভক্ত প্রশ্ন করছেন—'তবে যে তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ লোকের মত বসে রুটী বেলছ; এসব কি? মায়া নাকি?' মা বলছেন—'মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।' পাগল হরিশ একবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় জয়রামবাটীতে এসে মার পিছনে ধাওয়া করে। সেই প্রসঙ্গে বলছেন—'সাতবার ঘুরে আর আমি পারলুম না। তখন নিজ মূর্তি এসে পড়লো। আর আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম, তারপরে ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জীব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগলো।' ঘটনাটি মা অত্যন্ত সহজভাবেই বর্ণনা করেছেন কিন্তু এর তাৎপর্য গভীর।

এর পশ্চাতে আমরা যে দেবীর আবির্ভাব লক্ষ্য করি তার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দশমহাবিদ্যার মধ্যে অসুরদলনী বগলামূর্তির একটি প্রতিচ্ছবি ঘটনাটি। একবার সুরেন্দ্রনাথ সেন নামে কোন ভক্ত স্বপ্নে শ্রীশ্রীমার দর্শন ও মন্ত্র লাভ করে স্বামীজীর কাছে নিজ সংশয়ের কথা বললেন। স্বামীজী তাঁকে বললেন—'মন্ত্র জপ করতে থাক- পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি।'

তিনি বগলার অবতার। সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা। সারদা দেবীর উপরে মহা শান্ত ভাব কিন্তু ভিতরে সংহার মূর্তি। মায়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এই অতি ভীষণ ও অতি মধুর ভাবের সমাবেশ দেখি, মহাযুদ্ধের সময় জয়রামবাটীতে একবার সংবাদপত্রে যুদ্ধে লোকক্ষয়ের বর্ণনা শোনামাত্র তাঁর অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে। প্রথমে মৃদু গলায় 'হোঃ হোঃ' শব্দে আরম্ভ করে পরে উচ্চৈঃস্বরে 'হাঃ হাঃ' করে অট্টহাস্য আরম্ভ করলেন। গোলাপ-মা ও যোগেনমা গলবস্ত্র হয়ে 'সংবর সংবর' বলার পর তিনি প্রকৃতিস্থা হন। মায়ের নম্র শান্ত মূর্তির অন্তরালে এই ঈশ্বরীর স্বরূপের আভাস সাধারণের দুজ্ঞের্য়। শুধুমাত্র ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই মা কি বস্তু তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন মাতৃসন্নিধানে যেতেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতো, ভাবস্থ অবস্থায় তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ মায়ের কাছে বালকবৎ অবস্থান করতেন। মায়ের ভারী শরৎ মহারাজের সম্ভ্রমবোধ তাঁর জীবনের প্রতিটি আচরণে ফুটে উঠতো। মায়ের আত্মীয়বর্গ থেকে আরম্ভ করে জয়রামবাটীর কুকুর বেড়ালকেও তিনি কি শ্রদ্ধার চোখেই না দেখতেন। ঠাকুরের প্রত্যেক সন্তানই মাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরীরূপে জ্ঞান করে সেইমত আচরণ করতেন। এই দেবী ভক্তসন্তানগণের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারবন্ধন এক কৃপাকটাক্ষে ছিন্ন করে অনায়াসে তাদের আশ্বাস প্রদান করে

বলতেন 'আর কেউ না থাক, তোমার একজন মা আছেন'। আমরা আরও লক্ষ্য করি, যাঁরা বাল্যে মাতৃহারা হয়েছেন তাঁদের অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের আকৃতিতে নিজ জননীর আকৃতির সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতেন। এই সব অস্বাভাবিক অনুভূতিগুলি মায়ের বিশ্বজননীত্বের জ্ঞাপক। অনন্ত আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি জননী মুহূর্তমধ্যে কত শত সন্তানের প্রাণে আধ্যাত্মিকতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতেন, গুরুভাবে আরূঢ়া দেবী নির্বিচারে অম্লানবদনে সমস্ত পাপ-তাপ হজম করে বলতেন—'বাবা ছেলে যদি ধূলা কাদা মেখে আসে, তাকে ধুয়ে মুছে কোলে নেওয়াই কি মায়ের কাজ নয়'? তাই প্রেমানন্দ মহারাজের উক্তি 'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছিনা, মার কাছে চালান করে দিচ্ছি'। শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছাশক্তি কি অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন ছিল তা সারদানন্দের একটি পত্রে পাওয়া যায়,—'মা ইচ্ছা বা স্পর্শ সহায়েই শিষ্যকে ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া দিবামাত্র ঠাকুর তাহাকে গ্রহণ করেন ইহা অবধারিত।'

জীবনসায়াহ্নে মা যখন ম্যালেরিয়া রোগে দুর্বল তখন রাধু একবার ক্রোধে ঝুঁড়ি থেকে একটি বেগুন নিয়ে তাঁর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করে। যন্ত্রণায় বিচলিতা মা কিন্তু ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে বললেন—'ঠাকুর, ও অবোধ, ওর দোষ নিও না'। পরক্ষণে নিজের চরণধূলি রাধুর মাথায় দিয়ে বললেন—'রাধি এ শরীরটায় আঘাত লাগে—এমন একটি কথা পর্যন্ত ঠাকুর কখনও বলেন নি, আর তুই কিনা তাকে এত কষ্ট দিলি? এর স্থান যে কত উঁচুতে তা তুই কি বুঝবি? তোদের সবার সঙ্গে রয়েছি বলে তোরা গ্রাহ্যই করিস না'। সত্যই, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে পরম সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে বলতেন 'ও চটে গেলে এখানকার সব পণ্ড হয়ে যাবে', হৃদয়কে ডেকে সাবধান করে বলতেন 'ওর ভেতর যে আছে সে যদি ফোঁস্ করে, তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তোকে রক্ষা করতে পারবেন না'—তাঁর স্থান কোন্ উচ্চলোকে তা অনির্দেশ্য।

অন্যদিকে আমরা দেখি মানবের সেবার একটা ধারা আছে, দেবতার পূজারও একটা বিধি আছে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান যখন নরদেহ ধারণ করে আসেন, তখন তাঁর ভাবের অনুধাবন করা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অমূল্যসম্পদ রক্ষার জন্যই এই দেবীর সেবিকার বেশে আগমন, অকল্পনীয় তৎপরতার সঙ্গে সেবায়, সাহচর্যে এই দেবশরীর রক্ষা, অথচ নিজেকে সম্পূর্ণ নিরভিমান রেখে অন্তঃপুরে লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করা—এ সমস্তই কি আশ্চর্য নয়। এসব ঘটনাই কি তাঁর দেবদুর্লভ চরিত্রের মহিমার সহজ প্রকাশ নয়? এমন অনায়াসে যিনি নিজশক্তিকে সংবরণ করে রাখতে পারেন তাঁর দেবত্বের পরিমাপ কে করবে? সাধারণ রমণীরূপে পল্লী-পরিবেশে এ জীবনের দেবদুর্লভ পবিত্রতা, অনুপম সন্তানবাৎসল্য ও আধ্যাত্মিকতা—সবটা মিলে যেন প্রহেলিকা।

বাস্তবিক পক্ষে তাঁর জীবনের বহু ঘটনাবলী আমাদের পৌরাণিক যুগের দেবীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপরদিকে তাঁর শ্রীমুখেই আমরা শুনি 'ঠাকুর বলতেন ধর্মের আঁচড়টি পর্যন্ত বাইরে থাকবে না'। তাঁর জীবনটি এই কথারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর সমস্ত সত্তার ভিতর কোথাও আড়ম্বর ছিলনা। তিনি অতি সাধারণ হয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। সহসা তাঁকে দর্শন করে সাধারণ মানুষ তাঁর দেবীত্ব অনুধাবন

করতে সক্ষম হত না। 'অথচ পূর্বে কোন যুগে মানবীর মধ্য দিয়ে দেবীত্বের এই বিপুল বিকাশ আমরা ঘটতে দেখিনি'। তাঁর আদর্শ জীবন ভারতবর্ষের চিরাচরিত নারীর আদর্শকে অতিক্রম করে বহু উর্ধ্বে বিরাজমান। এই দেবীর দিব্য জীবনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে এবং যুগের মেয়েরা ত্যাগে, মনীষায়, জ্ঞানে পূর্ব পূর্ব যুগের গার্গী মৈত্রেয়ীকেও অতিক্রম করে যাবে তা স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাই তাঁকে বলতে শুনি, শ্রীরামকৃষ্ণ-উদ্বোধিত ভারতের এই নবজাগণের প্রভায় পূর্ব পূর্ব যুগের সমস্ত জাগরণের মহিমাই সূর্যের নিকট তারকাবলীর ন্যায় ম্লান হয়ে পড়বে; নব মহাশক্তির মহা উদ্বোধনের তুলনায় পূর্বের সমস্ত সংস্কারই বালকের ক্রীড়ামাত্র মনে হবে। তাই আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী এই মাতৃরূপিণী দেবীর পবিত্র জীবনের অনুধ্যান করে আমাদের নিজেদের জীবন সার্থক করে তোলার সময় এসেছে।

'পবিত্রং চরিত্রং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥'

মায়াবতী

স্বামী জীবানন্দ

সচ্চিদানন্দ সায়রে বুদ্বুদ উঠিল,
নিরাকার সাকার হইল—
সৌন্দর্য জমাট-বাঁধা,
সেই মায়াবতী।
বাক্যমন অগোচরে
মায়া-পারে
নিয়ে যাবে ব'লে মায়াবতী।

সেথা, অনাদি অনন্ত এক অখণ্ড সত্তায়
সচ্চিদ্-আনন্দে তার চরম বিরতি।
যেথা, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা
ধ্যান ধ্যেয় ধ্যাতা
সব একাকার,
উপায় উপেয় উপাসক
একই আধার!
সেথা, কোথায় পুরুষ আর কোথায় প্রকৃতি,
তত্ত্ব কোথা চতুর্বিংশতি?—
দেহ মন প্রাণ সব করে সাম্যে স্থিতি,
অন্ন-প্রাণময় মনোময়
বিজ্ঞান-আনন্দময়
কোষপঞ্চকের
একই লক্ষ্য, গতি—
অদ্বৈত ভাবেতে অবস্থিতি।

স্বামীজীর ভাবরূপ
অনুপম এই মায়াবতী!

দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, "বাস্তবিক জায়গাটি (শেঠজীর বাগান) যেন একটি ছোটখাটো বরাহনগর মঠ হইয়া দাঁড়াইল"।[১] 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'-লেখকের মতে, "শেঠজীর বাগান যেন দ্বিতীয় বরাহনগর-মঠে পরিণত হইল।"[২] রামকৃষ্ণ-ভাব-গঙ্গা সঞ্চরণের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-অন্তরঙ্গগণ-সেবিত বরাহনগর মঠ একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দারিদ্র্য, অপমান, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অগ্রাহ্য করে ত্যাগব্রতী রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বজনীন ভাবালম্বনে ভাবী বিরাট কর্মযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁদের সমবেত চর্যায় এক দুর্লভ আধ্যাত্মিক শক্তি-আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, দিগন্ত-প্রসারী মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটেছিল। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভবিষ্য পরিকল্পনা রূপদানের জন্য প্রস্তুতি চলেছিল প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে।

বরাহনগরে গড়ে ওঠে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ। ত্যাগ বৈরাগ্য-নিধূ'ত বরাহনগর মঠ-জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল মীরাট সহরের 'শেঠজীর বাগান' নামে পরিচিত এক বাগান-বাড়ীতে। সময় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শেষাংশ ও পরবর্তী খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশ। দ্বিতীয় বরাহনগর মঠের বাসিন্দা ছিলেন যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ (প্রাক্‌সন্ন্যাস নাম শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল)—এই সাতজন একনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ-পার্ষদ। স্বামী জ্ঞানানন্দ (দক্ষ) শেষের কয়েকদিন যোগদান করেন।

মীরাটে যে অস্থায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ গড়ে উঠেছিল তা পূর্বপরিকল্পিত নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে যেখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে গড়া ত্যাগী সন্তানদের কয়েকজন মিলিত হয়েছেন সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শে যেন এক একটি মঠ গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বরাহনগরে মঠ সংগঠনের ইতিবৃত্ত জানতে হলে মঠে যোগদান-কারী পরিব্রাজকগণের গতিবিধি কিছুকাল পূর্ব থেকে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

নগাধিরাজ হিমালয়ের দুর্বার আকর্ষণ। ঈশ্বরসেবীদের প্রিয় ঠাঁই হিমালয়-পাদপীঠে সুরধুনীর তীর। নগাধিরাজের আকর্ষণে আলমোড়াতে উপস্থিত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ। হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চল সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দ বেশ অভিজ্ঞ, তিনিই স্বামী বিবেকানন্দের হিমালয় পরিভ্রমণে গাইড্। তাঁদের পরিভ্রমণের প্রথম

১ প্রমথনাথ বসু: স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ), পৃঃ ২১৮-১৯।

২ স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ), পৃঃ ২৯৬।

অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন 'The Life of Swami Vivekananda' (পৃঃ ২০২) by his Eastern & Western Disciples: "In fact, this garden at Meerut was beginning to seem like a miniature Baranagore monastery."……

ভাগের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমার জন্য অখণ্ডানন্দজীর একটি পত্রাংশ[৩] উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "আমরা নৈনিতাল হইয়া……আলমোড়ায় পৌঁছিলাম। তথায় ভায়া শরৎচন্দ্র ও সান্ন্যালের সাক্ষাৎ হইল। আলমোড়ায় আমরা সপ্তাহাধিক ছিলাম।……পূজনীয় ভায়ার (স্বামীজীর) সে স্থান মনঃপূত না হওয়ায় ভাগীরথী তীরে থাকিবার মানসে আমরা চারিজনে সেথা হইতে প্রস্থান করিলাম।[৪] আমি অত্যন্ত কাসরোগে আক্রান্ত হইয়া পথ চলিতে লাগিলাম। ৺বদরিকাশ্রমের পথস্থ ৺কর্ণপ্রয়াগ নামক স্থানে অল্প জ্বর হওয়ায় তিন দিবস কাল বিশ্রাম করণান্তর তথা হইতে নিম্নে শ্রীনগরাভিমুখে আমরা চলিলাম। পথিমধ্যে এক চটিতে ভায়া শ্রীনরেন্দ্রনাথও জ্বরে পড়িলেন। আমরা তিন দিবস তথায় জ্বর ভোগ করিয়া চলৎশক্তি-রহিত হইয়াও ধীরে ধীরে নিম্নে ৫।৬ মাইল আসিয়া পথস্থ এক ধর্মশালায় দুইজনে পূর্ণমাত্রায় জ্বরাভিভূত হইলাম। তৎপর তথাকার মুন্সেফ মহাশয়[৫] আমাদের কবিরাজী ঔষধ সেবন করাইয়া সযত্নে ডাণ্ডীযানে শ্রীনগরে পৌঁছাইলেন। মুন্সেফ মহাশয়ের ঔষধে আশু প্রতিকার হইল। তথায় আমরা পক্ষাধিক[৬] আরামের সহিত ছিলাম।………৺ভাগীরথীর দর্শনলালসা বৃদ্ধি হওয়ায় তথায় আর অধিক কাল থাকিতে না পারিয়া টিহরী পৌঁছিয়া মার তীরে মনপ্রাণ সফল করিলাম।

"………পথে তথাকার ডাক্তার আমার chest examine করিয়া চিকিৎসার জন্য ডেরাডুনে যাইতে আদেশ করিলেন। কারণ তথায় অধিক শীত এবং ভিক্ষার নিয়ম ছিল না; মাধুকরী যাহা পাইতাম। অতএব আমরা সকলে ডেরাডুনে পৌঁছিলাম। স্বামীজীর পর্বত অবতরণের কারণ আমার পীড়া-বৃদ্ধিতেই হইল। ডেরাডুনে পৌঁছিয়া Civil Surgeon Dr. Maclaren-কে দেখাইলাম। তিনি little Bronchitis হইয়াছে বলিলেন আর উত্তরপ্রদেশে থাকিলে বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়া একেবারে plains-এ যাইতে পরামর্শ দিলেন।……ডেরাডুনে আমরা পাঁচজন ছিলাম। ডেরায় আসিতে মসূরীর নীচে রাজপুর নামক স্থানে আমাদের তুরীয়ানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ[৭] হয়। তিনি ডেহরায় নামিয়া আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন।……পরে আমার plains-এ যাওয়া স্থির জানিয়া তাঁহারা তিন জনে (শ্রীনরেন্দ্র, শরৎ ও তুরীয়ানন্দ) হৃষীকেশে চলিয়া গেলেন। আমার নিকট কেবল সান্ন্যাল মহাশয় রহিলেন।"

অখণ্ডানন্দজী তাঁর "স্মৃতিকথা"তে (পৃঃ ৫৭-৬১) পরিভ্রমণের যে বৃত্তান্ত দিয়েছেন তা মূলতঃ

৩ স্বামী অখণ্ডানন্দ মীরাট সহর থেকে ১৪।১১।৯০ তারিখে কাশীর শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে পত্র লেখেন।

৪ তাঁহারা আলমোড়া ত্যাগ করেন ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০।

৫ ইনি গাড়োয়ালের প্রধান আমিন শ্রীবদ্রীদেব যোশী।

৬ স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'তে (পৃঃ ৫৮) গাড়োয়াল জেলার প্রসিদ্ধ নগর শ্রীনগরে "একমাস দেড়মাস" অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আলোচনা করলে তাঁদের পক্ষাধিক কাল অবস্থান গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

৭ তখন নবরাত্রির একদিন মাত্র বাকী অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর, ১৮৯০ খৃঃ।

উপরোক্ত পত্রাংশের অনুরূপ। জানা যায় টিহরীরাজের দেওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্য[৮] মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। ভট্টাচার্য মশায় ভাগীরথী ও ভীলাঙ্গনা নদীর সঙ্গমস্থল গণেশ-প্রয়াগে তপস্যার জন্য কুটীর নির্মাণ করে দিতে চান। অখণ্ডানন্দজীর চিকিৎসার আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বামীজী এই লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেন না। 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে (পৃঃ ৬০) জানা যায় অখণ্ডানন্দজী দেরাডুনে উকীল পণ্ডিত আনন্দনারায়ণের নিকট অবস্থান করেন; এদিকে স্বামীজী, তুরীয়ানন্দজী, সারদানন্দজী ও সান্ন্যাল মশাই হৃষীকেশ যাত্রা করেন।[৯] পূর্বে উদ্ধৃত পত্রাংশে জানা যায় যে সান্ন্যাল মশাই ডেরাডুনে অখণ্ডানন্দজীর সেবার জন্য তাঁর সঙ্গে থাকেন। পরবর্তী দুটি পত্রে এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন, "ডেরাডুন হইতে একাকী, তৎপরে তাঁহাদের সংবাদ আর আমি জানি না এবং তাঁহারাও আমার জানেন না।"[১০] "সান্ন্যাল ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে যাইবেন। এক্ষণে আমার সেবার জন্য কাহাকেও প্রয়োজন নাই।"[১১] এই পত্রাংশ থেকে বোঝা যায় যে স্বামীজী, তুরীয়ানন্দজী ও সারদানন্দজী হৃষীকেশের উদ্দেশ্যে দেরাডুন ত্যাগ করার কয়েকদিন পর সান্ন্যাল মশাই অখণ্ডানন্দজীর অনুমতি নিয়ে হৃষীকেশ যাত্রা করেন।

দেরাডুনে কয়েকদিন বিশ্রামের ফলে অখণ্ডানন্দজী অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। এলাহাবাদে গিয়ে জনৈক গোবিন্দ ডাক্তারের কাছে কিছুদিন বাস করার সঙ্কল্প[১২] করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত গুরুভ্রাতাগণ দেরাডুন ত্যাগের পূর্বে জেনে যান। কিছুদিন পরে অখণ্ডানন্দজী এলাহাবাদের পথে সাহারাণপুরে উপস্থিত হন এবং সেখানে উকিল বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে দুই তিন দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্কু বাবুর পরামর্শে এলাহাবাদ যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তাঁর পরিচয়-পত্র নিয়ে তিনি মীরাট সহরে ডাক্তার ত্রৈলোক্য ঘোষ মশায়ের[১৩] নিকট উপস্থিত হন। সেই সময় ত্রৈলোক্যবাবুর মীরাটের সরকারী হাসপাতালের এসিস্টাণ্ট সার্জেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক ত্রৈলোক্যবাবু জনপ্রিয় হৃদয়বান সজ্জনরূপে মীরাটে সুপরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে চন্দননগরে তাঁর নিবাস। যৌথ পরিবারের এক নাতিবৃহৎ অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করে ত্রৈলোক্যবাবু মীরাট সহরে

৮ ইনি স্বনামধন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের অগ্রজ।

৯ 'স্মৃতিকথা' (৬০ পৃঃ) বলেন, "তাঁহার (পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ) নিকট আমি একলা রহিলাম। স্বামীজী, শরৎ মহারাজ, সান্ন্যাল মশায় ও তুরীয়ানন্দ হৃষীকেশ চলিয়া গেলেন।" তাঁর লেখা পত্রের সংবাদই গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

১০ ২০।১১।৯০ তাং প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা পত্র।

১১ ২০।১১।৯০ তাং স্বামী শিবানন্দকে লিখিত পত্র।

১২ স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত।

১৩ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'স্মৃতিকথা' (পৃঃ ৩-৪): "স্থানীয় লোকেরা ও রহিসেরা তাঁকে ধনন্তরী বলেই জানতেন ও দেবতার সম্মান দিতেন। তাঁর গুণে ও ব্যবহারে তাঁর কাছে সকলেই বদ্ধ ছিলেন। তাঁর অনুরোধপালনে সকলেই তৎপর থাকতেন। তাঁর প্রভাবও বাঙালীদের অনেকটা অগ্রসর করে দেয়।"

বাস করছিলেন। ত্রৈলোক্যবাবু অখণ্ডানন্দজীকে তাঁর গৃহে[১৪] সযত্নে রাখেন এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অনতিবিলম্বে তিনি রোগমুক্ত হন এবং তাঁর পূর্বস্বাস্থ্য লাভ করেন।

এদিকে স্বামীজী, তুরীয়ানন্দজী ও সারদানন্দজী (কয়েকদিন পর কৃপানন্দজী) তপস্যাভূমি হৃষীকেশে চণ্ডেশ্বর মহাদেবের নিকটবর্তী একটি কুটীয়াতে আশ্রয় নেন ও সাধন-ভজনে নিরত হন। এবার স্বামীজীর তপস্যা-বাসনা পরিতৃপ্তির পথ উন্মুক্ত হয়। স্বামীজী অনুকূল পরিবেশে 'চিন্তামণির নাচদুয়ারে' রতনমাণিক্য সংগ্রহে ব্যস্ত, অকস্মাৎ এক প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার অভাবে একদিন জীবনসংশয় উপস্থিত হয়। গুরুভাইরা বিপদভঞ্জন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করতে থাকেন, তুরীয়ানন্দজী সঙ্কটাস্তোত্র পাঠ করেন। সেই সময় হঠাৎ একজন সাধু উপস্থিত হন। তাঁর প্রদত্ত ঔষধ সেবনে স্বামীজী সংজ্ঞা ফিরে পান। কয়েকদিনের সেবাযত্নে স্বামীজী কিছুটা দৈহিক বল লাভ করেন। সেইসময় ঘটনাক্রমে পূর্বপরিচিত দেওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি দিল্লীতে এক হাকিমের নিকট স্বামীজীর চিকিৎসার পরামর্শ দেন, একটি পরিচয়পত্রও লিখে দেন।

দিনকয়েক পরে পরিব্রাজক দল সাহারাণপুর যাওয়ার পথে হরিদ্বারে উপস্থিত হন। তাঁরা খবর পান তাঁদের গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ কনখল গ্রামে একটি ঝুপড়ীতে[১৫] তপস্যা করছেন। বৃন্দাবনে কয়েকমাস সাধনভজনের পর তিনি ১৮৯০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে পদব্রজে হরিদ্বারে উপস্থিত হন এবং প্রাণাধিক পণ করে ভগবচ্চিন্তায় ডুব দেন।[১৬] অনেকদিন পরে কনখল গ্রামে গুরুভ্রাতাদের মিলন, দুর্লভ এক সুখ-মুহূর্ত। প্রিয় স্বামীজীর জীর্ণ শরীর দেখে ব্রহ্মানন্দজী আশঙ্কিত হন, তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে ব্যগ্র হন। এদিকে একাকী কঠোর তপস্যা করতে গিয়ে 'রাজার' স্বাস্থ্য বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখে স্বামীজী তাঁকে তাঁদের সঙ্গী হতে অনুরোধ করেন। তিনিও প্রীতির আহ্বানে সাড়া দেন। অতঃপর পরিব্রাজকদল দিল্লীর পথে সাহারাণপুরে উপস্থিত হন। সেখানে উকিল বন্ধুবাবুর কাছে তাঁরা জানতে পারেন যে মীরাটের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, সেখানে ডাক্তার ত্রৈলোক্যবাবুর গৃহে অখণ্ডানন্দজী বাস করছেন। আদরের গঙ্গাধরকে (অখণ্ডানন্দজী) দেখবার জন্য সকলেই, বিশেষ ব্রহ্মানন্দজী আগ্রহ প্রকাশ[১৭] করেন। স্বামীজীও সমর্থন করেন। তদনুযায়ী তাঁরা শীতের এক সন্ধ্যায় মীরাট সহরে ডাক্তার ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হন।

অখণ্ডানন্দজী মীরাট সহরে আসেন অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে। কিছুদিনের মধ্যে

১৪ স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'স্মৃতিকথা' (পৃঃ ৬১) : "তথায় এক মাস দেড় মাস অবস্থান করি

১৫ ফুসঘাসের (tigergrass) ছাউনী দেওয়া কুটিয়া।

১৬ ত্রিগুণাতীতানন্দজী নভেম্বর মাসে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "রাখাল এক্ষণে কনখলে আছেন। সেখান হইতে হৃষীকেশ যাইবেন। তাঁহার বড় বৈরাগ্য শুনিলাম।"

১৭ স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'স্মৃতিকথা' পৃঃ ৬২—"তিনি (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাকে দেখিবার আগ্রহ করায় সকলে মীরাটে আসেন।"

তাঁর শরীর সুস্থ হয়, কিন্তু শ্বাসযন্ত্র দুর্বল থাকায় ও সেবারে মীরাটে শীতের আধিক্যের জন্য অখণ্ডানন্দজী সমুদ্রতীরে কোন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রমদাবাবুকে কাশীতে চিঠি[18] লেখেন। যে কোন কারণেই হোক্ সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নি। তিনি প্রমদাবাবুকে ঐ চিঠিতে লেখেন, "ইহারা কয়ভাই অতিশয় হৃদয়বান ও উদার প্রকৃতির লোক, আমাকে যত্ন ও সেবার ত্রুটি করিতেছেন না, অতিশয় প্রীতিতে রাখিয়াছেন।" এই সময়ে অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয়। ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন, এবং ভারতধর্ম-মহামণ্ডলের একজন নেতারূপে খ্যাতিলাভ করেন। সেই বছর নভেম্বরের মধ্যভাগে দিল্লী সহরে ভারতধর্ম-মহামণ্ডলের এক বিরাট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞেশ্বরবাবুর আমন্ত্রণে অখণ্ডানন্দজী দেওয়ালী উৎসবের পর দিল্লীতে যান এবং মহামণ্ডলের অধিবেশনে যোগদান করেন। অনুমান হয়, তিনি সেই অধিবেশনে ভাষণ দেন। তিনি মীরাটে প্রত্যাবর্তন করে প্রমদাবাবুকে লেখেন,[19] "গতকাল সায়াহ্নে আপনার পত্র পাইয়া সকল অবগত হইলাম। কল্য ষষ্ঠ দিবসে দেহল্লী হইতে এখানে পৌঁছিয়াছি। সেইজন্য বিলম্ব হইয়াছে। ভারতধর্ম-মহামণ্ডলের অধিবেশন অতি সমারোহ এবং উৎসাহের সহিত সমাধা হইয়াছে। তথাকার জলবায়ু অতিশয় মন্দ সেজন্য তথায় আর অধিককাল থাকিতে পারিলাম না।" সেদিনই তিনি শিবানন্দজীকে লেখেন, "আপনাদের সম্বাদ পাইয়া সুখী হইলাম। ৫।৬ দিন দেহল্লীতে গিয়াছিলাম তজ্জন্য পত্র বিলম্বে পাইলাম। দিল্লীর আবহাওয়া অতিশয় মন্দ, তথায় ৫।৬ দিন থাকিয়াই আমার স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।"

মীরাট সহর থেকে লেখা অখণ্ডানন্দজীর কয়েকটি চিঠিপত্র অনুধাবনযোগ্য। তিনি উপরোক্ত ২০।১১।৯০ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, "ডেরাডুন হইতে একাকী, তৎপরে তাহাদের সংবাদ আর আমি জানি না এবং তাঁহারাও আমার জানেন না। তাঁহারা জানিতেন যে আমি ৺প্রয়াগে যাইব কিন্তু পথিমধ্যে এ অবস্থিতির কথা কিছুই জানিতেছেন না। এক্ষণে তাঁহারা হৃষীকেশে আছেন কি কোথায় গেছেন এবং তাঁহাদের কি মানস কিছুই বলিতে পারিলাম না।" আবার, প্রমদাবাবুকে ২৫।১১।৯০ তারিখে লেখা দীর্ঘ পত্র ও ৫।১২।৯০ তারিখে লেখা পোস্টকার্ড থেকে জানা যায় যে স্বামীজী বা অপর কোন গুরুভ্রাতা তখন পর্যন্ত মীরাট সহরে আসেন নি।

স্বামীজী প্রভৃতি মীরাট সহরে উপস্থিত হন, "৺কালীপূজার পর শরতের শেষ।"[20] সে বছর ৺কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় ১১ই নভেম্বর (২৬শে কার্ত্তিক, ১২৯৭ খৃঃ)। কিন্তু পরিব্রাজক দল যে ৫ই ডিসেম্বরের পূর্বে মীরাট সহরে পৌঁছান নি, সেবিষয়ে অকাট্য প্রমাণ অখণ্ডানন্দজীর পূর্বে উদ্ধৃত পত্রগুলি।

আনুমানিক ৬।৭ ডিসেম্বরের শীতের সন্ধ্যায় স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, সারদা-

১৮ মীরাট থেকে ২০।১১।৯০ তারিখে লেখা।
১৯ ২০।১১।৯০ তারিখে লেখা পূর্বোক্ত পত্র।
২০ প্রমথনাথ বসু : স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ) : পৃঃ ২১৮ এই তথ্যের ভিত্তি স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি।

নন্দজী ও কৃপানন্দজী ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। অখণ্ডানন্দজী ত্রৈলোক্যবাবুর দাদাকে একখানি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন।[২১] দীর্ঘকাল পরে মিলনের আনন্দে সবাই মেতে উঠেন। স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য দেখে অখণ্ডানন্দজী আতঙ্কিত হন। তিনি লিখেছেন, "স্বামীজীকে এত রুগ্ন আমি কখনও দেখিনি, ঠিক যেন একটি ছায়ামূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। মনে হয়েছিল তিনি যেন তখনও হৃষীকেশের সাংঘাতিক পীড়া থেকে উদ্ধার পান নি।" বোধ হয় সেই দিন বা পরের দিন যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও একজন হিন্দুস্থানী শেঠ গাড়ী চড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু পরমহংসদেবকে দেখেছেন বলাতে স্বামীজী তাঁর পায়ের ধুলা নিতে চান। শেঠজীর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ খুব জমে উঠে। স্থির হয়, স্বামীজী ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ীতে থেকে চিকিৎসা করাবেন, সঙ্গে থাকবেন অখণ্ডানন্দজী, অপর সন্ন্যাসিগণ বাস করবেন যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাটীতে।

ডাক্তার ত্রৈলোক্যবাবু স্বামীজীকে একটি টনিক দেন। এই ঔষধ সেবন করে স্বামীজীর ক্ষুধার উদ্রেক হতে থাকে। তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। বিস্ময়কর প্রতিভা স্বামীজী যেখানে অবস্থান করেন সেখানেই পরিবেশ জমজমাট হয়ে উঠে। ত্রৈলোক্যবাবুর কনিষ্ঠ ভাই প্রসন্নকুমার অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে প্রায়ই তর্কবিচার করতেন। তার্কিক প্রসন্নকুমার স্বামীজীর সামনে তর্কজাল বুনতে চেষ্টা করেন কিন্তু অল্প সময়েই তাঁর তর্ক করার সাধ মিটে যায়, তিনি বলতেন, "স্বামীজী দেখছি জ্ঞানের জাহাজ"।[২২] একদিন স্বামীজী প্রসন্নকুমারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি ঠাকুরকে চিন্তা করবেন, তিনি আপনার অভাব পূর্ণ করবেন।" সেই সময় এক রাত্রিতে প্রসন্নকুমার স্বপ্ন দেখেন, ঠাকুর সর্বাঙ্গে ময়লা মেখে নাচতে নাচতে তাঁর নিকট এসে বলছেন, 'আমায় কোলে কর', তাঁর দেহ ময়লাযুক্ত দেখে প্রসন্নকুমার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন, ঠাকুরও অন্তর্হিত হন। এই কাহিনী শুনে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, "আপনার ঠাকুরের ঘরে আসিতে এখনও বিলম্ব আছে।"[২৩] পরবর্তীকালে ঠাকুরের ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রসন্নকুমারের গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করে ঠাকুরের মহিমার জয়গান করেছিলেন।

দিন পনেরো পরে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, সারদানন্দজী ও কৃপানন্দজী পূর্বোক্ত শেঠজীর বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁর বাগানবাড়ীতে বাস করতে থাকেন। শেঠজীর বাগানের সম্মুখে রেসকোর্স ও পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ড। সারদানন্দজী ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড আক্রমণে কাবু হয়ে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন, কয়েকদিনের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করায় শেঠজীর বাগানে চলে আসেন, কারণ সেখানে তখন প্রবল আকর্ষণ। ঘটনাক্রমে ঠাকুরের অপর এক ত্যাগী সন্তান

২১ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি।
২২ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি।
২৩ ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ', পৃঃ ১৮২। ১৯০৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ মীরাটে গমন করেন। সেখানে

অদ্বৈতানন্দজী মীরাটে উপস্থিত হন। শেঠজীর বাগানের সংবাদ পেয়ে তিনিও সেখানে যোগদান করেন। রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে সমর্পিত-মনপ্রাণ সাতজন গুরুভ্রাতার মিলনে, বিশেষতঃ দিব্য নেতৃত্বের অধিকারী স্বামীজীর উপস্থিতিতে শেঠজীর বাগান মঠবাড়ীতে পরিণত হয়। গুরুভ্রাতাদের স্বভাবতই স্মরণ হচ্ছিল বরাহনগর মঠের দিনগুলি। ধ্যান-ধারণা, জপ, পাঠ, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মঠের দৈনন্দিন কর্মসূচী প্রীতির বন্ধনে পরিচালিত হচ্ছিল। দুপুরে বিশ্রামের পর স্বামীজী সকলকে নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা করতেন। একে একে মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মৃচ্ছকটিকম্, কুমারসম্ভবম্ পাঠ সমাপ্ত করে বিষ্ণুপুরাণ পাঠ আরম্ভ হয়। এই সাময়িক মঠবাসীদের খবর সহরে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতিদিন কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী ও স্থানীয় ভদ্রলোক শেঠজীর বাগানে সমবেত হতে আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন সহরের খ্যাতিসম্পন্ন উকিল কালীপদ বসু। তিনি স্বামীজীর অফুরন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের আস্বাদ পেয়ে তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি একদিন স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দজীকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। বিদ্যোৎসাহী এই ভদ্রলোকের উদ্যোগে মীরাটে একটি ভাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল।[২৫] এই গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক আনিয়ে স্বামীজী পড়াশুনা করতেন। তিনি অখণ্ডানন্দজী মারফত স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলী (Sir John Lubbocks' Works) এক এক খণ্ড আনিয়ে পড়তেন এবং দুইদিন[২৫] পরেই ফেরত দিয়ে পরবর্তী খণ্ড আনাতেন। গ্রন্থাগারিক বিশ্বাস করেন না যে, স্বামীজী এরূপ অল্পসময়ে ভারী বই পড়েছেন। স্বামীজী জানতে পেরে একদিন গ্রন্থাগারে উপস্থিত হন এবং কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থাগারিককে বলেন, "Ask me any question, I am prepared to answer."[২৬] গ্রন্থাগারিক কয়েকটি প্রশ্ন করে তাদের যথোচিত উত্তর পেয়ে বুঝেন তাঁর সন্দেহ অমূলক। তিনি স্মৃতিধর স্বামীজীর অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত হন। পরে অখণ্ডানন্দজী এর রহস্যভেদের জন্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে স্বামীজী বলেন, "আমি কখনও কোন বই প্রতিটি শব্দ ধরে পড়ি না, আমি গোটা এক একটা বাক্য ধরে পড়ি, এমন কি, এক একটা প্যারা ধরেও পড়ে যাই—যেমন নাকি ছবির কলের সামনে একসঙ্গে একখানি বহু বর্ণের চিত্র ভেসে উঠে।"[২৭]

অখণ্ডানন্দ স্বামীর পূর্বপরিচিত আফগানিস্তানের আমির আব্দার রহমানের জনৈক আত্মীয় ও সর্দারশ্রেণীর অভিজাত ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট আসেন। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে শরণার্থিরূপে মীরাটে বাস করছিলেন। তিনি উঁচু করে শুদ্ধ হয়ে সাধু-সন্দর্শনে আসতেন, প্রতিবারই একটাকার ফলমিষ্টাদি হিন্দু বাহকের সাহায্যে আনতেন। একদিন তিনি সাধুদের পোলাও খাওয়ার জন্য অর্থ

প্রসন্নকুমারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়।

২৪ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি।

২৫ ঐ　　২৬ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি।

২৭ The Life of Swami Vivekananda by His Eastern & Western Disciples, pp. 203, অনুবাদ: স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত।

দেন এবং স্বামীজী স্বহস্তে রান্না করে গুরু-ভাইদের খাওয়ান।[২৮] স্বামীজী তাঁর সঙ্গে স্থানের সুপ্রসিদ্ধ ফকির আমুদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার মাধ্যম ছিল উর্দু ভাষা।

শেঠজীর বাগানে সাধুরা নিজহস্তে রান্নাবাড়া করতেন। মনে হয় পূর্বোক্ত শেঠজী কিছু অর্থ দিতেন। বাগানে এসেও স্বামীজীকে কিছুদিন ঔষধ সেবন করতে হয়। ত্রৈলোক্যবাবু পথ্যের উপযুক্ত সিধা সাধুদের সকলের জন্য প্রতি সপ্তাহে পাঠাতেন। কোন কোন দিন স্বামীজী নিজে রান্নার কাজে সাহায্য করতেন। গুরুভ্রাতাদের বিশেষতঃ তুরীয়ানন্দজীকে খাওয়ানোর জন্য স্বামীজী একদিন নিজে বাজার থেকে মাংস কিনে আনেন, ডিম সংগ্রহ করেন এবং উপাদেয় খাবার প্রস্তুত করে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।[২৯]

সেই বছর মীরাট অঞ্চলে বেশ শীত পড়েছিল। তুরীয়ানন্দজী তাঁর অভিজ্ঞতা স্মরণ করে পরবর্তীকালে প্রেমানন্দজীকে সাবধান করেছিলেন, "তাই বলছিলাম মীরাটে বড় শীত। শীতকালে তোমার সেখানে যাওয়া সম্ভবপর হইবে না।"[৩০] তবুও সেখানকার স্বাস্থ্যপ্রদ জলহাওয়াতে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দজী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। সারদানন্দজী ম্যালেরিয়া-বীজাণু-মুক্ত না হলেও অনেকাংশে সুস্থ হয়ে ওঠেন। অপরাহ্ণে তাঁরা অনেকে বেড়াতে যেতেন, প্যারেড মাঠে সৈনিকদের ক্রীড়া কসরত উপভোগ করতেন। কোন কোন দিন সকালবেলা স্বামীজী ক্যান্টনমেন্টের দিকে বেড়াতে যেতেন। গুরুভ্রাতাদের পরস্পরের সাহচর্যে, বিশেষ করে 'অখণ্ডের ঋষি' স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ধ্যান-ধারণা, শাস্ত্রপাঠ, বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা, ভজন-সঙ্গীত ও নানাপ্রকারের শিক্ষা দীক্ষার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বরাহনগর মঠের দিনগুলি সদা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, গুরুভ্রাতাদের পরস্পরের প্রীতির বন্ধন নিবিড়তর হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনী লেখক যথার্থই লিখেছেন, "This was one of the happiest periods of their life."[৩১]

এই সময়কার সুখস্মৃতি রোমন্থন করে তুরীয়ানন্দজী লিখেছিলেন,[৩২] "এক সময়ের মীরাটের স্মৃতি আমাদের মনে খুব জাগরূক রহিয়াছে। পুণ্যস্মৃতি স্বামীজী হৃষীকেশে অসুখের পর এই মীরাটে পরিবর্তন করিয়াই আবার পূর্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রায় ছয় মাস কাল[৩৩] আমরা তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেই সময়েই কনখলে আমরা মহারাজের (ব্রহ্মানন্দজীর) সহিত সাক্ষাৎ করি ও তখন হইতে অন্যূন ছয় বৎসর কাল তাঁহার সহিত

২৮ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি।

২৯ ঐ

৩০ ১৯।১২।১৯১৫ তারিখে লেখা তুরীয়ানন্দজীর পত্র।

৩১ The Life of Swami Vivekananda, pp. 203.

৩২ আলমোড়া হতে ১৯।১২।১৫ তারিখে তুরীয়ানন্দজী প্রেমানন্দজীকে যে পত্র লেখেন তার একাংশ।

৩৩ স্বামীজীর সঙ্গে রাজপুরে সাক্ষাৎ হয় ১৩ই অক্টোবর, ১৮৯০ এবং দিল্লীতে ছাড়াছাড়ি হয় আনুমানিক ১৮৯১ খৃঃ মার্চ মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক পাঁচ মাস।

একত্রে যাপন করিয়াছিলাম। মীরাটের অবস্থান যে কি সুখের হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্বামীজী আমাদের জুতাসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা সেই সময় দিতেন। এদিকে বেদান্ত উপনিষদ্ সংস্কৃত নাটকসকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, ওদিকে পোলাও কালিয়া রান্না শেখাইতেন, আরও কত কি যে করিতেন তাহা তুমি অনুমানই করিতে পারিতেছ। এই সময়ের একদিনের ঘটনা চিরদিনের মত হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। এ সেই মঠের মাগুর মাছ রান্নার মত। মনে আছে ত মাগুর মাছের ঝোলের কথা। সে কথা কি ভুলিবার। এও সেই রকমের। একদিন পোলাও কালিয়া প্রভৃতি রান্না করিয়াছেন। আর মাংসের কিমা করাইয়াছেন, তাহার কিছু শিক্‌কাবাব করিবার ইচ্ছা ছিল। হরিভাইকে শিক্‌কাবাব খাওয়াব। কিন্তু শিক পাওয়া গেল না। স্বামীজী কি ছাড়িবার পাত্র! সম্মুখে পিচগাছ ছিল, তারই গোটাকতক ছোট ডাল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেই কিমা জড়িয়ে দিয়ে কাবাব তৈরী হল। সে যে কি উপাদেয় হ'ল তা আর কি বলবো। আমরা ভাল হয়েছে বলায় সব আমাদের খাইয়ে দিলেন। নিজে দাঁতে কাটলেন না। আমরা বলায় বললেন যে, আমি ওসব ঢের খেয়েছি, তোমাদের খাইয়ে আমার বড় সুখ হচ্ছে। সব খেয়ে ফেল। বোঝো। ঘটনা সামান্য কিন্তু চিরতরে হৃদয়ে গাঁথা আছে। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম কাটি কাবাব। কত যে যত্ন কত যে ভালবাসা কত গল্প কত বেড়ান সব স্মৃতিপটে জলজল করছে, এইখান থেকেই স্বামীজী একাকী চলে যান।"

দ্বিতীয় বরাহনগর মঠের আনন্দমুখর দিনগুলি গুরুভ্রাতাদের প্রীতির সম্বন্ধকে সজীব ও নিবিড় করে তুলেছিল, সেই সময় স্বামীজী একদিন অকস্মাৎ ঘোষণা করেন, "আমার জীবনব্রত স্থির হয়ে গেছে। এখন হতে আমি একাকী অবস্থান করব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।" নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক-জীবন যাপনের জন্য স্বামীজীর মন অত্যন্ত ব্যাকুল দেখে মঠবাসীদের অধিকাংশ কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর সঙ্গ ছাড়তে চান না। তিনি কাতরভাবে স্বামীজীকে বলেন, "তোমারই অনুরোধে আমি মধ্য এশিয়া দেখা বন্ধ রেখে বরানগরে ফিরে গিয়েছিলাম, এখন তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছ।" স্বামীজী স্মিতহাস্যে উত্তর করেন, "গুরুভাইদের সঙ্গে থাকায় তপস্যার বিশেষ বিঘ্ন হয়। দেখনা, তোমার ব্যারামে টিহিরিতে ভজন করতে পারলাম না। গুরু-ভাই-এর মায়া না কাটালে সাধন-ভজন হবে না। যখনই তপস্যা করব মনে করি, তখনই ঠাকুর একটা বাগড়া দেন। আমি এবার একলা বেরুব। কোথায় থাকব, কাউকে সন্ধান দেব না।" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অখণ্ডানন্দজী বলেন, "তুমি যদি পাতালেও যাও, সেখান থেকে যদি খুঁজে তোমায় বার করতে না পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।"[৩৪] সঙ্কল্পে অটল স্বামীজীর মত অপরিবর্তিত থাকে। একদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী দিল্লীর টিকিট জোগাড় করে মীরাট ত্যাগ করেন।

দলনেতা স্বামীজী মীরাট ত্যাগ করার পর অস্থায়ী 'দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ' ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। মঠবাসীরা তাঁদের পরবর্তী

৩৪ স্বামী অখণ্ডানন্দ : 'স্মৃতিকথা' পৃঃ ৬১।

কার্যক্রম স্থির করেন, ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হন দক্ষ (স্বামী জ্ঞানানন্দ)।[৩৫] স্বামীজী চলে যাওয়ার দুদিন[৩৬] পরে তিনি শেঠজীর বাগানে আসেন, দিন আষ্টেক পরে তিনি ও অদ্বৈতানন্দজী হরিদ্বারে ৺কুম্ভস্নানের জন্য যাত্রা করেন। শিবরাত্রিতে প্রথম স্নান, চৈত্র অমাবস্যাতে দ্বিতীয় স্নান এবং মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তিতে তৃতীয় বা প্রধান স্নান হয়। সে বছর প্রথম স্নানের দিন পড়ে ২৫শে ফাল্গুন, ১০৯৭, রবিবার, ইং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ। খুব সম্ভবতঃ অদ্বৈতানন্দজী ও জ্ঞানানন্দজী মার্চ মাসের প্রথমেই হরিদ্বার উদ্দেশে রওনা হন। অপর সকলে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং গাজিয়াবাদে উপস্থিত হন। সারদানন্দজী স্বাস্থ্যের কারণে কৃপানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে এঁটাওয়া চলে যান। অপর সকলের লক্ষ্য ছিল, মনে হয় স্বামীজীর অনুসন্ধান করা। ঘটনাক্রমে সেখানে এক গরিবদাসী সাধু সেবক জুটে যায়। সাধুদের সেবাযত্ন করে ভোজন করিয়ে তার আনন্দ। তাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজী দিল্লীতে যান। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীকে আবিষ্কার করতে তাঁদের বেশী সময় লাগে না। স্বামীজী দিল্লীতে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করে আলোয়ার যাত্রা করেন[৩৭] আনুমানিক মার্চ মাসের মাঝামাঝি। তার কিছুদিন পরে ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজী গাজিয়াবাদে আসেন। সেখানে আটদিন বাস করে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী পাঞ্জাব প্রদেশের তীর্থপরিক্রমায় যাত্রা করেন,[৩৮] অখণ্ডানন্দজী রওয়ানা হন বৃন্দাবনের উদ্দেশে।[৩৯]

[শেষাংশ ৬৮৯ পৃষ্ঠায়]

৩৫ ঐ 'স্মৃতিকথা' পৃঃ ১৬৬ : "আমি মঠে থাকিতে স্বামী জ্ঞানানন্দকে অনেকে দক্ষ ঋষি বলিয়া ডাকিতেন। সে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিল। ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসিত। খুব সরল ছিল বলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং বরাহনগর মঠে লইয়া আসিয়া তাহাকে সন্ন্যাস দেন।...অনুমান ১৮৯১ খৃঃ মীরাটে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।...মীরাট হইতে স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে হরিদ্বার কুম্ভে যায়। ইহার তিন-চার মাস পরেই জ্ঞানানন্দ ঘোর উন্মত্ত অবস্থায় বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

৩৬ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরী।

৩৭ স্বামীজীর জীবনীকারদের অধিকাংশের মত, "১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে এক সকালে ট্রেন হইতে আলোয়ার নগরে অবতীর্ণ হইলেন।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ প্রথমভাগ, পৃঃ ৩০৩) এবং সেখানে তাঁর অবস্থিতি "সাত সপ্তাহ পূর্ণ" হয় (ঐ, পৃঃ ৩১৪)। এই সময়-নির্দেশ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আছে বলে জানা যায় না। অপরপক্ষে স্বামীজী ফেব্রুয়ারীর শেষে দিল্লীতে আসেন, ইহা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তিনি যে দিল্লীতে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন, সে বিষয়েও প্রমাণ বিদ্যমান। (অন্যতম প্রমাণ : ১৯।১২।১৯১৫ তাং লেখা তুরীয়ানন্দজীর পত্রাংশ, "যদিও দিল্লীতে আবার [স্বামীজীর সঙ্গে] একবার দেখা হয়েছিল এবং একসঙ্গে প্রায় একমাস থাকা গেছলো।" পূর্বাপর বিচার করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে স্বামীজী মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আলোয়ার যান।

৩৮ ২২।২।১৮৯১ তারিখে শিবানন্দজীর লিখিত পত্রাংশ, "শরৎ ও সান্যাল দুইজন Ettuah রহিয়াছেন। গঙ্গাধর, হরি ও রাখাল দিল্লীতে আছেন। বোধ হয় তাঁহারা পাঞ্জাবে যাইবেন।"

৩৯ 'স্মৃতিকথা' ঐ, পৃঃ ৬২ : "...রাখাল মহারাজ ও হরি মহারাজ পাঞ্জাবে এবং আমি বৃন্দাবনে—ব্রজধামে।"

রামমোহন ঃ দ্বিশতবার্ষিকীর আলোকে

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনের আদি প্রবর্তকরূপে ধর্মসংস্কারক রামমোহনের ভূমিকাই আমাদের প্রথম মনে জাগে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে যেমন ধর্মসাধনাকেই তাঁদের জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করতে দেখা যায়, রামমোহনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি যতটা যুক্তিবাদী, ততটা সিদ্ধসাধক ন'ন। তাই তাঁর গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে শাস্ত্রমন্থনজাত যুক্তি ও উক্তি-সংগ্রহ যাই থাক, যথার্থ অধ্যাত্মপ্রেরণার নিজস্ব বাণী বিশেষ কিছু নেই। এদিক থেকে কবীর, নানক, মীরাবাঈ, শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য স্মরণীয়। এমনকি তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতেও তেমন কোনো উদ্ধৃতিযোগ্য চরণের একান্ত অভাব। অথচ নির্গুণ বা সগুণ ব্রহ্মোপাসনামূলক সাহিত্যমূল্যে গরীয়ান রচনা ভারতীয় সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে।

ধর্মসাধনার সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যবহারিক জগতের সম্বন্ধ-স্থাপনে রামমোহন অনেক

[৬৮৪ পৃষ্ঠার পর]

উপরি-উক্ত তথ্যানুসারে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, স্বামীজী মীরাট সহর পরিত্যাগ করেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে. অর্থাৎ এই যাত্রাতে স্বামীজীর মীরাটে অবস্থানকাল ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯০ -এর পর হতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সেখানে অবস্থানকাল প্রায় তিনমাস। অখণ্ডানন্দজী মীরাটে অবস্থান করেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পরবর্তী মার্চের প্রথম সপ্তাহের কয়েকদিন।[৪০] এই হিসাবে মীরাটের শেঠজীর বাগানে অবস্থিত 'দ্বিতীয় বরাহনগর মঠের' স্থায়িত্বকাল অনূ্যন আড়াইমাস।[৪১] রামকৃষ্ণ-সন্তানদের স্বল্পস্থায়ী মিলনভূমি "শেঠজীর বাগান" তথা 'দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ' বহু পুণ্যস্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। আমরা সেই পুণ্যস্মৃতি চয়ন করে ধর্মরাজ্যের দিকপাল কয়েকজনের ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ আলোতে দিব্যপ্রেরণা লাভ করে থাকি।

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি : "গঙ্গাধর মহারাজ, হরি মহারাজ, রাখাল মহারাজ ৮ দিন গাজিয়াবাদে—গঙ্গাধর মহারাজ এলেন বৃন্দাবনে।"

৪০ ১৩৪৩ সালের রচিত 'স্মৃতিকথা'তে অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন, "সকলে মীরাটে আসেন ও চার পাঁচ মাস তথায় অবস্থান করেন।" গুরুভাইদের মধ্যে অখণ্ডানন্দজী মীরাটে সবচেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেন। তাঁর নিজের অবস্থানকাল কিঞ্চিদধিক চার মাস।

৪১ 'Life of Swami Vivekananda', p. 203-এর অভিমত' "After a stay in Meerut for about five months, the Swami again grew restless."—গ্রহণযোগ্য নয়। প্রমথনাথ বসু রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ২২০) উল্লিখিত "তিন মাসেরও অধিককাল" শুধু অখণ্ডানন্দজী ব্যতীত অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরিতে লিখিত, "চার মাস ঐ বাগানে থাকা হয়"—এই তথ্য অনেকাংশে অখণ্ডানন্দজীর মীরাটে মোট অবস্থানকাল বোঝাতে পারে।

পরিমাণে আধুনিকমনোভাবাপন্ন। ধর্মের সামাজিক পটভূমি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে রামমোহনের সচেতন দৃষ্টি বিংশ শতাব্দীর মানুষকেও মুগ্ধ করে। একেশ্বরবাদের উদার ঐক্যচেতনায় তিনি বিশ্ববাসীর সঙ্গে যে ভ্রাতৃত্ব অনুভব করেছিলেন, তার মূলে সমসাময়িক ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রাগ্রসর দৃষ্টি। সমুদ্রযাত্রার দ্বারা বহুযুগের কূপমণ্ডুকতা থেকে ভারতীয় মানসকে মুক্ত করে যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যেও তাঁর প্রসারিত ধর্মচেতনার প্রতিফলন লক্ষণীয়। বস্তুতঃ ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সে তিনি কেবল কৌতূহলী পর্যটক ন'ন, বিশ্বভ্রাতৃত্বে অবিচল আস্থাসম্পন্ন অথচ স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

আজকের দিনে এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে যে, রামমোহনের নিরাকার একেশ্বরবাদ আমাদের সমাজজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে কি? কলকাতা ও তাবৎ বঙ্গবাসি-অধ্যুষিত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিমাপূজার ব্যাপকতা দেখে বিপরীত সিদ্ধান্তই মনে জাগে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতিমাপূজা আজকের দিনেও অনেক ক্ষেত্রেই বহিরঙ্গ উৎসব-আয়োজনের বেশী কিছু নয়। উৎসবের আড়ম্বরে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার স্থান ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। রামমোহনের নিরাকারবাদ হয়তো পূর্ণাঙ্গ বিচারে গ্রহণীয় নয়, কিন্তু যে আন্তরিকতার উপরে তিনি নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, সেই আন্তরিকতারই অন্যতম দিক তাঁর যুক্তিবাদ। এই যুক্তিবাদী মনোভঙ্গী শুধু ব্রাহ্ম-আন্দোলনই সৃষ্টি করেনি, পরবর্তী নব্য-হিন্দু-আন্দোলনের যুক্তিবাদেও এর প্রভাব রয়েছে। আচারসর্বস্ব প্রশ্নহীন অভ্যাসের অনুবর্তন থেকে যথার্থ ধর্মের লক্ষণ-অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্ত করার পিছনে উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে রামমোহনের অগ্রগামিতা ইতিহাস-সমর্থিত। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা রামমোহনের মতবাদ-সমর্থনের কথা আমরা বলতে চাই না। কিন্তু যুক্তি, ধর্ম ও সমাজের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ-স্থাপন-প্রচেষ্টা যে আধুনিকতার লক্ষণ, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে রামমোহনেই তার সূচনা। এর ফলেই জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের ক্ষেত্রে রামমোহনের সংগ্রামী ভূমিকা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম দিকে পারিবারিক মতবিরোধে এ সংগ্রামের সূত্রপাত, তারপর বেদান্তচর্চা নিয়ে মতপার্থক্যে সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে সংগ্রামে এর প্রসার, সতীদাহ-আন্দোলনে, সাংবাদিক স্বাধীনতার সমর্থনে, শিক্ষাবিস্তারের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় এ সংগ্রামেরই নানামুখী বিকাশ, সমুদ্রপারে জীবনাবসানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মানবিক অধিকারের সপক্ষে সদাজাগ্রত সচেতনতায় এর পরিপূর্ণতা। আধ্যাত্মিক অর্থে আদর্শগত সিদ্ধি তাঁর পুরো আয়ত্ত হয়নি, কিন্তু যে মানবসচেতন জীবনদর্শন উনবিংশ শতাব্দীর যুগলক্ষণ, তার বিচারে রামমোহন বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য চরিত্র। মানবিকতাবাদ কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ডের মানুষে বিশ্বাস করে না, পতনে উত্থানে যে মানুষ তার অনন্ত সম্ভাবনার পথে অগ্রসর সেই মনুষ্যত্বই তার আগ্রহের বিষয়। সেদিক থেকে আদর্শ-উদ্‌যাপনে ব্যক্তির সিদ্ধি যেমন স্মরণীয় তার চেয়ে বেশী স্মরণীয় তার আদর্শের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতা। রামমোহনপ্রসঙ্গে এই শতাব্দীর প্রান্তে যাঁরা চিন্তারত, তাঁদের পক্ষে একথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ইতিহাসের বিচারে সর্বাংশেই বর্জনীয়, কিন্তু মানুষের মহত্ত্বকেই বিশেষভাবে শ্রদ্ধা

জানানোও মনুষ্যত্ব-বিচারের অন্যতম অঙ্গ। ব্যক্তিত্বে ও ভাবনায় অনেক বড়ো বলেই রামমোহনচরিত্রে অসঙ্গতিও অনেক বড়ো। তবু সব অসঙ্গতিকে ছাপিয়ে রামমোহন-মানসের বিশালতাই সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সামগ্রী।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় রামমোহনের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন রয়েছে —"রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদির উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না এমন কথা যে কহে সে যে আপনাকে বেদান্তী কহে ও তত্ত্বজ্ঞান করে অথচ আপনাকে অদ্বৈতবাদীও কহে, সে কেমন ইহা বুঝা যায় না। বুঝি অভিনব সুবুদ্ধি-কল্পিত বেদান্ত নামে কিছু একপ্রকার হইয়া থাকিবেক এবং সেও তেমনি অদ্বৈতবাদীও হইয়া থাকিবেক।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী : বেদান্তচন্দ্রিকা : পৃঃ ১৪২ : সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ]। উত্তরে রামমোহন নিজের মতবাদ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"যদি শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রই কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তি কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মার শ্রবণ-মনন রূপ উপাসনা করিবেন…।" [ভট্টাচার্যের সহিত বিচার : রামমোহন গ্রন্থাবলী : পৃঃ ১১৮ : সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ]

উপাসকের স্তরভেদ স্বীকার করলেও রামমোহন সাধারণভাবে প্রতিমা বা সাকার-উপাসনার বিরোধিতাই করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যেভাবে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, তার চেয়ে রামমোহনের যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই শাস্ত্রব্যাখ্যাসঙ্গত। কিন্তু সাকার ও নিরাকারের মধ্যে শুধু যে বুদ্ধিগত পার্থক্যই নয়, উপলব্ধিগত ঐক্যসূত্রও আছে, একথা মৃত্যুঞ্জয়ের মানসপটভূমিতেই সার্থকতর ভাবে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-উপলব্ধি-জাত সিদ্ধান্তটি ভারতীয় অধ্যাত্মমনীষার দিক থেকে ধ্রুব নির্দেশক। পরমসত্যের উপলব্ধির ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান এ দুটি ভাগ করেছেন এবং জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানকে মহত্তররূপে নির্দেশ করেছেন।

সাধনজগতের সর্বস্তরের রহস্যবেত্তা শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভাষায়—"সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাঁতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান।

কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। …যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা আহরণ করতে হয়; তারপর পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটা ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞাননাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত এই বিজ্ঞানের স্তর থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের অমর দুটি পঙ্‌ক্তি—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন,
সেবিছে ঈশ্বর।

রামমোহনের অধ্যাত্ম উপলব্ধি এ স্তরে উপনীত হওয়ার কোনো সাক্ষ্য তাঁর জীবনী বা রচনায় নেই। কিন্তু বেদান্তচর্চাকে তিনিও গুহানিহিত না রেখে প্রতিদিনের কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত থেকেই সাধনপথে

অগ্রসর হওয়ার সুকঠিন দায়িত্বগ্রহণের কথা ভেবেছেন। উপনিষদের ঋষিদের উদাহরণ দিয়ে এবং নিজেকে তাঁদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী ভেবেও তিনি সাকার উপাসনার চেয়ে দুরূহ নিরাকার উপাসনারই অনুগামী হতে চেয়েছেন। কিন্তু জনক বা যাজ্ঞবল্ক্যের মতো যথার্থ নিরাসক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী সংসার-সমাজে একান্ত দুর্লভ বলেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ত্যাগের আদর্শের উপর এত বেশী জোর দিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, পরবর্তী ব্রাহ্ম আন্দোলন নানা ঐহিক বিষয়ে মতভেদের জন্যই ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে সমাজ ও রাজনীতির নানা সমস্যা উত্তরকালের ব্রাহ্মদের প্রধান আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

রামমোহন জীবন ও জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তার অন্যতম পরিচয় মেলে তাঁর ইংল্যাণ্ডে বাস-কালে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা-বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যে—"The struggles are not merely between the reformers and the anti-reformers ; but between liberty and oppression throughout the world ; between justice and injustice, and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots."

[The Life and Letters of Raja Rammohan Ray : Collet : p 333 : 1962 Edn.]

ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় রামমোহনের সবচেয়ে উদ্বেগ ও আগ্রহের বিষয় ছিল তখনকার পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল পাশ হওয়া ; কারণ এই বিলটি পাশ হওয়ার উপরে শুধু ইংল্যাণ্ডের জনগণেরই নয়, সমগ্র ইংরেজ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ভর করছিল। সেই কথা মনে রেখেই উদ্ধৃত পত্রাংশে রামমোহনের মন্তব্য—"শুধু কেবল সংস্কারকামী আর সংস্কারবিরোধীদের মধ্যেই সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলেছে স্বাধীনতার সঙ্গে দমননীতির লড়াই, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে লড়াই, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে লড়াই। কিন্তু অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে, রাজনীতি ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রে একনায়ক ও মতান্ধ গোঁড়াদের সমস্ত বিরোধিতাসত্ত্বেও ক্রমশঃ উদারতর আদর্শই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।"

রামমোহনের চিরসংগ্রামী সত্তা এমনিভাবে জীবনসত্যকে উপলব্ধি করে এসেছে। সমস্যা এই, এককালের উদারতার আদর্শ পরবর্তীকালে আর একজাতীয় গোঁড়ামির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুধর্মভাবনার মূল সত্যের অনুসন্ধানী ব্রাহ্মসমাজ তাই পরবর্তীকালে মূল হিন্দু ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করতে বসেছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মই কি এক হিসাবে নিজের মধ্যে বহু বিচিত্র সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করে রাখে নি? চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে রামমোহন রায় অবধি সুদীর্ঘ ইতিহাসে শেষ অবধি সব তরঙ্গই ভারতপন্থার সর্বগ্রাসিতায় বিলীন হয়েই কৃতার্থতা অর্জন করেছে। রামমোহনের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

১.১.৩৭. ভক্তি ও অন্নপূর্ণা (আমেরিকান ভক্ত, বেলুড়মঠে মন্দির নির্মাণের জন্য বহু অর্থ দেন) কয়েকদিন পূর্বেই বাবাকে চিঠি দিয়াছেন, পরে টেলিগ্রাম আসিয়াছে: আগামী ১লা জানুআরি আমরা আপনার কাছে কাটাইব। বোস্টনের স্বামী অখিলানন্দজী সঙ্গে আসিতেছেন। বাবা অনঙ্গ মহারাজ (স্বামী ওঁকারানন্দ) ও বড় দ্বিজেন মঃ (স্বামী গঙ্গেশানন্দ)-কে আসিতে লিখিয়াছেন।

অভ্যর্থনার জন্য নানা আয়োজন হইতেছে—কলিকাতা হইতে ফুল ফল, মালা দেশী (রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি) বিদেশী (কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি) খাবার সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্রম সাজানো গুছানো হইতেছে—মহা আনন্দ।

১লা জানুআরি ভোরবেলা দেখা গেল—রেল-লাইনের ধারে একটি কাটা সেলুন-গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। বাবা অমনি কয়েকজনকে পাঠাইয়া দিলেন অতিথিদের প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিতে, নিজেও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ভক্তি, অন্নপূর্ণা ও স্বামী অখিলানন্দ আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাদের মালা দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। হলে টেবিলে চা-পানের পর উপহার-আদান-প্রদানের সহিত অভ্যর্থনার প্রথম পর্ব শেষ হইল।

দ্বিজেন মঃ আশ্রমের সকলকে রসগোল্লা দিতেছেন। এমন সময় অনঙ্গ মহারাজ আর্জেন্টিনার স্বামী বিজয়ানন্দ (পশুপতি মঃ)-কে লইয়া উপস্থিত। বাবা তাঁহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, আদর করিয়া খাওয়াইলেন, পরে বলিলেন, "বল্, কি চাই?" সেদিন বাবা একটি নূতন সাদা পশমের র‍্যাপার গায়ে দিয়াছিলেন, স্বামী বিজয়ানন্দ সেইটি চাহিলেন। বাবা তখনি চাদরখানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। আনন্দের স্রোতে যেন সারা আশ্রমটি ভাসিতেছে।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আমেরিকা যাইতেছেন, বাবা তাঁহাকে দাঁড়াইয়া লেকচার দিতে বলিলেন। 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থের জন্য লিপিবদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গের কিছুটা অনুবাদ করাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেটুকু সকলকে শোনানো হইল। আহারাদির পর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রম দেখিতে লাগিলেন; কেহ গাছতলায় কেহ বাগানে বেঞ্চে বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে সব চলিয়া গেলেন। সারাদিনের আনন্দের পর বাবা খুব ক্লান্ত, শেষে বলিলেন, "১লা জানুআরি, আজ আমাদেরও শুভদিন—'কল্পতরু' দিবস।"

কয়েকদিন ধরিয়া হিরণ্ময়ী বর্ধন আছেন। কুমিল্লার ডাঃ কামিনী বর্ধনের পত্নী, স্বামী-স্ত্রী কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বামী ডাক্তার, নাস্তিক-প্রকৃতি, হিরণ্ময়ী ভক্ত সাধিকা। তিনি বাবার ছবিতেই সব পূজা করেন—কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, ঠাকুর, মা সকলের পূজা; বাবার ছবিতে ভাই ফোঁটাও দেন। চিঠিতে একবার তাই লিখিয়াছিলেন। বাবা শুনিয়া বলেন, "দেখেছ, ঠাকুর মায়া দিয়ে ভোলাতে চাইছেন।"

হিরণ্ময়ী বর্ধন কাছে আসিলেই বাবা

বকিয়া ঝকিয়া ঠাকুরঘরের দিকে পাঠাইয়া দেন। সেখানে গিয়া তিনি বসিয়া বসিয়া কাঁদেন। বাবা বলেন, "যোগীর চক্ষু" একদিন হিরণ্ময়ী প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, ফুল-চন্দন দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া বাবার পাদপদ্ম পূজা করিলেন, শেষে পাদপদ্ম দুটি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিলেন। বাবা চুপ করিয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন।

৩.১.৩৭. বিকেলের দিকে বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বাবার শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রসঙ্গ হয়। তন্মধ্যে Botany (উদ্ভিদবিদ্যা) এবং Co-education (সহশিক্ষা)-ও আলোচিত হয়। পরিশেষে বাবা বলেন, "ছেলেমেয়েদের ভদ্র ব্যবহার শেখানোই শিক্ষার সবচেয়ে বড় অঙ্গ।"

"পশ্চিমে সাধুদের নামে 'মহারাজ' ব্যবহার করে—এমনি সম্মানার্থে 'মহারাজ' বলে, তাই থেকেই আমাদের চল্। অশোক, আকবর প্রভৃতি নামের আগে সম্রাট ব্যবহার করবে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ বলতে হবে, 'অমানিনা মানদেন' ('মানদেন' কথাটির উপর জোর দিলেন)—যার যেটুকু সম্মান প্রাপ্য, তাকে তা দিতে হবে। এক মুসলমান ফকিরের কাছে শিখেছিলাম—'যখনই মহম্মদের নাম উচ্চারণ করবে, তখনই 'হজরত' বলতে হবে।' তুমি মান্য কর, তবে তো তোমাকে মান্য করবে, যেমন 'মণি'কে 'মণি মহারাজ' না বললে চলবে না।"

আগামী কাল শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিপূজা। সন্ধ্যারতির পর রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। পূজারী শ্রীশ্রীঠাকুরকে শয়ন দিয়া আসিয়া কাল কিভাবে পূজা হইবে এবিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবা বলিলেন—

"মা, নাও; মা, খাও; মা, পর—এই তো পুজো। মন্ত্র-টন্ত্র আর কি? ঠাকুরের অত সংস্কৃত মন্ত্র-টন্ত্র ছিল না। খুব প্রাণ থেকে বলতে হয়—'মা, এই নাও; তোমারই জিনিস তোমাকে দিচ্ছি। কত ভক্ত আজ তোমায় কত ভালো ভালো জিনিস দিচ্ছে। আমি যা পেয়েছি, এনেছি; আর তো কিছু পাইনি। তুমি নিজগুণে নাও, মা।' কেঁদে কেঁদে বলবে, আর মনে করবে যেন তিনি প্রসন্না হয়ে সব নিচ্ছেন।

"আর হোম করবে—যেন সর্বস্ব আহুতি দিচ্ছ। ২৮টি বেলপাতা মায়ের নাম—ব'লে ব'লে দেবে। তা নইলে সারাদিন মায়ের পুজো হচ্ছে, এদিকে মায়ের ছেলেরা সব না খেয়ে শুকুচ্ছে, আর ওদিকে মায়ের ভোগই নামছে না। আমাদের মা এরকম চাইতেন না। ভাবের পুজো—বুঝলে?"

* * *

৪.১.৩৭. শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা। খুব ভোরবেলা শ্রীমন্দিরে মঙ্গলারতি হইয়া গেল। তারপর সকলে আসিয়া বিনোদ-কুটিরে বাবার কাছে বসিলে একজন একটি শিবের গান গাহিল: শিব শিব শঙ্কর ভোলা মহেশ্বর। তারপর বাবা করজোড়ে গদ্‌গদ স্বরে আবৃত্তি করিলেন—"নাগেন্দ্র-হারায় ত্রিলোচনায়"—(শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র)। একটি ভক্তকে গান গাহিতে বলায় সে একটি রাধার গান গাহিল। বাবা বলিলেন, "ও আবার কেন? মায়ের গান জান না?" তারপরই বলিলেন, "না, না—আমাদের মা তো সবই।" ভক্তটি মায়ের একটি গান গাহিল।

একটু বেলা হইলে ভক্তি-অন্নপূর্ণা-প্রদত্ত perambulator-এ (টায়ার দেওয়া সুন্দর ঠেলাগাড়িতে) বসিয়া বাবা ঠাকুরঘরের দিকে আসিলে সামনের উঠানে গাড়িটি দাঁড়

করানো হইল ; ঠাকুরঘরের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে গুরুগম্ভীর স্বরে বাবা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ চ ফণিকুণ্ডলায়।
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়

স্তবের পর অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন হাত দু-টি মাথায় ঠেকাইয়া। তারপর পূজার এবং ভোগের কিরূপ কি ব্যবস্থা হইতেছে খোঁজ লইয়া বিনোদ-কুটিরে ফিরিয়া গেলেন। চা-পানের পর ঘরে অনেকে জড় হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "আজ মায়ের তিথিপূজা ব'লে কেবলই মায়ের কথা মনে পড়ছে, ভেবে রেখেছি কিছু ব'লব।" ভক্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন : "১১টার সময় মনে করিয়ে দিস্।"

* * *

দুপুরে ১১টার সময় অনেকে বাবার ঘরে সমবেত। বাবা শুইয়া ছিলেন, বলিলেন, "শরীর বড় খারাপ। বলা আর হ'ল না।" একটু পরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন :

"কি আর কথা ? কাশীপুরে ঠাকুরের দেহ তখনও ঘরে। ওঃ সে কি করুণ কান্না ! মা যে বাড়িতে থাকেন, তা কেউ বুঝতে পারত না। মা এসে আছড়ে পড়লেন, আর কান্না—'মা গো, কোথা গেলি গো ; আমাকে কার কাছে রেখে গেলি।' মা ঠাকুরকে মাতৃভাবে দেখতেন—এইটিই এখানে দেখবার। এরপর কিন্তু আর কখনও মায়ের এরকম কান্না দেখা যায়নি। এই একটিবার তাঁকে এমন উতলা হ'তে দেখেছি।"

* * *

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। আরতির শেষে একে একে সকলে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া কাছে বসিতেছে। বাবা 'হলে' চেয়ারে বসিয়া আছেন। একথা সেকথা হইতেছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অলৌকিক জীবনকথা, 'বৈকুণ্ঠ-দর্শন'-এর কথা হইল। তারপর বৃন্দাবন ও জয়পুরের দু-একটি গল্পের পর বাবা হিমালয়ে 'দশরথ কী ডাণ্ডায়' তাঁহার দর্শন ও অনুভূতির কথা বলিলেন : "হিমালয়ের নির্জনতর স্থান। জল জুটে গেল, নীচেই ঝরণা। অনেক ওপরে ছোট একটু থাকবার জায়গা অনেক নীচে থেকে জল আনতে হয়। আর হিংস্র জন্তুর ভয় ব'লে রাখাল ছেলেরা সেখান থেকে নিয়ে গেল তাদের পাড়ায়। আগুন-ঘেরা ঘরে রাত্রে শুলাম। শেষে চিন্তা—'কি। অবিশ্বাস ? দেখি না কি হয়।' আবার বাইরে গাছতলায় এসে বসলাম, কিছুই হ'ল না। তারপর সেই ওপরে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলাম। পেছন থেকে ঠাকুর এসে দেখাচ্ছেন—চিন্ময় হিমালয়, শিবের উপর কালীর নৃত্য ; ঠাকুর গান গাইছেন—

'নেবে নাচ খ্যাপা মাগী
বাজবে যে মহেশের বুকে।'"

তারপর বাবা একটি নবাগত ভক্তকে গান গাহিতে বলিলেন। সে গাহিল :

(১) জয় যুগ-অবতার···

(২) অমৃত কণ্ঠে রামকৃষ্ণনাম···

তখন বাবা বলিলেন, "মায়ের গান জান না ?" ভক্তটি মায়ের গান গাহিল :

(১) কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।

(২) আর লুকাবি কোথায় মা কালী।

(৩) নিবিড় আঁধারে মা তোর
চমকে অরূপরাশি।

এবার বাবা নিজেই গান ধরিলেন :

(১) বল্‌রে তরু বল্—কার উদ্দেশে,
দিন রজনী তাকিয়ে থাকিস উর্দ্ধ্বদেশে।

বাউল সুরে গাহিতে লাগিলেন :

(২) বাইতে পারলাম না—
আমি আর বাইতে পারলাম না।

গানটি শেষ হইলে বলিলেন, "রামপ্রসাদের গান জান না? রামপ্রসাদ লক্ষ জবা দিয়ে মায়ের পূজো করেছিলেন, এক একটি গান এক একটি জবা। লক্ষ গান—লক্ষ জবা। এই সাধনা—এই সিদ্ধি। এই সব গান ঠাকুরের বড় প্রিয়—ঠাকুরের ভাবে ভরা। এসব ভুললে চলবে না, চালিয়ে যেতে হবে। শিখে নাও সব, মুখস্থ ক'রে নাও। তা নয়—আজকাল গান গাইতে বললেই বই খুঁজবে, হারমোনিয়মের ওপর 'গীতিগুচ্ছ' খুলে গান। আমাদের সময় এ-রকম ছিল না, একসঙ্গে দশখানা গান গেয়ে দিত—সব মন থেকে, বই খুলে গান গাওয়া—এ কখনও দেখিনি।"

একটি ব্রহ্মচারী বলিল, দশটা বেজে গেছে—ভাবার্থ এবার ওঠা যাক্। বাবা বেশ জোর গলায় বলিলেন, "দশটা বেজেছে তো কি হয়েছে? ভগবানকে ডাকার কি আবার সময় ধরা আছে না কি? ঘড়ি-টড়ি ঘণ্টা-ফণ্টা বাজে, ওর কি মানে? এইদিন কি আর আসবে? আজ মায়ের দিন—বছরে একটা দিন!

"ভাগলপুরে তানপুরা নিয়ে স্বামীজী গান ধরেছেন—সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা বেজে গেল—চলেছে একটি গান :

'এল না এল না শ্যাম কুঞ্জে তো এল না,
রজনী পোহায়ে যায় তবুও সে এল না।'

গান আর থামে না। কত সব গণ্যমান্য লোক এসেছে—কেউ উঠতেও পারে না, ওদিকে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শেষে ডাকাডাকি ক'রে গান ভাঙাতে হ'ল। স্বামীজীর ভাব বড় ভয়ানক।

"মঠে স্বামীজী এক এক দিন তর্ক লাগিয়ে দিতেন : পূর্বজন্ম জন্মান্তর—এসব আছে কিনা। দুটো পক্ষ হয়ে গেল। তিনি মধ্যস্থ—কখনও এ পক্ষে—কখনও ও পক্ষে যোগ দিচ্ছেন, তাতিয়ে দিচ্ছেন—যাদের যুক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে তাদের। রাত দুটো পর্যন্ত চ'লল, তারপর ঘুম। দেখছ তো? আরে আমাদের সামনেই এই- এর পর কি হবে ভেবে নাও। ১০টার সময় সব ঢুলছে—ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমুতে চায়! আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পালা নেই, তাই ভাবলুম একটু মায়ের নামগান হবে—তা এই অবস্থা! নইলে খাওয়ার ঘণ্টা পড়লে তোমাদের আটকে রাখবে কে? খাওয়া আর ঘুম! এইজন্যেই কি সব এসেছ?"

"মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) কথা বেরিয়েছে 'উদ্বোধনে'—যোগীর ঘুম ৪ ঘণ্টা আর ভোগীর ঘুম ৬ ঘণ্টা, ৮ ঘণ্টা। তোমরা যোগী, ভগবানকে চাও। তোমরা ঘুমুবে কি ক'রে? যে ভগবানকে চায়, সে তাঁকে লাভ না করা পর্যন্ত কি ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবে? থেকে থেকে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে—ওঃ এখনও তাঁকে পাইনি। সে যে জীবন অন্ধকার দেখে, কিছু তার ভাল লাগে না। ভগবানের নাম করার কি আবার স্থান কাল আছে নাকি? ভেঙে ফেল ঘড়ি-টড়ি—ও সব বাধা। সূর্য—সূর্য থেকেই তো সময়ের ভাব।...যাক্, গান গাও।"

যে 'দশটা বাজিয়াছে' বলিয়াছিল, সেই ব্রহ্মচারীটি গান ধরিল : 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।' বাবা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চেয়ারের উপরেই হাঁটুর উপর বাঁয়াটি লইয়া সুন্দর গম্ভীর

অতুলনীয় স্বরে নিজেই গাহিতে লাগিলেন স্বামীজী-রচিত গানগুলি :

(১) 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি,
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম
ছবি বিশ্ব চরাচর।'

(২) 'একরূপ অ-রূপ-নাম-বরণ,
অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন—
নেতি নেতি বিরাম যথায়।'

যেই সূর্য তারি কিরণ ;
সেই সূর্য সেই কিরণ।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া এই লাইনটি যে কতবার গাহিলেন! সব গম্ভীর, শান্ত, নিস্তব্ধ। রাত্রি দুপুর হইয়াছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিয়া গেল।

বাবা আবার বাঁয়ার তালে তালে গান আরম্ভ করিলেন :

(১) 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা
বম্ বব বাজে গাল,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে—
দুলিছে কপাল-মাল।'

—কতক্ষণ শুধু এই দুই লাইনই গাহিলেন।

(২) 'নাচে বাহু তুলে
ভোলা ভাবে ভুলে—'

এই গানের দু-এক কলি গাহিতে গাহিতে তাঁহার মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। জটার মতো চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে—দুলিতেছে, মাথা ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছে, দৃষ্টি অর্ধনিমীলিত, যেন শিবেরই ভাবে বিভোর। থাকিয়া থাকিয়া গানের এক একটি লাইন বলিতেছেন—কী সুন্দর অপূর্ব দিব্যমূর্তি! যেন মানুষ নয়! হঠাৎ মাথার ঝাঁকি দিয়া, চুলগুলি সামনে ঝুলাইয়া গাহিয়া উঠিলেন : 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা বম্ বব বাজে গাল।' সকলকে সুর ধরিতে বলিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গান চলিল। বাবা একটু চুপ করিয়াছেন—অপর সকলে গাহিতেছে

গান থামিলে ধরা গলায় বাবা আবার গাহিতে লাগিলেন—

(১) 'মনের কথা কইব কি সই
কইতে মানা—আ—আ
দরদী বিনে প্রাণ বাঁচে না—আ—।'

(২) 'রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়
মুঠো মুঠো,
দেনা মা, সাধ হয়েছে, পরিয়ে দেনা
মাথায় দুটো।'

"আহা! ঠাকুরের কাছে এইসব গান গাইতে গাইতে রাত কেটে গেছে। হায়, এই ঘুম-ই তো মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে, মানুষকে মেরে রেখেছে, বেহুঁস ক'রে রেখেছে। যদি মানুষ হ'তে চাও—ঠাকুর বলতেন 'মান হুঁস'—যদি সেই মান-হুঁস হ'তে চাও তো প্রার্থনা কর : যেন ঘুম কমে যায়, যাতে তাঁকে ডাকতে পার বেশীক্ষণ ধরে। ঠাকুর সারারাত মশারির ভেতর বসে ভগবানকে ডাকতেন। লোকে ভাবত বুঝি ঘুমুচ্ছেন। তাঁর ঘুমই ছিল না। তাঁর কাছে যারা গেছল, তারাও ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছিল। এই আমারই বা কি? আমি তো তাঁদের কাছে নগণ্য—দু-ঘণ্টার বেশি ঘুমুতে পারি না। যদি বেশী ঘুম হয়ে যায় তো লজ্জা হয়—কোথায় ভোরবেলা বিছানায় বসে একটু ঠাকুরদের নাম ক'রব—তা না, এ কি! মঠে মঙ্গলারতির পর শুয়ে থাকতে ভারি লজ্জা হ'ত—ঠাকুর উঠে পড়েছেন, আর আমি শুয়ে থাকব? ছি, ছি! অমনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়তাম।

"তবে শরীরের জন্য আহার যেমন দরকার, তেমনি নিদ্রাও দরকার। তোমরা যে আমাদের কাছে এলে—ঠাকুরের ছেলেদের কাছে—যারা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে—সেখানে তোমরা কি শিখলে? কিছু একটু শেখো। (তখন রাত্রি ১॥ টা) একটু রাত্তির হয়ে গেছে ব'লে অমনি সব ওঠবার জন্য ব্যস্ত! এই আমি বুড়ো মানুষ। অসুস্থ শরীর, সারাদিন খাইনি কিছু। ঠায় বসে আছি তোমাদের জন্যে। গান শুনছি, নিজে গাইছি, এত বকছি—তা এমন কিছু ক্লান্ত হইনি। এতটুকু ঢুল আসেনি। এর পর আজ আর কি ঘুম হবে? তোমরা তো যাবে আর ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমুবে—৭টা পর্যন্ত।

"আমি কিন্তু ঠিক ৫টার সময় ঘণ্টা বাজাতে ব'লব। দেখ, এখনও দেখ—ঠাকুরের কি শক্তি এই বুড়ো হাড় দিয়ে দেখাচ্ছেন।"

একটু পরে আবার বলিতেছেন:

"'আমি ভাল এক ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি। যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক মানুষ পেয়েছি।' শোন বলি—তোমরা অনন্তের জন্য এসেছ। ঘড়ির দিকে তাকালে কি হবে? ঘড়ি তো সীমা—বন্ধন। Time (সময়) তো relative (আপেক্ষিক)। অনন্ত যদি চাও, এ-সব ভাব দূর করতে হবে। দিন-রাত মিনিট-ঘণ্টা—এ-সব কতদূর পর্যন্ত? এই পৃথিবী—বড়জোর সূর্যের রাজত্ব পর্যন্ত। সূর্যের রাজত্ব আর কতটুকু? এই অনন্ত বিশ্বে কত সূর্য রয়েছে। এক-একটা নক্ষত্র সূর্যের চেয়েও বড়। Sirius (লুব্ধক) প্রভৃতি উজ্জ্বল নক্ষত্র দূরে দূরে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। Galactic system, nebulae—(ছায়াপথ, নীহারিকা) তার এক একটা থেকে কত কত সূর্য জন্মাবে! সেখানে কি time (সময়) আছে? Time (সময়)-ও সেখানে জন্মায়নি।

"আমরা ধ্যান করতুম—এই যেন পৃথিবীর বাইরে চলে যাচ্ছি। ওই যেন পৃথিবী দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে! আর আমি? যেদিকে তাকাই অনন্ত কোটি নক্ষত্র—আলোর কণা, বিদ্যুতের বেগে—light-এর velocity—তে (আলোর গতিবেগে) যার চেয়ে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি (জড়জগতে) তার চেয়েও দ্রুতবেগে চলে গেলাম একদিকে—কোন কূল-কিনারা নেই—যতদূর যতদূর যাও একরকম—বড়জোর periodic (একই ধরণের পরিবর্তন বার বার), সেদিকে তৃপ্তি হ'ল না, শান্তি হ'ল না। তখন আবার ঐ প্রচণ্ড গতিতে উলটো দিকে—সেদিকেও ঐরকম—সব দিকে ঐ একই ধরণ।

"তখন? ধীর স্থির নিস্পন্দ! অনন্তের কি সীমা আছে? এ তো গেল macrocosm (বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) তারপর দেখবে micro-cosm—অণু-পরমাণু—তার ভেতরও আবার কোটি জগৎ খেলা করছে। এ-সব ভাবলে মন আপনা হতেই স্থির হয়ে যায়, সময়ের হিসেব উড়ে যায়, সময় থেমে যায়, অন্ততঃ তার পক্ষে; সত্যি বলছি—এমন কত দিন হয়েছে।

"হিসেবী—calculating হ'লে তার কখনও অনন্তের ধারণা হয় না, ভগবান লাভ হয় না। যতক্ষণ দেখবে calculation (হিসেব), ততক্ষণ time and space (দেশ-কাল)-এর ব্যাপার, মায়ার রাজ্য। সত্য সেখান থেকে অনেক দূর। দশটা বেজে গেল, ঘুমোতে হবে—এ ভাব আমাদের ছিল না।"

রাত্রি ২টা বাজিয়াছে। একে একে সকলে চলিয়া গেল, দুইজন সেবক দুইদিকে ধরিয়া বাবাকে চেয়ার হইতে তুলিল, প্রায় জোর করিয়া তাঁহাকে শোয়ানো হইল।

শুইতে শুইতে বাবা বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ শরীরে কোন বোধ ছিল না। এখন আবার সব যন্ত্রণা-টন্ত্রণা মনে হচ্ছে। এতক্ষণ বেশ ছিলাম, ও-সব ছিল না।"

সেবকেরা মশারি টাঙাইয়া মোমবাতির আলোটি নিভাইয়া দিয়া বাবার অশ্রুতপূর্ব ভাবময় গান ও কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করিতে গেল কৃষ্ণা-সপ্তমীর চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠিয়া পড়িয়াছে। সুপ্ত শ্রান্ত অন্ধকার যেন নীরবে শান্তি ও আলো ঢালিয়া দিতেছে; সমগ্র আশ্রমটি এক অপূর্ব গম্ভীর ভাবে থম্ থম্ করিতেছে।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

১

উটজ-প্রাঙ্গণ খানি অপরূপ মায়া
সৌরকান্তি দিন আসে নামে রাত্রিচ্ছায়া,
শ্যামল বিটপীলতা ভরা ফুলে ফুলে
জ্বলিছে প্রদীপখানি তুলসীর মূলে।
দেবালয়ে উঠে দূরে দেবারতি-ধ্বনি
স্পর্শে পূত নীলাকাশ সমগ্র ধরণী।
নিস্তব্ধ গ্রামের পথ পথিকবিহীন,
আমোদর-কলতান ভেসে আসে ক্ষীণ

মৃদু আলো, চোখে পড়ে মুরতি কাহার ?
সংসারের কর্মে ব্যস্ত জননী আমার।
শিশুরে খাওয়াতে হবে, অতিথিসৎকার,
আত্মজন আর্তসেবা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভার
বিবিধ সংসারকর্ম, নিত্য দেবপূজা,
ধরণীতে নামিয়াছে মাতা দশভুজা।

২

আমোদর-নদীতটে, মৃন্ময় কুটিরে
নেমেছে প্রভাত-আলো আনন্দ-সমীরে।
সুপ্তিমগ্ন সারা গ্রাম, জাগে নাই কেহ
প্রখর গ্রীষ্মের তাপে ক্লান্তি-ভরা দেহ।
উঠানে পড়িল ঝাঁট, দেখি মা আমার
ঘর দোর সব করিতেছে পরিষ্কার।
এখনি যে যেতে হবে দূরে সরোবরে,
গৃহদেবতারে পূজি, রোগী শিশুতরে
দুধ জ্বাল দিতে হবে ঢুকি রান্নাঘরে,
দ্বিপ্রহরে অভ্যাগত, অতিথিসৎকার
শেষ হবে তবে তো বিশ্রাম। সন্ধ্যা নামে
দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি—চিত্তদেশ ভরে :
রজনী বাড়িয়া চলে, নামে অন্ধকার,
কলতান ভেসে আসে, কর্ম-ধারা থামে।

যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ

কৈথল

কুরুক্ষেত্র হতে নরবানা যাওয়ার রেলপথে কৈথল সহর অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র হতে কৈথলের দূরত্ব প্রায় উনপঞ্চাশ কিলোমিটার।

কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম ছিল কপিস্থল। কৌরবদের কাছে পাণ্ডবগণ তাদের বাসের জন্য যে পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা চেয়েছিল, তার মধ্যে কপিস্থল একটি। কিংবদন্তি—বীর হনুমানের জন্মস্থান বলে স্থানের নাম হয়েছিল কপিস্থল।

কৈথলে হনুমানের মাতা অঞ্জনা দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্মিত একটি পুষ্করিণী আছে। কৈথলে এবং কৈথলের আশে-পাশে অনেক মন্দির ও তীর্থ (পুণ্য জলাশয়) আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটির বিবরণ নিয়ে দেওয়া হল।

১। বৃদ্ধ কেদার তীর্থ—এই পুষ্করিণীর তীরে সাতটি শিবের মন্দির আছে।

২। চণ্ডীস্থান—দেবীর মন্দির।

৩। নবগ্রহ কুণ্ড।

৪। সপ্তর্ষি কুণ্ড—শিলখেরী গ্রামে।

৫। উপগা তীর্থ—কৈথলের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে গধরি গ্রাম। এটি একটি প্রাচীন নদী।

৬। কৈথলের আট কিলোমিটার দূরে, কৈথল-কর্ণাল সড়কের উপরে, ওঘাবতী নদীর তীরে ফারোল গ্রামে শুক্রতীর্থ নামে একটি পবিত্র জলাশয় আছে। আশ্বিন মাসের সোমাবতী অমাবস্যায় শুক্রতীর্থে স্নানের মেলা হয়।

৭। কৈথলের প্রায় এগার কিলোমিটার উত্তর-উত্তরপশ্চিমে, পুণ্যতোয়া সরস্বতীর তীরে, সিবন গ্রামে সীতা দেবীর নামে একটি তীর্থ আছে। প্রাচীনকালে স্থানের নাম ছিল সীতাবন।

দ্বৈপায়ন হ্রদ

কর্ণাল সহরের প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পশ্চিমে বহলোলপুর গ্রামের সন্নিকটে মহাভারতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ দ্বৈপায়ন হ্রদ। কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশদিনব্যাপী মহাযুদ্ধে যখন কৌরবেরা পাণ্ডবদের কাছে পরাজিত হল, তখন রাজা দুর্যোধন এই হ্রদে লুক্কায়িত হন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণ তাকে খুঁজে বার করে এবং ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে বাধ্য করে। ভীমের প্রচণ্ড গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়।

কিংবদন্তি—দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনির আশ্রম ছিল।

ফাল্গুন শুক্লা একাদশীতে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে প্রতি বৎসর স্নানের মেলা হয়।

কুরুক্ষেত্র

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥*

[ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "হে সঞ্জয়, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিল ?]

কুরুক্ষেত্র রেলষ্টেসন দিল্লী হতে ছাপ্পান্ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মোটর গাড়ীতে

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১ম শ্লোক

কিংবা বাসেও যাওয়া যায়। কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ এই কুরুক্ষেত্রে হয়েছিল।

পুরাণে অতি প্রাচীন কাল হতেই, এমনকি কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের পূর্বেও কুরুক্ষেত্র তীর্থ বলে বর্ণিত। এখানে কুরু-বংশের আদি রাজা কুরু শস্য-উৎপাদনের জন্য ভূমি কর্ষণ করেছিলেন বলে স্থানের নাম হয় কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্রে এবং তার আশেপাশে অনেক তীর্থ আছে। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে কয়েকটি অতীতের গর্ভ হতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাদের বিবরণ নিয়ে দেওয়া হল।

ব্রহ্মসর অথবা ব্রহ্মকুণ্ড এবং সন্নিহেত্‌সর সূর্যকুণ্ড নামে কুরুক্ষেত্রে দুইটি পবিত্র পুষ্করিণী আছে। কুরু রাজা অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মসর খনন করেছিলেন। পুষ্করিণীর তীরে ও তার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট দ্বীপে কয়েকটি মন্দির আছে। শ্রীকৃষ্ণ, যাদবগণ ও কুরু-পাণ্ডবগণ ব্রহ্মসরে স্নান করেছিলেন। বর্ষাকালে পুষ্করিণীতে নানা রঙের পদ্মফুল ফোটে। সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপে একটি পুণ্য কূপ আছে। সন্নিহেত্‌সর ব্রহ্মসর হতে অনেক ছোট। তার তীরে কয়েকটি মন্দির আছে; তাদের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পুণ্য দিবসে বিশেষতঃ সূর্য-ও চন্দ্র-গ্রহণের সময় তীর্থযাত্রিগণ পুষ্করিণীদ্বয়ে স্নান ও শ্রাদ্ধতর্পণ করে।

২। থানেশ্বর—অতি প্রাচীন ও পবিত্র জলাশয়ের তীরে থানেশ্বর শিবের মন্দির। কিংবদন্তি—পাণ্ডুপত্নী কুন্তীদেবী তাঁর পুত্রদের জয় কামনা করে থানেশ্বর শিবের পূজা করে দত বর লাভ করেছিলেন। এই ।র জল স্পর্শ করে বেণ রাজা কুষ্ঠরোগ হতে মুক্ত হয়েছিলেন।

৩। ভদ্রকালীর মন্দির—থানেশ্বর শিব-মন্দিরের কাছেই ভদ্রকালীর প্রাচীন মন্দির। স্থানটি একান্ন পীঠের অন্যতম। সতীদেবীর দক্ষিণ পদের গুল্ফ এই স্থানে পতিত হয়। তন্ত্রচূড়ামণির মতে এখানে দেবীর নাম সাবিত্রী ও ভৈরবের নাম স্থাণু।

কন্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমিষো ভৈরবস্তথা।
শর্বাণী দেবতা তত্র কুরুক্ষেত্রে চ গুল্ফতঃ ॥
স্থাণুর্নামো চ সাবিত্রী মণিবেদিকদেশতঃ।
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী শর্বানন্দস্তু ভৈরবঃ ॥*

[কন্যাশ্রমে (কন্যাকুমারী) আমার পৃষ্ঠদেশ পতিত হয়; সেখানে ভৈরবের নাম নিমিষ এবং দেবীর নাম শর্বাণী। কুরুক্ষেত্রে আমার গুল্ফ পতিত হয়, সেখানে দেবীর নাম সাবিত্রী ও ভৈরবের নাম স্থাণু। মণিবেদিকে (পুষ্কর তীর্থ) বামহস্তের মণিবন্ধ পতিত হয়, সেখানে দেবীর নাম গায়ত্রী ও ভৈরবের নাম শর্বানন্দ।]

৪। জ্যোতিসর—কিংবদন্তি, শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে গীতা উপদেশ করেছিলেন।

৫। নগড়ু—থানেশ্বরের প্রায় আঠার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। কিংবদন্তি—পিতামহ ভীষ্ম এখানে শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে ছিলেন:

যং যোগিনঃ প্রাণবিয়োগকালে
যত্নেন চিত্তে বিনিবেশয়ন্তি।
সাক্ষাৎপুরস্তাদ্ধরিমীক্ষমাণঃ
প্রাণান্ জহৌ প্রাকৃকালে হি ভীষ্মঃ ॥

[যাঁহাকে যোগিগণ প্রাণত্যাগের সময়ে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আরাধনা করেন, ভীষ্ম সেই সাক্ষাৎ হরিকে সম্মুখে দেখিতে দেখিতে

* তন্ত্রচূড়ামণি

নির্দিষ্ট কালে প্রাণত্যাগ করিলেন।]

থানেশ্বরের শব্দটি স্থানেশ্বরের অপভ্রংশ। স্থানেশ্বর শিবের নামে স্থানের নাম। থানেশ্বরের চতুর্দিকে, দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে যে স্থান ছিল, তার নাম ছিল কুরুক্ষেত্র। মহারাজা কুরু ব্রহ্মসরের তীরে বাস করতেন। ব্রহ্মসরের আরও নাম ছিল—রামহ্রদ, বায়বসর, পবনসর। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই হ্রদের তীরে এক যজ্ঞ করেছিলেন বলে প্রথম নাম ব্রহ্মসর। তার অনেক কাল পরে জমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেছিলেন তখন তাদের রক্তে এই হ্রদ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে হ্রদের নাম হয়েছিল রামহ্রদ। পুরাকালে হ্রদের উপর দিয়ে অতি স্নিগ্ধ বায়ু বয়ে যেত বলে হ্রদকে পবনসর বা বায়বসর বলা হত।

কিংবদন্তি—থানেশ্বরের প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কামোদা গ্রামে পাণ্ডবগণ বনবাসের সময় কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। কামোদা গ্রামে একটি পবিত্র পুষ্করিণী আছে তার তীরে একটি শিবমন্দির আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র শুক্লা-সপ্তমীতে মেলা হয়।

কুরুক্ষেত্রের প্রায় ষোল কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে পিণ্ডারসি গ্রাম। গ্রামে, রেল-ষ্টেসনের কাছেই প্রাচীন পিণ্ডারক তীর্থ। পুষ্করিণীর তীরে অনেক দেবমন্দির। প্রত্যেক সোমাবতী অমাবস্যায় তীর্থে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করার জন্য যাত্রিসমাবেশ হয়। পিণ্ডারসির আশেপাশে আরও অনেক তীর্থ আছে।

পেহোবা

থানেশ্বরের প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার পশ্চিমদিকে, পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরে পেহোবা তীর্থ। পুরাকালে তীর্থের নাম ছিল পৃথূদক, যার মানে হল পৃথুর জল অর্থাৎ পৃথুর হ্রদ। পৃথু ছিল বেণ রাজার পুত্র।

পেহোবা হ্রদ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতি বৎসর পিতৃপক্ষে হ্রদের তীরে বড় মেলা হয়। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করার জন্য সাধারণতঃ যাত্রিগণ এই তীর্থে আসে।

পেহোবায় পৃথ্বেশ্বর (পৃথ্বীশ্বর) মহাদেব, চতুর্মুখ মহাদেব, কার্ত্তিক ও সরস্বতীর মন্দির প্রসিদ্ধ। পৃথ্বেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীনকালে পৃথু রাজা নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময় মন্দির ধ্বংস হয়। তারপর মারাঠাগণ যখন ভারতে বলশালী হয়েছিল, তখন বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়।

পেহোবায় পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরেও কয়েকটি মন্দির আছে। কিছু দূর গিয়ে সরস্বতী নদী বিনশন তীর্থের কাছে শুকিয়ে গেছে।

ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মেরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥*

[তারপর সংযমী ও মিতাহারী হইয়া বিনশন তীর্থে, যেখানে ভূপৃষ্ঠ হইতে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়াছে, সেখানে যাইবে।]

গুরগাঁও

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥

[আমার সমান পাপী নাই এবং আপনার মত পাপনাশিনী কেহ নাই। হে মহাদেবি, ইহা জানিয়া যাহা করা উচিত তাহাই করুন।]

দিল্লী হতে গুরগাঁও সহর মাত্র বত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রেলপথে কিংবা মোটরগাড়ীতে বা বাসে যাওয়া যায়।

* মহাভারত, অরণ্যপর্ব, ৮২ অধ্যায়, শ্লোক ১০৭

গুরগাঁও-এ দেবী ভগবতীর পুরাতন মন্দির উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর নবরাত্রের সময় মন্দিরপ্রাঙ্গণে মেলা হয়।

গুরগাঁও হতে নয় কিলোমিটার দূরে গঢ়িহসরু নামে রেল-ষ্টেসনের কাছে, মার্গপুর গ্রামেও একটি ভগবতীর মন্দির আছে।

গুরগাঁও হতে আলোয়ার যাওয়ার রাজপথে (National Highway), গুরগাঁও হতে প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে, ফিরোজপুর ঝিরকা নামক গ্রামে একটি ঝরণা-মন্দির আছে।

হোডল

দিল্লী হতে মথুরার পথে, ছিয়াশি কিলোমিটার দূরে হোডল গ্রাম। মোটর গাড়ী অথবা রেলগাড়ীতে যাওয়া যায়।

হোডলে ছোট ছোট গাছের একটি উপবন আছে। তার নাম পাণ্ডব বন; সম্ভবতঃ পাণ্ডবগণ এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। উপবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির ও একটি পুণ্য পুষ্করিণী আছে।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥*

[পঙ্গু অর্থাৎ জ্ঞানাদি সাধনে অক্ষম ও মন্দবুদ্ধি জনের যাঁহারা গতি এবং যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্বস্ব সেই পরমদয়ালু শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহন জয়যুক্ত হউন।]

তোষম্

তোষম্ পাহাড় হিসার সহরের প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে। ভিউয়ানি হতে তোষম্ ষোল কিলোমিটার দূরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে।

তোষম্ পাহাড়ের উপরে কয়েকটি পুণ্য-তোয়া দীঘি আছে। তাদের একটির নাম পাণ্ডুতীর্থ।

আনন্দপুর সাহেব

যাহা তাহা তুম ধরম বিথারো।
দুষ্ট দুঃখিয়ান কো পাকড় পাছাড়ো ॥*

[সর্বত্র সত্যধর্ম প্রচার কর। যাহারা দুষ্ট ও অপরকে দুঃখ দেয় তাহাদের সাজা দাও।]

অম্বালা-সিরহিন্দ-নানগলবাঁধ রেলপথে আনন্দপুর সাহেব শিখদের একটি বিখ্যাত তীর্থ। অম্বালা হতে আনন্দপুর একশত আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে। নবম গুরু তেগ্ বাহাদুর আনন্দপুর সহর স্থাপন করেন। দশম ও সর্বশেষ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ যখন মোগল বাদশা ঔরঙ্গজেব এবং তার অধীন পার্বত্য হিন্দু-রাজগণের সঙ্গে সংগ্রাম করতে বাধ্য হন, তখন তিনি আনন্দপুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

আনন্দপুর সাহেবে কতগুলি শিখদের মন্দির আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

গুরু কি মহল—এখানে নবম গুরু তেগ্ বাহাদুর বাস করতেন। নির্মিত হয়েছিল ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে। মন্দিরের নীচে একটি গুহা আছে, সেখানে গুরুজী ধ্যান করতেন। গুহাটির নাম ভোরা সাহেব গুরু গোবিন্দ সিংহ এই মন্দিরে তাঁর শৈশবের শিক্ষা গ্রহণ করেন; যদিও গোবিন্দ সিংহ জন্মেছিলেন বিহারের পাটনায়।

গুরুদ্বারা তেগ-বাহাদুর—মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন হিন্দু ও শিখদের সব মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দেয়, তখন গুরু তেগ-

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ১ম পরিচ্ছেদ

* গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক)

বাহাদুর সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হয়ে গুরুজীকে দিল্লীর রাজধানীতে ডেকে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করতে আদেশ দেয় গুরুজী তার আদেশ অগ্রাহ্য করায় ক্রুদ্ধ হয়ে ঔরঙ্গজেব তাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে হত্যা করে। গুরুজীর ছিন্ন মস্তক কোন উপায়ে শিখগণ আনন্দপুরে নিয়ে আসে এবং গুরু গোবিন্দ এই স্থানে তাঁর মৃত পিতার ছিন্নমস্তক দাহ করেন। ঠিক যেখানে এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল তার নাম 'অকল বুঙ্গ। গুরু তেগ-বাহাদুর প্রাণ দিলেন কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করলেন না। তাই বলে, "শির দিয়া তো শের নহি দিয়া।"

গুরুদ্বারা কেশগড—এখানে গুরু গোবিন্দ তাঁর প্রথম পাঁচ জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে 'অমৃত' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। শিষ্যগণ সিংহের মত বলশালী হবে বলে তাদের সিংহ পদবী হয়েছিল। তিনি তাদের খালসা নামে অভিহিত করেন। মন্দিরটি অতীতের সেই পুণ্যস্মৃতি বহন করছে।

গুরুদ্বারা আনন্দগড়—আনন্দগড়ই ছিল গুরু গোবিন্দ সিংহের দুর্গ। মোগল ও পার্বত্য হিন্দু-রাজগণের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে তিনি আনন্দগড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা এই আনন্দগড়ে ঘটে। তিনি যে কত বড় বীর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, আনন্দগড়ে অবস্থানের সময়ে তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে তা জানা যায়।

আনন্দপুর সাহেবের নিকটে আগমপুরেও শিখ গুরুদ্বারা আছে। তাদের একটিতে গুরু গোবিন্দ সিংহ হোলা* উৎসব পালন করতেন। অপরটিতে গুরু গোবিন্দের পত্নী মাই জিতোর সমাধি।

কিরাতপুর সাহেব

অম্বালা সহর হতে রেলপথে কিরাতপুর সাহেব একশত চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। আনন্দপুর সাহেব হতে কিরাতপুর মাত্র আট কিলোমিটার দূরে।

কিরাতপুর সাহেবে কয়েকটি শিখদের গুরুদ্বারা আছে। তাদের মধ্যে 'বাবা গুরুদিত্ত' নামে মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। হর-মন্দির সাহেব, শিষ মহল ও তখৎ সাহেব নামে গুরুদ্বারাগুলি সপ্তম গুরু হর রায়ের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মৃতি বহন করে। পাতালপুরী নামে গুরুদ্বারায় গুরু হর রায়ের সমাধি। (ক্রমশঃ)

---

* দোলপূর্ণিমার পর দিন শিখদের হোলা উৎসব হয়।

সমালোচনা

ভারত-সংস্কৃতির রূপরেখা : প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। ৩৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য : ৬.০০ টাকা।

সভ্যতাকে যদি সুন্দর জীবনের বহিরাবরণ বলে বর্ণনা করা হয় তবে সংস্কৃতি হল ঐ সুন্দর জীবনের সত্তা বা প্রাণ। সামাজিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে—অর্থাৎ পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আরও কিছুটা যোগ করে মানুষ সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পুরুষকেই (generation) নতুন করে সংস্কৃতির অনুশীলন করতে হয়। এই কারণে সভ্যতার অগ্রগতি নিয়মিত ঘটলেও সংস্কৃতির অবনতির ফলে সভ্যতা প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে। যাতে তা না হয় তার জন্যে প্রয়োজন হয় জাতিকে তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বার বার সচেতন করিয়ে দেওয়া। এই দিক দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানিকে স্বচ্ছন্দেই এক উল্লেখযোগ্য অবদান বলে অভিহিত করা চলে।

ভারত-সংস্কৃতির ওপর অনেক বড় বড়—বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত বই আছে, সংস্কৃতির আলোচনা আজ বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে পাঠ্য ইতিহাসেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এ-বিষয়ে অবিমিশ্র অনুসন্ধিৎসা ঠিক ক'জনের আছে? মোটকথা, আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা মোটেই গড়ে ওঠেনি। তাই দেখা যায়, অন্ধ—হীন অনুকরণের এত মোহ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অনুসন্ধিৎসা এবং তৎপরবর্তী স্তর—শ্রদ্ধাসৃজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র। তাই ভারত-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক মাত্র ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। তবুও কিন্তু উপক্রমণিকা বা প্রথম পাঠ হিসেবে গ্রন্থখানি এক মূল্যবান সঙ্কলন, সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, গ্রন্থখানি একখানি সঙ্কলন। চার ভাগে বিভক্ত গ্রন্থখানিতে বিভিন্ন লেখক ভারত-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেছেন। প্রথম ভাগে আছে ভারত-সংস্কৃতির ধারা, দ্বিতীয় ভাগে পরিচয় দেওয়া হয়েছে ভারতের সংস্কৃতির ও সাধনার, তৃতীয় ভাগে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ ভাগে কয়েকজন প্রখ্যাত আধুনিক চিন্তাবিদ্ ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি দিকের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

অধিকাংশ রচনাই সুলিখিত এবং স্বল্পায়তন হলেও সম্পূর্ণ সম্বদ্ধ—ইংরেজীতে যাকে বলে unity। আরও উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক লেখকই ভারত-সংস্কৃতির চাবিকাঠি পাঠকের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই কাগজের ওপর কলম চালিয়ে গেছেন। দু'একটি রচনা অবশ্য খসড়া-জাতীয়। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এগুলির পূর্ণতর রূপ দিয়ে গ্রন্থখানিকে আরও পূর্ণাঙ্গতার দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কোন্ কোন্ রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য? বাছাই করা কঠিন, কারণ তা নির্ভর করবে পাঠকের ব্যক্তিগত রুচিপছন্দজনিত পক্ষপাতের ওপর। যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে চান, তাঁদের কাছে অধিকাংশ রচনাই তুল্যমূল্য মনে হবে। আর যাঁরা এই সংস্কৃতির বিশেষ দিকে আগ্রহী, তাঁরা ঐ বিষয়-সম্পর্কিত রচনাগুলিকেই কদর করবেন। সুতরাং গ্রন্থখানি আগাগোড়া শেষ

করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বাছাই করেও অংশবিশেষ পড়া যায়. আবার প্রয়োজন মত বাচিয়ে নেবার জন্যে হাতের কাছেও রাখা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, গ্রন্থখানি ঠিক কাদের জন্যে? সংক্ষিপ্ত উত্তর: সকলের জন্যে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের—ভাবী নাগরিকদের জন্যে। বোধহয় এই শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য রেখেই অনেকগুলি রেখাচিত্র সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থপাঠে ভারত-সংস্কৃতির প্রতি ভাবী নাগরিকদের শ্রদ্ধা অনেকখানি গড়ে উঠবে এবং ফলে অন্ধ অনুকরণের মোহ দূর হবে—সুরু হবে মানুষগড়ার কাজ। এবং এর মধ্যেই রয়েছে ভারতের ভবিষ্যৎ। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়: "It is culture that withstands shocks, not a mass of knowledge."

এই মূল্যবান গ্রন্থখানির দু'টি ত্রুটির উল্লেখ না করে পারলাম না। দু'টিই মুদ্রণ-পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমতঃ, কয়েকটি রচনায় প্রান্তিক টীকা সংযোজন করা হয়েছে কিন্তু বাকিগুলিতে এর পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে sub-heading। বোধহয় সর্বক্ষেত্রেই ঐ দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করলে ভাল হয়। দ্বিতীয়তঃ, যতিচিহ্ন বা punctuation mark-এর আধিক্য পাঠে কিছুটা অসুবিধা ঘটায়। অনেক ক্ষেত্রেই কমা হাইফেন ইত্যাদি বাদ দেওয়া যেত, এবং বর্তমানে তাই করা হয়। যেমন, (৯ পৃষ্ঠা) শিল্প সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি প্রত্যেকটি শব্দের পর কমা-ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। অনুরূপ ভাবে, (৭৪ পৃষ্ঠা) ব্রহ্মদেশ সিংহল আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের নামের পর নিয়মিত কমা ব্যবহার না করলেই বোধহয় ভাল। আবার (১২৭ পৃষ্ঠা) 'সত্যগুলিকে'— এইভাবে ব্যবহার করে মধ্যের হাইফেন উঠিয়ে একটি শব্দ করাই যুক্তিযুক্ত। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এই মুদ্রণ-পরিকল্পনাজনিত ত্রুটিও দূর করা হবে পরবর্তী সংস্করণ যে হবে. সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কারণ বাংলা ভাষায় ভারত-সংস্কৃতির এত সংক্ষিপ্ত সুলভ অথচ হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ আর কোথায়? যদি না হয় তবে বুঝব বাঙালীর আর আশা নেই—ভাগীরথীর প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হতে চলেছে।

—ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৬০৫ পৃঃ ৩য় লাইনে 'অধিষ্ঠাতাঃ' স্থলে 'অধিষ্ঠিতাঃ' এবং ৬০৬ পৃঃ ১৮শ লাইনে 'কালাত্ময়ুক্তানধিতিষ্ঠতোকঃ' স্থলে 'কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠতোকঃ' পড়িবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন গভর্নিং বডি-র ১৯৭১-৭২ সালের কার্যবিবরণী : [গত ২৯শে অক্টোবর বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত]

"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় আমরা আরো একবছর মিশনের কাজ যথারীতি চালাইয়া আসিতে পারিয়াছি ; এই কালের, ১৯৭১-৭২ সালের কার্যবিবরণী ও হিসাব এই সভায় উপস্থাপিত করিতেছি। গত তিন বছরের বিরুদ্ধ পরিবেশ ও চাপের তুলনায় আলোচ্য বর্ষ অপেক্ষাকৃত শান্তিময় থাকিলেও বহু স্থানে আমাদের বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদ্রবের ফলে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রের পরিচালন-ব্যবস্থা ঠিক করা ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পুনর্গঠন করা ছাড়াও বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) দুঃসহ রাজনৈতিক হাঙ্গামার চাপে সেখান হইতে আগত ভাইদের জন্য বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তুসেবার গুরুভারও এইকালে আমাদের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইয়াছে। পূর্বের পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সব কেন্দ্রগুলিই তখন ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল ; সে কেন্দ্রগুলির অধিকাংশই লুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেগুলির পবিত্রতা নষ্ট করা হইয়াছিল, ধ্বংসের পরিমাণও কম নয়।

সেখানে তখন বিভিন্ন কেন্দ্রে মিশনের পাঁচজন সাধু (পাকিস্তানের জাতীয়তা পাওয়া) কাজ করিতেছিলেন ; তাঁহাদের ভারতে পলাইয়া আসিতে হয়। সেখানে মিশনের কাজের অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ কিছুকাল দুঃখ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বর্ষের শেষের দিকে বাংলাদেশের মহান অভ্যুদয়ে নূতন আশার আলো দেখা দেয়—আমরা আনন্দের সহিত আজ জানাইতেছি, বাংলাদেশে মিশনের দশটি কেন্দ্র আবার সেবাকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছে ; ঢাকা, বাগেরহাট, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট ও ফরিদপুরে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সাধুরা থাকিয়া পরিচালনা করিতেছেন, এবং আরও পাঁচটি কেন্দ্র স্থানীয় ভক্তগণের সহায়তায় চালাইতেছেন। এগুলির মধ্যে তিনটি মঠ-কেন্দ্র। বর্তমানে সব কেন্দ্রেই প্রধান সেবাকার্য পুনর্বাসন ও রিলিফ।

ভারতবর্ষে আলোচ্য বর্ষে কয়েকটি নূতন কাজ হইয়াছে : অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার দেওমালির নিকটে নরোত্তমনগরে একটি নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে, চণ্ডীগড় কেন্দ্রের ছাত্রাবাস-ভবনের নূতন একটি তল নির্মিত হইয়াছে, এলাহাবাদে একটি দ্বিতল ডিসপেনসারী-ভবনের এবং বারাণসী সেবাশ্রমের একটি নূতন অস্ত্রোপচার-ভবনের উদ্বোধন হইয়াছে। বোম্বাই আশ্রম কর্তৃক সেখানকার 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া'-য় স্বামীজীর ১২-ফুট উচ্চ একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজীর পৈতৃক আবাসের একাংশ ক্রয় করার পূর্ব-আরব্ধ চেষ্টা চলিতেছে। এসব ছাড়াও, মিশনের কাজ যে সামগ্রিকভাবে বর্ধিত ও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, নিম্নের কার্যবিবরণীই তাহার প্রমাণ।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড) ব্যতীত ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৪টি

শাখাকেন্দ্র ছিল ; তন্মধ্যে বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) ছিল ৭টি এবং ব্রহ্মদেশ, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে একটি করিয়া ; অবশিষ্ট ৬১টি ভারতে। ইহা উল্লেখ্য যে, মিশনের এই কেন্দ্রগুলি ছাড়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রধান কেন্দ্র ব্যতীত ৬৪টি মঠকেন্দ্র আছে, সেগুলির কার্যবিবরণী এখানে দেওয়া হইতেছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যাহা আচরিত ও তৎকর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া কার্যে রূপায়িত করিয়াছেন, সেই বৈদান্তিক-তত্ত্ব-নিহিত নিষ্কাম সেবার ক্ষেত্রই রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মক্ষেত্র। এই কর্মধারার প্রধানতঃ পাঁচটি বিভাগ : (১) সেবাকার্য (Relief), (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রচার, (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনহিতকর কার্য।

সেবাকার্য

(১) **উদ্বাস্তু সেবা :** আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন তিনটি প্রধান সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য সেবাকার্য পরিচালিত হয় (১৯৭১ এপ্রিল হইতে ১৯৭২ জানুয়ারি) এই সব স্থানে : পশ্চিমবঙ্গের জামশেরপুর (নদীয়া), রাধিকাপুর ও ডালিমগাঁও (পশ্চিম দিনাজপুর), মালদহ ; সকতি ও মানিকগঞ্জ (জলপাইগুড়ি) ; গাইঘাটা, বোকচরা, কালাসিমা ও লক্ষ্মীপুর (২৪ পরগনা) এবং পুরুলিয়া ; মেঘালয়ের শেলা, ইছামতী ও ডাউকি ; খাসী পাহাড়), তুরা (গারো পাহাড়) আসামের করিমগঞ্জ ও শিলচর ; এবং ত্রিপুরার উদয়পুরে। সর্বসাকল্যে ৪২,৪৯৩টি পরিবারভুক্ত ২,২১,৯১৪ জন শরণার্থীকে সাহায্য দেওয়া হয়। ভারত ও ভারতের বাহির হইতে প্রাপ্ত দাতাদের দান এবং গবর্নমেণ্ট-প্রদত্ত খাদ্যের দাম বাবত এককোটি টাকার অধিক বাদ দিয়া এই সাহায্যের পরিমাণ মোট ২৬,৩৭,৯৯০·০০ টাকা ; হিসাব-নিকাশের পর সেবাকেন্দ্রগুলি -প্রদত্ত শরণার্থীদের সেবাকার্য-সংক্রান্ত হিসাব ইহার অন্তর্ভুক্ত।

বন্যাত্রাণকার্য ১৯৭১ খৃঃ আগস্ট হইতে নভেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয় পশ্চিমবঙ্গে মালদহ ও সারগাছি (মুর্শিদাবাদ), কাঁথি ও বাকুচা (মেদিনীপুর), শিমুলগাছি (নদীয়া), ডোমজোড় (হাওড়া), রহড়া ও মনসাদ্বীপে (২৪ পরগনা) ; বিহারে মনিহারী ও মেদিনীপুর (পুর্ণিয়া) এবং পাটনায়। নগদ খরচ হইয়াছে মোট ১,২৫,৮২৭·০০ টাকা ; ৯,৩৭৪টি পরিবারের ৪২,২২৭ জন সাহায্য পাইয়াছে।

ওড়িশা ঘূর্ণীবাত্যা-ত্রাণকার্য ১৯৭১ খৃঃ নভেম্বর হইতে ১৯৭২ খৃঃ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত হইয়াছে কটক জিলার চণ্ডীয়াগরিতে (পট্টমুণ্ডাই)। মোট খরচ হইয়াছে ২৩,১৯১·৭৮ টাকা। ১,৭৫৬ পরিবারের ৭,৩৭৫ জন সাহায্য পাইয়াছে।

উপরে লিখিত তিনটি সেবাকার্যে মিশন অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন চাল ও গম ৪৭,৫৭২ কুইন্‌টাল, মশলা ও লবণ ২২৭ কুইন্‌টাল, গুড় ও চিনি ২৮·৬৭ কুইন্‌টাল, শাকসবজী ৭,২৯২ কুইন্‌টাল, পাঁউরুটি ৫৬,৮০০ পাউণ্ড, বিস্কুট ৩·২০ কুইন্‌টাল, বার্লি ও সাগু ১২·৭০ কুইন্‌টাল, গ্লুকোজ ৯৩ কেজি, কম্বল ৩০,৯১০টি, ধুতি ও শাড়ি ৭৩,২৫৭টি, লুঙ্গি ২,৩৭০টি পোশাক-পরিচ্ছদ ৫৬,৯৪৮টি, শার্টের কাপড় ৩,৩৪৮ মিটার, পুরাতন পোশাক ৩৭,১৭৫টি, দুধের গুঁড়া ৫২৬ কুইন্‌টাল, শিশুখাদ্য ৫৮০ কুইন্‌টাল, জ্বালানি কাঠ ৮২৬

কুইন্‌টাল, বাসনপত্র ৬,৪৭৭টি, গানিব্যাগ ৮,১৩৩টি, কাপড়-কাচা সাবান ১১,৮৮ কুইন্‌টাল, মাদুর ৪৮০টি, ছাতা ১২০টি, হারিকেন লণ্ঠন ১১২টি, ত্রিপল ৮৪১টি, ত্রিপল শীট ৩৩ রোল, তৈল ২৭২.২৩ কুইন্‌টাল, এবং ৭,৪৩১ খানি পুস্তক। ইহা ছাড়া ৮৯টি কুটির তৈরী হয়, বিভিন্ন তাঁবুতে ৭টি বিদ্যালয় খোলা হয় এবং ১,২২,৩০৪ জনের চিকিৎসায় সাহায্য করা হয়।

বাংলাদেশে মিশনের সেবা ও পুনর্বাসন-কার্য ১৯৭২ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে আরম্ভ হইয়া এখনও চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মঠ ও মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে অর্থ ও জিনিস-পত্র দ্বারা নিয়মিতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্রও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ৯৮টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ১৯৬ জন দরিদ্র ছাত্রকে এবং সাময়িকভাবে ১৩০টি পরিবারকে ও ১৮ জন ছাত্রকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে; এই সাহায্য বাবত মোট ব্যয় হয় ২৩,২১০.৩০ টাকা। ইহা ছাড়া ২৮৮ খানি পোশাক-পরিচ্ছদ, ৪৯টি কম্বল, ১১ খানি গরম চাদর এবং ৪৯ খানি ধুতি ও শাড়ী দরিদ্র নর-নারীর মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

চিকিৎসা

জাতিধর্মনির্বিশেষে রোগীদের সেবার জন্য ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র বহুসংখ্যক ইনডোর হাসপাতাল ও আউট-ডোর ডিসপেন্‌সারি পরিচালনা করেন। আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৬টি হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে শয্যাসংখ্যা ছিল ১,১০২ এবং চিকিৎসাধীন রোগী ছিলেন ২০,৯৫২ জন। ৫১টি আউটডোর ডিসপেন্‌সারিতে অনেক পুরাতন রোগী সহ ৩৭,৯৭,৬৭৭ জন চিকিৎসিত হয়। রাঁচির তুন্দরি হাসপাতাল এবং দিল্লীর ক্যারল-বাগে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার্থ শয্যাগুলি শুধু যক্ষ্মারোগীদের জন্য। কলিকাতার সেবা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষণ বিদ্যালয় যথারীতি পরিচালিত হয়; এই বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ—সাহায্যকারী (auxiliary) ও সাধারণ (general)।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদীয় প্রথায় চিকিৎসা হয়। মঠকেন্দ্রগুলির ৫টি ইনডোর হাসপাতালে ১০,৪৫৩ জন রোগী এবং ১৫টি আউটডোর হাসপাতালে ৫,১৭,৬৭৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

শিক্ষা

আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি পরিচালন করেন:

৫টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি.টি. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ৪টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইন্‌স্টিটুট, ২টি বেসিক ট্রেনিং বিদ্যালয়, ১টি শরীরশিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ১৩টি জুনিয়র টেক্‌নি-ক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রীয়াল স্কুল, '৪টি ছাত্রাবাস, হষ্টেল, ও অনাথাশ্রম, ২টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০৫টি অন্যান্য স্কুল, ৫২টি বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কম্যুনিটি সেণ্টার, ১টি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, ১টি অন্ধ বালকদের শিক্ষালয়, ১টি দিবা-

ছাত্রাবাস এবং ১টি ভাষা-শিক্ষায়তন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭০,৩৩৭, তন্মধ্যে ছাত্র ৫২,৬৪১ এবং ছাত্রী ১৭,৬৯৬।

মঠকেন্দ্রসমূহ-পরিচালিত ২২টি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৭১৬, তন্মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রী যথাক্রমে ৩,৯৮১ ও ১,৭৩৫ জন।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রসার:

এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, উৎসব, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সহযোগে বক্তৃতা, নিয়মিত ক্লাস ও বক্তৃতা এবং সেমিনারগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকটি কেন্দ্রের পুস্তক ও পত্রিকাপ্রকাশন বিভাগসমূহও উল্লেখ্য। এই সম্পর্কে কলিকাতা ইন্‌স্টিটুট অব কালচারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা-বিস্তারের যে প্রভূত কর্মানুষ্ঠান মঠকেন্দ্রসমূহ পরিচালন করিতেছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই; এই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা-সফর, ধর্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি ছাড়াও অনেকগুলি বৃহৎ পুস্তক-প্রকাশন-কেন্দ্র, মন্দির প্রভৃতি পরিচালিত হইতেছে।

গ্রামাঞ্চল ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনহিতকর কার্য:

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুসারে মিশন সর্বদাই সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত জনগণের সেবা করিতে আগ্রহী. আলোচ্য সময়ে গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি অধ্যুষিত স্থানে মিশন যে সেবা ও জনকল্যাণের কাজ করিয়াছেন, তাহা চমকপ্রদ না হইলেও কম নয়; আশানুরূপ কাজ যে করিতে পারা যায় নাই তাহার কারণ আমাদের সীমিত অর্থ ও সাধু-কর্মীর সংখ্যা, উৎসাহের অভাব নয়। ইহা সত্ত্বেও যথেষ্ট-পরিমাণ 'কাজ হইয়াছে। মিশনের চিকিৎসাকেন্দ্র ও শিক্ষায়তনসমূহ লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের সেবায় নিরত। ক্রমাগত একটির পর একটি করিয়া যে-সকল সেবাকার্য চলিয়াছে, সেগুলি শুধু দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। বার্ষিক উৎসবগুলিতে সহস্র সহস্র নরনারী যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়া জীবনের উচ্চতর ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যেও অবিচলিত থাকিবার শক্তি লাভ করেন। গ্রামাঞ্চলে সেবাকর্মের জন্য অন্তত: ১০টি বৃহৎ কেন্দ্র গ্রাম-ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। এই সকল গ্রামীণ কেন্দ্র তথা অন্যান্য শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীন বহু কেন্দ্র দরিদ্র ও অনুন্নত গ্রাম্য জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ১৪৪টি বিদ্যালয় চালাইয়াছেন; তন্মধ্যে ৭টি বহুমুখী বিদ্যালয়; ২টি মাধ্যমিক; ৪৫টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক, উচ্চতর প্রাথমিক ও মধ্য ইংরেজী; ৪২টি নিম্ন প্রাথমিক এবং ৪৮টি বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র। ১৫টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট সহ ২৪টি গ্রন্থাগার, ১২০টি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র, ৭টি অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট, ৯টি কম্যুনিটি সেণ্টার, ৭টি কারিগরী শিক্ষণ-কেন্দ্র, ১টি গ্রামীণ পাঠাগার-পরিচালন শিক্ষণ-কেন্দ্র প্রভৃতি দরিদ্র ও অনুন্নত গ্রামবাসিগণের জন্যই পরিচালিত হইয়াছে। এগুলি ছাড়া শিলং কেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ এলোপ্যাথিক ডিস্‌পেন্‌সারির মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে

৩০টি গ্রামে ১৩,৬১০ জন স্থানীয় রোগীর চিকিৎসা নিয়মিতভাবে করা হইয়াছে। রাঁচি-মোরাবাদী আশ্রমের পরিচালনাধীন 'দিব্যায়ন' নামে একটি আবাসিক যুব প্রতিষ্ঠান কৃষি, পক্ষি-পালন (poultry), দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিক্রয় (dairy) প্রভৃতির শিক্ষণ প্রকল্প এবং নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে উপজাতিদের মধ্যে প্রশংসনীয় কার্য করিতেছেন। শিলচর আশ্রম কুকী ও মিজো প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে বহুবিধ জনকল্যাণকর কার্য করিয়াছেন। অরুণাচল প্রদেশে আলঙ্ (সিয়াঙ) এবং নরোত্তমনগর (তিরাপ) কেন্দ্রগুলি পূর্ণ উদ্যম ও আগ্রহের সহিত শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্য করিয়া যাইতেছেন; এজন্য কেন্দ্রগুলি উপজাতি-সমূহের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।

বিদেশে কার্য

সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস, ও শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত মিশনের কেন্দ্রগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষা-ও সংস্কৃতিমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশ ও ফ্রান্সে অবস্থিত কেন্দ্র দুইটি সাংস্কৃতিক ও অধ্যাত্মবিষয়ক ভাবধারা-প্রচারে নিরত।

অনুরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আরজেন্‌টিনা, ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত ১৫টি মঠ-কেন্দ্রে।

বাংলাদেশে অবস্থিত ১০টি মঠ ও মিশন কেন্দ্র বর্তমানে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার সহিত প্রধানতঃ আর্তত্রাণ-ও পুনর্বাসন-কার্যে নিরত আছেন।

উপসংহার

বন্ধুগণ, যে বাধা ও বিপত্তি সম্মুখে আসিয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও, তাহা অতিক্রম করিয়া, সাহস ও দৃঢ়বিশ্বাস অবলম্বনে মিশন যে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে. উপরের কার্যবিবরণী হইতে তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। শ্রীভগবান-প্রদত্ত প্রেরণাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাছাড়া সরকার ও জনসাধারণের সহানুভূতি এবং সর্বোপরি আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছে; এজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কাজ আমরা ভালভাবেই করিয়াছি, আশা করি ভবিষ্যতে আরো ভালভাবে করিব। সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান আমাদের পথ দেখাইয়া চালিত করুন, এই প্রার্থনা।"

বিশেষ সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারি স্বামী গম্ভীরানন্দের চক্ষু পুনরায় পরীক্ষা করিয়া বোষ্টনের চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহার বাম চক্ষুতে পূর্বের অস্ত্রোপচার-জনিত উন্নতি অব্যাহত আছে। বিশেষ ধরণের চশমা দেওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অধিকতর উন্নতি হইয়াছে।

আমেরিকা হইতে যাত্রা করিয়া স্বামী গম্ভীরানন্দ গত ২৩শে নভেম্বর লণ্ডন, ২৭শে গ্রেজ ও ৩০শে জেনেভা হইয়া ৩রা ডিসেম্বর দিল্লী পৌঁছান। সেখান হইতে মায়াবতী শ্যামলাতাল ও লক্ষ্ণৌ হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে পৌঁছাইয়াছেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (মাখন মহারাজ) গত ৫. ১১. ৭২ রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময় দিল্লী আরউইন হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বিকল

হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। হাসপাতালের কার্যপরিচালনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন; মায়াবতী ও বারাণসী সেবাশ্রমের কর্মিরূপে এবং বৃন্দাবন ও কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষরূপে সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কিষেণপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ হন এবং দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে সঙ্ঘ একজন সরল, কর্মে একনিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে হারাইল।

স্বামী দেবেশানন্দ

স্বামী দেবেশানন্দ (প্রভাস মহারাজ) ৭৭ বৎসর বয়সে গত ১৩. ১১. ৭২ সকাল ৮টা ২২ মিনিটে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অসুস্থতার জন্য বহুদিন হইতে তিনি হাসপাতালে ছিলেন। তাঁহার ডায়েবিটিস ছিল, সম্প্রতি যকৃতের উপসর্গও দেখা দিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। কনখল সেবাশ্রম ও বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করা ছাড়াও তিনি কানপুর, লখনৌ ও শ্যামলাতাল আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা তাঁহার সহৃদয় মধুর ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারিতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁহাদের আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা) গত ২৭শে নভেম্বর নিজস্ব ভবনে (১৫১ বিবেকানন্দ রোড) ভগিনী নিবেদিতার ১০৬তম জন্মবার্ষিকী পালন করিয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ও শ্রীধীরাজ বসু নিবেদিতার জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সোসাইটির শিশুবিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

(পুনর্মুদ্রণ)

[পূর্বানুবৃত্তি : আমার তিব্বতভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ]

(গত সংখ্যার শেষ লাইন :

পণ্ডিত আমাদের বলিল, উপরে যাওয়ার জন্য গুড়পাপড়ি প্রস্তুত করিয়া লউন।

ময়দা ঘৃতে ভাজিয়া গুড় বা চিনি মিশ্রিত করিলে তাহা একরূপ শুষ্কভাবাপন্ন হয়। ইহাকেই গুড়পাপড়ি বলে। ইহা অনেকদিন থাকে, খারাপ হয় না। আমাদের আলেখিয়া বন্ধুদ্বয় উহা প্রস্তুত করিয়া দিল। আলেখিয়া কাহাকে বলে, তাহা সাধারণকে জ্ঞাপনার্থ বিশ্বকোষ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"আলেখিয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা 'অলখ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়। এইজন্য ইহাদের নাম আলেখিয়া। ইহাদের সঙ্গে যে ঝুলি থাকে, তাহাকে পরম পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। এই ঝুলি অনুসারে তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ১—ভৈরব-ঝুলিধারী, ২—গণেশ-ঝুলিধারী ও ৩—কালী-ঝুলিধারী। ভৈরব-ঝুলিধারীরা বৈকালে ও সায়ংকালে, গণেশ-ঝুলিধারীরা পূর্ব্বাহ্নে এবং কালী-ঝুলিধারীরা বেশী রাত্রে ভিক্ষা করিয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-ঝুলিধারীরা কেবল লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করে, মনে করিলে কাহারও বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে পারে। কিন্তু কালী-ঝুলিধারী বা ভৈরব-ঝুলিধারীরা কাহারও দ্বারস্থ হয় না, পথে পথে 'অলখ', 'অলখ', এই নাম বলিতে বলিতে চলিয়া যায়, যাহার ইচ্ছা হয়, সেই ভিক্ষা দেয়। ভৈরব ও কালী-ঝুলিধারীদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি দেবসাধনোদ্দেশে নিজের সঙ্গে মদ্য, ছাগলের মেটে ভাজা ও একখানি ছুরি রাখে। ভৈরব-ঝুলিধারীরা সঙ্গে রুটিও রাখে, পথে কুকুর দেখিলেই তাহাকে রুটি খাইতে দেয়, কারণ কুকুর ভৈরবের বাহন।

ইহারা গায়ে খেলকা ও কয়েক রকম অলঙ্কার ব্যবহার করে। ইহারা যখন বামহস্তে ঝুলি ও খর্পর ও দক্ষিণহস্তে একটা চিমটা এবং ঘুঙ্গুরের শব্দ করিতে করিতে ভিক্ষার্থ বাহির হয়, তখন বড় মন্দ দেখায় না। ইহারা গির্ণার, পুণা প্রভৃতি স্থানে বাস করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রায় নির্গত হয়। সন্ন্যাসীরা যখন তীর্থ-যাত্রা করে, তাহারা আলেখিয়া সঙ্গে লয়। তখন আলেখিয়ারাই অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়। এই মহৎ কার্য্যটী অপর সম্প্রদায়ে প্রায় লক্ষিত হয় না।" (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

জেনেরাল সার এম জি জেরার্ড কিছুদিন হইল মধ্য এসিয়ায় পামির নামক অধিত্যকাতে এক দুর্গম গিরিপথ দিয়া অশ্বারোহণে একদিনে ৬৭ মাইল গিয়াছিলেন। আজও পর্যন্ত কেহই অশ্বপৃষ্ঠে অত দুর্গম স্থান দিয়া এত চলিতে পারেন নাই।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারীতে পার্লিয়ামেন্ট খুলিয়াছিল।—মহারাণীর বক্তৃতা হয়—তাহাতে বলিয়াছিলেন, প্রধান ২ সকল সকল রাজ্যেরই সহিত সদ্ব্যবহার চলিতেছে। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে এখনও প্লেগ বাড়িতেছে; তজ্জন্য তিনি অতি দুঃখিত, তবে—ভরসা দিতেছেন যে—প্লেগাক্রান্তদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, অন্যান্য দেশে রোগবিস্তাররোধের জন্য এবং সমূলে একেবারে তাহার নাশের জন্যও যৎপরোনাস্তি যত্ন করা যাইতেছে। এবারে ফসলাধিক্যের সংবাদ শুনিয়া আমাদের পূজনীয়া সম্রাজ্ঞী বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের প্রশংসা আমরা অনেকের মুখেই শুনিতে পাইতেছি।

ইনি যে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি, তাহা দু-একটী সামান্য ঘটনা হইতেই পূর্ব্বে আমরা বুঝিয়াছি। বোধ হয়, যতদিন কর্জ্জন বাহাদুর ভারতে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ত কোনও মতেই কাবুল প্রভৃতির সঙ্গে আর বিবাদ বিসংবাদ সম্ভব নহে। শুনিতে পাইলাম নাকি কাবুলের সঙ্গে, আর আমাদের বড়লাটের সঙ্গে, ভারি বন্ধু-ভাবে, খবরাখবর খুব চলিতেছে। কেনই বা না হবে?—আপ্ ভাল ত জগৎ ভাল। বিদ্যা-বল বলুন, বুদ্ধি-বল বলুন, সৈন্য-বল বলুন, আর যে বলই বলুন না কেন—চরিত্র-বল অপেক্ষা আর কোনও বলই এত বলীয়ান নহে।

প্রশিয়া দেশে এচেনের পশুশালায় একটী সিংহ-শাবক স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত হইয়াছে। ইহার নাম প্রিন্সেস।—স্ত্রীলোকটী উক্ত পশুশালার অধ্যক্ষের পরিচারিকা। প্রিন্সেসকে ঐ ধাত্রীদ্বারা দুধ খাওয়াইয়া লালন করা হইত; অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাড়ীতেই সর্ব্বদা ছাড়া থাকিত—প্রায় বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে বা চিমনীর নীচে থাকিতে ভালবাসিত। বাটীতে যেমন নিরীহ কুক্কুর-শাবকগুলি বেড়াইত, প্রিন্সেসও সেইরূপ শান্তভাবে খেলা করিত। প্রিন্সেস বড় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—শীঘ্রই বোধ হয় স্বাধীনতা খোয়াইবে। জিজ্ঞাসা কি করিতে পারি—আমাদের দেশে এমন কয়জন স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা সিংহ-শাবককে "মানুষ" করিতে সাহসী হন?

ইংলণ্ডে আজও ভৃত্য-পীড়ন সময়ে সময়ে শুনা যায়! গত ১১ই জানুয়ারীর লণ্ডনস্থ "স্কেচ" নামক কাগজ বলিতেছেন যে, "এমিলী জেন পোপজয়" নাম্নী সপ্তদশ বৎসরের বালিকা মনিবাণীর পীড়নে গত ২৭শে ডিসেম্বরে গতাসু হয়। উইকলী ডিসপাচের গ্রাহকগণ সকলে মিলিয়া ঐ বালিকার হইয়া অনেক লড়িয়াছিলেন এবং তাহার কবর-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে ভৃত্য-পীড়ন প্রভৃতি অসদ্ব্যবহার অনেকের ঘরেই আছে!! আমেরিকায় ভৃত্যকেও পর্য্যন্ত "আজ্ঞে" "প্রাজ্ঞে" বলিয়া কথা কহিতে হয়। তথায় কর্ম্মের বেশী আদর—কর্ম্ম-মাত্রই—জুতাসেলাই হইতে "চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম মহা পবিত্র বলিয়া গণনা করা হয়। আর্য্য-জাতির মধ্যে কি তা আগে ছিল না?

জানালা প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট গাছ রাখা পাশ্চাত্য দেশে ভারি প্রচলিত। ইহাতে যে কেবল গৃহাভ্যন্তরের শোভা বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও অনেক সাহায্য করা হয়। পাশ্চাত্যদেশে, পূর্ব্বে, ঐরূপ জানালা-প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট ফুলের গাছ রাখা চলন ছিল। কিছুদিন পরে, ফুলের উপর হইতে দৃষ্টি যাইয়া পাতার উপরে পড়িল; ফুলগাছের পরিবর্ত্তে চওড়া অথবা বাহারী পাতাওয়ালা গাছ বসান ব্যবহার উঠিল। "পাম" ও "ফর্ণের"ই আদর একপ্রকার একচেটে হইল। আজকাল আবার উক্ত আদর পাম ও ফর্ণের উপর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া পানডেনস্, মারাণ্টা, ড্রেসিয়ানা, ক্রোটন প্রভৃতির উপরেও পড়িতেছে। আমাদের দেশে এইরূপ গাছের আদর ও ব্যবহার বড়ই কম। জানালা প্রভৃতি সাজাইতে গেলে ঘটী-বাটী প্রভৃতি—বা বড়জোর খেলনা প্রভৃতি দিয়া সাজাইয়া থাকি!!

সুখের বিষয় যে,—মার্কিন মহিলাগণের মধ্যে চিত্রবিদ্যা-চর্চ্চা, অতি আধুনিক হইলেও, আজকাল বেশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিশ বৎসরের কথা হইল, "আমেরিকান

শিল্পি-সমিতি" (Society of American Artists) সমগ্র আমেরিকা হইতে ঢুঁড়িয়া দুইটী মাত্র মার্কিন মহিলা পাইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের চিত্রবিদ্যায় একটু দখল ছিল। গত ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার "জাতীয় ভাবাঙ্কন-বিদ্বৎ-সমাজ" (National Academy of Design) তথায় একটী মাত্র মহিলাকে (ফিডেলিয়া ব্রিজেস) চিত্রবিদ্যায় নিপুণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু, আজকাল এই বিদ্যায় পারদর্শিনী মহিলাবর্গের সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছে। আমরা দুই-এক জনার নাম দিতেছি—মেরী ক্যাসাট্, সিসিলিয়া বো, ডোরা হুইলার কীথ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথমটীর নাম এদেশের কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবেন বলিয়া বোধ হয়। ইনি প্যারিস নগরে যাইয়া উক্ত বিদ্যায় নিজের পারদর্শিতায় খুব বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেখুন! দু দশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে 'কোনও মহিলা চিত্রাঙ্কন জানিতেন না' বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, সেখানে আজ শত শত ভদ্র-মহিলা দুই দিনেই চিত্র-বিদ্যার প্রতিবিভাগে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন—পাশ্চাত্য দেশে এত বিদ্যানুরাগ! আর আমাদের দেশে দেখুন, ঠিক তাহার বিপরীত।—প্রাচীন কালে যখন পাশ্চাত্যদেশ জঙ্গলাকীর্ণ বা সমুদ্রতলস্থ ছিল, তখন ভারতের প্রায় প্রতি ঘরে প্রতি ভদ্র-কন্যা চিত্রবিদ্যায়—এমন কি, অনুরূপ প্রতিকৃতি অঙ্কনাদি সর্ব্বপ্রকার কঠিন কঠিন চিত্রবিদ্যাবিভাগে নিপুণ ছিলেন। ইহার প্রমাণ, রামায়ণ মহাভারতে এবং ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের গ্রন্থসমূহে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ভারতের এমন যে গুণশালী মহিলা আজ কিনা—মনুষ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা দূরে থাক, 'ক' 'খ' অঙ্কনেও অক্ষম!

রামকৃষ্ণ মিশন

১। কলিকাতা বিভাগ।

গত ২রা ফাল্গুন, কলিকাতা আলবর্ট হলে, রামকৃষ্ণ-মিশনের একটী মহতী সভা হইয়া গিয়াছে। সিষ্টার নিবেদিতা—স্বামী বিবেকানন্দের একজন ইংলণ্ডীয় শিষ্যা—"কালী ও কালীপূজা" এই বিষয়ের উপর একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকার, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাবু সত্যেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতিও কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। মিসেস শালজার, শ্রীমতী সরলাদেবী প্রভৃতি দু-চারিটী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠ হইতে, চারিটী সন্ন্যাসীকে প্রচারার্থ বাহিরে প্রেরণ করিয়াছেন,—পশ্চিমে গুজরাট অঞ্চলে দুইটীকে (স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ); আর, পূর্ব্বে ঢাকা অঞ্চলে দুইটীকে (স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ)। স্বামী সারদানন্দের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, ইনি স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমেরিকায় অনেকানেক সহরে হিন্দুধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। আর যে তিনটী সন্ন্যাসী—ইঁহাদিগেরও নাম বোধ হয় কেহ কেহ শুনিয়া

থাকিবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেকদিন ব্যাপিয়া উক্ত বেলুড় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, ভগবদ্গীতা এবং বৈশেষিক ও বেদান্ত-দর্শন পড়াইয়াছিলেন; এবং রামকৃষ্ণ মিশন সভায় কিছুদিন, উপনিষৎ প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ স্বামিদ্বয় গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গলা-দেশের নানা অঞ্চলে, রামকৃষ্ণ মিশন সভা হইতে কতকগুলি রিলিফ সেণ্টার (দুর্ভিক্ষ-মোচনাশ্রম) খোলা হইয়াছিল; তাহার মধ্যে দেওঘর সেণ্টারের কার্য্যাধ্যক্ষ উক্ত স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন; আর, প্রকাশানন্দ ছিলেন—দক্ষিণেশ্বর-সেণ্টারের কার্য্যাধ্যক্ষ।

২। আমেরিকা বিভাগ।

স্বামী অভেদানন্দ গত দুই মাসে আমেরিকায় এই সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন—

৪ঠা ডিসেম্বর—পুনর্জ্জন্ম। —(Re-incarnation.)
৭ই „ —অহং ও অহংকার। —(Ego and Egoism.)
১১ই „ —মুক্তি কি? —(What is Salvation?)
১৪ই „ —কর্ম্ম-তত্ত্ব। —(Philosophy of Work.)
১৮ই „ —ভগবৎ-প্রেম। —(What is Divine Love?)
২১শে „ —প্রকৃত ভক্তি। —(Ideal Devotion.)
৪ঠা জানুয়ারী ১৮৯৯—মত ও কার্য্য (রাজ-যোগ)—(Theory and Practice.)
৮ই „ —ভগবানের মাতৃভাব। —(The Motherhood of God.)
১১ই „ —জগদ্ব্যাপী জীবনী শক্তি (রাজযোগ) —(The Cosmic Life Principle.)
১৫ই „ —ক্রমোন্নতি-বাদ ও পুনর্জ্জন্ম।—(Evolution and Re incarnation.)
১৮ই „ —প্রাণায়াম ও ধারণা —(Breathing and Mentation.)
২২শে „ —একত্ববাদ ও একেশ্বরবাদ —(Monism and Monotheism)
২৫শে „ —একাগ্রতার সহায়। (রাজ-যোগ) —(Preliminary to Concentration.)
২৯শে „ —বেদান্তের নৈতিক মত।—(The Ethics of Vedanta.)

সমালোচনা

শান্তি-শতকম্ -শিহ্লন মিশ্র প্রণীত এবং কলিকাতা-নিবাসী (১২ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা) বাবু মন্মথনাথ মৈত্র-অনুবাদিত। মূল শ্লোকগুলি ও কবিতায় অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শান্তি-শতক সকলেরই শান্তি-প্রদ। অনুবাদক মহাশয় শান্তি-রসাত্মক সেই শ্লোকগুলি সুন্দর বাঙ্গালা-কবিতায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি যথার্থই সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে।

পুনর্মুদ্রিত অংশের সূচীপত্র

উদ্বোধন ১ম বর্ষ, (১ম ৪র্থ সংখ্যা : ১লা মাঘ—১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫)

কভার : ১ম সংখ্যার প্রচ্ছদ –/৪১ ; ১ম সংখ্যার কভার ৪র্থ পৃষ্ঠা—/৪২ ; দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদের ফটো—২২/১৬৮ ; ৩য় সংখ্যার কভার ৩য় পৃষ্ঠা—৬৫/৪৫১

[ফুটনোটে '—সম্পাদক'-লেখা মন্তব্যগুলি বর্তমান সম্পাদকের, অন্যথায় মূল গ্রন্থের]

উদ্বোধন ১ম বর্ষের সমগ্র সূচীপত্র*

[১লা মাঘ, ১৩০৫—১৫ই পৌষ, ১৩০৬]



* ১ম বর্ষের ১ম— ৪র্থ সংখ্যার পুনর্মুদ্রিত অংশের মূল পত্রিকার পত্রাঙ্ক এখানে পাইবেন।— সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'২০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—[illegible] সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য [illegible] উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—[illegible] সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাবান্তর। মূল্য [illegible]

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। [illegible] অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। [illegible] স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। [illegible] মূল্য [illegible] উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য [illegible]

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য [illegible] উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—[illegible] সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

বাণীসঞ্চয়ন—১ম সংস্করণ। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী হইতে বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্বাচিত উপদেশাবলী। স্বামীজীর বাস্ট-সংবলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। পৃষ্ঠা ৩১২; মূল্য ৩'২৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৭৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ—ইংরেজীতে প্রকাশিত Discourses on Jnana Yoga পুস্তকের অনুবাদ। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' হইতে পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আত্মতত্ত্ব ও বেদান্ত-বিষয়ক বহু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক। মূল্য দুই টাকা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যিই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০৲ ২য় ভাগ ১০৲
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে „ ৯৲ „ ৯'০০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে:

মূল্য—১ম ভাগ	২'৫০	উঃ গ্রাঃ পক্ষে	২'২৫
২য় „	৪'৭৫	„	৪'২৫
৩য় „	৩'৫০	„	৩'১৫
৪র্থ „	৩'০০	„	২'৭০
৫ম „	৩'৫০	„	৩'১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—১ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১৫৲, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৪৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১'২৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০'৭০

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত—২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ত্রিবর্ণ চিত্র। মূল্য—৪'০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ১৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—৭৫ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২'০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৭শ সংস্করণ। স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—২'০০।

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য ৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—২'০০।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১'৫০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডায়েরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫'৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর আধুনিকতম মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৮৲ করিয়া। একত্র লইলে ২৩৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৫ম সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-প্রণীত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৩'৫০। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ৯'২০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১০ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য—০'৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—১০ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীচন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১'২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎ-পরবর্তী প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। বেদান্তের মূলতত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্মের মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপস্থাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মূল্য এক টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুন্দর আখ্যান। মূল্য ০'৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩'০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'০০।

শিবানন্দ-বাণী—১ম খণ্ড—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত। মূল্য—২'২৫।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৫ম সংস্করণ, ২২৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় ক্ষোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩৲। উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২'৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সংকলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৩'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালা"র প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'৫০।

৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

